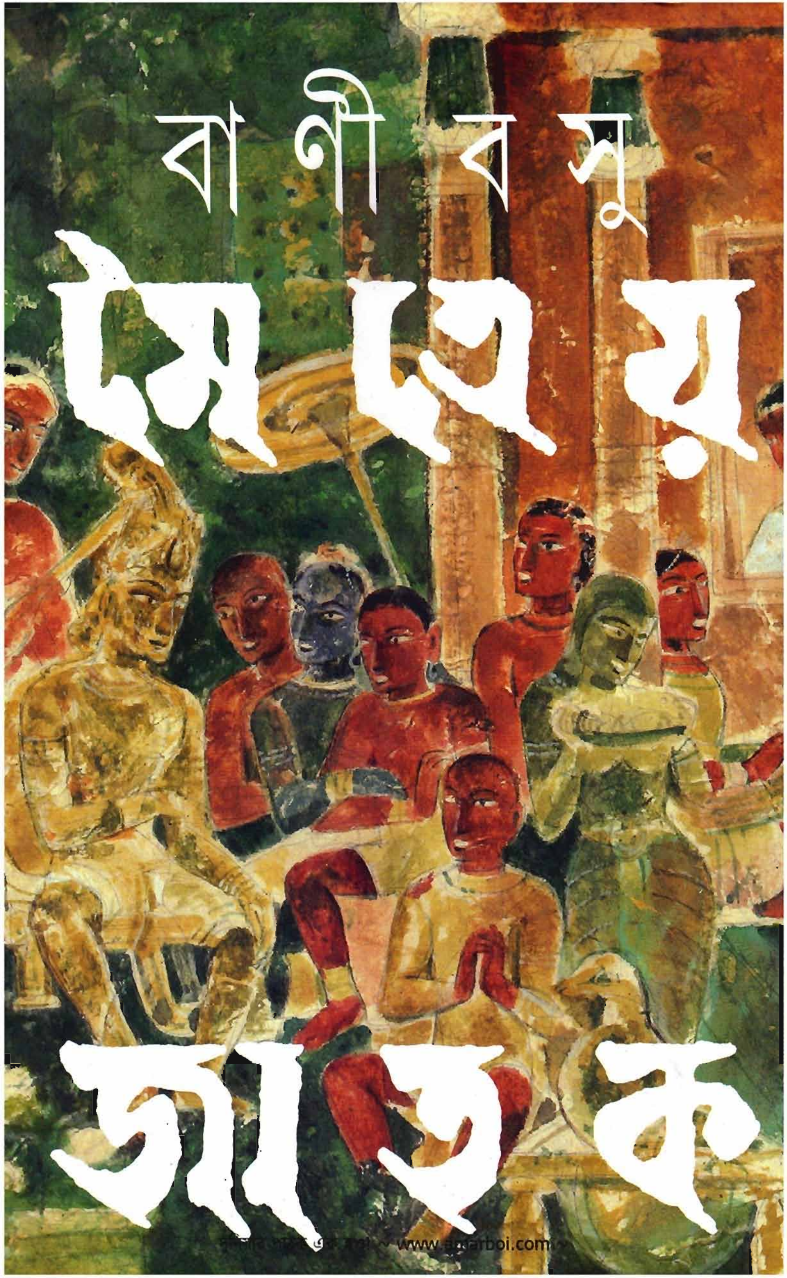

বাণী বসু

মৈত্রেয় জাতক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৈত্রেয় জাতক

বাণী বসু

গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ভারতভূমির প্রেক্ষাপটে রচিত এই সুবৃহৎ উপন্যাস একই সঙ্গে ঐতিহাসিক সময় ও সময়াতীত মানবপ্রবাহের ধারক। দুই পর্বে বিন্যস্ত এই উপন্যাসের কথাবস্তুর উৎসমুখ বৌদ্ধজাতক। ভিন্ন ভিন্ন স্তরে উন্মোচিত কাহিনী—সংঘাত ও সম্প্রসারণে, বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসে, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষায় দীপালোকের মতন কখনও কম্পমান, কখনও স্থির। কাহিনীর কেন্দ্রে আছেন তথাগত বোধিসত্ত্ব স্বয়ং। আছেন লোকবিশ্রুত সম্রাট থেকে নিচুতলার ব্রাত্য পতিত মানুষজন। চরিত্রচিত্রণে 'মৈত্রেয় জাতক' প্রাচীন জীবনকে অতিক্রম করে আধুনিক জীবনের অন্তর্লোক স্পর্শ করেছে। ভাষা ও আঙ্গিকের কারুকৃতিতে অনন্য, বাণী বসুর এই সৃষ্টি মানুষের শাশ্বত জীবনচর্যার অবিস্মরণীয় স্মারক।

9 788172 154806

আ
ন ন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌতম বুদ্ধের জীবৎকাল তথা ভারত-ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কে অবিকল ও প্রাণবন্ত চেহারায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন বিদগ্ধ কথাকার বাণী বসু, দু-পর্বে সুবিন্যস্ত তাঁর এই বিশাল, বেগবান, বর্ণময় উপন্যাসে। এই কাহিনীর পটভূমি এক দিকে ছুঁয়ে আছে মধ্যদেশ—অর্থাৎ আজকের বিহার উত্তরপ্রদেশের কিছু-কিছু অঞ্চল, অন্য দিকে চিরকালীন মানুষের চিরজটিল মনোলোক। এই দ্বিবিধ পটভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাসের কথাবস্তু।

কখনও রাজনৈতিক স্তরে—যেখানে উত্তর-পশ্চিম থেকে পুবে আরও পুবে সরে আসছে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র, গান্ধার-মদ্র-কুরু-পাঞ্চালের জায়গায় কোশল-বৈশালী-মগধ, পুরনো সাম্রাজ্যবাদের নীতির সঙ্গে ঘটছে নতুন মৈত্রী-ভাবনার সংঘাত। এই সংঘাতের কেন্দ্রে যেমন আছেন লোকবিশ্রুত গৌতম বুদ্ধ, আছেন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বলে খ্যাত বিম্বিসার, কোশলপতি প্রসেনজিৎ ও নানান ধুরন্ধর রাজপুরুষবর্গ, তেমনই আছেন তক্ষশিলার বিদগ্ধ যুবক চণক, গান্ধারের বিদুষী নটী জিতসোমা, সাকেতের সন্ধিৎসু রাজন্যকুমার তিষ্য।

কখনও-বা অর্থনৈতিক স্তরে, যেখানে ক্ষমতার প্রতিসরণ ঘটছে শ্রেণীবিন্যাসেও। ধনই হয়ে উঠছে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে-সঙ্গে শাস্ত্রজীবী এবং শস্ত্রজীবীদের প্রতিযোগিতায় পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে আসছেন বণিক ও ধনজীবীরা।

আবার সামাজিক স্তরে এঁদের সবাইকে ঘিরে বৃহত্তর জনজীবনে কৃষিজীবী, বৃত্তিজীবী, ভূম্যধিকারী নাগরিক, ছোট ব্যবসায়ী, কবি, নটী, দাস প্রমুখের ক্ষেত্রে চলেছে শাশ্বত জীবনচর্যা। তবু তার উপরেও পড়ছে পরিবর্তনের নানান সূক্ষ্ম আঁচড়। বুদ্ধকথিত ভাবাদর্শ বহুভাবে প্রবেশ করছে গণচেতনায়, জাগছে কখনও অনুকূল প্রভাব, কখনও-বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া। আর এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-বিপর্যয়, সম্পর্কের ভাঙন ও পুনর্বিন্যাসের অন্তঃশীল প্রবাহ। মনস্তাত্ত্বিক এই স্তর।

এই চতুরঙ্গ স্তরের প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়ে মোহনার দিকে এগিয়ে-যাওয়া এই উপন্যাসে কিংবদন্তি হয়ে-ওঠা বহু ঘটনার ও অনুরূপ পরিস্থিতির নতুনতর ভাষ্য। আধুনিক জীবনের চোখে প্রাচীন জীবনের আপাত সরলতার মিথকে ছিন্ন করে এক অতি জটিল আবেগ-অনাবেগ, প্রেম-অপ্রেম, চেতন-অবেচতনের দ্বন্দ্বময় ব্যক্তি ও যৌথ-জীবনের কথা। যথোচিত ভাষায়, এবং যথাযোগ্য আঙ্গিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

জন্ম : ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৬। শিক্ষা-দীক্ষা-কর্ম কলকাতায়।

শিক্ষা : প্রথমে লেডি ব্রেবোর্ণ, পরে স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী। ইংরেজিতে অনার্স, পরে ইংরেজি সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. (১৯৬২)।

কর্ম : হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা।

লেখালেখি : ছাত্র-জীবন থেকেই প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা ও অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত। উল্লেখযোগ্য অনুবাদ : শ্রীঅরবিন্দের সনেটগুচ্ছ (শৃন্বন্তু), সমারসেট মমের সেরা প্রেমের গল্প (১৯৮০, রূপা), সমারসেট মমের সেরা গল্প (১৯৮৪, রূপা) ও ডি. এইচ. লরেন্সের সেরা গল্প (১৯৮৭, রূপা)। আনন্দমেলা ও দেশ পত্রিকায় প্রথম গল্প, প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। 'জন্মভূমি মাতৃভূমি' প্রথম উপন্যাস। শারদীয় 'আনন্দলোক'-এ প্রকাশিত, ১৯৮৭-তে। পেয়েছেন তারাশঙ্কর পুরস্কার (১৯৯১), ১৯৯৫-এর সাহিত্য সেতু পুরস্কার এবং সুশীলা দেবী বিড়লা স্মৃতি পুরস্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদ □ সুব্রত চৌধুরী

মৈত্রেয় জাতক

বাণী বসু

আ ন ন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচার্য গৌরী ধর্মপাল

ও

আচার্য অনির্বাণকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

'মৈত্রেয় জাতক' বুদ্ধর জীবন কথা নয়। ঐতিহাসিক রোম্যান্স তো নয়ই। এই জাতক একটি সময়কালের পুনর্নির্মাণ, যে কাল আজকের সংকটমুহূর্তে নিঃসন্দেহে ফিরে দেখার যোগ্য। অবশ্যই কল্পনাশ্রয়ী এ নির্মাণ, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যসমূহকে অবমাননা করে নয়। ইতিহাসের গর্ভে যেখানে যেখানে অনিশ্চয়তা, পরস্পরবিরোধ ও নীরবতা, যুক্তিসিদ্ধ কল্পনা সেই ফাঁকগুলোতেই স্বেচ্ছাচারী হয়েছে। যেমন বিম্বিসারের বংশ নির্ণয়, অভয় বা জীবকের পরিচয়, আনন্দর বয়স, এবং সাধারণভাবে ছোট ছোট ঘটনার কালক্রম। ঘটনাবলীর পেছনের মোটিভ-নির্ণয়ও ছিল গবেষণার কেন্দ্র, যদি একে ন্যূনতম গবেষণার মান দেওয়া যায়। এই চিত্র পূর্ণ এমন দাবি করি না। বিশেষত জ্ঞাতৃকপুত্র বর্ধমান মহাবীরকে তেমন কোনও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় দেখানো গেল না, এ দুঃখ রয়েই গেল। কিন্তু ইতিহাস, কথাকাহিনী এমন কি বিজ্ঞানের জগতেও কোন চিত্রই বা পূর্ণ ? আসল কথা যথাসম্ভব খোলা মন ও মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে কাজ করা গেছে কি না।

অশ্বঘোষ, ললিতবিস্তর, অবদানশতক এবং সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রনাথ সবার চোখেই বুদ্ধ করুণার অবতার। সবার আগে অবশ্যই তিনি অধ্যাত্মপুরুষ। কিন্তু আধ্যাত্মিক কৃতির মূল্যায়ন তো অনাধ্যাত্মিক মানুষের ক্ষমতার বাইরে ! সুতরাং, আধ্যাত্মিকতাকে তাঁর ব্যক্তিত্বের পশ্চাৎপট বলে মেনে নিয়েই একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে তিনি এ-যুগের বিচারে এবং সে যুগের চোখে কীভাবে প্রতিভাত হন, অর্থাৎ বিগ্রহের ভেতরকার মানুষ অমিতাভ কেমন, কী তাঁর তাৎপর্য তা দেখার বিশেষ আগ্রহ ছিল, আরও আগ্রহের বিষয় সেই দেশ ও সেই কাল যা তাঁকে সম্ভব করেছিল, সেইসব মানুষ যাঁরা তাঁকে বন্ধুতা অথবা শত্রুতা দিয়েছিলেন, এবং সবার পেছনে সেই জীবনের পটভূমি যা সাধারণজনের যাপিত।

দেখা গেল সিদ্ধার্থ একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান (চতুরও বটে), অসামান্য দৈহিক রূপ ও ব্যক্তিমায়া সম্পন্ন (পুরুষদেরও মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো), সময়ে সময়ে কৌতুকপ্রিয় (মোটেই সর্বদা ধ্যানগম্ভীর নন), দারুণ প্র্যাকটিক্যাল ও স্থিতধী (উপস্থিতবুদ্ধি তাঁকে বহুবার বাঁচিয়েছে) অথচ ট্র্যাজিক মানুষ। আজকের ভাষায় তাঁকে শোধনবাদী বললে বোধহয় ভুল হবে না। সমাজের পাশাপাশি বাস করতে করতে যে সঙ্ঘ তিনি গড়েছিলেন তাতে সমাজ শক্তি ও রাজশক্তির সঙ্গে বহু আপস ও রফা ছিল। তাঁর প্রধান সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা হল—অতিকৃচ্ছ্র ও অতিভোগ এই উভয়বিধ বদভ্যাসের মাঝামাঝি এক মধ্যপন্থার সুপারিশ। তাঁর কালের বিচারে এ পদক্ষেপ যদি বৈপ্লবিক না-ও হয় অন্তত তা বিশেষ কাণ্ডজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যবহার করে তিনি উপকরণশুদ্ধি (স্নানে পাপ মোচন ইত্যাদি), অনর্থক অনুষ্ঠান (অগ্নিহোত্র ইত্যাদি) অগ্নিবরুণ সোমের দেবত্ব—ইত্যাদি খণ্ডন করলেন, কিন্তু আবার বললেন সুকর্মে স্বর্গ বা দেবযোনি, কুকর্মে নরক বা তির্যগ্ যোনি প্রাপ্তির কথা, কর্মফল জন্ম থেকে জন্মান্তরে প্রসারিত হবার কথা। ভেবে দেখলে এই পরস্পরবিরোধের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এই মহামানব যিনি মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের উদ্যোগে লোকগুরুর ভূমিকা নেন তাঁর লক্ষ্য ছিল সংযত, সজাগ, কর্তব্যপরায়ণ, সহনশীল, করুণাময়, নিরাসক্ত এক সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন। 'সম্মা আজীব' অর্থাৎ সৎ-জীবিকার প্রতিও তিনি জোর দিয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠীদের ধনোপার্জনও এই সৎ-জীবিকার মধ্যে পড়ে (ব্যবসা বাণিজ্যের কুটিলা গতির কথা তখনও যথেষ্ট জানা ছিল না)। জীবনযাপনে যাতে অসুবিধের সৃষ্টি হয় এমন সংস্কার দূর করতে তাঁর যতটা উদ্যোগ ছিল, সুকর্মে প্রবর্তনা ও আশা জাগ্রত রাখবে এমন সংস্কার রচনা করতেও তাই বোধ হয় ততোটাই উদ্যোগ দেখিয়েছিলেন।

বর্ণভেদ তিনি নিজে মানতেন না, তাঁর সঙ্ঘও মানত না, কিন্তু সমাজশরীর থেকে বর্ণভেদ উঠিয়ে দেবার জন্যও তো কই উঠে পড়ে লাগেননি ! অবশ্য জন্মের বদলে গুণকর্মের ওপর নির্ভরশীল বর্ণভেদের কথা বিশেষত ব্রাহ্মণত্বের কথা তিনি বহুবার বলেছেন। অর্থাৎ শ্রমভাগের একটা কাঠামো হিসেবে বর্ণভেদের ভূমিকা হয়তো তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করতেন না।

অপর দিকে আত্মা তিনি মানতেন না, ঈশ্বর সম্পর্কে ছিলেন নীরব। আবারও আত্মবিরোধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা আত্মা ও ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতো আশাপ্রদ ও শুভসংস্কার আর কী-ই বা থাকতে পারে ? তবে কি তিনি ধ্যানযোগে অনাদ্যন্ত শূন্যেরই মুখোমুখি হয়েছিলেন, এবং সে কথা সোজাসুজি সামান্য জনের কাছে প্রচার করা ভালো মনে করেননি ? জীবনের বৃহত্তম দার্শনিক 'চালাকি'টি তিনি করলেন এই ঈশ্বরসম্পর্কিত প্রশ্নে ? ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে অনর্থক বাদানুবাদ সর্বাঙ্গসুন্দর ইহ জীবনের পরিপন্থী মনে করেই কি তিনি তাঁর আবিষ্কৃত শূন্যতত্ত্ব গোপন রাখলেন ? তিনি কি পৃথিবীর প্রথম এগজিসটেনশ্যালিস্ট ? এবং তাই-ই আনন্দকে তাঁর জীবনের শেষ নির্দেশ দিলেন 'আত্মদীপো ভব ?' একি প্রকারান্তরে বলা নয় তোমাকে পথ দেখাবার কেউ নেই, জীবন এবং মরণের মুখোমুখি দাঁড়াও, নিজের জোরে, নিজের নির্বাচনের দায় স্বীকার করে।

গৌতম বুদ্ধর রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা আরও চমকপ্রদ ও বৈপ্লবিক। এখানে লক্ষণীয়, তাঁর বৈরাগ্য ছিল একটা ইতিবাচক মনোভাব থেকে উৎপন্ন। দারা-পুত্র-পরিবার আর ভালো লাগছে না—এমন নয়, দুঃখনিবৃত্তির একটা উপায় খুঁজে বার করবোই—এমনি। শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে রোহিণী নদীর জল নিয়ে বিবাদ (গঙ্গার জল নিয়ে পঃ বঙ্গ ও বাংলাদেশ, কাবেরীর জল নিয়ে তামিলনাড় ও কর্ণাটক স্মরণীয়) ও অনবরত রক্তক্ষয় নাকি তাঁর বৈরাগ্যের অন্যতম কারণ (অত্তদণ্ড সুত্ত—জাতক অট্‌ঠকথা)। তা হলে যে নিরাময়ের সন্ধানে তিনি বেরিয়েছিলেন রাজনৈতিক নিরাময়ও তার অন্তর্গত হওয়া অসম্ভব নয়! এবং জীবনের অনেকটা সময়ই যে তিনি কোশলপতি, মগধরাজ বা বৎসরাজের সংস্পর্শে কাটালেন সেটাও নেহাত কাকতালীয় নয়, বরং সচেতন ও সাভিপ্রায় হতে পারে। আসলে অভ্যন্তরীণ নীতিতে গণতান্ত্রিক ও বৈদেশিক নীতিতে পারস্পরিক মৈত্রীর একটি তত্ত্ব তিনি রাজপুরুষদের কাছে ক্রমাগত পেশ করে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ যে রাজনীতি জিনিসটা বরাবর ভেদনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাকে তিনি তার বিপরীত মৈত্রী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছিলেন। একজন প্রতিভাবান গণরাজকুমার হিসেবে ষোড়শ মহাজনপদের অফুরান বৈরিতার পরিপ্রেক্ষিতে মৈত্রীতত্ত্বের উপযোগিতা অনুভব করা তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি পারেননি। কেন ? জিনিসটা যুগধর্মের বিরোধী এই বলে, এই 'কেন'র একটা দায়সারা উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু আসল কথা, গৌতম যা বোঝেননি, তা হল রাজনীতির সামনে এসব ক্ষেত্রে এক দ্বিতীয় এবং সহজতর বিকল্প বরাবর থেকে যায়—তা হল সাম্রাজ্যগঠন। কেন্দ্রীয় সেনা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রি পরিষদ, কেন্দ্রীয় টাঁকশাল, এক মুদ্রা, এক মূল্যমান, এক আরক্ষা। বুদ্ধের কল্পনার ভারতবর্ষ কিছুটা সম্ভব হয়েছিল প্রায় দু'শ বছর পরে অশোকের রাজত্বকালে। কিন্তু তারপর ? তা আবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এবং আজ সারা বিশ্বে গৌতম যদিচ 'এশিয়ার আলো' বলে স্বীকৃত, যদিচ অশোকস্তম্ভ আমাদের জাতীয় প্রতীক, এবং পঞ্চশীল নিয়ে যথেষ্ট বাগ্মিতা ও ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছে, ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে বুদ্ধর প্রচারিত তত্ত্বের মধ্যেকার নেতিবাচক দিকটি ছেঁকে নিয়ে আমরা পরমহংস হয়েছি, কিন্তু আত্মনির্ভর হওয়া, যে মতবাদের (ধর্মমত, রাজনৈতিক মতবাদ) প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাকে ভাঙা ভেলার মতো পরিত্যাগ করা, অষ্টাঙ্গিক মার্গের সবল সদর্থক দিকটি জীবনে গ্রহণ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে এক কিম্পুরুষোচিত অহিংসাতত্ত্ব বুদ্ধর ওপর আরোপ করে ভারতের নির্বীর্যকরণের জন্য আমরা তাঁকেই দায়ী করি। বিশ্বের মহত্তম ট্র্যাজেডিগুলি এমনই হয়। শুভ ভেবে যা করা হল তার ফল হল চূড়ান্ত অশুভ। তাই অমিতাভ বুদ্ধ যে ট্র্যাজেডির নায়ক তার কাল আড়াইহাজার বছর। এবং তার প্রেক্ষিত সমস্ত বিশ্ব।

সমগ্র বুদ্ধযুগটির চরিত্রই কি ট্র্যাজিক নয় ? গ্রামজনেরা গ্রামকৃত্য করছে, অর্থাৎ নিয়মিত শ্রম দিয়ে গ্রাম পরিচ্ছন্ন রাখছে, নগরে নগরে কৌতূহলশালা, নতুন নতুন মতামতের আদানপ্রদান হচ্ছে, শুনছেন শুধু বিদ্বানরা নন, রাজ পুরুষরাও, সাধারণ মানুষরাও। এমন নাগরিকদের নিয়েই তো আথিনীয় রাষ্ট্র প্রধান পেরিক্লীস গৌরব করেছিলেন! আশি হাজার(?) গ্রামিক নিয়ে বৈঠক করেছেন এক সম্রাট, তাদের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শুনবেন বলে, বিচারের পদ্ধতির আটটি স্তর, বিনিশ্চয়ামাত্য থেকে গণরাজ পর্যন্ত, অপরাধ অপ্রমাণ হলে এঁদের যে কেউ মুক্তি দিতে পারেন, কিন্তু গুরুতর অপরাধ হলে এতগুলো কোর্টে তা প্রমাণিত হতে হবে। একশো বছরের এদিক ওদিকে জন্মেছেন মহা বৈয়াকরণ পাণিনি , লোকোত্তর ও লোকায়তের মিলনের রূপকার যাজ্ঞবল্ক্য, বিদ্রোহী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রৈক্ক, মহাবীর, গৌতম, উপনিষদগুলি রচিত হচ্ছে, সঙ্কলিত হচ্ছে সূত্র-সাহিত্য। প্রব্রজ্যা-বাতিকে গৌতম গুরুমশাইকে নিয়ে রাজগৃহের লোক তামাশা করে ছড়া বাঁধল। কিন্তু এই বেদবিরোধী শ্রমণকেই দূর থেকে আসতে দেখেই আবার বেদপন্থী ব্রাহ্মণ শিষ্যসামন্তদের সাবধান করছেন—'অত গোল করো না, শ্রমণ গৌতম গোলমাল ভালোবাসেন না।' বুদ্ধের সময়ে আথেন্সে সোক্রাতিসকে বিষপানে বাধ্য করল তাঁর রাষ্ট্র, কিন্তু বুদ্ধযুগে তো একা বুদ্ধ নয়। ছটি (মোট তেষট্টিটি) শক্তিশালী বেদবিরোধী শ্রমণপন্থ ছিল, কই কোনও ধর্মোন্মাদ তো তাদের হত্যার পরোয়ানা বার করেনি? দেবদত্ত গৌতমকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা ব্যক্তিগত অসূয়াপ্রসূত, এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ তা সমর্থন করেনি। তবে? এই-ই কি সেই আধুনিক যুগ নয়, যা জিজ্ঞাসা করে, মীমাংসা চায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সাহস রাখে! আরও কত জিজ্ঞাসু সন্ধিৎসু কর্মবীর তা হলে সে যুগে থাকা সম্ভব যাঁরা নতুন চিন্তা করেছেন কিন্তু রয়ে গেছেন ইতিবৃত্তের আড়ালে! এবং হায় বুদ্ধযুগের নারীকুল। প্রায়শই উচ্চশিক্ষিত, ব্যক্তিত্বময়ী, পূর্ণবিকশিত কিন্তু সামনে কোনও পথ খোলা পাননি। প্রব্রজ্যাই একমাত্র বিদ্রোহ যা তাঁরা করতে পেরেছেন। ব্যর্থ এবং আবারও ট্র্যাজিক। এঁদের সবাইকে নিয়েই প্রধানত 'মৈত্রেয় জাতক'-এর যাত্রা।

বুদ্ধোক্ত সেই মেসায়া যাঁর নাম মৈত্রেয়, তিনি আজও আসেননি। আরও আড়াই হাজার বছর নাকি তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। পরবর্তী যুগের চিন্তাবীররা যেমন রুসো-মার্কস-টলস্টয়-গান্ধী-রাসেল-রবীন্দ্রনাথ-শ্রীঅরবিন্দ এঁদের মধ্যে মৈত্রেয়র পদধ্বনি শোনা গেছে, কিন্তু আসেননি সেই মুক্তিবাদী যিনি পারবেন মানুষকে মৈত্রীবদ্ধ করতে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে, ব্যক্তিগত জীবনযাপনে, হৃদয়বৃত্তিতে ও মননে। হয়তো মৈত্রেয় কোনও মানুষ নয়, হয়তো তা যুগ যুগান্তরের নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে উদ্ভূত এক মানসিকতা যা সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে মানুষের আদিম অপাপবিদ্ধ সরলতার মিলন না হলে জাত হবার নয়। কিংবা হয়তো তা জাত হবে তখনই, ভেদ-নির্ভর এই সভ্যতা যখন শেষ সর্বনাশকে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ করবে। মৈত্রী ছাড়া যখন অন্য পন্থা থাকবে না।

বাণী বসু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ডাঃ দেবার্চনা সরকার তাঁর 'পালিসাহিত্যের ভূগোল' সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি পড়তে দিয়ে আমার অশেষ উপকার করেন।

শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল, ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ রণবীর চক্রবর্তীর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

গ্রন্থসংগ্রহে সহায়তা করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন—সর্বশ্রী বীরেশ্বর ঘোষ, শংকরলাল ভট্টাচার্য, অরুণ ঘোষ এবং অধ্যাপিকা—নিয়তি রায়, নমিতা মিত্র, অশোকা চট্টোপাধ্যায়, অলোকা মিত্র ও শিখা মজুমদার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

“গড্ডলিকার সহবাসে উত্ত্যক্ত
তারা খুঁজেছিল সাযুজ্য সংরক্ত ;
কল্পতরুর নতশাখে সংসক্ত
শুক্র শশীরে ভেবেছিল করগত।”

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মগধের রাজধানী রাজগৃহ-গিরিব্রজের বৈপুল্লগিরির ওপর থেকে এক ব্যক্তি নেমে আসছিলেন। সময় অপরাহ্ণ। সূর্যাস্তের দেরি আছে। কিন্তু সময়টা এমনই যে কখন সূর্যাস্ত হবে টের পাওয়া না-ও যেতে পারে। পাহাড়ের গা সুকঠিন শিলাময়। লেশমাত্র শ্যামলতা নেই। কিন্তু পর্বতের যে কোনও অংশে দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলে নিবিড় ঘন শ্যামলিমার বিপুল আয়োজন দেখা যায়। ধানক্ষেতগুলিতে সবুজ সজীব ধানগাছগুলি হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে। বনে-উপবনে নগরপথের দু-প্রান্তের বীথিকায় গৃহসংলগ্ন উদ্যানগুলিতে এবং সর্বোপরি নগরের প্রান্তিক অটবীতে সবুজ উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে। ভারে ভারে সবুজ। বহু বর্ণচ্ছায়ের। তাম্রাভ সবুজ, নতুন কদলীপত্রের সবুজ, বৈদূর্য মণির, মরকত মণির সবুজ, গাঢ় কৃষ্ণাভ সবুজ। থরে-বিথরে। গত কয়েক দিন দণ্ড কয়েকের বৃষ্টিপাতে প্রকৃতি সজীব, পরিচ্ছন্ন, সহর্ষ, প্রাণময় হয়ে উঠেছে। বর্ষা এসে যাচ্ছে শীঘ্রই। এসে গেছে। পূর্ব দিকপ্রান্ত থেকে অরণ্যের তরুসম্ভার দলিত মথিত করে বেগবান বারিগর্ভ হাওয়া বইতে থাকবে। প্রথমে যখন তখন ঝড়বৃষ্টি প্রচুর ধুলো উড়িয়ে। তারপর বৃষ্টি। শুধু বৃষ্টি। এখন থেকে থেকেই মাঝে মাঝে উড়ন্ত মৈনাকগিরির মতো বিপুলাকার ঘন নীলবর্ণ মেঘ দেখা যাচ্ছে। নগরের বাপী, তড়াগ, পুষ্করিণীর পরিষ্কার জলে মুকুরিত হয় এই মেঘরাজ। জলকেলিতে মত্ত নগরের মেয়েরা কৃত্রিম ভয়ে ভুরু দুটি ওপর দিকে তুলে পরস্পরকে দেখায় মেঘরাজের অবর্ণনীয় পুরুষশোভা। তারপর সাহসিকার মত্ত কলহাস্যে ঝাঁপ দেয় মেঘরাজের বক্ষপট লক্ষ্য করে। এটা তাদের খুব প্রিয় খেলা। উদ্যানের মধ্যে কোনও তড়াগের পাশে দাঁড়ালে তাদের লীলাচাপল্য শোনা যাবে। যেমন শ্রেষ্ঠী অহিপারকের অন্তঃপুরের দীর্ঘিকায়।

—এমন উদার বক্ষপট আর কোথায় পাবি বল, মাধবিকা, আলিঙ্গনে এমন সুখ...

—আর যেখানেই পাই তোর বা আমার গেহে কখনও নয়—

—সাহস তো তোদের বাড়ছে দেখছি দিন দিন! পতিনিন্দা করছিস! গহপতির কানে গেলে কী হবে ভেবে দেখেছিস?

—রাখ্‌, রাখ্‌, পুষ্পমালিকা, ভাবনাগুলো সব শুদ্ধান্তঃপুরে গহপতির ধর্মপত্নীর পেটিকায় বন্ধ করে এসেছি আমরা। তুই কি তোর পতিকে নীবিবন্ধে বেঁধে এনেছিস নাকি? এনে থাকিস তো বাঁধন খুলে নামিয়ে দে, একটু নাচাই।

পুষ্পমালিকার স্বামী খর্বাকার, কৃশকায়। মাধবিকার কথায় সে রাগ করে দীর্ঘিকার ঘাট থেকে উঠে পড়ে। তার মুখে অকালসন্ধ্যা।

মাধবিকা শৃঙ্গী মাছের মতো ওলোট-পালোট খেতে খেতে ঘাটের কাছে এসে জলসিক্ত মুখটি তুলে বলে, ‘রাগ করিস কেন পুষ্প, কেমন করে নাচাব জানিস? এই পুবে হাওয়া যেমন করে দীঘির জলকে নাচাচ্ছে! তেমন। ধর্মপত্নীর সইয়েদের তো এটুকু অধিকার থাকেই, থাকে না?’

পুষ্পমালিকার চোখে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করছে। সে বোধ হয় অন্যদের মতো রসিকা নয়, কোথায় একটু বঞ্চনা, একটু ক্ষোভ, একটু অসন্তোষ তাকে অভিমানী করে তুলেছে। সে দীর্ঘাঙ্গী, কুরঙ্গনয়না রমণী। স্বামীর আকৃতি পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও প্রাণপণে মানিয়ে নিচ্ছে। স্বামী তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁচলে বাঁধা এইটুকুই যা সুখ। সে প্রতিবেশিনীদের রসিকতায় তার স্বামীর খর্বতা, স্ত্রৈণতা, সব কিছুর প্রতিই নিষ্ঠুর কটাক্ষ লক্ষ করেছে। হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল, 'কথা ঢাকবার জন্য এত করছিস কেন মাধবিকা, দীঘির জল-টল বলে আমাকে ভোলাবারই বা প্রয়োজন কী? মর্কট, সোজাসুজি মর্কটই বল না তাকে! তবে আমি তো তোর মতো স্বয়ংবরা হইনি। তোর মুখে নিজের মনোনীত পতির নিন্দা মানায় না।' পুষ্পমালিকা তার বৈকালিক স্নান না সেরেই দ্রুত চলে গেল।

মাধবিকা টুপ করে ডুব দিল। ডুবসাঁতার দিয়ে বেশ কিছুদূর চলে গিয়ে সখী সুদত্তার পাশে ভেসে উঠল। তার কানে তীক্ষ্ণ স্বরে কু দিয়ে সমস্ত দীঘির জল তোলপাড় করতে করতে মাঝে মাঝে মুখ তুলে বলতে লাগল, 'এই দ্যাখ্ পতির বক্ষের অপ্রশস্ততা নিয়ে পরিহাস করেছি বলে অবীচি নরকে কেমন তপ্ত তৈলে ভাজা-ভাজা হচ্ছি।' স্নানরত পুরকামিনীরা সবাই হেসে উঠতে রঙ্গরসিকতার স্রোত আবার বইতে থাকে। আকাশে গুড়গুড় ধ্বনি।

সুদত্তা মুখ তুলে বলে, 'আরে আরে, স্বয়ং মেঘরাজ তোর রসিকতায় খুশি হয়েছেন। কেমন সমর্থন জানাচ্ছেন দ্যাখ্!'

সুদত্তার সতীন বারুণী বলল, 'সমর্থন জানাচ্ছেন ভালো। আবার নিজেও রসিকতা আরম্ভ না করলেই বাঁচি। দীঘির ঘাটে আমার নতুন কুসুমবর্ণ নিচোলটি রেখেছি।

সুদত্তা বলল, 'আমারটাও তো।'

'আমারও, আমারও' একটা রব উঠল।

মাধবিকা গাল ফুলিয়ে বিচিত্র উপায়ে মুখের জল ফোয়ারার মতো ওপর দিকে উচ্ছ্রিত করতে লাগল চিতসাঁতারে শুয়ে। জল ফুরিয়ে গেলে বলল, 'আরে সই, যত গর্জে তত বর্ষে না, জানিস না?'

সকলে জল থেকে উঠে, দ্রুত বেশ-বাস বদলাতে লাগল। নিপুণ হাতে লোধ্ররেণু মাখল মুখে, কেশ যাদের সিক্ত ছিল সযত্নে আঁচড়ে মেলে দিল, যারা মাথা ডোবায়নি, তারা কবরী কিংবা বেণী রচনা করতে লাগল। ফুলের মালাগুলি কেশে, কণ্ঠে বিন্যস্ত করতে করতে সুদত্তা বলল, 'পুষ্পমালা কিন্তু গর্জালোও যত, বর্ষালোও তত।' কলহাসিতে লতায়িত হতে হতে পুরকামিনীদের দলটি উদ্যানপথে গৃহের দিকে চলতে লাগল।

হ্যাঁ, কী বলছিলাম! বৈপুল্ল পর্বতশিখর থেকে এক ব্যক্তি নেমে আসছিলেন। নামতে নামতে বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। দেখছিলেন আকাশের পশ্চিম পট মার্জিত নীল। পূর্ব কোণ থেকে মেঘপতি যেন এক গোপন একক বিজয়-অভিযানে বার হয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত নভোমণ্ডল জয় করে নিতে চান। কতকগুলো দিন আসে যখন আকাশের স্বাভাবিক নীলিমা ধূম্রজালিকার মতো মেঘজালিকায় আচ্ছন্ন থাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। মুক্তাফলের মতো এক অবর্ণ ছায়া-লাবণ্যে উদ্ভাসিত থাকে এই অপূর্ব নগরী, তার প্রান্তবর্তী গভীর অরণ্য এবং কর্মোপলক্ষে নগরীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গতায়াতরত নাগরিকদের মুখচ্ছবি। বৃষ্টির চেয়ে কিছু কম মনোহর নয় সে দৃশ্যও।

মানুষটিকে দেখলে প্রৌঢ় জটিল সন্ন্যাসী বলে মনে হয়। সামান্য অধোবাস ছাড়া অঙ্গে আর কিছু নেই। জটাক্রান্ত কেশ। মুখে দৃঢ় কতকগুলি বলিরেখা। পা দুটি খালি। কিন্তু ব্যক্তি বয়সের তুলনায় খুবই ক্ষিপ্র, হস্তপদচালনায় রীতিমতো দক্ষ। মুখমণ্ডলে বলিরেখা থাকলেও দেহের অন্যান্য স্থানের ত্বক মসৃণ, দীর্ঘ দিনের অমার্জনা ও ভস্মাচ্ছাদন সত্ত্বেও গাত্রবর্ণ যে এক সময়ে রক্তাভ শ্বেত ছিল বোঝা যায়। চোখের দৃষ্টি একই সঙ্গে গভীর এবং তীক্ষ্ণ। তিনি যেন এক চোখে পথের খুঁটিনাটি দেখে নিচ্ছেন। আর এক চোখে দেখছেন আকাশ, অরণ্য, কোনও দূরবর্তী দেশ, দূরবর্তী সময়। এই আত্মমগ্নতা ও সতর্কতার সহবাস মানুষটিকে এই পরিবেশে অভিনব বলে চিনতে সাহায্য করে।

রাজপথে পৌঁছে ব্যক্তির চলার গতি মন্দ হয়ে এলো। তিনি মাথার পেছনে প্রলম্বিত জটাভারের এক অংশ সামনের দিকে টেনে আনলেন এবং নীরবে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। পদক্ষেপ অতি ক্ষিপ্র; তাঁর যেন খুবই তাড়া আছে। অন্য কোনও পথচারী সামনে পড়লে সে সসম্ভ্রমে পথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেড়ে দিচ্ছিল। রাজধানীর পথে পথে সন্ন্যাসী, আজীবক, শ্রমণ, তীর্থিকদের স্বতই দেখা যায়। এরা বিভিন্ন স্থান থেকে আসেন। গ্রাম গ্রামান্তর তো বটেই, দেশ দেশান্তর থেকেও আসেন। ভিক্ষান্নই তাঁদের সম্বল। দৈহিক সুখ ও আরামের দিকে এঁরা দৃক্‌পাত পর্যন্ত করেন না। মাঝে মাঝেই বিতর্কসভা বসে, রাজগৃহে তো স্বয়ং রাজা বিম্বিসারই এমন অনেক কৌতূহলশালা নির্মাণ করে দিয়েছেন অতি সুন্দর সুন্দর উদ্যানের মধ্যে। ভ্রাম্যমাণ তীর্থিক আজীবকরা ইচ্ছামতো সেখানে অবস্থান করতে পারেন, বিতর্কে বা ধর্মসভায় যোগ দিতে পারেন। তখন জ্ঞানপিপাসু, ধর্মপিপাসু প্রজারা ছাড়াও রাজা, শ্রেষ্ঠী, অমাত্য, রাজন্যরা সেখানে আসেন, শ্রদ্ধাভরে শোনেন, প্রশ্ন করেন। রাজগৃহে সংসারত্যাগী এইসব নানান শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের খুবই সমাদর। চূড়ান্ত ভোগ-বিলাস আর চূড়ান্ত কৃচ্ছ্র— দুই-ই এখানে পাশাপাশি দেখা যায়।

সন্ন্যাসী কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে চলছিলেন। পথের দুধারে কিছুদূর অন্তর অন্তর নানান আপণ। বহুবিধ পণ্যভারে সুসজ্জিত। তবে এগুলি বেশির ভাগই বিলাসের দ্রব্য। মালা, গন্ধদ্রব্য, অবলেপ্য, বেলী, জাতী, চম্পা, কেতকী ইত্যাদি পুষ্প এবং চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ইত্যাদি সুরভিসারের গন্ধে পথ আমোদিত। কয়েকটি শৌণ্ডিকালয়ও আছে। এই ধরনের একটি শৌণ্ডিকগৃহ থেকে সহসা এক ব্যক্তি উঠে এসে সন্ন্যাসীর গতি রোধ করল। ব্যক্তিটির গলায় জাতীপুষ্পের মালা, কস্তুরী সুবাসিত উত্তরীয়টি বর্ষার হাওয়ায় উড়ছে। সে মৃদুস্বরে বলল, 'কী হে সন্ন্যাসী, এই যুবাবয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করে আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন ? চলো দেখি, আমার সঙ্গে পানাগারে চলো, এক সন্ধ্যাতেই তোমার কপাল কেমন ভ্রূকুটিহীন করে দিই দ্যাখো।'

সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'দেখছ না আমি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ! পথ ছাড়ো নাগরক, আমি তোমার পরিহাসের পাত্র নই।'

নিম্ন কণ্ঠে নাগরিক বলল, 'বৃদ্ধ নয় ভণ্ড। জটিলক নয় কুটিলক এবং চতুরক। ভালো চাও তো আমাকে অনুসরণ করো, তারপর তুমি পরিহাসের পাত্র না অপাত্র-বোঝা যাবে।'

AMARBOI.COM

সন্ন্যাসী স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, নাগরিক বলল, 'লঠ্‌ঠিবন চেনো ? লঠ্‌ঠিবন ? অবিলম্বে চলে এসো সেখানে নয় তো তোমার প্রাণসংশয় !'

নাগরিক পানাগারের পাশে একটি পিঙ্গলবর্ণ ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সন্ন্যাসী ইতস্তত তাকালেন। সায়ংকালীন ক্রয়-বিক্রয় ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত মানুষেরা কেউই বোধ হয় এই ছোট্ট নাটকটি লক্ষ করেনি। তিনি সাধারণত এক পথ দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন না। কিন্তু যেদিন পাহাড়ে ওঠেন সেদিন এ পথ দিয়ে তাঁকে যেতেই হয়। লঠ্‌ঠিবন নগরীর উপান্তে। অশ্বারোহণে যাওয়া সহজ হলেও এই আসন্ন সন্ধ্যায় এতখানি পথ পদব্রজে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। কিন্তু মাল্যধারী নাগরিকের সাবধানবাণী এখনও কানে বাজছে, তিনি বিলম্ব করলেন না। তাড়াতাড়ি পা চালালেন।

কিছু পথ চলবার পর তিনি লক্ষ করলেন—তাঁর প্রায় পাশাপাশি একটি চতুর্দোলা চলেছে। নিশ্চয় দোলাটি তাঁর অনেক পেছনে ছিল। চার জোড়া পায়ের ছোটার গতিতে এখন কাছে চলে এসেছে। যেন বড্ড কাছে। চতুর্দোলার আচ্ছাদন সরিয়ে একটি হাত ও একটি শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ বেরিয়ে আসছে দেখতে পেলেন সন্ন্যাসী।

—ভগবন্, আপনি কোথায় যাবেন ?

ঈষৎ ভাবলেন সন্ন্যাসী, তারপর বললেন, 'লঠ্‌ঠিবন।'

—সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। একবার ছায়া পড়ে গেলে লঠ্‌ঠিবনে শতসহস্র জোনাকি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না। আসুন আমি পৌঁছে দিচ্ছি। এ আবার কী ? বিপদ ? নতুন বিপদ ?

'আসুন'—অন্তরালবর্তীর কণ্ঠে অনুরোধের চেয়ে আদেশের সুরই যেন প্রবল। দ্বিরুক্তি না করে মাটিতে রক্ষিত চতুর্দোলায় প্রবেশ করলেন সন্ন্যাসী, আচ্ছাদন বন্ধ হয়ে গেল।

অভ্যন্তরের অন্ধকারে মনে হল ব্যক্তিটির পরনে শ্রেষ্ঠীবেশ। নবীন বলেই মনে হয়, অন্তত কণ্ঠস্বর থেকে। কিন্তু শিরোভূষণ, ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু, গুম্ফ ও চতুর্দোলার ভেতরের অন্ধকার মিলিয়ে বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। বৃথা বাক্যব্যয়ও করলেন না ব্যক্তি। যেন এই উপকারটুকু করা ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ন্যাসী, তাঁর গন্তব্য, ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও কৌতূহলই নেই তাঁর। সন্ন্যাসী নিজেও সতর্ক হয়ে আছেন, কথা বলার ইচ্ছা নেই। সমীচীনও হবে না সেটা। তিনি সারাটা পথ চুপ করে রইলেন। লঠঠিবনের প্রান্তে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে চতুর্দোলাটি দ্বিগুণ হুম্ হুম্ শব্দে চলে গেল। সন্ন্যাসী খানিকটা চলবার পর দেখলেন অদূরে একটি সুদীর্ঘ পিপ্পল বৃক্ষের নিচে অশ্বটিকে গাছের সঙ্গে বেঁধে পদচারণা করছে তাঁর পূর্ব পরিচিত নাগরিক।

—যাক, সন্ধ্যা গাঢ় হবার পূর্বেই পৌঁছে গেছ দেখছি। গৃহত্যাগ করলে কী হয়, প্রাণের ভয় ঠিকই আছে! নাগরিকের মুখে যেন কৌতুকের হাসি।

সন্ন্যাসী রুক্ষস্বরে বললেন, 'ডেকেছ কেন ? শীঘ্র বলো, সময় নেই।'

নাগরিক অতর্কিতে দু পা সামনে এগিয়ে এসে তাঁর গুরুভার জটায় এক টান দিল, জটাভার তার হাতে খুলে এলো, প্রকাশিত হল স্বর্ণাভ কৃষ্ণ কেশ। নাগরিক বলল, 'ভণ্ড সন্ন্যাসী! অদূরে সরোবর রয়েছে। আমার সঙ্গে এসো। মুখেও অনেক আঁকিবুঁকি কেটেছ, সেগুলি ভালো করে ধোও, আমি তোমার আসল মুখ দেখতে চাই।'

—'মুখ দেখার দরকার নেই।' ব্যক্তি বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বর একেবারেই বিচলিত নয়। 'স্বীকার করছি আমি ছদ্মবেশ ধারণ করেছি কিন্তু সব ছদ্মবেশই প্রতারণার জন্য নয়। আত্মরক্ষার জন্যও কখনও কখনও ছদ্মবেশের প্রয়োজন হয়। আপনি কী জানতে চান, বলুন। উত্তর পাবেন।'

—নাম বলো। তরোয়াল আস্ফালন করে নাগরিক বলল।

—কাত্যায়ন চণক, নিবাস তক্ষশিলা।

—এমনটাই অনুমান করেছিলাম। উত্তরদেশ। তবে আমি ভেবেছিলাম আরও উত্তর। কাশ্মীর। উদীচ্য ব্রাহ্মণ ?

—আপাতত।

—অর্থাৎ ?

—আপাতত ব্রাহ্মণবৃত্তিতেই নিযুক্ত। কিন্তু প্রকৃত দ্বিজ তার শিক্ষানুযায়ী যে কোনও বৃত্তি নেবে। পরিবর্তনও হতে পারে।

—বটে! সুদূর তক্ষশিলা থেকে রাজগৃহে ছদ্মবেশের কারণ ?

—তার আগে তোমার পরিচয় দাও নাগরিক।

—যদি না দিই!

—আর একটি বাক্যও বলব না।

—বিদেশি চরের শাস্তি জানা আছে ?

—শূলদণ্ড ? না আমকশ্মশানে গলা অবধি জীবন্ত সমাধি ? তবে ধরতে পারলে দেশি চরের বোধ হয় কিছু পুরস্কারও প্রাপ্য হয়। তক্ষশিলায় তো পুরস্কারের মূল্য ছয় শত কার্যাপণ। মগধে কত ?

নাগরিকের মুখ ধীরে ধীরে হাসিতে ভরে গেল। সে বলল, 'বুঝতে যখন পেরেছ, তখন নামে প্রয়োজন কী ? তক্ষশিলায় চরের নাম থাকলেও মগধে চরেরা অনামক।'

সন্ন্যাসীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, তিনি বললেন, 'গান্ধারবাসী প্রয়োজনে ছদ্মবেশ ধারণ করলেও, প্রয়োজনের বাইরে মিথ্যা কথা বলে না। আমি কাত্যায়ন গোত্রীয়। দেবরাত পুত্র চণক। নিবাস তক্ষশিলা। দেবরাত-পুত্র এই পরিচয়ের প্রকৃত গুরুত্ব তুমি বুঝতে না পারো মাগধ, তোমার প্রভু সম্যক বুঝতে পারবেন। আমি এদেশে ভাগ্যান্বেষণে এসেছি। তা ছাড়াও কিছু রাজকার্য আছে। দুটিকে একত্র করেছি। যথাসময়ে প্রকাশ পাবে। তোমার প্রভুর কাছে নিয়ে গেলে গান্ধাররাজের অঙ্গুরীয় দেখাব।'

—তুমি কি দূত ?

—ধরো একপ্রকার তাই।

—তাহলে রাজসভায় গিয়ে রাজদর্শন প্রার্থনা না করে জটা মাথায় নিয়ে ছদ্মবেশে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করছ কেন ? বিস্ময়ের সঙ্গে শ্লেষ মিশিয়ে নাগরিক বলল।

—কারণ আছে। যথাসময়ে রাজদর্শন হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ভালো। কিন্তু সে পর্যন্ত তুমি আমার দৃষ্টিবন্দী রইলে, জেনো।

—'থাকি। ক্ষতি কী ?' উদাসীন স্বরে বললেন চণক, 'আমি তাহলে এখন যেতে পারি অনামক মাগধ ?'

হালকা অন্ধকারে এবার যষ্টিবনে ইতস্তত জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে। একটু দূরের ঝোপ বা কুঞ্জগুলি কুণ্ডলীকৃত অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে। মাগধ তার অশ্বের গলায় হাত বোলাচ্ছে। মুখে মৃদু হাসি। সন্ন্যাসী:বেশী চণক বেরিয়ে এলেন।

আয়তনে খুব বড় নয় নতুন রাজগৃহ নগর। পদব্রজেই এর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে যে পারেন না চণক তা নয়। কিন্তু এখন সন্ধ্যা ঘনায়মান। প্রধান পথগুলির ধারে ধারে দীপদণ্ড পথ আলোকিত করে বটে, কিন্তু যষ্টিবন নগরীর উপান্তে। এই উপান্ত থেকে যথেষ্ট দূরে যেতে হবে তাঁকে। মহারণ্য ঘিরে আছে নগরীর দক্ষিণ পূর্ব দিক। সেই দিকেই যাবেন তিনি। এখনও বাতাস বইছে পুব দিক থেকে। হাওয়া নির্মল, যেন একটু জলকণাবাহী। গান্ধারদেশে এমন হাওয়া নেই। গ্রীষ্মে সেখানে তপ্ত কটাহের মতো আবহাওয়া হয়। শীত নিদারুণ। শুষ্ক শীত। তা হোক, পশুরোমবস্ত্র দিয়ে সে শীত উপভোগ করা যায়। কিন্তু এই পুবদেশের মতো বৃষ্টি সেখানে হয়ই না বলতে গেলে। এই বৃষ্টি একটা বিস্ময়, একটা অবর্ণনীয় আনন্দের ব্যাপার। বৃষ্টি চণককে মুগ্ধ সম্মোহিত করেছে। তিনি শীতল বাতাসের স্রোতের মধ্য দিয়ে যেতে থাকেন ধীরে ধীরে। ভাবতে থাকেন পুব দিকে সূর্য ওঠে, এই বাতাস আসছে সেই সূর্য ওঠার দেশ থেকে। সে দেশ কেমন ? আদৌ দেশ কী ? না সাগর ? না এমনই বন শুধু,না মহাবন। এই হাওয়ার উৎপত্তি হল কোথা থেকে ? এত জলই বা কোথা থেকে নিয়ে আসে। যেন অফুরান জলের সঞ্চয়। নিশ্চয় অকূল বারিধি ওদিকে। চলতে চলতে চণকের মনে হল দুটি পায়ের বদলে যদি তাঁর দুটি ডানা থাকত ! ধৃতরাষ্ট্র হংসের মতো সোনার বরণ বিশাল দুটি ডানা ! তাহলে তিনি এই মুহূর্তে এই নগরীর কোনও প্রাসাদচূড়ায় গিয়ে বসতেন। তারপর গৃধ্রকূট শিখরে। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিতেন চারপাশ। তারপর ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন এই বাতাসের স্রোতের উলটো দিকে। পূর্বাচল। নগরী, গ্রাম, নদনদী, মহারণ্য পার হয়ে চলে যেতেন পুবালি হাওয়ার দেশে।

নগরের দক্ষিণ প্রান্তের অরণ্যে চণকের বাস। যে আটবিকেরা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে নিজেদের আবাসের কিছু দূরে, তিনি তাদের নিয়মিত প্রদীপের তেল ও ধান্যজাত নানা দ্রব্য সরবরাহ করেন। এইসব বস্তু ওই আটবিকেরা চায়নি। কিন্তু পেলে ভারি প্রসন্ন হয়। ওরা নির্জনতাপ্রিয়, নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে কাউকে, বিশেষত শ্বেতকায়দের একেবারে সহ্য করতে পারে না। বনের ফল, মধু, আপনাআপনি গজিয়ে ওঠা নীবার ধান এবং মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস— এই তাদের খাদ্য। অভাববোধ বলে কিছু নেই। কিন্তু অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়। স্বভাবে হিংস্র। তবে কিছুদিন বাস করতে করতে চণক বুঝেছেন এ হিংসা এসেছে সংশয় থেকে, নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে। স্বভাবে না বলে আচরণে হিংস্র বলাই ভালো। চণক তাঁর অর্ধমলিন সন্ন্যাসী বেশ দিয়ে এদের ভুলিয়েছেন। তেল, শর্করা, লবণ দিয়ে এদের মন জয় করেছেন। অপরাহ্ণ চার ঘটিকার মধ্যেই অরণ্যে অন্ধকার নেমে আসে। দেখতে দেখতে নিবিড়, নিশ্ছিদ্র হয়ে যায় সেই অন্ধকার। সেই তমিস্রায় ছোট ছোট মাটির কুটিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে আটবিকেরা পরম বিস্ময়ে ও উল্লাসে চেয়ে থাকে দীপশিখার দিকে। নাচ গান আমোদে মাতে। ডিম, ডিম, ডিমাডিম, অনেক রাত পর্যন্ত শুনতে পান চণক। কৃতজ্ঞতাবশে তারা চণকের কুটির প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন রাখে, তিনি ভালোবাসেন বলে বহু প্রকারের কুসুম চয়ন করে মাটির পাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে দেয়। স্থূল, এবড়ো-খেবড়ো মাটির পাত্র। তাদের কুম্ভকারের চক্র নেই। তাঁর কুটিরটিও তারাই রচনা করে দিয়েছে। নিয়মিত মধু, ফলমূল, কখনও কখনও ঝলসানো মৃগ কি বরাহমাংসও তাঁর জন্য রেখে যায় ওরা। এবং একটি দীপ জ্বেলে রাখে।

অরণ্যে প্রবেশ করার সময়ে পেছনে ঘাড় না ফিরিয়েও চণক সতর্ক হলেন। মগধের চরেরা তাঁর প্রতি লক্ষ রাখছে এ তো সকালের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু এখনও কি কেউ পেছনে আছে ? আটবিকরা মাগধদের ভয় পায়, ঘৃণা করে। ঘৃণা উভয়ত। ভয়ও তাই। নগরে অনেক সময়েই চণক শুনেছেন কোনও শিশু হয়ত বিপণির সামনে বায়না ধরেছে, খেলনার জন্য, হয়ত খেলনাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহার্ঘ, তার পিতা তাকে ভয় দেখাচ্ছেন 'বনে রাক্ষস আছে, লম্বা লম্বা কালো কালো হাত পা, ছোট ছেলেদের মুণ্ডু কাঁচা চিবিয়ে খায়, বিশেষ করে কাঁদুনে ছেলেদের !' এইভাবে এদের নিয়ে কত কথা, কত কাহিনী তৈরি হয়, ভয় আর ঘৃণার মিশ্রণ দিয়ে।

যদিও তাদের আবাস কিছুটা দূরে, তবু চণকের সঙ্গে আটবিকদের যোগাযোগ আবিষ্কৃত হলে মাগধরা যদি আটবিকদের ওপর কোনও অত্যাচার করে ? তাহলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন না চণক। আরও একটি সমস্যা আছে। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে আছেন। ছদ্মবেশ আজ মগধের গূঢ় পুরুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। এখন যে কোনদিন ছদ্মবেশ তাঁকে ত্যাগ করতে হতে পারে। তখন ! তখন তাঁর আশ্রয়দাতা আরণ্যকরা তাঁকে কীভাবে নেবে ? স্বেচ্ছালালিত মলিনতার তলায় তাঁর রক্তপদ্মসন্নিভ গাত্রবর্ণ দেখলে যদি তারা বিদ্বেষ বোধ করে ! তাঁকে ছদ্মবেশী জানলে তারা তাঁকেও ঘৃণা করবে এটাই স্বাভাবিক। কোনও রকম কপটতা, শঠতা, খলতা তারা সহ্য করতে পারে না, কাপট্যের জন্যই তারা নাগরিকদের আরও ঘৃণা করে। এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে চণক তাঁর কুটিরের দীপালোক দেখতে পেলেন। গলিত কালিমার মধ্যে এক বিন্দু স্বর্ণখণ্ডের মতো জ্বলছে। দেখতে দেখতে কেমন হৃষ্ট হয়ে উঠলেন চণক।

কুটিরের চারপাশ খানিকটা পরিষ্কৃত। ঝোপঝাড় কেটে ফেলা হয়েছে। সেখানে কিছু বন্য কুসুমের গাছ। কোনও কোনও নিশীথ পুষ্পের গন্ধে আকুলিত হয়ে আছে কুটিরের চারদিকের বাতাস। এই গন্ধে সাপ চলে আসে চণক জানেন, তিনি সাবধানে পা ফেলতে লাগলেন। কিছু দূর থেকেই আরম্ভ হয়েছে দীর্ঘ সব বনস্পতির রাজ্য। সেদিকে তাকালে আর দৃষ্টি চলে না। এই অরণ্যে তেমন কোনও হিংস্র শ্বাপদ নেই। আটবিকরা এবং মগধের ক্ষত্রিয় কুমাররা মৃগয়া করে করে তাদের সব যম-সদনে পাঠিয়ে দিয়েছে। আছে এখন শৃগাল, নানা ধরনের মৃগ, শশক, বন্যবরাহ এবং বহু রকমের পাখি। এখনও। কুটিরের প্রবেশপথে একটি দীর্ঘ ছায়া দেখলেন চণক। প্রদীপ জ্বালিয়ে অদূরে বসে আছে অটবীকুমারী রগ্‌গা। মাথা অনেকটা নিচু করে। নিচু দ্বারপথে তিনি প্রবেশ করতে রগ্‌গা উঠে দাঁড়াল। নাতিদীর্ঘ কিন্তু ভারি সুগঠিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মেয়েটি। তার বক্ষোদেশ অনাবৃত। এই বনের অজস্র কচি কাঁচা বিল্বফলের মতো বক্ষ দুটি তার। নিম্নাঙ্গে একটি পিটিয়ে নরম করা বল্কল। তার মাথার অজস্র ধুলোমাখা কালো চুল তার বুক এবং পিঠ প্রায় ঢেকে রেখেছে। চুলগুলির দিকে তাকিয়ে মনে মনে জিহ্বা দংশন করলেন চণক।

AMARBOI.COM

রগ্‌গা আবদারের সুরে বলল, 'যতি, এনেছিস আমার কাঁকই ?'

চণক বললেন, 'আজ নগরে কিছু বিপদে পড়েছিলাম রগ্‌গা, আনতে পারিনি।'

রগ্‌গা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বলল,'রোজই তো তোর কিছু না-কিছু হয়। আনতে ভুলে যাস। অথচ খুড়োর জন্যে তেল, চাল এসব আনতে তো তোর ভুল হয় না !' বলতে বলতে সে তার রুক্ষ কেশভার পুরোপুরি সামনে এনে তার মধ্য দিয়ে আঙুল চালাতে লাগল।

চণক বললেন, 'আমি তো অনেকদিনই তোমায় বলেছি রগ্‌গা। আমি সন্ন্যাসী, কঙ্কতিকা কিনতে গেলে লোকে কী ভাববে ?'

—তাহলে তাই-ই বল, বলিস না বিপদে পড়েছিলাম। আর যদি তাই-ই হয়, কাঁকই কিনতে যদি তোর অসুবিধেই হয় তো আমায় কথা দিয়েছিলি কেন ? আসলে তোরা অজ্জরা সন্ন্যাসীই হোস আর যাই-ই হোস, বড্ড শঠ।

চমকে উঠলেন চণক। কী নিখুঁত চরিত্রজ্ঞান অরণ্যবালিকার ! সত্যিই তিনি কঙ্কতিকার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। রোজই ভুলে যান। রোজই মিথ্যা আশ্বাস দেন। শঠতা তো একেই বলে। আবার একে সভ্যতাও বলে। ভুলে গিয়েছিলেন একথা বললে মনে ওর কষ্ট দেওয়া হবে তাই অন্যভাবে বলা, আবার নিজের দোষ ঢাকবার জন্যও বলা। এই মিথ্যাচার তো সভ্যতার অঙ্গ। তিনি নম্র সুরে বললেন, 'রগ্‌গা, আমি শাস্তিগ্রহণ করছি। তুমি আজ যা-যা আমার জন্য এনেছ সব নিয়ে যাও। যতদিন না তোমার কাঁকই এনে দিতে পারছি, তোমার কাছ থেকেও আমি কিছু গ্রহণ করব না।'

রগ্‌গা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গা ঘেঁষে চিবুক ছুঁয়ে বলল, 'তুই রাগ করলি ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি যে সন্ন্যাসী, নারীসান্নিধ্য পরিহার করে চলেন একথা রগ্‌গা জানে। কিন্তু মানে না। সে কিছুই মানতে চায় না। সে কাছে আসতেই একটা উগ্র বুনো গন্ধ পেলেন চণক। যেন অরণ্যের গায়ের গন্ধ। একটু সরে গিয়ে বললেন, 'না, রাগ নয়। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছি।'

প্রায়শ্চিত্ত কথাটা ভালো বুঝতে পারল না রগ্‌গা, দু একবার জিভে উচ্চারণ করল, 'পারশ্চিত্ত ? পারশ্চিত্ত ?' তারপর যেন মোটামুটি বুঝে নিল, সরল বিস্ময়ে বলল, 'পারশ্চিত্ত করলে খাবি কী ?'

—নিজে যা সংগ্রহ করতে পারি।

কিশোরীর চোখে ব্যথার ছায়া নামল। সে বলল, 'তুই পাহাড়ে গিয়ে ধ্যান করবি ? না আমাদের মতো ফলমূল কুড়োবি ? চাই না আমার কাঁকই যতি, তুই হাত-পা ধুয়ে খেতে বোস, আমি যাই।'

সে আড়াল ছেড়ে সরে দাঁড়াতে চণক দেখলেন বড় বড় শালপত্র জোড়া দিয়ে তাঁর জন্য অগ্নিপক্ক মৃগমাংস এনে রেখেছে রগ্‌গা। সঙ্গে কিছু ফলমূল। তিনি নিকটবর্তী সরোবরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে এলে রগ্‌গা বলল, 'আমি যাই রে যতি, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, উদ্দক খুঁজবে।' তার মুখে এখন রাগ অভিমানের চিহ্নমাত্র নেই। চণক মাথা নেড়ে সম্মতি জানাবার আগেই সে বাতমৃগীর মতো চঞ্চল ছন্দে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। এই ঘন অন্ধকারেও কোথায় কোন গাছ, কোন ঝোপ, কিসের শাখা সরাতে হবে সে পরিষ্কার দিবালোকের মতো দেখতে পায়। পথ তার চেনা, আপন করতলের মতো মুখস্থ। বিশেষত সে এখন উদ্দকের কাছে যাচ্ছে। উদ্দক রগ্‌গার প্রণয়ী। এখনও উভয়ের বিবাহ হয়নি। অর্থাৎ রগ্‌গার খুড়ো মদ্যমাংসের ভোজটা দেননি। উদ্দকেরও হয়ত খুড়োকে কিছু দেওয়ার আছে। তবে উদ্দক ও রগ্‌গা প্রায়ই একসঙ্গে বাস করে।

এই আটবিকদের ভালো বোঝেন না চণক। পশ্চিম দেশ থেকে পুবে এসে প্রথম এদের দেখে ঘৃণায় শিহরিত হয়েছিলেন। এই অরণ্যে বাস করতে এসে তাঁর প্রথম ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হল এদের হাতে বন্দী হওয়া। সেদিনের কথা স্মরণ করলে আজও তাঁর রোমাঞ্চ হয়। একটি শিংশপা বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিনি কুটির বাঁধবার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করছিলেন। কাছাকাছি খুব বড় বড় গাছ থাকবে না, ঝোপগুলি সহজে কেটে ফেলা যাবে, অল্প দূরেই থাকবে কোনও জলের উৎস, অরণ্যের খুব গভীরেও নয়। আবার খুব প্রান্ত ঘেঁষেও নয় এমন একটি স্থান। সহসা পায়ের কাছে শনশন করে দুটি তীর এসে পড়ল। চমকে চোখ তুলে তাকাতেই গাছের আড়ালে আড়ালে কালো কালো ছায়া দেখলেন। লিকলিকে রোগা। কোমরে কৌপীন বস্ত্র। খালি গা। মাথায় তাম্রাভ রুক্ষ কেশ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। হাতে ধনুক নিয়ে অতি ক্ষিপ্র গতিতে তারা তাঁকে গোল হয়ে ঘিরে ফেলল। তিনি বদ্ধাঞ্জলি নতজানু হয়ে বসলেন। কালো মানুষগুলি পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর একজন রূঢ় স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কে ?'

—দেখছ না আমি জটাধারী সন্ন্যাসী !

—আমাদের বনে এসেছিস কেন ?

—সন্ন্যাসীরা হয় বনে, নয় গিরিগুহায়, নিভৃত স্থানে বাস করতে চায়। জানো না ?

—তুই কি এখানে তপস্যা করবি ? তোদের দেবতা ইন দ্রর আসন টলাবি ?

—না ইন্দ্রের আসনের ওপর আমার লোভ নেই। নির্জনে ধ্যান করতে ভালোবাসি।

—কীরকমের তপস্বী তুই ? মাথা নিচু করে ঝুলিস ? না এক হাত ওপরে তুলে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে থাকিস ?

—কোনটাই করি না।

—গাছের খসে পড়া পাতা খেয়ে থাকিস ? না পাতা পেড়ে খাস ?

—কোনটাই না।

—তবে ?

—ধ্যান করি। দিনান্তে একবার আহার করি। ফলমূল অন্ন মাংস যা জোটে !

এরপর আটবিকরা এসে তাঁকে পরীক্ষা করে। অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না। চণকের অধোবাস বিশেষভাবে প্রস্তুত। দু তিনটি স্তর আছে তাতে। ভেতরে প্রকোষ্ঠে স্বর্ণমুদ্রা, শিকড়বাকড়, পর্ণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্ষাপণ সেলাই করে বাঁধা। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রতি সম্ভ্রমবশতই বোধ হয় ওরা তাঁকে ভালো করে অনুসন্ধান করেনি।

এই মানুষগুলিই তাঁকে তাঁর রুচি ও প্রয়োজনমতো স্থান খুঁজে দিল। সরোবরতীরে বসিয়ে রেখে নিজেরাই কুটির বেঁধে দিল। যতই দেখছেন ততই এদের প্রতি তাঁর এক ধরনের শ্রদ্ধা ও মমতা বেড়ে যাচ্ছে। কালো মানুষরাও যে উন্নতনাসা স্বর্ণাভ গাত্রবর্ণের মানুষের মতোই মানুষ, অনেক বিষয়ে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছে। এদের বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা, নগ্নতা, নারী পুরুষের ইচ্ছামতো যৌনাচার, আমমাংস খাওয়া তিনি আগে অতি অরুচিকর বিকৃতি বলে মনে করতেন। এখন বলেন, নিজেকেই বলেন, বোঝেন না। ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। এদের যে চারিত্রিক গুণ যেমন অকপটতা, সহ্যশক্তি, বিনয়, সদা-সতর্কতা, সহজাত বুদ্ধি, বনের যাবতীয় পশুপাখি বৃক্ষ লতাদির গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান, বিশ্বস্ততা এইগুলির সঙ্গে যদি সভ্য মানুষের শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা, বেশবাস, বাসস্থানের সৌকর্য ইত্যাদি যোগ হয় তাহলে কি আদর্শ মানুষ প্রস্তুত হবে ? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চণক ভাবেন— না, এগুলির সহাবস্থান বোধ হয় সম্ভব নয়। যে মুহূর্তে দেহ ঢাকবে সেই মুহূর্তেই মানুষ মনও ঢাকবে, উদ্দেশ্য ঢাকবে, চাতুর্য ব্যবহার করবে। সৌকর্য সুষমা ইত্যাদি থেকে আসবে ঘৃণা, লোভ, প্রতিভা থেকে আসবে ক্ষমতালিপ্সা।

আহার শেষ করে তিনি উচ্ছিষ্ট শালপাতাগুলি ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলেন। সরোবর থেকে মুখ-হাত ধুয়ে কুটিরের মেঝে পরিষ্কার করলেন, তারপর শীতল মাটির মেঝেয় শুয়ে পড়লেন। রাত্রি আরও একটু গভীর হলে তবেই তিনি জটাটি খুলে রেখে একটু স্বস্তি পাবার চেষ্টা করবেন। এখনও সে সাহস করছেন না। অনেক সময়ে আটবিক পল্লী থেকে উদ্দক, রগ্‌গা কিংবা অন্য কেউ হঠাৎ এসে পড়ে। হয়ত সামান্য কোনও সমস্যা হয়েছে। এই সরল মানুষগুলিকে নাগরিক শিষ্টতা শেখানো সম্ভব নয়। তারা জানে, সন্ন্যাসী বহু রাত্রি অবধি ধ্যান-ধারণা করেন। নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সমস্যার কথা নিয়ে এই উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানীগুণী বন্ধু সন্ন্যাসীর কাছে রাতে আসা এমন কিছু একটা বিধিবহির্ভূত কাজ নয়। কয়েকদিন আগেই তো এসেছিল রগ্‌গার প্রণয়ী উদ্দক। তার সমস্যা অতি বিচিত্র। মৃগয়া করতে করতে সে অরণ্যের মধ্যে বহুদূর চলে গিয়েছিল একটি বরাহর পেছন পেছন। বরাহটিকে মারবার পরও গোষ্ঠীর নিয়মমতো সে বরাহটিকে বয়ে নিয়ে আসেনি। একটি স্রোতস্বিনীর ধারে অরণিকাষ্ঠের সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে বরাহমাংস ঝলসিয়ে সে দুদিন ধরে অল্পে অল্পে খায়। তারপর যেটুকু বাকি ছিল নদীতীরে ফেলে গোষ্ঠীতে ফিরে আসে। উদ্দক তার এই অপরাধ সবার সামনে স্বীকার করতে সম্মত। খালি রগ্‌গাকে ভয় পায়। রগ্‌গা যদি তার সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয় ? উদ্দককে চণক মিথ্যাচারের পরামর্শ দিতে পারেননি কিছুতেই। রগ্‌গাকে তিনি বুঝিয়ে বলবেন এই আশ্বাস নিয়ে উদ্দক চলে যায়।

আজ সারা দিন অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশি পরিশ্রম হয়েছে। তবু উৎকণ্ঠায় ঘুম আসছে না চণকের। মগধের চর সহসা তাঁর ছদ্মবেশ ভেদ করায় কি তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের ভিত শিথিল হয়ে গেছে ? বোধ হয় তাঁর গণনা মতো কাজ হচ্ছে না। অজানা অচেনা এই মধ্যদেশ। পুব ঘেঁষে। এখানে বন ও নদনদী ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তিনি জানতেন গঙ্গা-সিন্ধু-যমুনা বিধৌত এক জনবসতিপূর্ণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে। অচিরবতী, সরযূ বা মহীরও নাম শোনা ছিল কিন্তু পথে আসতে আসতে দেখেছেন ক্রমশই নদীর সংখ্যা বাড়ছে। উপনদী শাখানদী প্রসারিত দশ আঙুলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। কোনটিতে রুপোলি জলস্রোত, কোথাও জলের বর্ণ নীলাভ, কোথাও গৈরিক। উত্তর পশ্চিমদেশে এক যোজন অতিক্রম করতে যে সময় লাগে এখানে তার দশগুণ লাগাও বিচিত্র নয়। পথচলতি সব শ্রমণ পরিব্রাজকের কথায় নির্ভর করে পরিকল্পনা করা ঠিক হয়নি। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। এবারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আত্মপ্রকাশেরও সময় হয়েছে।

হঠাৎ কুটিরের দ্বারে মৃদু শব্দ হল। অরণ্যে প্রায় দু'মাস থাকার পর প্রহর সম্পর্কে খানিকটা ধারণা চণকের হয়েছে। এখন মনে হয় রাত্রি দ্বিপ্রহর। আটবিক পল্লীর নাচ-গানের আওয়াজ অনেকক্ষণ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেমে গেছে। এত রাত্রে আবার কার কী কাজ পড়ল? ধীরে ধীরে অর্গল খুলে, দ্বারের অন্তরালে সরে দাঁড়ালেন চণক। আবার দরজায় আঘাত। এবার দ্বার খুলে গেল, মুক্ত দ্বারপথে একটি নগ্ন তরবারি প্রবেশ করল।

চণক চাপা স্বরে বললেন, 'কৃপাণ কোষবদ্ধ করো ভীরু, সন্ন্যাসী নিরস্ত্র।'

উত্তরে একটি ধীর গম্ভীর স্বর বলল, 'দীপ জ্বালো।'

২

রাজগৃহের উত্তর-পশ্চিমে নিত্যপ্রবাহিনী সরযূ নদীর তীরে অনন্যা সুন্দরী তন্বী সাকেত। কোশল রাজ্যের তিন গরবিনী নগরী—শ্রাবস্তী, অযোধ্যা, সাকেত। শ্রাবস্তী যদি হয় চাকচিক্যময় রত্নহার, অযোধ্যা যদি হয় বহু-ব্যবহৃত স্বর্ণসূত্র, সাকেত তবে একগাছি মুক্তার মালা। বিশ্বভুবনে এমন নগরী আর কোথায় আছে? প্রয়োজনের খামখেয়ালে গড়ে উঠেছে শ্রাবস্তী। স্বয়ং কোশলরাজের বসবাস, বহু ধনী শ্রেষ্ঠীরাও স্বভাবতই জড়ো হয়েছে সেখানে। তাই জাঁকজমকে চোখ ধাঁধায়। সব পাওয়া যায়। সব্বম অত্থি ইতি সাবত্থি। অযোধ্যা প্রাচীন নগরী। তার পথঘাট, প্রাসাদ, বিপণি সবেতেই একটা ব্যবহারের মালিন্য। কিন্তু সাকেত কল্পনার ধন। ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে অতি সুমিত, পরিচ্ছন্ন শিল্পরুচিতে সাজানো হয়েছে তাকে।

প্রধান পথগুলি সবই নদীমুখী। পথের দু-ধারে ছায়াতরু। এই প্রশস্ত পথগুলিকে সমকোণে কেটে চলে গেছে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আরও পথ। নগরীর কেন্দ্রে রাজন্য উগ্রসেনের প্রাসাদ, চারিদিকে তার উদ্যান। শুধু রাজন্যগৃহ কেন নগরীর প্রায় সবগুলি গৃহেই কানন রয়েছে। রয়েছে সুস্বাদু পানীয় জলের কূপ। তা ছাড়াও বাপী। রাজগৃহ থেকে পাটলি গ্রামের কাছে গঙ্গা পার হয়ে বৈশালী অতিক্রম করে নিচের দিকে নামলে পড়বে প্রথমে অচিরবতী নদীর তীরে শ্রাবস্তী। কিন্তু বারাণসীর কাছে গঙ্গা পার হয়ে কোশলের দিকে অগ্রসর হলে প্রথমেই পড়বে অযোধ্যার উপকণ্ঠে সাকেত। আর সাকেতে প্রবেশ করে প্রথম যে দৃষ্টিগ্রাহী মনোরম প্রাসাদটি চোখে পড়বে সেটাই সাকেতের ধনীশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর আবাস।

সাকেতকে মধুভাণ্ডের মতো তিন দিকে ঘিরে একের পর এক বিস্তৃত রয়েছে শস্যক্ষেত্র। ধান্য, যব, ইক্ষু। প্রধানত ধান্য। উৎকৃষ্ট জাতের ধান্য উৎপাদন করে সাকেতের সমীপবর্তী গ্রামগুলি। এইসব শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অনেকগুলিই সাকেতের নাগরিকদের। তাঁদের নিযুক্ত কর্ষকরা গ্রামগুলিতে বসবাস করে। ক্ষেতগুলি কর্ষণ করে।

আজ হলকর্ষণোৎসব। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবশেষে মাটি ভিজিয়ে দিয়ে গেছে মেঘ। সেই প্রথম বর্ষণের পর ধরিত্রীর মাতৃগন্ধে গৃহপতিরা বুক ভরে শ্বাস নিয়ে নিজের নিজের ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করবেন। কুসুম মাল্যে চন্দনে সজ্জিত হয়েছে হলযন্ত্র ও বলদ। গৃহস্বামিনী বরণ করবেন। শঙ্খ বাজাবে, আনন্দধ্বনি করবে পুরনারীরা। পুরোহিত ক্ষেত্রপূজা, হলপূজা করবেন ঠিকমতো। এই সময়ে সম্পন্ন গৃহপতিরা পশুযাগ করে থাকেন। একটি ছাগশিশু বলি দেওয়ার প্রথা আছে। ইদানীং কিন্তু তা আর হচ্ছে না। পুরোহিতরা অনেকেই এতে ক্ষুব্ধ। কে এক ক্ষত্রিয়বংশীয় শ্রমণ শ্রাবস্তীতে প্রচার করে বেড়াচ্ছে দেবপূজার নামে জীববলি দেওয়া নাকি হত্যা। দেবতা কখনও এ বলি গ্রহণ করেন না।

কিন্তু হলকর্ষণোৎসবের চেয়েও আকর্ষক উৎসব আজ আছে। সরযূর তীরে তাই তরুণ যুবকদের যেন মেলা বসে গেছে। প্রত্যেকেরই পরনে উত্তম বেশ। বক্ষে চন্দনলেপ। গলায় হার। পুষ্পমালা। কানে কুণ্ডল। বাহুতে অঙ্গদ। কপালে তিলক। সাকেতের কুলনারীরা, অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কন্যারাও আজ উৎসবে যোগ দিতে নদীতীরে আসবে। নদীর ধার পর্যন্ত চূতবীথিকার প্রধান পথটিতে বহু অস্থায়ী বিপণি শ্রেণিবদ্ধভাবে বসে গেছে। বহুধরনের ফুল। ফুলের মালায় ও অলঙ্কারে কে কত বৈচিত্র্য আনতে পারে তার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কেউ গেঁথেছে স্থূল বেলকুঁড়ি দিয়ে পাঁচ লহর, সাত লহর মুক্তাহারের মতো মালা। মল্লিকার মালায় রূপদক্ষ কেউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো মালার মাঝখানে ঝুলিয়ে দিয়েছে প্রস্ফুটিত দু-তিনটি কেতকীর মধ্যমণি। কর্ণিকারের কর্ণাভরণ। পত্রের ওপর কুঁড়ি দিয়ে গাঁথা কবরীসজ্জা। কণ্ঠী, কেয়ুর, মেখলা। সব ফুলের। সুগন্ধে আকুল হয়ে রয়েছে পথগুলি।

তরুণদের হৃদয়ে আশা ও উল্লাস। কুমারীরা নদীতীরে আসবে। যাদের সহসা দেখতে পাওয়া যায় না, তারাও। তরুণরা যাকে ইচ্ছে মালা দিয়ে বরণ করবে। অবশ্য এ নির্বাচন একেবারে প্রাথমিক। উৎসবের দিনে কোনও কুমারীর গলায় জোর করে মালা পরিয়ে দিলেই যে তাকে ঘরে আনতে পারা যাবেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেই কন্যা যদি নিজ কণ্ঠের মালাটি বিনিময়ে দেয় তবেই মোটামুটি গান্ধর্ববিবাহের প্রথম পর্ব সিদ্ধ হল বলে মনে করা হয়। এর পর কন্যার পিতার কাছে নিজের কুল, শীল, উপার্জন ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ ও মাঙ্গলিক উপঢৌকন দিয়ে দূত পাঠাতে হবে। কন্যার পিতা যদি পাত্রকে উপযুক্ত মনে করেন একমাত্র তবেই এই প্রাথমিক নির্বাচন বিবাহে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। কিন্তু, নিশ্চয়তা থাক বা না থাক, এ এক মধুর খেলা। এ দিনটিতে নব্য যুবকদের সংযত করা এক দুরূহ ব্যাপার।

ঋতু-উৎসবের দিনগুলিতে বিশাখা যেন মুক্ত পাখি। ঝরা বকুলে আকীর্ণ হয়ে রয়েছে পথ। ঘন সবুজ পত্রজালের মধ্যে থেকে কোকিল যুবা ক্ষণে ক্ষণে উৎকণ্ঠ ডাক ডেকে উঠছে। কে বলে পিক শুধু বসন্তেই ডাকে! সাকেতে সর্ব ঋতুতে সর্ব সময়ে পিক কুহরে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিশাখা। দেখতে পায় না। বিচিত্র কর্কশ স্বরে ডেকে উঠে সহসা ঝরঝর শব্দে পেখম ছড়িয়ে নাচতে শুরু করে দেয় একটা ময়ূর গ্রীষ্মের আকাশ একটু ছায়াময় হলেই। বিশাখা থাকে সাকেতের পূর্বস্থলীতে। পিতার সপ্ততল প্রাসাদ। তাকে ঘিরে চতুর্দিকে বিছিয়ে রয়েছে অশ্বশালা, হস্তিশালা, রথাগার, মহানস, সংরক্ষণাগার, শ্রীগৃহ। মাঝে মাঝেই উদ্যান। উদ্যানের মধ্যে তড়াগ যেমন পদ্মে-কলহারে শোভাময়, তড়াগের চারপাশের ভূমিও তেমনই বহুবিধ বৃক্ষ, কুসুমকুঞ্জ ইত্যাদিতে শ্রীময়। এরই মধ্যে বিশাখার দিন কেটে যায় নানা বিষয় শিক্ষা করতে। আচারিয় মহাকল্লক আসেন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে। মা দেবী সুমনা স্বয়ং তাকে চিত্র লিখতে শিখিয়েছেন ; শিখিয়েছেন কীভাবে শাখা-প্রশাখায় প্রলম্বিত বিশাল সংসার ধারণ করে রাখতে হয়। পিতা শেখান অর্থের গণনাকৌশল, প্রয়োগ, বাণিজ্য-মন্ত্র। [illegible]য়নের মণি সন্তান। তাকে তাঁর পিতৃধন সর্বৈব অর্পণ করতে চান তিনি। বিশাখা নিপুণভাবে শিখে নিচ্ছে সব। এই পনেরো বছর বয়সেই সে নানা বিষয়ে বাবা ও মাকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

সাকেত সুন্দর। সুন্দর সাকেতের সপ্ততালিক প্রাসাদ। কিন্তু সাত বছর এখানে কেটে গেলেও আজও বিশাখার সাকেতকে বিদেশ বলে মনে হয়। বড় ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ, আপন ছিল তাদের আদি নিবাস ভদ্দিয়। অঙ্গরাজ্যের এই ছোট প্রান্তিক নগরে দীর্ঘদিন ধরে পিতামহ মেণ্ডক গড়ে তুলেছিলেন তাঁর অতুল ধনসম্পদ। বামে শ্রাবস্তী। রাজগৃহ, বারাণসী, দক্ষিণে চম্পা। ভদ্দিয় ছোট জনপদ হলেও তার অবস্থান ছিল শ্রেষ্ঠীর কাজকর্মের পক্ষে সুবিধাজনক। অঙ্গ ও মগধের মাঝখানে। তা ছাড়াও মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর মূল ভদ্দিয়তে, তিনি তাকে ত্যাগ করেননি। ধনী কন্যা বলে আলাদা একটা অস্মিতা তখন সেই বয়সে গড়ে ওঠেনি বিশাখার। ছিলেন স্নেহময়ী পিতামহীরা, ছিল পিতৃব্য পুত্র-কন্যারা, জীবন ছিল সারা দিনমান প্রলম্বিত একটি ছুটির দিনের মতো। যার প্রতি প্রহরে নতুন নতুন আবিষ্কারের রোমাঞ্চ। বিশেষত, পিতামহ আবার ছিলেন ঐন্দ্রজালিক। শ্রেষ্ঠী বলে যত খ্যাতি জাদুকর বলে খ্যাতি বুঝি তার দ্বিগুণ। পরিবারের অনেকেই ইন্দ্রজাল জানত। শিশুকাল থেকেই বিশাখার মনোগত ইচ্ছা ছিল সে হবে জাদুকরী। তার জাদুদণ্ডের এক ছোঁয়ায় বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হবে, গাছ বড় হয়ে উঠবে, তাতে ফল ধরবে, পাকবে, তারপর সেই সুগন্ধ আম্রফল সে দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করবে। পিতামহ খুব ব্যস্ত মানুষ ছিলেন, তবু যখন তাঁকে কাছে পেত নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে অকপটে জানাত বিশাখা।

মৃদু মৃদু হাসতেন পিতামহ, 'তুই বিবাহ করবি না বিসাখা!'

—না, পিতামহ, আমি দেশে দেশে জাদু দেখিয়ে বেড়াব।

—কিন্তু তার জন্য তো দলবল চাই। সে সব পাবি কোথা থেকে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতৃব্য পুত্র-কন্যাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে নিশ্চিন্তে বলত, 'কেন ভদ্দা রয়েছে, রোহিণী রয়েছে, মধুস্‌সরা রয়েছে, ছন্ন, বলভদ্দ, ছেটকও রয়েছে। ওরাও শিখবে। ওরা আমার সহকারী হবে।'

ভদ্দা, রোহিণী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠত, 'না, না, আমরা বিসাখার সঙ্গে দেশে দেশে ওভাবে ঘুরতে পারব না, আমরা ভদ্দিয়তেই থাকব।'

—তোরা বিবাহ করবি না ? পিতামহের প্রশ্ন।

—হ্যাঁ। পিতামহ, আমরা বিবাহ করব।

—কেমন বর চাই-রে ভদ্দা, রোহিণী ?

—তোমার মতো ! তোমার মতো !

পিতামহ অট্টহাস্য করে উঠতেন, নিজের শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্র শ্মশ্রুতে হাত বুলোতে বুলোতে বলতেন, 'দেখলি তো বিসাখা, তোর দলবল কেমন ?'

মধুস্‌সরা তখন বিশাখার হাত ধরে জোর গলায় বলত, 'আমি তো আছি ভগ্নী বিসাখার সঙ্গে, কি রে বলভদ্দ, ছেটক, ছন্ন, তোরাও কি ভদ্দিয় ছেড়ে দেশে দেশে জাদু দেখাতে চাস না ?'

বিশাখা যোগ দিত, 'তোদের কারও মধ্যেই কি কোনও বীরতা নেই ?'

ছেলে তিনটি গৃহের সবচেয়ে ছোট। কচি-কচি গলায় জবাব দিত, 'হ্যাঁ, আমরা জাদুকর হব, জেটঠা বিসাখার সহকারী হব, পিতামহ, আমাদের শিখিয়ে দাও।'

তখন মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী পরম স্নেহ এবং গর্বভরে বিশাখার দিকে তাকাতেন, বলতেন, 'তা, তোমার অক্ষিতারকার যেরকম ক্ষণে নিশ্চলতা ক্ষণে চঞ্চলতা দেখছি, যেমন গ্রীবাভঙ্গি দেখছি, তুমি পারবে, তুমি জাদুকরী হয়েই জন্মেছ বিসাখে। তবে তোমার সঙ্গে যদি একটি উপযুক্ত জাদুকরের বিবাহ দিই তবে আপত্তি নেই তো !'

একটু ভেবে বিশাখা বলেছিল, 'না, তা নেই। তবে তাকেও সত্য করতে হবে আমরা এক স্থানে থাকব না। সার্থবাহরা যেমন অরণ্য, কান্তার, বারিধি কিছু মানে না। খালি চলে চলে আর চলে, আমরাও তেমনি শকটে আমাদের পেটিকাগুলি নিয়ে খালি চলব, চলব আর চলব।'

শ্রেষ্ঠী বললেন, 'অরণ্য ? কান্তার ? বারিধি ? দিদি, অরণ্যে-কান্তারে কাকে জাদু দেখাবে ? ব্যাঘ্র-ভল্লুককে ? না নরখাদক যক্ষদের ?'

বিশাখা একটু কি অপ্রতিভ ? শিশুকাল থেকে বাণিজ্যযাত্রার কাহিনী শুনে আসছে, তার স্বপ্ন সেই সব কথা-কাহিনী-কল্পনার উপকরণ দিয়ে গড়া। সে ঢোঁক গিলে বলল, 'কেন পিতামহ ! ধরুন ভদ্দিয় থেকে চম্পা যেতে, কি রাজগৃহ যেতে, মাঝে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে যেতে অরণ্য, নদী, প্রান্তর তো পড়বেই ! বল মধুস্‌সরা, বল ছন্ন কী অপূর্ব, রোমাঞ্চকর হবে আমাদের জীবন ?'

শ্রেষ্ঠী হেসে আশ্বাস দিলেন, 'ঠিক আছে দিদি, আর একটু বড় হয়ে ওঠো, কেশ আরেকটু দীর্ঘ হোক, ওষ্ঠাধরে আরও রঙ্ লাগুক, আঁখিপক্ষ্মগুলি আরও নিবিড় হয়ে উঠুক, তুমি অবশ্যই জাদুকরী-শ্রেষ্ঠা হবে।'

এখন বিশাখার পনেরো বছর পার হয়ে গেছে। পঞ্চদশী, পৌর্ণমাসী। সঙ্গে সব সময়েই ঘোরে জগৎ ব্যাপারে অভিজ্ঞ সুচতুরা সখী ও দাসীর দল। সে এখন পিতামহের সেই শেষ আশ্বাসবাণীর রহস্য ভেদ করতে পারে। হাসি পায়, কিন্তু ক্রোধও হয়। এখন হয়ত ভ্রাম্যমাণ জাদুকরী হবার সেই শৈশব সাধ আর নেই। কিন্তু জাদু, জাদুর প্রতি তার আকর্ষণ কমেনি মোটেই। কদিন আগে তাদের উদ্যানপালের সদ্যোজাত পুত্রটি অকালে মারা গেল। তার সব পুত্র-কন্যাগুলিই এভাবে মারা যায়। অকস্মাৎ নীলবর্ণ হয়ে যায়। তারপর একটা ক্ষীণ স্বর বেরোয় মুখ দিয়ে। তার পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বিশাখার মনে হয় সে যদি জাদু জানত, জাদুদণ্ড দিয়ে স্পর্শ করত একবার, উদ্যানপালের নয়নের মণিটি বেঁচে উঠত ! জীবনে সংকল্প যদি-বা থাকে, সাধ্য কেন থাকে না ? জীবন এমন একই ছকে বাঁধাই বা হবে কেন ? ঠিক যেভাবে তার প্রপিতামহী, পিতামহী প্রমাতামহী, মাতামহী জীবন কাটিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই ? যেভাবে তার মায়ের জীবন....। এইখানে এসে বিশাখার চিন্তা থেমে যায়। না, মা সুমনা একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি ওই ছকের মধ্যে আছেন ঠিকই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু তাকে ইচ্ছামতো অতিক্রমও করেন। তবে, তবে কেন বিশাখা গতানুগতিতে গা ভাসাবে?

এখন সে চূতবীথিকার পথ ধরে পায়ের তলায় নবীন ঘাসফুলগুলি সযত্নে এড়িয়ে সরযূতীরের দিকে চলেছে। বহু সখী এবং অন্যান্য পরিবার থেকে আগত নবীনা সুরূপা কিশোরীদের মধ্যে থেকেও তাকে চিনে নেওয়া যাচ্ছে অনেক কাচখণ্ডের মধ্যে একটি মাত্র দৃঢ়জ্যোতি হীরকখণ্ডের মতো। নীলাভ শ্বেত দুকূলের একটি অধোবাস পরেছে সে, উপরার্ধে ঘন নীল রঙের স্তনপট্ট। দুই কাঁধ থেকে নেমে এসেছে শ্বেত উত্তরীয়। তাতে রক্ত ও নীলবর্ণ বুটিকা। ঈষৎ কুঞ্চিত তার নীলকৃষ্ণ কেশ ঠিক ময়ূরপুচ্ছের মতো তার পিঠ বেড়ে রয়েছে। কেশাগ্রভাগ বাইরের দিকে সমানভাবে বক্র হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। বিশাখার গায়ের রঙ রক্তাভ গৌর। সুবক্র ঠোঁটদুটি দেখলে মনে হয় তাতে রঞ্জনী দেওয়া রয়েছে। কিন্তু বিশাখা কোনও রঞ্জকদ্রব্য ব্যবহার করেনি। তার কান, নাক, কপাল, বিশাল দুই পক্ষ্মাচ্ছাদিত চক্ষু, চিবুক থেকে আরম্ভ করে বাহুযুগল, আঙুলগুলি, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অশেষ যত্নে গড়া। সর্বোপরি এই পনেরো বছর বয়সেই তার মধ্যে এমন একটা শান্ত বুদ্ধির দীপ্তি যে, তাকে দেখলে সম্ভ্রম হয়।

কুমারীর দল এগোতেই যুবকদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা গেল। অনেকেই মালিনীর কাছ থেকে তার সবচেয়ে মনোমত মালাটি সংগ্রহ করে রেখেছে। গত বসন্তোৎসবে যে কিশোরী বা বালিকা মনোহরণ করেছে, তারই কণ্ঠ লক্ষ্য করে মালাগুলি সব নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কুমারীদের দলে হিল্লোল, হাসি। এরই মধ্যে একটি যুবক বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরে সাহস সঞ্চয় করছিল। সে একটি অতি সুন্দর কুন্দ ফুলের মালা হাতে একটু ইতস্তত করে বিশাখার দিকে এগিয়ে গেল। তার বন্ধুরা একটু দূর থেকে বিপুল ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাকে লক্ষ করছে।

যুবক ক্ষত্রিয়কুমার। স্থানীয় রাজন্যর ছেলে। এই বয়সেই শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হয়ে উঠেছে এমন শোনা যায়। সে খুব সাহসে ভর করে, হৃৎপিণ্ডের প্রবল আলোড়ন সংযত করে বিশাখার মুখোমুখি হল। বিশাখার রাজহংসীসদৃশ চলার গতি মন্থর হয়ে এসেছে। আশেপাশে তার সখীদের মুখে কৌতুকের হাসি। চোখে কৌতূহল নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেছে। কুমার যথেষ্ট দীর্ঘাকৃতি। সে মালাটি হাতে নিয়ে বিশাখার গলায় পরাতে যাবে, বিশাখা দু পা পিছিয়ে গিয়ে তার স্বর্ণঘণ্টার মতো কণ্ঠে বলে উঠল, 'তিট্ঠ, তিট্ঠ তিস্স। এ কী করছ!'

ক্ষত্রিয়কুমার তিষ্য হকচকিয়ে থেমে গেল।

তার আজকের আচরণের পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। না, না। এই বছরের, কি তার আগেকার বছরের কোনও প্রগলভ ঋতু-উৎসবের উদ্দীপন নয়। আছে আরও কয়েক বছর আগেকার একটি পারিবারিক উৎসবের দিন ও দিনান্তের স্মৃতি। সে তক্ষশিলার গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসবার পর তার পিতা উগ্রসেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সপরিবারে নিজগৃহে দ্বিপ্রাহরিক ভোজে আপ্যায়ন করেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়। শ্রেষ্ঠীকন্যা বিশাখাকে দেখে, তার সঙ্গে আলাপ করে তিষ্য চমৎকৃত হয়ে যায়। সে আজ তিন চার বছর আগেকার কথা। তক্ষশিলার শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করবার পর পিতা তাকে পাঠান আরও বিশদভাবে অস্ত্র প্রয়োগ শিখতে শ্রাবস্তীর সেনাপতি মল্লবংশীয় বন্ধুলের কাছে। ইতিমধ্যে সে ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমরাগ দিয়ে পত্র লিখে অতি বিশ্বাসী জ্ঞাতিভগ্নীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বিশাখার কাছে। তিন বছরে তিনটি। কোনবারই কোনও উত্তর পায়নি সে। কিন্তু মৌনতাই তো সম্মতি? মৌনতাই তো মুগ্ধতা? একে সে রাজন্যবংশীয় কুমার, দ্বিতীয়ত সে অতি বীরপুরুষোচিত অবয়বের অধিকারী। তার সুচারু কেশ, সযত্নপুষ্ট ক্ষীণ গুম্ফরেখা, পরিষ্কৃত লালিত শ্মশ্রু সবেতেই একটু ক্ষীণ স্বর্ণাভা আছে। তিষ্যর পিতা উগ্রসেন গর্ব করেন তিনি পাঞ্চাল রাজবংশের সন্তান। বিশুদ্ধ রাজরক্ত তাঁর ধমনীতে। কোনদিন পরিবারে কোনও মিশ্রণ হতে দেননি তাঁর পূর্বপুরুষ। খুব সম্ভব শিক্ষাশেষে সে হয় মগধ, নয় কোশলের সেনাবাহিনীতে অতি উচ্চপদে যোগ দেবে। না দিলেও সাকেতের সীমার মধ্যে তো সে রাজকুমার, পরে রাজাই হতে যাচ্ছে। তক্ষশিলা থেকে আসবার পর যখন বালিকা বিশাখার সঙ্গে আলাপ হয় সে নিজে ছিল সদ্য-স্নাতক অহঙ্কারী যুবক, তাকে লক্ষ্য করে তরুণী কুমারীদের লাস্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। সে কিন্তু কাউকেই প্রশ্রয় দিতে চাইত না। শুধু বিশাখার বুদ্ধিদীপ্ত, সপ্রতিভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাপচারিতায় সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কয়েক দণ্ডের মধ্যেই দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জমেছিল। বারো বছরের বালিকার পক্ষে অবশ্য বিশাখা তখনই একটু অতিরিক্ত গম্ভীর, যেন একটু অকালপক্কও কিন্তু সে পক্কতা অন্যান্য বালিকার মতো নয়, সে কথায় কথায় শ্লোক উদ্ধৃত করত, গুরুগম্ভীর মন্তব্য করত রাজকর্তব্য, বাণিজ্যপথ ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু তিষ্যর মনে হয়েছিল বালিকা আসলে সরল। একেবারেই পূতচিত্ত। অভিজাত ঘরের শিক্ষাদীক্ষায় তার ওপর একটা গাম্ভীর্যের, পক্কতার আচ্ছাদন তৈরি হয়েছে। বালিকার লীলাচাপল্য ওরই মধ্যে যখন তখন প্রকাশ পেত।

—তিস্‌স, তিস্‌স, তোমার হাতের রেখা দেখি। এখনও তিষ্য বালিকার অদ্ভুত মিষ্ট অথচ জোরালো কণ্ঠ শুনতে পায়।

—ভদ্র তিষ্য বলো বিসাখে, আপনার বলো, তোমার বলো না, আমি তক্ষশিলার স্নাতক, জানো না ? সমগ্র সাকেতে আপাতত এই একটিই !

ভদ্র বা আপনি শোনবার কোনও বাসনা ছিল না তিষ্যর। তবু দুষ্টুমি করে ভর্ৎসনা করেছিল সে বিশাখাকে।

বিশাখা তার কৌতুক সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, হে তক্ষশীলিত তিষ্য ভদ্র, আপনার অসামান্যম্ একম্ অদ্বিতীয়ং দক্ষিণহস্তম্ দেখি।'

—তুমি কি জ্যোতিষ জানো ? হস্তরেখা পড়তে পারো ? অঙ্গবিদ্যাটিদ্যাও জানো নাকি ?

—ভদ্রে বলুন তিষ্যকুমার, আমি ধনঞ্জয়পুত্রী, মেণ্ডকপৌত্রী জাদুকরী বিসাখা। রেখা পড়তে না পারলে আপনার ওই কর্কশ, ভারী হাতটি ধারণ করে আমি কী এমন স্বর্গলাভ করব ? তবে জ্যোতিষশাস্ত্রও তক্ষশিলায় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে খুব কম জনই।

তিষ্য হেসে বলেছিল, 'বেশ, বেশ, ভদ্রে বিসাখে আপনি আমার হস্তরেখা বিচার করুন।'

ভালো করে তার দক্ষিণ হস্তের রেখাগুলির ওপর নিজের পুষ্পবৃন্তের মতো কোমল আঙুলগুলি চালনা করে তিষ্যর সারা শরীরে বিপুল রোমহর্ষ জাগিয়ে দিল বিশাখা। তারপর হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'অহো কী দুঃখ ! ভদ্র আপনি তো দেখছি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হবেন !'

—ঘাতক না ঘাতিকা ঠিক করে বলো, সে রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিল তিষ্য।

তার কথার গূঢ়ার্থ বোঝেনি বিশাখা। শুধু তার নীলাভ কৃষ্ণকেশ সমেত অপরূপ মাথাটি দুলিয়ে বলেছিল 'তা জানি না, ঘাতকের লিঙ্গ বলতে পারব না, যাও তিস্‌স, আর তোমার অশুভ হাত দেখব না। শেষে বলবে বিসাখা অপ্রিয়বাদিনী। অকল্যাণকামী।'

তিন বছর আগেকার প্রতিটি শব্দ ফিরে ফিরে এসে আঘাত করল তিষ্যকে। সে ব্যথাম্লান মুখে বলল, 'মাল্য প্রত্যাখ্যান করছ ভদ্রে বিসাখে ?'

—অবশ্যই। তুমি কি ভেবেছিলে সাধারণীদের মতো ধনঞ্জয়পুত্রীও সরযূমুখী চূতবীথিকায় প্রণয়গুঞ্জন করে ? বিশাখার সুন্দর চোখে ক্রোধ ঝলসে উঠেছে। মুখে অপমানের লালিমা। তার কণ্ঠস্বর যতই সুন্দর হোক এই মুহূর্তে কর্কশ লাগল।

একটি কথাও বলতে পারল না তিষ্য। পায়ে পায়ে পিছিয়ে এলো। তার চোখের সামনে অন্ধকার। আশেপাশে বন্ধুকল্পরা ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। তার বিশেষ বন্ধু সুমিত্র এবং আত্রেয় তাকে বহুবার নিষেধ করেছিল, এ কথা মানতেই হবে। বিশাখা সাকেতের ধনীশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়ের নয়নের মণি, তারপর অপরূপা রূপসী। তার জন্য ববেরু থেকেও পাণিপ্রার্থী এলে বিস্ময়ের কিছু নেই। তা ছাড়া আজকাল জনসমাজে শ্রেষ্ঠীরাই শ্রেষ্ঠ। রাজাদের তারা মুখেই সম্মান দেখায়, ভালো করেই জানে রাজার ভালোমন্দ এক রকম তাদের অর্থঋণে বাঁধা। তিষ্যদের পুরোহিত সক্ষোভে বলে থাকেন, 'এখন আসছে এক বৈশ্য যুগ, যার যত অধিক স্বর্ণ, তার তত উচ্চ বর্ণ'। স্বয়ং কাশীকোশলের নৃপতি প্রসেনজিৎ যখন মগধরাজ বিম্বিসারের কাছে একটি শ্রেষ্ঠী তাঁর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন মগধরাজ্যের পঞ্চশ্রেষ্ঠী যোতীয়, জটিল, মেণ্ডক, পুণ্যক, কাকবলীয় কেউই কি আসতে চেয়েছিল ? রাজাদেশ অগ্রাহ্য করতে তাদের কারোরই কোনও অসুবিধে হয়নি। দুই রাজার মান বাঁচাতে অবশেষে মেণ্ডক তাঁর পুত্র ধনঞ্জয়কে কোনক্রমে রাজি করিয়েছিলেন। সে-ও ধনঞ্জয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপের সুপুত্র বলেই। ধনঞ্জয় আসার পর থেকেই সাকেত নগরী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সরযূর জলে পণ্যতরী এসে ভিড় করছে। সরযূ বেয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে তরীগুলি তারপর পুবমুখে পাল তুলে চলে যায়, আসে। সার্থবাহরা আর পথের বিপদ গ্রাহ্য করছে না, দলে দলে বণিক মধ্যবর্তী চৌরকান্তার, ব্যালকান্তার কিছুই না মেনে সাকেতকে কেন্দ্র করে সারা উত্তরাপথ ঘুরে ঘুরে বাণিজ্য করছে। অনেক পরদেশী বণিক তো বলে সায়ংকালে প্রসেনজিৎ ধনঞ্জয়কে নিয়ে এই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন, সায়ংকালে এই নগরের পত্তন হয়। ধনঞ্জয় নাকি বলেছিলেন , 'সায়ংকৃত'। তার থেকেই সাকেত। এই নতুন সাকেত-জন্মকথা বণিকদের মুখে মুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অযোধ্যার উপকণ্ঠে যে সাকেত নগরী সত্যই ছিল, অযোধ্যা এবং সাকেত উভয় নগরীর রাজাই যে তিষ্যর পিতা উগ্রসেন, বংশপরম্পরায়, এসব কথা এই নব্য বণিকরা জানে না। বিশ্বাসও করতে চায় না। আসলে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীই এই নগরীর যশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখন সাকেত শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী, বারাণসী, চম্পার সঙ্গে তুলিত হয়। সেই ধনঞ্জয়ের কন্যা যে ধনগর্বী, রূপগর্বী হবে তাতে আর আশ্চর্যের কী ! সবাই বুঝেছিল, খালি তিষ্যই বোঝেনি, মানতে চায়নি।

পায়ে পায়ে পিছিয়ে এসে তিষ্য তরুণদের ভিড় থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নিল। তাদের ঈষৎ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কারও কারও দুঃখপ্রকাশ কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। একটা অভিমান, একটা হতাশা ও ক্ষোভের আবরণের মধ্যে সে এখন সম্পূর্ণ একা। সে ফিরে চলেছে। অবশ্যই গৃহ অভিমুখে নয়। অন্য কোথাও। নির্জনে। সুমিত্র এবং আত্রেয় কিছুক্ষণ পেছন পেছন এসেছিল। কিন্তু তারা সাকেতের বাল্যবন্ধু। বেড়ে ওঠার সময়ে, তক্ষশিলা এবং শ্রাবস্তীতে থাকায় দীর্ঘকাল অদর্শনে তাদের বন্ধুত্বে আর সে রকম গাঢ়তা অনুভব করে না তিষ্য। বাঁধন যেন শিথিল হয়ে গেছে। উপরন্তু আজ উৎসবের দিনে অনেক প্রমোদ।—'তিস্‌স্‌ আমরা নদীতীর থেকে একটু ঘুরে আসছি'— এই বলে তারা চলে গেল। তিষ্য ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে সরযূর বিপরীত দিকে তার ছোট বেলাকার অঙ্কধাত্রীর বাড়ি এসে পৌঁছল। ডাকল, 'ধাই মা !'

প্রৌঢ়া বেরিয়ে এসে তিষ্যকে দেখে বড় প্রীত হল। রাজপরিবারের শিশুরা বহু প্রকার ধাত্রীর কোলে কোলে মানুষ হয়। তিষ্যর ছিল তিনজন ধাইমা। তার এই অঙ্কধাত্রী-ই ছিলেন তার দুধ-মা। আর ছিল একজন মণ্ডনধাত্রী, সে খুব সম্ভবত একটি মধ্যবয়স্কা বারবিলাসিনী। এবং একজন ক্রীড়াপনিক ধাত্রী। কিন্তু দুধ-মাকে সে বড় ভালোবাসত। ইনি ছিলেন নাতি কৃষ্ণা, নাতি গৌরী। বক্ষের দুগ্ধধারা কবোষ্ণ। তার মুখগহ্বর মিষ্ট জীবনরসে ভরে যেত। ধাইমার স্তন দুটিও ছিল দৃঢ়, অতি উচ্চ নয়। স্তন ঝুলে পড়ে তার নাক চেপ্টে যাচ্ছিল বলে একটি ধাত্রীকে আগেই বিদায় দেওয়া হয়েছিল। এই ধাইমার সুকোমল, সুপৃথুল কোলে শুয়ে সে মধুভাণ্ডের মতো এঁর সুবর্তুল স্থূল বোঁটাযুক্ত স্তনটি ধরত। কত আদর করে ধাই-মা তাকে কোলে বসিয়ে পা দুটি দুদিকে ঝুলিয়ে দিয়ে, তার হাত পা ধীরে ধীরে তৈলমর্দন করে সুগঠন, বলশালী করবার চেষ্টা করতেন। সেই দৃঢ় কোমল স্পর্শ এখনও সে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে অনুভব করে। মণ্ডনধাত্রীটি তাকে খুব করে সাজাত। গ্রীষ্মকালে কার্পাসিক, অল্প শীতে ক্ষৌম এবং অধিক শীত পড়লে পশমী বস্ত্র পরাত। রেশমের খুব সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ তৈরি করে দিত ধাইটি। মুক্তা স্বহস্তে গেঁথে তার গলার মালা প্রস্তুত করত। কিন্তু কেন যেন এই ধাইটিকে তার ভালো লাগত না। এই ধাইটি তিষ্যর শিশু বয়সেই তার সুকুমার পুরুষাঙ্গটি নিয়ে নানান কৌতুক করত, পুরললনারা হেসে অস্থির হয়ে যেত।

—দ্যাখো, দ্যাখো ঠিক অশ্বের মতো দীর্ঘ লিঙ্গটি হয়েছে খোকার। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে যা হবে না !

এখনও মনে আছে তিষ্যর। ধাত্রীটি তার জননাঙ্গ নিয়ে খেলা করতেও ছাড়ত না। ক্রীড়াপনিক ধাত্রীটি কিন্তু ছিল শান্তস্বভাব। শিশুর সঙ্গে খেলা করবার জন্য যে দৈহিক শক্তি ও উৎসাহ প্রয়োজন তা যেন তার কিছু অল্প ছিল। মাঝে মাঝেই উন্মনা হয়ে যেত। কন্দুক দিয়ে তাকে প্রহার করত তিষ্য। ক্ষুব্ধ হয়ে সে বলত, 'অরে অরে, দরিদ্র বলে কি এমন করে প্রহার করতে হয় ? বালক হলে হয় কি। ধনী ঘরের বড় ছোট সবাই দেখি সমান !' তারপর সে কাঁদতে আরম্ভ করত।

তিষ্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলত, 'তা, তুই আমার সঙ্গে খেলা করছিস না কেন ?'

শ্যামা নামে সেই মেয়েটি বলত, 'মাতার মৃত্যুর পর পিতা আমাকে তোমাদের বাড়িতে বিক্রি করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে দূরদেশে চলে গেলেন। আমার কি তোমার সঙ্গে কন্দুক খেলতে মন লাগে! কোথায় গেল আমার সুপন্ন। সে কথা দিয়েছিল আমাকে বিবাহ করবে। বচ্চ, আমি খালি এইসব কথাই ভাবি।'

—সুপন্ন কে ?

—সে একটি অতি মনোহর যুবক। আমার মনপ্রাণ হরণ করেছিল।

—আমার চেয়েও মনোহর ? এমনি পীত দুকূলের বস্ত্র তার আছে ? এমনি ময়ূর পালক দেওয়া শিরোভূষণ ?

বিষণ্ণ হাসি হাসত শ্যামা, 'না বচ্চ, পীত রেশমও তার ছিল না, মুকুটও তার ছিল না, তোমার মতো এমন শ্বেতপদ্মের মতো গাত্রবর্ণই বা সে কোথায় পাবে! কিন্তু আমার কাছে সে ছিল সবার থেকে মনোহর।'

তিষ্য বর্তমানে ফিরে এলো। ধাইমা ডাকছে। হাতে মৃৎপাত্রে কী সব ভোজ্য। তিষ্য বলল, 'ধাইমা, সূতককে একটু বলবে মন্দ্রাকে এখুনি নিয়ে আসবে।'

এই সূতক তিষ্যর সমবয়সী। ধাইমার বৎস। এরই প্রাপ্য দুগ্ধধনে ভাগ বসিয়ে বড় হয়েছে তিষ্য। সে তাদের অশ্বরক্ষক, তিষ্যর প্রিয় অশ্বী মন্দ্রা সূতকের তত্ত্বাবধানেই থাকে।

—নিশ্চয়ই বচ্চ, এই যে বলি।

কুটিরের নিচু ছাদ এক হাতে ধরে বেরিয়ে এলো সূতক। সে উৎসবের নতুন পোশাকে সজ্জিত। নববধূর সঙ্গে নদীতীরে যাবার আয়োজন করছিল। প্রভুপুত্রের ডাকে সে বেরিয়ে এসে তিষ্যদের অশ্বশালার দিকে দৌড়ল।

তিষ্য কুটিরসংলগ্ন মৃৎবেদীর ওপর বসে পড়ল। ধাইমা তার পাশে পাত্রটি নামিয়ে রেখেছে, হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ধাইমা, সেই শ্যামাকে মনে আছে? আমাকে খেলা দিত?'

ধাইমা বলল, 'সামা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সামাকে মনে আছে বই কি।'

—তার সংবাদ কী ?

ভ্রূ কুঁচকে ধাই-মা কিছুক্ষণ মনে করবার চেষ্টা করে বলল, 'সামা তো তোমার পিতার কাছ থেকে মুক্তি ক্রয় করে সাকেত ছেড়ে চলে যায়।'

তিষ্য উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তবে কি সে সুপন্নর দেখা পেয়েছিল?'

—সুপন্ন ? কে সুপন্ন ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ধাইমা।

নিশ্বাস ফেলে তিষ্য উঠে দাঁড়াল। অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মন্দ্রা আসছে। মন্দ্রা। তার নাসা স্ফুরিত হচ্ছে, পিঙ্গল ও সাদা রোমগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। সে বুঝতে পেরেছে তিষ্য, তিষ্য তাকে ডাকছে। সে দ্রুত কুটিরাঙ্গন পার হয়ে গেল, ধাইমা জল আনতে ভেতরে গিয়েছিল। তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তিট্‌ঠ কুমার তিট্‌ঠ। তোমার জন্য ক্ষীরমণ্ড পাকিয়ে এনেছি। উৎসবের দিনে একটু মুখে করো।'

'তিট্‌ঠ'টুকু শুধু শুনেছিল তিষ্য। অল্প সময়ের ব্যবধানে আজ দুবার তাকে কথাটা শুনতে হল। কিন্তু সে থামবে না। সে মন্দ্রার পিঠে লাফিয়ে চড়ল। তার পেটের ওপর দুদিক থেকে সামান্য পায়ের আঘাত হানল, মন্দ্রা হাওয়ার বেগে ছুটে চলল।

সরযূতীর ছাড়িয়ে সে চলে এসেছে অনেক দূর। ছোট একটি টিলা। আশেপাশে বট, অশথ, শিংশপা কতকগুলি। বিস্তীর্ণ সব ক্ষেত। টিলায় পিঠ দিয়ে, অর্থাৎ সরযূর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসল তিষ্য। জ্বালাময় ক্রোধ নয় আর, কেমন একটা গভীর বিষাদ তার হৃদয়ে। কর্ষণোন্মুখ এই বিশাল সবুজ শস্যক্ষেত্র এই উদার আকাশ তার চোখ ছুঁয়ে যাচ্ছে, সে অনুভব করছে না। মুখে তিক্ত স্বাদ। সে টিলায় হেলান দিয়ে দূরের দিকে চোখ প্রসারিত করে দিল। কিছুক্ষণ পর চোখ বুজিয়ে ফেলল। স্বপ্ন নেই, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, এক ধরনের নির্বেদ।

—বৎস, বৎস—প্রৌঢ় গলার উৎকণ্ঠ ডাকে চোখ মেলল তিষ্য। সামনে দুই ব্রাহ্মণ। একজনের মাথা শুভ্র। আর একজনের শুক্ল কেশের সঙ্গে কিছু কৃষ্ণেরও মিশ্রণ আছে।

—বৎস, তুমি কি সাকেতবাসী ?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল তিষ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আজ কি সেখানে হলকর্ষণোৎসব ?

—হ্যাঁ।

—জানো কি নদীতীরে কুমারী-সমাবেশ হয় কি না ?

—হয়। তিক্ত স্বরে বলল তিষ্য।

— পৌঁছতে পারবো সময় মতো ?

—আপনাদের ভাগ্য ! বিরস মুখে চোখ বুজিয়ে ফেলল তিষ্য।

ব্রাহ্মণদ্বয় বুঝলেন এ যুবকের কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু জানা যাবে না। তাঁরা ফিরতে উদ্যত হলেন।

হঠাৎ তিষ্যর চোখ দুটি খুলে গেল, 'আপনাদের কি অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন ?'

—হ্যাঁ বৎস, অতিশয়।

—ঘোড়ায় চড়তে পারেন ? তিষ্যর মুখে সামান্য হাসি।

দুজনের মধ্যে যিনি অল্পবয়স্ক, তিনি বললেন, 'যৌবনে চড়েছি। চেষ্টা করলে পারি বোধ হয়।'

—এই অশ্বী অতি সুশীলা, এর পিঠে চড়ে সোজা ওইদিকে চলে যান। সে দিক নির্দেশ করল।

—অশ্বটি কী করবো ?

—ছেড়ে দেবেন কার্যশেষে। ও ঠিক ওর মন্দুরায় ফিরে যাবে।

ব্রাহ্মণেরা দু হাত তুলে স্বস্তিবাচন করলেন। অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ সহজেই মন্দ্রার পিঠে উঠে গেলেন। দ্বিতীয় জনকে উঠতে সাহায্য করল তিষ্য। অদূরে একটি শিবিকা। সেটিকে সরযূতীরে আসবার নির্দেশ দিলেন ব্রাহ্মণরা, তারপর মন্দ্রা তাঁদের নিয়ে ছুটে চলে গেল। তিষ্য আবার চোখ বুজল।

তিষ্য সাকেতের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার। তার পিতা উগ্রসেনের দুই রানি। জ্যেষ্ঠা শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় উগ্রসেন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তার দুই জ্যেষ্ঠার মধ্যে একজনের বিবাহ হয়েছে শ্রাবস্তীতে। এক রাজপরিবারে। আর একজনের বৈশালী থেকে কিছু দূরে ভোগনগরে। সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে। বড়রানির দুটি মেয়ে এবং তার নিজের মা ছোটরানির একটি ছেলে শিশুকালেই মারা গেছে। তিষ্যর বাকি দুটি ভাই তার থেকে ছোট। কেউই তার মতো গুণবান নয়, বলেন পিতা। তাঁর ইচ্ছা সে এখন থেকে সাকেতে থেকেই রাজৈশ্বর্য ভোগ করুক। শিখে নিক জনপদ শাসনের খুঁটিনাটি। মাণ্ডলিক রাজা হিসেবে একশটি গ্রামের শাসনকার্য দেখতে হয় উগ্রসেনকে। গ্রামিকরা বছরে তিনবার তাঁর সভায় সমবেত হন। তা ছাড়াও, কোনও সমস্যা উপস্থিত হলে পিতাকে তার সমাধান করতে হয়। কিন্তু এই রাজস্ব আদায়, বছরে তিনবার শস্যের ষষ্ঠ ভাগ এবং বণিকদের পণ্যের দশম ভাগ রাজভাণ্ডারে পাঠানো, চৌর এবং দস্যুদমন, এই ধরনের বাঁধা কাজে মন লাগে না তিষ্যর, এটুকু কাজ কি আর তার মধ্যম বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা করতে পারবে না ? সে সাকেতের এই গণ্ডি থেকে, এমন কি শ্রাবস্তীর গণ্ডি থেকেও মুক্ত হতে চায়। তক্ষশিলা থেকে যাওয়াআসার পথে সে দেখেছে কত জনপদ, কত নগরী—মিথিলা, মথুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ, মদ্রদেশ, যতই উত্তরে যাও ভাষা আরও সুছন্দ, সুচারু। মানুষগুলির দৈর্ঘ্য উচ্চ, নাক মুখ চোখ অতি স্পষ্ট, নীলাভ কৃষ্ণ চোখের মণি, অনেক সময়ে নীলাভ কেশ, স্বর্ণাভ কেশ। কিন্তু তাদের পূজা, যজ্ঞ, নিয়মপালনবিধি অতি বিশদ এবং দুরূহও বটে। বিশেষ রকমে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সাহায্য ছাড়া তারা ধর্মাচরণ করতেই পারে না। তিষ্যর আকৃতিতে খানিকটা পশ্চিমদেশের ছাপ আছে। নইলে ওরা মধ্যদেশ ও প্রাচীর মানুষদের ব্রাত্য বলে অবজ্ঞার চোখে দেখে। দক্ষিণে মথুরার পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে নিবিড় অরণ্য। তার ওপারে বিন্ধ্য পর্বতমালা। ওই পর্বতের ওপারে কী ? গুরুগৃহে শুনেছে হিংস্র শ্বাপদে পূর্ণ অরণ্য এবং পর্বত যদি-বা পার হওয়া যায়, অসভ্য বর্বর জাতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন, আছে যক্ষ, রক্ষ নাগ, বানর প্রভৃতি বহু জাতি। উপরন্তু দক্ষিণদেশের মাটি শিলাময় ও মরুভূমিসদৃশ। সেখানে সহজে শস্য জন্মায় না।

কেন কে জানে তিষ্যকে টানে এইসব অজানা দেশ, অদেখা জাতি। তার মনে হয় কিছু অনুরূপ সঙ্গী পেলে সে বিন্ধ্য পার হয়ে দক্ষিণদেশে চলে যেত, বাহুবলে জয় করে নিত যক্ষ-রক্ষদের। রাজা

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত তাদের, এমন মাণ্ডলিক রাজা বা রাজন্য নয়। সত্যিকারের রাজা। কেমন করে সুশাসন করতে হয় দেখিয়ে দিত। এই উত্তরাখণ্ডে বড় বেশি সন্ন্যাসীর উপদ্রব। যখন তখন, যে সে হয় আজীবক, নয় তীর্থিক— একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থঘরের পুরুষ, এমন কি রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়রাও। উত্তরাখণ্ডের শেষ লক্ষ্য যেন অরণ্যবাস। সন্ন্যাস। যে তা করতে পারে সে বন্দনীয়। বাকিরা পারল না বলে যেন কোথায় একটা হীনম্মন্যতা বোধ করে। আজীবক, তীর্থিকদের সেবা করে নিজেদের হীনতা স্খালন করতে চায়। দক্ষিণে গিয়ে সে রাজ্য স্থাপন করবে। আদর্শ নগর, সম্পন্ন গ্রাম, তক্ষশিলার মতো শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করবে বহু। এবং এ সমস্ত করতেই তার সাহায্য লাগবে একজন বুদ্ধিমতী, সাহসী, প্রেরণাদায়িনী রানির।

এই পর্যন্ত চিন্তা করে তিষ্যর মন অবসাদে ভরে গেল। রমণীর মন আজ পর্যন্ত কে-ই বা বুঝতে পেরেছে! পাওয়া তো দূরের কথা। সে কি এই তিন বছর বিশাখা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল না? সমগ্র সাকেত নগরীতে আর কে আছে তার মতো সুপুরুষ, উপায়কুশল? তিন বেদ, শিক্ষা, কল্প, দর্শন, দণ্ডনীতি, ধনুর্বেদ, আঠারোটি শিক্ষণীয় বিষয়ের অনেকগুলিই তো আয়ত্ত করেছে সে। উপরন্তু এমন অমিশ্র আর্যবংশ, বন্ধুল মল্লর কাছে শস্ত্র শিক্ষা। ধনঞ্জয়-কন্যা যদি তার পাশে থাকত তাহলে দক্ষিণদেশে বর্বরদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে চক্রবর্তী রাজা হওয়া তার পক্ষে খুব কঠিন হত না বোধ হয়। শ্বশুর একজন মহাধনবান শ্রেষ্ঠী, তাঁর অর্থবল হত তার পৃষ্ঠবল। কিন্তু এ সবই বাহ্য। আসল হল বিশাখা। বিশাখার প্রণয়। কাশ্মীরে, গান্ধারে, মদ্রদেশে বহু সুন্দরী দেখেছে সে। পারস্য দেশের কিছু কিছু রাজকুমার কাশ্মীরে বসবাস করেন, তাঁদের বংশের সুন্দরীরা দেবকন্যার মতো। কিন্তু বিশাখা অন্য রকম। তার সৌন্দর্যের সঙ্গে লাবণ্য, গাম্ভীর্যের সঙ্গে চাপল্য, বুদ্ধির সঙ্গে সারল্য, আভিজাত্যের সঙ্গে করুণা এমন আশ্চর্যভাবে মিশেছে! যে বিশাখা বালিকাবয়স থেকে গাভী, রোগগ্রস্ত কুকুর বিড়াল ও অশ্বদের পরিচর্যা নিয়ে দিনের এক চতুর্থাংশ সময় কাটায়, গুরুজনদের অভিবাদন করে রাজকুমারীর মতো, সমবয়স্কদের পরামর্শ দেয় মন্ত্রীর মতো, ভিক্ষুক আর শিশুদের প্রতি যার স্নেহ সারা সাকেতে সুবিদিত, সে তার প্রণয়প্রার্থী, উচ্চবংশীয় উচ্চশিক্ষিত ক্ষত্রিয়কুমারকে এইভাবে অপমানিত করল? এ কাজ কি বিশাখার যোগ্য হল?

কিন্তু কোন বিশাখা? বিশাখা নামে একটি অলৌকিক মানসপ্রতিমা গড়ে তার পূজা করছে না কি তিষ্য? দৈহিক রূপ মানুষকে বড় প্রতারিত করে, দেবশ্রীসম্পন্ন হলেই কি মানুষ দেবস্বভাব হয়? তক্ষশিলায় কত দেশ থেকে কত যুবক আসে। বেশির ভাগই অতি সুপুরুষ। কিন্তু তাদের কীর্তি স্মরণ করে এখনও শিউরে ওঠে তিষ্য। বারাণসী থেকে এক ব্রাহ্মণকুমার গিয়েছিল গুরু কাশ্যপের কাছে। অতি অল্প সময়েই দেখা গেল সে তার সতীর্থদের সব বিষয়ে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কাশ্যপের শিষ্যরা এমন ঈর্ষাকাতর হল যে, ষড়যন্ত্র করে গুরুর মনে ধারণা জন্মিয়ে দিল যে, ওই ব্রাহ্মণকুমার কনিষ্ঠ গুরুপত্নীর প্রতি আসক্ত এবং উভয়ে ব্যভিচারে মত্ত। কাশ্যপ এতদিনের প্রিয় প্রতিভাবান ছাত্রটির সম্পর্কে একটু অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন বোধ করলেন না। একটুও অনুকম্পা দেখালেন না। সোজা তাড়িয়ে দিলেন। অথচ ওই ব্রাহ্মণকুমার দিবাভাগে গুরুসেবা করে রাত্রে বিদ্যাশিক্ষা করত। পুণ্য শিষ্য ছিল তো! গুরুদক্ষিণার সহস্র কার্ষাপণ দিতে পারেনি। তার পরিবর্তে সেবা দিত। তার সৎ চরিত্র, দীনতা, বিনয় লক্ষ্য করবার মতো। বিশাখা কেমন? কাশ্যপের অভিজাতবংশীয় ধনগর্বী সুপুরুষ শিষ্যগুলির মতো নিষ্ঠুর? বোধশূন্য? সহানুভূতিশূন্য? রূপ, খ্যাতি আর তিন বছর আগেকার বুদ্ধিমন্ত কথাবার্তার স্মৃতি দিয়েই কি তাকে বিচার করা চলে?

হঠাৎ তিষ্যর একটা কথা মনে হল। ব্রাহ্মণেরা কুমারী সমাবেশের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন কেন? উভয়েই বিবাহের বয়স পার হয়েছেন, পুরুষের অবশ্য বিবাহ যে-কোনও বয়সেই চলে, কিন্তু এই বয়সে ভার্যা গ্রহণের ইচ্ছা হলে, সে প্রথম বারই হোক, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারই হোক সাকেতের কুমারী সমাবেশের জন্য এত ব্যাকুলতা কেন? ব্রাহ্মণগুলির আকৃতিও তো বেশ সৌম্য। কুমারীলোলুপ বটুদের মতো যেন ঠিক নয়। আরে! তিষ্য আবার নিজেকে তিরস্কার করল। আকৃতিতে কী এসে যায়! প্রকৃতি কেমন? বাইরের রূপ দেখে তা বোঝা অসম্ভব। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তিনজন। শিবিকায় এসেছেন। ত্বরা আছে। কিছু ক্লান্ত ও উৎকণ্ঠিতও মনে হল। তিষ্যর মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌতূহলের সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু একখণ্ড বিরাট মেঘ ভেসে আসছে। সহসা তীব্র ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হল।

৩

দীপে অগ্নিসংযোগ করলেন চণক। অন্ধকার এত গাঢ় যে, কুটিরের কোণগুলিও আলোকিত হল না। তৈলও সম্ভবত অল্প হয়ে এসেছে। চণকের চোখে ধন্ধ। দীর্ঘকায় আগন্তুক তাঁরই মতো মাথা নিচু করে কুটিরে ঢুকছেন। মাথায় উষ্ণীষ। দীর্ঘ অঙ্গচ্ছদ। সম্পূর্ণ শব্দহীন পাদুকা। আগন্তুককে চিনতে পারছেন না চণক। তাঁর কটিবস্ত্রে একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা লুকানো আছে। ছুরির বাঁটে হাত রেখে চণক নম্র সুরে বললেন, 'মাটির পীঠিকা ছাড়া এই কুটিরে ভদ্রকে বসতে দেবার মতো তো কিছু নেই। দয়া করে বসুন। রাত্রি গভীর, মধ্যযাম উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সম্ভবত। এই নিশীথে, অরণ্যে, একাকী সন্ন্যাসী আপনার কী কাজে লাগতে পারে ভদ্র?'

'একাকী সন্ন্যাসী?' মৃদু, প্রায় নারীসুলভ সরু গলায় আগন্তুক বলল। তার কণ্ঠস্বরে শ্লেষ গোপন নেই, 'সন্ন্যাসীই বটে! তোমার ছদ্মবেশ ভেদ করতে মগধের গূঢ়পুরুষের প্রয়োজন হয় না, যে কোনও বুদ্ধিমান নাগরিক তোমার জটাটি এইভাবে উল্টে দিতে পারে', তরোয়ালের প্রান্ত দিয়ে আগন্তুক চণকের জটাটি ফেলে দিল। আজকে এই দ্বিতীয়বার। তার পরে বলল, 'সুভদ্র, অনঘ আর সম্পাতি কোথায় গেল? দৌত্য কর্ম করতে এসে হীন চরের মতো ব্যবহার করছ কেন? ওদের তিনজনকে কি হত্যা করেছ?' শেষের শব্দগুলি বলবার সময়ে আগন্তুকের কণ্ঠস্বর সহসা বদলে গিয়ে কর্কশ, কঙ্করময় বোধ হল।

চণক সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করলেন। সমগ্র তক্ষশিলায় এই একটি মাত্রই রাজপুরুষ, একটি মাত্রই ব্যক্তি আছেন, যিনি কণ্ঠস্বর ইচ্ছামতো বদলাতে পারেন। তিনি হেসে বললেন, 'স্বয়ং মহাচরাধিচর হয়ে চরবৃত্তিকে হীন বলছেন মহামাত্র দর্ভসেন?'

—বলছি। যে চর নিজের কার্য উদ্ধার করার প্রাথমিক উপায়গুলি সম্পর্কে এমন অসাবধান, যার ছদ্মবেশ এত অসম্পূর্ণ, উপরন্তু যাকে চর নিযুক্ত করা হয়নি, সেই স্ব-নিযুক্ত চরকে হীন বলব না তো কী! জানো কি, তোমার পৃষ্ঠদেশে স্বাভাবিক গাত্রবর্ণ স্পষ্ট বোঝা যায়! বয়স্ক মুখের সঙ্গে যুবাপুরুষের হাত-পা নিয়ে তুমি একটি অতি হাস্যকর মর্কটের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি সেই শশকের মতো যে দেহের সম্মুখভাগ বিবরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে মনে করে সে বুঝি নিজেকে অদৃশ্য করতে পেরেছে এবং শৃগাল বা তরক্ষু যার পশ্চাদ্‌ভাগ কামড়ে ধরে অনায়াসেই তার সায়মাশটি সমাধা করতে পারে। উপরন্তু তুমি অপরের ছদ্মবেশ ভেদ করতে পার না।

চণক মুখ তুলে বললেন, 'ও আপনিই! মাগধ গূঢ়পুরুষ তবে আপনিই সেজেছিলেন?'

—মূর্খ! শুধু মূর্খ নয়, হস্তিমূর্খ! মাগধ চর মগধেরই চর। তুমি যে ধরা পড়েছ তাতে কোনও সংশয়ই নেই। বহু কষ্টে সেই জন্যেই এই মধ্যরাত্রিতে অরণ্য ভেদ করে এই হস্তিমূর্খের সন্দর্শনে আসতে হয়েছে আমাকে। বলি, কোনও ব্যক্তি কি তোমাকে নগরীর উপান্তে যষ্টিবনে পৌঁছে দেয়নি?

—ওহ্, সেই সম্ভ্রান্ত পুরুষই তবে আপনি? আমি ভেবেছিলাম সেও আর একটি মাগধ চর। সময়মতো উপস্থিত হতে পারব না বলে প্রথম চরের নির্দেশে এসেছে।

—মগধের শাসনযন্ত্রের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা তো আকাশ চুম্বন করছে দেখছি। তোমাকে সময়মতো পৌঁছে দিতে মাগধের কী দায়!

—আমার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া তো তার প্রয়োজন…।

অসহিষ্ণু হয়ে দর্ভসেন বললেন, 'পূর্ণ পরিচয়ই বটে! মাগধ চেয়েছিল তুমি সন্ধ্যা পার করে ওই উদ্যানে প্রবেশ কর। তাহলে হত্যাটা সহজ হত।

—হত্যা?

—হ্যাঁ নির্বোধ, হত্যা। শিবিকায় আমি সত্বর পৌঁছে না দিলে, ঘনপত্র বৃক্ষের অন্তরালে সঙ্গীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে সশস্ত্রভাবে ঘোরাফেরা না করলে, তোমাকে নিহত হতে হত।

মগধের চর কিভাবে তাকে সরোবরে মুখ ধুতে জোর করছিল মনে পড়ে একটু হাসলেন চণক, বললেন, 'আমাকে নিহত করা অত সহজ নয়। যাই হোক, হত্যা করে লাভ ?'

—লাভের কথা তো তুমিই ব্রাত্যটার সঙ্গে আলোচনা করছিলে। পুরস্কার! নিহত ব্যক্তিকে পরিষ্কৃত করলেই তাকে বিদেশি বলে স্পষ্ট চেনা যেত। ছদ্মবেশী বিদেশি, চর ছাড়া কী ? ওই মাগধ বহু কার্ষাপণ পুরস্কার পেত। কিন্তু এ সব কথা থাক। এখন আসল কথায় এসো। সুভদ্র, সম্পাতি, অনঘকে কীভাবে হত্যা করলে ? কেনই বা ?

চণকের চোখ দুটি হঠাৎ জ্বলে উঠল, তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে বললেন, 'আর্য দর্ভসেন, আপনি অনেকক্ষণ থেকেই আমাকে মূর্খ, হস্তিমূর্খ, মর্কট অনেক কিছু বলে যাচ্ছেন। সবই সহ্য করেছি। কিন্তু বিনা প্রমাণে, বিনা কারণে সহসা আমাকে হত্যাকারী বলে ধরে নেওয়াটা সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার আচার-আচরণে কি আমাকে হন্তা, এমন কি কোন রূপেই কোনও অপরাধী বলে মনে হয় ?'

দর্ভসেনের মুখে হাসি খেলে গেল, বললেন, 'তোমার জেনে রাখা ভাল চণক, কাউকে উত্তেজিত করে দিলে তার মুখ থেকে সত্য কথাটা শীঘ্র বেরিয়ে আসে। অপেক্ষা করছি। তোমার কী বলবার আছে বল!'

—সম্পাতিকে পাঠিয়েছি বৈশালী। সুভদ্র ও অনঘকে শ্রাবস্তীতে। প্রতি দিনই তাদের আগমন প্রত্যাশা করছি।

বিস্মিত দর্ভসেন বললেন, 'কেন ?'

—পথে আসতে আসতে ছদ্মবেশ ধারণ করবার নির্দেশ স্বয়ং মহারাজ পুষ্করদেবই দিয়েছিলেন, আপনি জানেন না কেন বুঝতে পারছি না। জনপদ থেকে জনপদান্তর যেতে যেতে আমরা বহু প্রকার কথা শুনেছি। চার জনে অবশেষে পরামর্শ করি গ্রীষ্ম পার হবে, তার পরেও বর্ষার তিন-চার মাস সময় আছে। ইতিমধ্যে এই মধ্যদেশ সম্পর্কে যথাসাধ্য জেনে নেওয়া ভালো। আপনি কি জানেন, মগধরাজের রাজবৈদ্য তরুণ জীবক এখন উজ্জয়িনীতে! প্রদ্যোত মহাসেনের কামলা রোগ হয়েছে। নিরাময়ের জন্য জীবক মহোদয়ের ডাক পড়েছে। এতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যেখানে সেখানে কি আপনি আশা করেন মগধরাজ তাঁর মিত্র অবন্তীরাজের বিরুদ্ধে গান্ধারকে সাহায্য করবেন ?

দর্ভসেন চিন্তিত মুখে চুপ করে ছিলেন, বললেন, 'সমস্যা বটে! কিন্তু তোমার কাজ ছিল মগধরাজের কাছে আমাদের গান্ধারের দৌত্য নিয়ে যাওয়া, তারপর তিনি যা করবেন, আমাদের সেটাই মেনে নিতে হবে।'

চণক বললেন, 'এ ছাড়াও আমাদের মনে রাখতে হবে রাজা বিম্বিসারের অগ্রমহিষী তো মদ্রদেশীয়! সাগলের সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও বিবাদ নেই ঠিকই। কিন্তু তার পাশাপাশি পাণ্ডবরা এখন মহারাজ পুষ্করদেবের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখছে না।...আর এইসব কারণেই আমি সব দিক বিবেচনা করে শ্রাবস্তী ও বৈশালীতে আমার সহকর্মিদের পাঠিয়েছি। সেখানে বাতাবরণ কী, সাহায্য পাওয়া যাবে কি না, তারা পর্যবেক্ষণ করে আসুক। তারপর ফলাফল যাই হোক, আমরা দৌত্য করব।'

এই সময়ে অরণ্যে ঝিল্লির ঝংকার এমন সশব্দ হয়ে উঠল যেন খুব কাছেই কোথাও শত শত নর্তকী নূপুর বাজিয়ে নাচছে। দর্ভসেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি যেন আত্মগতভাবে বললেন, 'কি জানি চণক, কাজটা হয়ত তুমি ভালই করেছ। তোমার শিক্ষার উপযুক্ত। সত্যিই, তুমি তো শুধু একজন যে- কোনও রাজপুরুষ নও, যে রাজার সন্দেশটুকু মাত্র বয়ে নিয়ে আসবে। তুমি দণ্ডনীতির পাঠ নিয়েছ বড় বড় পণ্ডিতের কাছে ...সাধারণ রাজদূত শুধু সুদর্শন, শিষ্টাচারী, সুস্মিত, অক্রোধী এবং বাগ্মী হলেই চলে। এরূপ রাজপুরুষ অনেক পাওয়া যাবে গান্ধারে। কিন্তু তুমি... তোমাকে... আচ্ছা... চণক তুমি কি মগধরাজের ছিদ্র অন্বেষণ করছ ? কিছু পেয়েছ বা শীঘ্র পাবে ? সুন্দরী ললনা চাই ? রাজার কি মণিমুক্তার প্রতি দুর্বলতা আছে ? সুবর্ণ উপহার দিয়ে কিছু করা যাবে ? এই বিম্বিসার যদি গান্ধাররাজকে সাহায্য না করেন তাহলে অবন্তীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই চণ্ড মহাসেন যে অচিরে গান্ধার ছারখার করে দেবে !'

এ কথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে চণক বললেন, 'ভাল কথা মহামাত্র, আপনি কীভাবে এখানে এসে পৌঁছলেন জানতে পারি কী ? আমার ধারণা ছিল এই দৌত্যকর্মের দায়িত্ব মহারাজ শুধু আমার হাতেই দিয়েছেন। সুভদ্র, সম্পাতি এবং অনঘ যদিও আমার সতীর্থ, তবু আমার অধীনেই। আমিই ওদের চেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু…মহারাজ যে আপনাকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছেন, এ ধারণা তো আমার ছিল না !'

দর্ভসেন রহস্যময় মৃদু হাস্য করে বললেন, 'চণক, রাজকার্যের জটিলতার মধ্যে তুমি সবে মাত্রই প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছ সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রনীতির গূঢ় নিয়মগুলি যে তুমি একেবারে জানো না, তা তো নয় !'

চণক মাটিতে কতকগুলি অক্ষর আঁকছিলেন একটি শলাকার অগ্রভাগ দিয়ে, কতকগুলি অক্ষর, কিছু অবয়ব। তিনি প্রায় স্বগতোক্তি করলেন, 'তাহলে মহারাজ পুষ্করদেব আমাকে বিশ্বাস করেন না ? আমার পর্যবেক্ষণশক্তিতে বা দৌত্য বিষয়ে যোগ্যতায় তাঁর আস্থা নেই !'

দর্ভসেন তাড়াতাড়ি বললেন, 'এমন কথা বলো না চণক। এ তো রাজকার্যের গতানুগতিক নীতিই ! বিশেষ, তুমি বয়সে ও অভিজ্ঞতায় নবীন, যদিও বুদ্ধি ও শিক্ষায় অবশ্যই প্রাজ্ঞ !'

চণক হঠাৎ মুখ তুলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, 'আর্য কি এখানেই শয়ন করবেন ? আমি তাহলে কিলিঞ্জক বিছিয়ে দিই !'

—এত রাত্রে আর কোথায় যাব ? তুমি অনর্থক এত কৃচ্ছ্রসাধন করছ চণক।

মহামাত্রের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে দীপটি নিবিয়ে দিলেন চণক। মহামাত্র শয়নমাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়েছেন। মৃদুস্বরে তাঁর নাক ডাকছে। চণক জানেন এই নিদ্রা অতি সতর্ক নিদ্রা। সামান্যতম শব্দে টুটে যাবে। মহামাত্রের মুঠি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে পাশে রাখা তরোয়ালের দিকে। কুশলী ! অতি কুশলী ! যা শিখে এসেছেন, এতকাল ধরে যা যা চলে আসছে, সবই নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারেন এঁরা। তার থেকে এতটুকু সরলে, এতটুকু কল্পনাশক্তির ব্যবহার করলে এঁরা বিচলিত হয়ে পড়েন। বুঝি সব গেল, শাস্ত্র, রাজ্য, সংস্কার, দেশ, সব ভেঙেচুরে গেল। চণক ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, না এঁদের সঙ্গে তাঁর মিলবে না। তিনি পরিকল্পনায় বিশ্বাসী। প্রকল্পনা। প্রকৃষ্ট কল্পনা। তিনি স্বপ্ন দেখেন। কোনও স্বপ্নকেই অগ্রাহ্য করেন না। কবে কোনকালে রাজা জনক, কি ইক্ষ্বাকু , কি যযাতি কী করেছিলেন। অবশ্যই সেগুলি শ্রোতব্য, বিচার্য, কিন্তু সে সবই ভিত, সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে বহু দূর দেখতে হবে। সু-উচ্চ অট্টালক স্থাপন করতে হবে। না হলে সকলই বৃথা।

তিনি কুটিরের বাইরে চলে এলেন ধীর পদক্ষেপে। এই মধ্যদেশে যাকে নাসিকা কুঞ্চিত করে গান্ধাররা বলে ও-স্থানও তো প্রাচীই, পাপভূমি, কীকট দেশ, এখানে অপেক্ষাকৃত আগেই সূর্যোদয় হয়। যতই পূর্বে যাওয়া যাবে, ততই শীঘ্র সূর্য উঠবে। একটি সূক্ষ্ম গণনা আছে। চণক জানেন আজ সূর্যোদয়ের সময় পাঁচ প্রহরের কিছু আগে। আকাশ আজ পরিষ্কার। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই পদ্মের অভ্যন্তরের মতো একটি মৃদু লাল আভা পূর্বাচল থেকে ধীরে ধীরে গগনমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়বে। বালার্কর চেয়ে এই আভা তাঁকে আকৃষ্ট করে বেশি। তাঁর হৃদয়মণ্ডলেও যেন ছড়িয়ে যায় এই আভা। তিনি এখন কুটির দুয়ারে বসে এই সূর্যোদয়ের পূর্ব লগ্ন দেখবেন অবিকল যেমন ঋষি কুৎস আঙ্গিরস দেখেছিলেন :

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাত
চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।

তিমির বিদীর্ণ করে, সকল জ্যোতির জ্যোতি উষা আসছেন। কুৎস উষা ও রাত্রিকে দুই ভগ্নী রূপে কল্পনা করেছেন। উষা শ্বেতা, রুশতী, আর রাত্রি কৃষ্ণা। উষা অজীগর্ ভুবনানি বিশ্বা…। উষা জাগালেন। জাগাচ্ছেন। জাগিয়ে থাকেন এই বিশ্বভুবন। এই সময়ে কিছু ভাবতে ইচ্ছা করে না। খুব বেশি দুশ্চিন্তা করার মানুষও এমনিতে তিনি নন। এখন তিনি ডুবে আছেন রুশতী উষার আবির্ভাবরসে। নীরন্ধ্রা কৃষ্ণা রাত্রির রূপও তিনি দেখেছেন এই দু মাসে। অরণ্যের মধ্যে রাত্রি যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী নিবিড়, কী নিকষ, তা লোকালয় থেকে কল্পনা করা যায় না। লোকালয়ে মাথার ওপর চন্দ্রাতপ বিছিয়ে থাকে আকাশ। লক্ষ দীপশিখার মতো। কিংবা হরিদ্রাভ, নীলাভ সব হীরের মতো জ্বলে তারকারাজি। অন্ধকার তরল হয়ে যায়। এই অটবীতে যেন রাত্রি সত্যিই উষার অপরা ভগ্নী। একেবারে বিপরীত। সে শব্দময়ী। ঝিল্লিঝঙ্কারে, নিশাচর পাখির ডাকে, মাংসলুব্ধ, তৃষ্ণার্ত পশুদের বিচিত্র দূরাগত আওয়াজে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। জোনাকি জ্বলে। কিন্তু সে শুধুই টিপ টিপ জ্বলা, তাতে কোনও আভা নেই। দেখা যায় না কিছু। কিন্তু সম্পাতি, সুভদ্র, অনঘ সত্যিই ভাবালে! পাটলি গ্রামের কাছে বন্ধুদের নিয়ে গঙ্গা থেকে মধ্যদেশের ভূমিতে অবতরণ করেছিলেন তিনি। নৌকায় সমানে গূঢ় পরামর্শ চলেছে। জীবক কোমারভচ্চর উজ্জয়িনী যাবার জনশ্রুতি গঙ্গাপথেই শোনা গিয়েছিল। কত পণ্য বোঝাই তরী যে পশ্চিম থেকে পূর্বে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভেসে যাচ্ছে, আসছে। তাদের অনেকের সঙ্গেই রয়েছে জলনিয়ামক। নদীর স্রোতের সমস্ত গূঢ় কথা জানে। জানে কোথায় কোন গ্রামে, কী জনপদে কেমন আহার্য পাওয়া যাবে, নামা নিরাপদ কিনা, নদীদস্যুদের দৌরাত্ম্য কোন কোন অঞ্চলে। এইসব নৌ-বণিকদের অধিকাংশই ছ মাস সাত মাস কি তারও বেশি গৃহছাড়া, আপনজনের মুখ দেখে না। সেই ক্ষতি হয়ত পূরণ করছে দেশ-দেশান্তরের অভিজ্ঞতা। চোখে দেখা, কানে শোনা। কখনও কৌতুকময়, কখনও কৌতূহলপ্রদ, কখনও ভয়ঙ্করের ধার ঘেঁষেও যায় সেসব কাহিনী।...

—কারে পার করো ভাই, ও পাটনী।

—দেশ জিজ্ঞাসা করি নাই। কথায়বার্তায় মনে হয় তক্ষশিলার স্নাতক। মগধ যায়।

—তুমি কারে নিয়া যাও ?

—আর কইও না। বহু লক্ষ পণের বারাণসী লইয়া যায়। চম্পার পথে যমের সদৃশ কুম্ভীর বণিকের নৌকা উল্টায়। পণ্য সব জলে গেছে। বণিক বয়সে তরুণ, মায়ের জমা কাহন-কড়ি নিয়া বার দিয়াছিল। সবার সব থাকে, দুঃখী মানুষটারই সব যায় ভাই, কারে দোষ দিব, কও। মাথার যেন দোষ হচ্ছে, মনে লয়। আপন মনে বিড় বিড়ায়, মাঝি, উহারে ঘরে লইয়া যাই।

—আহা! আহা! যাও ভাই। ভাগ্যে থাকে আবার সকলই হবে।

কেউ কেউ বলল জীবক কোমারভচ্চ আহূত হননি। শ্রেণীক বিম্বিসার নিজেই উদ্যোগ করে পাঠিয়েছেন তরুণ বৈদ্যকে। অতি অল্পসময়ের মধ্যে কোমারভচ্চর খ্যাতি নাকি ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে। রাজা বিম্বিসার এই সুযোগে চণ্ড মহাসেনের চণ্ডতা প্রশমের আশায় আছেন। অর্থাৎ, মগধরাজ নিজেও ওই চণ্ডরাজকে ভয় করেন, তার সখ্য চান যেন তেন প্রকারেণ। একটি ক্ষত্রিয়বংশীয় যোদ্ধাবেশী যাত্রী সকৌতুকে বলছিল, 'কেন, অবন্তীরাজের কি বাসবদত্তা ছাড়া আর সুন্দরী কন্যা নেই ? আর মহারাজ বিম্বিসারেরও কি বীণা কি বংশীবাদন আসে না! না হলে কৌশাম্বীরাজ উদয়নের মতো তিনিও চণ্ডরাজাটার জামাতা হতে পারতেন। সব দিক রক্ষা হত!'

এইসব কথা শুনে চার বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করত নীরবে। এইসব রটনা যদি সত্য হয়, তাহলে তো গান্ধার থেকে এত দূর আসা একপ্রকার বৃথাই হল! অবশেষে পাটলি গ্রামে এক সম্পন্ন গৃহস্থের অতিথিশালায় দু রাত পরামর্শের পর স্থির হল শ্রাবস্তী ও বৈশালী ঘুরে আসা প্রয়োজন। শ্রাবস্তী ও বৈশালী মগধের মিত্ররাজ্য। সেখান থেকে চণ্ড মহাসেনের বিরুদ্ধে সাহায্যের আশা থাকলে হয়ত মগধরাজ গান্ধারের প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। বস্তুত চণ্ডরাজাটি কাউকেই জ্বালাতে ছাড়েন না। নিজের জামাতার সঙ্গেও প্রণয় নেই। এ তো সাধারণ দৌত্যকর্ম নয়! মহামাত্র দর্ভসেন যাই বলুন না কেন! দেব পুষ্করসারী কূটকক্ষে তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, যেভাবে হোক অবন্তীরাজ প্রদ্যোত মহাসেনকে নিরুদ্যম করার ব্যবস্থা করতে হবে, মগধরাজের বন্ধুত্ব চাই-ই চাই। কাজেই চণক প্রচলিত পথ থেকে সরে গিয়ে রাজাজ্ঞার বিরোধী তো কিছু করেননি! তবু কেন দর্ভসেনের আবির্ভাব হল ? মস্তিষ্কের মধ্যে প্রশ্নগুলি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, গণনার উত্তর মিলছে না। চণক তাই বড় বিভ্রান্ত বোধ করছেন। রাজগৃহের যে অতিথিশালায় তাঁর সঙ্গী তিন জনের আসবার কথা, সেখানে তিনি নিত্যই খোঁজ নিয়ে থাকেন। কিন্তু না। কোনও চিহ্ন নেই! অথচ বোঝা যাচ্ছে, তাঁর অজ্ঞাতবাসের দিন ফুরোল। প্রথম কারণ, মগধের চর। দ্বিতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ, দর্ভসেন। আটবিকদের জেগে ওঠবার আগেই, এদিকে তারা আসবার আগেই, তাঁকে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। আটবিকরা থাকে অরণ্যের নিবিড়তর অঞ্চলে। সেখানে বড় বড় বনস্পতি বহুক্ষণ দিনের আলো ঠেকিয়ে রাখে। তারা রাত্রে বহুক্ষণ জেগে জেগে নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদ করে, নিশাচর প্রাণী সব। সকালে তাদের ঘুম ভাঙতে আর একটু বিলম্ব হবে। এই সুযোগে চলে যেতে হবে। সংকল্প স্থির করে তিনি নিকটবর্তী বন্য সরোবর থেকে ভালো করে স্নান করে এলেন, কুটিরে এসে ক্ষুদ্র পেটিকা থেকে পীতবর্ণের অধোবাস বার করে পরলেন। পায়ে গান্ধারদেশীয় পাদুকা। গায়ে শ্বেত উত্তরীয়। কটি থেকে তুলে নিয়ে শুভ্র উপবীত বক্ষে স্থাপন করলেন যথাযথ। তার পর সুবর্ণমণ্ডিত কঙ্কতিকা দিয়ে তাঁর স্বর্ণাভ কৃষ্ণ কেশ আঁচড়ালেন। দর্ভসেন ততক্ষণে উঠে বসেছেন। বললেন, 'ভালো, তুমি তবে প্রস্তুত ?'

চণক বললেন, 'হ্যাঁ। এবার যত শীঘ্র পারি এ স্থান ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। আটবিকরা যে-কোনও সময়ে এখানে এসে পড়তে পারে। এসে আমাদের দেখলে প্রীত হবে না।'

দর্ভসেন মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে বললেন, 'কেন ? তুমি কি আটবিকদের মুখোমুখি হতে ভয় পাও নাকি ?'

চণক গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ওদের তীরে তীক্ষ্ণ বিষ মিশ্রিত থাকে আর্য, দূতকার্য সমাধা না করেই যমসদনে যাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। আপনি ওই সরোবরে চলে যান। ওই যে শিংশপা বৃক্ষ দুটির মাঝখানটায় দেখুন, চকচক করছে ! আমি অপেক্ষা করছি।'

কিছুক্ষণ পরেই দর্ভসেন মুখমণ্ডলের জল উত্তরীয় প্রান্ত দিয়ে মুছতে মুছতে ফিরে এলেন। বললেন, 'চলো। বিষের তীরকে দর্ভসেন ভয় পায় না। কিন্তু কার্যসিদ্ধির পূর্বে অনর্থক গোলমাল, রক্তপাত এসব অশুভ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়াটা ঠিক নয়।'

দুজনে অবিলম্বে বনানীর উত্তর প্রান্তের দিকে চলতে লাগলেন। ক্ষুদ্র মাটির কুটিরের মধ্যে একটি কিলিঞ্জক বিছানো রইল। এক প্রান্তে একটি নির্বাপিত মাটির প্রদীপ। একটি মাটির পাত্রে জলে ভেজানো কিছু সুগন্ধ বন্যকুসুম। এবং কিলিঞ্জকের ঠিক মাঝখানে একটি সুবর্ণমণ্ডিত কঙ্কতিকা। কুটিরের দুয়ার বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে আসবার সময়ে দর্ভসেন বললেন, 'কিছু যেন ফেলে এলে ?'

—কিছু নয়, বলতে বলতে চণক নিমেষে বনভূমির অনেকটা পার হয়ে গেলেন। দর্ভসেন বললেন, 'সহসাই যেন তোমার আচরণে একটা অস্বাভাবিক দ্রুতি এসে গেছে। এতদিন তো এখানেই বাস করছিলে ! বসেই ছিলে ?'

চণকের চোখ ঝলসে উঠল, দর্ভসেন দেখতে পেলেন না। আত্মসংবরণ করে চণক বললেন, 'ছিলাম সন্ন্যাসী বেশে। দুজন সম্ভ্রান্ত আর্যপুরুষকে তাদের বাসস্থানের ত্রিসীমায় দেখতে পেলে আটবিকরা অবশ্যই লক্ষ্যভেদ করবে। শীঘ্র চলে আসুন।'

বন পার হয়ে নগরপ্রান্তে পৌঁছবামাত্র গান্ধারের রক্ষীবাহিনী তাঁদের ঘিরে ধরল। মহামাত্র দর্ভসেনের অশ্ব এবং আরও একটি অশ্ব চণকের জন্য নিয়ে তারা সারারাত অপেক্ষা করছিল। এক লাফে নিজের ঘোড়াটির ওপর চড়ে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন চণক। রক্ষীদের মধ্যে কারও কারও মুখ চেনা। তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় হল। সসম্ভ্রমে প্রশ্নের উত্তর দিল তারা। তাদের অনর্থক শরীর কঠিন এবং মুখের পেশীগুলি স্থির রাখার চেষ্টা দেখতে দেখতে চণকের মনে হচ্ছিল, তিনি কি এই দু মাসে একটু বুনো হয়ে গেছেন ! নিজেকে যেন আর দর্ভসেনের কর্তৃত্বাধীন ওই রক্ষীবাহিনী, যা গান্ধারের প্রতীক, যা উচ্চবর্ণ সভ্যতার ও রাজকীয় আচারআচরণেরও প্রতীক, তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। স্বাচ্ছন্দ্য এবং অস্বস্তি এই দুই বিপরীত অনুভূতির মাঝখানে পড়ে তিনি যেন একটু হতবুদ্ধিও।

দর্ভসেন বললেন, 'নগরদ্বারে গিয়ে গান্ধারের দূতবাহিনীর আগমন ঘোষণা করো রক্ষীজ্যেষ্ঠক।'

চণককে বললেন, 'আমরা নগরের বাইরে এক পান্থশালায় ছিলাম এতদিন। তোমাদের কারও দেখা পাই না ! না পেলে তো প্রথানুযায়ী কিছু করতেও পারি না। ভালো সমস্যাতেই ফেলেছিলে, যা হোক।'

চণক উত্তর দিলেন না। দর্ভসেনের পাশাপাশি চলছিল তাঁর ঘোড়াটি। রাশ টেনে একটু পিছিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলেন। তারপর চিন্তিত মুখ অল্প নিচু করে মন্দগতিতে চলতে লাগলেন।

রোদ ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠছে। নগরদ্বার পেরিয়ে গেল। নগরদ্বারের অতি স্থূল কঠিন ইন্দ্রকীলকের পাশেই দৌবারিকদের পীঠাগার, একজন অশ্বারোহী তীরবেগে রাজপুরী অভিমুখে ছুটে গেল গান্ধার দূতদের আগমনবার্তা নিয়ে। আর একজন সমাদরে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের পথ দেখিয়ে। ক্রমশই পথগুলি আরও প্রশস্ত পরিষ্কার, একটি দুটি করে সৌধ দেখা দিচ্ছে। সুসজ্জিত নগরবাসীরা বেরিয়ে পড়েছে। মুছে যাচ্ছে তমসাবৃত, তরুচ্ছায়াশীতল অরণ্য, পাতার কুটির। দূরে ডিম ডিম শব্দ। কালো কালো মানুষগুলির হাতে অব্যর্থ-লক্ষ্য তীর ধনুক। মুছে যাচ্ছে নীরন্ধ্র অন্ধকারে একটি মাত্র দীপের আলো, উদ্দক, রগ্‌গা। চণক ভাবলেন একটি অধ্যায় শেষ হল তাহলে! যখন তক্ষশিলা থেকে বেরিয়েছিলেন, তখন কি ভাবতে পেরেছিলেন এইসব অভিজ্ঞতার কথা! হয়ত এর পরেও যা ঘটবে তার মধ্যেও থাকবে কল্পনার অতীত কিছু। যতই পরিকল্পনা করুন, জীবনযাপন ও কর্তব্যকর্মের মধ্যে যদি অভাবনীয়র প্রবেশ মাঝে মাঝে না ঘটে, তো জীবনের স্বাদ যেন লবণহীন ব্যঞ্জনের মতো মনে হয়। সুতরাং বিপদ থাক। থাক-যা কিছু আকস্মিক, রোমাঞ্চক। মহামাত্র দর্ভসেনের মতো বাঁধানো রাজমার্গ দিয়ে চলা সব সময়ে তাঁর পোষাবে না।

৪

নদীতীরে পাষাণময় গৃহ। শ্রেষ্ঠী নদীতীর বহুদূর পর্যন্ত বাঁধিয়ে দিয়েছেন। এই গৃহও দ্বিতল। উপরিতলে জলবণিকরা ইচ্ছামতো বিশ্রাম নিতে পারে। রয়েছে বিশ্রামাগার। বিশ্রামাগারে সুখশয্যা, কাষ্ঠফলক, ব্যবস্থাপক, দাসদাসী, জলপূর্ণ কুম্ভ। নিচতলায় নারী পুরুষের স্বতন্ত্র বেশাগার। বহুজনের বসবার জন্য কাষ্ঠাসন, পাষাণবেদী। এই গৃহের উন্মুক্ত প্রশস্ত অলিন্দপথে দাঁড়িয়েই উৎসবমত্ত নগরবাসীদের দেখছিলেন তিন ব্রাহ্মণ। সহসা বৃষ্টি আসতে তাঁরা একটি ভারি সুন্দর দৃশ্য দেখলেন। মৌচাকে ঢিল মারলে যেমন মৌমাছিরা সবেগে বেরিয়ে এসে এক দিকে ধাবিত হয়, বৃষ্টির বিন্দুগুলি তীরের ফলার মতো আকাশ থেকে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বহু তরুণী, যারা এতক্ষণ বিপণিগুলিতে কেনা-কাটায় ব্যস্ত ছিল, ব্যস্ত ছিল পরস্পরের সঙ্গে মধুরালাপে, তারা মাথা নিচু করে এলোমেলো ভাবে কিন্তু সবেগে ছুটে আসছে বেশাগারে আশ্রয় নেবার জন্য। তরুণরাও আছে। আছে বালকবালিকার দল। কিন্তু তরুণীগুলি সযত্নে প্রসাধন করেছে। তাদের মাথার কবরীশোভন কুসুমালঙ্কার থেকে পায়ের আলতা পর্যন্ত নিখুঁত সজ্জা। কণ্ঠের মালা দুলছে, কাঞ্চীগুলি ঝাপটা মারছে নিতম্বে, ওই কার পা থেকে নূপুর খসে পড়ে গেল, নিচু হয়ে তুলতে যেতেই খসে পড়ে গেল কণ্ঠহারের কেন্দ্রমণি পুষ্পগুচ্ছটি। কেউ হয়ত দু হাতে মাথার ওপরটা ঢাকছে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

হঠাৎ কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন, 'দেখুন দেখুন। ওইদিকে দেখুন!'

তিন জনে তাকিয়ে দেখলেন সবাই ছুটছে। খালি একটি মেয়ে আসছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। চলার ধরনটি ভারি সুন্দর। অতি মন্থরও নয়, অতি দ্রুতও নয়। রাজহাঁস যেমন অবলীলায় জলে ভেসে যায়, তেমনি। মেয়েটির গাত্রবর্ণ পদ্মের কচি পাপড়ির মতো কোমল, অরুণাভ, মসৃণ। বৃষ্টির জলে তার কোনও প্রসাধনই ধুয়ে যায়নি। অর্থাৎ সে প্রসাধনবিনাই এমন। অপরিমিত কালো কেশের মধ্যে মুখটি ফুটে আছে কহ্লার কুসুমের মতো। আকৃতি, গঠন, অঙ্গসৌষ্ঠব ও অবয়বসংস্থানে এত সুষমা যে, ব্রাহ্মণদের দৃষ্টি যেন এক শীতল শান্তি অনুভব করল। সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটির কেশ। ঠিক ময়ূরপুচ্ছের মতো তার মাথার চারদিকে চালচিত্র রচনা করেছে। আর কেশাগ্র সব সাপের ফণার মতো বাঁকানো।

কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিস্ফারিত লোচনে চেয়ে চেয়ে বললেন, 'একেই বলে যথার্থ কেশকল্যাণী। এমনটি আর দেখিনি।'

জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বললেন, 'এ যে কেশকল্যাণী, মাংসকল্যাণী ও ছবিকল্যাণী তাতে সন্দেহ নেই। ত্বক দেখুন জ্বলজ্বল করছে। গঠন দেখুন সুকুমার, নির্দোষ। কিন্তু বড় অলস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যম বললেন, 'ঠিকই বলেছেন আর্য, স্বামীর কপালে দধ্যোদন।'

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'সুন্দরী পত্নীও হবে আবার সুসিদ্ধ অন্নব্যঞ্জনও সময়মতো পাওয়া যাবে, এত ভাগ্য করে কজন পুরুষ আর আসে বলো ! ও দুটি বস্তু আজকাল আর একত্র পাওয়া যাচ্ছে না।'

কিশোরী ততক্ষণে বেশাগারের অলিন্দে ব্রাহ্মণদের পাশেই প্রায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার দুগ্ধধবল উত্তরীয়টি এবং নীলাভ শ্বেত অধোবাসটি দেহের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গেছে। ফুটে আছে পুষ্পমালায় দুধারে উন্মুখ শঙ্খের মতো বক্ষযুগল। এমন নিখুঁত নাভিস্থল, মনোহর শ্রোণিদেশ, এমন সুচারু জঙ্ঘা, প্রস্ফুটিত কমলপত্রের মতো চরণ ব্রাহ্মণরা আর দেখেননি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণদের দিকে তাকিয়ে কিশোরী বলল, 'আপনারা কি আমায় কিছু বলছেন ?'

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে চমৎকৃত হলেন তিন ব্রাহ্মণ। কনিষ্ঠ বললেন, 'কণ্ঠকল্যাণী, না স্বরকল্যাণী, কী বলবে একে ? যদিও আমাদের অনুসন্ধানের মধ্যে এটি পড়ে না।'

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'অস্থিকল্যাণীও বটে, দন্তপঙ্ক্তি যেন ঘনবদ্ধ হীরকের সারি।'

—কিছু বললেন ? আবার জিজ্ঞেস করলো কিশোরী।

—না। বলছিলাম মা, তোমার সখীরা কেমন বৃষ্টি আসতেই দৌড়ে এসে এই গৃহে আশ্রয় নিল, রক্ষা পেয়ে গেল। তুমি ভিজে গেলে।

মেয়েটি হাসল। বহুদর্শী অভিজ্ঞ মানুষ যেমন অল্পদর্শী, অল্পবুদ্ধি মানুষের কথা শুনে হাসে, তেমনি অনুকম্পামিশ্রিত ক্ষমার হাসি।

জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বললেন, 'মা, কিছু বলবে ?'

মেয়েটি বলল, 'একটা প্রশ্ন হঠাৎ মনে এলো, আপনারা তো বিদ্বান, বহুদর্শীও বটে, অনুমতি দেন তো জিজ্ঞাসা করি।'

—নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবে। এর আবার অনুমতি কি মা।

মেয়েটি বলল, 'বহু অলঙ্কার আর মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত পরিচ্ছদে ভূষিত অভিষিক্ত রাজা, ধরুন মাথায় মুকুট, হাতে দণ্ড— হঠাৎ বেগে দৌড়তে আরম্ভ করলেন...যথাযথ হবে কি ?'

জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হেসে বললেন, 'একেবারেই না। অভিষিক্ত রাজা হবেন শার্দূলগতি, তাঁর মহিমা যতটা না আকৃতিতে, তার চেয়েও অধিক তাঁর গতিভঙ্গিতে থাকে মা।'

মেয়েটি বলল, 'তবে রাজহস্তী ? পিঠে সুদৃশ্য বস্ত্রাচ্ছাদন, সুখাসন, তার ওপর শ্বেতচ্ছত্র, মস্তকে ও শুণ্ডে পত্রলেখা। এই হস্তী যদি দৌড়ায় ?'

'ভারি কুদৃশ্য হবে মা' মধ্যম ব্রাহ্মণ বললেন, 'অতি ভয়াবহও বটে ! প্রথমেই লোকে ভাববে হস্তীটি পাগল হয়ে গেছে। মদবারি ঝরছে কিনা লক্ষ করবে। কারণ ওই সময়ে হাতি সাময়িকভাবে ক্ষিপ্ত হয়। যখন দেখবে তা-ও নয়, তখন এই হস্তী সম্পর্কে তাদের আর কোনও দয়াই থাকবে না। শত শত বাণ বর্ষণ করে হয়ত মেরেই ফেলবে। রাজহস্তী হল গজেন্দ্র, চলবে গজেন্দ্রগমনে।'

মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, 'আচ্ছা, তবে সন্ন্যাসী ? মুণ্ডিতমস্তক, সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী ? হাতে ধরুন ভিক্ষাপাত্র। হঠাৎ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলেন।'

তিন ব্রাহ্মণই হেসে উঠলেন, 'ছিঃ, মানাবে না মা। সন্ন্যাসীকে কি অধৈর্য মানায় ! তিনি তো সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয়ও বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি হবেন ক্ষান্তিবাদী। হাত পা নাক কান কেটে ফেললেও তিনি ধৈর্যশীল থাকেন। তিনি অকস্মাৎ ধাবিত হলে, ইতরজন কী শিখবে ?'

—উৎসবসাজে সজ্জিত সদ্‌বংশজাত নারীকেও ছুটলে মানায় না আর্য।

চমকে উঠলেন তিন জন। জ্যেষ্ঠের চোখে কৌতুক ঝিলিক দিল। কিশোরী নিজেকে অনায়াসে নারীর দলে ফেলে দিল। একেই সে সর্বাঙ্গসুন্দরী, তার ওপর তার অঙ্গবিক্ষেপ এত মনোহর যে, এই মুহূর্তে সত্যি কথা বলতে কি তাঁর ইচ্ছে হচ্ছে মেয়েটির দৌড়নোর দৃশ্য দেখতে। তবে এটা সত্যি অল্পবয়স্কা হলেও মেয়েটি হরিণী প্রকৃতির নয়, বরং যেন একটি হংসবালিকা। মানস সরোবরে রাজহংসী।

মেয়েটি এই সময়ে হংসের মতোই কটাক্ষ হেনে বলল, 'বৃষ্টিপাতে অধোবাস অঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আর্য, আপনারা কি চান আমি দৌড়তে গিয়ে পড়ে হাত-পা ভাঙি ?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কখনও না মা, কখনও না। তিন জনে সমস্বরে বলে উঠলেন। তাঁদের মনোগত ইচ্ছে কি মেয়েটি পড়তে পেরেছে ?

—হাত-পা ভাঙলে আর কারও কিছু না, কিন্তু আমার পিতামাতা যে আশা করে আছেন, এত যত্নে লালিতা কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করবেন, তা কি পারবেন ? বিবাহযোগ্য যুবারা বরং দগ্ধোদন খেতে রাজি, কিন্তু ভগ্নহস্ত, ভগ্নপদ কন্যা কদাপি বরণ করবেন বলে তো মনে হয় না।

—ঠিকই বলেছ মা। একেবারে ঠিক। হাসি চেপে জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বললেন। মেয়েটি খুবই সপ্রতিভ। কিছুটা প্রগলভও বটে। তাঁদের কথাবার্তা বোধ হয় কিছু কিছু শুনতে পেয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত উত্তর দিয়েছে। অকালপক্ব, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে ভারি মনোহর।

মধ্যম ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নামটি কী মা ?'

—বিসাখা।

—কার কন্যা ?

—পিতা ধনঞ্জয় সেট্‌ঠি, মাতা দেবী সুমনা।

—কোন্ ধনঞ্জয় ? ভদ্দিয় নগরের মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর পুত্র না কি ?

—তিনিই। বিশাখার কণ্ঠে শান্ত গৌরব।

—তুমি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা ? সবিস্ময়ে বললেন জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তবে তো পুষ্পরাগ খুঁজতে খুঁজতে আমরা আসল হীরকমণিই পেয়ে গেছি। বলতে বলতে তিনি চকিতে একটি দীর্ঘ সুবর্ণহার বিশাখার গলায় পরিয়ে দিলেন। তার বহুমূল্য রত্নখচিত কেন্দ্রমণিগুলি তার বক্ষের নিচে দুলতে লাগল। ব্রাহ্মণ বললেন— শ্রাবস্তীবাসী মিগার শ্রেষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই সুবর্ণহার দিয়ে তোমায় আশীর্বাদ করতে অনুমতি দাও মা। তাঁর সুপুত্রের জন্য আমরা কন্যা নির্বাচন করতে বেরিয়েছি।

আশেপাশে সখীরা হাততালি দিয়ে কলকল করে উঠল, 'বিসাখা বৃত হয়ে গেল, বিসাখা বৃত হয়ে গেল।'

বিশাখা সপ্রতিভ কণ্ঠে জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন নাম বললেন সেট্‌ঠির ?'

—মিগার, মৃগার। কোশল রাজধানী শ্রাবস্তীতে বাস।

—আর তাঁর পুত্র ?

—তরুণ পূর্ণবর্ধন।

বিশাখা গম্ভীর মুখে সখীদের ডেকে বলল, 'সই, শীঘ্র যাও, পিতাকে খবর দাও, রথ পাঠিয়ে দিতে বল, এখন তো আর পায়ে হেঁটে যেতে পারব না !'

বৃষ্টির বেগ এতক্ষণে প্রশমিত। যারা বেশাগারে অলিন্দে আশ্রয় নিয়েছিল, সেইসব সাকেতবাসীরা কৌতূহলের দৃষ্টিতে বিশাখা এবং তিন ব্রাহ্মণের দিকে তাকাতে তাকাতে বাড়ি ফিরে চলল। অনেকে এখনও অপেক্ষা করছে। শ্রেষ্ঠীর গৃহ থেকে রথ আসবে, শ্রাবস্তীর তিন বটুকে নিতে ধনঞ্জয় নিজে আসেন কি না, এসব অনেক কৌতূহলের বিষয় এখনও রয়েছে। কয়েকজন রথের কথা বলতে চলে গেলেও অধিকাংশ সহচরীই এখনও বিশাখার চারপাশে তাকে প্রায় বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে। আছে সাকেতের আরও অনেক বড় ঘরের মেয়েরাও। তাদের কলকণ্ঠ বৃষ্টির শব্দকে বহুগুণ ছাপিয়ে যাচ্ছে। আজ উৎসবের দিনে, মধ্যাহ্নবেলায় সরযূতীরে সাকেতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কৌতূহলপ্রদ ঘটনাটি ঘটে গেল। বিবাহ জীবনের একটা আবশ্যিক ঘটনা, শিক্ষা সমাপন করে গৃহে ফিরলেই পুত্রদের বিবাহ দেন সব গৃহস্থরাই। দু-চারজন যারা বিবাহ করতে চায় না, ঋষি প্রব্রজ্যা নিতে চায়, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আর সবার ক্ষেত্রেই বিবাহ তো ঘটছেই। কোনও কোনও পুরুষের দু-বার, তিন-বার। ক্বচিৎ কখনও কোনও রমণীরও দ্বিতীয়বার বিবাহ ঘটে। কিন্তু তবু বিবাহ একটা মহা উত্তেজনার বিষয়। এখনই আরম্ভ হবে সারা সাকেতে নানান জল্পনা-কল্পনা। যারা সাক্ষী রইল ঘটনাটির, তারা বাড়ি গিয়ে পরিজনদের বলবে, তারা আবার বলবে তাদের পরিচিতদের। বাড়ির দাস-দাসীরা যেতে আসতে সংবাদ বিনিময় করবে। এইভাবে ঘটনাটি পল্লবিত হয়ে সাকেত এবং তার আশপাশের গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়বে। কারণ ধনঞ্জয় যেমনি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী তাঁর কন্যা তেমনি রূপসী ও গুণবতী। এবং উভয়েই লোকপ্রিয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

সাকেত যেতে হলে গঙ্গা পার হয়ে বাম দিকে বেঁকে যেতে হয়। রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী পঁয়তাল্লিশ যোজন পথ। ঘন অরণ্য না থাকলেও ছোটখাটো বন আছে। তা ছাড়া সবটাই ধানক্ষেত, যবক্ষেত, তিলক্ষেত। ছোট ছোট গ্রাম, বড় বড় কানন। এই পথ দিয়ে তথাগত বুদ্ধ রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীতে যান বলে এক যোজন অন্তর অন্তর বিশ্রামাগার নির্মিত হচ্ছে। শ্রাবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠী সুদত্ত শ্রাবস্তীতে গৌতম বুদ্ধর বসবাসের জন্য এক বিশাল উদ্যান অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ দিয়ে কিনেছেন নাকি। বহু সহস্র ইষ্টকবর্ধকী এবং তক্ষা মিলে অত্যন্ত শীঘ্র শেষ করছে সেই জেতবনের মহাবিহার। এখনও কাজ চলছে। বিশেষত, বিশ্রামাগারগুলির অলঙ্করণ তো এখনও অবশিষ্ট। গত বর্ষা ওই জেতবনেই অবস্থান করেছেন গৌতম। পরে এসেছেন রাজগৃহে। বেণুবনে বাস করছেন, বহু ভিক্ষু সহ। রয়েছেন বুদ্ধের বিমাতা মহাপ্রজাবতী এবং বুদ্ধজায়া যশোধরাদেবীও। ভিক্ষুণী সংঘে সম্প্রতি বুদ্ধজনক শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাবতী নাকি আলুলায়িত কুন্তলে, সামান্য বস্ত্র ধারণ করে, আরও বহু অভিজাত শাক্যরমণীর সঙ্গে বহু যোজন পথ অতিক্রম করে বৈশালীতে বুদ্ধ সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। রাজকন্যা, রাজরানি। বিশেষ শুদ্ধোদন ছিলেন অতিশয় বিলাসী। মহাপ্রজাবতী কখনও মাটিতে পা রাখেননি। ভিক্ষা করতে করতে ছিন্নমলিন বেশে তিনি যখন বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় উপস্থিত হলেন তখন স্ফোটকে তাঁর চরণ দুটি নাকি ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। রক্তাক্তচরণ গৌতমমাতাকে সেবায় সুস্থ করে তোলেন আনন্দ। এবং বহু কষ্টে বুদ্ধকে সম্মত করান ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে। পরে যশোধরাদেবীও তাঁর পিতৃকুল শ্বশুরকুল সর্বত্র থেকে যে অতুল সম্পদ পেয়েছিলেন শাক্যবংশীয় কোন রাজকুমারকে অর্পণ করে এসে ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন।

বিশ্রামাগার নির্মিত হচ্ছে ভালো। কিন্তু পথ ? পথটি তো বাণিজ্যপথও, এটিকে সংস্কার করাবে তো ? এই পথটিও যে বড়ই উচ্চাবচ, কঙ্করময়, ধূলিমলিন ! গ্রামের বা জনপদের মধ্যে প্রবেশ করলে অপেক্ষাকৃত সুপথ পাওয়া যায়। সে মগধের গ্রামজনেরা নিয়মিত গ্রামকৃত্য করে বলে। গ্রামের পথগুলি, অতিথিশালা, চারণভূমি, নদীপার্শ্ব, পুষ্করিণীগুলি এরা পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু রথ যাবার উপযুক্ত পথ নয় সেগুলো। সেনিয় বলেছিল শিবিকায় যেতে, সুমনাদেবীর ইচ্ছা ছিল তাঁর নিজস্ব সিন্ধুদেশীয় অশ্ব চিত্ররথে চড়ে যাওয়াআসা করেন। কিন্তু এখন আর তিনি সেই দুরন্ত বালিকাটি নেই, নেই সেই দুঃসাহসী কিশোরীও। মনে মনে আছেন। কিন্তু বাইরের আকৃতিতে তিনি অতি সম্ভ্রান্ত কুলের বধূ, গৃহিণী। সেনিয় রাজি হল না। সাত ঘোড়ার রাজরথ নির্দিষ্ট হয়েছে সুমনার জন্য। ভালোই হয়েছে, দ্রুত পথ পার হয়ে যাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অশ্বগুলি তো বন্য অশ্ব নয়, হাজার হলেও রাজ-মন্দুরায় লালিত-পালিত, যুদ্ধরথের অশ্বও নয়। বড় পাথরের টুকরোর আঘাতে একটি তো রীতিমতো কাতর হয়ে পড়েছিল। একটি নিগমগ্রামে তাকে শুশ্রূষার জন্য রেখে আসা হয়েছে। অন্য একটি শিক্ষিত অশ্বকে জোতা হয়েছে রথে। ছ'টি শ্বেত অশ্বের মধ্যে সেই কপিশবর্ণ অশ্বটিকে সর্বদাই তাঁর সুখাসন থেকে দেখতে পান দেবী সুমনা। আহত অশ্বটির কথা মনে পড়ে যায়।

আবরণী সরিয়ে তিনি দেখলেন অদূরে কয়েকটি কুটির দেখা যাচ্ছে। তিনি সারথিকে থামতে নির্দেশ দিলেন।

—কী গ্রাম এটা, সূতপুত্র ?

—বোধ হয় কম্মার গাম দেবী।

—খুব বড় গাম কী ?

—খুব বড় নয়। প্রধানত কম্মারদের গ্রাম, ওই যে কুটিরগুলি দেখছেন, ওর পাশে পাশেই সংলগ্ন কামারশালাগুলি। এদের সূক্ষ্ম বস্তু প্রস্তুত করার খ্যাতি আছে দেবী। খুব সরু সূঁচ, তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, সরু দাঁতের করাত গজদন্ত কাটবার জন্য, এইসব। জীবকভদ্র তো এই গ্রাম থেকেই তাঁর শল্য চিকিৎসার যাবতীয় বস্তু নির্দেশ দিয়ে প্রস্তুত করান। সন্দংশ, অন্তর্মুখ, দন্তশংকু, স্বস্তিক...

—তাই নাকি।

—হ্যাঁ দেবী, ওই যে সুবন্ন সেট্‌ঠির শিরঃপীড়ায় মারা যাবার মতো হয়েছিল ! মনে হত কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে তাঁর মস্তক কেটে ফেলছে। বৈদ্য শুদ্ধশীল এবং সন্নতি আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। জীবক বৈদ্য এই গ্রামের কামারশালা থেকে তীক্ষ্ণধার শস্ত্র নিয়ে গেলেন। সুবন্ন সেট্‌ঠির করোটি ভেদ করে দুটি কৃমিকীট বার করে দিলেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে সেট্‌ঠি সুস্থ হয়ে উঠল।

সুমনা অবাক হয়ে রইলেন। করোটি ভেদ করা যায়! তারপর আবার জুড়ে দেওয়াও যায়! এ তো অলৌকিক কাণ্ড! তাঁর শ্বশুরগৃহে কিছু ইন্দ্রজাল-বিদ্যার চর্চা আছে। বাইরের দর্শকের কাছে তা অলৌকিক মনে হলেও তিনি জানেন, সেগুলির মধ্যে নিপুণতা আছে, চর্চা আছে, কিন্তু সমস্তটাই কৌশল। কিন্তু করোটি ভেদ করে কীট বার করা! এ তো গৌতম বুদ্ধের করার কথা! তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ। স্বর্গ-মর্ত্য-নরক কোথায় কী হচ্ছে সব তাঁর নখদর্পণে থাকবার কথা। তিনি করলে বোঝা যেত। মক্‌খলি গোসালকে দেখেছেন এমনি কারুর উদরে হাত বুলিয়ে দারুণ যন্ত্রণার উপশম করতে। ব্যথায় পা ফেলতে পারছে না, তার নিমেষে পা সোজা হয়ে গেল, সে সহজভাবে চলতে লাগল। কিন্তু শস্ত্র দিয়ে করোটি ভেদ!

অশ্বগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সারথি এখানে কিছুকাল থামবার অনুমতি চাইছে। সুমনা তো আগেই তাকে থামতে বলেছেন। তাঁর চিত্ত অধীর হয়ে রয়েছে। প্রায় দু মাসের কাছাকাছি তিনি নিজগৃহে অনুপস্থিত। কন্যাকে দেখেননি, স্বামীকে দেখেননি, কতকাল হয়ে গেল। মনে হচ্ছে দূরগামী পাখির মতো যদি দুটি ডানা থাকত, এখনি উড়ে সাকেতের একমাত্র সপ্ততালিক প্রাসাদের চূড়ায় গিয়ে বসতেন।

কিন্তু মগধের এই প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছেছে রথ মাত্র দু দিন সময়ে। ঘোড়াগুলির মুখের দুপাশে সাদা ফেনা। ওরা নিকটবর্তী কোনও সরোবরে জল-পান করবে, কিছুকাল চরবে। খাবে। তারপর আবার চলতে পারবে।

দুই দাসীর সাহায্যে রথ থেকে নামলেন সুমনা। সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এমনিই রীতি। সুমনা রাজগৃহের অতি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়কন্যা। বালিকা বয়সে বিম্বিসারের সহাধ্যায়িনী ছিলেন। তখন কে জানত, এই সামান্য ক্ষত্রিয়কুমার সেনিয় রাজা হবে! অঙ্গরাজ্য জয় করবে! কোশল-বৈশালীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে রীতিমতো মহারাজ বিম্বিসার! সবচেয়ে কৌতুকের কথা সেনিয় ভারি সুদর্শন এবং রূপগর্বী ছিল। দীর্ঘিকা দেখলেই সে কোন-না-কোনও ছলে সেখানে গিয়ে মুখ দেখে আসত। আচার্য খানিকটা আদরে, খানিকটা তিরস্কারে তাকে বিম্বং সারং যস্য সঃ বিম্বসারঃ বলে ডাকতেন। চাঁচর কেশ, তীক্ষ্ণ নাসাগ্র, মসৃণ শ্যাম গাত্রত্বক, দীর্ঘায়ত চক্ষু এই বন্ধুকে সহাধ্যায়ীরা সবাই তখন বিম্বিসার বলেই ডাকতে শুরু করে। মাত্র ষোল বছর বয়সে তাকে যখন পিতা ক্ষেত্রৌজা সামান্য একটি চতুষ্পায়ী আসনে হরিদ্রাবর্ণ সিংহচর্ম বিছিয়ে রাজা বলে অভিষিক্ত করলেন, তখন আচার্য প্রদত্ত সেই বিম্বিসার নামটাই রয়ে গেল, লোকে বলে বটে সেনিয়, কিন্তু সেটা নামের একটা অপ্রধান বিশেষণের পুচ্ছ যেন। সুমনা চলতে চলতে আপনমনেই হেসে ফেললেন। দুজনের বন্ধুত্ব বেশ গভীর ছিল। অর্থাৎ যে কোনও সূত্র ধরে দুজনের মধ্যে মারামারি লেগে যেত। সুমনা শুধু প্রখর বুদ্ধিশালিনীই ছিলেন না, অনুশীলন করেছিলেন দৈহিক বল, ধনুর্বাণ এবং অসিচালনা। যে কোনও ব্যাপারেই সুমনাকে পরাজিত করতে সেনিয়কে যথেষ্ট শক্তিক্ষয় করতে হত। সহজে হত না। শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সুমনাকে পরাস্ত করে সেনিয় তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর চড়ে বসত, চুলের মুঠি ধরে বলত, 'আমি হব রাজা আর তুই তখন হবি আমার প্রতীহারী।'

এক ঝটকায় তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে করতে সুমনা বলত, 'প্রতীহারী না আরও কিছু। রাজা না আরও কিছু! আমি হব নিষাদরানি, তুই আমার অনুচর, আমার তূণ-টুন বইবি।'

—তবে রে, তবে তুই প্রতীহারীও নয়, আমার তাম্বুলের পাত্র বইবি। কি যেন বলে তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী। দাসী, দাসী, দাসী।

সেনিয় এর পর এলোপাথাড়ি মার খেত। বালিকার তীক্ষ্ণ নখ এবং দাঁতের প্রহারে জর্জরিত হয়ে বলত, 'নারী, নারী, নারীরা এমনিই হয়। এত তো অস্ত্রের ব্যবহার শিখছিস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বার করলি সেই দাঁত, নখ আর শিঙ্‌। বন্যপশু আর রমণীর এই-ই তো প্রকৃতিদত্ত প্রহরণ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানটি ভারি মনোরম। সিন্ধুবার, সপ্তপর্ণী, শাল্মলী, পিপ্পল—বহু বৃক্ষে ঘেরা বন ? না উদ্যান ? বনই মনে হয়। কিন্তু গ্রামজনেরা বনটিকে নিজেদের ইচ্ছা মতো পরিষ্কার করেছে। ছায়াবৃক্ষগুলি রেখেছে, পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করেছে। শুষ্ক পত্র কাঠিকুঠি ঝাঁট দিয়ে ঝুড়িতে তুলছিল একটি প্রৌঢ়া, সুমনাকে দেখে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপর একটু দূরে সরে গেল। অদূরে একটি বকুল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আরও দুটি যুবতী। তাদেরও হাতে ঝাঁটা, ঝুড়ি।

সুমনা বললেন, 'এখানে কোনও বিশ্রামগৃহ আছে ? কি লতামণ্ডপ ?'

—না তো মা, গাঁয়ে আছে অতিথশালা। এ বনে তো নাই।

—পানীয় জলের সরোবর আছে ?

—ওই তো পুকুর রয়েছে। আমরা স্নান করি, পান করি, সবই...।

—কী করছ এখানে ?

ঝুড়ি দেখিয়ে প্রৌঢ়া বলল, 'এইসব কুড়িয়ে নিয়ে আগুন করি মা। আমরা তো আর অগ্নিহোত্রী নই যে, ঘরে অগ্নিদেব থাকবেন ! বনটি পরিষ্কারও হল, আমাদের গ্রামকৃত্যও হয়ে গেল। একসঙ্গে দুটি।'

—ওই মেয়ে দুটি কি তোমার ?

—'মেয়ে নয় মা, বউ', সগর্বে বলল প্রৌঢ়া 'সাত ছেলে আমার, বড়বউ রাঁধে, মেজবউ জোগান দেয়, সেজবউ ঘর নিকায়, নবউ গরুছাগলগুলি দেখে। এই দুটি সব্ব কনিট্‌ঠা এখনও। এদের নিয়ে আমি এইসব করি। ছোটটির এখনও বিয়ে হয়নি।'

—ছেলেরা তোমার কী করে মা ?

সন্ত্রস্ত হয়ে প্রৌঢ়া বলল, 'ক্ষেত চষে মা, সব ক্ষেত চষে।'

—ক্ষেত্রপাল ?

—না, মা, না। ক্ষেত্রপালের ভূমি, শুধু চষে তারা।

সুমনা অন্যমনে এগিয়ে গেলেন। বধূ দুটি এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলাবলি করতে লাগল, 'কী রকম সোঁদাল ফুলের মতো রং দেখেছিস ?'

—অঙ্গেও বোধ হয় বারাণসীর বস্তর ? তাই না ?

—কাঞ্চীটা দেখেছিলি ? পুরো সুবর্ণের নয় ? যখন পেছন ফিরে চলে গেল, ভরা ঘটের মতো নিতম্ব দুটি দুলিয়ে, কাঞ্চীটি কী মানিয়েছিল ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ মানিয়েছিল। চল চল এখন কাজ সারি।' তাদের শাশুড়ি তাড়া দিল।

এই সময়ে সুমনা লাফ দিয়ে একটি নীপশাখা থেকে দুটি অপূর্ব সুন্দর নীপকুসুম পাড়লেন, ভালো করে দেখেশুনে কানের ওপর দিয়ে সুকৌশলে আটকাতে লাগলেন, যাতে প্রস্ফুটিত কেশরময় গোলাকার ফুলগুলি কানের পাটার ওপর এসে দুলতে লাগল।

গ্রামবধূদের একজন সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'দ্যাখ দ্যাখ, ধনী ঘরনীর কাণ্ড দেখ। কানে মণিরত্নের কর্ণপুর। উনি আবার কদমফুল দোলাচ্ছেন !' অন্যজন বলল, 'আদিখ্যেতা !' তার ঠোঁট বিকৃত হয়ে রয়েছে।

প্রৌঢ়া ধমক দিয়ে বললেন, 'কী হচ্ছে ? নিজের নিজের যেমন যেমন আছে খেয়ে পরে থাকতে পারলেই তো হল। বড় মানুষের গহনার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার কী ? শুধু শুধু তেষ্টা বাড়বে। চল, এখন চল দিকিনি !'

কিছুদূর চলে এসে প্রৌঢ়া আবার বলল, 'সুবন্ন, সুবন্ন ! দেখলি তো অত সুবন্ন পেলেও মন ভরে না, ওই রূপসী তো সে-ই কদমফুলের দিকেই হাত বাড়াল ! তোরা যখন মল্লিকার কাঞ্চী পরিস, কর্ণিকারের কর্ণপুর কানে ঝোলাস, তোদের ওতেই মানায়। আমার ছেলেদের সুবন্ন-সুবন্ন, রুপা-রুপা করে বিরক্ত করিসনি। এ জন্মে পুণ্যসঞ্চয় কর। পরজন্মে নিশ্চয় সুবন্ন পরতে পাবি।'

ঘন তমালবৃক্ষের শ্রেণীর ওপারে সরোবর দেখতে পেলেন সুমনা। তিনি একা প্রবেশ করেছেন বনে। দাসীদের আসতে নিষেধ করেছেন। সব সময় সঙ্গে দাসী। লোকজন যেন অসহ্য লাগছে। ওরা এখন তাঁর ভোজ্য প্রস্তুত করছে। করুক। যতক্ষণ ধরে পারে করুক। এই রাজবাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাসীদের আবার আচার-আচরণ একটু বেশি মাত্রায় শীলিত। আভূমি প্রণত না হয়ে কথা বলে না। চোখে চোখ ফেলে না। তিনি সোজাসুজি সারথির সঙ্গে কথা বললে, আপাদমস্তক কেমন কঠিন হয়ে যায় তাদের। সেনিয়র মতো সাধারণ ঘরের ছেলে দিবারাত্র এসব সহ্য করে কী করে?

সরোবরটি খুবই প্রশস্ত। ওপরে শৈবালের একটি পাতলা স্তর। ওপারে তাঁর রথের ঘোড়ারা জলপান করছে। লতামণ্ডপ একটি আছে। কিন্তু শুঁয়োপোকায় ভর্তি। লতামণ্ডপটি দেখে মনে হল কেউ কোনও সময়ে সযত্নে রচনা করেছিল, তারপর কালের প্রকোপে এখন সে স্বামীও নেই, সে ধনও নেই, সব নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে হয়ত এ বন এক সময়ে উদ্যানই ছিল, এই লতাকুঞ্জে সুখী সৌভাগ্যশালী ভূস্বামী পত্নী পরিবৃত হয়ে বসতেন বসন্তের পূর্ণিমায়, গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবকাশে। যেমন ভদ্দিয়তে দেখেছেন শ্বশুর মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীকে। কপিশ বর্ণের ঘোড়াটি দীর্ঘ সময় জল পান করে আকাশের দিকে মুখ করে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। আহা! সুমনার মন বাৎসল্যে ভরে উঠল। সত্যিই, অনেক যোজন পরে ওদের জলপানের ও বিশ্রামের অবসর দেওয়া হল। তিনি খুব তাড়া দিচ্ছিলেন। হলকর্ষণ উৎসবের পূর্বেই তাঁর পৌঁছবার কথা। বহু খুঁটিনাটি করণীয় আছে। বিশাখাকে তেমন কিছুই বলে আসা হয়নি। রাজবাড়িতে বিশেষ কারণে দেরি হয়ে গেল। পঞ্চকষায়, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব... ঘটস্থাপনের জন্য সুবর্ণঘট গড়াতে দিয়ে আসা হয়নি। ধনঞ্জয়ের কি মনে থাকবে ঘটের পরিমাপের জন্য পুরোহিত আচার্য ক্ষত্রপাণির কাছে বিধান নেওয়া প্রয়োজন! এবার হলকর্ষণোৎসবের দিনে তাঁদের পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল। প্রাসাদের শ্রীমণ্ডপটি নতুন করে তোলবার কথা। তৎসংক্রান্ত বাস্তুযাগেরও অনেক ঝামেলা। সে সমস্ত কি ওই পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে সামলাতে পারবে? বস্তুত, সারা বছরই তো যাগ-যজ্ঞ পূজা-সংস্কার চলছেই। তিনি শিখেছিলেন পিতামহী, পরে শ্বশ্রূমাতা পদ্মাবতীর কাছে, ভদ্দিয়তে থাকলে বিশাখা সবই আপনাআপনি শিখে যেত। কিন্তু সাকেতে তাঁরা খানিকটা একা হয়ে গেছেন। সব কিছুই স্বয়ং উপস্থিত থেকে নিষ্পন্ন করতে হয়। উপরন্তু, তিনি বিশাখাকে নিজের মতোই অশ্বারোহণ, অসিচালনা ইত্যাদি বিদ্যায় পারদর্শী করবার জন্য একাধিক আচার্য আচার্যা নিয়োগ করেছেন। ব্যায়াম এবং অধ্যয়নের জন্য তাকে অনেক সময় দিতে হয়। ধনঞ্জয়ের এগুলিতে খুব অনুমতি ছিল না। তিনি সুমনাকে বলেছিলেন, 'তুমি ছিলে ক্ষত্রিয়কন্যা, তাই অস্ত্রশিক্ষা, ভারোত্তোলন এসব তোমার পিতামহ তোমাকে শিখিয়েছিলেন বংশের ধারা অনুসরণ করেই। আমার কন্যার এসবে প্রয়োজন কী?'

—কোথায় আবার কজন ক্ষত্রিয়কন্যাকে তুমি অস্ত্রশিক্ষা করতে দেখলে সেট্‌ঠি। আমি তো দেখি না। পিতামহী বলতেন যবে থেকে মেয়েরা অস্ত্রচালনা করতে ভুলে গেল তবে থেকেই তাদের দাসীর দশা!

ধনঞ্জয় হেসে বলেছিলেন, 'আমার গৃহে অস্ত্রশিক্ষা না করে এলেও তোমার দাসীর দশা হত না প্রিয়ে। তুমি তো জানো পাঁচটি বাণ তুমি প্রথমেই আমার ওপর ব্যয় করে তবে এ গৃহে এসেছ।'

সুমনা বলেছিলেন, 'কৌতুক রাখো সেট্‌ঠি, আমি অস্ত্রচালনা না জানলে কোথায় থাকতে আজ তুমি আর কোথায় থাকতাম আমি! মনে পড়ে? মনে পড়ে পূর্বদেশে বাণিজ্যযাত্রার কথা?'

এটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়াই ছিল যথেষ্ট। ধনঞ্জয় বিশাখার শস্ত্রশিক্ষায় আর আপত্তি করেননি।

এখন কর্মকার গ্রামের প্রত্যন্ত বনে তমালশ্রেণীর তলায় হরিতাভ সরসীর জলের দিকে তাকিয়ে সুমনা আক্রান্ত হলেন মধুর, রোমাঞ্চময় অতীতস্মৃতিজ্বরে। সুমনা এখন আর রাজগৃহ থেকে সপ্তাশ্ববাহিত রথে সাকেতে ধনীশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়ের গৃহে আদৌ ফিরছেন না। এখন বর্ষারম্ভও নয়। সুন্দর, শোভন সময় এখন। বর্ষা অতিক্রান্ত, কিন্তু হিমঋতু আরম্ভ হয়নি। সুনীলবর্ণ নভস্তল। মেঘরাজি যেন শুভ্র কার্পাসবস্ত্রখণ্ড। কোনও দেবতা তাদের ফুঁ দিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন আকাশময়। যেন শারদ পৃথিবীর অতুলনীয় স্বর্ণশোভা দেখে চেল ওড়াচ্ছে দিগ্‌দেবতারা। তাদের ছোটিকার শব্দও একটু কান পাতলেই কাষ্ঠকুট্ট পাখিদের মাধ্যমে শুনতে পাওয়া যাবে। টুক টুক টুক। কুট্ট কুট্ট কুট্ট।

সুমনা তখন সপ্তদশী। শ্বশ্রূমাতা পদ্মাবতী বললেন—'যুবতী বধূ বাণিজ্যে যাবে পতির সঙ্গে এমন অদ্ভুত সাধের কথা আমি কখনও শুনিনি। ছিঃ। পথে কত বিপদ!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বশুর মেণ্ডক বললেন—'আমিও কখনও শুনিনি, সত্যি বলছি প্রিয়ে। কিন্তু এই বধূটি ক্ষত্রিয়কুমারী, উচ্চশিক্ষিতা, তার ওপর ব্যায়ামশালায় প্রথম যখন ওকে দেখি তখন থেকেই ওই দুঃশীলা লৌহমুষলের মতো কি যেন একটা অস্ত্র দিয়ে আমাকে একেবারে ভূতলশায়ী করে ফেলেছে।'

শেষের কথাগুলি অবশ্যই মেণ্ডকের স্নেহকৌতুক। তিনি রাজগৃহের এক শস্ত্র প্রতিযোগিতা উৎসবে সুমনাকে প্রথম দেখেছিলেন। এবং দেখে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ধনঞ্জয়ের বধূ নির্বাচন করেছিলেন।

পদ্মাবতী বললেন— 'এই বিশাল পরিবার। বিশাল গৃহ। এতগুলি পুত্র-কন্যা, বধূ, পৌত্র-পৌত্রী, আত্মীয়, পরিজন। তুমি গহপতি হয়ে যদি এমন স্বেচ্ছাচারিতা কর তবে কে তোমায় মানবে? আমি বরং অবসর নিই। তুমি তোমার পুত্রবধূ কোকিলাকেই এবার থেকে সংসারের ভার দাও। আমি সমনদের কাছে ধর্মদেশনা শুনে কাল কাটাব।' তিনি দ্রুত পদক্ষেপে চলে যাচ্ছিলেন।

সুমনা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর হাতদুটি ধরল— 'আমি যাব না মাতা, যাব না, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না।' সুমনার চোখে সহসা জল আসত না, সেদিন চোখ দুটি ভিজে উঠেছিল।

—'আমি কি তাই বলেছি মা?' পদ্মাবতী তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'আসল কথা কি জানো, তুমি যদি এভাবে যেতে চাও, তবে গৃহের অন্য বধূ-কন্যাগুলিও অসম্ভব সব ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকবে। তখন কী করে সেসব পূরণ করব বল?'

শ্বশুর মেণ্ডক মৃদু হেসে বললেন— 'সে ভয় কর না প্রিয়ে, এত বধূই তো এসেছে এ গৃহে, কে কবে দেশে দেশে ভ্রমণ করবার আশায় সার্থবাহর পিছু নিয়েছে বলো? কে-ই বা শিক্ষা করেছে ধনুর্বেদ! পরশু আর কার হাতেই বা এমন মানায়?'

দেবি পদ্মাবতীর অনুমতি এবং আশীর্বাদ নিয়ে সুমনা যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন তাঁর পরনে যোদ্ধৃবেশ। পুরুষদের মতো অধোবাস। ঊর্ধ্বাঙ্গে কঞ্চুক। মাথার চুলগুলি চুড়ো করে বেঁধে একটি উষ্ণীষ পরে নিয়েছিলেন। গৃহের অন্য বধূগুলি নিন্দা করেছিল, অবশ্য প্রকাশ্যে নয়। ভদ্দিয়র আত্মীয়-বন্ধু প্রতিবেশীরাও কি আর সমর্থন করেছিলেন? কিন্তু মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর মুখের ওপর কথা বলবে কে?

অঙ্গদেশ পেরোলেই পথে খালি জঙ্গল, জঙ্গল আর জঙ্গল। রথ চলবার যোগ্য পথ তো ছিলই না। গো-শকটগুলি নিয়ে ধনঞ্জয় প্রায়ই সমস্যায় পড়ছিলেন। সুমনা ও ধনঞ্জয় ছিলেন অশ্বের ওপর। শরৎকাল, রোদ অসহ্য হয়ে উঠলে মাথার ওপর ছত্র ছিল। বৃষ্টি হয়নি। জঙ্গলগুলি হিংস্র শ্বাপদে পূর্ণ। বিশ্রাম করবার সময়ে তিন-চার জন দাসকে বৃক্ষের ওপরে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা প্রহরা দিচ্ছে। শকটগুলি বৃত্তাকারে রেখে, তার বাইরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছিল। বৃত্তের ভেতরে বস্ত্রাবাসে মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের থলিগুলি নিয়ে বলবান সশস্ত্র দাস এবং দলের অন্যান্য বণিকরা। কিন্তু সুমনার আগ্রহে তাঁদের স্কন্ধাবারটি রচিত হয়েছিল কয়েকটি ঘনপত্র সু-উচ্চ বৃক্ষের আড়ালে। তখন সদ্য বিবাহিত। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য যেন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মনে হচ্ছিল নতুন প্রণয়যুক্ত হয়ে। কার্তিকী পৌর্ণমাসীর অবারিত জ্যোৎস্না দুধের ধারায় স্নান করিয়ে দিচ্ছে সেই অরণ্যের অচেনা গাছগুলি, বন্য কুসুমের উগ্র গন্ধ ছুটেছে মুক্তধারায়। অগ্নিবলয়ের বাইরে নিশ্ছিদ্র অমিস্রা। তার ভেতরে শকটগুলির, বলদগুলির, বস্ত্রাবাসগুলির কালো কালো আকৃতি।

—কী সুন্দর দ্যাখো দ্যাখো? সুমনা বললেন ধনঞ্জয়কে।

—ধনঞ্জয় একবার চারদিকে দৃষ্টিপাত করেই বললেন— 'কাকে সুন্দর বলছো প্রিয়ে, ওই ঘন কৃষ্ণগিরিসন্নিভ দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে? না এই ভৌতিক ছায়াগুলিকে, যারা আগুনের শিখার মধ্যে কাঁপছে, আকার হারাচ্ছে আবার আকার পাচ্ছে?

সুমনা বিস্মিত হয়ে বললেন— 'সবই, আর্যপুত্র, এ ছাড়াও আছে পত্রালির ফাঁকে ফাঁকে গলে-পড়া চান্দ্রেয় দুধের ধারা, উতল করা সৌরভ, মাঝে মাঝে নৈশ পাখির তীব্র ডাক।'

—'ভয়ঙ্কর বলো, নারকীয় বলো, পরিচিত পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্নাধারাটা পর্যন্ত যে বৈতরণীর স্রোতোধারা মনে হচ্ছে আমার। যেন পরপারে যাবার জন্যে আমাদের আহ্বান করছে। আর ওই কটু গন্ধকে তুমি সৌরভ বলছ প্রিয়ে, রাতের পাখিগুলিকে কি জন্মের সময়ে কেউ জিভে মধু দেয়নি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেসে ফেললেন সুমনা। হঠাৎ মনে হল সেনিয়, সেনিয় থাকলে তাঁর কথার অর্থ বোধ করতে পারত। কিন্তু সেনিয় তো এখন রাজা, এমন শৌর্যবীর্য দেখাচ্ছে যে, শ্রাবস্তী থেকে স্বয়ং মহারাজ মহাকোশল তাঁর কন্যাকে তার হাতে অর্পণ করেছেন। অনেক গুণ হয়েছে সেনিয়র। সে আজকাল গুপ্তভাবে বৈশালীতে বিখ্যাত জনপদশোভিনী অম্বপালির গৃহে যায়।

—'দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন সুমনা?' তরুণ ধনঞ্জয় ততক্ষণে গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেছেন সুমনাকে—ধনঞ্জয় বললেন, 'অবশ্যই সুন্দর এই রাত্রি, তোমায় আমায় গোপনতা দিচ্ছে বলে, সুন্দর ওই অগ্নিবলয়, আমাদের সুখরাত্রিটি রক্ষা করছে বলে, আর জ্যোৎস্না, তোমার বর্ণকে মোহময় করেছে বলে। বনকুসুমের ওই উগ্র গন্ধ আমাকে কেমন কামোত্তেজিত করেছে দেখো! পাখিগুলি ডাকতে থাকুক, আমার গদ্‌গদ্ ভাষণ আর তোমার শীৎকার ধ্বনি চাপা পড়ে যাবে।'

বস্ত্রাবাসের বাইরে চলে এলেন দুজনে। চুম্বনমত্ত ধনঞ্জয়। সুমনার অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে। তাঁর বক্ষের বর্মটি খুলতে খুলতে ধনঞ্জয় বলছেন—'পুরুষ বেশে তোমায় আরও মোহময়ী দেখায় সুমনা, এই বর্মের বাধাগুলি তোমার-আমার মধ্যে রেখে তুমি আমাকে আরও দুর্দম, আরও উদ্দাম, উন্মাদ করে তুলছ।'

সহসা একটা শব্দ হল। সুমনা নিমেষে ধনঞ্জয়ের মুখের ওপর হাত-চাপা দিয়ে বললেন—'শুনতে পেলে?'

—'আরে বন্য বিড়াল কি ওই জাতীয় প্রাণী হবে, আমি তো আমার শরীরে দ্রুত রক্ত সঞ্চালন শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

ধনঞ্জয়ের কথা শেষ হল না, সুমনার হাতের তীর ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলে গেল শব্দ লক্ষ্য করে। অর্ধোন্মোচিত সুমনা, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন ধনঞ্জয়। তীব্র চিৎকারে রাত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পর্যবেক্ষকদের হাতে উল্কা জ্বলে উঠেছে। হিংস্র জন্তু নয়, হিংস্র মানুষই আক্রমণ করেছে তাঁদের। অস্তোন্মুখ চাঁদের মৃদু আলোয়, অন্ধকারের সঙ্গে গা মিলিয়ে বলবান কালো রঙের মানুষ সব। পর পর তিনজনকে ধরাশায়ী করলেন সুমনা। অন্যরা পালিয়ে গেল। আহত তিনটি বনেচরকে দাসেরা ক্ষতস্থান বেঁধে সঙ্গে নিয়ে নিল। পণ্যসম্ভার বইতে এরকম দাস যত পাওয়া যায়, ততই ভালো। স্থলনিয়ামক বলল— 'এরা দুর্দান্ত নরমাংসভোজী যক্ষ।' লোকগুলি রক্তচক্ষে তাঁদের দিকে তাকাচ্ছিল। সবাই ভয় পাচ্ছিল, তাদের ভাষা কেউ বুঝছিল না। হাত রজ্জুবদ্ধ অবস্থায়, পানীয় জল ও সামান্য খাদ্য দিয়ে তাদের চম্পা পর্যন্ত নিয়ে আসা হল। কী আশ্চর্যের কথা, তারা কিন্তু একবারও অরণ্যে ফিরে যেতে চায়নি। হাতের-ইঙ্গিতে জানিয়েছিল অরণ্যে ফিরে গেলে তাদের কৌমের লোকেরা তাদের গ্রহণ তো করবেই না। বরং মেরে ফেলবে। আর্যদের স্পর্শে তারা নাকি দূষিত হয়ে গেছে! অদ্ভুত! অবশেষে নৌদাস হিসেবে যখন তাদের পট্টনে বিক্রি করে দেওয়া হল, তখন তাদের কী গোঙানি! অশ্রুচ্ছন্ন তাদের চোখগুলি দেখে মনে হয়েছিল তারা জীবনের সমস্ত আশা-ভরসা হারিয়ে ফেলেছে! নরমাংসাশী মানুষগুলিকে তো সঙ্গে রাখাও যায় না!

—'দেবি, আপনার আহারের আয়োজন হয়েছে।' চমকে মুখ তুলে সুমনা দেখলেন দাসী দুটি দুদিকে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জোড়হস্ত।

তিনি বললেন— 'এখানে নিয়ে এসো।'

—'এখানে?' দাসী দুটি পরস্পরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করল।

গত কয়েক মাস ধরে রাজগৃহে রোমাঞ্চক সব ঘটনা ঘটছে। কয়েক মাস না বলে কয়েক বছর বলাই ভাল। সন্দেহ নেই, সাকেতের দেবি সুমনা সেইজন্যেই এতো আনমনা। কিছু ভাল লাগছে না তাঁর। নির্জনে, একা থাকতে চান।

ওরা চলে যাচ্ছিল, সহসা সুমনা ডেকে উঠলেন— "সিরিমা, রতি কি ভোজ্য আনছ?"

—'কেন দেবি মাংসোদন, ঘৃতপক্ব রোহিত…'

—'এই গ্রাম থেকে কিছু ফল, দধি এসব কেনা যায় না?'

—'কিনতে হবে কেন দেবি? সব সঙ্গে আছে।'

—'তাহলে তাই দাও, আর শোনো শাল কিম্বা পদ্মপুটে দিও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোজ্য নিয়ে এলো দাসীরা। পাটুলি গ্রামের উৎকৃষ্ট চিপিটক, একটু ভিজিয়ে দিলেই নরম হয়ে যায়। সেই চিপিটক, দধি ও মধু দিয়ে মেখে এনেছে দাসীরা। সুপুষ্ট সোনার রঙের কদলী। মোদক ছিল তিন-চার রকমের। স্পর্শ করলেন না সুমনা। চারদিকে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে মৃদু হাওয়া বওয়ার সিরসির শব্দ। মাথায়, কোলে, আশেপাশে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা, পাখিদের মধ্যাহ্নকূজন, সরোবরের সবুজ জলে লাফ দিয়ে বেড়াচ্ছে জলকীট। পদ্মপত্রের সুশোভিত পাত্রে ভোজন সমাধা করে, পাতাগুলি মুড়ে একটু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সুমনা, অমনি একটি কাক সেটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দাসীরা রৌপ্যভৃঙ্গারে করে আচমনের জল দিতে দিতে বলল— 'ভাগ্যে ভোজনের পরে নিয়েছে, আমরা তো ভয় পাচ্ছিলাম...' একটি কাঠবিড়ালি আর একটির পেছন পেছন লেজ তুলে একটি শাল্মলী গাছের গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

ধীরে ধীরে মধ্যাহ্নের অরণ্যের মধ্যে বনদেবীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুমনা। এখন তাঁর সঙ্গের লোকজন আহার করবে। একটু বিশ্রাম। তার পর যাত্রা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেবার বাণিজ্যযাত্রায় এক দস্যুদলপতিকেও তিনি হত্যা করেছিলেন। এক প্রকার দৈবাৎ তাকে আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। সেই অঞ্চলের ভূমি ছিল ঢেউ খেলানো, মাঝে মাঝেই ছোট ছোট টিলা উঁচু হয়ে আছে। গুল্ম তো আছেই, বৃক্ষও নেহাত অল্প না। অপরাহ্ণে ধনঞ্জয় যখন গণনাকার্যে ব্যস্ত, তিনি ধীরে ধীরে টিলায় উঠে গিয়েছিলেন সন্ধ্যাসূর্য দেখবেন বলে। তখনই একদল লোকের মাথা দেখতে পেলেন টিলার ওধারে। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছিল ঠিক কখন কীভাবে এই বণিকদের হত্যা করে তাদের ধন হস্তগত করবে। সুমনা একটি বনমহিষের মুণ্ডের মতো পাথর আলগা করে ফেললেন কয়েকবার নাড়িয়ে নাড়িয়ে, তারপর সমস্ত শক্তিতে গড়িয়ে দিলেন ওধারে। সম্ভবত দলপতিটিই ছিল পাথরটির অবতরণের মুখে। তার মাথাটি চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই পৈশাচিক আর্তনাদ জীবনে কখনও ভুলবে না সুমনা। প্রথমটায় তিনি থেমে গিয়েছিলেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো। তারপর ত্বরিতে নেমে এসে নিজের বস্ত্রাবাসের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন। চারদিকের টিলায় টিলায় প্রতিহত হয়ে সেই আর্তনাদ তাঁদের সার্থকে চঞ্চল করে তুলেছিল। দস্যুরা বোধ হয় দেবতার কোপ মনে করে পালিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের স্থলনিয়ামকও পর্বতদেবতার পূজা দিয়েছিল। কেউ টের পায়নি এটি তাঁরই কীর্তি এবং পূজার নৈবেদ্যটি আসলে তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু সেই দস্যুদলপতির বিদলিত মস্তক, রক্তে মস্তিষ্কের শুভ্র অংশে মাখামাখি দেহ ও ভূমি, শকুন-শৃগালের উৎসব, এসব দেখে তাঁর এমন অসুখ করেছিল যে, বহুদিন সুদ্ধু সুগন্ধি স্নিগ্ধকর পানীয় বা ফলের রস ছাড়া আর কিছু মুখে করতে পারেননি।

কথাটা চেপে রেখেছিলেন অনেকদিন। ভদ্দিয়তে ফেরবার পর পূর্বদেশের সুনীলবর্ণ সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র পরে কপালে কুঙ্কুম-চন্দনের পত্রলেখা এঁকে, গন্ধমালা, এবং শঙ্খকঙ্কন পরে অতি সুন্দর হয়ে যেদিন ধনঞ্জয়ের শয্যায় গেলেন, মিলিত হবার পূর্ব মুহূর্তে কেঁদে ফেলেছিলেন।

—'আর্যপুত্র, আমি হত্যা করেছি, আমার হাতে রক্ত লেগে আছে।'

—'সে কী ?'

তখন সব কথা খুলে বলতে ধনঞ্জয় হেসে বলেছিলেন— 'এই কথা ! অন্যায় তো কিছু করনি। দলপতি ওভাবে না মারা গেলে ওরা আমাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত হয়তো। হয়তো আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি পারত না, তবু কিছু লোকক্ষয় তো হতই ! এত তাম্র, রূপা, মণিমুক্তা, সূক্ষ্মবস্ত্র, স্বর্ণ এসব নিয়ে ফেরা হত না। তবে তুমি বড় দুঃসাহসিকা। আমি আর তোমায় নিয়ে কোথাও যাচ্ছি না।'

ধনঞ্জয়ের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন সুমনা। ধনঞ্জয় বলেছিলেন—'তোমার দেহে শক্তি থাকলে কি হবে প্রিয়ে তোমার হৃদয় কুসুমগুচ্ছের মত কোমল।'

পথের দিকে এগিয়ে গেলেন সুমনা। রক্ষীপ্রধানকে জিজ্ঞাসা করলেন— কতক্ষণে সাকেত পৌঁছব ?'

—'কাল সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছে যাবার চেষ্টা করছি দেবি। সকালে অতটা বর্ষণ না হলে দ্বিপ্রহরেই পৌঁছে যেতাম।'

সে কথা সুমনা জানেন। সকালের ওই সময়টা মধ্যজৈষ্ঠে অমন বৃষ্টি। খুবই শুভঙ্কর। ফসল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাল হবে। ধনধান্যে পূর্ণ হবে বসুন্ধরা। তবে মধ্যশ্রাবণ অবধি যদি এই প্রকার চলে বা এর চেয়ে অধিক বৃষ্টি হয়, নদীগুলিতে জলস্ফীতি হবে, প্রাবনের ভয় থাকবে। অচিরবতী ভীষণ আকার ধারণ করবে। সে এক এক সময়ে এতই ক্ষীণা থাকে যে, হেঁটে পার হওয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় তারই রূপ ভয়ঙ্করী। সরযূ অবশ্য সারা বছরই সমান নাব্য। যথেষ্ট গভীর। সহসা জলস্ফীতি হয় না।

দাসীরা এসে ডাকল। সুমনা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ভেতরটা উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে আছে। বিশাখার জন্য হঠাৎ কেমন উৎকণ্ঠা হচ্ছে। রাজপ্রাসাদ থেকে যেসব বার্তা তিনি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন সেসব কি শুভ ? ধনঞ্জয় কী বলবেন ? বিশাখা ? বিশাখার মাত্র পনেরো বছর পার হয়েছে। এইটুকু বয়সের পক্ষে সে একটু বেশি শিখেছে, বুদ্ধিমতীও, কিন্তু বালিকাই তো ! তাঁর একমাত্র। ভদ্দিয়তে তাঁর দেবরবধূরা বহু পুত্রবতী। কিন্তু ধনঞ্জয় প্রায় সারাটা যৌবনই কাটিয়েছেন বাণিজ্যযাত্রায়। একটির বেশি সন্তান দিতে পারেননি সুমনাকে। বিশাখা তাঁর মাথার মণি, তাঁর হৃৎ-কমল। অন্য নারী যেমন চোখে কন্যাকে দেখে— লালন-পালন করা হল, বিবাহ হল, হয়তো বহুদূরে, সারা জীবনে আর দেখা হল না, তিনি কেন এভাবে দেখতে পারেন না। কেন মনে হয়, বিশাখা চোখের আড়াল হলে তিনি বুঝি ব্যর্থ হয়ে যাবেন, হয়তো-বা উন্মাদ হয়ে যাবেন ! কেন এমন হল ? ঘোড়াগুলো আরও জোরে ছুটছে না কেন ? সারথি কি প্রচুর মোদক খেয়ে মদ্য পান করে উদরে হাত বোলাতে বোলাতে রথচালনা করছে ?

হঠাৎ সুমনা ডাকলেন— 'সূতপুত্র ?'

—'বলুন দেবি।'

—'আমাকে একটু রথ চালনা করতে দাও।'

—'বলেন কি দেবি ! আপনি ? না, না, আমায় ক্ষমা করুন।'

—'আমার কথা শোনো সূত, আমি পারি, শিক্ষা করেছি।'

—'সাত ঘোড়ার রথ দেবি, এ চালানো খুব কঠিন কাজ। তাছাড়া ঘোড়াগুলি আপনার পরিচিত নয়।'

সুমনা উঠে দাঁড়ালেন। দাসী দুটি উৎকণ্ঠিত। রক্ষী কজন বিস্মিত, উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে আছে, সুমনা সূতের হাত থেকে রশি নিলেন। ঘোড়াগুলি প্রথমটা কেমন অস্বস্তিতে গা মোড়ামুড়ি করছিল, তারপর সহসা তারা স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুটে চলল।

AMARBOI.COM

৬

মাথার ওপর অর্ধবৃত্তাকার সোনালি রঙের চাঁদোয়া। তা থেকে ঝুলছে মুক্তার ঝালর। চতুষ্কোণ সিংহাসনের ওপর কোমল স্থূলাসন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সবার ওপরে রয়েছে সিংহচর্মের আস্তরণ। সিংহাসনের বাহুগুলিও সিংহমুখ। স্ফটিকের পাদপীঠের ওপর পা দুটি। দু'ধারে সারি সারি বসেছেন অমাত্যরা, রাজন্যরা, সবারই পেছনে চামর দোলাচ্ছে যুবতীরা। মণিকুট্টিমের ওপর নানা রঙের পাথরের চিত্র করা। কস্তুরীর সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়। শ্রেণীক বিম্বিসারের রাজসভা। গান্ধার দেশ থেকে রাজদূত সভায় আসছেন ঘোষক জানাল। মহারাজ বাম উরুর ওপর ডান উরু ন্যস্ত করে বসেছিলেন। নামিয়ে নিয়ে আবার পাদপীঠের ওপর দুটি পা-ই রাখলেন। চণক লক্ষ করলেন রাজার প্রগাঢ় যৌবন। ব্যায়ামপুষ্ট, তামার পাটার মতো বুকখানা। তার ওপর শ্বেতচন্দনের অনুলেপন। গলায় রক্তাভ মুক্তার দীর্ঘ মালা। বাহুর সুপুষ্ট পেশীর ওপর সোনার অঙ্গদ। কানে মুক্তাখচিত স্বর্ণাভরণ। শুভ্র পট্টবস্ত্রে সোনার পাড়। রাজমুকুটে বহুমূল্য হীরক ঝকঝক করছে। একটু আধটু মুখ ফেরালেই চতুর্দিকে আলো ঠিকরে যাচ্ছে। শ্মশ্রু নেই, গুম্ফদ্বয় নাতিদীর্ঘ, অতি সুপুরুষ, সুমুখ সন্দেহ নেই। দেখতে দেখতে চণকের কেমন রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ইনিই তাহলে সেই বিম্বিসার ! অতি অল্প সময়ের মধ্যে যিনি সমগ্র উত্তর দেশে মধদেশে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন ! মুখে একটা হাস্যচঞ্চল ভাব, চোখে সামান্য কৌতুক, কিন্তু মুখের ভাব পরক্ষণেই পালটে অতি গম্ভীর হয়ে যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান্ধারের রাজদূত সংখ্যায় তিনজন। যদিও সহচর এবং রক্ষী আরও অনেক। যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে তাঁদের রাজ-অতিথিগৃহে রাখা হয়েছিল সাত দিন। আজ অষ্টম দিন রাজাজ্ঞায় সভায় উপস্থিত করা হচ্ছে।

প্রথমেই দূত-প্রধান মহামাত্র দর্ভসেন মহারাজকে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে প্রথম উপঢৌকন নিবেদন করলেন। তাঁর আদেশে দুজন দাস এসে দূরে সভাকক্ষের দরজার কাছে একটি গোটানো গালিচা রাখল তারপর সহসা খুলে গড়িয়ে দিল। মুহূর্তে সভার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঢেকে গেল জমাট রক্তের মতো বর্ণের কোমল পশমে। গালিচার ওপর বহু চিত্র করা। সবুজ, নীল, শুষ্ক তৃণরাশির মতো হলুদ। রমণীরা আসনে বসে আঙুরগুচ্ছ থেকে আঙুর নিয়ে খাচ্ছে লীলায়িত ভঙ্গিতে, বিচিত্র সব পাখি, পাত্রমিত্র সহ রাজারা সভায় বসে আছেন। সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন। রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'পারস্যের গালিচাশিল্পী কি মগধের সভাকক্ষের পরিমাপ নিয়ে গিয়েছিলেন!'

বিনীত হেসে দর্ভসেন বললেন, 'মহারাজ, ভৃগুকচ্ছের বণিকদের কথাবার্তা থেকে অনুমান হয় আমাদের জম্বুদ্বীপে সভাকক্ষের যেসব আয়তন ব্যবহার করা হয়, পারস্য দেশেও তাই-ই সিদ্ধ। মাপ-জোকের তত্ত্ব কারুশিল্পীরা সর্বদেশেই একভাবে বোঝেন। আমাদের শুল্বসূত্র পরিমাপের আদর্শ। তার থেকেই সব এসেছে। ঋষিরা দেবতাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তো!'

দ্বিতীয় দূত চণক নত হয়ে হাত জোড় করে বলে উঠলেন, 'জ্ঞান এবং শিল্পের রাজ্য সম্ভবত সসাগরা ধরণীতলে একটাই। আহা যদি রাষ্ট্রশিল্পও অনুরূপ হত!'

মহারাজ বিম্বিসার চকিত হয়ে বললেন, 'কী বললেন?'

দর্ভসেন সবার অলক্ষ্যে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানলেন চণকের দিকে। চণক আবার নমস্কার করে বললেন, 'অপরাধ মার্জনা করবেন মহারাজ, অধীন তক্ষশিলার দেবরাত-পুত্র চণক। অধীত বিষয়গুলি নিয়ে মনে মনে আলোচনা করতে করতে এসব কথাই মনে উদয় হয় কি না!'

বিম্বিসার যেন শরের মতো সোজা হয়ে গেলেন, 'আপনি আচার্য দেবরাতের পুত্র? অহো, আজ আমার কী সৌভাগ্য! সময়ান্তরে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক রইলাম।'

রাজা সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন, লক্ষ করলেন চণক। শরীর একটু শিথিল। শরীর থেকে মন অন্যত্র সরে গেলে যেমন হয়। কিন্তু মুখে একটা রাজকীয় প্রসন্নতা, সুভদ্র মনোযোগের আভাস ফুটিয়ে রেখেছেন। প্রতারিত হচ্ছেন দর্ভসেন এবং সম্পাতি। হয়তো সমবেত রাজন্য ও অমাত্যরাও। কিন্তু চণক বুঝতে পারছেন, এই সুদর্শন রাজার ভেতরে কোথাও অধৈর্য প্রবেশ করেছে।

দর্ভসেন দ্বিতীয় উপঢৌকন নিবেদন করলেন। আগাগোড়া অপূর্ব সূচীকর্মে খচিত আটটি পশমি শাল। উভয় পিঠেই কারুকাজ একরকম। রঙগুলি অত্যুজ্জ্বল নীলকান্তমণির, পদ্মরাগের, গলিত স্বর্ণের, গজদন্তের, প্রস্ফুটিত কিংশুকের, শ্যামশষ্পের, এবং দুটি একেবারে বলাক-পাখার মতো শুভ্র। সভাস্থল যেন ঝলমল করে উঠল। সূক্ষ্ম সূচীকর্ম দেখতে দেখতে সকলে সাধুকার দিয়ে উঠলেন।

তৃতীয় উপঢৌকন এলো সূক্ষ্ম দুকূল পরিহিত অপরূপ সুন্দরী একটি রমণী। দর্ভসেন বললেন, 'এই রমণী অসাধারণ নৃত্যকুশলা, সঙ্গীতেও এঁর জুড়ি মেলা ভার। স্বয়ং রাজার তত্ত্বাবধানে চৌষট্টি কলায় শিক্ষিত হয়েছেন ইনি।' রমণী জোড় হাতে অপরূপ ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। অমাত্যরা বিস্ফারিত চোখে দেখছিল। রাজাগুলির চোখে কামমোহ ও লোভ যাওয়া-আসা করছিল। খালি বিম্বিসারের মুখের ওপর দিয়ে একটি লঘু মেঘের মতো কালো ছায়া ভেসে গেল। খুব সূক্ষ্ম একটি ভ্রূকুটি উঠেই মিলিয়ে গেল তাঁর কপালে। চণক দেখলেন।

দর্ভসেন এবার গান্ধাররাজ পুষ্করসারীর বার্তা শোনাবার জন্য চণককে ইঙ্গিত করলেন। চন্দন কাঠের আবরণ থেকে বার করে—শ্বেত রেশমের ওপর স্বর্ণসূত্র দিয়ে প্রস্তুত লিপিটি মেলে ধরলেন চণক।

'হর্যংককুলপ্রদীপ মগধাধিপ মহারাজ বিম্বিসারের প্রতি গান্ধাররাজ পুষ্করসারীর প্রার্থনা— আজীবন প্রীতি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক কুশলে প্রযত্ন। মহারাজ পুষ্করসারী পুনশ্চ নিবেদন করছেন গত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক মাস যাবৎ অবন্তীরাজ প্রদ্যোত মহাসেন বিনা কারণে গান্ধাররাজ্যকে উত্ত্যক্ত করছেন। প্রান্তিক গ্রাম ও জনপদগুলি অবন্তীর লুণ্ঠনশীল সৈন্যদের দ্বারা বিপর্যস্ত। শোনা যাচ্ছে আগামী শরৎকালে অবন্তীরাজ স্বয়ং গান্ধার আক্রমণে আসবেন। এমত সময়ে প্রতিবেশী সাগলরাজ্যের জামাতা মহামান্য মগধাধিপ যদি অবন্তীকে প্রশমিত করবার জন্য সহযোগিতা করেন তবে এই বন্ধুত্বকে দেব পুক্কুসারী তাঁর শিরোভূষণ করবেন। এবং মগধের অনুরূপ বিপৎপাতে সহযোগিতা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবেন।'

শুনতে শুনতে মহারাজ বিম্বিসারের মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন হয়ে যাচ্ছিল। লিপিটি চণকের মুখস্থ, তিনি সামনে সেটা ধরে অর্ধনিমীলিত চোখ মেলে রেখেছিলেন রাজার মুখের দিকে। ক্ষণপূর্বের রহস্যালাপ, ঔৎসুক্য, এ সবের চিহ্ন আর সেখানে নেই। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। কথা শেষ হতে আর একটু শিথিল হয়ে বসলেন। পেছনে ঠেস দিয়েছেন। তুলে দিয়েছেন ডান উরুর ওপরে বাম উরু। মুখ প্রসন্ন। যেন বরাভয় আপনি প্রকাশিত হচ্ছে মুখমণ্ডলে। সামান্য পরে বললেন, 'গান্ধাররাজ পরমপ্রাজ্ঞ দেব পুক্কুসাতীকে আমার নমস্কার জানাই। দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি উত্তর পাবেন। আপনারা দূত মহোদয়রা এখন বিশ্রাম করুন। রাজগৃহে আছে বহু শোভনোদ্যান, চিত্রগৃহ, নাট্যশালা, প্রাসাদেও নৃত্য-গীতাদি প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। অন্যত্রও আছে। মহামান্য দূতগণ যেভাবে কালক্ষেপ করতে চাইবেন, তাঁদের দাস-দাসীরা সেভাবেই সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবে।'

উঠে দাঁড়ালেন দর্ভসেন, সঙ্গে সম্পাতি, চণক। তিন জনে নমস্কার জানালেন। রাজা বললেন, 'সত্থি সত্থি।' তাঁর চোখ দুটি নিমেষের জন্য চণকের চোখ ছুঁয়ে গেল।

দুজন আধিকারিক আভূমি প্রণত হয়ে জানাল নগরবধূ শ্রীমতীর গেহে নৃত্য-গীত এবং কাব্য-পাঠের আয়োজন হয়েছে। রাজগৃহের অনেক গুণিজনই আজ সেখানে যাচ্ছেন। গান্ধারদূতদের নিয়ে যাবার জন্য রথ প্রস্তুত।

দর্ভসেন তাকালেন চণকের দিকে। চণক বললেন, 'দুশ্চিন্তায় বহুদিন কেটেছে। মন্দ কী? সম্পাতি, তুমি কি বলো?'

সম্পাতি বিনীত স্বরে বলল, 'মহামাত্য দর্ভসেন যা আদেশ করেন!'

আকাশে নীল মেঘ। গুরু গুরু ধ্বনি হচ্ছে। দর্ভসেন শঙ্কিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বৃষ্টিটা এসে পড়বার আগেই নগরবধূর গৃহে পৌঁছতে পারবো তো?'

তাঁর পেছন পেছন রথে উঠতে উঠতে চণক বললেন, 'আর্য, এই প্রথম আষাঢ়ী বৃষ্টির দৃশ্য কিন্তু খুব সুন্দর। রথে যেতে যেতে যদি বৃষ্টি এসেই যায়, খুবই উপভোগ্য হবে সেটা।'

দর্ভসেন ভ্রূকুটি করে নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'কার্যোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত কোনও সুদৃশ্যই আমার রুচিকর লাগবে না, সে তো তুমি জানো চণক!'

চণক প্রায় আত্মগত বললেন, 'কার্যোদ্ধার কি সে অর্থে হবে?'

সম্পাতি ফিরে তাকাল। রথ ছুটেছে। দর্ভসেন বললেন, 'কী বললে?'

—কিছু না।

দর্ভসেন জোর গলায় বললেন, 'এই যে শ্রীমতীর গৃহে যাচ্ছি, নৃত্য-গীত কি আর তেমন করে মনকে স্পর্শ করবে? কিছুক্ষণ শিথিল হওয়া একটু। এর চেয়ে অধিক কিছু নয়।'

সম্পাতি চণকের দিকে তাকিয়ে খুব সূক্ষ্ম একটি হাসি হাসল। অমাত্য দর্ভসেনের রমণীপ্রীতি তক্ষশিলার কারও অজানা নয়। এই যে রাজান্তঃপুর থেকে জিতসোমাকে উপঢৌকন পাঠানো হল মগধরাজের কাছে, এ পরিকল্পনা খুব সম্ভব তাঁরই। দর্ভসেনের পাঁচটি স্ত্রী। এ ছাড়াও তক্ষশিলার নগরশোভিনী গণিকা চন্দ্রাননা তাঁর বিশেষ পক্ষপাতপুষ্ট। নগরপ্রান্তে তাঁর যে উপবন এবং উদ্যানগৃহ আছে, সেখানে রাজান্তঃপুরের অনেক সুন্দরী নটী ও দাসীই অভিসারে যায়। দর্ভসেন অবশ্য বলেন গূঢ়পুরুষ আর গণিকা, এরা একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গূঢ়পুরুষের বৃত্তিই তাকে গণিকার কাছে যেতে বাধ্য করে। রাজপুরীর রমণীগুলিই কি অল্প সংবাদ রাখে! তাদের সাহায্য গূঢ়পুরুষদের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাঁর সর্বদা প্রয়োজন হয়।

শ্রীমতীর গৃহের শ্রী-মণ্ডপটি বৃত্তাকার। চারদিকে ঘিরে আছে ছোট ছোট কাঠের স্তম্ভ। তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দরী রমণীমূর্তি তক্ষণ করা। স্তম্ভের ওপর থেকে মালা ঝুলছে, তার ওপর দীপবর্তিকা ; এখন দিনের বেলা, তাই সেগুলি জ্বলছে না। প্রত্যেকটি স্তম্ভের সামনে অতিথিদের জন্য আসন। অদূরে একটি কৃষ্ণকায় বাদক মৃদঙ্গ নিয়ে বসেছিল। আর একটি মেয়ের হাতে বীণা। স্নিগ্ধ সবুজ রঙের বসন পরে শ্রীমতী বসেছিল। দীর্ঘ চোখে দীর্ঘতর কাজলরেখা। ভুরু দুটি কান ছুঁয়েছে। বর্ণ শ্যাম, গালে লালিমা। ঠোঁট দুটিও টুকটুক করছে। বুকের ওপর কুমকুম ও চন্দনের কারুকাজ। মনে হচ্ছিল সে পট্টবস্ত্রের ওপর লাল সুতোর কাজ করা একটি স্তনপট্ট পরে আছে। গলায় একটি দীর্ঘ রত্নহার। কণ্ঠ বেড়ে রয়েছে একটি অদ্ভুত সুন্দর অলঙ্কার। তার মুখ দুটি উদ্যত সর্পের মতো। হাত নেড়ে যখন সে কথা বলছিল তখন অঙ্গুরীয়গুলি ঝলমল করে উঠছিল, কেয়ূর ও কঙ্কণের রত্নগুলিও ঝিকমিক করছিল। উঠে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে নমস্কার করে তাঁদের স্বাগত জানাল শ্রীমতী। উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। 'ইনি বোধিকুমার, রাজগৃহের বিখ্যাত কবি, ইনি বাপ্পভদ্র, আমরা বলি বপ্পকুমার। মহাশ্রেষ্ঠী কাকবলীয়র পুত্র, সঙ্গীত বোঝেন খুব ভালো। ইনি কাকবর্ণ, এ নগরের মহাপর্ণিক, ভালোবাসেন কাব্য ও সঙ্গীতসুধা পান করতে। এই যে এঁর সঙ্গে আলাপ করুন আর্য দর্ভসেন, ইনি নটশ্রেষ্ঠ চারুবাক। দু-চার দিনের মধ্যেই শ্রেষ্ঠীমহলে একটি সমাজোৎসব আছে। তাতে আর্য চারুবাক শক্রদেবের মহিমা দেখাবেন, লিখেছেন মহামান্য বোধিকুমার। যদি থাকেন, অবশ্যই আহ্বানপত্র পাঠানো হবে, আসবেন নিশ্চয়। আসবেন তো সম্পাতি ভদ্র ? চণক ভদ্র ?'

চণক দেখলেন শ্যামশ্রীমণ্ডিত তরুণীটি তাঁর দিকে যেন বিহ্বল চোখে চেয়ে আছে। তিনি সামনের দিকে কোন দুর্লক্ষ্য বিন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এত বড় কবি যখন উপস্থিত রয়েছেন, কাব্যসুধা পান করা যাক, কী বলেন শ্রেষ্ঠী বাপ্পভদ্র ? মহামাত্য দর্ভসেন, ভদ্র চারুবাক আপনাদেরও তাই মত তো ?'

—নিশ্চয়। হোক, হোক। সকলেই সম্মতি জানালেন।

বোধিকুমার তাঁর পুঁথির দুপাশের তাম্রপট্ট খুলতে লাগলেন। বললেন, 'সামান্যই রচনা হয়েছে।' মগধের চলিত ভাষায় তিনি যে কাব্যাংশটি পড়লেন তার অর্থ এই রকম :

'কত বসন্ত গর্ভে ধারণ করে তুমি অন্তর্বত্নী হয়েছ হে আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী। মধুমাসের মাধুর্যবিলাস এমন শ্যামশোভা তোমায় কেন দিল যাতে বাসন্তী জ্যোৎস্না নিজেকে পরিপূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে ? কবি ভেবেছিল বাসন্তীবিলাস থেকে জন্ম নেবে স্বয়ং রতিপতির মতো কোনও চিরযুবা, জন্মযুবা কুমার। তার বদলে তুমি এক রুদতী কৃষ্ণা কল্যাণীর জন্ম দিলে। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ক্ষয় করে যে দিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে আর দিয়ে যাচ্ছে ॥'

শেষ হতে না হতেই সভার মধ্যে সাধু সাধু রব উঠল। বোধিকুমার নত হয়ে সবাইকে নমস্কার জানালেন। মহাপর্ণিক কাকবর্ণ বললেন, 'এর পর শ্রীমতীর সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু ভালো লাগবে না। কাব্যালোচনায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল বোধ হয় কুমার বাপ্প এবং চারুবাক, তারা ভ্রূকুটি করে থেমে গেল। দর্ভসেন নিচু সুরে বললেন, 'ওহে চণক, এরা যে দেখি এদের কথ্য ভাষা দিয়ে কাব্য রচনা করতে শুরু করেছে। বলি কালে কালে আর দেখব কত ?' তাঁর কথার কিছু কিছু বোধ হয় কুমার বাপ্পের কানে গিয়ে থাকবে। সে বলে উঠল, 'ঋগ্‌বেদীয় ভাষার সঙ্গে আমাদের এখনকার দেবভাষার পার্থক্যটা তো মানেন আর্য ? ভাষা বহতা নদীর মতো। বদলে যায়, 'মর্যো ন যোষাম্ অভ্যেতি পশ্চাৎ' এখানে উপমানের পরে এসেছে বলে ন বলতে ইব অর্থাৎ মতো বোঝাচ্ছে। এ প্রকার ব্যবহার কি এখন আর পাওয়া যায় ? তারপরে ধরুন উত। বৈদিক ভাষায় এবং অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরে উত-র অর্থ দাঁড়িয়েছে বা। ভাষাকে আপনি ধরে রাখতে পারবেন না।'

দর্ভসেন চুপ করে গেলেন। চণক বললেন, 'আপনার কথা ভাববার মতো বপ্পভদ্র। একেবারেই উড়িয়ে দেবার যোগ্য নয়।'

বপ্প বললেন, 'আপনি তা হলে অনুমোদন করছেন ? জানেন বোধিকুমার আমার অন্তরঙ্গ বান্ধব, তাকে এই কাব্যটি কথ্য ভাষায় লিখতে আমিই উৎসাহ দিয়েছি। দেবভাষাতেও একটি রূপ আছে এর। সেও ভারি সুন্দর। বিদ্বানরা যদি কথ্যটিকে গ্রহণ না করেন তাহলে দেবভাষার রূপটি তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রইলই ! কবির যশোহানি হবে না। কী বলেন ?' বপ্প বোধিকুমারের দিকে চেয়ে কৌতুকের হাসি হাসলেন।

শ্রীমতী গান ধরল। ভ্রমরগুঞ্জনের মতো বীণার সুরপুঞ্জগুলি তার উচ্চারিত শব্দগুলিকে ঘিরে ঘিরে লীলায় মেতে উঠল। মৃদঙ্গের মধুর গম্ভীর ধমৎকার তার সঙ্গে। শ্রীমতী শব্দগুলি উচ্চারণ করছিল যেন অস্ফুট ভোরের কাকলির মতো।

'পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের সঙ্গে কুঞ্জে কে এলে মঞ্জুভাষ ?

রঞ্জিত এই হৃদয় যে আজ বাজছে নূপুর-শিঞ্জিতে ॥

বারে বারে ঘুরে ফিরে এই দুটি চরণ নানা সুরে নানা ভাবে নানা তালে ও লয়ে গাইতে লাগল শ্রীমতী।

সে খুবই অল্পবয়সী। মুখে এখনও সরলতার রেশ। গাইতে গাইতে তার সুন্দর চোখের দৃষ্টি কখনও পড়ছে তরুণ বাপ্পের ওপর, কখনও চারুবাকের প্রসাধিত মুখমণ্ডলে, কখনও দর্ভসেনের শঙ্খশ্বেত কপালের ওপর। কাউকেই সে তার দৃষ্টিপ্রসাদ থেকে বঞ্চিত করছিল না। গান শুনতে শুনতে বুঝতে পারছিলেন চণক এই বারবিলাসিনী অনেক শিখেছে। কিন্তু হয়তো অতর্কিত প্রণয়ের আক্রমণ এখনও লুকোতে শেখেনি। গাইতে গাইতে তার দৃষ্টি যখনই চণকের ওপর পড়ছিল, তখনই চেষ্টা করছিল চোখে চোখ মেলাতে। চোখে যেন এক নিভৃত আমন্ত্রণ-লিপি। এ কি বারবধূর লাস্য ? না প্রণয়িনীর সঙ্কেত ! অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি বুঝতে পারছিলেন না। গানের শেষে সুসজ্জিত দাসীরা সুরাভৃঙ্গারে করে মৈরেয় পরিবেশন করে গেল। এই দ্বিতীয়বার। একটু পরেই নৃত্য আরম্ভ হবে। দর্ভসেন উঠে দাঁড়ালেন। সবাইকে নমস্কার করে বললেন, 'আপনারা নৃত্যচ্ছন্দ উপভোগ করুন। আমরা তিনজন এবার যাই। বহু কাজ।' শ্রীমতীর দিকে ফিরে বললেন, 'অপরাধ নিও না যেন ভদ্রে।'

চণক অনুভব করলেন শ্রীমতীর আকুল দৃষ্টি যেন তাঁদেরই পেছনে। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, 'সন্ধ্যায় আসছেন তো ?' কার দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করছে বোঝা গেল না।

দর্ভসেন বললেন, 'আসব বইকি, সময় পেলে নিশ্চয়ই আসব সুন্দরি !' বাইরে এসে তিনি জোর গলায় বললেন, 'আমাদের গৃহে নিয়ে চলুন মহাশয়, কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন।'

—যথা আজ্ঞা ! রথ ছুটল।

রাজপুরীর প্রাচীরবেষ্টিত অঞ্চলের মধ্যেই রাজ- অতিথিশালা। তিন জনে নেমে দ্বিতলে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষায় ঢুকতেই দাস-দাসীরা ছুটে এলো। কারও হাতে পানীয়, কারও হাতের থালিতে ফল ও মিষ্টান্ন, ব্যজনী হাতে ছুটে এলো অনেকে।

দর্ভসেন রুক্ষস্বরে বললেন, 'মধ্যাহ্নভোজনের আগে শীতল পানীয় ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করব না। ফুলমালাগুলো শুকিয়ে উঠেছে নতুন মাল্য দাও। বড় গরম। চন্দনাবলেপও নতুন করে দাও।'

তিন জনে আসনে বসলে দাসীরা হাত-পা সমস্ত স্নিগ্ধ, সুবাসিত জলে ধুইয়ে, তারপর মুছিয়ে দিল। বুকে, কপালে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দিল, মল্লিকার মালা জড়িয়ে দিল মাথায়, কণ্ঠে, হাতে। তারপর দধির সুগন্ধী শীতল পানীয় নিয়ে এলো। পাত্রে চুমুক দিয়ে দর্ভসেন ইঙ্গিত করলেন দাসীগুলি সব চলে গেল। ঘরের সামনেই প্রশস্ত অলিন্দ। হঠাৎ ঝরঝর শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হল। চণক বললেন, 'ওইখানে উচ্চাসন পাতা আছে, চলুন গিয়ে বসা যাক। বৃষ্টি দেখা যাবে।'

পানীয় হাতে উঠতে উঠতে দর্ভসেন বললেন, 'বৃষ্টি বৃষ্টি করে কি তুমি পাগল হয়ে যাবে চণক ? রহস্যময় তোমার এই হঠাৎ কবিত্ব। খুব বিরক্তিকরও। কী বলো সম্পাতি ?'

সম্পাতি শুধু মৃদু হাসল। চণক বললেন, 'কাব্য শুনলেন না ? আপনাকে ক্ষয় করে সে দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে !'

দর্ভসেন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওই গর্ভস্রাবটার কথা ছাড়ো। বোধিকুমার না গর্দভকুমার ! বর্ষার ওপর কাব্য ! ঋষি অত্রির পর্জন্য সূক্তটা মনে কর দেখি !

'কনিক্রদদ্ বৃষভো জীরদানু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেতো দধাতি-ওষধীষু গর্ভম্ ॥

—পঞ্চম মণ্ডল, ত্রিষ্টুপ ছন্দ। মনে পড়ছে ?'

চণক বললেন, 'গর্জাচ্ছে পর্জন্য বৃষ ক্ষিপ্র অতি

রেতধারা ওষধিকে করে গর্ভবতী ॥'

'ধিক্ চণক ধিক,' দর্ভসেন বলে উঠলেন, 'এখুনি এখুনি কি তুমি মগধ-জ্বরে আক্রান্ত হলে ? ঋষি অত্রির সূক্তে কী পৌরুষ ! কী দার্ঢ্য ! গর্জমান বজ্রগর্ভ বর্ষার অনুভব সঙ্গে সঙ্গে হয় না কি ?'

চণক বললেন, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু একটি সূক্ত চমৎকার বলে আর একটি সূক্ত চমৎকার হবে না, হতে পারে না, আপনার এ যুক্তি আমি মানতে পারি না মহামাত্র। রুদতী বর্ষার দুঃখী অথচ দাত্রী মূর্তিটিও আমার বড় ভালো লেগেছে। কৃষ্ণা, বিদ্যুতের আভরণে ভূষিতা, বসন্তগর্ভা, কিন্তু দিতে দিতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে শ্যামল বক্ষযুগ। দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে। কবিকে দিচ্ছে, নটকে দিচ্ছে, ধনীপুত্রকে দিচ্ছে, অমাত্যদের দিচ্ছে...'

বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে দর্ভসেন বললেন, 'তুমি কি শ্রীমতী নামে ওই গণিকার কথা বলছ ?'

'হয়তো !' চণক উদাস স্বরে বললেন, 'ভানুমতী, করেণুমতী, সানুমতী এদের কথাও বলছি হয়তো।'

—বাঃ এই বয়সেই তুমি অনেকগুলি বারবধূকে চিনে ফেলেছ তো ? সানুমতী তো দেব পুষ্করসারীর মণ্ডনকারিণীদের প্রধান। অন্যগুলি কে ?

সম্পাতির স্বভাব খুব মৃদু। সে সহসা মুখ খোলে না। এখন আর থাকতে না পেরে বলে ফেলল, 'চণক কোনও বিশেষ বারবধূর কথা তো বলছে না আর্য ! ও বোধ হয় সাধারণভাবে সব বারবধূর জীবনের কথা ভেবে বলছে।'

'বারবধূর জীবন ?' অবাক হয়ে দর্ভসেন বললেন, 'ও নিয়ে এত ভাববার কী আছে ? রাজভাণ্ডার থেকে বৃত্তি পাবে, কর দেবে, বিদগ্ধ পুরুষের মনোরঞ্জন করবে, বৃদ্ধ হলে অভিজাত গৃহের নারীদের শিল্পশিক্ষা দেবে ! তেমন তেমন নৃত্যগীতনিপুণা এবং সুন্দরী হলে তো জম্বুদ্বীপভরা খ্যাতি। বৈশালীর আম্রপালীর কথাই ধরো না ! কিংবা রাজগৃহের শালবতী ! এদের এক রাত্রির মূল্য কত জানো ?'

কেউ কোনও উত্তর দিল না। বৃষ্টির গতিবেগ বাড়ছে। দর্ভসেন সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে এখানে বসার একটা সুবিধে আছে। বৃষ্টিপাতের শব্দে আমাদের কথাবার্তা ডুবে যাবে, অলিন্দ পার হয়ে, ওই বৃহৎ কক্ষ পার হয়ে আর ওধারে পৌঁছবে না। ভালো কথা চণক, তুমি তখন রথে উঠতে উঠতে নিম্নস্বরে যেন বললে কার্যোদ্ধার হবে না। কেন ?'

চণক উদ্যানের একটি বিশালকায় জম্বুবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে উদাস স্বরে বললেন, 'হবে না তো বলিনি ! সংশয় প্রকাশ করেছি। আপনি দেখেননি নর্তকী জিতসোমাকে অর্পণ করবার পর মহারাজ বিম্বিসারের কেমন ভাবান্তর হল ?'

দর্ভসেন বললেন, 'অবশ্যই দেখেছি। মনের আনন্দ গোপন করবার একটা উপায় হল ভ্রূকুটি, ওষ্ঠাধর কুঞ্চন। আমাদের মনোবৃত্তি সম্পর্কে নানা পাঠ নিতে হয় চণক, পর্যবেক্ষণও করতে হয়। মগধের রাজা অতিশয় পুলকিত হয়েছেন। গান্ধার রমণীরা তো গাত্রবর্ণেই প্রথমে সবার চোখ ঝলসে দেয়। তারপর গঠন, দেহসৌষ্ঠব ! এখানকার ওই নটীটি ? শ্রীমতী ? ও তো কালো !'

সম্পাতি মৃদু স্বরে বলল, 'মেয়েটি লাবণ্যময়ী।'

দর্ভসেন বললেন, 'তোমাদের এখন প্রথম যৌবনের চোখ। তোমাদের ব্যাপার আলাদা। শোনো চণক, আমি শুনেছি এই বিম্বিসার অতি অল্প বয়স থেকেই খুব ইন্দ্রিয়পরায়ণ। অন্তঃপুরে মহিষীই নাকি পাঁচ 'শ, দাসী নটীদের সংখ্যা করা যায় না এত। এক বণিক বধূকে বাতায়নে দেখে ইনি নাকি এমনই কামগ্রস্ত হয়েছিলেন যে, সেই বণিককে নানা ছলে বিদেশে পাঠিয়ে তার ভার্যাকে ভোগ করেন। তার পুত্রের নাম অভয়কুমার। তো সেই অভয় তো স্বতন্ত্র প্রাসাদে বাস করে। যথেষ্ট সম্মান। সেই নাকি আবার জীবক বৈদ্যর পালক, শত্রু জানেন পিতাও কি না। জিতসোমার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগরশোভিনীকে উপঢৌকন দিয়েই আমার অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে।'

চণক বললেন, 'ক্ষমা করবেন আর্য, আপনার ধারণা ভ্রান্ত, বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমি এক মাস আগে থেকে রাজগৃহে শুধু শুধু ঘুরছি না। শুধু শুধু সম্পাতি, অনঘ আর সুভদ্রকে বৈশালীতে, শ্রাবস্তীতে পাঠাইনি। একটু ধৈর্য ধরে আমার বিশ্লেষণ শুনুন।'

—বলো শুনছি। উদার একটা ভঙ্গি করলেন দর্ভসেন।

চণক বললেন, 'ভ্রূকুটি এবং ওষ্ঠাধর কুঞ্চন মনের আনন্দ গোপন করবার জন্য ব্যবহার হয় ঠিকই। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করবারও এটাই আদি উপায়। মহারাজ বিম্বিসার জিতসোমাকে দেখা মাত্র ভ্রূকুটি করেন, পরক্ষণেই বিরক্তি গোপন করবার প্রয়াসে মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও প্রসন্নতা ফিরিয়ে আনেন। আমার বিশ্বাস উনি জিতসোমাকে দেখে অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়েছেন।'

দর্ভসেন হাত তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, চণক তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার কথা শেষ করতে দিন। মগধরাজের চরিত্র সম্পর্কে যে কাহিনীগুলো শুনছেন সেগুলো রটনা। তাঁর অগ্রমহিষী তিনটিই। কোশলকুমারী, সাগলকন্যা দেবী ক্ষেমা এবং বৈশালীর এক গণরাজ চেতকের কন্যা ছেল্লনা দেবী। আরও কিছু মহিষী থাকতে পারেন, খ্যাতিমান রাজাকে বহুজনেই কন্যাদান করতে উৎসাহী। যে অসম্ভব সংখ্যাগুলো শুনেছেন সেগুলো প্রাসাদের দাসীদের সংখ্যা হতেই পারে। আমাদের গান্ধারেও কি অন্তঃপুরিকাদের সংখ্যা অজস্র নয়? কুমার অভয় মহারাজ বিম্বিসারের একেবারে প্রথম বয়সের পুত্র হতে পারেন, কিন্তু জীবক বৈদ্য সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আর্য। মহারাজের বয়স আর কুমার অভয়ের বয়স বিচার করলে কি মনে হয় না, কোথাও একটা বোঝার ভুল আছে? জীবক কৌমারভৃত্য কী করে মহারাজের পৌত্র হতে পারেন আমার মাথায় আসে না। তক্ষশিলার স্নাতক, অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা সমাপ্ত করে যশস্বী হয়েছেন কিন্তু বাইশ তেইশ তো তার বয়স হবেই। মহারাজকে দেখলে মনে হয় তিনি এখনও ঠিক মধ্যবয়স্ক নন। কুমার অভয় তো একেবারেই যুবাপুরুষ। পালন করেছেন হয়তো অতি অল্প বয়স থেকে। হয়তো তিনি পথে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন বলে, তাঁর গৃহে জীবক পালিত হয়েছেন। ক্ষমতাবান মানুষ মাত্রেই নানা রটনার লক্ষ্য হন। তা ছাড়া...

সম্পাতি বলল, 'চণক বয়ঃক্রমের যে হিসেব দিল তাতে সত্যিই...'

দর্ভসেন অধৈর্য হয়ে বললেন, 'আর কি বলছে চণক, বলতে দাও।'

—বলছিলাম, বেশ কয়েক বছর হল মগধরাজ তথাগত বুদ্ধর শরণ নিয়েছেন। এখন তিনি নতুন করে ইন্দ্রিয়ভোগে লিপ্ত হতে চাইবেন না।

দর্ভসেন রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তথাগত, তথাগত, তথাগত! ওই গর্ভস্রাবটার কথা এভাবে বলছ কেন? বড় জোর বল শ্রমণ গৌতম। হুঁঃ! বুদ্ধ বললেই বুদ্ধ হওয়া যায়। না? ইন্দ্রজাল শিখে এসেছে অঙ্গদেশ থেকে। ইন্দ্রজাল শিখে আমাদের সভার দুজন সুযোগ্য আধিকারিককে হরণ করে নিল। তোমার জন্য। এই তোমার জন্য চণক। কে বলেছিল ওদের শ্রাবস্তীতে পাঠাতে?'

চণক বললেন, 'আপনি বৃথাই রাগ করছেন। ওদের কাছ থেকে যেটুকু তথ্য পাবার সে তো আমরা পেয়েই গেছি। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ যে অবন্তীর বিরোধিতা করবেন না, এই তথ্যটুকু আমাদের প্রয়োজন ছিল। এখন, অনঘ আর সুভদ্রর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আমাদের কী অধিকার? তা ছাড়া এই তথাগত বুদ্ধ সম্পর্কে আমি বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। এখানে এসে ভাসা ভাসা শুনছি কে এক শাক্যবংশীয় শ্রমণকে নাকি মগধরাজ রাজগৃহে সম্পত্তি দিয়ে, সেনাধ্যক্ষর পদ দিতে চেয়েছিলেন। সেই শ্রমণ নাকি তা প্রত্যাখ্যান করে চলে গিয়েছিলেন, ছয় বছর পরে বুদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন। এই পর্যন্ত। তিনি যে ওই সময়ে শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন, এবং সেখানে দলে দলে লোক বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করছিল, সুভদ্র এবং অনঘ যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে যাবে এত কথা কি আমি জানতাম? বলো সম্পাতি?'

সম্পাতি বলল, 'সত্যি কথা মহামান্য দর্ভসেন, চণক আমাদের দলপতি হলেও আমরা চারজনেই পরামর্শ করে স্থির করি শ্রাবস্তী ও বৈশালী যাওয়া দরকার। অনঘ ও সুভদ্র নিজেরাই শ্রাবস্তী বেছে নেয়। আমি নির্বাচন করি বৈশালী। চণক তখন বলে সে রাজগৃহের ওপর দৃষ্টি রাখবে। চণক বহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ সংগ্রহ করেছে। প্রশংসনীয় চরকর্ম সন্দেহ নেই। আমি বৈশালী থেকে শ্রাবস্তীতে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে অনঘদের সন্ধান করতে গিয়ে শুনি তারা দুদিন হল প্রব্রজিত হয়েছে। আমি তো শুনে অবাক ! অনেক কষ্টে জেতবনের প্রান্তে সুভদ্রর সঙ্গে দেখা হয়। তার মুণ্ডিতকেশ আকৃতিতে পুরনো সুভদ্রর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই আর্য। শুধু শ্মশ্রুগুম্ফকেশই নয়, আরও অনেক কিছুই যে সে বিসর্জন দিয়েছে তা তার জ্যোতির্বর্ণ মুখশোভা থেকে সহজেই বুঝতে পেরেছি। দ্বিতীয়বার তাকে ফিরে আসতে বলার সাহস আমার হয়নি। কিন্তু সে তার কর্তব্য করেছে। কোশলরাজ সম্পর্কে যেটুকু জানবার ছিল সে তা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। আমার পক্ষ থেকে বলতে পারি লিচ্ছবিরা যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও, কোনও ঝঞ্ঝাটে নিজেদের জড়াতে চায় না। যদিচ প্রদ্যোত মহাসেনকে কেউ পছন্দ করে না। নিষ্ঠুরতা ও উগ্রতার জন্য সবাই বলে চণ্ডপ্রদ্যোত। কিন্তু সহসা তাঁর বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হবে গান্ধাররাজের আবেদনে, এমন আশা নেই। এখন মগধরাজই ভরসা।'

দর্ভসেন চিন্তিত হয়ে বললেন, 'চণক, তুমি কি বলছ জিতসোমাকে পাঠিয়ে আমরা একটি কূটনৈতিক ভুল করে ফেলেছি ? এবং তারই জন্য মগধরাজের অপ্রীতিভাজন হলাম ?'

—না, তা আমি বলছি না মহামাত্র। জিতসোমাকে পাঠানো আমাদের ভুল হয়েছে। সে কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। কিন্তু, শুধু সেই জন্যই মগধরাজ আমাদের দৌত্য বিমুখ করবেন বলে আমার মনে হয় না। প্রাথমিক বিরক্তিটুকু জয় করতে না পারলে তিনি আর মহারাজা কিসের ? আসলে জিতসোমাকে আমরা পুরোপুরি অপব্যয় করলাম। কোনও প্রয়োজন ছিল না এর। আর এঁরা অর্থাৎ কোশলরাজ, লিচ্ছবিরা, মগধরাজ, এমন কি দূরে হলেও কৌশাম্বী এঁরা একটি সংঘ। অবন্তী আরও দূরে হলেও প্রতিবেশী রাজ্য বলেই মনে করেন। সুদূর গান্ধারের জন্য প্রতিবেশীকে ঘাঁটাতে রাজি হবেন না মগধরাজ।'

—তাহলে শুধু শুধু আমাদের এতদিন অপেক্ষা করিয়ে রাখলেন কেন ? কোনও অর্থ হয় এর ? দর্ভসেন খুবই উত্তেজিত।

এই সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। শ্যামবীথিকা সমেত সমস্ত উদ্যানটি ঘন বৃষ্টির আড়ালে সবুজ রঙের একটি চাদরের মতো দেখতে হল। চণক বললেন, 'মগধরাজ ধুরন্ধর কূটনীতিক। তাঁর "না"টা তিনি আমাদের কীভাবে জানান, শুনতে আমি অত্যন্ত উৎসুক রয়েছি।'

দর্ভসেন দারুণ বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি তো ক্রমশই মগধ রাজ্য এবং রাজার ভক্ত হয়ে পড়েছ হে চণক !'

চণক হেসে বললেন, 'গুণগ্রাহিতা বলে কোনও বস্তু কি রাজনীতি শাস্ত্রে নেই ? না থাকলে আমি তার পত্তন করবার চেষ্টা করব।'

—গুণগ্রাহিতা না হয় খুব ভালো বস্তু। কিন্তু কী বিশেষ গুণ তুমি দেখলে মগধের রাজার ?

এই সময়ে একটি দাস এসে জানাল রাজপুরী থেকে দূত এসেছে। মহারাজ তাঁর আচার্যপুত্রের সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক। যদি কাত্যায়ন চণক অনুগ্রহ করে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের সময়ে রাজাকে সঙ্গ দেন, তিনি সুখী হবেন।

চণক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অবশ্যই। আমি এক্ষুনি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি।'

দাস জানাল, 'রথ প্রস্তুত আছে।'

দর্ভসেন অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি বিম্বিসারের আচার্যপুত্র ? কাত্যায়ন দেবরাত এই বিম্বিসারের আচার্য ছিলেন ? এ কথা তো জানতাম না !'

চণক বললেন, 'হ্যাঁ। দীর্ঘকাল আগে পিতা একবার মগধদেশে এসেছিলেন। তাঁর সেই সময়ের কিছু স্মৃতি তিনি আমায় বহুবার গল্পচ্ছলে বলেছেন। মগধ আমায় বহুদিন ধরে আকর্ষণ করছে। আচ্ছা বিদায় মহামাত্র, বিদায় সম্পাতি। রাজদর্শন করে আসি। গান্ধার রাজ্যের সমস্যার কথা যতদূর পারি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করব আবার।'

চণক বেশ পরিবর্তন করে চলে গেলে দর্ভসেন গম্ভীর মুখে পদচারণা করতে করতে বললেন, 'সম্পাতি ! তিনজন দূতের মধ্যে একজনকে যিনি বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেন তাঁকে কি কোনক্রমেই যথার্থ কূটনীতিক বলা চলে ? তোমার গুণগ্রাহিতা কী বলে ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাতি ইতস্তত করে বলল, 'মহামাত্র, আপনার ব্যথিত হবার কিছু নেই। মগধরাজ আচার্যপুত্রের সঙ্গে আলাপ করবার অন্য কোনও সময় বার করতে পারছেন না বলেই বোধ হয় ভোজনের সময়ে...'

অসন্তুষ্ট মুখে থেমে গেলেন দর্ভসেন, বললেন, 'কি জানি! আমি এ রাজার আচার-আচরণে কোনও আভিজাত্য খুঁজে পাচ্ছি না। নীতিজ্ঞানও খুঁজে পাচ্ছি না। পথ থেকে সন্ন্যাসীকে ডেকে এনে সেনাধ্যক্ষ করতে চায়, যেচে যেচে এক দুষ্ট রাজার অসুখে নিজের বৈদ্য পাঠিয়ে দেয়। গান্ধারের মতো মাননীয় রাজ্যের মহামান্য রাজাকে নিজেদের অসংস্কৃত ভাষার পুক্কুসাতী বলে উল্লেখ করে। আর হবে নাই বা কেন? ছিল তো এক গোষ্ঠীনেতার পুত্র। রাজবংশেও নয়, কিছুই নয়। নাগেদের সঙ্গে কী একটা সম্পর্ক আছে সেটা ঢাকতে চায় হর্যংক বংশ হর্যংক বংশ করে। তা সে যতই গলা ফাটাক না কেন আসলে তো জাতে উঠেছে কোশল সাগল আর লিচ্ছবি কন্যা ঘরে এনে। ও কি যথার্থ ক্ষত্রিয় নাকি?'

সম্পাতি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'চুপ চুপ মহামাত্র, আপনি যে দেখি স্থান কাল বিস্মৃত হলেন! আমরা রাজ-অতিথিশালার অলিন্দে বসে। কে জানে কোথা থেকে কে শুনে ফেলবে!'

বৃষ্টিধারার দিকে চেয়ে দর্ভসেন বললেন, 'শুনতে পাচ্ছ? কী কলরোল! এই নিরবচ্ছিন্ন শব্দে বোধ হয় দামামার শব্দও শোনা যাবে না। সম্পাতি, আমি একটু বিশ্রাম করতে যাই। তোমার ইচ্ছা হয় এই বিচিত্র দেশের বিচিত্র বৃষ্টি উপভোগ কর, আমার কিছুই ভালো লাগছে না।

৭

রত্নহারটি হাতে করে ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'শ্রাবস্তী থেকে আসছেন? কোন শ্রেষ্ঠী? সুদত্ত?' সুদত্তর নাম তিনি রাজগৃহে শুনেছেন। সেখানে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে কুটুম্বিতা আছে তাঁর। কিন্তু শ্রেষ্ঠী সুদত্তর পুত্ররা যতদূর শুনেছেন বিবাহিত। আর ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেম খুব রূপবান, কিন্তু দুশ্চরিত্র। রূপগর্বে ধরাকে সরাজ্ঞান করে।

জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বললেন, 'না, না, সুদত্ত নয়, মিগার শ্রেষ্ঠী।'

—মিগার? মৃগধর? নাম শুনিনি তো দেব! কত আয় তাঁর, বার্ষিক?

—চারশত কোটির মতো হবে।

'ওহ,' ধনঞ্জয় বললেন, 'আমার সঙ্গে তুলনায় তো সে এক কাহনও নয়! তা তাঁর পুত্রটি?'

—আজ্ঞে পুন্নবদ্ধন। সদ্য যুবা। সুন্দর, সুকুমার। মিগার শ্রেষ্ঠীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। স্বভাব দোষশূন্য। সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক ইত্যাদির গুণগ্রাহী, সূক্ষ্মরুচির যুবক। পঞ্চকল্যাণী কন্যা না হলে বিবাহই করবে না। এমনই তার প্রতিজ্ঞা। বহুকষ্টে যে তাকে বিবাহে রাজি করা গেছে এ কথা ব্রাহ্মণরা উচ্চারণ করলেন না আর। তাঁরা অভিজ্ঞ লোক। বুঝে ফেলেছেন ধনঞ্জয়ের চিত্ত দোলাচল।

—শিক্ষাদি কেমন যুবাটির?

—আজ্ঞে। পিতামাতার একটি মাত্র সন্তান। বারাণসীতে আচার্য রন্তিদেবের কাছে দশ বছর নানা বিষয়ে শিক্ষা করেছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ধনঞ্জয় বললেন, 'অনেক দূর থেকে আসছেন। ক্লান্ত আছেন, কদিন আমার গৃহে বিশ্রাম করুন। আমার পত্নী গেছেন রাজগৃহে। তিনি না ফিরলে তো কোনও সিদ্ধান্ত হবে না।'

তা ভালোই। দেশে দেশে ঘুরে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। কাশী, অযোধ্যা, ভোগনগর, দাহিগ্রাম বহু স্থান ঘুরে এসেছেন তাঁরা। এখন দিন কয়েক সাকেতের শ্রেষ্ঠীর গৃহে কোমল শয্যা, দাস-দাসীর সেবা। মধ্যাহ্নভোজনে নরম তুলতুলে গোবৎসের মাংসের সঙ্গে দধিতণ্ডুল, মৎস্যের বিচিত্র পদ, নানা ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন থাকবে নিশ্চয়ই। মাধ্বী ও মৈরেয়ও যত চাও তত। মিগারের চেয়েও শতগুণ ধনী! ব্রাহ্মণরা ব্যাপারটা ঠিক কল্পনা করতে পারলেন না। নিভৃতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন—লোকটি দাম্ভিক কিনা। মতভেদ হল। 'দম্ভ হলেই বা আমাদের কী? মিগার বুঝবে? মিগার তো ধমক দিয়ে ছাড়া কথা কয় না!' একজন বললেন। আর একজন বললেন, 'এ বিবাহ হবে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখো। শ্রেষ্ঠীপত্নী ফিরে এলেই আমরা ভদ্রভাবে বিতাড়িত হবো। শ্রেষ্ঠীরই এত দ্বিধা, এত দম্ভ। তার পত্নী তো আরও অহংকারী হবে।'

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'মেয়েটির যে প্রকার রূপ, হাব-ভাব, তাতে কিন্তু ওকে রানি হলেই মানায়। কেমন একটা সহজাত মর্যাদাবোধ। ঠিক দম্ভ একে যেন বলা যায় না। নদীতীরে আমাদের কেমন কথার জালে বদ্ধ করল! রূপেও রানি, কথাবার্তাতেও রানি।'

—তা ঠিক, কনিষ্ঠ বললেন।

মধ্যম বললেন, 'বৈশালীতে বা অন্য কোনও গণরাজার দেশ হলে এ মেয়েকে জনপদবধূ নির্বাচন করা হত। আর সেটাই হত এর যোগ্য সমাদর।'

'কথাটা তুমি কি ঠিক বললে?' জ্যেষ্ঠ বললেন, 'এর রূপ শ্রদ্ধাসম্ভ্রম উদ্রেক করে, আর অম্বপালী হল গিয়ে মোহিনী, নৃত্যগীতে তার জুড়ি নেই সারা মধ্যদেশে। সে মেয়েটি তো পালক পিতার কাছে মানুষ। পিতা তাকে নগরশোভিনী হবার জন্যই প্রস্তুত করেছিল। তা মেয়ে পিতার মান রেখেছে। এ কথা বলতেই হবে। বৈশালীর তো গর্ব বটেই, অম্বপালী সারা মধ্যদেশেরই গর্ব।'

মধ্যম বললেন, 'আপনি জানেন না আর্য। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। পালক পিতা হলেও আম্রপালীর পিতা মহানামভদ্র মেয়েটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার রূপের খ্যাতি চারিদিকে এমন ছড়িয়ে পড়ল যে, রাজারাজড়া, রাজকুমার থেকে আরম্ভ করে মহাধনবান শ্রেষ্ঠী, ইত্যাদি কেউ আর তার পাণিপ্রার্থী হতে বাকি রইল না। তখন মহানামভদ্র সংস্থাগারে নিজের সমস্যার কথা নিবেদন করলেন। বাস্। যেমনি দেখা অমনি গণরাজারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে এ মেয়ে জনপদশোভিনী হবার যোগ্য। ওদের দেশে তো সংস্থাগারে যা ঠিক হবে তার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কারও নেই।'

—এত কথা তুমি জানলে কি করে? জ্যেষ্ঠর মুখে সকৌতুক হাসি।

—পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে তোমার শিষ্য-টিষ্য কেউ ছিল না কি?

কনিষ্ঠ বলল, 'আমরা সবাই-ই কিন্তু মোটামুটি এই রূপই জানি আর্য। মহানামভদ্র নাকি বুক চাপড়ে হাহাকার করেছিলেন, বলেছিলেন "এই আপনাদের বিচার হল? ধিক ধিক আপনাদের।" অম্বপালী নাকি প্রথমে পাথরের মূর্তির মতো হয়ে যায়। তারপর পিতার শোক দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে তার কয়েকটি শর্ত আছে, সেগুলি যদি লিচ্ছবিকুল মানেন তাহলে সেও তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। নইলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে।'

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'আশ্চর্য! এত কথা আমি জানি না তো! আসলে কোশল রাজ্যের বাইরে কমই গিয়েছি। তা ছাড়া যজন-যাজন আর ভাটের কর্ম করি, অত সংবাদ আমার কাছে আসবেই বা কী করে? বয়সও গিয়েছে।'

কনিষ্ঠ হেসে বললেন, 'আপনার আমার বয়সের সঙ্গে আর এসব সংবাদের সম্পর্ক কি, আর্য? শুনেছি অম্বপালীর এক রাত্রির মূল্য নিয়ে বৈশালী ও রাজগৃহে রীতিমত বিবাদ হয়ে গেছে।'

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'তা সে যাই হোক। এমন নারী-রত্ন একজন পুরুষ ভোগ করবে, নৃত্যগীতকাব্যাদি কলার চর্চা না করে অন্তঃপুরে সপত্নীদের সঙ্গে কলহ করে আর যাউ রান্না করে কাল কাটাবে এটা আমার ঠিক মনে হয় না। রুচিমান বিদগ্ধ পুরুষগুলি যাবে কোথায়, নাট্য ও নৃত্য-গীতের উন্নতিই বা হবে কি করে!'

মধ্যম বললেন, 'তা ছাড়াও একটা কথা আছে। অতি সুন্দরী, গুণবতী রমণীরা গর্বিত হয়ে থাকে। তারা সবসময়েই স্বেচ্ছাচারিতা করতে চায়। কাউকে তেমন শ্রদ্ধাভক্তি করে না। এরূপ রমণী কুলে না আনাই ভাল। অশান্তির সৃষ্টি হয় এতে। এই দেখুন না, আমার প্রথমা পত্নী জ্যোতির্লেখা, অতি রূপসী, তার ওপর কুলপতি পিতার কন্যা। দশ সহস্র না হলেও বহু ছাত্রের অধ্যাপনা ভরণপোষণ করেন। দক্ষিণা পাঁচশত কার্যাপণ, কিন্তু পূণ্য শিষ্যও আছে অনেক।'

'এমন কুলপতির কন্যা তোমার পত্নী হল কি করে?' জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন, 'খ্যাতিমান আচার্যরা সাধারণত শ্রেষ্ঠ ছাত্রটির সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দেন। তুমি তো তেমন নও বাপু।' কনিষ্ঠ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যম অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'তা নই। কিছু করতে পারিনি ঠিকই। কিন্তু এখনও আমার রূপ দেখছেন তো আর্য! যখন আমার শ্বশুর মহাশয়ের ওখানে ব্রহ্মচর্য পালন করছিলাম, তখন ক্ষত্রিয়দের মতো অশ্বচালনা, কিছু কিছু অস্ত্রচালনাতেও নিপুণ হয়েছিলাম। জ্যোতির্লেখা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়।'

—আর তুমি? তুমি বুঝি অশ্বচালনা, অসিচালনা কোনও রণে যাবার জন্য অভ্যাস করতে? জ্যেষ্ঠের কথায় কনিষ্ঠ সশব্দে হেসে উঠলেন।

মধ্যম ব্রাহ্মণের গৌরবর্ণ মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল, তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও আকৃষ্টই হয়েছিলাম। অমন রূপবতী কন্যা, বল্কলে যার যৌবন বাঁধতে পারে না, অমন গাঢ় কৃষ্ণতার চক্ষু দুটি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা গান্ধর্ব বিবাহ করেছিলাম। শ্বশুর মহাশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। প্রাণ খুলে আশীর্বাদও করেননি। কিন্তু অস্বীকার আর করবেন কি করে?'

—তারপরে?

—প্রথম প্রথম জ্যোতির্লেখা আমার গৃহে এসে ভালোই ছিল। সুন্দর মানিয়ে নিয়েছিল। বলত দেবতারা যেমন রাখবেন তেমনই থাকব। পিতা-মাতাও কোনও অভিযোগ করতেন না। কিন্তু তারপর একদিন দুঃখ করে বলল, পিতার গৃহে এত শিখলাম, কিছুই কি চর্চা করতে পারব না? আগে সর্বদা পিতৃশিষ্যদের সমবেত মন্ত্রপাঠ শুনতাম, গৃহশুকটি যখন-তখন ব্যাকরণের সূত্রগুলি মুখস্থ বলে বলে কান ঝালাপালা করে দিত। তুমি তো খালি যজন-যাজনই কর, আমাকে অনুমতি দাও না আমি শ্রেষ্ঠীগৃহের মেয়েগুলির আচার্যা হবো! ওরা বলছিল!

'সে তো ভাল কথা।' জ্যেষ্ঠ বললেন, 'যদিও প্রব্রাজিকাদের কাছেই নারীদের শিক্ষা পাওয়ার বিধান।'

—ভালো তো আমিও ভেবেছিলাম। সে নিয়মিত শ্রেষ্ঠীগৃহে যাতায়াত শুরু করল। তারপরই তার রূপগর্ব, বিদ্যাগর্ব বেড়ে গেল। মাতা অভিযোগ করতে লাগলেন, সে সময়মতো তাঁদের আর আহার দেয় না। তিরস্কার করলে বলে, আপনি তো অথর্ব হয়ে যাননি অজ্জা। নিলেনই না হয় একদিন নিজেদের অন্ন নিজেরা বেড়ে। শ্রেষ্ঠী কন্যাগুলিকে ছন্দ বোঝাতে দেরি হয়ে গেলে কী করব! তখন আমি দ্বিতীয়া পত্নী ঘরে আনলাম।'

কনিষ্ঠ বললেন, 'আপনার একটি ছেলেও তো আছে!'

—একটি নয়, দুটি। সেই তো হল সমস্যা! জ্যোতির্লেখা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "আমি তোমাকে দুটি পুত্র দিয়েছি। শ্রেষ্ঠীগৃহ থেকে ধন এনে গৃহের শ্রীবৃদ্ধি করেছি। তা সত্ত্বেও তুমি আমায় সপত্নীদুঃখ দিলে?" দিলাম যে তার দম্ভ ভাঙতে সে কথা আর ভেঙে বলিনি।

মধ্যম ব্রাহ্মণ উরুতে চপেটাঘাত করে হাসতে লাগলেন।

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'তো তাঁর দম্ভ গেছে?'

—গেছে বইকি! তবে কি জানেন এই সব স্ত্রীলোক ভেঙেও ভাঙে না, আগেরই মতো শ্রেষ্ঠীগৃহে যায়, ধন যা পায় আমার পিতার হাতে তুলে দেয়, রন্ধন, গৃহশাসনের দায়িত্বগুলিও নির্বিবাদে পালন করে কিন্তু আমার শয়নগৃহে আর আসে না। কখনও না। পুত্র দুটিকে পিতৃগৃহে শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।

—তা আপনার লাভ হল? না ক্ষতি হল?

—লাভই হল একরকম। জ্যোতির্লেখার তখন ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স হবে, দুই সন্তানের মা, এদিকে আমার দ্বিতীয়া তো সবে সতের পার হয়েছে, দরিদ্র ঘরের মেয়ে। যা বলি তাই শোনে।

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'ভাল, ভাল।'

জ্যেষ্ঠ বাইরে গেলে কনিষ্ঠ বললেন, 'আচ্ছা আর্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? প্রথমার জন্য আপনার উৎকণ্ঠা হয় না!'

মধ্যম বললেন, 'উৎকণ্ঠা? উৎকণ্ঠা ছেড়ে একেক সময় তার জন্য কামনা এত প্রবল হয় যে শ্রেষ্ঠীগৃহ থেকে ফেরবার পথে একটি উপবন আছে সেখানে আমি তার জন্য লুকিয়ে থাকি। দুই সন্তানের জননী হলে কি হবে, জ্যোতির্লেখা যৌবনকে বলতে গেলে একইভাবে ধরে রেখেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার তো সন্দেহ হত তার কোনও জার জুটেছে, না হলে আমাকে এত উপেক্ষা সে করে কী করে ? এতগুলি ঋতুই বা ব্যর্থ করে কোন সাহসে ? তা দেখলাম, শ্রেষ্ঠীগৃহ থেকে দু-তিনটি বালক তার সঙ্গে সঙ্গে আসে। একদিন একলা পেয়ে পেছন থেকে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিলাম, লজ্জার কথা বলবো কি ভাই। "দুর্বৃত্ত" বলে সে আমাকে মাটিতে ফেলে পদাঘাত করলে।'

—না জেনে করেছেন। ভালোই তো। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন তিনি অন্য পুরুষকে প্রশ্রয় দেন না।

মাথা নাড়তে নাড়তে মধ্যম বললেন, 'না রে ভাই, আমার বদ্ধমূল ধারণা সে বুঝতে পেরেই করেছিল। পরে যখন দেখল আমি, অবাক হবার ভান করে বলল, "এ কি, তুমি ?" বলে আমায় প্রণাম করল। তারপর একটি কথাও না বলে চলে গেল।'

—কী করে ধারণা করছেন সে বুঝতে পেরেছিল ?

মধ্যম ব্রাহ্মণ আরক্ত মুখে বললেন, 'কেন সে আমি তোমাকে কী করে বোঝাব ? আমাদের আলিঙ্গনের একটি বিশেষ ধরন ছিল, কুলপতির ওখানে ওইভাবেই তার কাছে প্রণয় নিবেদন করেছি। সে সব গুহ্য কথা কোনও সমবয়সী বয়স্যকেই বলতে লজ্জা হয়, তো তুমি !'

মধ্যম ব্রাহ্মণ হঠাৎই কথা থামিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ চিন্তিত মুখে বাইরের উদ্যানে চলে গেলেন। রাত বেশি হয়নি। আকাশটি সুন্দর। এ উদ্যানটি তাঁদের অতিথিশালার সংলগ্ন। সুন্দর, সুসজ্জিত, একটি ছোট্ট কহ্লার-সরোবর আছে, তার আশেপাশে বড় বড় পাথরের টুকরো। গুল্ম জাতীয় গাছ। দেখতে হয়েছে যেন পর্বতের মধ্যে সরোবর কিংবা চাঁদকে ঘিরে নক্ষত্রমণ্ডলী। বড় গাছগুলির তলায় শিলাসন। কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বড় চিন্তিত। মধ্যম ব্রাহ্মণের মতো একটি সমস্যা তাঁরও হয়েছে। অবশ্য একেবারে একই প্রকার নয়। একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। শিলাসনে বসে তিনি তাঁর নিজের সমস্যাটির কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর প্রথমা পত্নীটিকে কাশীতে গঙ্গাস্নানের সময়ে কুমিরে নিয়ে যায়, দ্বিতীয়টির প্রতি স্বভাবতই তাঁর গভীর স্নেহ, যতদূর সাধ্য সাবধানে রাখেন তিনি এই প্রিয়া পত্নীকে। কিন্তু চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেও, এখনও পুত্রমুখ দেখাতে পারেনি তাঁর প্রিয়া। তৃতীয়া গ্রহণ করবার জন্য জোর করছেন পিতা, পিতামহ। বংশে এমনিতেই পুত্রসন্তান অল্প। বংশই বা রাখবে কে ? মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষকে অন্নজলই বা দেবে কে ? তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতাদের সবারই দুটি তিনটি করে পত্নী। ভ্রাতৃজায়ারা তো তাঁর ব্রাহ্মণীকে সর্বক্ষণই উত্ত্যক্ত করে। কিন্তু এসে থেকে স্বামীর বিশেষ সমাদর পেয়ে পেয়ে তাঁর পত্নী অভিমানিনী হয়ে উঠেছে। এখনই সে অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্যাদি উপহার দিলে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে দিয়েছে। এবার যাত্রার আগে ব্রাহ্মণী বলেছিল, 'সেট্‌ঠি পুত্তুরের জন্য যেমন, নিজের জন্যেও তেমন একটি ভালো দেখে গাই নিয়ে এসো। এঁড়ে বাছুর বিয়োবে এমন গাই। লক্ষণ পড়তে পারে এমন পণ্ডিতের সাহায্য নিও না হয়। নিজে তো কিছুই শেখোনি।'

এমন নয় যে আমোদ-প্রমোদের সন্ধানে তিনি কখনও কোথাও যাননি। আগেও গিয়েছেন, এখনও যান। গান তিনি ভালোবাসেন। নাট্য কিংবা গোষ্ঠীসভা হলে শ্রাবস্তী নগরের যেখানেই হোক, তিনি আগে গিয়ে বসে থাকবেন। সুগায়িকা বারবধূগুলি চেনা হয়ে গেছে। কোনও সম্পন্ন শ্রেষ্ঠীকুমার জুটলে, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চলে যান। কিন্তু, গৃহে কুলস্ত্রী একাধিক থাকলে অনেক সময়ে বড় বিড়ম্বনা হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠদের সবার ঘরে তো শান্তি নেই ! তাঁর গৃহটি যেমন শ্রীমণ্ডিত, তেমনি শান্তিপূর্ণ। তিনি নিজেও মৃদঙ্গ বাজান, সময় পেলে যখন মৃদঙ্গটি নিয়ে বসেন, মাটির মাত্রে তুষের আগুন করে তাতে সুগন্ধিচূর্ণ দিয়ে একপাশে রেখে যায় ব্রাহ্মণী। দীপটি নিষ্কম্প শিখায় জ্বলে, দুটি কন্যা তাঁরই মতো সংগীতপ্রিয়, বেশ ভালো গাইতে পারে। তাঁর মৃদঙ্গ বাদনের মান এমন নয় যে কোনও উৎসবে সুযোগ পাবেন, কিন্তু গৃহের মধ্যেই এমন শ্রোতা ! কন্যা দুটি, গৃহিণী তদ্গত চিত্তে শোনে। আবারও বিবাহ করলে ব্রাহ্মণীর যা মতিগতি দেখা যাচ্ছে, মৃদঙ্গটি হয়তো দুই সপত্নীই বাজাতে থাকবে, তাঁকে পথে পথে ঘুরতে হবে।

পেছনে কাশির শব্দ শোনা গেল। ব্রাহ্মণ মুখ ফিরিয়ে দেখলেন জ্যেষ্ঠ।

—বসব নাকি একটু ? জিজ্ঞাসা করলেন জ্যেষ্ঠ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, কনিষ্ঠ একটু সরে বসলেন।

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে! মিগারের পুত্তুরের জন্য এত চিন্তা?'

কনিষ্ঠ কপাল চাপড়ে বললেন, 'মিগারের পুত্তুরের আর কি? একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করুক না, কেউ কিছু বলতে আসবে না। ধনী শ্রেষ্ঠীদের ঘরে তো এক এক পত্নীর এক এক গৃহ। কাংস্যপাত্রগুলি আলাদা আলাদা থাকলে তো আর ঠোকাঠুকির সম্ভাবনা নেই।'

—আহা, শ্রেষ্ঠীদের কথাই যখন বললে তখন রজতপাত্র, সুবর্ণপাত্রর কথা বলো। কাংস্যপাত্র তো তোমার আমার ঘরে। তা হলো কি? বলই না। বয়সে বড়, সংসারে দেখলাম শুনলামও অনেক। তোমার সমস্যাটা কী হে!

কনিষ্ঠ ইতস্তত করে নিজের সমস্যাটির কথা বলেই ফেলেন। শুনে জ্যেষ্ঠ বললেন, 'দেখো গুণপতি। শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীলোককে কখনও বাড়তে দেবে না।'

—বলেছে নাকি? কনিষ্ঠ দুর্বল কণ্ঠে বললেন।

—সন্দেহ প্রকাশ করছ? একস্য পুংসো বহ্যো জায়া ভবন্তি। শোননি? যা বা অপুত্রা পত্নী সা পরিবৃত্তী। অপুত্রা পত্নীকে তো পরিত্যাগই করতে পারো। যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরেই ত্যাগ করা যায়। তা তুমি তো ত্যাগ করছ না হে, শুধু শাস্ত্রানুযায়ী দ্বিতীয়া ভার্যা গ্রহণ করছ! অপরাধ তো কিছু করছ না!'

—তা করছি না। কিন্তু গৃহশান্তি? গৃহশান্তির কথা ভেবেই...

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'ওই যে বললাম, বাড়তে দিয়েছ। বড়ই বাড় হয়েছে।'

জ্যেষ্ঠ উঠে পড়লেন। বেশি কথা বাড়ানো ঠিক নয়। তাঁর নিজের গৃহে সবার বড় ব্রাহ্মণীটি খুবই ধৈর্যশীল, ক্ষমাপরায়ণ, গৃহকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি ছিল বেশবাসপ্রিয়, কলহপরায়ণ, তৃতীয়াকে গৃহে আনার পর সে পুংশ্চলী হয়ে যায়। পিতৃগৃহে চলে গেল, আর এলো না। শ্রাবস্তীতে কেউ এ কথা জানে না। জানলে তাঁর মর্যাদাহানি হবে। তিনি রটিয়ে দিয়েছেন তার মৃত্যু হয়েছে। বহুদিন হয়ে গেল, এখনও সেসব কথা মনে হলে তাঁর যন্ত্রণা হয়।

নির্বিঘ্নে পূজার্চনা করবেন, কোনও ধনী শ্রেষ্ঠীর কি ক্ষত্রিয় পরিবারের বাঁধা পুরোহিত থাকবেন, দানগুলি গৃহে এসে জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণীর কাছে তুলে দেবেন, সে সব ভাণ্ডারজাত করবে, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েগুলি দানের জিনিস দেখবার জন্য গোলমাল করবে, মনে মনে খুশি হলেও বাইরে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করবেন তখন দ্বিতীয়া এসে তাদের হাতে মোদক দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। পা ধুইয়ে দেবে তৃতীয়া, ভোজ্য এবং খাদ্য নিয়ে আসবে জ্যেষ্ঠা। রাত্রে সবচেয়ে ছোটটি অর্থাৎ তৃতীয়াকে নিয়ে সহবাস সুখ উপভোগ করবেন। এই তো জীবন! সুখের পরাকাষ্ঠা! স্বাদ বদলাতে দ্বিতীয়া, কখনও কখনও প্রথমাও থাকবে বইকি। পত্নীগুলিকে তিনি শাস্ত্রানুযায়ী সমান ভালোবাসতে না হোক সমদৃষ্টিতে দেখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, না? তা ভালোবাসা তো শুধু শয্যাতেই প্রমাণ হয় না! এই যে তিনি গার্হস্থ্যের কোনও ব্যাপারে জ্যেষ্ঠা ব্রাহ্মণী ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করতে পারেন না, দানের দাসী, গবাদি পশু, তৈজস ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য মধ্যমপুত্র ছাড়া আর কাউকে দায়িত্ব দিতে চান না, এগুলো কি ভালোবাসা নয়? শাটক্ যেগুলি পান সবার মধ্যে সমান ভাগ করে দেবার নির্দেশ দেন জ্যেষ্ঠাকে। নির্দেশ দিতেও হয় না। সব কাজই সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হয়ে যায়। তার হাতের অপূপ, পায়স কিংবা প্রতিদিনের সেব্য যে যাগু তার স্বাদ কী! তখন তিনি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান, সে কি তা বোঝে না? শয্যায় তার শিথিল প্রত্যঙ্গগুলি যদি কামোন্মাদনা জাগাতে না পারে বিশেষ তিনিও তো পক্ককেশ বৃদ্ধই হলেন অথচ ভোগবাসনা যায়নি। ক্রমশই তরুণী আরও তরুণী প্রয়োজন হয়। এই সামান্য কথাটা না বুঝে দ্বিতীয়া তার একটি ছেলে একটি মেয়েকে নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেল! আর এলো না। একবার তাকে আনতে গিয়ে কী অপদস্থই না হয়েছিলেন! ছেলেমেয়ে দুটি তাঁর সঙ্গে চলে এলো। দুই রাত্রি সেখানে থেকেও তার দেখা পেলেন না। শ্যালকরা বলল—সে নাকি সখীর গৃহে গেছে। পুত্র-কন্যা দুটিকে নানাভাবে প্রশ্ন করে তিনি যা বোঝবার বুঝলেন। ফিরে এলেন এবং কদিন পরেই রটনা করলেন সে অকস্মাৎ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্পাঘাতে মারা গেছে। কিন্তু একটি সুখী, শান্তিময়, কল্যাণশ্রী সম্পন্ন সংসারের গৃহপতি বলে গৌরব আর কি তিনি মনে মনে করতে পারেন ?

৮

সকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে। এখন কিন্তু তার চিহ্ন মাত্র নেই। রাতের আকাশে অজস্র তারা। দিক্‌সুন্দরীরা যেন অমলনীল বসন পরে হীরককুচির আভরণে সজ্জিত করেছেন নিজেদের। উদ্যানে অনেক দূরে দূরে দীপদণ্ড। গ্রীষ্মে, বর্ষায় অন্তঃপুরের এই উদ্যানটি বিসাখার বড় প্রিয়। স্বল্প আলোয় সর্বত্র গাছগুলির অবয়ব চেনা যায় না। খালি পুঞ্জীভূত অন্ধকার দিয়ে তাদের আকার গড়া। পুষ্পিত তরুগুলি থেকে সুবাস আসছে। সপ্তপর্ণীর অঙ্গ থেকে, বকুল, নীপতরু থেকে মাতাল করা সুগন্ধ তরুণ আষাঢ়ের সিক্ত বাতাসের সঙ্গে বয়ে চলেছে। নীপতরুমূলে পাষাণ বেদিকার ওপর বসল বিশাখা। পাঁচজন অনুচরী চার দিক থেকে তাকে ঘিরে আছে। কারও হাতে ময়ূরপাখার ব্যজনী, কেউ স্নিগ্ধ পানীয় হাতে, কেউ কেউ তার পদ বা হস্ত সংবাহন করবার জন্য গুছিয়ে বসল। বিশাখার রাত্রের সাজ মনোরম গাঢ় নীল রঙের সূক্ষ্ম কাশীর কার্পাস-বস্ত্র। আভরণগুলি খুলে ফেলে কুসুমসজ্জা করেছিল সকালে একবার। আর একবার অপরাহ্ণে, এখন সেগুলি শুকিয়ে উঠেছে। দাসীরা কণ্ঠে মুক্তামালা দুলিয়ে দিল, কানে মুক্তার কর্ণভূষা, হাতে রত্নখচিত গজদন্তের কঙ্কণ। তার ক্ষুদ্র কোমল পা দুটি কোলে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে টিপে দিচ্ছিল ধনপালী। কিছুক্ষণ পর বিশাখা বলল, 'আঃ, ধনপালি, আর কতক্ষণ এভাবে সংবাহন করবি ?'

'কেন ভদ্দে, তোমার ভালো লাগছে না ?'

'আমি কি বৃদ্ধা ? না রোগিণী ? সে যখন তখন সংবাহন ভালো লাগবে ?'

'কিন্তু এ তো বৃদ্ধা বা রোগিণীর সংবাহন নয় ভদ্দে, এই সংবাহন পদ্ধতি আমি আমার পিতামহীর কাছে শিখেছি। তিনি মহারানী ক্ষেমার মণ্ডনধাত্রী ছিলেন। সুদূর মদ্ররাজ্য থেকে মহারানীর সঙ্গে মগধে আসেন। আমাদের কত কিছু শিখিয়েছেন। এতে শরীরে রক্ত চলাচল সাবলীল হয়। ত্বকের শোভা বাড়ে। কোনও গ্লানি থাকে না কখনও।'

বিশাখা তার মণির মতো উজ্জ্বল, মৃণালের মতো সুগঠন, ফুলের পাপড়ির মতো মসৃণ সুখস্পর্শ বাহু বাড়িয়ে বলল, 'ধনপালি, আমার কি আরও উজ্জ্বলতা, আরও মসৃণতা, আরও শোভার প্রয়োজন আছে ? এর চেয়েও বেশি হলে উপযুক্ত বর কোথায় পাবেন পিতামাতা ?'

ধনপালী হাসিমুখে চুপ করে রইল। যদিও বিশাখা তার দাসীদের সঙ্গে সখীর মতোই ব্যবহার করে, তবু প্রভুকন্যার সব কথার উত্তর দেওয়ার শিক্ষা তার নেই।

আর এক দাসী কহ্না বলল, 'তা যদি বলো ভদ্দে, রূপে গুণে বিচার করলে তোমার যোগ্য বর পূর্ব দেশেই বলো, উত্তর দেশেই বলো, কোথাও পাওয়া যাবে না। যদি বা পাওয়া যায়ও অতি সুন্দরী অতি গুণবতী ভার্যার মর্যাদা কি পুরুষরা দিতে পারে ?'

'এ কথা কেন বলছিস ?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল বিশাখা।

'আমি দেবী রাহুলমাতার কথা ভেবে বললাম। সমন গৌতম তো এখন বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি কি বিবাহের সময়ে সর্বাঙ্গসুন্দরী, অনুপম গুণবতী কন্যা চাননি ? তা সেই কন্যা তাঁর কী কাজে লাগল ? পুত্রও তো দিয়েছিল ? পুত্রবতী সেই ভার্যার কী মর্যাদা তিনি দিলেন ? শুনতে পাই সদ্য প্রসূতি রাহুলমাতা গৌতমের গৃহত্যাগের পর মাটিতে শুতেন, দিনান্তে সামান্য পক্কান্ন একবার মাত্র গ্রহণ করতেন, মেঘদামের মতো কেশ কেটে ফেলেছিলেন। এত তপস্যা, এত পাতিব্রত্যের পরও তো গৌতম তাঁকে পা দিয়েও স্পর্শ করে দেখেননি।'

'কোথা থেকে এত শুনলি ?' অন্যমনস্ক হয়ে বিশাখা বলল।

'আমরা তো আর তোমার মতো অন্তঃপুরে থাকি না, নানা দিকে ঘুরতে হয় কাজে। সমন গৌতমের শিষ্যরাই তো এসব কথা গৌরবের সঙ্গে বলাবলি করে। নাকি কপিলাবস্তুতে তাঁকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখে দেবী নিদারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন, তাঁদের বংশের অনুপযুক্ত কাজ বলে নিষেধ করে পাঠিয়েছিলেন শ্বশুরকে দিয়ে। নাকি গৌতম তাঁকে বলেন তিনি শাক্যবংশের নন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধবংশের। একাকী রাহুলমাতার সঙ্গে তিনি দেখা পর্যন্ত করতে চাননি। যিনি দীর্ঘদিন তপস্যা করে কাম জয় করেছেন, নিজের স্ত্রীকে তিনি ভয় পেলেন, না কি ? সঙ্গে ওই উপতিষ্য বলে প্রৌঢ় ভিক্ষুটা ছিল, দেহরক্ষীর মতো, ওই যে গো যাকে সবাই সারিপুত্ত সারিপুত্ত করে। অগ্‌গসাবক হয়েছে না কি আবার !'

ময়ূরী বলল, 'শুধু দেবী রাহুলমাতা না কি ? আমি আরও মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনেছি কপিলাবস্তুর। কিন্তু ভদ্দে অল্পবয়স্কা, ব্যথা পাবেন, তাই না বলাই ভালো মনে করছি।'

বিশাখা মৃদু হেসে ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে তাকে তাড়না করে বলল, 'কৌতূহল কী করে বাড়াতে হয় খুব শিখেছিস, না ? কার কাছ্ থেকে এ বিদ্যা আয়ত্ত করলি ? ধনপালি তো তার পিতামহীর কথা বলে, তোর কি মাতামহী ?'

ময়ূরী হাসতে লাগল, তারপর ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'সত্যি গো বিসাখাভদ্দে, সমন গৌতম তাঁর বৈমাত্রেয় ছোট ভাই নন্দর বিয়ের দিনে তার হাতে ভিক্ষাপাত্র ধরিয়ে দিয়ে তাকে ন্যগ্রোধ-আরামে টেনে আনেন। বটগাছের ওই কাননটা শাক্য আর কোলিয়দের রাজ্যের সীমায় বোধহয়, রোহিণী নদীর তীরে। রাজপুরী থেকে অনেক দূর। তারপর অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে নন্দকে জোর করে পব্‌বজ্‌জ্যা দেন। ওদিকে তো বিয়ের সাজ পরে তার বধূ বসে আছে। একই সঙ্গে বধূও হবে, রানীও হবে। গৌতম চলে যাবার পর ওই কুমার নন্দই তো শুদ্ধোদনের সম্পত্তি পাবেন। শাক্যরা গৌতমের বংশকেই সবচে মানে। শুদ্ধোদনের ধনও নাকি অনেক।

বিশাখা তাকে আবার তাড়া দিয়ে বলল, 'গল্প বলতে জানিস না ? অন্য দিকে যাচ্ছিস কেন ? নন্দর বিয়ের গল্পটা বল্ !'

'বিয়ের গপ্পো নয় গো, মরণের গপ্পো ! শোনো, শুনলেই বুঝতে পারবে। নন্দর তো ওই বধূর সঙ্গে বাল্য থেকে প্রণয়। বধূ তো তোমারই মতো জনপদকল্যাণী।'

'এই ময়ূরি, মিথ্যা বলবি না, আমি কখনও জনপদকল্যাণী নই।'

'মিথ্যা বলছি না ভদ্দে, ওই সব গণরাজার দেশে সুন্দরী কন্যাদের জনসমক্ষে হাজির করতে হয় সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা হয় গো, তাই উপাধি দেয়া। তোমাকে তো তোমার পিতা ভয়ে ঘরের বারই করতে পারেন না। পাছে অমূল্য নিধিটি হারিয়ে যায়। সেদিন সরযূতীরে ওই বটুদের কথা শুনছিলে না ? অস্থিকল্যাণী, কেশকল্যাণী, মাংসকল্যাণী, একজন আবার বলল কণ্ঠকল্যাণী। তো সবেতেই যদি অমন কল্যাণী হও, মাথার থেকে পা পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ, তো জনপদকল্যাণী তুমি হবে না তো কি সেট্‌ঠি ভবদেবের মেয়ে খুজ্‌জ উত্তরা হবে ?'

বিশাখা রাগ করে বলল, 'কারও শারীরিক ত্রুটি নিয়ে এমন অকারণ পরিহাস করা আমি সইতে পারি না ময়ূরি, ছি ! উত্তরা দুর্ভাগিনীর দুঃখের কথা কখনও ভেবে দেখেছিস ? পিঠে ওই রকম কুঁজ। আহা, সে সোজা হয়ে চলতে পারে না।'

ধনপালী বলল, 'ময়ূরির গপ্পোটা যে শেষ হল না ভদ্দে, এই ময়ূরি ক্ষমা চা। আগে ক্ষমা চা, তারপর গপ্পোটা বল।'

ময়ূরী জোড়হাত করে ক্ষমা চাইল, কিন্তু তার ওষ্ঠাধরপ্রান্তে দুষ্টুমির হাসি লেগেছিল। বিশাখা গম্ভীরভাবে বলল, 'ঠিক আছে, বল্।'

'কুমার নন্দর প্রণয়িণী ওই শাক্যকন্যা অসামান্য রূপসী ছিল। নন্দকে ভালোবাসত প্রাণ দিয়ে। চিন্তা করো ভদ্দে, বধূসাজে সজ্জিত মেয়েটির কাছে সংবাদ এলো তার বর যে নাকি কিছুক্ষণ পরই বিয়ে করতে আসবে, সে পব্‌বজ্‌জ্যা নিয়েছে।'

'তারপর ? তখন কী হল ? শ্রমণ কি দয়া করলেন ?'

'সমন করবেন দয়া ! তা-ও নারীকে। যে নারীকে তৈজসপত্তরের মধ্যে গোনা হয় ? কন্যাটি মারা গেল। পূর্ণ বধূবেশে সজ্জিত সেই অপরূপা কন্যার হৃদয়ে বিষের তীর বিঁধল। শুনেছি চম্পক গৌরী কন্যাটি নাকি নীল হয়ে গিয়েছিল ব্যথায়। এত যাতনা যে টেনে টেনে গা থেকে আভরণ, বস্তর, উত্তরীয় সব খুলে ফেলে তারপর আপাদমস্তক নীল হয়ে ঢলে পড়ে।'

উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গাঢ় নিশ্বাস ফেলে বিশাখা মৃদুস্বরে বলল, 'নন্দ শুনেছেন সে কথা ?'

'শুনেছেন কি না জানি না, তবে এটুকু জানি যে সমন গৌতম তাকে নাকি ওই বধূর চেয়েও শতগুণে সুন্দরী দেবকন্যার লোভ দেখিয়ে বিনয় পালন করাচ্ছেন। তার নাকি মন ইতিমধ্যেই শান্ত হয়ে এসেছে। অর্হত্ত্ব লাভ করল বলে।'

বিশাখা বলল, 'বাঃ, দায়িত্বহীন মোহান্ধতার পুরস্কার হল অর্হত্ত্ব ? আর অনন্য প্রণয়ের পুরস্কার হল অপঘাত ?'

'তবেই বলো ভদ্দে, সুন্দরী গুণবতী হয়েই বা কী লাভ ! যোগ্য পতিলাভ করেই বা কী ! রাহুলমাতার যখন বিবাহ হয়, তখন শাক্যকুমারীরা, কোলিয় কন্যারা তো সবাই তাঁকে ঈর্ষাই করেছিল।'

'কেন ?' বিশাখা অন্যমনস্ক হয়ে বলল।

'তুমি সমন গৌতমকে দেখনি ?'

'হ্যাঁ একদা দেখেছিলাম বটে।'

'তাহলে জিজ্ঞেস করছো ? মগধরাজ বিম্বিসার নাকি তাঁকে বাতায়ন থেকে দেখতে পেয়ে নিচে নেমে এসে মগধ রাজ্যটাই অর্পন করতে চেয়েছিলেন।'

'সে কি শুধু রূপ দেখে ময়ূরি !'

'বাতায়ন থেকে প্রথম দর্শনে রূপ ছাড়া আর কী-ই বা দেখা যায় ভদ্দে !'

'তা অবশ্য,' বিশাখা স্বীকার করল, তারপর বলল, 'ময়ূরি, রূপেরও তো প্রকারভেদ আছে। যে রূপ দেখে শাক্যকন্যারা রাহুলমাতাকে ঈর্ষা করত, আর যে রূপ দেখে মগধরাজ রাজ্য দিয়ে দিতে চাইলেন তা নিশ্চয়ই এক নয়। একটি যদি রমণীমনোহর হয় তো অন্যটি হয়তো সর্বোত্তম পৌরুষব্যঞ্জক, হয়তো অসীম শক্তির কোনও দ্যোতনা ছিল সেই রূপে।'

'কি জানি তোমার মতো অত বিদ্যে তো শিখিনি ভদ্দে, এভাবে বিচার করতে পারব না, তবে আমার মতো সামান্য মেয়ে এটুকু বলতে পারে, তোমার মতো রূপসী গুণবতীর যোগ্য যদি কেউ হয় তো সে হবে ওই কুমার সিদ্ধার্থ।'

শিউরে উঠে কানে আঙুল দিল বিশাখা, ভর্ৎসনা করে বলল, 'ছি, ময়ূরি, এ কথা মুখে আনলেও যে পাপ হয়। শ্রমণ আমার পিতার বয়সী, পিতৃসম, তাছাড়া প্রব্রজিত, সন্ন্যাসী।'

'আমি কি তোমাকে সিদ্ধার্থকে প্রার্থনা করতে বলেছি ভদ্দে, আমরা মূর্খ নারী, সব কথা ঠিক মতো বোঝাতে পারি না, বলছি সিদ্ধার্থর মতো কেউ থাকলে সে হতো তোমার যোগ্য বর। কিন্তু তাতেই বা কী ? ওই রকম যোগ্য বরের হাতে পড়ে আমাদের আদরিণী প্রভুকন্যার যদি রাহুলমাতার মতো দশা হয়।'

'আমি অন্তত কেশ কর্তন করব না'—মল্লিকার মালা জড়ানো বেণীটিকে দুহাতে যেন আদর করতে করতে বিশাখা বলল, —'কর্কশ বস্ত্রও পরবো না, কদন্ন ভোজনও আমার দ্বারা হবে না।' সে অনুচরীদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, তার কণ্ঠস্বরে ক্রমশই চাপা গর্ব এবং রোষ প্রকাশ পাচ্ছিল।

'তুমি কখন সমনকে দেখেছিলে, ভদ্দে, আমাদের সে গপ্পো শোনাও না। আমরা তোমাকে কত গপ্পো শোনালাম !'

তার দাসীরা প্রভুকন্যার ভাবান্তর অনুভব করেছে। তারা তাকে সম্ভ্রম করে, ভালোবাসে, ভয় করে না। প্রভুকন্যার সঙ্গে তাদের সখিসম্বন্ধ। তার কাছ থেকে তারা অনেক কিছু শেখেও।

বিশাখা ধীরে ধীরে বলল, 'সে তো অনেক দিনের কথা। তখন ভদ্দিয় নগরে পিতামহের গৃহে থাকতাম। তোরা সে সময়ে ছিলি না।'

ধনপালী বলল, 'ভাগ্যিস তুমি সাকেতে এসেছিলে, নইলে যে আমাদের কী দশা হত ! খুজ্জ উত্তরার, না, না, উত্তরাদেবীর মা একটি দাসীকে এমনই প্রহার করেছেন যে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছিল আর কি !'

শিউরে উঠে বিশাখা বলল, 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ! সে কী ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে এক মহা কলঙ্কের ব্যাপার ভদ্দে, এই কহ্না তুই বল না ! তুই বেশ ভালো বলতে পারিস।
কহ্না বলল, 'ছি, ওসব কথা বিসাখাভদ্দার কানে তুলে কাজ নেই !'
বিশাখা বলল, 'আবার ! বল বলছি শিগগিরই !'
কহ্না বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি উত্তরামাতারও খুব দোষ নেই। মেয়ে খুজ্জ বলে তো দুশ্চিন্তার সীমা নেই। বিয়ে ছাড়া মেয়েদের গতি কী ? কিন্তু কী করে দোষযুক্ত কন্যাকে পার করবেন !'
বিশাখা বলল, 'উত্তরা কিন্তু সুশ্রী। ওই একটিই দোষ-ওর, আহা।'
'দোষ বলে দোষ ! তা অনেক দেখে-শুনে শেষ পর্যন্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পাত্র স্থির করেছিলেন ভবদেব সেট্‌ঠি। প্রথম স্ত্রীটি মারা গেছে। যমজ দুটি পুত্র। আহা অল্পবয়স্ক ! এর অসুখ করলে ওরও অসুখ করে। একসঙ্গে হাসে, একসঙ্গে কাঁদে। ব্রাহ্মণ তো একেবারে সারা হয়ে যাচ্ছিলেন। বুঝতেই পারছো অবিলম্বে পত্নী দরকার। ভবদেব অনেক সুবন্ন, ধান্য ক্ষেত্র ইত্যাদি যৌতুক দেবেন স্বীকার করে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে নিয়ে আসেন। ভদ্দা উত্তরা স্বহস্তে পলান্ন, পায়স, মণ্ড, মোদক সব প্রস্তুত করেছিল। যখন মাতা-পিতা-কন্যা ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলছে তখন পদ্মিনী ভোজ্য খজ্জ সব নিয়ে ঘরে ঢোকে। ভোজনপর্ব সমাধা করে বটু বলে কি জানো ? "যে দাসীটি ভোজ্য এনেছিল, ও ভৃতিকা, না ক্রীতদাসী ? যদি ক্রীতদাসী হয় তো কত নিষ্ক্রয় দিলে ওকে মুক্তি দেবেন বলুন, আমি ওকেই বিবাহ করব।"
'বলিস কী ?' বিশাখা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'একজন ব্রাহ্মণ হয়ে লোকটি এমন করল ?'
'ব্রাহ্মণ তো কী', কহ্নার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হল। সে বলল, 'শূদ্রা বলে, দাসী বলে কি আমরা আর মানুষ নই না কি, ওরকম অনেক বটু-বামুন, অনেক ক্ষত্তিয়-সেট্‌ঠিকুমারের নাক কেটে দিতে পারি।'
ধনপালী বলল, 'আহ্ কহ্না কী বাচালতা হচ্ছে ?'
বিশাখা হাসিমুখে বলল, 'না না ওকে বলতে দে পালি। অবশ্যই পারিস। নাক কান কাটতে পারিস, মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারিস। তোর শক্তিতে কে সন্দেহ প্রকাশ করছে ! আমি ব্রাহ্মণের দিক থেকে কথাটা চিন্তা করছি। একটি কন্যাকে বিবাহ করার জন্য গিয়ে তার...' বিশাখা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল। তার পাঁচজন দাসী তাকে ঘিরে রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে তাদের মনে সামান্য হলেও কিছু অভিমানের সঞ্চার হয়েছে। এই প্রসঙ্গ থামানো ভালো।
ময়ূরী বলল, 'তারপর জানো ভদ্দে, ব্রাহ্মণকে দুর্ব্যবহার করে বিদায় দিয়ে খুজ্জ উত্তরার মা পদ্মিনীর গলা টিপে ধরে। এমন জোরে যে উত্তরাভদ্দা আর ভবদেব সেট্‌ঠি কেউ ছাড়াতে পারছিলেন না। উত্তরার মা কেমন স্থূলাঙ্গী জানোই তো ! অবশেষে পদ্মিনী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে, সেট্‌ঠি বলতে থাকেন তুমি অতি কোপনস্বভাব, হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান নেই, নাও এবার হত্যার অপরাধে তোমাকে নগরপালের লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়ে হাত পা কেটে দেবে। তখন হাই-মাই করে কাঁদতে থাকে স্থূলাঙ্গিনী। ইতিমধ্যে উত্তরাভদ্দা চোখে মুখে জল দিয়ে, কণ্ঠ পৃষ্ঠ ডলে দিয়ে, উত্তম সুরা পান করিয়ে পদ্মিনীকে সুস্থ করে তোলে।'
'এখন ভালো আছে ?' বিশাখা জিজ্ঞাসা করল।
'এখনও হাতে পায়ে তেমন বল পায়নি শুনতে পাই।'
'মেয়েটি কি অতি সুন্দরী !'
'কী যে বলো ভদ্দে, অতি সুন্দরী আর কোথা থেকে হবে ! ভস্মের মতো বন্ন, কিন্তু মাথায় কেশ খুব, পৃথুল শ্রোণী। বক্ষ দুটিও বৃহৎ মৃৎ-হণ্ডিকার মতো। পুরুষদের আর কী চাই বলো ! তবে মানুষটি খুব শান্ত পদ্মিনী। এবার হয়তো ওকে বিক্রি করে দেবে সেট্‌ঠি।
বিশাখা উৎকর্ণ হয়ে ছিল, বলল, 'ওকে বিক্রি করলে আমি কিনব। দেখিস তো ! আর ওই ব্রাহ্মণ ? ওর একটু সন্ধান আনতে পারিস ?'
ময়ূরী বলল, 'কালই পদ্মিনীর খোঁজ আনব। কেন গো ভদ্দে ?'
বিশাখা সহসাই প্রভুকন্যা হয়ে উঠল। বলল, 'তাতে তোর প্রয়োজন কী ? আর এবার তোরা যা তো !'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোথায় যাবো ? তুমি একা থাকবে নাকি ?'

'কেন ! আমাকে একা থাকতে নেই ! দিবারাত্র তোদের কেকারব শুনতে হবে ?'

'দেবী তোমায় একা রাখতে বারণ করে গেছেন কিন্তু ।'

'আচ্ছা আচ্ছা যা, দেবী এলে আমি নিজে তাঁকে বুঝিয়ে দেবো এখন, কতক্ষণ একা থেকেছি ।'

ওদের পাঁচজনেরই খুব ঘুম পেয়ে গেছে বুঝতে পারা যাচ্ছে। ছাড়া পেয়ে ওরা বাঁচল। এখন ওদের কক্ষে গিয়ে শোওয়া মাত্র ঘুম এসে যাবে। অমন অন্তর্ভেদী নাসিকাগর্জন সবার দাসীরই হয়ে থাকে কি না জানা নেই বিশাখার। হলে বুঝতে হবে অভিজাত কন্যাদের সবারই রাত্রি-জাগরণ অভ্যাস আছে। এক এক জনের নাসিকার আওয়াজ এক-একরকম। কহ্না ঘুমোলেই ঘরে হরিৎ ফড়িং উড়তে থাকে, জোরালো পাখার শব্দ। ময়ূরী তার সঙ্গে যুক্ত করে একটা গুঞ্জনধ্বনি, ধনপালী ঘুমোয় মুখ হাঁ করে। এবং এক নিমেষ অন্তর তার খোলা মুখ থেকে একটি ছোট্ট পাখি উড়ে যায় ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎ করে।

প্রহরখানেক পরে বিশাখা ওদের কারও মুখ বন্ধ করে দেয়, কাউকে জোর করে পাশ ফিরিয়ে দেয়, কারুর গড়িয়ে পড়া মাথা উপাধানে তুলে দেয়, তারপর সত্যিকার নিস্তব্ধ নিশা নামে তার কক্ষায়। আগে সব গৃহের নিয়মমতো তার দাসীরা তার ঘরেই মাটির উপর শুতো। বিশাখা তার বারো বছর বয়স হবার পর নিজের ঘর আলাদা করে নিয়েছে। দাসীরা শোয় সংলগ্ন ঘরে। দ্বার খোলাই থাকে। তবু তো রাত্রির পরিসরে আপন কক্ষে কুমারী বিশাখা একা।

এখন এই কাননে সেই বহু আকাঙ্ক্ষার ধন একাকিত্ব সে পেল। ওই বৃক্ষগুলি ! সপ্তপর্ণী, এই নীপ, ওই বকুল, অদূরে ধ্রুব আম্রফলের বৃক্ষগুলি সব কাছাকাছি, তবু কেমন একা ! আকাশের তারাগুলি ! কাছাকাছি, তবু কত দূর ! নিজেদের একাকিত্ব কী দীপ্তির সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে ! সাতটি ঋষি যেন নিজ নিজ আসনে ধ্যানমগ্ন, ওই তো অরুন্ধতী ! দ্যুতিময়ী, স্বতন্ত্রা। এমন কি এই আকাশ ? এত মেঘ, দিবানিশি এত রঙ, সূর্য, চন্দ্র, তারকা সব নিয়েও কেমন একাকী। উদাসীন ! বিশাখা জানে তার চিত্তের মধ্যে কোথাও কোনও গুপ্তগৃহে এই একাকিত্ব যেন ন্যগ্রোধবৃক্ষতলে এক বৃক্ষদেবের মতো বসে আছে। তাকে ভালো করে দেখবার চেনবার অবসর সে পায় না।

হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও ধুপ করে একটা শব্দ হল। বিশাখা চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। মার্জার ? অন্য কোনও জানোয়ার হওয়া তো সম্ভব নয় ! সুরক্ষিত এই উদ্যান ! কিন্তু মার্জার অতি লঘুশরীর, এমন ভারী আওয়াজ···

'রত্নমালা ভালো লাগবে জানলে কুন্দমালা নিয়ে অপদস্থ হতে আসতাম না।' খুব কাছ থেকে কেউ বলে উঠল।

'কে ?' বিশাখা মৃদুস্বরে বলল।

নীপগাছটির উত্তর দিকে একটি ছায়া নড়ল, 'আমার বোঝা উচিত ছিল অবশ্য। ধনীকন্যার কাছে প্রণয়যোগ্যতা সুবর্ণ-মণি দিয়েই বিচার হবে এ আমার বোঝা উচিত ছিল। ভুল করেছি, কারণ ধনীকন্যাকে সুবর্ণপ্রতিমা মনে করিনি, বরং রক্তমাংসের কুসুমস্তবক মনে করেছিলাম।'

বিশাখা বলল, 'কাপুরুষের মতো আড়ালে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? সামনে এসো !'

'বাঃ, বেশ বিচার তো ! সামনে এলে বলবে হঠকারী, প্রগল্‌ভ, আড়ালে থাকলে বলবে কাপুরুষ ! চমৎকার বিসাখা, অতি চমৎকার !'

বিশাখা বলল, 'জানো না তিষ্য ? অত্যন্ত বেশি প্রকাশ্যও লজ্জাকর অত্যন্ত বেশি অপ্রকাশ্যও আবার অস্বস্তির বস্তু, নিতে হয় মধ্যপন্থা। কোন বস্তু কী ভাবে চাইতে হয় শেখোনি ?'

'না, শিখিনি বিসাখা। কখনও ভাবিনি দূর দেশ থেকে আগত কতকগুলি বটু না-জানা না-দেখা কোনও পুরুষের সঙ্গে বিসাখার মতো মেয়ের বিবাহের ঠিক করে ফেলতে পারবে একেবারে পথের মাঝখানে, সহস্র ইতরজনের চোখের সামনে, এবং ঠিক সেই দিনই যে দিন বিসাখা তার আন্তরিক শুভার্থী, প্রণয়প্রার্থী, সুশিক্ষিত, ক্ষত্রিয়যুবাকে অতি সঙ্গত পূর্বে-লিপিতে-জানানো বিবাহ প্রস্তাবের জন্য গণ্ডে চপেটাঘাত করেছে।'

সহসা বিশাখার দুই চোখ জলে ভরে উঠল। সে কোনও কথা বলল না। চাঁদের আলো পড়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মুখে। জলভরা চোখদুটি সরোবরের মতো চকচক করছে।

মধ্যজ্যৈষ্ঠের সেই হলকর্ষণের দিনটি থেকে তিষ্য অনেক ভেবেছে। একা একা ঘুরেছে, সাকেত-অযোধ্যা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বসে থেকেছে দিনের পর দিন। কিন্তু বিশাখার সঙ্গে একটা মুখোমুখি বোঝাপড়া না হলে সে শান্তি পাচ্ছে না।

'আমাকে যে ভালো লাগে না সে কথা তো লিপিতেই জানালে পারতে বিসাখা, আমি এই তিন বছর যে স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছি তা দেখতাম না। কষ্ট হতো অতিশয়, কিন্তু আত্মসংবরণ কী করে করতে হয়, বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা কী করে হাসিমুখে সহ্য করতে হয়, প্রকৃত ক্ষত্রিয় তা জানে।'

বিশাখা মাথা নেড়ে মৃদুতর স্বরে বলল, 'তোমাকে ভালো লাগে না সে কথা তো সত্য নয় তিষ্য।'

'সত্য নয়।' তিষ্য আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো, তারপর লক্ষ করল বিশাখার চোখে জল। সে অভিভূত হয়ে বলল, 'সখি বিসাখে, তুমি কাঁদছো?' সে তার উত্তরীয় প্রান্ত বিসাখার চোখের জল মোছাবার জন্য তুলল।

বিশাখা একটু পিছিয়ে গিয়ে ধরা গলায় বলল, 'আমাকে স্পর্শ করো না তিষ্য। জানো না, কৌমার্যরক্ষার জন্য আমাদের পিতা-মাতা অনুক্ষণ আমাদের প্রহরা দিয়ে রাখেন। জানো না, স্নানাগারে, শয়নকক্ষে পর্যন্ত দাসীরা আমাদের অনুসরণ করে। বিন্দুমাত্র সংশয় হলে স্বয়ং পিতা পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখতে কুণ্ঠা বোধ করেন না যে আমরা প্রকৃতই কুমারী কি না। যতই আদরিণী হই তিষ্য, আমরা, এই সাকেতের, রাজগৃহের, শ্রাবস্তীর, বারাণসীর সর্বত্র যেখানে যে আছি যত নারী, সবাই বন্দিনী। আভিজাত্য একটা ছলমাত্র। সুকৌশলে বন্দিত্ব আমাদের অভ্যাস করিয়ে নেওয়া।

তিষ্য অবাক হয়ে বলল, 'বিসাখা, তুমি এই সব ভাবো! মুক্তি চাও? কোনদিন তো বুঝিনি? তুমি যদি বলো তো এই মুহূর্তে আমার অশ্বী মন্দ্রার পিঠে চাপিয়ে তোমাকে নিয়ে এই সাকেত থেকে উধাও হয়ে যেতে পারি।'

'মুক্তি চাই, একথা তো বলিনি তিষ্য!' চোখের জল মুছে বিসাখা বলল। 'স্বর্ণশৃঙ্খলের যন্ত্রণা, আভিজাত্য-সর্পের দংশন- বেদনা যে কী ভাবে হাসিমুখে সহ্য করতে হয়, শ্রেষ্ঠীকন্যা তা জানে।'

'সে কী? তাহলে কী চাও বিসাখা!'

'এখনও ভালো করে জানি না তিষ্য। জানি না কী চাই। কী চাওয়া উচিত এটুকুই চিরকাল শিখে এসেছি। অনুক্ষণ মনে সংশয় উপস্থিত হয়।'

'আমাকে যদি ভালোবাসো বিসাখা, তো অনুমতি দাও।'

'কী? মন্দ্রার পিঠে অনির্দেশ্যের পথে বেরিয়ে পড়বো?'

'ধরো তাই।'

'তারপর যখন ব্যালকান্তার এসে পড়বে, হিংস্র শ্বাপদেরা আক্রমণ করবে, যখন দস্যুরা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, একজন দুজন নয় অসংখ্য দস্যু। অরণ্যে যখন রাক্ষস-যক্ষ আমাদের বেঁধে ফেলে কাঁচা ভক্ষণ করবার ব্যবস্থা করবে, কিংবা যখন অনুদক কান্তারে পড়ে হা জল যো জল করে প্রাণ যাবে?'

'অত চিন্তা করলে মুক্তি পাওয়া যায় না বিসাখা। আমি ক্ষত্রিয়কুমার, দেহে বল আছে। অস্ত্রচালনা করতে পারি, তুমিও পারো শুনেছি, ভয় কী?'

'ভয় নয় তিষ্য, হঠকারিতা করতে আমার প্রকৃতি আমাকে বাধা দেয়। আমি পিতামাতাকে প্রাণাধিক ভালোবাসি। তাঁদের প্রাণে দুঃখ দেবার চেয়ে বরং আমি মৃত্যুবরণ করবো।'

'তাহলে? তাহলে বলো পিতাকে বলি তিনি বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠান শ্রেষ্ঠীর কাছে। বিসাখা আমি হবো রাজা, সাকেতে নয়, বিন্ধ্য পেরিয়ে চলে যাবো দক্ষিণ দেশে, তুমি হবে আমার রানী।'

'অগ্রমহিষী?'

'নিশ্চয়ই।'

'তারপর দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী? থাকবে না? বাবাতা পরিবৃক্তী, পালাগলী.... শাস্ত্রের সব নির্দেশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়পত্র আছে না ? রাজাদের জন্য ?

'বিসাখা আমি একপত্নীক থাকবো।'

'রাজ্যাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একপত্নীক থাকা সম্ভব নয় তিষ্য। দেখো না, মহারাজ বিম্বিসার কোশলকুমারীর পর, ছেল্লনা দেবী, তারপর ক্ষেমা দেবীকে বিবাহ করলেন ! কৌশাম্বীরাজ উদয়নের প্রথম যৌবনের গল্প শোননি ? অবন্তী-রাজকুমারী বাসুলদত্তাকে কত কাণ্ড করে অপহরণ করলেন। আর এখন ? এখন তো কৌশাম্বীরাজের মহিষী সংখ্যা বছরে একবার করে বেড়ে যাচ্ছে। দোষ দিচ্ছি না। রাজ্যরক্ষা করবার জন্যেই অনেক সময়ে রাজাদের বারবার বিবাহ করতে হয়।'

'তাই কি তুমি অজানা-অচেনা শ্রেষ্ঠীকুমারের মাল্য গ্রহণ করলে বিসাখা ? একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না ? প্রণয়ের কোনও মূল্য নেই ?'

'প্রণয় কী আমি জানি না তিষ্য।' বিশাখা সহসা তার দীর্ঘপক্ষ্ম নীলাভ চোখ দুটি পরম সরলতার সঙ্গে তিষ্যর দিকে মেলে ধরে বলল।

'জানো না ? এই যে বললে আমাকে ভালোবাসো ?'

'তা তো বলিনি। তোমাকে ভালো লাগে না, এ কথা সত্য নয় এটুকুই বলেছি। তুমিই বলো না, পরস্পরের প্রতি কিছুদিনের আকর্ষণ, সন্তান উৎপাদন, গৃহস্থালী দেখা, তারপর ক্রমশ ক্রমশ বয়স বাড়া, জরার আক্রমণ, তারপর মরণের কোলে ঢলে পড়া। এই তো জীবন। এর মধ্যে প্রণয় কোনটা ? মিলনের পূর্বের আকর্ষণটা ? না নিয়মিত সন্তান উৎপাদনটা ? না সুষ্ঠুভাবে গৃহস্থধর্ম পালন করাটা ? কোনটা ?'

তিষ্য বলল, 'সখি বিসাখে তুমি অতিসরলা না অতি বাক্‌পটু আমি বুঝতে পারছি না। আমার তক্ষশিলার শীলিত মস্তকটিও তুমি ঘুরিয়ে দিলে। বেশ, সহজ সরল কথায় বলো, রাজা উগ্রসেনের দূত যদি তাঁর জ্যেষ্ঠ কুমার তিষ্যর সঙ্গে ধনঞ্জয়-পুত্রীর বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে যায়, তুমি সম্মত হবে ?'

'আমার সম্মতির তো কোনও গুরুত্ব নেই তিষ্য ! পিতা বুঝবেন কী করবেন।'

'বুঝলাম বিসাখা,' এতক্ষণে তিষ্য হতাশ হয়ে বলল, 'আবার বুঝলামও না। আচ্ছা বিদায়। তবে তুমি রাণী হলে সে রাজ্যে আর কূটনীতিকের প্রয়োজন হবে না।' তিষ্য কাননের ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর নিশীথরাত্রির বুকে ধাবমান অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল।

মধ্যরাত পর্যন্ত উদ্যানেই বসে রইল বিশাখা। মা নেই বলেই হয়তো অন্তঃপুরের শাসন এখন কিছুটা শিথিল। নইলে, এই বিরাট আকাশ, এই শূন্য উদ্যান, জনমানবহীন এমন নিশীথরাত্রির অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও হয়নি। কখনও কখনও অবশ্য সে তাদের সপ্তমতলের ছাতেও ওঠে। সেখান থেকে ধনধান্যময় বসুন্ধরা কত নিচে, কত দূরে মনে হয়। কিন্তু আকাশ কি কাছে আসে ? আসে না তো ! থেকে যায় ঠিক সেই একই প্রকার দূর। আর সেখানেও অনুচরী ব্যতীত ওঠবার অনুমতি তার নেই। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর গৃহে তাঁর কন্যাকে কোনও নিষেধাজ্ঞা কখনও স্পষ্টভাবে শুনতে হয় মনে করলে ভুল হবে। কিন্তু গৃহের পরিমণ্ডলই কয়েকটি সামাজিক, পারিবারিক রীতি-নীতি, উচিত অনুচিতের অনুজ্ঞা দিয়ে গড়া, বুদ্ধিমতী বিশাখার বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না কোথায় তার কাছ থেকে কী প্রত্যাশিত। তার বাইরে গেলে পিতা মাতাকে ব্যথা দেওয়া হবে। যেখানেই যাক বিশাখা, সে সরযূতীরেই হোক, কোনও শোভনোদ্যানেই হোক, বা নিজের গৃহের সপ্তমতলবর্তী ছাতেই হোক, পিপীলিকা-শ্রেণীর মতো দাসীরা তাকে অনুসরণ করে। এই প্রকারই রীতি। পিতা মাতার কখনও মনে হয়নি এই রীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশাখার জন্যে, অন্তত বিশাখার জন্যে। পিতা মাতাকে বিসাখা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তাঁদের বিচক্ষণতাতেও তার আস্থা আছে। পিতা তো এত পরিশ্রমী উদ্যোগী যে ভদ্দিয়তে পিতামহর সঙ্গে থাকবার সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনী ছিলেন। সাকেতে আসবার পর কয়েক বছরের মধ্যেই অক্লান্ত পরিশ্রমে যোতীয়, কাকবলীয় এঁদের সমকক্ষ হয়ে গেছেন ! তাঁর বাণিজ্য স্থলে, জলে উভয়তই প্রসারিত হয়েছে। সূক্ষ্ম কার্পাস, ক্ষৌম, পট্টবস্ত্র, রেশম, পুবদেশের মধু এসব পাঠান পশ্চিমে, উত্তর-পূর্বের ঘন অরণ্যময় ভূমির একদিকে যেমন মধু ও কাঠ, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে তেমন তাম্রপিণ্ড, অয়স্‌, নদীর বালুতে মিশ্রিত স্বর্ণরেণু, পাহাড়ের গহ্বরে প্রচুর মণিরত্ন পাওয়া যায়। আর কেউ জানে না, পিতা জানেন সেসব রত্নভাণ্ডারের ঠিকানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ছাড়াও অজিন আসে পেটিকার পর পেটিকা, আসে চিত্র-বিচিত্র সাপের খোলস, ব্যাঘ্রচর্ম, গজদন্ত।

আর মা? তিনি এতই বিচক্ষণ যে রাজান্তঃপুরে কোনও দুরূহ সমস্যা হলেই তাঁর ডাক পড়ে। পিতামাতার বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্ব রাজগৃহেই কেটেছে। সেই সময় থেকেই মহাদেবী ক্ষেমা ও কোশলকুমারীর সঙ্গে মায়ের অন্তরঙ্গতা। মহারাজ বিম্বিসার তো তাঁর শিশুকালের বন্ধু। মাস দুয়েক আগে দ্রুতগামী রথ এসে মাকে রাজগৃহে নিয়ে গেছে। কে জানে আবার কী সমস্যার উদয় হল সেখানে! যে কোনদিন মা এবার এসে পড়বেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই বিরাট শ্রেষ্ঠীসংসার বিশাখাই চালাচ্ছে। মা তো তাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তবু কেন চলাফেরার বিধিনিষেধ ঘোচে না! তা কি সে কুমারী বলে? বিবাহের পর তাহলে এগুলি ঘুচবে? মাকে দেখে অন্তত এই মনে হয়। কিন্তু মায়ের কথা স্বতন্ত্র। অন্যান্য সব পরিবারের বধূরা তো কই…!

শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় বিধৌত হয়ে যাচ্ছে এখন কাননভূমি। বহুদূর থেকে শৃগালের রব শোনা যাচ্ছে। সহসা বিশাখা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ছ-সাত বছর আগেকার একটি দিনের কথা তার মনে পড়ছে। বসন্তকাল। ভদ্দিয়র দিনান্ত শিমুলে পলাশে অশোকে সিঁদুরবর্ণ হয়ে রয়েছে। লাল মাটির পেটা পথটা চলে গেছে শস্যক্ষেতগুলির পাশ দিয়ে দিয়ে। কুম্ভকার পল্লী, কর্মকার পল্লী, সূত্রধর পল্লী পেরিয়ে চলে যাচ্ছে বিশাখার রথ গ্রামপ্রান্তের শালবনে। এখানে যেমন অঞ্জনবন, তেমনি নিবিড় সুন্দর সেই বনবীথি। বিশাখার সঙ্গে তার সখীরা, ভগ্নীরা, দাসীরা। দূর থেকে যেই বনটি দেখা অমনি সে নেমে পড়েছে। সবাই অবাক। বিশাখা চলেছে তার বসন সংবৃত করে, শালমঞ্জরী মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

সবাই জিজ্ঞেস করছে, 'নামলি কেন?'

'শুনলি না, পিতামহ বললেন ভগবান বুদ্ধ তথাগত এসেছেন। তথাগতকে দেখতে কেউ রথে চড়ে যায়?'

বয়সে বড় এক পিতৃব্যকন্যা বলল, 'তুমি কি ভেবেছ তথাগত মানে আকাশ থেকে এসেছেন? যিনি ইন্দ্র বরুণ যম অশ্বিনীকুমার এঁদেরও ওপরে থাকেন? যাঁর কথা সেদিন আচার্য দেবল বলছিলেন? মোটেই না। ইনি একজন সন্ন্যাসী। তথাগত একটা সম্ভ্রমের ডাক।'

বিশাখা হারবার পাত্রী নয়। সে বলল, 'তাহলে তথাগত কেন বলে, বলো তো? তথা হতে আগত। সেখান থেকে এসেছেন। সেইখান, যেখানে দেবতারা থাকেন। সেখানে দেবতাদেরও পতি স্বয়ং ছাড়া আর কে থাকবেন?'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুলোচনা বলেছিল, 'দূর, দেবতা কি চোখে দেখা যায়? যজ্ঞের সময়ে এত দেবতাদের ডাকা হয়, হবিঃ দিয়ে, পশুমাংস দিয়ে, দুগ্ধ দিয়ে, তা তাঁদেরই কি দেখা যায়, বল্?'

বিশাখার মনটা দমে গেল। তারপর শালবনের মর্মরধ্বনির মধ্যে তারা প্রবেশ করল। কেমন একটা মৃদু গুঞ্জন! প্রকৃতি কি মৃদুস্বরে গান গাইছে! না তো! আরও কিছুদূর এগোতে ওরা দেখল একটি শিংশপার মূলে একটি উঁচু মৃৎ-বেদীর ওপর একজন মানুষ বসে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে বনের মাটির ওপর আরও বহু জন। কথা বলছেন সেই পুরুষ। দূর থেকে তাকেই প্রকৃতির স্ব-কণ্ঠের সঙ্গীত বলে মনে হয়েছিল। উনি কথা বলছেন, একটি কাহিনী। থামলেন। বিশাখা এবং তার সখীদের দিকে তাকালেন, বললেন, 'এসো বচ্চে বিসাখা, সুলোচনা, সিরিমা, কালী, রম্ভা এসো।' উনি কী করে ওদের নাম জানলেন, তারা যে কজন সামনে দাঁড়িয়েছিল। সবার নাম! বিশাখা তার সখী ও ভগ্নীদের নিয়ে বসল। একেবারে ওঁর মুখোমুখি। দশ হাত দূরে। উনি বলতে আরম্ভ করলেন। সমস্ত মুখ প্রসন্নতায় ভরা, হাসছেন না তবু যেন হাসছেন। চোখ দিয়ে, ত্বক দিয়ে হাসছেন। 'পৃথিবীতে যেদিকেই চাও দুঃখ, হে ভদ্দিয়বাসীরা। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, বিচ্ছেদ, অপমান, অকল্যাণ। যেদিকেই যাবে কোনও না কোনও রূপে দুঃখ এসে পথরোধ করে দাঁড়াবেই। করাল তার মুখ, লোল তার জিহ্বা, অতি ভীমণ তার দৃষ্টি। এ দুঃখ কি পরের করা? পরং কতং? এই জড় প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে? না কি আমাদের ভেতরে কেউ আছে সেই উৎপন্ন করছে? সয়ং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতং ? না কি সয়ংকতং চ পরং কতং চ দুক্‌খম ! নিজেরও করা, আবার পরেরও করা। অনেকে অনেক কিছু বলছেন। কিন্তু নানাভাবে তপস্যা করে অবশেষে আমি দেখলাম দুক্‌খ আত্মা নামক কোনও বস্তু থেকেও উৎপন্ন হয় না, আবার জড় প্রকৃতি থেকেও হয় না, আবার দুক্‌খ আকস্মিকও নয়। প্রকৃত কারণ হচ্ছে তন্‌হা। যতক্ষণ তন্‌হা ততক্ষণ দুক্‌খ।'

সভায় একটি দস্তুর বৃদ্ধ সহসা কেঁদে উঠল, 'ভগবন, ভগবন, জরায় আমাকে আচ্ছন্ন করছে, মরণ আমার দ্বারে উপস্থিত। মহাদুঃখ সমাসন্ন, আমিও তার লোল জিহ্বা দেখতে পাচ্ছি। যে আমি সারা দিনে একটি গোটা গোবৎস শূলে পাক করে আহার করতে পারতাম, গোটা মহাশোল এবং রোহিত পলান্নের সঙ্গে প্রতিদিন দুই বেলা যার জঠরের পক্ষে কিছুই ছিল না, দুই ভৃঙ্গার ভর্তি বারুণী, মাধ্বী পান করেও যে অবিচলিত থাকত, চারটি বরারোহা স্ত্রী গৃহে বর্তমান, আরও ছটি সুদেহী শূদ্রা দাসী সব সময়ে সেবা করতে প্রস্তুত, তা সত্ত্বেও যার পৌরুষ এমন দুর্বার ছিল যে ভদ্দিয়র বারবধূ মদালসা তো বটেই, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যে রাজগৃহের শালবতীর গৃহে কামনা চরিতার্থ করতে যেত সেই আমি অশক্ত হয়ে পড়েছি ভগবন। খাদ্যে রুচি নেই। মাংসদর্শনে বিবমিষা আসে। এখন আমার চোখের সামনে দিয়ে স্বয়ং অম্বপালী হেঁটে গেলেও বোধহয় কামেচ্ছা হবে না।'

সভায় উপস্থিত একটি যুবক ঈষৎ হেসে নিম্নকণ্ঠে বলল, 'এখানে কেন বৃদ্ধ শৃগাল, তুই তক্ষশিলায় আত্রেয় পুনর্বসুর কাছে চলে যা, দ্যাখ্ যদি সিংহবসা বা বানরলিঙ্গ থেকে তোর জন্য কিছু ওষুধ করে দিতে পারে ! আরও দশ বছর রতিসম্ভোগ কর পথকুক্কুরের মতো ! খালি ভদ্দিয়র এই সব সুন্দরী বালিকা কিশোরীগুলিকে সাবধানে রাখতে হবে।' বলতে বলতে যুবক বিশাখার দিকে দৃষ্টিপাত করছিল। কেন কে জানে বিশাখার মধ্যে একটা ভয়ের শিহরন জাগল।

এমন সময়ে শোনা গেল বুদ্ধ বলছেন : 'তোমার এই নিরবচ্ছিন্ন ভোগেচ্ছা এই-ই তনহা। তনহা থেকেই জন্ম, জন্ম থেকেই জরা, মরণ। ... সম্ভোগ করতে চাও কেন ?'

'সুখ হয় ভগবন, বড় সুখ, রোমকূপে, রোমকূপে। জঙ্ঘায়, লিঙ্গে, জিহ্বায়, ওষ্ঠে, বক্ষে, উদরে বড় সুখ।'

'কিন্তু তার পরে ?'

'তার পরে দেহে অবসাদ, গ্লানি, তা দূর করতে আরও মৈরেয় আরও মৈথুন, আরও মৎস্য মাংস।

'তারপরে ?'

'তারপরে এখন অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, নিরুত্তেজিত ব্যর্থ দিনরাত। কিছু পারি না, কিছু পারি না আর। এর থেকে মুক্তির উপায় কী ?'

গম্ভীর মধুর স্বরে তথাগত বললেন, 'নিব্বানং পরমং সুখম্।' কথা কটি কেমন ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো সমস্ত বনে ছড়িয়ে গেল। নিব্বানং নিব্বানম্, উন্নতদেহ শালতরুগুলি ঊর্ধ্বমুখ করে যেন বলছে— নিব্বানম্‌ম্‌ম্ বনস্থলীর রক্তবর্ণ মাটি থেকে সুগন্ধিচূর্ণের মতো বাতাসে উত্থিত হচ্ছে পরমং সুখম্, পরমং সুখম্‌ম্‌ম্।

প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি কথা এখনও অবিকল মনে করতে পারে বিশাখা। কিন্তু এর পর ? আর কিছু মনে নেই। শুধু অস্পষ্ট একটা অনুভব ছিল যে বিশাল সেই জনমণ্ডলী একদম স্তব্ধ। সেই বৃদ্ধের কান্নার শব্দ হঠাৎ যেন এক বিপুল গর্ভবতী নির্জনতা গ্রাস করে নিল। বিশাখার মা নেই, বাবা নেই, সখীরা, দাসীরা, ভ্রাতা-ভগ্নীরা নেই, খেলা নেই, গহনা নেই, উৎসব নেই, অথবা আছে, সব আছে। বর্জিত বস্তুর স্তূপের মতো অনেক নিচে পড়ে আছে। বিশাখা নিজেও নেই, আছে এক জ্যোতিঃসমুদ্র। তাতে ভাসছে তিনটি শব্দ নিব্বানং পরমং সুখম্।

কতক্ষণ সে এভাবে ছিল জানে না। যখন জ্ঞান হল দেখল সামনে পিতার মুখ। তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। পেছনে মা। হঠাৎ দৃষ্টিপথে এলো শালবন, বৃহতী জনসভা, সবার পেছনে অস্তাচলের আরক্ত আকাশ। পিতার চোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। জিজ্ঞাসা করছেন, 'ভগবন্, হঠাৎ কন্যার এমন অবস্থা হল কেন ? কোনও অসুখ নয় তো ? অপস্মার কি অন্য কিছু ? আমাদের স্নেহের পুতলি যে এই কন্যা !'

'না সেট্‌ঠি, বিসাখা সোতাপত্তি মার্গে প্রবেশ করেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সোতাপত্তি ? সে কী ভগবন্ ?'

'এখানে তথাগত চত্তার অরিয়সচ্চ (চার আর্যসত্য) ব্যাখ্যা করছিলেন, বিসাখা শুদ্ধ আধার। শুনতে শুনতে হৃদয়ঙ্গম করেছে। একেই সোতাপন্ন বলে। এ বিকার নয় সেট্‌ঠি। এ বিস্তার, বিহার।'

'আমরা এতজন বয়স্ক মানুষ রয়েছি। কত বণিক, কত সেট্‌ঠি, কত গোট্‌ঠি জেট্‌ঠক, গহপতি, শিক্ষাবান যুবক সব। সবার মাঝখান থেকে এতটুকু একটি বালিকা কী করে এমন উচ্চতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করল ভগবন্।'

'মস্তিষ্ক দিয়ে তো নয়, জাগ্রত বোধি দিয়ে এ তত্ত্ব বোধিচিত্তে প্রবেশ করে সেট্‌ঠি, তুমি চিন্তা করো না। বিসাখাকে গেহে নিয়ে যাও।'

জ্যোৎস্নার সমুদ্র এখন কানন প্লাবিত করে দিচ্ছে। বিশাখা সেই জ্যোতিঃসত্ত্ব বুদ্ধ তথাগতকে দৃষ্টিপথে আনবার চেষ্টা করল, পারল না। স্মরণে আসছে, কিন্তু সেদিনকার দেখা সেই মূর্তি নয়। তাঁর অন্য রূপ। মেণ্ডক-গৃহে ভোজনে বসেছেন এক অনিন্দ্যকান্তি যুবাপুরুষ। উজ্জ্বল গলিত স্বর্ণের মতো গাত্রবর্ণ। মাথায় কেশপুঞ্জ সবে গজাতে আরম্ভ করেছে। কুঞ্চিত পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণকেশ। আকর্ণবিস্তৃত পদ্মপলাশের মতো নয়ন দুটি। সিংহকটি। মেরুদণ্ড শালবৃক্ষের মতোই সোজা। পুরস্ত্রীরা অনেকেই তদ্দণ্ডে তাঁর কাছে দীক্ষিত হবার জন্য আবেদন করেছিল। তার এক পিতৃষসা, যিনি নাকি প্রথম স্বামী বাণিজ্যে যাবার বারো বছর পরে তখন সবে মোক্ষ (বিবাহ-বিচ্ছেদ) নিয়েছেন, পিতামহ তাঁর আবার বিবাহের ব্যবস্থা করছেন, তিনি হঠাৎ নিজের কেশগুচ্ছ ধরে লুটিয়ে পড়েছিলেন সেই যুবার চরণে।

'বিবাহ নয়, পব্বজ্জা দিন, ভগবন্।'

বিশাখা দেখল জ্যোৎস্নাময় বীথিপথ ধরে তার পিতা এগিয়ে আসছেন। শেষ রাত। চন্দ্রাননা আকাশটির কপালে শুকতারার টিপটি ক্রমশই জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছে। সে এতক্ষণ কাননে ছিল ?

পিতা সস্নেহে বললেন, 'মা বিসাখা, তুমি ঘুমোতে যাওনি ?'

বিশাখা সহসা উত্তর দিতে পারল না। এবার ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে উদ্বেগ গোপন রইল না। তিনি তাকে সামান্য নাড়িয়ে বললেন—'মা, কোনও কারণে অভিমান করেছ ? ঘরে চলো। মায়ের জন্যে কি উৎকণ্ঠিত হয়েছ ? কিছুক্ষণ আগে অগ্রদূত এসেছে তোমার মায়ের সংবাদ নিয়ে। তিনি আজ দ্বিপ্রহরের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।' বিশাখা দেখল সে উঠতে পারছে না। অথচ হাত পা ধরে যায়নি, সে কথাও বলতে পারছে না। অথচ জিভ দাঁত সবই সে পরিষ্কার নাড়াতে পারছে। ভেতরে কেমন একটা স্তব্ধতা। অননুভূতপূর্ব। তখন ধনঞ্জয় তাকে দুই হাতে করে তুলে নিলেন। যেন দুই হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি একটি পদ্মের মালা। সেইভাবে চলতে চলতে ধনঞ্জয় ভাবলেন—'কী হল ? প্রথম বুদ্ধ দর্শনে মায়ের আমার এমনই যেন ভাবান্তর হয়েছিল। আবার, কি তেমনি হল ?' অন্তঃপুরের দ্বারে গিয়ে তিনি ডাকতে লাগলেন, 'কহ্না, ধনপালি, কোথায় গেলি সব ? বিসাখাকে ঘরে নিয়ে যা।'

বিশাখা ধীরে ধীরে বাবার কোল থেকে নেমে দাঁড়াল। স্বপ্নোত্থিতর মতো বলল, 'পিতা, ওদের বকো না। আমিই ওদের জোর করে শুতে পাঠিয়েছিলাম ? ওরা যেতে চায়নি।'

'কী হয়েছে মা তোর ?' ধনঞ্জয় যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছু হয় নি তো ! তোমার কোলে ওঠবার সাধ হয়েছিল হয় তো। পিতা। শীঘ্রই তো পরহস্তগতং ধনম্ হয়ে যেতে হবে। তাই…।'

ধনঞ্জয় বিশাখার মাথাটি বুকে চেপে ধরে বললেন, 'এমন করে বলো না মা। পিতা-মাতার থেকে তোমাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। দেখো, তুমি কত সুখী হবে।' কোথায় উদ্যানের মধ্যে কোন গাছ থেকে একটা তক্ষক ডাকছে। তক্ খক্ তক্ খক্ তক্ খক্। ভোরের অরুণাভা এসে রাঙিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে উঁচু উঁচু গাছের শীর্ষ শাখাগুলি। পাখি ডাকছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

কয়েকটি দীর্ঘ কটাক্ষে কক্ষটি ভালো করে দেখে নিল চণক। একজন রাজার শয়নকক্ষ, ভোজনকক্ষ এসব দেখে কি তাঁর মন বোঝা যায়! হয়তো যায় না, কারণ রাজপুরীর বিভিন্ন অংশ কেমন হবে না হবে সেটা একটা রাজকীয় প্রথার ব্যাপার। তবে, রুচির প্রশ্নও নিশ্চয় আছে। যা প্রথা তার থেকে রুচিকে স্বতন্ত্র করে ফেলবার চেষ্টা করে চণক। গান্ধাররাজের ভোজনশালার সঙ্গে এ কক্ষের কোনও তুলনাই হয় না। সরল, নিরাড়ম্বর, ইস্টক নির্মিত কক্ষ। বৃহৎ। কিন্তু খুব বেশি বৃহদায়তন নয়। দেয়ালে রঙিন ভিত্তিচিত্র, হর্ম্যতল কাঠের। অতি মসৃণ। ঘরটির মধ্যে চারটি চারটি আটটি স্তম্ভ রয়েছে। পীঠগুলি চতুষ্কোণ। তার ওপর প্রস্ফুটিত কমলের মধ্যে থেকে সুগোল স্তম্ভগুলি উঠে গিয়ে ছাদটিকে ধরে রেখেছে। ছাদ সমান, মসৃণ। শুধু মাঝখানে একটি সহস্রদল পদ্ম। রাজার বসবার আসনের পিছনে একটি ভাস্কর্য। দুদিক থেকে দুটি হাতি সামনের পা এবং শুঁড় তুলে উভয়ের মাঝখানে একটি প্রকোষ্ঠের মতো সৃষ্টি করেছে। তারই সামনে চিত্রবর্ণ স্থূল রাজাসন। চণককে এনে দাসীরা বসিয়েছে অতি স্থূল, অতি কোমল আসনে, সামনে ভোজন ফলক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কক্ষের একদিকের শুক্ল বস্ত্রাবরণী সরিয়ে দু পাশে দুটি সুন্দরী যুবতী নিয়ে বিম্বিসার প্রবেশ করলেন। চণক লক্ষ করল যুবতী দুটি পিঙ্গল বর্ণ। রাজার পরনে পীতাভ কার্পাসবস্ত্র, নগ্ন বক্ষে চন্দন আর হরিতালের অবলেপ। পীত উত্তরীয়। শুভ্র মার্জিত উপবীত। কপালেও চন্দন হরিতালের তিলক। ঘন কেশ সুবিন্যস্ত, স্নানান্তের স্নিগ্ধতা সর্ব অঙ্গে। শালপ্রাংশু ভুজের ওপর মুক্তার অঙ্গদ, কানে মুক্তার কুণ্ডল, কিন্তু কণ্ঠে শুধু একটি অতি স্থূল জাতী পুষ্পের মালা। মহারাজ বিম্বিসার সত্যিই অতি সুপুরুষ।

চণক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছিল। রাজার মুখে চণককে দেখে একটি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছে। প্রতিনমস্কার করলেন সুভদ্র ভঙ্গিতে। বাতায়নপথে বর্ষার সজল হাওয়া প্রবেশ করছে, সেদিকে তাকিয়ে বীজনকারিণী দাসী দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের ছুটি, সুনন্দে, সুভদ্রে,' আভূমি প্রণাম করে ছন্দিত পায়ে দাসীদুটি চলে গেল। ভারে ভারে খাদ্যবস্তু আসতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গন্ধে, বর্ণে ভোজনকক্ষটি আমোদিত হয়ে উঠল।

রাজা বললেন, 'চণকভদ্র, এ ভাবে আপনার দেখা পাবো, কখনও ভাবিনি। আমাকে অনুগ্রহ করে আচার্যদেবের কথা শোনান। আমার যা কিছু সত্যিকারের শিক্ষা তা আচার্য কাত্যায়ন দেবরাতের কাছেই।'

চণক ধীরে ধীরে বলল, 'মহারাজ, পিতা গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর শেষ আদেশ ছিল আমি যেন মগধে এসে আপনার সঙ্গে মিলিত হই।'

বিম্বিসার পরম বিস্ময়ভরে বললেন, 'আচার্য বলেছিলেন! এর নিশ্চয় কোনও গূঢ়ার্থ আছে। বলুন ভদ্র?'

চণক একই সুরে বলল, 'পিতা আমাকে বলেছিলেন তাঁর আশীবর্ণীর কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে।'

জোড়াসনে বসে ডান কনুইয়ে ডান উরুর ওপর ভর দিয়ে বসেছিলেন বিম্বিসার। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন, মৃদু স্বরে বললেন 'আপনি জানেন!'

'জানি। সবটাই।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে রাজা বললেন, 'সে তো আশীর্বাদ যতটা, আদেশ তার চেয়েও অধিক।'

চণক বলল, 'হয়তো তার চেয়েও অধিক প্রার্থনা।'

'কী বলছেন! আচার্য আমার জীবনে সবচেয়ে মাননীয়।'

'কোনও কোনও ব্যাপারে ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রাহ্মণকে প্রার্থী হতে হয়, প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে নির্ভর করতে হয় বলবীর্যের ওপর।'

নীরবে খেতে লাগলেন দুজনে। কিছুক্ষণ পর বিম্বিসার বললেন, 'ভদ্র, আপনি আমার থেকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক শেখবার সুযোগ পেয়েছেন আচার্যর কাছ থেকে, তিনি ছিলেন আশ্চর্য মানুষ, যেন একটি জ্বলন্ত উল্কা। কিন্তু সে তাঁর ভেতরটা। অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে, জ্বলছে। এমন আগুন যা পোড়ায় না, দীপ্তি দেয়, যে ইচ্ছে করবে তার থেকে আত্মদীপ জ্বালিয়ে নিতে পারে। ভেতরে অমন আগুন, কিন্তু বাইরেটা স্নিগ্ধ যেন চন্দনতরু।' এতক্ষণ যেন আত্মগত বলছিলেন, এবার চণকের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি বয়সে তরুণ, কিন্তু নানা বিদ্যায় পারদর্শী বলেই মনে হচ্ছে আমার। আপনার নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি কী বলে ?'

চণক বলল, 'পিতার আশীবাণী সত্য হবে।'

হঠাৎ যেন ব্যাকুলভাবে বিম্বিসার বলে উঠলেন, 'আচার্যপুত্র চণক, আপনি কি শুধু এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই এসেছেন ?'

না মহারাজ আগেই বলেছি, পিতা আদেশ করেন আমি যেন আপনার সঙ্গে মিলিত হই। ঠিক এই ভাষা। এর কোনও ব্যাখ্যা তিনি দেননি, বা দেবার সময় পাননি। কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল। দেব পুষ্করসারী যখন এই দৌত্যকর্মে আমায় নিযুক্ত করলেন, একমাত্র তখনই আমি পিত্রাদেশ পালন করবার সুযোগ পেলাম।'

বিম্বিসার বললেন, 'আহার্য সব পড়ে রয়েছে ভদ্র। গ্রহণ করুন।' নীরবে ভোজন চলতে লাগল। সুবাসিত পলান্ন, তিন প্রকারের। চণক বুঝতে পারলেন বিম্বিসার এখন ভাবছেন। তিনি কি সেই অল্পসংখ্যক মানুষদের একজন যাঁরা কোনও সময়ই বৃথা যেতে দেন না ! তিনি ভোজন করছেন ঠিকই, হাতের তিনটি আঙুল ঘোরাফেরা করছে মৎস্যের পাত্রে, কিন্তু তিনি ভাবছেন। নানাবিধ মৎস্য ও মাংসের পদ পরিবেশন শেষ হয়ে গেলে, মহারাজ আবার কথা বললেন, 'দৌত্যকার্যটি কি আপনার গৌণ ?'

চণক হেসে বলল, 'না মহারাজ, একেবারেই না। এই আমার প্রথম দৌত্য। বিফল হলে বড়ই অপযশ হবে। বিশেষত দেব পুষ্করসারী আমাকে নবীন এবং অল্পদর্শী ভেবে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ মহামাত্রকে যথাযথ উপদেশ ও লোকজনসহ আমার পেছনে পাঠিয়েছেন।'

বিম্বিসার মৃদু হেসে বললেন, 'চণক ক্ষুব্ধ বোধ করছেন তাহলে !'

চণক নীরব রইলো।

কিছুক্ষণ পর বিনা ভূমিকায় বিম্বিসার বলে উঠলেন, 'মগধরাজ্যের স্বার্থে প্রদ্যোত মহাসেনকে আমায় শান্ত রাখতে হয়। তাঁর জামাতা কৌশাম্বীরাজ উদয়নের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক। এদিকে কোশলরাজ ও লিচ্ছবিরা আমার মিত্র ; শুধু এই কারণেই প্রদ্যোত এখনও আমায় উত্যক্ত করেননি। কিন্তু কোনও কারণ পেলে করতে দ্বিধা করবেন না। কদিন আগেই আমার বৈদ্য জীবককে হত্যা করতে ছুটেছিলেন।'

'জীবককে ! হত্যা ?' চণক আশ্চর্য হয়ে বলল।

'সে এক কাহিনী। জীবককে তিনি চেয়ে পাঠালেন তার খ্যাতি শুনে। যাবার সময়ে আমি তাকে সাবধান করে দিই। যে কোনও সূত্র পেলে অতি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন এই রাজা। জীবক গিয়ে শুনল উনি তৈলাক্ত বা ঘৃতসিক্ত কোনও আহার্য সহ্য করতে পারছেন না। কামলা রোগে এমনই হয়। কিন্তু জীবককে তার ভৈষজ ঘৃতে মিশ্রিত করে দিতেই হবে। বমনোদ্রেক হবে কিন্তু ওই ভৈষজ শরীরে গেলেই উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমার সতর্কবাণী জীবকের মনে ছিল। সে রাজার কাছ থেকে আগেই একটি দ্রুতগামী হাতী সংগ্রহ করে রেখেছিল। ভৈষজ পাঠিয়েই জীবক ওই হাতীতে চড়ে সারারাত ভ্রমণ করে উজ্জয়িনীর সীমানা অতিক্রম করে আসে। ঔষধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই প্রদ্যোত বুঝতে পারেন ঘৃত মিশ্রিত আছে, বমনও হয়। অমনি জীবকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়ে গেল। পেছনে লোক ছুটল। চিন্তা করুন, মগধের রাজবৈদ্য ! নিজে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, কোনও দিক ভাবলেন না, ভদ্রতা না, করুণা না কূটনীতি না। ভাগ্যে জীবক বুদ্ধি করে পালিয়ে এসেছিল !'

'তারপরে ?' চণক সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল।

'তারপর তো সেরে গেলেন। ওই একবারের ওষুধ প্রয়োগে ! তখন আনন্দিত হয়ে মূল্যবান বস্ত্র ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা, এই তো মগধের চিত্র, আর এই মহাসেনের চরিত্র ! একেবারে খ্যাপা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা। এখন ভদ্র চণক, আপনিই বলুন আমার কী করা উচিত।'

চণক হেসে বলল, 'আপনার কর্তব্য কি চণকের পরামর্শের ওপরই নির্ভর করে আছে? চণক আচার্যপুত্র বলে?'

বিম্বিসার হেসে একটি স্থূল গোমাংসখণ্ড মুখে পুরলেন, তার পরে বললেন, 'না। তা নয়। তবু আপনি বলুন।'

চণক বলল, 'প্রথমে দেব পুষ্করসারীর আস্থাভাজন দূত এবং গান্ধারাজসভার একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী অমাত্য রূপে বলছি, 'মহারাজ অবিলম্বে গান্ধাররাজকে লিপি পাঠিয়ে আশ্বস্ত করুন, তারপর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এদিক থেকে অবন্তীকে উত্ত্যক্ত করুন। ছোট ছোট সেনাদল দস্যু সেজে গিয়ে অবন্তীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি ছারখার করে দিতে থাক। যাতে প্রদ্যোতরাজ অপরের রাজ্যের গ্রামগুলি বিনষ্ট করা থেকে বিরত হয়ে, নিজের রাজধানীর দিকে নজর ফেরাতে বাধ্য হন।'

বিম্বিসার বললেন, 'প্রদ্যোত যখন ক্রুদ্ধ হয়ে কারণ জানতে চাইবেন, কী বলব?'

চণক বলল, 'ওরা তো দস্যু দল! মোটেই মগধের সেনা নয়! প্রদ্যোত ওদের দমন করুন। আপনি বলবেন আপনিও করছেন। কিন্তু আসলে আপনি মোটেই কিছু করবেন না!'

বিম্বিসার সবিস্ময়ে বললেন, 'মিথ্যা বলব? মিথ্যাচরণ করব?'

চণক বলল, 'বৃহত্তর স্বার্থে মিথ্যাচরণ তো করতেই হয়। আপনি কি এই রাজগৃহ গিরিব্রজর পুরনো কাহিনীটি শোনেননি মহারাজ?'

'কোন কাহিনী?'

'রাজা জরাসন্ধের পতনের কাহিনী! কীভাবে তিনি বিভিন্ন দেশের রাজাদের বন্দি করে রেখে দিতেন। তারপর কুরুবংশের দুই বীর ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আসে। ভীমসেন নামে একজন তাঁকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে মেরে ফেলে। ব্রাহ্মণ নয় বুঝলে তো জরাসন্ধ সম্মতই হতেন না—কিন্তু মিথ্যাচরণ যেন রাজকৃত্যের অঙ্গ না হয়ে যায়, আতুরে সত্যাচারো নাস্তি। কিতু সে শুধুই আতুরে...।'

বিম্বিসার সারাক্ষণ চণককে নিরীক্ষণ করছিলেন, এবার হেসে বললেন, 'ভালো। ভালো। আর মগধরাজের সতীর্থ, পরামর্শদাতা, মন্ত্রী হিসেবে চণক কী বলেন?'

চণক গম্ভীরভাবে বলল, 'মহারাজ পূর্বাস্য হয়ে থাকুন আপাতত, দক্ষিণ দিকেও মুখ ফেরান, কদাপি পশ্চিমাস্য হবেন না।'

বিম্বিসার চমকে হাতের পাত্র নামিয়ে রাখলেন, বললেন, 'আচার্যপুত্র, আপনি আমার মনের কথা জানলেন কী করে?'

চণক স্মিত মুখে বলল, 'আপনার মনের কথা আমি কী করে জানবো বলুন! তবে উত্তর থেকে মধ্যদেশে এসেছি। এসেছি দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে।'

বিম্বিসার হঠাৎ কোমল অনুনয়ের সুরে বললেন, 'ভদ্র চণক, সতীর্থ হিসেবে বিম্বিসার আপনার কাছে অনুরোধ করছে, আপনি রাজগৃহে থাকুন, মগধরাজসভায় আপনার অর্থধর্মানুশাসক পদপ্রাপ্তির কথা আমি অবিলম্বে ঘোষণা করছি।'

চণক বলল, 'মহারাজ, দেব পুষ্করসারীকে আপনি কী ভাবে সাহায্য করবেন, বললেন না তো।'

'আমি অবিলম্বে তাঁকে আশ্বস্ত করে লিপি পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনি তো জানেন, এই লিপিই সব। আমার আশ্বাসের পেছনে শুভকামনা থাকবে কিন্তু কোনও অস্ত্রের টংকার থাকবে না। তবে একটা কথা, প্রদ্যোত মহাসেন কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেন না। বললাম না, খ্যাপা রাজা! এখন ইচ্ছে হয়েছে গান্ধারসীমান্তে বীরত্ব ফলাচ্ছেন। ঝোঁক চলে গেলেই আবার সৈন্য গুটিয়ে নেবেন। বরং তোড়জোড় করে ভিন্নরাজ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেই তিনি ক্ষিপ্ত ও উগ্র হয়ে আরও ক্ষতি করবার দিকে ঝুঁকবেন!'

চণক বলল, 'বুঝলাম। মহারাজ অসাধারণ কূটনীতিজ্ঞ। এবং মহারাজের চর চরাচর ছেয়ে আছে। কিন্তু আমি তো মগধরাজসভায় যোগ দিতে পারবো না। মহারাজ ক্ষমা করবেন।'

'সে কী!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রথম কথা, দেব পুষ্করসারী তাতে অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হবেন। আমি তা চাই না। দ্বিতীয়, আমার উদ্দেশ্য অন্য। মহারাজের মন্ত্রিসভায় থাকলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না যে!'

দাসীরা এইবার মিষ্ট পদগুলি নিয়ে আসছে। আগেকার ভোজনফলকগুলি তুলে নিয়ে, গজদন্তের কারুকার্যময় ছোট দুটি ফলক রেখে গেল সে জায়গায়। বিম্বিসার বললেন, 'কী তোমার জীবনের উদ্দেশ্য, জানতে পারি, আচার্যপুত্র?'

'আমি পরিব্রাজক।'

'পরিব্রাজক! তুমি কি সন্ন্যাস নিতে চাও?'

'সন্ন্যাসী নয়, সংসারত্যাগী নয়, মহারাজ। শুধু দেখতে চাই। এই জম্বুদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে চাই। বুঝতে চাই।'

'তুমি তাহলে একজন ভ্রমণাসক্ত কর্মভীরু? এত শিক্ষা, এত পাণ্ডিত্য, এত বুদ্ধি, মেধা, বিষয়জ্ঞানের পরেও! চণক ভদ্র, তুমি আমাকে হতাশ করলে।'

'আমি কর্মভীরু নই মহারাজ। আপাতত শুধু বন্ধনভীরু। আমি শুধু ভ্রমণের জন্যই ভ্রমণ করতে চাই, তা নয়। আমি বুঝতে চাই জম্বুদ্বীপ কি গান্ধার, মদ্র, মিথিলা, চেদি, অবন্তী, মগধ, বৎস, কোশল, কলিঙ্গ এইরূপ! না নদীবিধৌত, অরণ্যঋদ্ধ, পর্বতসমুদ্র দ্বারা সুরক্ষিত এক বিশাল ভূমি। দেবতা প্রদত্ত, দেব পরিকল্পিত এক বিশাল ভূখণ্ড, যা আদৌ খণ্ড নয়। আর যদি খণ্ড-খণ্ডই হয় তো কী সেই সূত্র যা উজ্জ্বল মণিগণের মতো এই খণ্ডগুলিকে গাঁথবে? আপনি জানেন নিশ্চয়ই মহারাজ, উত্তর-পশ্চিমে উপরিশ্যেন পর্বতের ওপারে গড়ে উঠছে এক বিরাট সাম্রাজ্য। সেই সম্রাটের নাম কুরুস। ইনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। এমন আরও আছে। আরও হবে, আসবে—এরা কিন্তু আসবে। তখন গান্ধার, মগধ, অবন্তী, আমরা একলা একলা দাঁড়িয়ে মার খাবো, নিঃশেষ হয়ে যাবো, না সমবেত হবো। সমবেত হলে কী ভাবে হবো? সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসীরা তাদের একমাত্র রাজার পতাকার তলায়? না ছোট ছোট রাজার ছোট্ট ছোট্ট সৈন্যদলে, তাদের মধ্যে কোনও কোনও রাজা সমুদ্র পার থেকে আসা রাজাদের সঙ্গে যোগ দিতেও পারেন। যদি পিতার আশীর্বাদ সত্য করার পথে অগ্রসর হতে চান, তাহলে যত দূরেই থাকি, আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমার পরিব্রজন আপনার কার্যসাধনই করবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিম্বিসার বললেন, 'এভাবে ভ্রমণ করলে কিন্তু আপনার বহু ব্যবহারিক অসুবিধে হবে। তখন কী করবেন?'

'মহারাজ যদি অনুগ্রহ করে সেই অসুবিধাগুলি দূর করবার ব্যবস্থা করে দেন, তো উত্তম। না দিলেও আমি নিজেই সেগুলি অতিক্রম করার চেষ্টা করে যাবো। তবে তাতে কিছু অমূল্য সময় বৃথা ব্যয় হয়ে যাবে। এখন মহারাজের যা ইচ্ছা! পিতা আমাকে আপনার সঙ্গে মিলিত হতে বলেছিলেন।'

চমকে উঠে বিম্বিসার বললেন, 'আচার্য কি এইভাবে জম্বুদ্বীপ পরিক্রমা করে আমাকে সংবাদ দিয়ে সাহায্য করতে বলে গেছেন আপনাকে?'

চণক হেসে বলল, 'না মহারাজ। আচার্য কাত্যায়ন দেবরাত শিষ্যকে চিরকাল পুরনো পরামর্শের শৃঙ্খলভারে বন্দী করে রাখবার মানুষ নন। তিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির উন্মেষ ঘটিয়েছেন। এখন আমরা স্বাধীনভাবে সেই ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির ব্যবহার করবো। আমি এবং আপনি। তা ছাড়া সেভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা তো চরের কাজ মহারাজ, আমি সে ভার নিতে পারি না। মানুষের ব্যবহার, কার্যকলাপ, উদ্দেশ্য, স্বার্থ, ভাষা, এই সবের ভেতরে তার একটা অন্য পরিচয় আছে। আমি সেই পরিচয় পেতে আগ্রহী।'

'ওহ্, আপনি তবে আত্মার সন্ধানী? সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে ক্ষেত্রে আপনার পার্থক্য কী রইল ভদ্র! আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মহারাজ মুখ প্রক্ষালন করলেন।

'আত্মা নয়। আত্মা তো পণ্ডিতেরা বলছেন এমনই বস্তু যা দেখা যায় না, বাঁধা যায় না, মরে না, জন্মায় না। আমি যা খুঁজছি তার জন্ম মরণ সবই আছে। এই বিচিত্র ভূখণ্ডকে তার বিভিন্ন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবগোষ্ঠী সহ আমি বুঝতে চাই। এই যাত্রার যা সুফল তা আপনিই ভোগ করবেন। আমি আপনার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে বাঁধা। আর কোনও বন্ধন স্বীকার করব না।'

অভিভূত হয়ে বিম্বিসার বললেন, 'তোমাকে ভালো বুঝলাম না চণক। কিন্তু এটুকু বুঝেছি, তোমার মৈত্রী অমূল্য। ঠিক আছে। তুমি তোমার পথে চলো। রাজগৃহে তোমার জন্য আমি একটি গৃহ ঠিক করে দিচ্ছি। রাজকোষ থেকে তুমি প্রয়োজনমতো অর্থাদিও পাবে। পরিব্রজন কালে তোমার অসুবিধা না হয় এ আমি দেখব। চরেদের ওপর তোমার সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া থাকবে। এখন আলিঙ্গন দাও বন্ধু।'

চণক ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত বাড়িয়ে রাজাকে আলিঙ্গন করল। দৈর্ঘ্যে তারা প্রায় সমান সমান। চণক অল্প বড় মাথায়। কিন্তু মহারাজ যাকে বলে বৃষস্কন্ধ মহাভুজ। চণক দেখল, মহারাজের চোখ চকচক করছে। তিনি বললেন, 'চণক, আমি বন্ধুহীন, বড় একা। রাজপদ আমাকে এরূপ করেছে। আচার্য কাত্যায়নের শিক্ষাও আমাকে এমন করেছে। আমি কি একজন বন্ধু পেলাম?'

চণক বলল, 'সমগ্র জম্বুদ্বীপে যদি কোথাও একবিন্দু বন্ধুত্ব থাকে আপনার জন্যে তবে তা থাকবে চণকের কাছে। আমি কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার কাছে আসিনি মহারাজ। আপনি সবকিছুতে জ্যেষ্ঠ হয়েও যখন এমন অকপটে আমাকে এত কথা বললেন, আমিও অকপটে বলি আপনি আমার স্বপ্নদৃষ্ট মানুষ।'

রাজপুরী থেকে ফেরবার সময়ে চণক হেঁটে ফিরছিল। মহাবিদ্যালয়নগরী তক্ষশিলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে সে কি তার দুটি পা-কেই প্রধান অবলম্বন মনে করেনি? এতদিন রাজকার্য ছিল, সে ছিল গান্ধারের মহামান্য দূত। কিন্তু এখন? এখন তো সে পরিব্রাজক চণক। যেতে যেতে সে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হল, বিম্বিসার খুব নরম মনের মানুষ। তার মতো কঠিন ধাতুর নন। বিম্বিসার বুদ্ধিমান, চতুর কূটনীতিজ্ঞ, সবই ঠিক। কিন্তু স্নেহ বা মোহের বশে হঠকারিতা করতে পারেন। যেমন শ্রমণ গৌতমকে সেনাধ্যক্ষ না সর্বাধ্যক্ষ কীসের একটা পদ দিতে চেয়েছিলেন। যেমন আজ প্রথম আলাপেই তাকে অর্থধর্মানুশাসক করতে চাইলেন। এ পদগুলিতে কেউ না কেউ আছেন নিশ্চয়। হঠাৎ তাঁকে বিনা কারণে অপসারিত করলে সে রাজপুরুষ তো নিমেষেই রাজার ঘরশত্রু হয়ে উঠবেন। চম্পা নগরীর বিপুল রাজস্বও সোনদণ্ড নামে এক ব্রাহ্মণকে দান করেছেন রাজা, যজ্ঞের দক্ষিণা হিসেবে। এ কি তিনি পুরুষানুক্রমিক রাজবংশের উত্তরাধিকারী নয় বলে? রাজারা যে ভালো কাজ করেন না, অতিরিক্ত দান করেন না তা নয়, কিন্তু করেন রাজকর্তব্য বলে, কখনও বা গোপন কোনও স্বার্থের কথা চিন্তা করে। কিন্তু বিম্বিসার যখন করেন, করেন তিনি ভালো মানুষ বলে। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম যে-সব উপাদান দিয়ে মানুষ গঠিত হয় সেই সব উপাদান বিম্বিসারের চরিত্রে। চণক অনুভব করল, মহারাজ বিম্বিসারের কাছাকাছি কোনও শক্ত ধাতুর লোক থাকা প্রয়োজন, এবং নিজেকে বন্ধনভীরু বলে বর্ণনা করলেও সে একটা বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে।

রাজপুরীর সীমা পেরিয়ে গেছে। মুখ্য তোরণের তলা দিয়ে চণক পথে বেরিয়ে এলো। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছে। ধীরে ধীরে অপরাহ্ণ ঘন হয়ে উঠবে। আবার আরেকটা দিনের মতো সূর্য অস্ত যাবে। গোধূলির আলোয় ভরে যাবে চারিদিক। তারপর সন্ধ্যা নামবে। সহস্রচক্ষু, অযুত-নিযুতচক্ষু সন্ধ্যা। আর সঙ্গে সঙ্গে আবৃতচক্ষু হয়ে যাবে এই পৃথিবী। নিমীলিতাক্ষী জননী। শান্তির সময়। ক্ষান্তির সময়।

শান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী
শান্তম্ ইদম্ উর্বন্তরিক্ষম।
শান্তা উদন্বতীর্ আপঃ
শান্তা নঃ সন্তু ওষধীঃ।

শান্ত দ্যুলোক শান্ত পৃথিবী। মহাশান্তি ওই মহা-অন্তরিক্ষে। শান্ত সলিলাদি। শান্ত ওষধিরা। এইভাবেই গড়িয়ে যাবে দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন, কর্মের পর ক্ষান্তি, ক্ষান্তির পর আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ম। নতুন জীবন অঙ্কুরিত হচ্ছে, পুরনো জীবন খসে পড়ছে। চলছে চলছে, থেমে থাকছে না। কিন্তু চলছে এক ভাবে, এক নিয়মে। ব্যতিক্রমগুলিও নিয়মে বাঁধা। পূর্ণিমা, অমানিশা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ঋতু-পরিবর্তন। কী অর্থ এই অনন্ত পুনরাবৃত্তির? কী চান দেবতা? আমরা মানুষরাও কি এই পৌনঃপুনিকতার অন্তর্গত! না কি কোথাও পথ আছে এই চক্র থেকে প্রজ্বলন্ত উল্কার মতো বেরিয়ে যাবার! কোনও পরিবর্তন ঘটাবার? এই বিশাল ঘূর্ণ্যমান অন্তরিক্ষের দিকে তাকালে, হঠাৎ, বালুকণার মতো ক্ষুদ্র মনে হয় নিজেকে, সংকল্পকে, সিদ্ধিকে। না না। চণক মাটির দিকে মুখ ফেরাল। সে এভাবে হারিয়ে যাবে না। হারিয়ে যাবে না। হারিয়ে গেলে চলবে না।

বোধিকুমার না? কিছুটা আগে আগে চলেছে সেই অল্পবয়স্ক কবি বোধিকুমার। চণক পেছন থেকে গিয়ে তার কাঁধ ছুঁলো। বোধিকুমার ফিরে দাঁড়ালো। চণককে দেখে তার মুখ হাসিতে ভরে গেল। বলল, 'আপনি! এখনও গান্ধারে ফেরেন নি? শ্রীমতীর ধারণা ছিল আপনি...'

'থামলেন কেন? বলুন।'

বোধিকুমার হেসে বলল, 'আমি বিট নই। কিন্তু শ্রীমতী বোধহয় আপনার বিরহে বড়ই ক্লিষ্ট। করবারও কিছু নেই। আপনি বিদেশী দূত, ফিরে যাচ্ছেন তো!'

চণক বলল, 'কবি বোধিকুমার তাকে রুদতী বসন্তগর্ভা আষাঢ়ী বর্ষাধারার সঙ্গে তুলনা করে অপূর্ব কবিতা রচনা করলেন, আর তিনি ক্লিষ্ট হলেন কাষ্ঠকঠিন চণকের জন্য? আশ্চর্য!'

বোধিকুমার বলল, 'পৃথিবীতে প্রত্যাশিত ঘটনা কখনওই ঘটে না। কবিদের ভাগ্য ভালো নয় ভদ্র। কিন্তু আপনি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন শ্লোকগুলিতে আমি শ্রীমতীকেই বর্ণনা করেছি!

চণক বলল, 'নিশ্চয়ই!'

'তাহলে আপনার মতো সাহিত্য-ভাবক আমি আগে রাজগৃহে দেখিনি চণক ভদ্র। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বোধিকুমার বলল, যদি আপত্তি না থাকে চলুন না ওই আম্রবীথিতে একটু বসি। যাবেন?'

চণক বলল, 'চলুন।'

১০

ওই তো অদূরে দেখা যাচ্ছে সাকেতের সীমানা। রাজগৃহ তো পর্বত দিয়েই ঘেরা, তা সত্ত্বেও নগরীর প্রবেশদ্বার আছে, প্রাচীর আছে। শ্রাবস্তীরও চারিদিকে প্রাচীর। বৈশালীরও। সাকেতের তেমন কিছু নেই। কিন্তু আছে অঞ্জন বন। দূর থেকে দেখা যায় এই শাল-অরণ্য। আর তার ওপর জেগে থাকে ধনঞ্জয়ের বিমানটি। এই বিমান দেখেই লোকে সাকেত চেনে। রাজন্য উগ্রসেনেরও এমন নেই। সুমনা একবার নিষেধ করেছিলেন ধনঞ্জয়কে। শ্রেষ্ঠীর যত সম্পদই থাক, বাইরে যেন তা রাজার ঐশ্বর্যের বহিঃপ্রকাশকে ছাড়িয়ে না যায়। ধনঞ্জয় স্বভাবে খুব বিনয়ী নন। বলেছিলেন, 'রাজা বিম্বিসার বা প্রসেনজিৎ হলে ভাবনার কথা ছিল, এ তো সামান্য এক মাণ্ডলিক রাজা। সপ্তভূমিক প্রসাদ ও তার ওপর মনোহর চূড়া আমার অনেক দিনের সাধ সুমনা।' সাকেত দেখা দিতেই সুমনার চিত্তের ভেতরটা রোদ পড়ে সোনার স্তূপের মতো ঝলমল করে উঠল। সাকেত তাঁর মুক্তি, সাকেত তাঁর কল্পনা, কল্পভূমি।

যখন ধনঞ্জয়ের ওপর আদেশ হল ভদ্দিয় ছেড়ে শ্রাবস্তীতে আসবার। কী চিন্তা সবাইকার। শ্বশ্রূমাতা পদ্মাবতী দেবী ভয় পেলেন। ভিন্ন রাজ্য, বলা তো যায় না, আজ মগধের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো, কাল তো না-ও থাকতে পারে! ষোলটি মোট মহাজনপদ, তো তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভাঙচুর তো লেগেই আছে। কুরু-পাঞ্চালের বিশাল যুদ্ধ হল, দুই বংশেই এখন প্রদীপ নিবু-নিবু। মেণ্ডক বললেন, 'মহারাজ বিম্বিসার আর রাজা প্রসেনজিৎ দুজনে দুজনের শ্যালক।' পদ্মাবতী বললেন, 'কুরু পাঞ্চালের যুদ্ধে শুনেছি মামা ভাগনের বিরুদ্ধে, শ্যালক ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে, গুরু শিষ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। রাজাদের কী মতিস্থির আছে? যদি কখনও মগধে কোশলে যুদ্ধ লাগে মেণ্ডক অর্থসাহায্য করবেন মগধকে, আর তাঁর পুত্র অর্থ দেবেন কোশলকে!' অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদ-প্রতিবাদ। কিন্তু সুমনার চিত্তে কেমন একটা আনন্দের বাতাস লেগেছিল। বিবাহের প্রথম কয়েক বছরের রোমাঞ্চ, সার্থর সঙ্গে বাণিজ্যযাত্রার সে স্বাদ জীবনে কখনও ভুলবেন না, কিন্তু তার পর ? শ্রেষ্ঠী পরিবারের বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্যে কবে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন, হারিয়ে গিয়েছিল তাঁর বীর্য, শক্তিমত্তা, তাঁর বেদবিদ্যা, ধনুর্বেদ, সব, স-ব। ধনঞ্জয় তখন বেশির ভাগই বাইরে থাকতেন। মেণ্ডক পরিবারে সুমনা নিশ্চিহ্ন।

রাজগৃহে স্বরূপ মল্ল ও তাঁর স্ত্রী কুশাবতী মল্লর কাছ থেকে অস্ত্র ও ব্যায়াম শিক্ষা করতেন সুমনা। একবার স্বরূপ মল্ল তাঁকে বলেছিলেন, 'কল্যাণি, একটা সময় ছিল যখন আমাদের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকারা পর্যন্ত অশ্বারোহণ, অস্ত্রধারণ জানত। মত্ত মাতঙ্গের মতো বল ছিল নারীদের দেহে। তারা আমাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করত। নইলে কি আর যক্ষরক্ষ অসুর নিধন করে এই অপরূপ সপ্তসিন্ধুবিধৌত জম্বুদ্বীপ আমরা অধিকার করতে পারতাম !'

'কেন আচার্য ! এ কি আমাদের নিজেদের দেশ নয় ? আমরা কি যযাতিপুত্র অনু দ্রুহ্যু যদু তুর্বসুর থেকে উৎপন্ন হইনি ? যযাতি তো সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। সূতদের থেকে তো আমরা এমনই শুনেছি।'

কুশাবতী বললেন, 'ছিলেন হয়ত। সবই তো বহু কাল আগেকার কথা। কত শ' কত হাজার বছর আগে কে জানে ! শাক্যরা তো ওক্কাকুর পুত্র-কন্যাদের অন্তর্বিবাহের ফলে জাত হয়েছে শুনি। বজ্জিরাও তাই। যমজ ভাইবোন। কিন্তু তার পূর্বে ? যযাতিতে গিয়েই তো সবাই পৌঁছই। তার পূর্বে কী ? তারও পূর্বে ? আমাদের একটি দাস ছিল, বন থেকে সংগ্রহ করা। সে কোনদিন পোষ মানেনি। দাসের মতো ব্যবহার সহ্য করত না। আমরা অবশ্য তা করতামও না। সেই দাসটি, তার নাম কচ্ছু। সে তোমার আচার্য স্বরূপ মল্লকে অনেক গূঢ় বিদ্যা শিখিয়েছিল। বিষ প্রস্তুতের পদ্ধতি। সাপের বিষ নেমে যায় ক্ষত সেরে যায় এমন ওষধি চিনিয়েছিল। ইনিও বিনিময়ে তাকে অনেক কিছু শেখান। সে-ও অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়ে যথেষ্ট উপার্জন করত। তা সেই কচ্ছু বলত, তোমরা কে ? তোমরা তো উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়ের ওপার থেকে এসেছ বিদেশি। এই পৃথিবীর প্রকৃত প্রভু তো আমরা দাসরাই। আমাদের কত কোম থাকত বড় বড় নগরে, সেসব তোমরা ধ্বংস করে দিয়েছ, আমাদের থেকেই শিখেছ কৃষিবিদ্যা। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ, তাঁরা তাঁদের পিতৃপুরুষ, তাঁরা আবার তাঁদেরও পিতৃপুরুষদের থেকে শুনে আসছেন। তার চক্ষু জ্বলত বলবার সময়ে। উদরী রোগে মারা যায়। মারা যাবার আগে খালি বলত—জানতাম, তোমাদের আর্য মানুষদের পাপ আমাদের স্পর্শ করেছে, এ তোমাদের রোগ। আমাদের অরণ্যে বার্ধক্য আর হিংস্র জন্তুর আক্রমণক্ষত ছাড়া আর কোনও রোগ নেই।'

অরণ্যচারী কালো মানুষদের কথা ভাবতে গিয়ে, বহু দূর অতীতে কোনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়-ডিঙিয়ে আসা অশ্বারোহী-অশ্বারোহিণী পূর্বপুরুষদের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন সুমনা। সত্যিই তো 'আর্য' শব্দের মূলে 'ঋ' ধাতু। বিভিন্ন গণে যে ঋ ধাতু দেখতে পাওয়া যায় তাদের বেশির ভাগেরই অর্থ গতি। সে হিসেবে 'আর্য' শব্দের অর্থ হতে পারে 'যারা চলে, গতিশীল, যাযাবর' আবার বেদে দাশ ধাতুর অর্থ 'দান' করা। যিনি দেন তিনি নিশ্চয়ই কোনও অর্থেই দীন হতে পারেন না। কিন্তু সে তো দাশ !

সারথি বলল, 'দেবি, সর্বাঙ্গসুন্দর আপনার সাকেত ওই দেখা যাচ্ছে।'

সুমনা হেসে বললেন, 'আমি আগেই দেখেছি।'

সত্যি ! সাকেতকে নির্বাচন করে ধনঞ্জয় একটা কাজের মতো কাজই করেছিলেন। স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে ভিন্ন দেশে একলা বসবাস করার রোমাঞ্চ নিয়ে তিনি শিবিকায় বসলেন। যথোচিত ম্লানমুখে। তাঁর শিবিকার কিছু দূরেই পাশাপাশি চলেছেন কোশলরাজ পসেনদি (প্রসেনজিৎ) এবং ধনঞ্জয়। পসেনদির ঘোড়াটি দুধ-সাদা, ধনঞ্জয়েরটা কপিশ। পসেনদি তো সেনিয়র সমবয়স্কই। কিন্তু স্থূল হয়ে পড়েছেন। বিলাসপ্রিয় নাকি ? কাঁধে, উদরে এত চর্বি জমলে যুদ্ধ করবেন কী করে ! সেনাপতি বন্ধুল আর দীঘকারায়ণের হাতেই সব ফেলে রাখলে চলবে ? সেনিয় নিজে সৈন্য পরিচালনা করে অসম সাহস ও বীর্যের সঙ্গে। অঙ্গদেশ কীভাবে অধিকার করল ! সেনিয়কে দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমনার আশা অনেক। এখন পসেনদি ও ধনঞ্জয়কে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে তাঁর ঈর্ষা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এক লাফে গিয়ে ধনঞ্জয়ের ঘোড়াটিতে চড়ে বসেন। বহু দিনের অনভ্যাস। তবু ঘোড়ায় চড়া একবার যে শিখেছে সে কখনও ভোলে না। তবে শিবিকা ছাড়তে খুব একটা ভরসাও পাচ্ছিলেন না। সেনিয় আসার সময়ে বলেছিল, 'সুমনা আমার শ্যালকটিকে সাবধান।' কী অর্থে বলেছিল কে জানে! কিন্তু সুমনা শিবিকার অন্তরালে থাকতেই মনস্থ করেছিলেন। রাজাদের মন! কোন্ নারীকে কখন ভালো লাগবে, তার জীবনটি, তার পরিবারের জীবনটি শেষ করে ছেড়ে দেবেন।

গোধূলিবেলায় তাঁরা পৌঁছেছিলেন একটি অপূর্ব স্থানে। দূরে দেখা যায় রুপোলি জলের ধারা, শ্রেণিবদ্ধ রাজপথে তমাল, পিয়াল, বকুল, সপ্তপর্ণীর সারি। কাঠের ও ইষ্টকের হর্ম্য সামান্যই, বাকি সব পরিচ্ছন্ন মাটির কুটির। দিকচক্রবাল তাই আরও উদার, আরও বৃহৎ মনে হচ্ছে। একটা লঘু হলুদে-সবুজে মেশা উত্তরীয় যেন পৃথিবীর গায়ে বিছিয়ে রয়েছে। পরিচ্ছন্ন সোনালি আকাশের পটে শতখানেক শ্বেত এবং পাটল গরুর দল ঘরে ফিরছে। গোধূলির আলোয় শ্বেত গাভীগুলিকে পদ্মবর্ণের মনে হচ্ছে। হঠাৎ এদিকে ওদিকে বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে উঠতে লাগল। যেন পৃথিবীর বুকে তারা ফুটছে। ধনঞ্জয় বললেন, 'মহারাজ, এ স্থানটি কোন রাজ্যে পড়ে?'

'আমারই রাজ্যে শ্রেষ্ঠী।'

'শ্রাবস্তী থেকে কত দূর?'

'এক দিনের পথ।'

'নাম কী স্থানটির?'

'সাকেত।'

'বাঃ, সায়ংকৃত সাকেত। যদি এই স্থানেই বসবাস করতে ইচ্ছা করি?'

'শ্রাবস্তীতে যাবেন না শ্রেষ্ঠী?'

'শ্রাবস্তী রাজধানী। সেখানে সর্বদাই বড় হট্টগোল। বহু লোকের বাস। আমার গৃহিণী আবার একটু নির্জনতা ভালোবাসেন।'

'ভালো, তাহলে এখানেই আপনার বসতবাস ফেলতে আজ্ঞা দিচ্ছি। রজ্জুকদের কাল সকালেই ডাকিয়ে আপনার ভূমিসীমা সব ঠিক করে দেব।'

সাকেত সুমনার আত্মভূমি। সুমনা ধনঞ্জয়কে বলেন, 'তুমি বলেছিলে সায়ংকৃত, আমি বলি এ আমার স্বয়ংকৃত। সাকেতে আছে শ্রাবস্তী, রাজগৃহ ইত্যাদি বড় বড় নগরের পরিশীলন। সেই সঙ্গে ভদ্দিয়র মতো ছোট নগরের অনাবিল নির্জনতাও। সাকেতের রাজা উগ্রসেন মানুষটিও খুব ভালো। ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কার নেই। ধনঞ্জয় যেভাবে সাকেতের উন্নতির পরিকল্পনা করতে চান, সুপরামর্শ মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়েছেন। আশেপাশে গ্রামগুলি বেশ সমৃদ্ধ। ধান ও যব ক্ষেতগুলি প্রতি বছরই পূর্ণ হয়ে যায়। ধনঞ্জয় সরযূতীর বাঁধিয়ে দিয়েছেন। মণিময় (সাদা পাথরের) ঘাট হয়েছে। নদীমুখী পথগুলিও খুব শীঘ্র নির্মিত হয়ে গেছে। গ্রামের সব গৃহ থেকে, নগরের সব গৃহ থেকে দাসেরা শ্রম দিয়েছে, বিনিময়ে তাদের অন্ন, বস্ত্র ও প্রতি দিন কয়েক মাষক করে দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রভুরা প্রথমটা আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু উগ্রসেন ধনঞ্জয়ের পক্ষে ছিলেন। পালা করে দাস পাঠাতে তখন আর আপত্তি করেনি কেউ। পথগুলি তো সবারই প্রয়োজন হয়। নগর আর কতটুকু। নগর ঘিরে শস্যক্ষেত, ফলের, নানাবিধ শাক ও পর্ণের ক্ষেত, উদ্যান এ সবই তো বেশি। কাজেই গ্রামবাসীদের পথগুলি কাজে লাগে। ধনঞ্জয়ের গৃহে পূজাপার্বণ যজ্ঞ থাকলে প্রধান প্রধান গৃহপতিদের নিমন্ত্রণ হয়। দরিদ্রদেরও অন্নবস্ত্র দান করা হয়। তখন এইসব পথ মানুষের চলাচলে, গোশকটে, ঘোড়ার ক্ষুরে ভেঙে যায়। ধনঞ্জয় তাই সম্প্রতি পথ সংস্কারের সময়ে পাথর ব্যবহার করিয়েছেন।

শাঁখ বাজছে। বহু জোড়া শাঁখ। দুয়ারে ঘটে আম্রপল্লব। 'কি রে ধনপালি, শাঁখ বাজাচ্ছিস কেন? এই ময়ূরি, হল কি তোদের? দ্বারে ঘট—এসব কী?'

'বিসাখাভদ্দা বলেছে', হাসতে হাসতে আরও জোরে শাঁখে ফুঁ দিল সবাই। 'দু মাস কেটে গেল,

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের ঘরনী ঘরে এলে,' বর্ষিয়সী এক পুরাঙ্গনা বললেন, 'বিসাখা তো ঠিকই করেছে।'

'দেহে যেন প্রাণ এলো, ঘর যেন আঁধার হয়ে ছিল', আরেক জন বললেন।

সুমনা বোঝেন এসবই স্তুতিবাদ। তবু জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন ? বিসাখাকে তো সব ভার দিয়ে গেছি। সে কি পারেনি ?'

'না, না, তা কেন ? তবে কন্যা যদি চাঁদ হয় তো মাতা যে সূর্য। পার্থক্য একটা থাকেই !'

বিশাখা এসে দাঁড়িয়েছে, মুখে হাসি, চোখে আনন্দের অশ্রু।

'বিসাখা, বপ্প মঙ্গল কেমন হল বচ্চে ?'

'সব ঠিকঠাক হয়েছে মা।'

'মাঙ্গলিক দ্রব্যগুলি সব ঠিকঠাক সংগ্রহ হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ মা, কোনও ভুল হয়নি।'

'লাঙলের গায়ে গোরোচনা, চন্দনের তিলক ?'

'হ্যাঁ।'

'বলদগুলিকে সাজিয়েছিলে ?'

'নিশ্চয়।'

'আর বাস্তুযাগের মঙ্গলঘট ? সোনার দিলেন তোমার পিতা, না রূপার ?'

'রজত মোক্ষ ফলদায়ী মা, বাবা তো মুক্তি চান না, তাই সুবর্ণই দিলেন, পুরোহিতের সুবিধে হল।'

বিশাখার অনুচরীরা উত্তরীয়প্রান্ত মুখে দিয়ে হাসতে লাগল।

সুমনা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও কী কু-অভ্যাস, মুখে বস্ত্রখণ্ড দিচ্ছিস কেন ? তা বিসাখা যজ্ঞের সময়ে তোমার পিতা একাই ছিলেন, না...'

এবার সবাই আবার হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বিশাখার মুখ লাল হয়ে গেছে, সে বলল, 'কাষ্ঠফলকে তোমার একটি চিত্র এঁকেছিলাম মা, সেই প্রতিমা পিতার পাশে রেখেছিলাম !'

'কৌতুক হচ্ছে ?' সুমনার মুখেও হাসি। 'তোমার এ ব্যবস্থা আচার্য ক্ষত্রপাণি মেনে নিলেন ?'

'নিলেন তো দেখলাম।'

'বৈদিক যাগে পত্নীর যজ্ঞভাগিনী হয়ে বসবার নির্দেশ আছে। আমি ভাবছিলাম তোমার পিতা যদি পুকুর-প্রতিষ্ঠা আর বাস্তুযাগটি পিছিয়ে দেন !'

'পিতা দিতে চেয়েছিলেন, আমি বাধা দিলাম। আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমার চিত্রটি এঁকেছি মা, তাই দিয়েই কাজ হবে না কেন ? তথাগত বুদ্ধ তো বলেইছেন যাগযজ্ঞের এত সব খুঁটিনাটি বিধি—এসব অপ্রয়োজনীয়। পুরোহিত দেব ক্ষত্রপাণি একটু আপত্তি করছিলেন। কিন্তু তারপর আমি জোর করে বলতে মেনে নিলেন।'

'বুদ্ধের কথা মনে আছে ? তুই তো তখন বেশ ছোট !'

'মা আমার বেশ মনে আছে অজ্জা-মা কী একটা শুভযোগে গঙ্গাস্নানের অভিলাষ জানাচ্ছিলেন, ভগবান বললেন, "কেন ভদ্দিয়তে এত সুন্দর কাকচক্ষুর মতো নির্মল জলের সরোবর রয়েছে, স্নানের অসুবিধা কী ?" অজ্জা-মা বললেন, "শুভযোগে গঙ্গাস্নান করলে সর্ব পাপ ক্ষয় হয় যে !" ভগবান তাতে হেসে বললেন, "রাজদ্বারে নিত্য যে সব চোর, দস্যু, নরঘাতক আসে সেগুলিকে এবার থেকে গঙ্গাস্নানে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়, পাপস্খালন হয়ে যাবে ! আর এই যে শুনি মেণ্ডক-পিতা, সারা ভদ্দিয়নগরে নাকি এমন ব্যক্তি নেই যে তাঁর কাছে উপকৃত হয়নি। তা, তাঁর কর্মফল আর হত্যাকারীর কর্মফল এক হয়ে যাবে উদকশুদ্ধির ফলে, এ কখনও হয় আর্যে ?"

'বাঃ, তোর তো খুব সুন্দর মনে আছে ?'

মাতা-কন্যা কথা বলতে বলতে ততক্ষণে সুমনার কক্ষে এসে গেছেন। বিশাখা দুষ্টু হেসে বলল. 'কেন মনে থাকবে না মা, আমরা ছোটরা অর্থাৎ আমি, পিতৃব্যকন্যা দেবী, জ্যেষ্ঠতাত পুত্র কুণ্ডিন আমরা সকলেই তো ভেবেছিলাম অজ্জা-মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে আমাদের পাপগুলিও এই বেলা ধুয়ে আসব।'

সুমনা হেসে বললেন 'তোমাদের পাপগুলি আবার কী ছিল ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিসাখা হাসি মুখে বলল, 'জেট্‌ঠর পাপ অনেক। প্রজাপতি ও ফড়িং-এর পাখা ছিঁড়ে দেওয়া ছিল তার নিত্যকর্ম। এ ছাড়াও সে আমাদের ছোটদের সুযোগ পেলেই প্রহার করত। পিতামহর কাছে যখন-তখন মিথ্যা কথা বলে কত কাহন যে নিত!'

সুমনা বললেন, 'আর দেবী? দেবীর মতো ভালোমানুষ মেয়ের আবার কী পাপ?'

'দেবী? দেবী অজ্জা-মার মাথার পাকা চুল তুলে দিয়ে মাষক পেত তো? দুটি তুললে চারটি বলতো। তা ছাড়া খুড়িমার কুসুমবর্ণ বারাণসী বস্ত্র লুকিয়ে লুকিয়ে পরতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল। খুড়িমা যখন সইয়ের মেয়ের বিয়েতে পরতে গিয়ে দেখলেন, সে কী চেঁচামেচি! দেবী পালংকের তলায় লুকিয়ে রইল। মাঝখান থেকে আমাদের মাজারীটা, সেই ধবলাটা, সে খুব মার খেল।'

সুমনা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর তুই? তুই কী করেছিলি?'

বিশাখার মুখ পাংশু হয়ে গেল। দেখে একটু অবাক হলেন সুমনা। কিছুক্ষণ পর আত্মসংবরণ করে বিশাখা ধীরে ধীরে বলল, 'মা, আমিই বোধ হয় সত্যিকার পাপ করেছিলাম।'

'সে কী?' সুমনা উৎকণ্ঠা গোপন করতে পারলেন না।

'হ্যাঁ মা। আমি তীর ছোঁড়া অভ্যাস করতাম তো নিত্য!'

'হ্যাঁ, সে তো আমারই নির্বন্ধে।'

'হ্যাঁ মা, কিন্তু লক্ষ্যভেদে জেট্‌ঠ ভাইদের সঙ্গে পারতাম না, তাই গোপনে গাঁয়ে চলে যেতাম, নানারকম লক্ষ্যবস্তু স্থির করতাম। ঝুলন্ত আম্রফল, কখনও বদরিকা, কখনও কুটিরের চালে অলাবু। তারপর একদিন শীতের প্রাক্কালে উড়ন্ত হাঁসে তীর সন্ধান করতে লাগলাম। দশ বারোটি হাঁস আমি এভাবে মেরেছি মা। কিন্তু কোনটিই দেখিনি। গাঁয়ের চণ্ডাল ও পুক্কুশরা ছুটোছুটি করে সেগুলি দূর থেকে নিয়ে যেত।'

সুমনা বললেন, 'বেশ করেছিলে। ধনুর্বেদ কি অহিংসার জন্যে কেউ শিক্ষা করে? রক্ত, ক্ষত, মৃত্যু এসব দেখে বিহ্বল যাতে না হও তার জন্যেও তো এসব শিখতে হয় বিসাখা।'

'তারপর শোনোই না মা। রোজই হাঁস মারি, আর তীর লেগেছে এই আনন্দে ছুটে চলে আসি। শেষে একদিন কী যে দুর্বুদ্ধি হল একটি ছুটন্ত চণ্ডাল বালকের বাম গুল্‌ফে তীর সন্ধান করলাম। উঃ, সে কী রক্তপাত মা, ছেলেটির সে কী বুকফাটা আর্তনাদ।' বলতে বলতে বিশাখা ডান হাতে নিজের বক্ষের কাছে বন্ধনী আঁকড়ে ধরল।

'তারপর?' সুমনা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন।

'আমি আগেই তীর টেনে ফেলে দিয়ে জবার পাতা থেঁতলে দিয়ে তার রক্ত বন্ধ করলাম, তারপর তাকে কোলে নিয়ে তার কুটিরে পৌঁছে দিই। বলিনি ইচ্ছা করে করেছি। সে বালকটিও বুঝতে পারেনি। অজ্জা-মার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে দিই ছেলেটির চিকিৎসার জন্য। সে অর্থ কিন্তু ওরা উল্লাস করে মদ্যমাংস খেয়ে উড়িয়ে দিল, বলল, বৈদ্য ওদের দেখবেন না। বনের লতাগুল্মই ওদের ওষুধ।'

'তুমি চণ্ডাল বালকটিকে কোলে নিয়েছিলে? খুব অশুচি ওরা। থাক, না জেনে করেছ।'

'মা, বালকটি নোংরা ছিল না মোটেই। বেশ হৃষ্টপুষ্ট তৈলসিক্ত বালক। তবে ওদের পল্লী খুব নোংরা। বড় দরিদ্র। অত দরিদ্র হলে বোধ হয় আমরাও শুচিতা রক্ষা করতে পারবো না। মা, বুদ্ধ তথাগত এই অশুচিতা, দারিদ্র্য—এসব নিয়ে কিছু বলেননি?'

সুমনা চিন্তা করে বললেন, 'বোধ হয় বলেছিলেন। ওই উদকশুদ্ধির প্রসঙ্গেই। তবে তখন আমরা তাঁর জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখে বিবশ হয়ে বসেছিলাম। সব কথা হয়তো ঠিকমতো কানে প্রবেশ করেনি। সত্যিই, অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্তকে তো রাজগৃহে অনেকবার দেখেছি, সম্প্রতি পূরণ কাস্যপকেও দেখলাম। কিন্তু কুমার সিদ্ধার্থর মতো অমন অলৌকিক প্রভা আর কারও নেই।'

'উনি যে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন মা। শিষ্যরা বলে সম্যক-সম্বুদ্ধ।'

সুমনা কী যেন ভাবছিলেন। বললেন, 'ওঁর বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড সব কিছুই তুচ্ছ করাটা আমি কিন্তু এখনও ঠিক মেনে নিতে পারি না। যজ্ঞাগ্নিতে হবিঃ অর্পণ করার পর কেমন একটা স্বর্গীয় সুগন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠে। সেই সুগন্ধী ধূম যেন আমাকে স্বর্গের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তা ছাড়া শুনতে পাই, উনি নারীদের বড় অসম্মান দেখিয়েছেন, দেখান।'

'কই আমাদের ভদ্দিয়র গৃহে তো তেমন কিছু দেখিনি মা।'

'না, মেয়েদের সামনে উনি কিছু বলেন না, কিন্তু যখন সঙ্ঘে ভিক্ষুদের উপদেশ দেন তখন মেয়েদের সম্পর্কে কী না বলেন! কোনও গৃহী পব্বজ্যা নেওয়ার পরে যদি স্ত্রীর জন্য উদ্বিগ্ন হন, উনি গল্প বলেন ওই স্ত্রী নাকি জন্মে জন্মে তার অনিষ্টকারিণী ছিল। এসব কী? তা ছাড়া ভিক্ষুণী সংঘ যে গঠিত হয়েছে তার স্থান সম্পূর্ণ ভিক্ষু সংঘের নীচে। কেন? সংসারত্যাগী ভিক্ষুর আবার ছোট বড় কী? অথচ দেবী ক্ষেমা...' সুমনা চুপ করে গেলেন।

'দেবী ক্ষেমা কী মা?'

'তোমার পিতা আসুন, সব বলব। এবার রাজগহ থেকে পেটিকা ভরা সংবাদ এনেছি।'

বেলা পড়ে এসেছে। সুমনার জন্য অপেক্ষা করে করে অবশেষে ধনঞ্জয় চলে গেছেন সরযূতীরে। নৌবণিকদের সঙ্গে তাঁর প্রয়োজন আছে। মায়ের ঘরে মা এবং মেয়ে অনেক দিন পরে একা। দু'জনের কথা আর ফুরোতে চায় না। গৃহস্থালির খুঁটি-নাটি। এটা হয়েছে কি না, ওটা বাদ গেল কেন? মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে সুমনার চোখ ফিরছে না। হঠাৎ যেন বিশাখা বড় হয়ে গেছে। এমনিতেই সে বয়সের তুলনায় পরিণত। এখন যেন আরও বড় বড় লাগছে। সুমনার বুকের ভেতরটা খালি খালি ঠেকে। বিশাখা ধনঞ্জয় সেট্‌ঠির আদরের কন্যা। গর্বের কন্যা। কিন্তু সুমনার সে মানসপুত্রী। সারা জীবন ধরে যা শিখেছেন, যা ভেবেছেন, যা যা স্বপ্ন দেখেছেন সবই সযত্নে মেয়ের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে এক গভীর একাকিত্ব। শত কাজেও যা ভরতে চায় না। সেই একাকিত্বই কি তাঁকে এভাবে মেয়ের মধ্যে একজন সঙ্গী গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত করেছে? কত শিখেছিলেন তিনি। কিন্তু কিছুরই যথার্থ প্রয়োগ করা গেল না। কারও সঙ্গে কথা বলে, কারও সঙ্গে মেলামেশা করে সুখ পান না। সাকেতে তাঁর কোনও সখী নেই। ভদ্দিয়তে তো ছিলই না। শাশুড়ি পদ্মাবতী ছিলেন খুব গুণী রমণী। খুবই প্রাজ্ঞ। একমাত্র তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাতেই কিছুটা প্রাণের আরাম ছিল। কিন্তু তাঁর অন্যান্য সব দেবর-জায়ারা গণ্ডমূর্খ। এমন নয় যে গৃহে আচার্যর কাছে কোনদিন কিছু শেখেনি। কিন্তু দেবার্চনাবিধি, স্বামীবন্দনা, শাটিকা এবং পেটিকা এর বাইরে আর কিছুতেই যেন তাদের আগ্রহ নেই। সার্থ ফিরে এলে তুমুল উৎসব লেগে যেত মেণ্ডক সেট্‌ঠির অন্তঃপুরে— দেখো দেখো, এই মরকতটি কী উজ্জ্বল? কী সুগোল! এটি আমি অঙ্গুরীয়তে পরব।

—দেখো না এই চিত্রল মৃগের চর্ম কী সুখস্পর্শ! আমি এটি শয্যার আস্তরণ করব। চর্মকারদের বললেই হবে, কেটে কেটে জুড়ে দেবে।

—এইরূপ কিলিঞ্জক আগে কখনও দেখেছিস? গ্রীষ্মকালে নাকি শীতল থাকে। ভারি চমৎকার!

কারও একবার মনে উদয় হত না কোথাকার এই মরকত অথবা পদ্মরাগ, কোন দুর্গম পাহাড় না নদীতীর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেল। কোথায় ছিল ওই চিত্রল হরিণগুলি, তাদের কি সার্থর ধানুকীরাই মারল না চর্মগুলি কিনে এনেছে! ওই শীতল কিলিঞ্জকের বেতগুলিই বা কোথায় জন্মায়! সুমনার ইচ্ছা হত জানতে। কিন্তু এসব প্রশ্ন করলে তাঁর দেবর-জায়ারা বলাবলি করত জ্যেষ্ঠার বেশ কতকগুলি সন্তান হওয়া প্রয়োজন। তিনি ছিলেন হংসকুলে বক, শ্বশুর মেণ্ডক বলতেন বককুলে হংস। রাজান্তঃপুরে গিয়েও রানিদের মতো অভিজাত রমণীদের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও স্বার্থসিদ্ধি আর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার তাড়নায় আর সব চিত্তবৃত্তি নষ্ট হয়ে গেছে।

সুমনা একাত্মতা অনুভব করেন খানিকটা নিগ্‌গণ্ঠদের পব্বাজিকাদের সঙ্গে, তাঁরা অনেক জানেন, সংসারে থাকেন না, তবু কত বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু পব্বাজিকাদের পোশাক পরিচ্ছদ, মুণ্ডিত মস্তক, সবরকম রমণীত্ব, রমণীয়ত্ব পরিহার করে চলা তাঁর ভালো লাগে না। তিনি ভালোবাসেন নীল কঞ্চুক, পাটলবর্ণ শাটিকা, শ্বেত উত্তরীয়ে গোরোচনা দিয়ে আঁকা হংসমিথুন। তিনি ভালোবাসেন সোনার কাঞ্চী, মুক্তার কণ্ঠহার, চন্দনের পত্রলেখা। খুব গোপনে গোপনে সুমনা এক জনের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, সে হল অম্বপালী। বৈশালীর প্রসিদ্ধ গণিকা। সেনিয়র প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম। অধিক শোনেননি, কিন্তু যেটুকু শুনেছেন এই নারীরত্নকে তাঁর সখী করতে ইচ্ছা হয়। এ কথা তিনি মুখেও উচ্চারণ করতে পারেন না। এ তো হয় না। কিন্তু যদি হত!

'বপ্পমঙ্গলে নদীতীরে কেমন উৎসব হল বিসাখা!' তিনি উৎসুক সুরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'চূড়ান্ত সমারোহ মা। জাতী পুষ্পের অলঙ্কার যা করেছিল, আসল মুক্তাকে হার মানিয়ে দেয়! কত নতুন নতুন সই হল। আর··· আর··· তিসস্‌ভদ্র, তিস্‌স্‌কে খুব অপমান করেছি মা!'

'সে কি, কেন!'

'আমায় মালা পরাতে এসেছিল। সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাকে কি পথে ওভাবে বিব্রত করা উচিত?'

'কিন্তু এ তো সাকেতের চলিত উৎসব, কত দিন থেকে হয়ে আসছে। আচ্ছা বিসাখা, তিষ্য তো যথেষ্ট সুপাত্র, তক্ষশিলা থেকে স্নাতক হয়ে আসবার পর আরও শিক্ষা করছে। সুদর্শন। ওকে কি তোর ভালো লাগে না?'

'তিষ্যকে আমি ঠিক—' বিশাখা দ্বিধান্বিত স্বরে থেমে যায়।

সুমনা চিন্তিত মুখে বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি তোর যোগ্য পাত্র এত জায়গায় তো ঘুরলাম, কোথাওই দেখিনি। কিন্তু বিসাখা যোগ্য মানে কী? যোগ্যতার সংজ্ঞা আমাদের নির্ণয় করতে হবে! তোমার পিতা যে কোথায় গেলেন, শুনলাম সাবত্থি থেকে কতকগুলি ব্রাহ্মণ কী না কী এক সেট্‌ঠিপুত্তের পক্ষ থেকে রত্নমালা নিয়ে এসে বসে আছেন। সেই সেট্‌ঠি কুমারই বা কী করে তোমার যোগ্য হয়? আমাদের আরও সংবাদ চাই! আরও বিশদ। অথচ তার সময় কি আর আছে? আচ্ছা বিসাখা, তিষ্যকে কি তোমার একটুও মনে ধরে না!'

যেন আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সুমনা, যেন তিনি জলে ডুবে যাচ্ছেন, তৃণগুচ্ছ আঁকড়ে ধরেছেন। তিষ্য শোভন, সুন্দর, মার্জিত, শিক্ষিত, সদ্বংশজাত, তা ছাড়া পাত্র হিসেবে তিষ্যর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হল সে সাকেতের মানুষ। বিশাখা তাঁর মানসকন্যা। তাঁর একমাত্র সখী, এই কন্যাকে দূরদেশে পাঠিয়ে তিনি কেমন করে বেঁচে থাকবেন?

বিশাখা সহসা জিজ্ঞাসা করল, 'মা, প্রণয় কী?'

'কেন বচ্চে? নিজের অন্তর দিয়ে জানোনি?'

'না, মা।'

'তবে তো জানানো দুরূহ। নিজের জীবনেই ধীরে ধীরে অনুভব করবে মা।'

'মা!' বিশাখা যেন কিছু বলতে চায়।

'বল? কী বলতে চাস?'

'বিবাহ কেন হয়? প্রণয়ের জন্য? না প্রজা-উৎপাদনের জন্য? না অন্ন, যব, লবণ, শর্করা, মধু তৈজস, শয্যা, ধনসম্পদ সব গুছিয়ে রাখবার জন্য?' বিশাখার মুখ গম্ভীর। সে পরিহাস করছে না। অপেক্ষা করছে শান্তভাবে। 'মা, বিবাহ কার সঙ্গে হয়? পতির সঙ্গে, না পতির পরিবারের সঙ্গে, না সমাজের সঙ্গে?'

—সুমনা চুপ করে আছেন।

'বলো মা, বলো। যা সত্য তাই বলো। প্রণয় যদি একটি সুন্দর মিথ্যা হয় যা দিয়ে অন্যসব ঢাকা থাকে, তা বলো। আর অন্যগুলি যদি প্রণয়ে পৌঁছবার সোপানস্বরূপ হয়, প্রণয়কে কেন্দ্র করে ঘূর্ণিত কর্মচক্র হয় তাও বলো। বলবে যা সত্যি। বিসাখাকে স্তোক দিও না মা।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন সুমনা। তারপর বিশাখার মুখটি নিজের দিকে তুলে ধরে বললেন, 'আমার মনে হয় প্রণয় একটি সুন্দর সত্য বিসাখা। কিন্তু এই সত্য যে সবাই দেখতে পাবেই এমন কোনও কথা নেই। প্রণয় জীবনের পর্বে পর্বে রূপ বদলায়। যে তার একটি রূপকেই ধ্রুব বলে মনে করে সে দুঃখ পায়। প্রণয়কে কেন্দ্র করেই পরিবারের কর্মচক্র ঘোরার কথা, কিন্তু তা তো সব সময়ে হয় না। জীবনের অপূর্ণতার এই সব দায় আমাদের বহন করতেই হয়। কিন্তু, এ সব কথা হঠাৎ তোমার মনে আসছে কেন?'

'এখনও আসবে না!' বিশাখা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'এক যুবা আমাকে দিনেরাতে প্রশ্ন করছে আমি তাকে ভালোবাসি কি না, হৃদয়ের অন্তস্তল খুঁজেও এর উত্তর মেলেনি, মা। যদি প্রণয়ই

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহের ভিত্তি হয় তাহলে তাকে আমার বিবাহ করা উচিত হবে না। মিথ্যাচার হবে। আর বিবাহের কারণ যদি অন্যগুলি হয়, সেগুলি আমি অনায়াসে পারবো। কিন্তু তবু এই সামান্য সামাজিক স্বার্থের জন্য আমার জন্মস্থান, আমার পিতৃগৃহ, আমার মাতৃসঙ্গ ছেড়ে সাবত্থি চলে যাওয়া আমার যথেষ্ট মনে হয় না। সহজে বলছি মা, সে ক্ষেত্রে বিবাহে আমার রুচি নেই।'

সুমনা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন বললেন, 'সে ক্ষেত্রে তোমায় অপেক্ষা করতে হয় বিসাখা, কিন্তু সময় কি আর আছে?'

ধনপালী এসে সংবাদ দিল ধনঞ্জয় আসছেন। বিশাখা ঘর ছেড়ে যাচ্ছিল, সুমনা বললেন, 'কোথায় যাও বিসাখা, অপেক্ষা করো, তুমি বড় হয়েছ, রাজগহ থেকে যেসব সংবাদ বয়ে এনেছি সব শোনো!'

'কী সংবাদ?' ধনঞ্জয় উৎসুক মুখে ত্বরিত পদে ঘরে ঢুকলেন। সুমনা প্রণাম করলেন। পিতা-মাতার দৃষ্টি-বিনিময় লক্ষ্য করে মুখ নামিয়ে নিল বিশাখা। এই-ই কি প্রণয়লক্ষণ? সে শুনেছে কোন অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় বালিকা সুমনাকে দেখে পুত্রবধূ নির্বাচন করেছিলেন পিতামহ মেণ্ডক। তার পিতা সে সময়ে কোথায় ছিলেন? তার খুব সন্দেহ পিতাও সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন, মেণ্ডকের নির্বাচনের পেছনে নিশ্চয়ই তার পিতার আকুলতা ছিল, মায়েরও কি ছিল না? আসলে তার বাবা-মা অন্য প্রকার। অনেক সময়ে তাঁরা সমবয়সী সমকর্মা সখা-সখীর মতো। আবার কখনও কখনও নববিবাহিত বরবধূর মতো হয়ে ওঠে তাঁদের হাবভাব। তার বাবা-মার ক্ষেত্রে যে প্রণয় একটি সুন্দর সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে, তার জীবনে কি তা দেখা দেবে? তার ভেতরে কোথাও কোনও কুসুম ফোটার সৌরভ বিসাখা পাচ্ছে না অথচ সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে বুঝতে পারছে।

ধনঞ্জয় বললেন, 'বলো সুমনা, রাজগৃহের খবর ভালো?'

'ভালো, আবার ভালো নয়ও।'

'সে আবার কী?'

'ভদ্দাকে জানতে তো? রাজ কোষাধ্যক্ষের মেয়ে? সেই যে খুব চঞ্চল মেয়েটি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার পিতা তো তার বিবাহ দিতে পারছিলেন না। 'কাউকেই তার মনে ধরছিল না। শেষ পর্যন্ত পথে এক চোরকে দেখে তার ভালো লাগে।'

'সে আবার কী?'

'সত্যই অদ্ভুত। চোরের রাজা সত্থুক। পুরোহিত ঘরের ছেলে। স্বভাব-চোর, কিছুতেই শোধরাতে না পেরে তার পিতা-মাতা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

'এ-ও তো অদ্ভুত কথা সুমনা। শোধরানো যাবে না বলে কোনও কথা আছে! নিজের সন্তানকে বহিষ্কার?'

'তারপর শোনোই না। ভদ্দার তো তার প্রতি তীব্র প্রণয়, পিতা-মাতা কত করে বোঝালেন, সে কিছুতেই শুনল না। অবশেষে রাজরক্ষীদের বহু উৎকোচ দিয়ে সত্থুকের প্রাণরক্ষা হল, মহা সমারোহ করে ভদ্দার সঙ্গেই বিয়েও হল। এত বছর ভালোই ছিল, চর্ব্য-চোষ্য খাচ্ছে, সমাদরে আছে, সুন্দরী ভার্যা। কিন্তু একদিন ভদ্দাকে বললে সমস্ত অলংকার পরে গিদ্‌ধকূট পর্বতে যেতে হবে, সে নাকি গিরিদেবতার পূজা দেবে মানসিক করেছিল। গিরিশৃঙ্গে গিয়ে চোরটা বলে সমস্ত অলংকার দিয়ে দাও এখুনি। ভদ্দা বোঝায় যে, অলংকার তো তারই, চোর সে কথা শুনবে কেন? তখন ভদ্রা বুঝতে পারে, অলংকার নিয়েই ক্ষান্ত হবে না ওই ঘৃণ্য চোর, তাকেও নিশ্চয় হত্যা করবে। তখন বুদ্ধি করে বলে, শেষবারের মতো সালংকারা অবস্থায় সে স্বামীকে আলিঙ্গন করতে চায়। আলিঙ্গনের ছলে ভদ্দা চোরটিকে পর্বতশৃঙ্গ থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। তারপর আর কোনও কথা না। সোজা গিয়ে জৈন ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দিয়েছে। রাজগহে হুলুস্থুল।'

বিশাখা বলল, 'প্রণয়ের মধ্যে তাহলে বিবেকের একটা বড় স্থান রয়েছে মা।'

'নিশ্চয়', সুমনা বললেন। 'শুধু রূপমুগ্ধতাকে কী প্রণয় বলে?'

ধনঞ্জয় বললেন, 'মেয়েটির সাহসের প্রশংসা করতে হয়। সংকল্পের জোর দেখো! চোরকে বিবাহ করবে তো করবেই। তার পরে উপস্থিত বুদ্ধির বশে নিষ্ঠুর স্বামীকে হত্যা করল, সঙ্গে সঙ্গে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে গেল প্রব্রজ্যা নিয়ে। দেখে রাখো এ মেয়ে একদিন বহু ঊর্ধ্বে উঠবে।'

একজন দাসী উষ্ণ দুধ আর মিষ্টান্ন রেখে গেল। ধনঞ্জয় দুধের পাত্র মুখে তুললেন, একটু পরে বললেন, 'তা রাজপুরী থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কে ? কোশলদেবী ?'

'উঁহুঃ। সেনিয়। সেনিয়ই ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'বলো কি ? সর্বার্থকের পদবী এবার তোমাকেই দিয়ে দিন না মহারাজ !'

'রসিকতা রাখো, বড় অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে রাজগহে।'

'বলো, বলো শুনছি।'

'দেবী ক্ষেমা পব্বজ্জা নেবেন।'

ধনঞ্জয় দুধের পাত্র কাষ্ঠফলককে নামিয়ে রাখলেন, 'কী বললে ? দেবী ক্ষেমা ? প্রব্রজ্যা ?'

'হ্যাঁ গো। দেবী ক্ষেমা প্রব্রজ্যা নিতে চেয়েছেন...'

বিসাখা অবাক হয়ে বলল, 'মা, দেবী ক্ষেমা তো রাজার মহিষীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ! সবচেয়ে বিলাসীও !'

'হ্যাঁ রে, দুধ দিয়ে, হরিদ্রা দিয়ে, চন্দন জল দিয়ে স্নান করে, প্রহরে প্রহরে বেশবাস এবং অলঙ্কার পরিবর্তন করে। কোনও দুর্গন্ধ সইতে পারে না বলে ওর গৃহ-মার্জারিটাকে পর্যন্ত চন্দনজলে স্নান করানো হয়। মণ্ডনের যে কতরকম প্রক্রিয়া আছে, কত চূর্ণ, কত অবলেপ্য, কত মুকুর, কত সুরভিসার—সে তুই ধারণা করতে পারবি না। হিঙ্গুল চূর্ণ ব্যবহার করে নিয়মিত।' 'ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'রাজা মুখে হর্ষ দেখাচ্ছেন, ভেতরে ভেতরে মুষড়ে পড়েছেন। তাই আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন যদি ফেরাতে পারি। সোজাসুজি নয়। পাকেপ্রকারে। প্রকৃতপক্ষে রাজা তো নিজের জালে নিজেই জড়িয়েছেন কি না !'

'কি প্রকার ?'

'কলণ্ডক নিবাপে শ্রমণ গৌতম আশ্রয় নেবার পর মহারাজ তো প্রায়ই সব মহিষীদের সঙ্গে নিয়ে উপদেশ শুনতে যেতেন। কোশলদেবী যেতেন, চেল্লনাদেবীর পিতৃবংশ মহাবীরের ভক্ত, তবু তিনি যেতেন। যেতেন না খালি দেবী ক্ষেমা। মহারাজ পরিহাস করে বলতেন গৌতম দৈহিক রূপকে কোনও মূল্য দেন না, তাঁর কাছে অপ্সরীও যা বানরীও তা। সেই জন্যেই বোধ হয় দেবী যেতে চান না ! তাঁর অতুল রূপের সমাদর হবে না। শুনতে শুনতে ক্ষেমা একদিন বললেন, "মহারাজ কি মনে করেন বাইরের রূপ ছাড়া আমার মধ্যে সমাদর করবার মতো আর কিছু নেই ? আর যদি সত্যি তাই-ই হয় তবে সে রূপের যোগ্য সমাদর কি রাজান্তঃপুরে হয়নি বলেই রূপ পরখ করবার জন্য শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর বিচারের আশায় বসে আছি !" তা এ কথা শোনার পরও মহারাজের চৈতন্য হয়নি, তুমি তো জানো সেট্‌ঠি, বিম্বিসার কেমন গোঁয়ার। বেণুবন উদ্যানের সৌন্দর্য দেখাবার ছল করে তিনি ক্ষেমাদেবীকে গৌতম সকাশে পাঠান। সেখান থেকে ফিরে এসে মহিষী কিছুদিন বড় আনমনা হয়ে থাকেন, তারপর মহারাজকে জানিয়েছেন তিনি পব্বজ্জ্যা নেবেন। মহারাজের তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।'

'তা, পারলে মা তাঁকে নিবৃত্ত করতে ?' বিশাখা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল।

নিশ্বাস ফেলে সুমনা বললেন, 'না, মহাদেবী ক্ষেমার পব্বজ্জ্যা গ্রহণ উৎসব আরম্ভ হবে ঠিক হয়েছে আগামী আষাঢ়ী পূর্ণিমায়, আমিও দ্রুত রথে করে রাজগহ থেকে পালিয়ে এসেছি। তাঁর অনুপম গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপ উন্মূল হয়ে যাবে। শ্রীঅঙ্গে চীবর ধারণ করে, ভিক্ষাপাত্র হাতে চলে যাবেন, এ আমি সইতে পারব না। মহারাজ অবশ্য স্বর্ণমণ্ডিত শিবিকায় করে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন, বেণুবন আরাম তো দিয়েইছেন গৌতমকে, আরও বহু উপচার ভিক্ষু সংঘকে দেবার ব্যবস্থা করছেন। মনোগত ইচ্ছা বোধ হয় যে মহাদেবীকে ভিক্ষুণী বেশে কেউ দেখতে না পায়, এবং সংঘে গিয়ে দেবীর খাওয়া শোওয়ার কোনও কষ্ট না হয়।

ধনঞ্জয় দুঃখের হাসি হেসে বললেন, 'তোমার সেনিয় কি জানেন না ভিক্ষুণীর বিলাসে অধিকার নেই ! দিনে একবারের বেশি সে খায় না। তা-ও ভিক্ষান্ন ! গৌতমের সংঘের নিয়ম খুব কঠিন। আর উপসম্পদা পাবার আগে পর্যন্ত তো কথাই নেই ! রানি বলে নিয়মের কোনও শৈথিল্য হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সত্যিই, হবেই বা কেন ? দেবী ক্ষেমা তো উপাসিকা হলে পারতেন সুমনা। গৃহী ভক্তদেরও তো তথাগত সমাদর করেন, কর্মস্থান বলে দেন, এসব শুনেছি।'

সুমনা বললেন, 'শুনতে সহজ সেট্‌ঠি, রানি পব্‌বজ্যা নিলেন, আসলে ভেতরের ব্যাপার অনেক জটিল। পব্‌বজ্যা নেবার পথ অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে নির্মিত হয়। সেই পথ ধরে আসে তথাগতর উপদেশ, তথাগতর অলোকসামান্য উপস্থিতি।'

ধনঞ্জয় ছদ্ম ভয়ে বললেন, 'তুমিও কি প্রব্রজ্যা নেবে মনে করছ না কি ?'

সুমনা হাসলেন না। বললেন, 'সেটাই তো কথা। আমি তো কই নিচ্ছি না। দেবী ক্ষেমাই নিলেন কেন ? তোমার ভগ্নী রত্নাবলী নিল কেন ? ভদ্রা ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দিল কেন ? ভেবে দেখো এদের সবার ভেতরে একটা সূত্র আছে। একটি সাধারণ সূত্র।'

ধনঞ্জয় বললেন, 'হ্যাঁ, তিনজনেই সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে। একজন রানি। দুজন সেট্‌ঠি পরিবারের। সাধারণ সূত্র তো আছে বটেই।'

বিশাখা বলল, 'না পিতা। সাধারণ সূত্র হল যত ধন, যত রূপই থাক এঁরা দুঃখী। সবাই দুঃখী। অজ্জা রত্নাবলীর পতি বারো বৎসর নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন, তারপর পিতামহ তাঁর মোক্ষক্রিয়া করিয়ে তাঁকে আবার বিবাহ দিতে চাইলেন। কিন্তু ওই বারো বৎসরেই বিবাহিত জীবনের অনিশ্চয়তা, অসারতা অজ্জা রত্নাবলী বুঝে গিয়েছিলেন। নারী কি বস্তুবিশেষ, যে তার প্রভু না থাকলেই তাকে হস্তান্তরিত করে দেওয়া হবে ! আর ভদ্রাদেবীর দুঃখ তো স্বয়ংপ্রকাশ। একটা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চোর, তাকে তিনি প্রণয় দিলেন, সম্পদ দিলেন, সেবা দিলেন, সে হতভাগ্য ঘৃণ্য পশুটা বলে কি না অলঙ্কারের জন্যেই তোমাকে চেয়েছি, অলঙ্কারগুলি দাও ? উহ্, ভদ্রা বলে তাকে শুধু পর্বতশিখর থেকে ফেলে দিয়েছিলেন, আমি হলে ওর হস্ত-পদ-নাসিকা ছেদন করে ওকে কুক্কুর দিয়ে খাওয়াতাম।' বলতে বলতে উত্তেজনায় বিশাখার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল, তার নাসিকা স্ফুরিত হচ্ছে, কপালে স্বেদবিন্দু।

ধনঞ্জয় বিশাখার পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন, 'তোমার উত্তেজনার কারণ নেই মা। তুমি অত্যন্ত বিবেকী। মূর্খের মতো কাজ তো তুমি কখনওই করবে না। মোহেরও কোনও লক্ষণ তোমার মধ্যে কখনও দেখিনি।'

বিশাখা বলল, 'পিতা। কেন জানি না, অন্য কারও দুঃখের কথা শুনলে, বিশেষত নারীদের, আমি যেন কেমন একাত্ম হয়ে যাই তাদের সঙ্গে। অজ্জা রত্নাবলী যেন আমিই, আমিই যেন দেবী ভদ্রা, আমার এরূপ হয়। আর তুমি মূর্খতার কথা বলছ, মোহের কথা বলছ ? যতই বিবেকী হোক, কেউ বলতে পারে না সে কখনও মূর্খতা করবে না, মোহের বশবর্তী হবে না। আর না হলেও যে জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, ভাগ্যপীড়িত হবে না, এমন কথা কি কেউ দিতে পারে ?'

বিশাখার মনের মধ্যে ভীষণ আলোড়ন চলছে তার বিবাহের কথা হওয়ার জন্যেই বোধ হয়। সুমনা ধনঞ্জয় দুজনেই বুঝতে পেরে নীরব হয়ে রইলেন। ধনঞ্জয় তাঁর হাত রেখেছেন বিশাখার পিঠে, মা সুমনা একটি হাত জড়িয়ে রেখেছেন নিজের হাতে। হাতটি শীতল, বড়ই শীতল।

কিছুক্ষণ পর বিশাখা মুখ তুলে হাসল, বলল, 'কই মা, মহাদেবী ক্ষেমার কথাটা শেষ করো !'

'এই যে করি।' বলে সুমনা চুপ করে রইলেন। ধনঞ্জয় তাঁকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করছেন বলতে।

বিশাখা বলল, 'বলবে না ? মা আমি তো আর শিশু নেই ! পঞ্চদশ বর্ষ পার হয়ে গেছি। যতদূর সম্ভব আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, জীবনের, সংসার-জীবনের কী কী বিপদ, কী ধরনের জটিলতা থাকতে পারে। মা বলো !'

সুমনা ধীরে ধীরে বললেন, 'রানিকে তো একা পাওয়াই দুরূহ। গভীর রাতে দেখি শয্যা ছেড়ে গবাক্ষপথে বাইরে চেয়ে আছেন, আমি বললাম রাজ্ঞী এই সুন্দর বিলাসবহুল প্রাসাদ, কোমল শয্যা, এত সেবা, এত সুখের অভ্যাস, এসব ছেড়ে পাথরের ওপর সংঘাটি বিছিয়ে শুয়ে থাকতে পারবেন ? ভিক্ষার মিশ্রিত কদন্ন খেতে পারবেন ? দেবী বললেন, তুমি রানি হওনি তাই জানো না এই বিলাস, এই সেবা, এই সুখ মিথ্যে। একেই মায়া বলে। রানির জীবন এক অতলস্পর্শী শূন্যতা। এক মহাগহ্বরে হাহাকার, আমি বললাম—আপনার পুত্র হওয়ার সময় তো যায়নি, কেন এত হতাশ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছেন ? দেবী বললেন, "পুত্র ! সুমনা। রাজরানির পুত্রসুখ বলতেও কিছু নেই। কোশলদেবীকে দেখো না ? কোনদিন নিজের পুত্রকে কোলে নিতে পেরেছেন সাধ মিটিয়ে ? শাসন করতে পেরেছেন ? ক্রমশই ক্রোধী, দুর্বিনীত হয়ে উঠছে। পেরেছেন তাকে শান্ত করতে ? সুমনা। সুদূর সাগল থেকে যখন মগধে এসেছিলাম, পিতা-মাতা নিভৃতে বলে দিয়েছিলেন—এই রাজা চিরকাল ছোট রাজ্যের রাজা থাকবে না কন্যা। তোমার অতুল রূপবৈভবে, তোমার গুণগ্রামে বশীভূত রেখো এঁকে, সেইসঙ্গে এঁর প্রতিভাকে চেতিয়ে তুলো। সুমনা আমি পারিনি, আমাকে বিবাহ করবার অল্পদিন পরেই দেখলাম, ছেল্লনার গৃহেই তাঁকে বেশি সময় কাটাতে হয়, নইলে বৈশালীর লিচ্ছবিরা কুপিত হবে। শুধু রূপ নয়, আমার প্রণয়ই বা আদৃত হল কই ? আমি যে রাজকন্যা, রাজনীতির ব্যাপারে কিছু স্বাভাবিক বুদ্ধি ধরি তার অস্তিত্বই বা কোথায় স্বীকৃত হল ? আমার অভিমানকে রাজা রূপগর্ব বলে ভুল করেন, আমার হতাশাকে মনে করেন উদাসীনতা। দেব তথাগতকে আমি দেখতে যাইনি কেন জানো ? মহারাজ যার প্রতি সমাদর দেখাতে অগ্নিসাক্ষী করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন তার প্রতি তিনি উদাসীন, অথচ এক সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর এ কী তীব্র আকর্ষণ ! আমার ঈর্ষা হত, সত্য বলছি। আর শুধু তথাগতই তো নয়, রাজধানীর চারপাশের গিরিগুহাগুলি তো নানা পন্থের সন্ন্যাসীতে পূর্ণ। কত আজীবক, তীর্থিক, কত জটিল সন্ন্যাসী। রাজা তাঁদের এত সমাদর করেন কেন বলো তো ? তিনি রাজবংশের সন্তান নন, অথচ মহারাজাধিরাজ হতে চান, মহাজনদের আর্শীবাদ ও অলৌকিক সহায়তার জন্য তিনি মনে মনে লালায়িত। এ কি আমি বুঝি না ? তথাগতকে আমি দেখতে যাইনি, স্বীকারই তো করেছি সুমনা, আমার ঈর্ষা হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলাম ! তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন। কী বলব সুমনা, আমি যেন চোখের সামনে দেখলাম আমি জরতী হয়ে যাচ্ছি, ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি, সামান্যতম মর্যাদাও আর কেউ আমায় দিচ্ছে না। ওই মৃত্যু এসে আমায় গ্রাস করল, তৃষ্ণা গেল না, ঐশ্বর্যের তৃষ্ণা, মর্যাদার তৃষ্ণা, সন্তানের তৃষ্ণা, আবার জন্মালাম, আমার যৌবনকষ্ট, জরাকষ্ট, মৃত্যুদুঃখ, চক্র ঘুরছে, ভবচক্র। নত্থি রাগসমো অগ্‌গি, নত্থি দোসসমো কলি। / নত্থি খন্দাদিসা দুক্‌খা, নত্থি সন্তিপরং সুখম ॥ আকাঙক্ষার সমান আগুন আর নেই। শরীরের মতো দুঃখময়ও আর কিছু নেই। শান্তি, শান্তি, শান্তির মতো সুখও আর নেই। সুমনা আমার মনে হল, উনি আমারই জন্য রাজগৃহে এসেছেন, আমার মতো হতভাগিনীরও মুক্তির আশা আছে। রাজপুরীর এই স্থবির, অচল, জিঘাংসা-ঈর্ষাময় জীবনের থেকে অন্য পথে। হয়ত কঠিন। খুবই কঠিন। তবু তো কিছু ! তবু তো আশা ! এখানে যে কিছুই নেই সুমনা।'

সুমনা সজল চোখে মাথা নিচু করলেন। বিশাখা মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোলে মুখ রেখেছে। তার নিশ্বাসের উষ্ণতা, তিনি অনুভব করছেন কোলে। ধনঞ্জয়ও মাথা নিচু করে চুপ করে আছেন।

অনেকক্ষণ পরে সুমনা বললেন, 'যাক, রাজ পরিবারের সুখ-দুঃখের কথা ছেড়ে এবার আমাদের নিজেদের সুখ-দুঃখের কথায় আসি। সেট্‌ঠি, সেনিয়র ইচ্ছা বিসাখার সঙ্গে কুমার অজাতশত্রুর বিবাহ দেয়।'

'বলো কী !'

'হ্যাঁ। সোজাসুজি প্রস্তাবটা করেননি। আমার মন বোঝবার জন্য কতকগুলি সংকেত করেছেন মাত্র। অগ্রমাহিষী কোশলদেবীর বোধ হয় বিশেষ ইচ্ছা। বলছিলেন—আমাদের মধ্যে এত সখিত্ব, কোনও উপায়ে যদি একে আত্মীয়তার পরিণত করা যেত !'

বিশাখা হঠাৎ মায়ের কোলের মধ্যে মাথা নাড়তে লাগল, 'না মা, না না না।'

'অবশ্যই না', সুমনা বললেন।

ধনঞ্জয় বললেন, 'কুমার অদূর ভবিষ্যতে মগধের রাজা হবেন। শীঘ্রই তো চম্পার শাসনভার নিয়ে যাচ্ছেন শুনলাম। বিসাখার মতো অসামান্য মেয়ে মগধের রানি হবে এতে তোমাদের মাতা-কন্যা কারও মত নেই ? আশ্চর্য !'

সুমনা বললেন, 'সেট্‌ঠি, কুমার অজাতশত্রু অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। শস্ত্রনিপুণ, অল্প বয়সেই যুদ্ধকুশল, রাজনীতিও বোঝে, সবই ঠিক। কিন্তু লোভী, কোপনস্বভাব, হঠকারী। তারপর হাতে একটা ত্রুটি আছে। যে জন্য ওকে কুনিয় বলে সবাই। বিম্বিসারের উপযুক্ত পুত্রই যেন নয় ও। তা ছাড়াও

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবী ক্ষেমার যে মনোদুঃখের কথা শোনালাম তার পরেও তুমি বিসাখার জন্য রানির পদ প্রার্থনীয় মনে করো ? কীসের অভাব তার ? জগতে এমন কী বস্তু আছে যা আমরা বিসাখার জন্য এনে দিতে পারি না ! বেশি লোভ ভালো নয় সেট্‌ঠি ।'

ধনঞ্জয় চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু মহারাজ যদি এ প্রস্তাব পাঠান, আমি না বলব কী করে ? এ তো আমি অত্যন্ত বিপদে পড়লাম দেখছি !'

সহসা বিসাখা মুখ তুলে বলল, 'পিতা মহারাজের প্রস্তাব আসবার আগেই যদি আমার বাগ্‌দান হয়ে যায়, এমন কি বিবাহ স্থির হয়ে যায় তাহলেও কি মহারাজ তোমার ওপর জোর করতে পারেন, বা অসন্তুষ্ট হতে পারেন ?'

ধনঞ্জয় বললেন, 'না । মহারাজ ধার্মিক-স্বভাব । অন্যায় জোর করবার পাত্র নন ।'

'তাহলে ? তাহলে তো আমার বাগ্‌দান হয়েই গেছে । আমি যে মিগার সেট্‌ঠির পাঠানো আশীর্বাদী কণ্ঠহার গ্রহণ করেছি পিতা, সারা সাকেতের লোক, এমন কি রাজকুমার তিষ্য পর্যন্ত এ ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারে ।

সুমনা ও ধনঞ্জয় চমৎকৃত হয়ে কন্যার মুখের দিকে চাইলেন । ঠিক, সত্যিই তো ! উপায় তো রয়েছে !

ধনঞ্জয় বললেন, 'কিন্তু সেট্‌ঠি মিগার ঠিক আমাদের সমমানের নয় । পুত্রটি শুনছি রূপবান, গুণবান, কিন্তু সবই তো শোনা কথা । একটু সংবাদাদি না নিয়ে...'

বিশাখা বলল, 'পিতা, রাজরানি হবার চেয়ে আমি ভিক্ষুণী হওয়া অনেক শ্রেয় মনে করি । সেট্‌ঠি ঘরের আচার-বিচার অন্তত্পক্ষে আমার চেনা । সেট্‌ঠিকুমাররা কেমন হয় সাধারণত, সে জ্ঞানও আমার আছে ।'

সুমনা বললেন, 'বিসাখা ঠিক বলেছে । এখন আর চিন্তা করবার সময় নেই । সত্বর ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠাও । সম্মতি জানিয়ে শ্রাবস্তীতে মাঙ্গলিক উপচার পাঠাবার ব্যবস্থা করো । আর বিলম্ব নয় ।'

ধনঞ্জয় গাত্রোত্থান করলেন । দাস-দাসীদের ডাকা হল । দেবী সুমনা সাবত্থির ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলাপ করবেন । আজই দ্রুতগামী অশ্বে শুভ সংবাদ নিয়ে লোক চলে যাবে শ্রাবস্তীতে মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহে । পেছনে শিবিকায় বহুমূল্য আশীর্বাদী উপঢৌকন নিয়ে যাবেন স্বয়ং আচার্য ক্ষত্রপাণি, এবং তিন ব্রাহ্মণ ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠীগৃহে সাড়া পড়ে গেল ।

'শুনেছিস কহ্না, বিসাখাভদ্দার বিবাহ স্থির হয়ে গেল ।

'কোথায় ?'

'ওই যে তিন বটু এসেছে সাবত্থি থেকে । মিগার সেঠ্‌ঠির সুপুত্তুর পুন্‌নবদ্‌ধন রে ! পঞ্চ কল্যাণী কন্যে না হলে বিবাহ করবে না, শপথ করেছিল !'

'হি হি হি হি, কী আনন্দ, না ?'

'তা বিসাখাভদ্দার যা হাব-ভাব তাতে তিনিও পঞ্চকল্যাণ টল্যান কোনও প্রতিজ্ঞা করেননি তো ?'

'বীর্যশুল্কা হলে পারতেন বিসাখাভদ্দা ।'

'শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা । মৃদঙ্গ, পটহ, যেখানে যা আছে বাজা ।'

'বিসাখে, ও বিসাখে, এবার তবে সত্যিই চললি ?'

'উদায়ী, আর দেরি করো না । ভাণ্ডারে কী কী আছে তার তালিকা উপস্থিত করো । গণকরা লেখকরা সব কোথায় গেল ? আচ্ছা তো ?' 'মণিকার স্বর্ণকারেরা সব আসতে লেগেছে যে !' 'তাঁত বসাবার ঘর কোনটা হবে ?' 'ভদ্দিয়তে তুমি লিপিখানা নিয়ে চলে যাও মণিভদ্র' 'নিমন্ত্রণপত্র রচনার ভার কে নেবে ? রাজা প্রসেনজিৎ, রাজা বিম্বিসার এঁদেরও তো নিমন্ত্রণ পাঠাতে হবে ?' 'হাত চালাও ।' 'গ্রামগুলিতে সংবাদ দাও । তারা যেন ঠিক সময়ে উপহার নিয়ে উপস্থিত হতে পারে ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহামাত্র দর্ভসেন বেশ হৃষ্ট। মগধরাজের উত্তরটি তাঁর খুব মনোমত হয়েছে। গজদন্তের পেটিকায় প্রত্যুপহার। খুব লঘুভার। কী তাতে আছে দর্ভসেন জানেন না। পেটিকাটি নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ। উপহার যা-ই হোক, সে দেব পুষ্করসারী বুঝবেন। দর্ভসেনের আসল কাজ লিপিটি বয়ে নিয়ে যাওয়া। পেটিকাটি বাহুল্য। তবে অত লঘুভার যখন, তখন নিশ্চয় অতি দুর্মূল্য বস্তুই আছে। দর্ভসেন জানেন না পেটিকার মধ্যে আছে শুধু এক রেশম বস্ত্র, তাতে হিঙ্গুলরস দিয়ে শ্রমণ গৌতমের সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধ হবার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই-ই পুক্কুসাতীকে বিম্বিসারের উপহার। একমাত্র পুক্কুসাতীই যার মূল্য বুঝতে পারবেন। আগামী কালই দূতবাহিনী গান্ধারের দিকে যাত্রা করবে, উত্তরের বাণিজ্যপথ ধরে। চণকের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'চণকের এত আয়োজন, এত মনোযোগের দৌত্য সার্থক হল তাহলে শেষ পর্যন্ত, তার পদোন্নতি তো অবশ্যম্ভাবী।

সম্পাতি তুমি কী বলো ?'

সম্পাতি সংক্ষেপে বলল, 'অবশ্যই !'

দর্ভসেন তাতে সুখী হলেন না। তাঁর আশা ছিল অন্তত সম্পাতি বলবে, নেতা তো মহামাত্র দর্ভসেন। কৃতিত্ব তো তাঁরই। চণকের থেকে তিনি এতটা বিনয় আশা করেননি, কিন্তু সম্পাতির থেকেও নম্রতাটুকু কি তাঁর প্রাপ্য ছিল না।

চণকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কি হে চণক। কবে মগধরাজ সৈন্য পাঠাবেন, মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে কিছু বললেন না কি ?'

চণক বলল, 'না।'

দুদিন হয়ে গেছে চণক রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসেছে কিন্তু সে-সম্পর্কে সে নিজে থেকে কিছুই বলছে না। দর্ভসেন চেয়েছিলেন সে নিজে থেকেই সব বিবরণ দেবে। জিজ্ঞাসা করার দীনতা তিনি স্বীকার করতে চান না। অথচ কৌতূহল সংবরণ করতেও পারছেন না। আসলে মহামাত্র দর্ভসেনের অবস্থা একটু অসম্মানজনক হয়ে উঠেছে। গান্ধার রাজ্যে তাঁর পিতামহের সময় থেকেই চরাধ্যক্ষের পদটি তাঁদের বংশের। স্বরাজ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি আকাশচুম্বী। তিনি অত্যন্ত কুশলী। বীরপুরুষও। কিন্তু সারা জীবনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজের সুযোগ পাননি। মগধের দৌত্যকার্যের দায়িত্ব যখন গান্ধাররাজ তাঁকে না দিয়ে সদ্য আগত যুবক চণককে দিতে মনস্থ করলেন তখন দর্ভসেন যার-পর-নাই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চণক তার বাহিনী নিয়ে বার হয়ে গেলে তিনি তাঁর ক্ষোভের কথা গান্ধারাধিপতির কাছে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন।

'এবার তবে রাজকার্য থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন মহারাজ !'

'সে কি মহামাত্র ?'

'গুরুত্বপূর্ণ দৌত্যকর্ম যদি অনভিজ্ঞ তরুণদের হাতে ন্যস্ত করা যায় তাহলে আমাদের মতো প্রবীণ মস্তকের তো আর কোনও প্রয়োজন দেখি না মহারাজ !'

পুষ্করসারী মানুষটি একটু দুর্বল প্রকৃতির। বয়স্ক অমাত্যকে তিনি মোটেই ক্ষুব্ধ করতে চাননি। দর্ভসেন যে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন এ কথাও তাঁর মনে আসেনি। কেননা রাজ্যের চরশৃঙ্খলটি সারা বছর ধরেই খুব সক্রিয় রাখতে হয়। দর্ভসেন না থাকলে আর কাউকে সে কাজের ভার দিতে হয়। মগধের মতো সুদূর রাজ্যে তাঁকে পাঠানো মানে রাজধানীর অন্তঃপ্রশাসন একরকম বিকল হয়ে থাকা। এ ছাড়াও কয়েকটি গুপ্ত কারণে তিনি চণককে বেছেছিলেন। প্রথমত, তিনি জানতেন চণক অত্যন্ত ভ্রমণপিপাসু, ভ্রমণপটুও বটে। তাকে বেশি দিন সভার গতানুগতিক কাজে ধরে রাখতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, সে অতিশয় প্রতিভাবান যুবক। বহু বর্ষে তক্ষশিলায় এরকম একটি ছাত্র আসে। তাকে দিয়ে যতটা কাজ করিয়ে নিতে পারেন ততই ভালো। তা ছাড়াও তিনি জানতেন চণকের পিতা কয়েক বছর গুপ্তভাবে মগধরাজ বিম্বিসারের আচার্য ছিলেন। সেই কারণে কোনও বিশেষ বিবেচনা মগধরাজের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু দর্ভসেন তাঁকে বোঝালেন—দূরদেশে তরুণ চণককে পাঠিয়ে তিনি ভালো করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চণকের পৃষ্ঠরক্ষা, এবং এক হিসেবে তার ওপর চরগিরি করবার দায়িত্বটা তিনি গান্ধাররাজকে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে দিতে। মগধে আসবার পর প্রথম দিকটায় দর্ভসেন চণকের ওপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে কিছুটা সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশই যেন চণক তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সে একে স্বল্পভাষী, মন্ত্রগুপ্তি তার স্বভাবের অঙ্গ। এ দিকে মাসাধিককাল মগধে কাটানোয় তার এ স্থানের অভিজ্ঞতা দর্ভসেনের চেয়ে বেশি, সে তো এসে থেকে শুধু রাজ অতিথিশালায় থাকেনি, পথে পথে, পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে। উপরন্তু আবার মহারাজ বিম্বিসারের আচার্যপুত্র হওয়ায় তার বিশেষ সমাদর। দর্ভসেনের বহুদর্শিতা, কর্মকুশলতা, কিছুই যেন যথাযথ কাজে লাগছে না। চণক যেন কেমন করে অতিরিক্ত গাম্ভীর্য, অতিরিক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছে। তার মৌনতার বর্মে লেগে দর্ভসেনের সমস্ত বক্রোক্তিই ঝড়ে পড়ে যায়, কুশের তীরের মতো। চণক তাঁকে অবজ্ঞা না করেও, তাঁর অবাধ্য না হয়েও, নিজের মতে চলছে। দলের অবিসংবাদী নেতৃত্ব তিনি দিতে পারছেন না। তিনি ধরে আছেন বাইরের খোলসটা। ভেতরের আসল নীতিনির্ধারণের কাজটা যেন চণকই করছে।

পর দিন প্রত্যূষেই গান্ধার-যাত্রা, অথচ অপরাহ্ন থেকে চণকের দেখা নেই। রাজপুরী থেকে যামভেরী শোনা গেল। দর্ভসেন হাতের কাছে চণককে না পেয়ে সম্পাতিকেই কটু কথা শোনান—'কী হে সম্পাতি তোমাদের এমন উদাসীন, নিরুৎসাহ মতিগতি তো আমার ভালো ঠেকছে না ? আরও কটা দিন রাজগৃহে থেকে যাবে মনে করছ না কি ? তোমার সখা তো মনে হচ্ছে ওই নটী শ্রীমতীর গৃহেই রাত্রিযাপন করছে নিত্য।'

সম্পাতি সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'না আর্য, চণক শ্রীমতী বা অন্য কোনও নগরবধূর গৃহে যায় না। আমার মনে হয় ও গৃধ্রকূটে গেছে। বিশেষ ভালোবাসে ওখানে যেতে। কাল চলে যাবে তাই শেষ বারের মতো...'

'এত রাত পর্যন্ত ?' দর্ভসেন তিক্ত সুরে বললেন, 'শ্রীমতীর গৃহে গেলে সে তার যৌবনধর্মেই যেত, বুঝতে পারতাম ব্যাপারটা। কিন্তু গৃধ্রকূটে সে কোন দেবতার পুজো দিতে যায় শুনি।'

এই সময়ে চণক প্রবেশ করল। তার কপালে বিরক্তির কুঞ্চন। দর্ভসেন দেখেও দেখলেন না, আবার সেই একই কথা বললেন, 'বলি চণক তোমার ব্যাপারটা কী হে ? কোথায় যাচ্ছ, কোথায় এত রাত অবধি বিচরণ করে বেড়াচ্ছ, দলপতিকে জানাবারও প্রয়োজন মনে কর না, না কি ?'

চণক রুক্ষ স্বরে বলল, 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও কি মহামাত্র মাথা গলাবেন ? তেমন তো কোনও কথা ছিল না!'

'দৌত্য-পর্বে দূতের কোনও ব্যক্তিগত জীবন থাকে না চণক।' গম্ভীর স্বরে দর্ভসেন বললেন, 'তুমি তো দেখছি সমস্ত শিষ্টাচার লঙ্ঘন করছ, এখনও পর্যন্ত মগধরাজের সঙ্গে তোমার কী নিভৃতালাপ হল তা পর্যন্ত বলনি। আমি কিন্তু অপেক্ষা করে আছি।'

চণক বিরক্তি গোপন করে বলল, 'আর্য দর্ভসেন, মহারাজ বিম্বিসারের গৃহে দূত চণকের নিমন্ত্রণ ছিল না। মহারাজ সতীর্থকে ডেকে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। দণ্ডনীতি আমাদের আলোচনার বাইরে ছিল। আপনার অসামান্য কৌতূহল শান্ত করবার জন্য এইটুকু বললাম। এটুকুও বলবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না।'

'তাহলে এ তোমার অনুগ্রহ বলো! ভালো। গান্ধারে ফিরে তোমার পদোন্নতির জন্য রাজসকাশে নিশ্চয়ই প্রার্থনা জানাবো।' গম্ভীর রাগত গলায় দর্ভসেন বললেন.।

'আপনাকে কোনও প্রার্থনাই জানাতে হবে না মহামাত্র। কারণ আমি গান্ধারে ফিরছি না।'

'তার অর্থ ?' ক্রোধে ও বিস্ময়ে দর্ভসেন মুখ তুলে তাকালেন।

চণক বলল, 'আমি দেব পুষ্করসারীর কার্য সম্পাদনের জন্য আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও শক্তিতে যতটুকু পেরেছি, করেছি। মহামাত্র যদি এসে নেতৃত্বভার গ্রহণ না করতেন, তাহলে অগত্যা মগধের উত্তর ও প্রত্যুপহার নিয়ে আমাকে গান্ধারে ফিরতেই হত। কিন্তু যোগ্যতর, অভিজ্ঞতর ব্যক্তির হাতে নির্ভয়ে এ দায় সমর্পণ করে এবার আমি মুক্ত হতে চাই। এখন আমি কিছু দিন পূর্ব দেশে ভ্রমণ করব। মহারাজের কাছে অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেছি। সম্পাতির হাতে পাঠাবো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অনুমতি ? অনুমতির অপেক্ষা রাখছ তুমি ? নিজের যা মন চায় স্বেচ্ছাচারীর মতো তা-ই তো করছ দেখছি।'

'ঠিক আছে, অনুমতির পরিবর্তে যদি পদত্যাগ বলি তাহলে যথাযথ হবে তো ?'

'চণক, তোমার স্পর্ধা ও দুঃসাহস মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, মনে রেখো। সম্পাতির হাতে তুমি পদত্যাগপত্র পাঠাবে মহারাজ পুষ্করসারীর কাছে এই সুদূর মগধ থেকে ? তুমি তো দেখছি রাজদ্রোহী...'

দর্ভসেনের কথা শেষ হল না। চণক হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখ জ্বলছে, তর্জনী সাপের ফণার মতো উদ্যত। সে বলল, 'যথেষ্ট, মহামাত্র দর্ভসেন, অনেক বলে ফেলেছেন। আর নয়। আপনার স্পর্ধা ও দুঃসাহস মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর একটি অনুদার বাক্য উচ্চারণ করুন, করে দেখুন চণক অস্ত্রের ব্যবহার জানে কি না।' বলতে বলতে সে কটিতে লম্বমান তার ছুরিকার বাঁটে হাত দিল। তার পরই ঝটিতি কোষমুক্ত করল ছুরিকা।

সম্পাতি দৌড়ে এসে তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল, 'চণক, চণক, ধৈর্য হারিও না বন্ধু।'

চণক ছুরিকা কোষবদ্ধ করে বলল, 'ধৈর্য আজ প্রায় এক পক্ষ কাল ধারণ করে আছি, কেন জানো সম্পাতি ? ইনি যতই রূঢ় ও হিংসুক হোন না কেন, ছিলেন পিতার সতীর্থ। অর্থাৎ আমার পিতৃব্য সম্পর্কীয়। শুধু আমার পেছন পেছন মগধে এসে সম্ভবত স্ব-নির্বাচিত দলপতিত্ব করে আমাকে বিব্রত করছেন তাই-ই নয়, মিথ্যা দুর্নাম দেবার চেষ্টা করছেন কলঙ্কিত করবার চেষ্টা করছেন, সমানে। সম্পাতি আমার পত্র রচনা হয়ে গেছে, যাত্রার আগেই পাবে, আমি এখন চললাম।' চণক কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

দর্ভসেন প্রথমটা একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন, এখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সম্পাতি এই মুহূর্তে আমি ওই দুর্বিনীত, রাজদ্রোহী যুবককে গান্ধার রাজ্যের পক্ষ থেকে পদচ্যুত করলাম। রাজসকাশে পূর্বাপর সব জানাবো। তিনি যা হয় শাস্তিবিধান করবেন।'

সম্পাতি মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু তার পূর্বেই তো চণক গান্ধারসভার কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিয়েছে মহামাত্র। যাই হোক, এ ঘটনা খুবই দুঃখজনক, আমি চণককে ডেকে আনছি। সে নিশ্চয় আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আপনি শান্ত হোন।'

সম্পাতি বেরিয়ে গেলে, দর্ভসেন একা কক্ষটিতে বসে ক্রমশ শান্ত হয়ে এলেন, তাঁর বৃত্তিতে ক্রোধ সর্বদা পরিত্যাজ্য। কেননা ক্রোধ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়। বসে বসে অন্ধ রাত্রির দিকে তাকিয়ে রইলেন দর্ভসেন। বাতায়নের বাইরে কাননে কয়েকটি দীপদণ্ডের আলো জ্বলছে। তার ওদিকে নির্মম তমিস্রা। আকাশে আজও সরের মতো মেঘ। তাই তারার আলোর প্রসাদ রাজগহ, নগরীর পথঘাট আদৌ পাচ্ছে না। চণক তাঁকে হিংসুক বলে গেল। উল্লেখ করে গেল তিনি তার পিতার সহাধ্যায়ী ছিলেন। সহাধ্যায়ীই বটে ! সে সময়ে তক্ষশিলার যতেক আচার্য, বৎস কাত্যায়ন দেবরাত বলতে অজ্ঞান ছিলেন। তিন বেদ, বেদাঙ্গগুলি ছাড়াও দণ্ডনীতি, বার্তা, ইতিহাস, ইতিবৃত্ত অনেকগুলিতেই সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত করেছিল। সবাই বলতেন সে অসাধারণ প্রতিভাধর। অনেকে রাজ অমাত্য দ্যুমৎসেনের পুত্র বলে কোনও আচার্যই তরুণ দর্ভসেনকে কোনও বিশেষ সমাদর দেখাননি। তবু তিনি দণ্ডনীতিতে উচ্চ থেকে উচ্চতর পাঠ নিচ্ছেলেন। রাজসভায় পিতার বিভাগে তাঁর নিয়োগ এক প্রকার বাঁধা। কিন্তু তাঁর আচার্য, কৃষ্ণাত্রেয় একদিন স্মিত উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'বৎস দর্ভসেন তোমাকে খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার যা-কিছু জানা আছে সবই তোমাকে শিখিয়েছি, তবে তার থেকেও যদি উচ্চে যেতে চাও তো পথ আছে, আরও শিখবে ?'

দর্ভসেন সাগ্রহে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় শিখব আচার্য দেব।'

'তবে তক্ষশিলার চূড়ামণিস্বরূপ কাত্যায়ন দেবরাতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করো। সে দণ্ডনীতি নিয়ে চর্চা করছে। রাজকৃত্যের, শাসনযন্ত্রের উচ্চতর মার্গ সম্পর্কে নতুন নতুন তত্ত্ব-চিন্তা সে-ই করছে এখন। সম্ভবত পুঁথিও লিখছে।'

'বলছেন কি আচার্য ? সতীর্থের শিষ্যত্ব ? সম্ভব না কি ?'

আশ্চর্য হয়ে আচার্য কৃষ্ণাত্রেয় বলেছিলেন, 'উচ্চশিক্ষায় আচার্যের ক্ষেত্রে আবার পাত্রাপাত্র ভেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে না কি ? তুমি কি রাজা প্রবাহণের কথা শোননি ? শোননি মহাপণ্ডিত গৌতম শেষ পর্যন্ত কীভাবে তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন ! তুমি সেই বাক্‌সিদ্ধ যোগীর কথা শোননি যাকে ব্যাধের কাছ থেকে ধর্ম বিষয়ে শেষ পাঠ নিতে হয়েছিল ! আর শ্বেতকেতু ? শ্বেতকেতু যে চণ্ডালের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি বলে তার দু পায়ের মধ্য দিয়ে গলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সতীর্থ তো ভালো দর্ভসেন, অহংকার বর্জন করতে না পারলে কী করে উচ্চশিক্ষা লাভ করবে ? অবশ্য সবটাই তোমার অভিরুচি। আমি জোর করছি না।'

দর্ভসেন নিজগৃহে ফিরে এসেছিলেন, দণ্ডনীতি বিষয়ে এত দিনের যা জানা, যা গতানুগতিক সেই পর্যন্ত শিক্ষা করে। একেবারে মহাজনাশ্রিত মহাজন পদলাঞ্ছিত রাজনীতির সোজা পথ ধরে চলেন তিনি। এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে, চণক আরও কিছু জানে। আরও কিছু বোধ হয় শিখেছে পিতার কাছ থেকে। সোজাসুজি মগধ সভায় দৌত্য করতে না এসে সে প্রথমে অজ্ঞাতবাস করে গোপনে সমগ্র পূর্বদেশের সংবাদ নিল। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সম্পর্কে কত তথ্য এখন তার নখদর্পণে। প্রথমে এটাকে অবাচীনের অল্পদর্শিতা ভেবেছিলেন তিনি। এখন তাঁর মনে হচ্ছে এর মধ্যে উচ্চতর বুদ্ধির ইঙ্গিত আছে। সত্যিই আছে। এই যে চণক এখুনি গান্ধার ফিরছে না, এর মধ্যেও কোনও কূট উদ্দেশ্য আছে তার। অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক এই চণক। অল্প দিনেই দেব পুষ্করসারীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে, এখানে এসে মগধরাজেরও বিশেষ স্নেহ পেল। তিনি গোপনে একটি সংকল্প করলেন।

রাজগৃহ-গিরিব্রজে ভোর হচ্ছে। শেষ রাতে সামান্য নিদ্রার পর আবার সূর্যোদয়ের মুহূর্তেই গাত্রোত্থান করেছেন দর্ভসেন। দাসদাসীরা তাঁর প্রসাধন সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। প্রাতরাশে বসেছেন, সামনে চিত্রফলকের ওপর বহুবিধ ফল, যবাগু, অপূপ এবং দধি রয়েছে। চণককে সঙ্গে করে সম্পাতি প্রবেশ করল। দু'জনকেই দেখে মনে হচ্ছে রাতে ঘুমোয়নি। চোখ ঈষৎ আরক্ত কিন্তু স্নাত এবং নববস্ত্র পরিহিত। দাসীরা তাদের প্রাতরাশ এনে দিলে চোখের ইঙ্গিতে দাসীদের কক্ষ ত্যাগ করে যেতে বললেন দর্ভসেন।

চণক তাঁকে প্রণিপাত করে বলল, 'গতরাত্রের জন্য ক্ষমা চাইছি মহামাত্র।'

বলছে বটে, কিন্তু চণকের চোখের অভিব্যক্তি এখনও কঠিন, ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ। মনে মনে হাসলেন দর্ভসেন, ভাবলেন যতই উচ্চমার্গে যাতায়াত করো হে চণক, দর্ভসেনের কাছে এখনও তুমি বালকই। কূটনীতির কিছুই জানো না। মুখে বললেন, 'তোমার যেমন সৎ শিক্ষা সেই অনুযায়ীই তুমি ক্ষমা চাইছ চণক। ভালোই করেছ, না হলে জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কনিষ্ঠদের সম্পর্কটি ভগ্নসেতুর মতো হয়ে যায়, তার ওপর দিয়ে আর কোনও আলোচনা, পারস্পরিক জ্ঞান-বুদ্ধির যাতায়াতই সম্ভব হয় না। তবে আমারও ত্রুটি হয়েছে বৎস চণক। বয়োবৃদ্ধ বলেই আমার সব সময়ে স্মরণে থাকে না এখন, রাজকার্যে আমরা প্রায় সমগোত্রীয়। তুমিও আমাকে মার্জনা করো যুবক। নিজেই বলছ আমি তোমার পিতৃব্যসম। পিতৃব্যের তো তিরস্কারেরও অধিকার থাকে ! সেই ভেবেই...'

চণকের চোখের ভাব কোমল হয়ে এলো, সে বলল, 'মহামাত্র জানি না আবার কতদিনে মাতৃভূমিতে ফিরব। এ কথা সত্য সেখানে আমার পিতামাতা কেউ জীবিত নেই, জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদ্বয় বিবাহিত, স্বামীগৃহে সুখে কালাতিপাত করছে। আমার পিছুটান নেই। কিন্তু মাতৃভূমি ! মাতৃভূমির গভীর টান আমার রক্তের মধ্যে আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। আপনাকে সম্পাতিকে এবং বাহিনীর লোকজনকে এখন আমার অত্যন্ত আপনজন মনে হচ্ছে, হৃদয় মথিত হচ্ছে গতরাত্রের মনান্তরের জন্য।'

দর্ভসেন স্নেহের হাসি হেসে বললেন, 'তা তো হবেই চণক। হতেই পারে। কিন্তু তুমিই বা এমন ধনুকভাঙা পণ করেছ কেন যে গান্ধারে ফিরবে না ! এই দৌত্যে সাফল্যের পর আরও বড় পদ তোমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করে আছে, অন্তত আমি তো মহারাজের কাছে সেই মর্মেই প্রার্থনা জানাব, স্থির করেছি।'

চণক বলল, 'না আর্য। আমি এখন মগধেই থাকবো মনস্থ করেছি। মগধ, কোশল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশালী...তারপর অঙ্গ...'

দর্ভসেন খুব সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'মগধরাজ কি তোমাকে কোনও উচ্চপদ দিতে চেয়েছেন চণক ?'

চণক একবার তাঁর দিকে চাইল, তারপর বলল, 'না। তবে তিনি আমার সংকল্পের কথা শুনেছেন। তাঁর সম্মতি আছে।'

'তুমি কিসের আশায় এই হতভাগা দেশে বাস করতে চাইছ, চণক ? দর্ভসেন জোরের সঙ্গে বললেন, 'অসংস্কৃত মূর্খ, এদের জাতজন্মের কোনও ঠিকানা নেই। অনার্যদের সঙ্গে যথেচ্ছ বৈবাহিক সম্পর্ক করে করে সব তাম্রবর্ণ, খর্বাকার। সম্মান প্রদর্শন করতে জানে না। কী ভাষা। আহা! লঠঠিবন, বেলুবন, বচ্চ, বচ্চ, সেট্‌ঠি, সেট্‌ঠি শুনতে শুনতে কান আমার বধির হবার উপক্রম হয়েছে।'

চণক বলল, 'কিন্তু এই-ই তো প্রজাবর্গের ভাষা মহামাত্র! আমাদের গান্ধারেও তো পথে-ঘাটে লোকে এই ভাষাতেই কথা বলে, সামান্য পার্থক্য আছে, কিন্তু এই প্রকারই তো মোটের ওপর।'

'তারা বলুক। কিন্তু তাই বলে রাজা, অমাত্য, আচার্য, কবি সবাই এই অপভ্রংশ ভাষায় কথা কইবে ? ছিঃ! পবিত্র দেবভাষার কী শ্রীই হয়েছে! তার ওপর এরা কীভাবে মানুষের শারীরিক ত্রুটি নিয়ে নামকরণ করে দেখেছ ? আমাদের স্নানের জল যে আনে, সেই দাসটিকে এরা বলে দন্তুল ভদ্দক, তার দাঁতগুলি বড় বড় বলে। আর যে প্রকোষ্ঠগুলি পরিষ্কার করে তার নাম খুজ্জ মহীপাল, সে কুব্জ বলে। আর শুধু দাসদাসী বা সাধারণ লোকের ব্যাপারেই নয়, নিজেদের রাজকুমারকেই তো এরা কুনিয় বলে উল্লেখ করে, কুনিক আর কি। কোন্ হাতে না আঙুলে কী একটা ত্রুটি আছে না কি! একটি শ্রেষ্ঠীকে কালকর্ণী বলে উল্লেখ করে। কালকন্নি কালকন্নি করে বুঝতে পারি না, তার পরে সন্ধান করে আমাদের অনুচরদের থেকে জানলাম— ওর সঙ্গে বাণিজ্য করতে গিয়ে নাকি অনেকের বিপদ হয়েছে, তাই সকালে কেউ ওর মুখ দেখে না, আসল নাম শ্রীধর। এখন সে নাম সবাই ভুলে গেছে। বৃদ্ধ মানুষটি কালকন্নি বলেই পরিচিত। ছিঃ!'

চণক কৌতুকভরা মুখে বলল, 'হ্যাঁ, এদেশের লোকেরা ভারি খোলামেলা স্বভাবের, সেটা সত্য।'

দর্ভসেন বললেন, 'এটা খোলামেলা স্বভাবের চিহ্ন হল! আর এরূপ হবে না-ই বা কেন ? এরা তো খোলাখুলি দাসদের, শূদ্রদের বিবাহ করছে, দাস রাজন্যদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বও। রাজা স্বয়ং তো বোধ হয় নাগবংশীয় কোনও...' অসঙ্গত হয়ে যাচ্ছে ভেবে দর্ভসেন থেমে গেলেন। শত হোক, চণক এখন মগধরাজের রীতিমতো মিত্র। কী থেকে কী হয়ে যায়!

চণক ধীরে ধীরে বলল, 'মহামাত্র যা যা বললেন সবই সত্য। কিন্তু তিনি সেগুলি যেভাবে দেখছেন, আমি সেভাবে দেখছি না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য মৌলিক ও অনমনীয়। তর্ক করে লাভ নেই, তাই এই আলোচনা আমি বিলম্বিত করতে চাই না। শুধু এটুকু বলে ক্ষান্ত হচ্ছি যা আপনার কাছে শুধু দোষ বলে প্রতিভাত হচ্ছে, আমার কাছে তা খুবই কৌতূহলজনক বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। এই রাজগৃহ নগর তিন দিক থেকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত স্বাভাবিক দুর্গনগরী। এমনটা আর সমগ্র উদীচী প্রাচীতে কোথাও নেই। এর চতুর্দিকে বিস্তৃত সমতলভূমি, কোথাও বন্ধুর পার্বত্যভূমি, দক্ষিণে ঘন অরণ্য, উত্তরে খুব কাছেই নিত্যপ্রবাহিণী গঙ্গা। এই মগধ আমার কাছে যথার্থ চক্রবর্তী-ক্ষেত্র বলে প্রতিভাত হচ্ছে।'

'চক্রবর্তী-ক্ষেত্র!' দর্ভসেন যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'তুমি কি স্বপ্ন দেখছ চণক ?' চণকের আহার শেষ হয়েছিল, সে মধুমিশ্রিত দুগ্ধ এক পাত্র এক নিশ্বাসে পান করে উঠবার অনুমতি চাইল। তার মুখ স্মিত, চোখের দৃষ্টি যেন এখানে নেই। শুধু দৃষ্টির ওপর ভর করেই সে যেন অন্য কোথাও চলে গেছে।

'তুমি কি মনে করো শ্রেণীক বিম্বিসার যাকে এরা সেনিয় বলে সে চক্রবর্তী রাজা হবে, আর তাই তুমি মগধ রাজসভার আশ্রয় নিচ্ছ গান্ধার ছেড়ে ?' বিস্ময়ে যেন কূল পাচ্ছেন না দর্ভসেন।

চণক বলল, 'হবেন কিনা জানি না, মহামাত্র। তবে হবার কতকগুলি আয়োজন প্রকৃতি করে রেখেছে। মনে রাখবেন তিনিই প্রথম রাজা যিনি নিজস্ব বেতনভুক সৈন্যবাহিনী রাখবার কথা চিন্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন। আপনিই তো বললেন তিনি শ্রেণীক। সম্ভাবনা আছে। এই চক্রবর্তী-ক্ষেত্রকে ঠিকমতো বুঝলে, ব্যবহার করতে পারলে হবেন, না হলে হবেন না। তবে আমি মগধ রাজসভার আশ্রয় নিয়েছি এ ধারণা আপনার ভুল, সর্বৈব ভুল। আপনারা চলে গেলেই কিছু দিনের মধ্যেই আমি পূর্বদেশে যাত্রা করব। প্রকৃতপক্ষে ওই পূর্বদেশ, পূর্বাচলই আমাকে ক্রমাগত টানছে।'

চণক নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে সম্পাতি ও দর্ভসেনের কাছ থেকে বিদায় নিল। মৃদুস্বরে বলল, মহামাত্র, সম্পাতি, জীবনে হয়ত আর কোনও দিন দেখা না-ও হতে পারে। আশীর্বাদ করুন আমি যেন জম্বুদ্বীপের সীমান্ত দেখতে পাই। পুবে, দক্ষিণে সব মহারণ্য, দুর্গম পর্বতশ্রেণী পার হতে পারি।' সম্পাতিকে আলিঙ্গন করে চণক আর কোন দিকে না তাকিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ তার গমনপথের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন দর্ভসেন। শেষে বললেন, 'জম্বুদ্বীপের সীমানা ? মহারণ্য ? চক্রবর্তী-ক্ষেত্র ? সম্পাতি, যুবকটি কি পাগল হয়ে গেল ?'

১২

রাজগৃহে ঢুকে আনুমানিক এক ক্রোশের মতো দূরে গৃধ্রকূট। উত্তর-পূর্বে বৈপুল্ল এসে মিশেছে শৈলগিরিতে। তারই একটি শিখর— এই গৃধ্রকূট। অন্যান্য পাহাড়গুলি যেমন নানা পন্থের শ্রমণ ও সন্ন্যাসীতে একেবারে পূর্ণ, এটি ততটা নয়। নির্জন, রুক্ষ ভূমির ওপর কর্কশ পাহাড়, গাছপালা অল্প। কে যেন তার শিরে একটি বিশাল গৃধ্র-গ্রীবা মস্তক ও চক্ষু সমেত বসিয়ে দিয়েছে। বাঁ দিকে চক্ষু ন্যস্ত করে আছে। দেখলে আশ্চর্য লাগে। চণক তার গাঢ় তাম্রবর্ণ অশ্বটিকে পাহাড়ের মূলে একটি শাল্মলী গাছের সঙ্গে বাঁধল। অশ্বটির গলার কাছটা, পুচ্ছের চারপাশে কিছুটা অংশ উজ্জ্বল শ্বেত। রাজ অতিথিশালার মন্দুরা থেকে এই অশ্বটিকেই সে বেছে নিয়েছে। অশ্বটি কয়েক দিনেই তাকে বেশ চিনে গেছে। সে নামতেই গ্রীবাটি এগিয়ে দিল। আদর চায়। তার কেশরের ওপর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে চণক রজ্জু আলগা করে দিল। যতটা সম্ভব চরুক অশ্বটি।

পাহাড়ে চড়বার জন্য প্রকৃতি-নির্মিত কয়েকটি স্বাভাবিক সোপান আছে। সমান দূরত্বে নয়। এক পঙ্‌ক্তিতেও নয়। কিন্তু অনায়াসে পা রেখে রেখে ওপরে চড়া যায়। পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়েই চণকের প্রথম কাজ হল একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করা। এইভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে তার ভেতরটা একটা ব্যাখ্যাতীত হর্ষ এবং প্রশান্তি, বিস্ময় এবং আত্মপ্রত্যয়ে ভরে যায়। এখান থেকে এই রাজগৃহ নগর প্রায় পুরোটা চিত্রের মতো দেখা যায়। এই শিখরের চেয়েও অনেক উঁচু কিছু যদি থাকত। তাহলে আরও দেখা যেত, দেখা যেত উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার ধারা কীভাবে পূর্ব-দক্ষিণ গামিনী হয়েছে। গঙ্গার অপর পারে লিচ্ছবি বজ্জিদের স্বর্ণশ্রীমণ্ডিত বৈশালী নগরী। দেখা যেত অচিরবতী আর সরযূ, অচিরবতীর উত্তরে শ্রাবস্তী, সরযূর দক্ষিণে সাকেত। এবং দেখা যেত সুদীর্ঘ উত্তরের বাণিজ্যপথটি কীভাবে গতিশীল নদীস্রোতের মতই মগধ থেকে গান্ধারের দিকে চলেছে। কিন্তু অত্যুচ্চ শিখর হলেও কি এসব দেখা যাবে ? দৃষ্টির একটা সীমা আছে। সে সীমা তো মানুষের দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না! দৃষ্টিশক্তির সহায়ক যদি কিছু থাকত! যাতে দূরের জিনিস দ্বিগুণিত, চতুর্গুণিত হয়ে অনেক কাছে চলে আসে। তক্ষশিলায় যারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদির বিষয়ে চর্চা করে থাকেন, সেই নক্ষত্র-দর্শকরা এই সহায়ক যন্ত্রের অভাবের কথা প্রায়ই বলে থাকেন। এখন জ্যোতির্বিদরা শুধু জানেন গ্রহ ও নক্ষত্র দুই জাতীয় জ্যোতিষ্ক আছে। আরও ভালোভাবে দেখতে পেলে এদের পার্থক্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে। হয়ত দেখা যাবে আরও অনেক প্রকার জ্যোতিষ্ক আছে। অভিজিৎ নক্ষত্রের সাহায্যে চন্দ্রের পর্যায়-কাল এখন আরও সঠিকভাবে চিহ্নিত হচ্ছে। চান্দ্রমাস থেকে সৌরমাসে বৎসর গণনার রীতি অনুসরণ করেও জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সেভাবে খগোল পর্যবেক্ষণ করলে হয়ত আরও নক্ষত্র, আরও গ্রহ আবিষ্কৃত হবে। আবিষ্কৃত হবে অন্তরীক্ষ সম্পর্কে আরও অনেক নতুন তথ্য। ওপরে আকাশ, নীচে পৃথিবী। পাখিরা যেভাবে দেখতে পায় সেভাবে একটি চিত্রের মতো যদি এই পৃথিবীকে দেখা যেত! খালি চোখে এই পর্বতশীর্ষ থেকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, অরণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং জল অর্থাৎ নদ, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী ইত্যাদি, এরাই পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক স্থান জুড়ে আছে। ভূ-মণ্ডলের অধিকাংশই হল তার ওপর সমভূমি, কিছু অংশ উচ্চাবচ, বন্ধুর এবং কিছু অংশ উচ্চ, পর্বতসঙ্কুল।

শাস্ত্রে সপ্তদ্বীপের কথা বলা হয়। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। আবার কেউ কেউ বলেন ও সব প্রাচীন ধারণা। আসলে দ্বীপ চারটি। এই চতুর্মহাদ্বীপের নাম উত্তরকুরু, পূর্ব বিদেশ, অপর গোদান ও জম্বু। এরা যথাক্রমে মহামেরুর উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বিন্যস্ত। জম্বুদ্বীপ আকৃতিতে ত্রিকোণ। দুটি মতের মধ্যেই জম্বুদ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বালক বয়সে ভৃগুকচ্ছের পট্টনে গিয়ে নীলবর্ণ মহাবারিধি দেখে এসেছে সে। তার পিতা আচার্য দেবরাত বলতেন, 'এই এক সীমা দেখলে স্ব-ভূমির। এবার চলে যাও হিমবন্তের কোলে। সেখানে যোজনের পর যোজন গহন অরণ্য এবং তুষারমৌলি পর্বতশ্রেণী। এক জীবনে সেই দুর্গম সুন্দর প্রদেশ দেখে ফুরিয়ে শেষ করতে পারবে না। তবে বহু সন্ন্যাসী থাকেন সে অঞ্চলে, মাঝে মাঝে লবণ ও অম্ল খেতে নেমে আসেন জনপদে। তখন তাঁদের কাছ থেকে হিমবন্ত প্রদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিতে পারবে। পায়ের নীচে মাটি আর মাথার ওপর আকাশ—এই দুই সম্পর্কে যতই জানবে ততই বোঝা যাবে জীব, জীবন, মৃত্যু কী, কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত।

এইধরনের লবণাম্লসন্ধানী প্রব্রাজক দেখলেই গৃহে নিয়ে আসতেন তিনি। সাদরে ভোজন করাতেন। যতদিন ওঁরা থাকতেন ততদিন নিজেদের উদ্যানে একটি পর্ণশালা নির্মাণ করিয়ে সেখানেই তাঁকে থাকতে অনুরোধ করতেন। যতদিন পিতা বেঁচেছিলেন পর্ণশালাটি নিয়মিত সংস্কার করানো হত। সন্ন্যাসী আসুন বা না আসুন। এঁদেরই একজন তাকে চিত্রকূট পর্বতের কথা বলেছিলেন। সেখানে কাঞ্চনবর্ণ গুহা আছে। অসংখ্য নানা বর্ণের হংস অধ্যুষিত সেখানকার জলাশয়। তৃণহংস, পাণ্ডুহংস, মনঃশিলাহংস, শ্বেতহংস, রাজহংস—এমন বহু প্রকার। এঁর কাছেই বিশালকায় স্বর্ণবর্ণ ধৃতরাষ্ট্র হংসের কথা শোনে সে। এঁদের গলদেশ বেষ্টন করে নাকি তিনটি রক্তবর্ণ রেখা থাকে। তিনটি রেখা সেখান থেকে অধোদিকে নেমে গেছে। তিনটি রেখা পিঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে।

আর একজন বলেছিলেন তিনি যে অঞ্চলে বাস করেন সেখানে একের পর এক সাতটি পর্বতমালা আছে। বাইরে থেকে ধরলে এদের প্রথমটির নাম ক্ষুদ্রকৃষ্ণ, তারপর মহাকৃষ্ণ, তৃতীয়টির নাম উদক, চতুর্থটির নাম চন্দ্রপার্শ্ব, পঞ্চমটি সূর্যপার্শ্ব, ষষ্ঠটি মণিপার্শ্ব এবং সপ্তমটির নাম সুবর্ণপার্শ্ব। বহু বিচিত্র গুহা আছে সেখানে। মাঝখানে অগভীর সরোবর। জলের শেষ সীমা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাপ্রকার গুল্ম, উৎকৃষ্ট মাস ও মুদ্গের বন, বন্য অলাবু, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতিও পাওয়া যায়। পুষ্পের শোভা দেখলে না কি স্নানাহারের কথা ভুলে যেতে হয়। ফলাদির মধ্যে আছে ইক্ষুর বন। গজদন্তপ্রমাণ ফলবিশিষ্ট কদলীবন, পনসবন এবং সর্বশেষে নানা জাতির তরুলতাসমাকীর্ণ মহারণ্য। এমন একটি বটবৃক্ষ আছে নাকি, যেটিকে একটি ছোটখাটো পাহাড় বললে অত্যুক্তি হয় না। বহির্ভাগে বিস্তৃত বেণুবন।

অতি দুর্গম হিমবন্ত প্রদেশ। সেখানে যান একমাত্র এই সংসার- বিরক্ত প্রব্রাজকরা। যখন লোকালয়ে আসেন, তাঁদের দেহ জীর্ণ, শীর্ণ, কালিবর্ণ, জটা, শ্মশ্রু ইত্যাদিতে মুখের আকৃতি বোঝা যায় না। তপস্যাই এঁদের উদ্দেশ্য। ঘুরে ঘুরে কোথায় কী আছে দেখবার আগ্রহ নেই। কাজেই এঁদের কাছ থেকে খুব অল্প এবং সীমাবদ্ধ তথ্য পাওয়া যায়। ওই মহারণ্য পার হয়ে, পর্বতসানু পার হয়ে আরও উঁচুতে তুষারক্ষেত্র আছে। সেই তুষারক্ষেত্র বেয়ে ওপরে উঠলে কোথায় তার শেষ ? তার ওপারে কী ? এসব জানা যায় না। মানুষ যায় না ওসব দিকে।

চণক দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি ফেরালো। সেদিকে ওই মহাবন। ক্রমে ক্রমে পশ্চিম প্রান্তে বিন্ধ্যাটবীর সঙ্গে মিশবে এই বন। এখানে যে মানুষ থাকে তা চণক নিজের চোখেই দেখে এসেছে। যে আটবিকদের সঙ্গে এর আলাপ হয়েছিল তারা বলত আরও অনেক মানুষ আছে ওই মহাবনের বিভিন্ন স্থানে। এই দক্ষিণ-পূর্ব দেশই হল তার গন্তব্য। উত্তর সীমা, উত্তর-পশ্চিম সীমা মোটামুটি জানা আছে। দক্ষিণ এবং সমগ্র পূর্বাঞ্চল তাকে দেখতে হবে। সে এখন শুধু পথ সম্পর্কে চিন্তা করছে। কোনও সার্থর সঙ্গে যাবে, না একলা একলা ভ্রমণ করবে ? ক'দিনই সে রাজগৃহ এবং সন্নিহিত

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্চলের একটি রেখাচিত্র আঁকবার চেষ্টা করছে। খানিকটা নিজের চোখে দেখা, খানিকটা লোকমুখে শোনা তথ্যর ওপর নির্ভর করে একটি রেখাচিত্র। যতই এগোবে এই রেখাচিত্রটিতে সে আরও সংযোজন করবে। গ্রহ-নক্ষত্রাদি, সূর্য, বিশেষত ধ্রুবতারা হবে তার নিয়ামক।

এই সময়ে চণক দেখল একটি মুণ্ডিত-মস্তক শ্রমণ তার দিকে আসছেন। গৈরিক সংঘাটিতে তাঁর শরীর ভালভাবে ঢাকা। ডান হাতটি দুলছে। শ্রমণ গৌরবর্ণ হলেও, সম্ভবত রোদে রোদে ঘোরার জন্য ঈষৎ মলিনত্বক হয়ে গেছেন। চোখ দুটির দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। চণকের ওপর তাঁর দৃষ্টি নেই। মুখ প্রশান্ত। চণক কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে বলল, 'নমস্কার ভদন্ত'। চণকের দিকে তাকালেন শ্রমণ। স্মিত মুখ। ক্ষণপূর্বের দূরত্ব যেন আর নেই। যেন বহু যোজন দূরে কিছু দেখছিলেন, চণকের ডাকে এইমাত্র তাকে দেখতে পেলেন। হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। চণক বলল, 'অপরাহ্ণ সমাগত, আপনি কি এখন নামবেন ? আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'সাহায্য লাগবে না ভদ্র, তা ছাড়া আমি এখন নামবও না।'

চণক বলল, 'আপনি কি এখানে আজই এলেন ? আমি নিত্যই প্রায় আসি। আপনাকে দেখিনি তো!'

'আমি কিছুদিন এখানেই বাস করছি ভদ্র। নির্জনে।'

'কোথায় ?'

'দূরে আঙুল দেখিয়ে শ্রমণ বললেন, 'ওই দিকে একটি চত্তালের মতো প্রস্তরখণ্ড আছে, মাথার ওপরে আর একটি প্রস্তরখণ্ড। ওইখানে।'

'বৃষ্টি হলে ?'

'প্রস্তরখণ্ডটি আমাকে মোটামুটি রক্ষা করে।'

'অশন ?'

'সকালে ভিক্ষার্থে বেরোই নগরপ্রান্তে।'

'আপনি কি রাজগৃহেই রয়েছেন ?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সায় দিলেন শ্রমণ। তারপর বললেন, 'ইসিপতনে ছিলাম।'

চণক বলল, 'এই গিরিচূড়া বড় সুন্দর, নির্জন ধ্যানের পক্ষে খুবই প্রশস্ত। তা ছাড়াও এখান থেকে রাজগৃহ নগর চিত্রের মতো দেখা যায়।'

শ্রমণ মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনি গয়াশিরে গিয়েছেন ভদ্র ? অনেকে বলে ব্রহ্মযোনি।'

'না তো ? কোন দিকে ?'

'এখান থেকে দক্ষিণ দিকে। ব্রহ্মযোনির শিখর থেকে মগধ রাজ্য বহু দূর পর্যন্ত চিত্রের মতো দেখা যায়।'

চণক কিছু বলতে যাচ্ছিল। শ্রমণ হঠাৎ অধরে আঙুল রেখে পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। চণক দেখল পশ্চিমাকাশ যেন রক্ত বমন করছে। দূরে নীল বনানীরেখা। সহসা যেন মনে হয় বনে আগুন লেগে গেছে। চণক চমৎকৃত হয়ে বলল, 'ভদন্ত, আপনি কেন এখানে অপেক্ষা করছিলেন বুঝতে পেরেছি। এই স্থান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য কী অপূর্ব! ঠিক যেন বনে বনে দাবাগ্নি জ্বলছে!'

শ্রমণ পশ্চিমাকাশের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে যেন এক অতলস্পর্শী অভিনিবেশের মধ্য থেকে বলতে লাগলেন, 'সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ওই হুতাশন! দেখ দেখ আদিত্য কেমন আদীপ্ত। সমগ্র দৃশ্যমান জগতে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকল সমিধ পেয়ে পঞ্চেন্দ্রিয় জ্বলে উঠছে। বাসনাগ্নি, ক্রোধাগ্নি, কামাগ্নি, লোভাগ্নি, মোহাগ্নি। চক্ষু আদীপ্ত, শ্রোত্র আদীপ্ত, জিহ্বা আদীপ্ত, রসাদি আদীপ্ত, মনঃ সংস্পর্শ ও মনঃসংস্পর্শজনিত যে বোধ তা-ও আদীপ্ত। আর সেই দীপ্ত অনল থেকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে মৃত্যু, রোগ, শোক, নৈরাশ্য।' শেষের শব্দগুলি শ্রমণ বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'মৃত্যু, রোগ, শোক, নৈরাশ্য ...'

সহসা একখণ্ড মেঘের আড়ালে চলে গেল অস্তসূর্য। মেঘের চারপাশ দিয়ে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে তার ছটা। পশ্চিম আকাশ ধীরে ধীরে ভস্ম উদ্গীরণ করতে লাগল। জমে উঠছে চারদিকে ভস্মের স্তূপ।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওই অনলজ্বালা দেখে সংযত হও, প্রতি ইন্দ্রিয়ে নির্বেদ জাত হোক, সন্ধ্যাকাশের মতো বৈরাগ্য বরণ করো হে জ্ঞানী, হে সংযমী, ছিন্নমূল করো বাসনাকে। জন্মভয়, জরাভয়, ব্যাধিভয়, মৃত্যুভয় সমস্ত পার হয়ে বিমুক্ত হও, বিমুক্ত হও। শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করো।' শ্রমণ বলতে লাগলেন।

কাকে বলছেন? কখনও তিনি নিজেকেই বলছেন, কখনও মনে হচ্ছে চণককে শোনাচ্ছেন। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসছে। এবার নামতে হবে। আকাশের পটভূমি পেছনে নিয়ে একটি তমালতরুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন শ্রমণ। চণক ধীরে ধীরে বলল, 'ভদন্ত, আপনার কণ্ঠস্বর মধুর, আবৃত্তি গম্ভীর, যে সূক্তটি আপনি বললেন তা-ও মহৎ কবিতা। আপনি কি ওটি আমাকে শোনালেন?'

অন্ধকারে শ্রমণের কোনও ভাবান্তর হল কি না চণক বুঝতে পারল না। তিনি যেন ঘুম ভেঙে উঠে বললেন, 'আদিত্তপরিয়ায় সুত্ত। ব্রহ্মযোনি পর্বতশিরে তিনি উপবিষ্ট আছেন। তাঁকে ঘিরে আমরা। রাজগৃহের অধিত্যকা সামনে বিস্তৃত। সহসা সামনের পাহাড়ে দাবানল দৃষ্ট হল। তখন তিনি আমাদের এই দেশনা করেছিলেন। ভদ্র, আজ দাবানল নেই, কিন্তু অস্তাচলের আকাশ অমনই আগুন-ঝরা। আপনি দাবাগ্নির কথা বললেন, তাই ভগবানের মুখনিঃসৃত সেই অদ্ভুত সর্বদর্শী, মর্মস্পর্শী বাণী এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল।'

'কার বাণীর কথা বলছেন শ্রমণ?'

'ভগবান তথাগতর।'

'আপনার নাম কী ভদন্ত?'

'আমি ভিক্ষু অস্‌সজি। আদিত্তপরিয়ায় সুত্তাংশটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তা হলে ভগবান বুদ্ধ তথাগতর ধর্মদেশনা শুনতে বেলুবনে যাবেন ভদ্র। সেই মহাশ্রমণ আপনার সর্বসংশয় ছিন্ন করবেন।'

চণক ধীরে ধীরে নামতে লাগল। সহসা আকাশে ঝাঁক ঝাঁক তারা বেরিয়ে এলো। সোপানগুলির ওপর মৃদু আলো পড়েছে। কোণগুলি তাই সেই জন্যেই দ্বিগুণ অন্ধকার। খানিকটা নেমে এসে একবার মুখ তুলে দেখল, শ্রমণ ঠিক সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আত্মমগ্ন, বিশ্বচরাচরের অস্তিত্ব যেন ভুলে গেছেন। হয়তো এখনও মনে মনে উচ্চারণ করছেন, 'ওই দেখো, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে হুতাশন জ্বলছে....'

AMARBOI.COM

অন্ধকারের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে তার অশ্ব। গ্রীবা ও পেছনের শ্বেত অংশগুলি ফুটে আছে। 'চিত্তক!' সে মৃদুস্বরে ডাকল, স্পর্শ করল অশ্বের মাথা পিঠ। হ্রেষাধ্বনি করে উঠল চিত্তক। এক লাফে তার পিঠে চড়ে নগর অভিমুখে চলল চণক। কিন্তু ধীরে। অতি মন্দ্র গতি। সে কোথায় যাচ্ছে যেন জানে না। অনেকক্ষণ পরে একটি চৌমাথায় এসে অনেকগুলি দীপস্তম্ভ দেখে তার চৈতন্য ফিরল। সে একটি চেনা পথের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। নগর যেন আজ অস্বাভাবিক শান্ত। সান্ধ্য উদ্দীপনা নেই। বিপণিগুলি অর্ধেক বন্ধ। গৃহে গৃহে মঙ্গলকলস। দুয়ারের মাথায় মাল্য ঝুলছে। কিন্তু গৃহদীপ যেন তেমন ভালো করে জ্বলছে না। সহস্র সহস্র চক্ষু মেলে আকাশ চেয়ে দেখছে নগরকে। যেন কিছু বলছে। বলতে চাইছে। নগরী অভিমানিনী রমণীর মতো মুখ ফিরিয়ে রয়েছে, শুনেও শুনছে না।

সে ধীরে ধীরে শ্রীমতীর গৃহে এসে দুয়ারে করাঘাত করল। দীপ হাতে একটি দাসী দরজা খুলে সরে দাঁড়াল, 'আসুন ভদ্র।' ঘোড়াটিকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেল একজন।

প্রাঙ্গণটি সোজা গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। বাঁক ফিরতেই শ্রীমণ্ডপের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাগুলি দেখা গেল। আর একটু এগিয়ে চণক দেখতে পেল বোধিকুমার এবং চারুবাক তো আছেনই। আছেন আরও অনেক অচেনা যুবা এবং প্রৌঢ়, সকলে যেন কী এক আলোচনায় মত্ত। খানিকটা নিম্ন কণ্ঠে। একটা অবিরাম গুঞ্জনধ্বনির মতো শোনাচ্ছে তাঁদের আলাপ। মাঝখানে শ্রীমতী, আজ তার পরনে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের বসন, তাতে সোনার ছোট ছোট ফুল। রক্তবর্ণ উত্তরীয় দিয়ে সে অঙ্গ ঢেকে বসে আছে। বীণার দণ্ডের ওপর তার ডান হাতটি আলতো করে ফেলে রাখা, গভীর মনোযোগে সে উপস্থিত সবাইকার আলোচনা শুনছে।

চণক ধীরে ধীরে এক পাশে গিয়ে বসল। তাকে দেখে বোধিকুমার উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে কী সৌভাগ্য, চণক ভদ্র যে ! আপনি গান্ধারে ফেরেননি এখনও !' চণক উত্তর দিল না।

একটি অতি সুবেশ যুবক বলে উঠল, 'এই তো আরেক জনও উপস্থিত রয়েছেন এঁরও মতামত নেওয়া যাক। আপনিই বলুন না ভদ্র, স্বয়ং মহারানিই যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, কাল মহারাজারও তো সে মতি হতে পারে। তারপর মহামাত্যরা, বিনিশ্চয়কর্তা, নগরপাল এঁরাই বা বাদ থাকেন কেন ? আর কুলস্ত্রী কুলকন্যারা ? তারা কি মহারানির পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না ? তাহলে শেষ পর্যন্ত গৃহস্থাশ্রম থাকে কী করে ?'

আর একজন বললেন, 'রাজগৃহে তো সমনপন্থ একটা নয়। এতদিন ধরে রয়েছেন নিগ্‌গণ্ঠরা, রয়েছেন সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত, মক্‌খলি গোসাল প্রায়ই আসেন, রয়েছেন অজিত কেসকম্বলি। কই, এরকম ঘটনা তো ঘটেনি ! যার ইচ্ছে হয়েছে, বিষয়বৈরাগ্য হয়েছে সে শান্তির সন্ধানে যোগ দিয়েছে এঁদের আশ্রমে। কিন্তু এ কী ! দলে দলে সব অল্পবয়স্ক যুবা, কুমারী তরুণী, কুল-ইত্থি, পব্বজ্যা নিতে আরম্ভ করে দিল ! সঞ্জয়ের শিষ্যগুলি তো সব সেই উপতিস্‌স আর কোলিতের পেছু পেছু সমন গোতমের শাসনে যোগ দিয়েছে। এসব কি ঠিক ? ইনি তো দেখছি আমাদের গহে গহে বিচ্ছেদ ঘটাতে এসেছেন। সমাজে একটা ওলটপালট করে দিচ্ছেন। পতিরা পব্বজ্যা নিলে পত্নীরা তো একপ্রকার বিধবাই হবে। পুনর্বিবাহের অনুমতি দিলেও কি সবৎসা নারী আর বিবাহ করতে পারবে ? আর পুত্ত ? পুত্তরা যদি যায় ? কে-ই বা গহধম্ম করবে, কে-ই বা গহের অগ্নিরক্ষা করবে ? পুব্বপেতদের পিণ্ডদানই বা কে করবে ? বলুন ভদ্দ, বলুন ?'

কুলপুত্রটি উত্তেজিতভাবে চণকের দিকে চেয়ে রয়েছেন। চণক সুপ্তোত্থিতের মতো বলল, 'কী হয়েছে ?'

'কী হয়েছে ? আপনি জিজ্ঞাসা করছেন ?'

বোধিকুমার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'চণক ভদ্র বিদেশি, অল্পদিন হল তক্কশিলা থেকে এসেছেন। অত কথা জানেন না। চণক, মহারানি ক্ষেমা আজ বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করলেন। মহারাজ সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। বেলুবন উদ্যানে ভিক্ষুণীসংঘে চলে গেলেন রানি। মাথা মুড়িয়ে ফেলেছেন, অঙ্গে ত্রিচীবর, হাতে ভিক্ষাপাত্র। ভাবুন একবার ?'

'আপনি তক্কশিলা থেকে আসছেন ? বেদ-বেদাঙ্গ শিক্ষা শেষ করেছেন নিশ্চয় !' কুলপুত্রটি খানিকটা সম্ভ্রমে, খানিকটা কৌতূহলে বলে উঠলেন।

চণক মাথা নেড়ে সায় দিল।

'ব্রাহ্মণ ?'

আবারও মাথা নাড়ল চণক।

'আপনি হলেন গিয়ে উদীচ্য ব্রাহ্মণ। আপনিই ঠিক বুঝতে পারবেন আমাদের সমস্যাদি। সমন গোতম প্রথম রাজগৃহে আসার পর, অর্থাৎ কি না আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে লোকে তাঁর তিসরন নিতে ছুটল এমন নয়। সঞ্জয়ের ওই দুই শিষ্য উপতিস্‌স আর মৌদ্গাল্যায়ন কোলিত, যথেষ্ট বয়স্ক, বিদ্বান পণ্ডিত, তাঁদের গৌতম-শিষ্য অস্‌সজি ফট করে নিজেদের দলে টেনে নিল।'

অস্‌সজি নামটা শুনে উৎকর্ণ হয়েছিল চণক। সে জিজ্ঞাসা করল, 'অস্‌সজি কে ?'

'আরে সমন গোতমের ইসিপতনের শিষ্য। এঁদের পাঁচজনকে তো দিকে দিকে তাঁর সদ্ধর্ম প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন গোতম।'

'তিনি কীভাবে বিদ্বান পণ্ডিতদের...'

'কীভাবে আবার ! ইন্দ্রজাল ! এই অস্‌সজি যখন ভিক্ষায় বেরোন তাঁর চারদিকে মায়াজাল থাকে। দেখে অনেকেই মোহগ্রস্ত হয়। উপতিস্‌স নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কার কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে এমন প্রশান্তি লাভ করেছেন। অমনি ভিক্ষু অস্‌সজি তাকে সোজা পাঠিয়ে দিলেন সমন গোতমের কাছে। বাস, হয়ে গেল। অপর গুরুর শিষ্যদের এভাবে ভাঙিয়ে নেওয়া কি ঠিক ?'

চণক জিজ্ঞাসা করল, 'ত্রিশরণ কী ?'

'সমন গোতমের সদ্ধর্মের মূল মন্তর তো ওই তিসরন। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি। ধম্মং সরণং গচ্ছামি। সংঘং সরণং গচ্ছামি—এই তিন বাক্য বলে পব্বজ্যা নিতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধিকুমার বলল, 'কাশ্যপ ভ্রাতাদের কথাটাও একবার বলুন না ভদ্র রন্তিদেব।

রন্তিদেব নামে আর একটি কুলপুত্র বললেন, 'সে তো আরও কলঙ্কের ব্যাপার। আপনি সম্যক বুঝবেন। উরুবেলায় তিন কাশ্যপ ভ্রাতার আশ্রম ছিল। এঁরা জটিল পন্থের। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ। বহু শিষ্য। গৌতম এঁদেরও মোহগ্রস্ত করলেন। তিন ভাই— বেলা কাশ্যপ, নদী কাশ্যপ, গয়া কাশ্যপ অগ্নি জলে ফেলে দিয়ে সংঘে যোগ দিলেন। চিন্তা করুন! একজনও কি ভাবলেন না, কারুর অন্তত অগ্নিগৃহটি রক্ষা করা উচিত। আহ্বনীয় অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি এঁরা জলে ফেলে দিলেন কোন সাহসে? দেবতারা, পিতৃপুরুষরা কুপিত হবেন না?'

বোধিকুমার বলল, 'প্রথম যখন এঁদের সবাইকে নিয়ে শ্রমণ গৌতম রাজগৃহে এলেন, তখন সবাই ভেবেছিল এঁরাই গুরু। গৌতম-আদি তাঁর শিষ্য। এমনই খ্যাতি ওই কাশ্যপদের। তো এখন তো সব জটা-টটা ফেলে দিয়ে তুবরক সেজে বসে আছেন।'

রন্তিদেব বললেন, 'বেলট্ঠিপুত্ত তো ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। পারলে গোতমকে জ্যান্ত পোঁতেন।'

আর একজন বললেন, 'কিন্তু এইসব গোতমপন্থীদের ভয় বলে কিছু নেই।'

'ভয়' কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চণকের মাথার মধ্যে কোথায় যেন একটা কপাট শব্দ করে খুলে গেল। হঠাৎ সভার আলোচনাধ্বনি চলে গেল বহু দূরে। চণক দেখতে পেল গৃধ্রর মতো বক্রচঞ্চু এক গিরিশৃঙ্গ। নগ্ন। শস্যশ্যামল নয়। দিন শেষ হয়ে আসছে। অদূরে পশ্চিম দিকে মুখ করে তমালতরুর মতো কে একজন দাঁড়িয়ে। তরু না মানুষ? মানুষ না তরু? অস্তাচলে সূর্য অগ্নি বমন করছে: 'সংযত হও হে জ্ঞানী, ছিন্নমূল করো বাসনাকে, জন্মভয়, ব্যাধিভয়, জরাভয়, মৃত্যুভয় সমস্ত পার হয়ে বিমুক্ত হও। বিমুক্ত হও।' যেন তার কানের খুব কাছে মন্দ্রস্বরে কে আবৃত্তি করছে। তিনিই। সেই মানুষটিই। তাঁর কণ্ঠ মৃদু, অথচ তা সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে যাচ্ছে, ছাপিয়ে যাচ্ছে। আর কিছুই সে শুনতে পাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছে না। ঘরের মধ্যে কুলকুমারদের গোষ্ঠী? নেই। উজ্জ্বল মণিদীপের আলোয় কৃষ্ণবসনা সুন্দরী? নেই। চণক একলা দাঁড়িয়ে আছে আদীপ্ত অগ্নিবলয়ের মাঝখানে। অদূরে এক তমালতরু মাত্র সঙ্গী।

কতক্ষণ এভাবে সে ছিল কে জানে! যখন সচেতন হল, ঘরে বোধিকুমার আর শ্রীমতী ছাড়া আর কেউ নেই। বোধিকুমারের উদ্বিগ্ন মুখ তার চোখের সামনেই। তাকে তাকাতে দেখে বোধিকুমার বলল, 'কী হয়েছিল হঠাৎ চণক ভদ্র? আমরা তো ভিষক্ ডাকতে পাঠালাম। সভা ভেঙে গেল। সবাই যে যার গৃহে চলে গেল, ভিষক্ আনতে গেছে চন্দা, শ্রীমতীর প্রধানা দাসী।'

চণক বলল 'কিছু তো হয়নি। আসলে আমি... অর্থাৎ আমার স্মৃতি একটি বিশেষ দৃশ্যে, না বোধ হয় দৃশ্য নয়, অনুভূতি... কিংবা তাও নয়... নাঃ আমি শুধু শুধু আপনাদের বিরক্ত করছি।'

শ্রীমতী বোধিকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে তখনই বলেছিলাম ভদ্র বোধিকুমার, এ কোনও অসুখ নয়। অসুখে মানুষ এমন মেরুদণ্ড সোজা করে ধ্যানের ভঙ্গিতে বসে থাকতে পারে না। চোখের দৃষ্টি ওরূপ আবৃত হয় না। ওঁর হাতের ভঙ্গি দেখুন! আঙুলগুলি দেখুন! আমি বলছি বুদ্ধকথা শুনে উনি সোতাপন্ন হয়েছেন।' তার কণ্ঠে গভীর সম্ভ্রমের সুর।

চণক চকিত হয়ে বলল, 'সোতাপন্ন? স্রোতাপন্ন? সে কী ভদ্রে?'

এতক্ষণে শ্রীমতী পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটি সজল। সে বলল, 'আর্য, বুদ্ধের উপদেশবাণীর এমনই মহিমা যে সৎ ব্যক্তি শুনলেই হৃদয়ের মধ্যে কেমন সব ওলটপালট হয়ে যায়। জীবনের অসারতা সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায়। সদ্ধর্মের অন্তরে প্রবেশের এই প্রথম দুয়ার।'

'তুমি কোথা থেকে জানলে?' বোধিকুমার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

'আমার একটি দাস অনুচিত্ত, একদিন বেলুবনে গিয়েছিল। তথাগত বুদ্ধকে দেখে সে মুগ্ধ হয়। তারপর প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ছুটি চাইত। একদিন সকালে চন্দা এসে সংবাদ দিল, অনুচিত্ত নিজের ঘরে ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছে। আমি দেখতে গেলাম। ঠিক চণক ভদ্রের মতো।... অনুচিত্ত পব্বজ্জা নেওয়ার অনুমতি চাইল সকাতরে।'

বোধিকুমার বলল, 'তুমি দিলে?'

'না দিয়ে কেমন করে পারব ভদ্র?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘দেখো, ও হয়ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য একটা ভান করল।’

‘আপনি তো চণক ভদ্রর অবস্থা দেখলেন, ভান বলে মনে হল কী ?’

বোধিকুমার মাথা নেড়ে বলল, ‘চণকের কথা স্বতন্ত্র। তিনি উচ্চশিক্ষিত। উচ্চ পদে নিযুক্ত। উদীচ্যবংশজাত ব্রাহ্মণ।’

‘আমার দাসটি অশিক্ষিত, নীচ পদে নিযুক্ত, নীচ কুলজাত হলেও তারও এই একই ভাব আমি দেখেছি, একদম এক। বোধি ভদ্র আপনি যদি অনুগ্রহ করে গিয়ে ভিষক্‌কে আসতে নিষেধ করে আসেন বড় ভাল হয়। ভিষক সন্নতি বড় ক্রোধী। অকারণে আসতে হলে ক্ষিপ্ত হবেন। পরে প্রয়োজন হলে আর তাঁকে ডেকে পাবো না।’

বোধিকুমার একবার শ্রীমতীর দিকে তাকাল। আর একবার চণকের দিকে। তার পরে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় প্রাঙ্গণের বাঁক ফিরতে ফিরতে বলে গেল, ‘আমি আর তাহলে আজকে ফিরছি না শ্রীমতী, তুমিই চণক ভদ্রকে গৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।’

চণক চুপচাপ বসে। শ্রীমতী তার সামনে। সে-ও চুপ। কিছুক্ষণ পর সে ধীরে ধীরে তার বীণাটি তুলে নিল। মুরলী নেই, মুরজ নেই, পটহ-মন্দিরা কিছুই নেই। শ্রীমতীর আঙুলগুলি লঘু স্পর্শে সঞ্জীবিত করে যাচ্ছে শুধু বীণার তারগুলিকে। প্রথমে সুরগুলি শুধু লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ায় শ্রীমণ্ডপের কোণে কোণে। কখনও অনুরণন মাত্র রেখে চুপ করে যায়। তার পর ক্রমশই তারা ধীর থেকে দ্রুত, মন্দ্র থেকে তীক্ষ্ণ, গম্ভীর থেকে করুণ হয়ে উঠতে লাগল। বাদিকা যেন অনেকগুলি পথের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এখন পথ খুঁজে পেয়েছে। বহুক্ষণ পরে একজন দাসী চন্দনকাঠের ফলকে আহার্য নিয়ে এলো। আর একজন রুপোর ভৃঙ্গারে জল। মুখ হাত ধোবার পাত্র। চণক বিনা বাক্যব্যয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিল। ফলকের ওপর রুপোর থালায় নানাপ্রকার ফল, ক্ষীরমণ্ড, দুধ। আজ পূর্ণিমা। শ্রীমতী উপোসথ পালন করে। চণকের বর্তমান অবস্থায় সে তার ফলাহারই প্রশস্ত মনে করেছে।

খাদ্যে হাত দিতে গিয়ে হঠাৎ চণক হাত গুটিয়ে নিল। ‘তোমার আহার্যও আনতে বলো ভদ্রে !’

শ্রীমতী একবার ইতস্তত করল। কুলস্ত্রীরা পুরুষদের পরেই খায়, নইলে পাপস্পর্শ করে সে শুনেছে। কিন্তু সে তো কুলস্ত্রী নয়। মৎস্য-মাংস থেকে মদ্যপানেও তো সে পুরুষকে সঙ্গ দিয়ে থাকে। তার ইঙ্গিতে দাসী তার জন্যও একটি থালি নিয়ে এলো। দু'জনের আহার শেষ হলে শ্রীমতী মুখ নিচু করে বলল, ‘শিবিকা প্রস্তুত আছে। ভদ্র এখন গৃহে ফিরে যেতে পারেন। সঙ্গে আমার দাসেরা যাবে। তাঁর অশ্বটিকেও তারা পৌঁছে দেবে।’

চণক ধীরে ধীরে বলল, ‘আজ যদি শ্রীমতীর গৃহেই থাকি !’

‘সে কী ?’ শ্রীমতী চমকে মুখ তুলে তাকাল। আজ তার উপোসথের দিন। সে বারবধূ হতে পারে তবু উপোসথের সংযম পালন করছে আজকাল।

চণক বলল, ‘আজ চণক শ্রীমতীর কাছে প্রার্থী। সে কি ফিরে যাবে ?’ তার দৃষ্টিতে এখনও স্বাভাবিকতা ফিরে আসেনি। কথাগুলি সে যেন যন্ত্রের মতো বলল।

‘ভদ্র, আপনাকে যে তথাগত বুদ্ধ স্মরণ করেছেন ! শুধু বুদ্ধ-প্রসঙ্গ শুনেই যিনি সোতাপন্ন হন তিনি অতি উচ্চমার্গের মানুষ। তাঁকে বিপথগামী করলে মহাপাপ হবে আমার।’

চণক ধীরে ধীরে বলল, ‘কী পথ, আর কী বিপথ আমাকে আগে নিজ চেষ্টায় জানতে হবে যে শ্রীমতী ! তথাগত বুদ্ধ আমাকে স্মরণ করেছেন কি না জানি না, স্রোতাপন্ন হয়েছি কি না তাও জানি না। তবে শুধু বুদ্ধ-প্রসঙ্গ শুনেই আমার ভাবান্তর হয়নি। গৃধ্রকূট শিরে আজ শ্রমণ অস্‌সজির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি অপূর্ব ভঙ্গিতে আমাকে আদিত্তপরিয়ায় সুত্ত শোনালেন। ওই সুত্ত নাকি তাঁরা গয়াশিরে স্বয়ং শ্রমণ গোতমের কাছে শুনেছিলেন। তার পর থেকেই আমার ভেতরটা কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু শ্রমণ অস্‌সজির উচ্চারণের মহিমা বা তথাগতর বাণীর কাব্যসৌন্দর্য মানলেও, অস্তাচলের যে অরুণবর্ণ দীপ্ত আকাশ দেখে ওই সুত্ত শ্রমণ আমায় শোনালেন, সেই পশ্চিমাকাশের অস্তরাগকেও আমি সৌন্দর্যে কিছুমাত্র ন্যূন দেখি না। বস্তুত এই পৃথিবী, এই ভূমি, ওই আকাশ, উষাকাল, গোধূলি, সন্ধ্যারাত্রি, এই সবই আমায় প্রতিনিয়ত গভীরভাবে মুগ্ধ করছে। এগুলির কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও অর্থই নেই ? কোনও মূল্যই নেই ?’ চণক যেন হাহাকার করে উঠল, ‘শ্রীমতী’, সে বলল, ‘আমাকে এই অনভিপ্রেত স্তব্ধতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও। ওই সূত্রের মোহজাল ছিন্ন করো। ছিন্ন করো।’ দেহযন্ত্রের ভেতর থেকে যেন তার আর্তস্বর এতক্ষণে বেরিয়ে এলো।

তখন শ্রীমতী উজ্জ্বল শ্যামলবরণ একটি ছোট্ট পক্ষিশাবকের মতো উড়ে এসে চণকের বিস্তৃত বক্ষপটে আশ্রয় নিল। তার রক্তবর্ণ উত্তরীয়টি মাটিতে লুটোতে লাগল। তার বসনের সোনার কুসুমগুলি দীপালোকে চমকে চমকে উঠতে লাগল। তার প্রধানা পরিচারিকা চন্দা তাদের সুবাসিত শয়নকক্ষে নিয়ে গেল। যূথী মালিকার গন্ধে, চন্দনচূর্ণের গন্ধে ঘরটির অভ্যন্তর যেন তুষিত স্বর্গতুল্য বোধ হতে লাগল। চণক বলল, ‘শ্রীমতী তোমার বক্ষের পুষ্পস্তবক এই কি সদ্য প্রস্ফুটিত হল ? তুমি কোন আকাশের পূর্ণিমা যেখানে এমন যুগল চাঁদের উদয় হয় ! এই উদর, এই শ্রোণী কি রক্তমাংসের ? এ যে সুখস্পর্শে ফুলের পাপড়িকেও হার মানায় ! ওষ্ঠাধরে কি মধুভাণ্ড লুকিয়ে রেখেছ প্রিয়ে !’ বলে সে পরম সমাদরে শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করে তার ওষ্ঠাধরে যেন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। রাত যত বাড়ে তার বিস্ময় তত তীব্র, চুম্বন তত আগ্রাসী, আলিঙ্গন ততই গাঢ় হয়ে ওঠে। সে যেন চুম্বন দিয়ে এই রমণীর সমস্ত অঙ্গ অভিষিক্ত করতে চায়। মাঝে মাঝে মুখ তুলে সে তদগত হয়ে বলে, ‘কী অপরূপ এই পৃথিবীর দিনগুলি, ওই আকাশ থেকে নামা ত্রিযামা রজনী, এই নারী ! কোথা থেকে এত সৌন্দর্য তুমি পেলে নারী !’

শ্রীমতী মৃদু মধুর কণ্ঠে বলল, ‘নারী যদি সুন্দর হয়, তবে পুরুষ তুমি সুন্দরতর। কী বিস্ময় এই উন্নত শালতরুর মতো আকারে, মণিময় ফলকের মতো এই বক্ষপটে, ন্যগ্রোধকাণ্ডের মতো এই বলশালী রুক্ষ জঙ্ঘায়। দেবতাদের এক আশ্চর্য সৃষ্টি তুমি পুরুষ। আমি কখনও শক্রদেবকে দেখিনি, দেখিনি বরুণ, অগ্নি বা ঈশানকে। কিন্তু তোমাকে দেখে যেন মনে হয় দেখেছি। দেখেছি। জেনেছি।’

যৌবনরহস্যের অনির্বচনীয় আনন্দের তরঙ্গভঙ্গে ফেনায়িত হতে লাগল কাত্যায়ন চণক। এ-ও এক আদীপ্ত অগ্নিসম অনুভূতি। আদীপ্ত অঙ্গগুলি, আদীপ্ত রক্তস্রোত, আদীপ্ত হৃদয়, মস্তিষ্ক, চিন্তাস্রোত। কিন্তু হুতাশনে সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে না তো ! উত্থিত হচ্ছে না তো জন্মভয়, জরাভয়, মৃত্যুভয় ! বরং তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে সব। মৃত্যু এলে বুঝি মনে হবে এক দিন, অন্তত এক দিনও বড় দীপ্ত বাঁচা বেঁচেছিলাম ! তার জন্য জরার মূল্য কি দেওয়া যায় না ? এই আদীপ্ত প্রভাময় আনন্দের জন্য বারবার বহুবার সহস্রবার লক্ষবার তুমি দেবরাতপুত্র কাত্যায়ন চণককে জগতে পাঠিও হে ঈশ।

AMARBOI.COM

১৩

রাতের দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হয়েছে। স্তব্ধ নগরীর ওপর দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। অলৌকিক আলোয় নগরী যেন আর এ পৃথিবীর নগরী নেই। নাগরিকদের যাতায়াত নেই। পশুগুলি যে-যার বেষ্টনীতে শব্দ করছে না। নিশাচর পাখিগুলিও আজ বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন কি দক্ষিণ বনপ্রান্ত থেকে মাঝে মাঝেই যে শৃগালের কি তরক্ষুর তীক্ষ্ণ ডাক ভেসে আসে, তাও বুঝি শোনা যাচ্ছে না। বেণুবনের সৌন্দর্য এমনিতেই অপরিসীম। আজ এই পূর্ণিমা রাতে তা অলৌকিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিংশুক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট শ্রমণা তা দেখছেন না। তাঁর চোখ দুটি মুদিত। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত। পরিধানে ত্রিচীবর—অন্তর্বাসক, উত্তরাসঙ্গ (বহির্বাস), সংঘাটি বা পাঁচ হাত লম্বা চার হাত চওড়া একটি দোপাট্টা কাপড়। তা ছাড়াও ভেতরে তিনি পরে আছেন সংকচ্ছিকম বা বক্ষাচ্ছাদনী। যা সংঘের সবাইকার সাধারণ সম্পত্তি, সেই খবন পাবুরন বা পুরো শরীর ঢাকা বস্ত্রও তাঁকে একটি স্বতন্ত্র দেওয়া হয়েছে। শ্মশানে পরিত্যক্ত বস্ত্রস্তূপ থেকে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ড নিজেই সেলাই করে চীবর পরিধানই বিধেয়। কিন্তু এই শ্রমণার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুণীসংঘে বহুবিধ চীবরবস্ত্র এসেছে। তিনি আচার্যার কাছ থেকে কোসেয্য বা রেশমী চীবর পেয়েছেন। গাঢ় গৈরিক, প্রায় রক্তবর্ণ সেই চীবরবস্ত্রের মধ্য থেকে শুধু তাঁর গলিত সোনার বর্ণের মুখমণ্ডল ফুটে রয়েছে। তাঁর আচার্যা ছিলেন স্বয়ং দেবী মহাপ্রজাবতী। মুণ্ডিত মস্তকে, গৈরিক বস্ত্রে তিনি তিনবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনীতভাবে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। আচার্যা তাঁর নাম, বয়স, তিনি স্বামীর অনুমতি পেয়েছেন কি না ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। উত্তরে সন্তুষ্ট হবার পর তিনবার ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হল। তিনবার দশশীল মন্ত্র পাঠ করালেন থেরী মহাপ্রজাবতী। প্রাণিবধ করবে না, অদত্তাদান গ্রহণ করবে না, অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকবে, মিথ্যা কথা বলবে না। সুরাপান করবে না। বিকাল ভোজন করবে না। নৃত্য-গীত-বাদন থেকে বিরত থাকবে। মাল্য-গন্ধ-বিলেপন, ভূষণধারণ থেকে বিরত থাকবে, সুখশয্যা গ্রহণ করবে না। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি গ্রহণ করবে না। সেই সঙ্গে চারটি বিষয়ে সতর্ক হবার নির্দেশ দিলেন আচার্যা। চীবর, পিণ্ডপাত অর্থাৎ ভিক্ষার অন্ন, শয়নাসন বা বাসস্থান এবং ভৈষয্য বা ঔষধ। হরীতকী এবং গোমূত্র দ্বারা প্রস্তুত ঔষধই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পক্ষে সেবনীয়। প্রত্যেকটি কর্ম অর্থাৎ চীবর পরবার সময়ে, ভিক্ষান্ন গ্রহণ করবার সময়ে, শয়ন-স্থান নির্বাচন করবার সময়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে—চীবরটি নিয়মমতো সংগ্রহ করা হয়েছে তো ? এই ভিক্ষান্নে লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি তো ? ভোজন শুধু শরীররক্ষার জন্য। শয়নস্থান নির্বাচনেও বিবেক ও নির্বেদের পরিচয় দিতে হবে। সবই শুনে গেছেন, বলে গেছেন শ্রমণা। কিন্তু স্বয়ং দেবী মহাপ্রজাবতী যখন প্রসন্ন পূর্ণচন্দ্রের মতো স্মিত মুখে তাঁকে 'এহি ভিক্ষুণী', বলে আহ্বান করলেন তখন থেকেই শ্রমণা ধ্যানস্তিমিত হয়ে রয়েছেন। এই ধ্যান কিন্তু ঠিক উর্ধ্বলোকে, কোনও উচ্চ অনুভূতিতে হারিয়ে যাওয়া নয়। শ্রমণা চিত্তের গহনে স্থির হয়ে জানবার চেষ্টা করছেন সুখ কী ? দুঃখের কী স্বরূপ ? জরা কেন ? কী ও কেন ? মনে মনে নিজেই সহস্র প্রশ্ন করছেন, সহস্রবার উত্তর দিচ্ছেন নিজেই। কর্মফল ভোগ করবার জন্যই তো মানুষ জন্ম নেয়। যে কর্ম থেকে ক্ষত্রিয়ানী, রাজ্ঞী জন্মায় সে নিশ্চয় সুকর্ম। আবার যে কর্ম থেকে দুঃখী রাজ্ঞী জন্মায় তা কি কখনও সৎকর্ম হতে পারে ? সুখী চণ্ডালিনীর অতীত কর্ম সুন্দর না দুঃখী রাজ্ঞীর অতীত কর্ম সুন্দর ? চণ্ডালী জাতিতে হীন, সমাজে অনাদৃত, ব্রাহ্মণরা হয়ত তার ছায়া মাড়াবেন না। তাকে অধোবাতে অর্থাৎ তাঁর দিক থেকে যে বাতাস বইছে সেইটে ধরে যেতে বলবেন। এই চণ্ডালিনী হয়ত শবদাহিকা। কিংবা শবদাহের কাজে স্বামীকে সাহায্য করে। কিন্তু অন্য সময় সে যখন পরিষ্কার বসন পরে, হাতে পায়ে গলায় নানা প্রকার পিতলের গহনা পরে, মাথায় রক্তকুসুম, গলায় গন্ধপুষ্পের মালা পরে, পরিষ্কৃত, বীরপুরুষের মতো শোভন তার স্বামীর পাশে হয়ে রাজমার্গের একধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখে, সে যে চণ্ডালিনী তা দেখে বোঝা যায় না। হতে পারে কারও বাড়ির ভৃতিকা, কি ক্রীতদাসী, হতে পারে স্বাধীন কোনও পর্ণিকা। সে নিজে বলে উঠল, তাই তিনি জানতে পারলেন !

'ওমা, ওমা, অমন রুপুসী রানি, কিসের দুঃখু গা যে অমন করে মাথা মুড়িয়ে সন্নিসি হতে চলল ? আমি তো চাঁড়ালের ঘরে জন্মেছি। কই বাপু আমার তো অত দুঃখু নেই। বলো গো !' বলে সে তার চণ্ডাল স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকাল, তার স্বামী তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে দূরে সরে গেল।

বেণুবন থেকে আধ ক্রোশ মতো দূরে স্বর্ণমণ্ডিত শিবিকা থেকে নেমে পদব্রজে তিনি যাচ্ছিলেন। দু'ধারে দাঁড়িয়ে দলে দলে নগরবাসী। কেউ জয়ধ্বনি দিচ্ছে, কেউ পুষ্পবৃষ্টি করছে, কেউ উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছছে, কেউ হাত জোড় করে নমস্কার করছে। তাঁর মনে হচ্ছিল রাজমার্গ নয় তিনি মহামার্গ দিয়ে চলেছেন। মহাজন মার্গ দিয়ে চলবার অধিকার তারাই পায় যারা নিজেরাও মহাজন। একটা গভীর প্রসন্নতায়, শান্ত গৌরববোধে সমাহিত থেকে তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলছিলেন। এমন সময় তীব্র বেসুর বেজে উঠল নিস্তব্ধ রাজপথে—'কিসের দুঃখু গা ওর, যে অমন করে মাথা মুড়িয়ে সন্নিসি হতে চলল !' মেয়েটি কি তাঁর মুখের প্রসন্নতা, গতিভঙ্গির শান্ত, দৃঢ় সংকল্প— কিছু দেখতে পায়নি ! সে কি তাঁর প্রসন্নতাটাকে ছদ্ম আবরণ মনে করেছিল ? তাই এক টানে তাকে খুলে ফেলে তাঁর মর্মস্থলে তার অনার্য-দৃষ্টি, অ-সভ্য, অকপট দৃষ্টি বিঁধিয়ে দিল !

তাই তিনি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বেণুবনে রাত্রির দ্বিতীয় যামে কিংশুক বৃক্ষচ্ছায়ে বসে মুদিত নয়নে ভাবছেন কী সেই জটিল কর্মতত্ত্ব। কবে এসব দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা তিনি করতে পারবেন। তথাগত কবে তাঁকে উপসম্পদা দেবেন ? কবে তিনি সকৃদাগামী মার্গে প্রবেশ করবেন ? ভবচক্রে আবার না ফেরার সাধনার চেয়েও বেশি তাঁর কাছে ভবচক্রের কারণ জানা, কর্মফলের মর্মোদ্ধার করা। বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জটিল গণিত। এই দুরূহ অঙ্ক তাঁকে কষে বের করতে হবে। ইতিমধ্যে সংঘের অন্যান্য শ্রমণারা চেয়ে থাক তাঁর দিকে অবাক চোখে। ফিসফিস করে বলাবলি করুক, 'প্রথম দিনেই ইনি যে দেখি ধ্যানের মধ্যে ডুবে কোথায় হারিয়ে গেছেন! রাজরানি! কোমল সাত স্তর শয্যা ছাড়া শোননি কোনওদিন! দেখো কঠিন মৃৎ-বেদীতে কেমন নিরুদ্বিগ্ন বসে আছেন। আহা সংঘাটিটি বিছিয়েও বসেননি!'

'সত্যি! আচ্ছা আজ তো রাজবাড়ি থেকে ভিক্ষা এসেছে। কাল? কাল উনি কী করে ভিক্ষায় বার হবেন? এই নগরীতেই তো রানি ছিলেন! সোনার শিবিকায় অশ্বারোহিণী রক্ষিণী নিয়ে বেরোতেন!' একজন ভাবকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'দ্যাখো ধ্যান থেকে চট করে ওঠেন কি না! উঠলে তো ভিক্ষায় বেরোবেন! দেখে তো মনে হচ্ছে ইনি তথাগতর মতো সেই মহা সঙ্কল্প করেছেন:

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

'দুর্লভ বোধিজ্ঞান না লাভ করে ইনি যদি উঠতে না চান! সত্যি সত্যি যদি ত্বক অস্থি মাংস সব শুকিয়ে খসে পড়ে যেতে থাকে, আমরা কী করব?'

থেরী চিত্তা বেরিয়ে এসেছেন। 'তোমরা ভিক্ষুণীরা এত রাত্রে এত কী বকবক করছ? হয় ধ্যান করো, নয় নিদ্রা যাও।'

'না, না, সমনা খেমার কথা বলছিলাম, ভাবছিলাম।'

'সমনা খেমার কথা বলতে হবে না, ভাবতেও হবে না, নিজেদের কর্মস্থানগুলি নিয়ে চিন্তা করো। যাও, যাও বলছি!' থেরীর কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর।

যামভেরীর শব্দে মহিষী কোশলদেবীর ঘুম ভাঙল। আজ সারা দিন নানা কাজকর্মে গেছে। পোষধের দিন। এমনিতেই অল্প কথা বলেন, বসন-ভূষণের অতিরিক্ত পারিপাট্য ত্যাগ, গন্ধদ্রব্য, অনুলেপন, মাল্য এসব থেকে বিরত হয়ে নির্জনে চিন্তা করা, ধ্যান করা, এই তাঁর অভ্যাস। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, শুক্লাষ্টমী ও কৃষ্ণাষ্টমীতে পোষধ পালন করেন তিনি। কিন্তু মহাদেবী ক্ষেমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ উপলক্ষ্যে বহুবিধ দান, দরিদ্র-ভোজন, তারপর বুদ্ধসংঘে বহুপ্রকার উপহার যেমন চীবরের জন্য বস্ত্রাদি, আসন্ন শীতের জন্য বিশেষ করে রক্তকম্বল, শুষ্ক খাদ্য নানাপ্রকার, নবনীত, তৈল, ঘৃতাদি, ঔষধের জন্য বহু তাম্র পাত্র, ভেষজ পাঠানো হল। স্বয়ং কোশলদেবীকে উপস্থিত থেকে সব কিছু করাতে হয়েছে। দেবী ক্ষেমা তাঁর সপত্নী হলেও তাঁর বিরহে তিনি একেবারে ম্লান হয়ে গেছেন। সুখদুঃখের কথা বলবার মানুষ রাজপুরীতে কই! ক্ষেমা ছিল, যদিও সে অল্প কথা বলত, নিজের প্রাসাদে নিজের গৃহপালিত বিড়াল, ময়ূর-ময়ূরী, শুক-সারী নিয়েই থাকতে ভালোবাসত, তবু তার সঙ্গে কোশলদেবীর অন্তরের যোগাযোগ ছিল। আর কারও সঙ্গে তেমনটা নেই। তাই দেবী ক্ষেমার প্রব্রজ্য গ্রহণের উৎসব হিসেবে যা যা করণীয় তিনি নিজের হাতে বা নিজের তত্ত্বাবধানে করে গেছেন। যতক্ষণ দেবী রাজপুরীতে ছিলেন ততক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। মনের গভীর আবেগে, সংসার-বিরাগে দেবী ক্ষেমা নিজেই নিজের কেশ অর্ধেক কেটে ফেলেছিলেন। নহাপিতনীকে দিয়ে সুন্দর করে চেঁছে পরিষ্কার করে দিতে হল, কী দীর্ঘ, অপূর্ব কৃষ্ণ কেশদাম, সে একবার ফিরেও দেখল না, সহচরীরা সেই কেশ নিয়ে নিল। যারা অল্পকেশ তাদের জন্য নাকি কবরী প্রস্তুত করবে। একটি গৈরিক পাটের বস্ত্র পরে সে এখান থেকে গেল। কোনও প্রয়োজন ছিল না। সংঘে গিয়েই মস্তক মুণ্ডন করতে পারত। সেখানে আচার্যার কাছ থেকে তিনি যেমন দেবেন তেমনই চীবর তো গ্রহণ করতেই হবে। চীবর, কায়বন্ধ, বাসি বা ছোট ক্ষুর, সূচ ও পরিস্রাবণ। কিন্তু ক্ষেমা রাজপুরীতেই কেশ ফেলে দিল, অলঙ্কারগুলি সবাইকে বিলিয়ে দিল, শ্বেত কাসিক বস্ত্রে সোনার ফুল ছিল, সে বস্ত্রও পরিত্যাগ করল। তার কাষায়বাসিনী, মুণ্ডিতকেশা, প্রব্রাজিকা মূর্তি সে কি রাজপুরীর সবাইকে দেখিয়ে যেতে চেয়েছিল! নাকি রাজ্ঞীর বেশ ত্যাগ করতে তার আর বিলম্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সইছিল না !

পোষধে সর্ববিধ সংযম পালনীয়। কিন্তু মহারাজ বিম্বিসার যখন রাত্রি হতে না-হতেই কোশলদেবীর গৃহে প্রবেশ করলেন, তিনি পোষধের কথা মনে করিয়ে দিতে পারেননি। মায়া হয়েছিল। সারাক্ষণ, যতক্ষণ তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সকালে ব্যায়াম ও স্নানান্তে সভায় যাওয়া, সেখান থেকে ফিরে দ্বিতীয়বার বেশ পরিবর্তন করে দরিদ্র-ভোজনাদির তত্ত্বাবধান করা, দানযজ্ঞ সমাপন করা, মহাদেবীকে শিবিকায় তুলে দিয়ে তাঁর অনুগমন করা, সারাক্ষণই তাঁর মুখে হাসি ছিল। মহারাজের হাসি বহু প্রকার। কোশলদেবী অল্প বয়স থেকে দেখে আসছেন, তিনি চেনেন সব হাসিগুলি। রাজার মুখে হাসি ছিল, উল্লাস ছিল না। ওষ্ঠাধর হাসছিল, চোখ দুটি ছিল ভাবহীন। কর্মচঞ্চলতা প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর হাবে-ভাবে। কিন্তু রাত্রিতে সায়মাশ সমাধা করলেন যখন, প্রায় কিছুই স্পর্শ করলেন না। তারপর তাঁর কিছু নিভৃত রাজকার্য ছিল, কূটকক্ষে গেলেন। কোশলদেবীও নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন, আজ পল্যঙ্কে শয়ন করবেন না, মেঝের ওপর স্থূল কম্বলশয্যা প্রস্তুত করে দিয়ে গেছে দাসীরা। এমন সময়ে মহারাজ প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখের ওপরের ত্বকটি, যা সর্বসাধারণের জন্যে, সেটিকে যেন তিনি ফেলে রেখে এসেছেন, মুখ কালিবর্ণ। ওষ্ঠাধরে হাসির লেশও নেই। বললেন, 'দেবী, আজ আমি তোমার গৃহেই রাত কাটাব।' তিনি লক্ষ করেননি হর্ম্যতলে সংযমীর শয্যা বিছানো।

'নিশ্চয় মহারাজ', কোশলদেবী তাঁকে হাত ধরে নিয়ে এলেন। পল্যঙ্কে বসিয়ে সুবাসিত জলে মুছিয়ে দিলেন পা দুটি। দাসীদের আসতে নিষেধ করলেন। মহারাজের শয়নবস্ত্র এনে দিলেন। পরতে সাহায্য করলেন। এবং দীপের আলো আরও কমিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে তুলে ফেললেন নিজের সংযমশয্যা।

মহারাজ নিশ্চয় খুব ক্লান্ত ছিলেন। শোয়া মাত্রই ঘুমে তলিয়ে গেলেন। একটি হাত বুকের ওপর ছিল, কোশলদেবী সেটি নামিয়ে রাখলেন। শান্তভাবে শুয়ে রয়েছেন মহারাজ। প্রকৃতই ঘুমোচ্ছেন, না জেগে স্তব্ধ হয়ে আছেন বোঝা যাচ্ছে না। মৃদু দীপ জ্বলতে লাগলো, কোশলদেবী ধীরে ধীরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

এখন যামভেরীর শব্দে ঘুম ভেঙে মনে হল সমস্ত ঘরটা যেন হা-হা করছে। প্রশস্ত শয্যার অপরপ্রান্তে তো রাজা নেই ! মৃদু দীপ মৃদুতর হয়ে গেছে। ঘরে বড় বড় ছায়া। কী এক অমঙ্গল আশঙ্কায় কোশলকুমারী উঠে বসলেন। হাত জোড় করে নমস্কার করলেন ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অশ্বিনীদ্বয়, যম, ঈশান এবং সবশেষে তথাগত বুদ্ধকে। 'রক্ষা করো, রক্ষা করো', মৃদুকণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন, তারপর একটি উত্তরীয়ে মাথা ও শরীর ঢেকে বেরোলেন। প্রতিহারীরা দাঁড়িয়ে আছে। মহাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ কোথায় ?'

'বোধ হয় উদ্যানে দেবী !'

'বোধ হয় ! বোধ হয় কেন ! সঙ্গে যাওনি !'

সন্ত্রস্ত হয়ে একজন বলল, 'সঙ্গে আসতে নিষেধ করলেন।'

সোপানশ্রেণী বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেলেন কোশলকুমারী। স্থানে স্থানে প্রতিহারীরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোচ্ছে। যারা জেগে আছে তারা তাঁকে অভিবাদন করল। কেউ কেউ সঙ্গে যেতে চাইল। হাত তুলে নিষেধ করলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে কক্ষা থেকে কক্ষান্তর পার হয়ে এসে পৌঁছলেন অন্তঃপুরের বিশাল উদ্যানে। অদূরে জ্বলছে মালার মতো দীপগুলি। মাঝে মাঝে কয়েকটি নিবে গেছে। বহুক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি যতবার নিবে যায় ততবার জ্বালিয়ে দেয় একজন উদ্যান-দীপরক্ষক। কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে নিশ্চয়ই আর অতটা সতর্ক থাকে না। ওটি একটি স্তূপ। প্রথম সম্যক সম্বুদ্ধ হয়ে যখন গৌতম রাজগৃহে আসেন, তিনি কলণ্ডক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে মহারাজ তাঁর পায়ের একটি নখের কাটা অংশ চেয়ে নিয়েছিলেন। অন্তঃপুরের উদ্যানে তারই ওপর চৈত্য রচনা হয়েছে। অনাড়ম্বর একটি স্তূপ। কিন্তু প্রতিদিন দুবার তাকে বন্দনা করা হয়। প্রত্যূষে মাল্য-চন্দন দিয়ে। সন্ধ্যায় মাল্য-চন্দন এবং দীপ দিয়ে। অন্তঃপুরিকারা অনেকেই এই অর্চনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। দূর থেকে, ওপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কক্ষের বাতায়ন থেকে এই দীপমালা দেখতে পান তিনি। মনের ভেতরেও একটি মণিদীপ যেন জ্বলে ওঠে। আজ সেই স্তূপের পাশে একটি ছায়া দেখলেন। মহারাজ গভীর রাতে একাকী এসে স্তূপের সামনে বসে রয়েছেন। তিনি কি ধ্যানমগ্ন! মহিষী সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন। না। রাজার চোখ খোলা। তাঁর চোখে কি অশ্রুবিন্দু নাকি! সর্বনাশ! না, না। দীপালোক পড়ে চোখ চকচক করছে।

মৃদুস্বরে ডাকলেন তিনি, 'মহারাজ!'

'এসো রানি' মৃদুতর স্বরে বললেন বিম্বিসার।

পাশে বসে পড়ে দু'হাত ধরে কোশলদেবী বললেন, 'এত রাত্রে! স্তূপে একা! মহারাজ, আপনিও কি সংঘে প্রবেশ করবেন না কি?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিম্বিসার বললেন, 'আমি পাপী রানি, আমার সাধ্য কি সংঘে প্রবেশ করি!'

'কে বলেছে আপনি পাপী?'

'রাজাকে তো সে কথা কেউ বলে না, তাকে নিজের হৃদয় দিয়ে জানতে হয় মহাদেবি। কত অসংযম সারা জীবন ধরে, কী অনর্থক ব্যসন, অসামান্য প্রাচুর্য, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, বহু মানুষের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করা, আমার পাপের কথা তো বলে শেষ করা যায় না!'

'যুদ্ধ করে অঙ্গরাজ্য জয় করেছেন, ক্ষত্রিয়জনোচিত কর্ম করেছেন। এর মধ্যে পাপের কী হল! যাকে ব্যসন বলছেন, প্রাচুর্য বলছেন, তা রাজার জীবনের অঙ্গ, না থাকলে কেউ সম্মান দেবে না। কর্তৃত্বের অধিকার দেবে না মহারাজ। শ্রমণের যেমন ত্রিচীবর, বেদপন্থী সন্ন্যাসীদের যেমন জটা, অরণ্যের যেমন বৃক্ষ, শূন্যের যেমন নীলাম্বর, রাজারও তেমনি প্রাসাদ, রথ, হাতি, ঘোড়া, সোনা, রূপা, মণিমাণিক্য...'

কোশলদেবীর কথা শেষ হল না। বিম্বিসার বলে উঠলেন, 'রানি, তুমি তো জানো আমি কত অসংযমী। অম্বপালীর রূপগুণের খ্যাতি শুনে প্রতিচ্ছন্ন বেশে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাকে ভালোবেসেছিলাম, সে আমাকে অনুনয় করেছিল নগরবধূর জীবন থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে, আমি করিনি, লিচ্ছবিদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে জেনে পালিয়ে আসি, আমি কাপুরুষ রানি!'

'বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তো আপনি ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বলি দিয়েছেন মহারাজ, আপনি তো বরং সে জন্য বরণীয়, প্রশংসার্হ। একটু আগেই লোকক্ষয়ের কথা বলছিলেন। আপনার আত্মসুখের জন্য যদি যুদ্ধ লাগত, লোকক্ষয় হত সেটাই তো হত অন্যায়, আর অন্যায় থেকেই তো পাপ!'

'কিন্তু অম্বপালী যে পড়ে রইল সেই পাঁকের মধ্যে!'

'আপনি তো তাকে পাঁকের মধ্যে ফেলেননি মহারাজ! তার ভাগ্য। তার ভাগ্যই তাকে ওই পথে নিয়ে গেছে। আর গণের আজ্ঞায় সে যদি বহুচারিণী হয়, বহুর সেবা করে, সে-ও তো একপ্রকার পুণ্যই!' কোশলদেবীর কণ্ঠস্বর যেন রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

'পুণ্য! তুমি রাজকুলবধূ হয়ে এই কথা বলছ রানি?'

মহারানি কি একটু অপ্রতিভ হলেন! শেষ যামের অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না। কিন্তু একটু পরেই বললেন, 'কেন বলবো না মহারাজ? আপনি অম্বপালীর জীবনের অন্ধকার দিকটার কথা ভাবছেন, আমি ভাবছি আলোর দিকের কথা। চৌষট্টিকলায় সে পারঙ্গমা, লিচ্ছবিরা সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ আচার্য রেখে তাকে পৃথিবীর বিদুষীদের অন্যতম করে তুলেছে, সেই সঙ্গে নৃত্য-গীত-বাদ্য-কাব্যে সে অতুলনীয়। কত বিদ্বান, পণ্ডিত, কবি, কত বুদ্ধিমান, রুচিমান মানুষের সঙ্গে তার জানাশোনা, কত জনের ভালোবাসা, অধিক কি মহারাজ আপনার মতো মানুষের ভালোবাসাও তো সে পেয়েছে! এগুলি কি সৌভাগ্য নয়! আমি আর দেবী ক্ষেমা তো অনেক সময়ে ধনঞ্জয়পত্নীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতাম!'

'মহিষী, একটা কথার উত্তর দেবে?'

'যদি জানা থাকে তো নিশ্চয়ই দেবো মহারাজ?'

'দেবী ক্ষেমাকে কি আমি কোনওভাবে অবহেলা করেছি! সেই জন্যেই কি তিনি...'

'হাসালেন মহারাজ! নিজেকে এত বড় ভাববেন না। আপনার অবহেলায় প্রব্রজ্যা নেবে কোনও

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমণী ! তাহলে তো অনেকেরই প্রব্রজ্যা নেওয়ার কথা ! শুনুন —বৈরাগ্য একটা দুর্লভ সম্পদ, কোনও দুঃখ থেকে যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় আমি তার কথা বলছি না। বলছি, আত্মজ্ঞান লাভ করবার তীব্র ইচ্ছা থেকে যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় তার কথা। দেখলেন না, ক্ষেমা নির্মমভাবে নিজের অত গর্বের কেশদাম কেটে ফেলল, অত আদরের অলঙ্কার, বস্ত্র সব দাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিল ! তিন দিন ধরে যে দানযজ্ঞ হল, তার বেশির ভাগই তো ক্ষেমার ত্যক্তবস্তু দান ! এসব কিছুই ভালো লাগছিল না তার। সে জ্ঞানলাভ করতে চায়। কারও দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করে সে চলে গেল। সে অনাগামিফল লাভ করুক। আপনি তার জন্য অহেতুক দুঃখ করবেন না।'

'আমি তাহলে কেন এত অশান্তি সত্ত্বেও বিরাগী হতে পারি না দেবি !'

'আপনার যা কর্ম আপনি তাই করুন মহারাজ, যাতে নিযুক্ত রয়েছেন তাই সৎভাবে করুন, তথাগত কি বলেছেন অনাগামিফল লাভ করতে হলে ভিক্ষু হতেই হবে ? উপাসকদের দ্বারা তা হবে না ?'

'না, তা নয়।'

'তবে ? চিত্তবৈকল্য পরিহার করুন মহারাজ'! উঠুন ! ছিঃ !'

বিম্বিসার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর মহিষীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আমার স্বস্তি, তুমি আমার সান্ত্বনা, দেবি। এত কথা তুমি কোথা থেকে কখন জানলে ?'

রাজার বাহু ধরে প্রাসাদের দিকে এগোতে এগোতে কোশলদেবী বললেন, 'অম্বপালীর মতো অতটা না হলেও আমরাও কিছু কিছু জানি বইকি !'

রাজা ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে মহিষীর দিকে তাকালেন। কিন্তু কোনও ভাবান্তর দেখতে পেলেন না। মহিষী বললেন, 'শুধু আচার্যের শিক্ষাই তো সব নয় মহারাজ। প্রতিদিন জীবন থেকে, সুখ থেকে, দুঃখ থেকে, কলহ থেকে, সখ্য থেকে অবিরত শিক্ষালাভ করছি। সেই শিক্ষার মূল্য কি অল্প !' একটু থেমে আবার বললেন, 'চলুন।'

ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন দু'জনে। আর একটু পরেই ভোর হবে। এখন আর ঘুমোবার সময় নেই। তার প্রয়োজনও নেই। অদ্ভুতভাবে তাঁর পোষধ পালন হল, ভাবলেন কোশলদেবী। প্রতিহারীরা সন্ত্রস্ত হয়ে নমস্কার জানাচ্ছে। শয়নকক্ষে আর প্রবেশ করলেন না কেউ। পাশেই রয়েছে আরও একটি বিশাল কক্ষ। একটি দোলনায় সুখাসনে বসে দীর্ঘ আলোচনায় রাত ভোর করে দিলেন রাজ-দম্পতি।

অবশেষে রানি গেলেন স্নানে। বিম্বিসার গেলেন ব্যায়ামশালায়। মল্লযুদ্ধে মত্ত হয়ে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে পাপবোধ, নৈরাশ্য, বিরহযন্ত্রণা, ক্ষণবৈরাগ্য।

ঘোষক এসে জানাল, দেবী সুমনাকে সাকেতে পৌঁছে দিয়ে রক্ষীরা ফিরে এসেছে। তাদের কাছে মহারাজের জন্য পত্র আছে।

ঘর্মসিক্ত হাত দুটি মুছে পত্রে হাত দিলেন বিম্বিসার। পত্র দুটি। একটি সুবর্ণপট্টের মধ্যে গোটানো। আর একটি ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমরাগ দিয়ে লিখিত। সেই পত্রটিই আগে খুললেন মহারাজ। তাতে লেখা আছে : 'সেনিয়, এখানে পৌঁছে দেখি বপ্পমঙ্গলের দিনে সরযূতীরের উৎসবে আমার কন্যাটি এক সেট্‌ঠি পুত্তের মালা পরে বসে আছে। সেট্‌ঠিটি সাবত্থির। নাম মিগার। তাঁর গুণধরটির নাম পুন্নবদ্‌ধন। সুতরাং আবাহ-বিবাহের আয়োজন করতেই হয়। সুমনাকে সারা জীবন অনেক মার মেরেছ। সেই সব পাপগুলির স্খালন হবে যদি বিসাখাকে আশীর্বাদ করতে ভালো ছেলেটির মতো সাকেতে আসো। বরের সঙ্গে আসবেন কোসলরাজ, তাঁর নববধূ মল্লিকাদেবীকে নিয়ে, আমার দিক থেকে মগধরাজ না থাকলে সৌষম্যরক্ষা হয় না। সঙ্গে আনবে কোসলদেবী, ছেল্লনাদেবী এবং অন্যান্যদের। তোমার অনুচর, রক্ষী, দাস-দাসী, অন্তঃপুরিকা-বাহিনীর জন্য প্রাসাদ নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। সুমনার মাথার তিনটি পককেশের দিব্যি, এসো।'—

অন্য পত্রটি ধনঞ্জয়ের। আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণপত্র।

বিম্বিসার সুমনার পত্রটি আবার পড়লেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুমনার কন্যা বিশাখাকে কুনিয়র বধূ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। বিশাখা এখন কেমন হয়েছে তিনি জানেন না। শুনেছেন অসামান্য রূপসী, গুণবতী। কিন্তু শোনা কথার ওপর নির্ভর করবার প্রয়োজন কী ? সুমনাকে দেখলেই তো বোঝা যায় তার কন্যা কেমন হবে। কুনিয় বড় হঠকারী, তাকে সংযত রাখতে একটি তেজস্বী কন্যার আবশ্যক ছিল। তিনি সামান্য ইঙ্গিত করেছিলেন। সুমনা সে ইঙ্গিত বুঝতে পারবে না এ তিনি মানতে পারেন না। সুমনা অতি চতুর। তাই কি এই স্বতন্ত্র পত্র ! সুমনা গিয়ে দেখেছে কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে ? সত্য ? এ কথা কি সত্য ? সুমনার কন্যাটি তার বুকের পাঁজর, তার রূপগুণ সম্পর্কেও সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু কুনিয় ! সে রাজকুমার হতে পারে, বীরপুরুষও হতে পারে, কিন্তু তার অঙ্গে ত্রুটি রয়েছে। সুমনা-ধনঞ্জয়ের মতো মাতা-পিতা কি চাইবে কুনিয়র মতো জামাতা !

কিন্তু তিনি স্বার্থপর, তিনি চেয়েছিলেন। হল না। তিনি যা চাইছেন, কিছু কাল পর্যন্ত তা হচ্ছিল, তথাগতকে তিনি বলেছিলেন জীবনে তিনি যা যা অভিলাষ করেছিলেন সব পূর্ণ হয়েছে : প্রথম, রাজ্যাভিষেকের অভিলাষ। সামান্য গোষ্ঠীপতির পুত্র থেকে তিনি রাজা, ক্রমে মহারাজ হয়েছেন। দ্বিতীয় ইচ্ছা, তাঁর রাজ্যে সম্যকসম্বুদ্ধর চরণধূলি পড়ে। এ ইচ্ছার জন্ম হয়েছিল সেইদিন, যেদিন তাঁর দিতে চাওয়া উচ্চপদ, ধনসম্পদ এসব প্রত্যাখ্যান করে শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ তাঁর বুদ্ধত্বলাভের সংকল্প ঘোষণা করে চলে গেলেন, তখনই তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন বুদ্ধত্বলাভ করে সিদ্ধার্থ যেন তাঁর রাজ্যে আসেন। তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না যে এই যুবক বুদ্ধত্বলাভ করবেই। তাঁর দর্শন, উপদেশ শ্রবণ, এবং তাঁর উপদেশের মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারা এগুলি ছিল তাঁর অবশিষ্ট অভিলাষ। এগুলি পূর্ণ হয়েছে, যদিও বুদ্ধর উপদেশের মর্ম তিনি প্রকৃতই বুঝেছেন কিনা তা বলা এখনি সম্ভব নয়। কিন্তু তার পর ? যা চাইছেন তা হচ্ছে না। কুনিয়র নিরাপত্তার জন্য তাকে ভবিষ্যতে সৎপথে রাখবার জন্য সুমনাকন্যার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হল না। বিম্বিসার বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। তার পরেই চোখ পড়ল আরেকটি পঙ্‌ক্তির ওপর। 'সুমনাকে সারা জীবন অনেক মার মেরেছ।' কী অর্থ এর ? কিশোর বয়সে বালিকা সুমনাকে তিনি সত্যিই অনেকবার প্রহার করেছেন। সুমনাও পাল্টা প্রহার করতে ছাড়েনি। কিন্তু সারা জীবন ? সারা জীবন ? সারা জীবনের কথা বলবে কেন সুমনা ? শুধু কৌতুক ! কৌতুকের অতিশয়োক্তি ! না কি আরও কিছু ! বিম্বিসার উচ্চাকাঙ্ক্ষী। রাজচক্রবর্তী হবার প্রবল বাসনায় সে কি অনেক নারীকে দুঃখ দিয়েছে ! কোশলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহে কি সেনিয় একটি বালিকা সহাধ্যায়িনীকে উপেক্ষা করেছিল ? তারপর অম্বপালীর উর্বশীতুল্য রূপগুণরাশির জন্য কোশলদেবীকে ? দেবী ক্ষেমাকে ? অম্বপালীসংক্রান্ত ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন সন্ধি করতে হল গণরাজ চেতকের কন্যা ছেল্লনাকে বিবাহ করে। গতকাল দেবী ক্ষেমা বিম্বিসারকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করে চলে গেলেন। আর আজ ? আজ কি চলে যাচ্ছে আবাল্যসহচরী সুমনা ! অতি সন্তর্পণে, নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে, অতি সুকৌশলে চলে যাচ্ছে !

ধনঞ্জয়ের প্রেরিত আনুষ্ঠানিক পত্রটি অন্যমনস্কভাবে হাতে করে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন মহারাজ বিম্বিসার।

১৪

বহু দূর থেকে একটা ধ্বনি ভেসে আসছে। ফাঁপা চর্মগোলকের ওপর ধাক্কা দিলে যে-রকম শব্দ হয় সে-রকম। দিম দিম দিমা দিম, দিম দিম্। ক্ষেতে কাজ করতে করতে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল নন্দ। এত দিন গেছে, এত দিন ধরে এখানে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করছে, কই এ শব্দ তো শোনেনি ! কোনও কোনও দিন শস্য কাটার সময়ে সন্ধ্যা হলে খড়ে আগুন দিয়ে সবাই আগুন পোহাতো। তখন শোনা গেছে ওই ধ্বনি। সামান্য একটু সময়ের জন্য। কিন্তু দিনের বেলায় কখনও নয়। যতদূর চোখ যায় ক্ষেতটি তার একার, অর্থাৎ তাদের পরিবারের। বর্ষার জল পেয়ে সবুজে সবুজ হয়ে আছে। এই সময়ে আগাছাগুলো কেটে দিতে হয়। সকাল থেকে সে তার ভাইদের সঙ্গে এই কাজই করছিল। ধানগাছ যেমন শনশন করে বাড়ে, আগাছাও তেমন শনশন করে বাড়ে। এই সময়ে নিড়িয়ে না ফেললে শস্যের ক্ষতি করবে। তাই তারা চার ভাই সকাল থেকে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে লেগে গেছে। দু'জন গেছে বাড়িতে খেতে। খেয়ে একটু বিশ্রাম করে আসবে। সে এই প্রান্তে কাজ করছে, আর একেবারে অপর প্রান্তে আছে তার সেজভাই সাম। সাধারণত দাসেরা তাদের সঙ্গে এ কাজ করে। তারাই বেশি করে, নন্দ প্রমুখ একটু-আধটু হাত লাগায়, তত্ত্বাবধান করে। কিন্তু এ বছর কয়েকটি দাস তাদের বিক্রি করে দিতে হয়েছে। গৃহভৃত্য ছাড়া আর বড় কেউ নেই। পরিবার বাড়ছে। ছোট ভাইয়ের গত বছর যমজ পুত্র হল। তার নিজেরও তিন পুত্র, দুই কন্যা। সামের চারটি। বড় ভাইয়ের সাতটি। তার পিতামহ, পিতামহী দু'জনেই জীবিত। দুই খুল্লতাতর পরিবারও নেহাত অল্প নয়। খুল্লতাতদের পুত্ররা, দু-চারটি সবে সাবালক হয়েছে। তাদেরও কাজ শেখানো হচ্ছে। আজ অপরাহ্ণে তাদেরও আসবার কথা। ওরা বড় হয়ে গেল। জ্যেষ্ঠের পুত্রগুলি বড় হয়ে গেলে ক্ষেতের কাজের জন্য দাস বিশেষ লাগবে না। পিতামহ এ কথা গর্ব করে বলেন। যদিও নন্দ বুঝতে পারে না, দাস যথেষ্ট না থাকলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে কি করে।

এই ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়ালে সত্যিই নন্দর মনে হয় সে-ই পৃথিবীর রাজা। এই ভূমির প্রকৃতি তার নখদর্পণে। ভূমির সঙ্গে আকাশের যে সব সময়ে একটা খেলা চলছে, বাতাসে, বৃষ্টিতে, শৈত্যে, গ্রীষ্মে, শিশিরে— তার পরিপূর্ণ সাক্ষী সে। সে ক্ষেত্রপাল। সে কর্ষক। রাজা একজন আছেন। সাকেতে থাকেন। উগ্‌গসেন। শুনেছে তাঁরও ওপর নাকি রাজা আছে। সে থাকে সাবত্থিতে। রাজা কেমন, রাজৈশ্বর্য কেমন অতশত সে জানে না, দেখেনি। তার প্রপিতামহ নাকি ছিলেন সেই দলে, যারা বন কেটে বসত করেছিল। তাদের ভূমি গ্রামের প্রত্যন্ত সীমায়, বনের কাছ ঘেঁষে। সে সময়ে এই ভূমি যথেষ্টরও বেশি ছিল। এখন তাদের উনচল্লিশ জনের বিশাল পরিবারে তা আর যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। দুগ্ধবতী গাভী যথেষ্ট রয়েছে। সুপেয় জলের পুষ্করিণী তাদের গৃহসীমার মধ্যেই। কাছে রয়েছে ছোট্ট দক্ষিণা নদী, সরযূর একটি ক্ষুদ্র শাখা। তাতে মাছ প্রচুর। তা সত্ত্বেও, ঠিক পিতার সময়ের অশন-বসন, যাগ-যজ্ঞ, দান-ধ্যান, লৌকিকতা এসব চালিয়ে উঠতে পারা যাচ্ছে না। অগ্নিহোত্র রক্ষা করার ব্যয়ই কি অল্প নাকি? পিতামহ এতটুকু নিয়মের অন্যথা হতে দেবেন না। দুগ্ধ, ঘৃত, পুরোডাশ, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দান-দক্ষিণা এসব নিয়মমতো চালাতে হবে। আর না চালিয়েই বা উপায় কী! দেবতাদের তো আর রাগালে চলে না, পিতৃপুরুষদের কষ্ট দেওয়াটাই কি ঠিক! তা ছাড়া আহিতাগ্নি গৃহস্থ বলে প্রত্যেক অমাবস্যায় এবং প্রত্যেক পূর্ণিমায় একটি করে ইষ্টিযাগ করতে হয়। এই তো কদিন আগে পূর্ণিমার পূর্ণমাস যাগ গেল। চারজন ঋত্বিক। দুদিন ধরে পরিশ্রমও যেমন, ব্যয়ও তেমন। এ ছাড়াও বর্ষাকালে পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় পশুযাগ আছে। এ বছর আগামী অমাবস্যার পরের অমাবস্যায় তাদের গৃহে পশুযাগ হবে স্থির হয়েছে। তাতে আবার লাগে ছ'জন ঋত্বিক। খুঁটিনাটি বহু নিয়ম। নন্দ অত জানে না, সে তো যজমানও নয়। যজমান তার পিতামহ। সে জানে না যজমানের পরিবারের প্রত্যেকেই এই সব যজ্ঞফল পায় কি না! সবাইকারই কি স্বর্গলাভ হয়? সে ভালো জানে না। সে জানে এ বছর তার অজপাল থেকে কৃষ্ণবর্ণ নধর একটি অজ তাকে দিতে হবে। অজটিকে শ্বাসরোধ করে মারা হবে। তার নাভির পাশের মেদ বা বপা আহুতি দেওয়া হবে। তার থেকে তাদের মঙ্গল হবে।

যাই হোক, মোট কথা তাদের আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হয়ে যাচ্ছে। বছরে একবার শস্যের ষষ্ঠভাগ গ্রামণী নিয়ে সংগ্রহ করে রাখেন রাজকরের জন্য। সেটা কোনও সমস্যা নয়। সমস্যা এই বৃহৎ পরিবার নিয়মমতো প্রতিপালন এবং লৌকিক ও ধর্মানুষ্ঠান। পিতামহ গ্রামণীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাই আরও বন কেটে ভূমিসীমা বাড়াবার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। ভূমির তো ক্রয়-বিক্রয় চলে না। ভূমি হলেন জননী। তবে যে যতটা ভূমি বন কেটে বার করতে পারে, ততটা ভূমির শস্যের অধিকার তার। অবশ্যই গ্রামণীর অনুমতি চাই। তা সে সমস্যার তো সমাধান হয়ে গেছে। বনের এক অংশে বৃক্ষচ্ছেদকদের নিযুক্ত করা হয়েছে, বড় বড় গাছ কাটবে, গুল্মাদি পরিষ্কার করবে। তারপর মাটি পিটিয়ে তার ভেতর থেকে পাথরের খণ্ড বৃক্ষমূল কাঁকর ইত্যাদি বেছে ফেলে দিয়ে কর্ষণের জন্য প্রস্তুত করার কাজটি তাদের ভাইদের। কাটা গাছগুলিও কাজে লাগবে। অতিরিক্ত ঘর চাই। ঘরের জন্য পালঙ্ক, পেটিকা, ফলক ইত্যাদি অনেক কিছুর প্রয়োজন হবে। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁচা কাঠে তেমন কিছু হবে না। এ বছর গাছগুলি বৃষ্টিতে ভিজুক, রোদে পুড়ুক, শুধু সেগুলিতে একটা করে চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে। যাতে অন্য কেউ আবার নিয়ে না যায়।

বন কেটে কর্ষণের ভূমি প্রস্তুত করা খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ। গাছ কাটাও খুব বিপজ্জনক। যতদূর সম্ভব লোকালয়ের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করাই সঙ্গত। কিন্তু নন্দদের ক্ষেত্রটিই যে গ্রামের এক ধারে, বন ঘেঁষে। তাই সে দিমা দিম দিম দিম শব্দ শুনে কান খাড়া করে রেখেছিল একটি বড়সড় হরিণের মতো। বাতাসের গতির দিকে তার কান। সে শুনছে, সাম কাজ করছে অনেক দূরে, সে শুনতে পেয়েছে কি না কে জানে! যাক শব্দটি মিলিয়ে যাচ্ছে। তার ভয় হচ্ছিল, বন্যরা যদি হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে! সে একা এদিকে, তার ভাই সাম একা ওদিকে। সামও আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু শব্দটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সে আবার হাতে তুলে নিল তার নিড়ানি। সকাল থেকে পরিশ্রম করে সে একাই তো অনেকটা কাজ করে ফেলেছে।

হঠাৎ আঁটোসাঁটো কটিবস্ত্র পরা একটি বৃক্ষচ্ছেদক ছুটতে ছুটতে বন থেকে বেরিয়ে এসে অদূরে লুটিয়ে পড়ল। নন্দ তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দেখল লোকটির মুখ থেকে ফেনা উঠছে। আক্ষেপ হচ্ছে তার হাতে পায়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্থির হয়ে গেল। জ্ঞান হারাল নাকি? নন্দ লোকটির ডান হাত তুলে নিয়ে নাড়ির স্পন্দন দেখবার চেষ্টা করল। কিছু বুঝল না। সে লক্ষ করল লোকটির চোখ দুটি কেমন উল্টে গেছে। তখন সে দেখল লোকটির ঘাড়ের কাছে একটি তীর বিঁধে আছে। সন্তর্পণে সে তীরটি টেনে তুলল। সরু কাঠের ফলা। এই ফলায় নিশ্চিত বিষ মেশানো আছে। তীক্ষ্ণ বিষ! সর্বনাশ! মুখটি ভালো করে দেখে মনে হল এ বোধ হয় জম্বুক। মোট আঠারো জন ছেদক নিযুক্ত করেছে সে। তাদের দলপতি নিশিপাল। কীভাবে কতটা রজ্জুর বেড় দিয়ে কোন কোন গাছ ফেলা হবে এসব ঠিকঠাক করার দায় তার। সে কোথায়! নন্দ মুখের দু পাশে হাত রেখে চিৎকার করে উঠল 'ওহো-ও-ও-ও'। তিন চারবার চিৎকারের পর যেন অরণ্যের অভ্যন্তর থেকে প্রত্যুত্তর ভেসে এলো। নন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তার মাথার ওপর চক্রাকারে চিল ঘুরছে। দূরে, নীল আকাশে রোদের সেতু পার হয়ে হতে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠছে সূর্য। ছায়াগুলো ক্রমশই খর্ব হয়ে আসছে। বর্ষাকালে রোদ যেদিন হয়, বড় প্রখর হয়। আশা করা যায়, তার আর দুই ভাই তাড়াতাড়ি আসবে। তাদের হাতে কাজের দায় ফেলে দিয়ে সে গৃহের শীতলতায় গিয়ে বিশ্রাম করতে পারবে। আজ আর আসতে হবে না। সাম! সামই বা কোথায় গেল? ইতিমধ্যে এ কী বিপদ! ছেদকরা কেউ আসছে না কেন? জম্বুক কি মরে গেল? তাই যদি হয় এখন এই মৃতদেহ নিয়ে সে কী করবে! ফেলে যেতে পারবে না। এখুনি শকুন, চিল ঝাঁপিয়ে পড়বে দেহটির ওপর। বহুক্ষণ পর তার ধৈর্য যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন খুব কাছ থেকে সে 'ওহো-ও-ও' চিৎকার শুনতে পেল। তার পরই দু'হাতে ডালপালা সরাতে সরাতে, আঁটোসাঁটো মোটা কাপড় পরনে, হাতে কুঠার নিশিপাল বেরিয়ে এলো। নন্দ মুখে কিছু না বলে জম্বুকের দেহটির দিকে আঙুল দেখালো। নিশিপাল কাছে এসে নানাভাবে পরীক্ষা করে বলল, 'এ কী? এ তো মরে গেছে কর্তা! পায়ের কাছটা হিম হতে আরম্ভ করেছে!'

নন্দ বলল, 'বন্যদের বাদ্যির শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?'

নিশিপাল বলল, 'কই, না!'

'তাহলে তুমি উল্টো দিকে ছিলে বাতাসের মুখে শব্দ ছুটে আসছিল। আমি স্পষ্ট শুনেছি, বন্যদের সেই চর্মঢক্কার ধ্বনি। নিশিপাল তোমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এই দ্যাখো বন্যদের বিষ মাখা তীর! তোমার দলের লোকেদের জড়ো করো। আজ আর ছেদনকার্য হবে না। জম্বুকের সৎকারের ব্যবস্থা করো। আমি বাড়ি চললাম।'

নন্দর সারা শরীর গরমে লাল, ঘাম বইছে, কপালে ভ্রূকুটি। সে আর সময় নষ্ট না করে গৃহের দিকে চলল। পরিশ্রমের ক্লান্তি, শুভকাজে বাধা পড়ায় অমঙ্গলের ভয়, জম্বুকের মৃত্যুতে উদ্বেগ—সব মিলিয়ে তাকে একেবারে হতোদ্যম করে দিয়েছে।

বন্যদের তীরবিদ্ধ হয়ে জম্বুক মরে গেছে? নিশিপাল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। জম্বুক ছেলেটি একেবারেই অল্পবয়স্ক। অল্প বুদ্ধিও। তার পিতার বিপণি আছে গ্রামে। বেশ বড় বিপণি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু গণনা করতে পারে না, পরিমাপ ঠিক করতে পারে না, নগরী বা ভিন্ন গ্রাম থেকে, সার্থদের কাছ থেকে বাদ-বিতণ্ডা করে পণ্যও ঠিকমতো কেনা-কাটা করতে পারে না জম্বুক। তাই আঠারো বছর বয়স হওয়া মাত্র তাকে নিশিপালের দলে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার বাবা। এত বড় ছেলে বসে থাকলে নানা কু-চিন্তা, নানা কু-অভ্যাস দেখা দেবে। তার চেয়ে গায়ে খেটে যা হয় উপার্জন করুক, অন্ততপক্ষে সময়টা ব্যস্তভাবে কাটাক! মাথায় ঈষৎ খাটো হলেও জম্বুকের বলশালী শক্তপোক্ত আকৃতি। বড় বড় প্রাচীন বনস্পতির গোড়ায় কুড়ুল মেরে মেরে কী করে বৃত্তাকারে তাকে অর্ধেক ছেদন করে দড়ির ফাঁস ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিতে হয়, তারপর কয়েক জনে মিলে টান মেরে তাকে ধরাশায়ী করতে হয়, সে ভালোই শিখে গেছে। কিছু একটা করতে পারছে বলে উৎসাহও যথেষ্ট। যাঃ, বন্যরা তীরটা ওকেই মারল! নিশিপাল মাথায় হাত দিল। সবই ভাগ্য বলতে হবে। গোড়ার থেকেই ছেলেটার ভাগ্য মন্দ। নইলে পিতা বণিক, অত বড় বিপণি, গোলা। অন্যান্য পুত্রগুলি তো ওই বিপণি থেকেই দিব্যি উপার্জন করছে। গ্রাম-গ্রামান্তরে যাতায়াত করছে। জম্বুকের মাথায় সামান্য বুদ্ধিটুকুও দিলেন না কেন বিধাতা! ছিল কোথায় জম্বুক! দলের সঙ্গেই তো থাকবার কথা! আঠারো বছর বয়স হলেও, শিশুর মতো কৌতূহল জম্বুকের। হয়ত কোনও সময়ে দল থেকে ছিটকে পড়েছে বনের গাছ-পালা দেখবার জন্য, ফলমূল পাড়বার জন্য, বিপদ সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই নেই। শিশু যেমন আগুন দেখলে ভয় পায় না, বরং আগুনের দীপ্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তাকে ধরতে যায়। এ তেমনি।

এখন এই মৃতদেহ ছেড়ে সে দলের লোকেদের ডাকতে যেতেও পারছে না। নন্দ-কর্তা তো সব দোষ যেন তার একার এমনি একটা ভাব দেখিয়ে চলে গেলেন। সাম-কর্তারও তো দেখা নেই। তিনি বোধ হয় আগেই সংগোপনে বাড়ি চলে গেছেন। সাম-কর্তার চোখ দুটি যেমন গোল গোল, দেহটিও তেমনি। উনি তেমন কষ্ট সইতে পারেন না। নিশিপাল বারবার তার মুখের দু পাশে হাত রেখে চিৎকার করতে লাগল। অবশেষে অপরাহ্নের দিকে সে তার দলের সবাইকে একত্র করতে পারল। দলে একটি ছেদকের কিছু বিষ-চিকিৎসার অভিজ্ঞতা ছিল, সে হায় হায় করতে লাগল। সত্যিই নিশিপালের আগে যদি সে-ই প্রথম [illegible] ডাক শুনতে পেত জম্বুকটা হয়ত মরত না এত সহজে। কিন্তু এখন তো আর পশ্চাত্তাপ করে লাভ নেই। জম্বুক এখন মরে কাঠ হয়ে গেছে। বিষক্রিয়ার জন্য দেহের বর্ণও কেমন অস্বাভাবিক। যেন একটা গাছের মরা ডাল। সবাই মিলে বাঁশ বেঁধে খট্টা প্রস্তুত হল। তারপর জম্বুকের বাড়ি। এই বনান্তের শস্যক্ষেত থেকে সে অনেক দূরে। সাকেত নগরীর অনেক কাছাকাছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এতক্ষণে তার গৃহ থেকেও কেউ-না-কেউ তো আসবে! নাকি অল্পবুদ্ধি সন্তান বলে মৃতের সংকারেরও প্রয়োজন বোধ করে না এরা!

জম্বুকের বাড়ির কাছাকাছি এসে নিশিপাল এবং তার দলের লোকেরা দেখল জম্বুক-পিতা কাঁধের ওপর একটি গাত্রমার্জনী নিয়ে বৈকালিক স্নানে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সহাস্য মুখ। এই মাত্র বোধ হয় কারও সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তাদের কাঁধে খট্টা দেখে ঘটি হাতে দাঁড়িয়ে গেলেন, 'কে ম'লো রে? ও নিশিপাল! শ্মশানের দিকে নিয়ে না গিয়ে পল্লীর এদিকে কেন বাবা?' ততক্ষণে নিশিপালরা খট্টাটি নামিয়ে রেখেছে। জম্বুক-পিতা, হাতে ঘটি, কাঁধে গামছা, একেবারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। একটি বালক বেরিয়ে এসেছিল। সে বোধ হয় দৌড়ে গিয়ে ভেতরে খবর দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে একটা গোলমাল, কান্নার শব্দ, কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে এলেন জম্বুকের মা, পেছনে পেছনে আরও অনেক স্ত্রীলোক। নিশিপাল তাদের চেনে না। সে তীরটা দেখিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল জম্বুকের পিতাকে। তার মা হাহাকার করতে লাগলেন।

'ওরে আমার বাছা রে, কেমন করে এমন হল রে! কেমন নিঠুর পিতা! ধৈর্য নেই এতটুকু! বাছাকে আমার হাতে কুড়াল দিয়ে ঘরের বার করে দিলে। এই কি বণিকের ঘরের পুতের কাজ! না হয় বসেই খেত, শিশুগুলি, বালক-বালিকাগুলি কি আর বসে খায় না, কৃপণ বণিকের কত ধন যায় তাতে! ওরে জম্বুক, কে আমার বাগানের বেড়া বেঁধে দেবে রে? কে আর আছে এই বিলাসপ্রিয়, মহার্ঘ গৃহে যে বড় বড় পেটিকাগুলো বইবে অবলীলায়! কে হাসিমুখে দাসত্ব করবে সমস্ত পরিজনের? ...আর তোমাকেও বলি নিশিপাল, তুমি কি জানতে না, বাছা আমার জাত-কাঠুরে নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ওপর একটু দৃষ্টি রাখতে তোমার কী হয়েছিল ? শেষ পর্যন্ত অপঘাত !'

নিশিপাল অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখে ভাষা নেই। কিন্তু এই দুঃসংবাদ তাকেই এভাবে বহন করে আনতে হবে এ কথা সে কখনওই ভাবেনি। তার ধারণা ছিল নন্দ সংবাদটা এদের দিয়ে গেছেন। ক্রোধে দুঃখে তার ভেতরটা জ্বলছিল।

জম্বুকের বড় ভাইয়ের পুত্রটি মুখাগ্নি করবার পর চিতাটি যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তখন সে নিঃশব্দে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এলো। দক্ষিণা নদীর জলে স্নান করে ভিজে কাপড়ে এঁটে পরে চলল নন্দ-কর্তার বাড়ি।

আঙনে প্রদীপ জ্বলছে। গৃহাভ্যন্তর থেকে উপর্যুপরি শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। সেই সঙ্গে উত্তম যবাগু পাকের সুগন্ধ। কয়েকটি বালক-বালিকা বোধ হয় খেলা করতে অন্য কোথাও গিয়েছিল, ধূলিধূসর পায়ে কলকল শব্দ করতে করতে ভেতরে ঢুকল। গৃহ-বলভীতে পারাবতগুলি আশপাশ ফিরছে আর বকুম বকুম করছে। আঙনের পুষ্পিত কদমগাছের ওপর থেকে একটি ময়ূর ঝাঁপ দিয়ে নেমে এসে একটি এঁকেবেঁকে পালিয়ে যেতে থাকা ডুণ্ডুভ সাপ ধরল।

নিশিপালের ডাকে নন্দ বেরিয়ে এলো। বেশ স্নাত, সুন্দর। ধৌত বসন পরেছে। বুকে চন্দন লেপেছে। গরমটা বোধ হয় বড্ডই লেগেছে কর্তার।

নিশিপাল রুক্ষ গলায় বলল, 'অন্য লোক দেখে নিন, কাল থেকে আমরা আর আপনার কাজ করব না।'

নন্দ ত্রস্ত হয়ে বলল, 'বলছ কি নিশিপাল ! কেন ? জম্বুক যে বন্যদের তীরে মরে গেল, সে কি আমার দোষ ?'

নিশিপাল বলল, 'বণিকের ঘরে একটা সংবাদও তো দেবেন ! তারা নিশ্চিন্তে দিনান্তের কৃত্য পালন করে যাচ্ছেন, এদিকে তাঁদের কনিষ্ঠটি অপঘাতে মারা গেছে ! আমরা যে যমদূতের মতো গিয়ে ঘরের আঙনে দাঁড়ালাম। বণিকপত্নীর কী কান্না ! আমাকে তো তিরস্কারের পর তিরস্কার শুনতে হল। জম্বুকের পিতাকেও। তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। কী পরিস্থিতি বলুন তো ! ধিক্ আপনাকে ! ধিক্ !'

নন্দ মুখ নিচু করে বলল, 'শোনো নিশিপাল, শোনো। আমি সত্যই খুব অন্যায় করেছি। কিন্তু সংবাদ দিতে পারিনি...কেমন একটা অপরাধ বোধ হচ্ছিল। যদিও অপরাধ আমার নয়। আমি তো ভেবেইছিলাম সংবাদটা দিয়েই যাবো। কিন্তু জম্বুক-পিতার বিপণির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম তিনি হৃষ্ট মুখে নালিকায় করে গুড় পরিমাপ করছেন, আর কলস ভরছেন, তাঁর মধ্যমপুত্রটিও দ্রোণ নিয়ে কী জানি কী সব মেপে তুলছিল, কহাপনগুলি গণনা করছিল আরেক জন। আমি কিছুতেই সংবাদটা তাঁকে দিতে পারিনি।'

নিশিপাল কোনও কথা না বলে পেছন ফিরে চলতে আরম্ভ করল। নন্দ কয়েকবার ডাকল, 'নিশিপাল ! নিশিপাল !' নিশিপাল সাড়াও দিল না, ফিরলও না। নন্দ মুখ চুন করে বাড়ির ভেতরে ফিরে গেল। সমস্ত ঘটনাটা পিতাকে পিতামহ বলতে হবে এবার। তাঁদের পরামর্শ নিতে হবে। পিতামহ যা ক্রোধী ! তিনি সমস্ত অপরাধ তারই বলে সাব্যস্ত করবেন, তিরস্কার করবেন তাকে সবাইকার সামনে। পিতাও তালে তাল দেবেন।

নিশিপাল এবং তার দলের বৃক্ষচ্ছেদকরা বনের ডালপালা কেটে সমস্ত গ্রামে জোগান দেয়, তাদের অন্নের অভাব হবে না। কটিবস্ত্রটুকুও জুটেই যায়। নন্দদের মুখাপেক্ষী না হলেও তাদের চলবে। তাই-ই শূদ্রের এত সাহস ! কিন্তু নন্দ বা তার ভাইয়েরা চাষের কাজ করতে পারলেও, বড় বড় গাছ কাটতে পারবে না। এর জন্য ভাইয়েদের কাছ থেকেও তার ভর্ৎসনা জুটবে মনে হচ্ছে। কারণ পিতামহ নিশ্চয় বলবেন, 'আমার পিতা তো তোমাদের বয়সে বন কেটেই এই ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। দুই পুরুষেই তোমরা এত বলহীন হয়ে পড়োনি যে প্রয়োজন হলে গাছ কাটতে পারবে না !'

এই সময়ে জম্বুকের মাতা ভীষণ কান্নাকাটি করছিলেন। তিনি জম্বুক-পিতা এবং অন্যান্য পরিজনদের বলছিলেন গ্রাম চতুষ্পথের কাছে জম্বুকের দেহাবশেষের ওপর একটি স্তূপ স্থাপন করতে হবে। জম্বুক জীবিত থাকতে কেউ তাকে কোনদিন কোনও সমাদর দেখায়নি। বরং তাকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌতুক করেছে, তাকে অবহেলা করেছে। কী রমণী, কী পুরুষ, কী বালক-বালিকা কেউ তাকে কোনদিন সম্মান করেনি। আজ সে সেই অবহেলার ফলস্বরূপ মৃত। একমাত্র একটি স্তূপ স্থাপন করতে পারলেই তার আত্মার শান্তি হবে।

জম্বুককের বড় ভাই বলল, 'মা আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে আমাদের জন্ম মৃত্যু সব হয়। এ জন্মের ভোগভোগান্তি সবই তো পাপের ফল। জম্বুককে অধিক দিন জীবিত থেকে আরও কষ্ট সহ্য করতে হয়নি এ এক পক্ষে তার সৌভাগ্য!'

জম্বুক-মাতা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'কম্মফল! কম্মফল! কম্মফল-টলের কথা আমি জানি না। আমি জানি অসময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসব হওয়ার ফলে জম্বুককের মাথায় আঘাত লাগে। তাই সে ওরূপ অল্পবুদ্ধি। তার এখানে দোষ কী? দোষ তো ধাইয়ের, দোষ তো আমার, দোষ তো তোমারও পুত্ত, পুন্নগব্ভা মাতাকে তুমি উদ্যান থেকে অম্ব আনতে পাঠাওনি?'

'আমি কেন পাঠাবো? তুমি নিজেই তো গাছ থেকে সদ্য পাড়া অম্ব নিয়ে আসবে বলে উদ্যানে গেলে।'

'তুমি তো আমাকে নিষেধ করতে পারতে, তোমার বধূকে পাঠাতে পারতে! তা তো করনি। মাতার আর কী হবে? এতগুলি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, ওঁর আর কোনও যত্নের প্রয়োজন নেই। এই-ই তো তোমাদের মনোভাব! সন্তান-জন্ম যে কী বখু তা তো আর জানো না! হত তোমাদের কুক্ষিতে একটি করেও অন্তত বচ্চ, তো বুঝতে!'

এইভাবে জম্বুক-মাতা কান্নাকাটি, দোষারোপ করতে করতে মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন। পুত্ররা কত বোঝালো, স্তূপ একমাত্র মহামুনি, আচার্য এঁদের দেহাবশেষের ওপরেই হয়। তিনি শুনলেন না। অবশেষে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন দেখে, জম্বুক-পিতা গ্রামের চৌমাথায় সত্যিই একটি সুশোভন স্তূপ প্রস্তুত করালেন। গ্রামে কোনও আচার্য ব্রাহ্মণের বাস নেই। তাঁরা থাকলে হয়ত আপত্তি তুললেন। কিন্তু তাঁরা থাকেন উল্টো দিকের গ্রামে। এদিকে তাঁদের এমনিতে আসার কোনও সম্ভাবনাও নেই। বিশেষত চৌমাথায় আরও দুটি স্তূপ রয়েছে। প্রাচীন হয়ে গেছে, ভেঙে ভেঙে গেছে, কিন্তু আছে। এই উপলক্ষে জম্বুক-পিতা সেগুলিকেও সারিয়ে দিলেন। চুনমের প্রলেপ দেওয়া সাধারণ দুটি স্তূপ। কিন্তু জম্বুকের স্তূপটিতে সযত্নে কারুকার্য করা। প্রতিদিন তাতে মাল্য দিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে আসেন জম্বুক-মাতা। বলেন সে তো অল্পবুদ্ধি ছিল না। ছিল ক্ষণজন্মা। প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ। সংসারে প্রবেশ করার ভয়ে অল্পবুদ্ধি সেজে থাকত। তিনি নিভৃতে জম্বুকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় অনেক পেয়েছেন। কেন, গ্রামবাসীরা কি সেই তেমিয় নামে রাজপুত্রের কথা জানে না যিনি রাজকার্য করে কর্মচক্রের জড়িত হবার ভয়ে মূক-পঙ্গু সেজে থাকতেন! জম্বুকও সেই প্রকার।

পক্ষকাল পরে সাকেত থেকে ধনঞ্জয়পুত্রী বিশাখার বিবাহ উপলক্ষে গ্রামবাসীদের নিমন্ত্রণ করতে এলেন একজন ব্রাহ্মণ ও একজন লেখক, এঁরা দুজনেই শ্রেষ্ঠীর কাছে কর্ম করেন। চৌমাথায় নূতন স্তূপটি দেখে তাঁরা গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার স্তূপ? কেউ সদ্য প্রয়াত হয়েছেন, মনে হচ্ছে?

গ্রামবাসীরা সসম্ভ্রমে বলল, 'মহামুনি জম্বুকের। তিনি প্রতিচ্ছন্ন হয়ে সংসারে যাবতীয় কর্তব্য পালন করতেন অল্পবুদ্ধি সেজে। কিন্তু রাত্রিকালে শক্রদেবের সঙ্গে অন্তরীক্ষে বিচরণ করতেন। একটি বৃশ্চিক দংশন করায় তিনি নিদ্রার মধ্যে পা ছুঁড়েছিলেন, তাইতে বৃশ্চিকটির মৃত্যু হয়। বৃশ্চিক তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেয়, "আমার গমনপথে বাধাস্বরূপক হয়ে শুয়েছিলি, তাই আমি তোকে দংশন করেছিলাম, তুই পদাঘাতে আমাকে বধ করলি, এই পাপে ওই পায়ে বিষের তীর বিঁধেই তোর মৃত্যু হবে।" জম্বুক মুনি এই অভিশাপ সত্বর সফল করে দুঃখময় মানবজন্ম থেকে মুক্তি পাবার অভিলাষে গভীর বনে গিয়ে বৃক্ষ ছেদন করতেন, এই বৃক্ষতলের রক্ষক বনচররা তাঁকে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে বধ করে।'

শুনে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর দূত সেই ব্রাহ্মণ ও লেখক স্তূপটিকে প্রদক্ষিণ করে ভূমিতে শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। ভক্তিভরে সুগন্ধ মাল্য দিল, দীপ জ্বেলে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্বেতবর্ণের ওই স্তূপ দুটি কাদের ?

গ্রামজনেরা বলল, 'প্রথমটি সেই বৃশ্চিকের, এবং দ্বিতীয়টি সেই বৃক্ষদেবতার। এঁরা উভয়েই শাপভ্রষ্ট দেবতা ছিলেন।' তখন এই স্তূপ দুটিকেও যথাবিধি বন্দনা করে শ্রেষ্ঠীর দূতেরা গ্রামে ঢুকে সবাইকে আহ্বান করে শ্রেষ্ঠীর নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করল। তারপর বলল, 'এ গ্রাম তো পুণ্য গ্রাম, আমরা এসে ধন্য হলাম।' তারা গ্রামান্তরে চলে গেল। নলকার গ্রাম, লোনকার গ্রাম, কম্মার গ্রাম...এখনও অনেক রয়েছে।

গ্রামণী সেই রাত্রেই সব পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ডেকে সভা করলেন, শ্রেষ্ঠীর কন্যার বিয়েতে তো এমনি যাওয়া যায় না। উপহার নিয়ে যেতে হবে। গ্রামস্থ সবাইকেই সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু দিতে হবে। এখন স্থির করা যাক উপহারটি কী হবে! অবশেষে অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর স্থির হল একটি সোনার তীরধনুক দেওয়া হবে। তীরটি হবে আধ হাত পরিমাণ। ধনুকটি তদনুযায়ী। এই তীর জম্বুকমুনির মুক্তির স্মৃতির সঙ্গে জড়িত থাকায় পুরস্কারটি যথাযথ হবে বলেই মনে করলেন সকলে। সোনার বৃশ্চিক কিংবা স্ফটিকের স্তূপ দেবার কথাও হয়েছিল। কিন্তু বিবাহে স্তূপ তা যত বড় মুনিরই হোক না কেন, সমীচীন মনে হল না, আর বৃশ্চিকটির ব্যাপারে খুব দক্ষ স্বর্ণকার চাই। অত কুশলী শিল্পী এত শীঘ্র জোগাড় করা যাবে না বলেই সকলে সিদ্ধান্ত করলেন। জম্বুক-পিতা সবচেয়ে বেশি অর্থ ছন্দক (চাঁদা) স্বরূপ দিলেন, নন্দর পিতামহ দিলেন সাধ্যের অতিরিক্ত। বৃক্ষচ্ছেদকদের পল্লী থেকেও নিশিপালের তত্ত্বাবধানে দশটি তাম্র কাহন এলো।

সাকেতের উপকণ্ঠে এই জম্বুক-গ্রামের উপহারটি কনে বিশাখার বড় মনোমত হয়েছিল। অন্য নিরানব্বুইটি গ্রাম থেকে যে নিরানব্বুইটি উপহার আসে, শ্বশুরগৃহে যাত্রার সময় সে সমস্তই সে গ্রামবাসীদের উদার হাতে বিলিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সোনার এই তীরধনুকটি দেয়নি। এ যেন তার কৈশোর, তার অভিনব শিক্ষার প্রতীক, এ যেন তার কৌমার্য, তার স্বাধীনতা, তার আত্মমর্যাদাও। তাই তার শয়নকক্ষের নাগদন্ত থেকে ঝুলত জম্বুক-গ্রামের উপহার স্বর্ণময় তীরধনুক। যাতে সব সময়ে স্মরণে থাকে, সে কে, সে কী চায়! কী ভাবে তার জীবন আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু সে তো কিছুকাল পরের কথা। আগে বিশাখার বিবাহটাই তো হোক! সে তো এক রাজসূয় ব্যাপার!

AMARBOI.COM

১৫

সাকেত থেকে তিন বটু তিন স্থবিকা কাহিনী নিয়ে ফিরলেন। পূর্বাপর শুনে মিগার-পত্নী বললেন, 'গহপতি যা করবে ভেবে-চিন্তে করো। তোমার উপার্জনকে যে তার নিজের সম্পদের তুলনায় এক কাহনও মনে করে না সেই দাম্ভিকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করা কি ভালো ?'

মিগার শুষ্ক মুখে বললেন, 'কিন্তু উপায় কি ? পাশার দান যে ফেলা হয়ে গেছে! এখন আর ফিরি কী করে ? তবে হ্যাঁ। মিগার অত সহজে ছেড়ে দেবে না, শিক্ষা দিচ্ছি। আগে দেখি মহারাজ কী বলেন!'

'মহারাজের সঙ্গে এ কুটুম্বিতার কী সম্পর্ক ?'

'বাঃ, মহারাজ স্বয়ং তো এই সেট্‌ঠিকে মগধ থেকে এনে সাকেতে বসত করালেন।'

'তাই নাকি ? কেন ?'

'সে এক মহা অপমানের কথা!'

'কী ব্যাপার বলো তো সেট্‌ঠি!'

'ব্যাপার কিছুই না। মগধের রাজার তো দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। শ্রীবৃদ্ধি তো শুধু শুধু হয় না! অর্থভাণ্ডার প্রস্তুত থাকা চাই। মগধের শ্রীটি আছ পঞ্চ-মহা সেট্‌ঠির কোষে। তো রাজার অদ্ভুত অদ্ভুত ইচ্ছা মনে উদয় হয় কি না! আমাদের ডেকে কার কত সম্পদ গণনা করিয়ে বললেন—সাবত্থিতে তো দেখছি সুদত্ত, মণিভদ্র, প্রতর্দন ও মিগার। তাও সুদত্তর মতো সম্পদশালী আর কেউই নয়। কিন্তু মগধে রয়েছেন পাঁচজন। আমার রাজ্যেই বা সেনিয়র রাজ্যের থেকে অল্প থাকবে কেন ? আমরা কত করে বোঝালাম মহারাজ এধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কী লাভ ? আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে, মহামারী দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সময়ে আপনাকে ধন দিয়ে সাহায্য করতে পারছি না ! তো রাজার এক গোঁ। আরেক জন সেট্‌ঠিকে মগধ থেকে এনে বসত করাতে হবে।'

'তোমরা বললে না কেন, ভিনদেশের ধনী এসে আমাদের সমাজে মানাতে পারবে না, একটা অনর্থ হবে !'

'বলিনি আবার ! সে কথাও বলেছিলেন সেট্‌ঠি মণিভদ্দ। তার উত্তরে পাগলা রাজা কী বললেন জানো ? বললেন, আপনারা অনর্থক হিংসুকবৃত্তি করে তাকে বিব্রত না করলে তার অসুবিধে হবে কেন ? কোসল আর মগধ পাশাপাশি রাজ্য। দেশের প্রজাগণের মধ্যে, সমাজ-সংস্কারের মধ্যে কি কোনও পার্থক্য আছে ? সেখানেও যাগ-যজ্ঞ হয়, এখানেও যাগ-যজ্ঞ হয়। ওখানে মগধরাজ ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ও সোনদণ্ডকে প্রভূত ধন দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এখানেও আমি ব্রাহ্মণ পোক্‌খরসাদি ও তারুক্‌খকে ব্রহ্মত্র দিয়েছি। ওখানেও সন্ন্যাসী-শ্রমণদের সমাদর, এখানেও তাই। আপনাদের অসুবিধা হবে তা-ই বলুন !'

'গহপতি সুদত্ত কিছু বললেন না ?'

'তাঁর কি আসে যায় বলো গৃহিণী। তিনি তো নিজের সাম্রাজ্য বাড়িয়েই চলেছেন, বাড়িয়েই চলেছেন। মানুষটি কথাও বলেন অল্প। চতুর তো ! বুঝেছেন রাজার ইচ্ছা, অন্যথা হবে না। অমনি মৌন নিলেন। তা সেই যাই হোক। ওখানকার মহাসেট্‌ঠি মেণ্ডকের পুত্র ধনঞ্জয়কে মহারাজ একেবারে জোর করে নিয়ে আসছিলেন। সেট্‌ঠি পুত্তুর চতুর তো কম নয় ! সাবত্থি পর্যন্ত এলোই না। সাকেতে বাস নিল। বাস চুকে গেল। আমাদের কারও আর সে কথা কথা মনে নেই। এই বটুরা যে কন্যা নির্বাচন করতে গিয়ে ওই ধনঞ্জয়ের কন্যার গলাতেই আমার মালাটি পরিয়ে আসবে তা কি আমি স্বপ্নেও ভেবেছি !'

শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীপত্নী উভয়েই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীর কন্যার বিবাহ হচ্ছে, এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু নিজেদের চেয়েও শতগুণে ধনী যে তার ঘর থেকে বধূ আনলে তো মহা সমস্যার উদয় হবে ! সে কি শ্বশুর-শ্বশ্রূকে মান্য করবে !

মহারাজ প্রসেনজিৎ কিন্তু এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বুঝলেন গহপতি, বৈবাহিক সম্পর্কই হলো সবার সেরা সম্পর্ক। এই যে আমি আর মগধরাজ বিম্বিসার পরস্পর পরস্পরের ভগ্নীকে বিবাহ করেছি, দুটি রাজ্যে কেমন শান্তি বলুন তো ? যতই রাজ্যলোভ থাক কেউই তো আর ভগ্নীকে বিধবা করতে চায় না !' বলে প্রসেনজিৎ হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন, 'তো গহপতি, আপনার আর ধনঞ্জয়ের কন্যা এবং পুত্র যদি থাকে তো এইরকম বিনিময় করে নিন না কেন ? আমার রাজ্যের সম্পদের ভিত্তি আরো দৃঢ় হবে !'

মিগার অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'আমার কোনও কন্যা নেই।'

রাজা তাঁর অপ্রসন্নতা লক্ষই করলেন না, বললেন, 'তা না থাক। এতদিনে যে মগধশ্রেষ্ঠীর সঙ্গে শ্রাবস্তীর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হতে চলেছে—এ অত্যন্ত সুখের কথা। আমি স্বয়ং যাবো। মহাদেবী মল্লিকাকে নিয়েই যাবো।'

এ কথাতে খুব সংগোপনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মিগার। বললেন, 'তা তো নিশ্চয়ই, আপনার জ্ঞাতি-বন্ধু-পরিজন-সৈন্য-রক্ষী সবই নিশ্চয় যাবে !'

প্রসেনজিৎ চিন্তিত হয়ে বলেন, 'জ্ঞাতি-বন্ধু ? সে তো অনেক ? আমি কয়েক জন দেহরক্ষী, নির্দিষ্ট সংখ্যক দাস-দাসী আর মহাদেবী মগধকুমারী ও দেবী মল্লিকাকে নিয়ে যাবার কথা ভাবছিলাম।'

মিগার বলে উঠলেন, 'না, মহারাজ, আমার পুত্রের আবাহে আপনার অন্তঃপুরিকারা সবাই যাবেন। অন্যান্য রানিরাই বা বাদ থাকবেন কেন ? তাঁদের রক্ষার জন্য এবং আপনার মর্যাদারক্ষার জন্য যতজন দাসদাসী, রক্ষী ইত্যাদি লাগে সবাইকেই নিতে হবে।'

প্রসেনজিৎ বললেন, 'তাহলে গহপতি, আপনি একবার সাকেতের শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করে পাঠান। শুধু শুধু তাঁকে বিব্রত করতে আমার ইচ্ছা নেই।'

মিগার সংবাদ পাঠালেন, 'মহাসেট্‌ঠি, আপনার কন্যাকে বধূ করে আনতে পারছি বলে নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মানিত বোধ করছি। মহারাজ প্রসেনজিৎ আমাকে অতিশয় অনুগ্রহ করেন। কন্যাকে আনতে তিনিও আমার সঙ্গে যেতে চান। কত জন বরযাত্রী গেলে আপনার অসুবিধা হয় না, তা একটু যদি পূর্বাহ্ণে জানান।'

অশ্বারোহী দূত দু দিনের মধ্যেই ধনঞ্জয়ের লিপি নিয়ে এলো : 'মাননীয় শ্রেষ্ঠীবর মিগার, আপনার নিজের পরিবার, জ্ঞাতি, জ্ঞাতক, মাতৃকুল, পিতৃকুল, শ্বশুরকুলে যাঁরা আছেন তাঁরা তো সকলে আসবেনই, মহারাজ পসেনদিও তাঁর যতজন সৈন্য, যতজন রক্ষী লাগবে সবাইকে নিয়ে আমার কন্যার বিবাহোৎসবে আসবেন।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রমণীদের মধ্যে একমাত্র দেবী মল্লিকা ছাড়া আর কেউই গেলেন না। নারীদের এভাবে বরানুগমন করার প্রথা নেই। সে যত সমারোহের বিবাহই হোক। দেবী মল্লিকার কথা স্বতন্ত্র। মাত্র দু-চার বছর হল রাজা পসেনদি তাঁকে বিবাহ করেছেন। গিয়েছিলেন কোশল সীমান্তে বিদ্রোহ দমন করতে। এই সীমান্তের অঞ্চলগুলিতে মাণ্ডলিক রাজারা অধিকার পেতে পেতে এক সময়ে মনে করতে থাকে তারাই আসল রাজা। ইচ্ছামতো কর বসায়, বিচার করে প্রজাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে থাকে, রাজা পসেনদিকে গ্রাহ্যই করে না। কোশল রাজ্য, কাশী যুক্ত হবার পর একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। শাক্য, কোলিয়, কালাম, এরা সকলেই কোশলের পদানত। রাজার রয়েছে সুযোগ্য সেনাপতিদ্বয় বন্ধুলমল্ল ও দীর্ঘচারায়ণ। রাজা নিজে অত্যন্ত বিলাসী হলেও একবার ক্রুদ্ধ হলে যে আর রক্ষা নেই এ কথা এরা ভুলে যায়। পসেনদি স্বয়ং গিয়েছিলেন বিদ্রোহ দমন করতে। ফেরবার পথে একটি অতি শোভন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলেন ক্লান্ত হয়ে। ওই পুষ্পোদ্যানের স্বত্ব ছিল যাঁর তিনি একজন সুবিখ্যাত মালাকার। মল্লিকা তাঁরই কন্যা। রাজাকে শ্রান্ত ক্লান্ত দেখে মল্লিকা তাঁর ঘোড়াটির রজ্জু ধরে রাজাকে জল পান করতে দেয়। এবং ক্লান্তিতে অভিভূত হয়ে রাজা ঘুমিয়ে পড়লে, কঠিন ভূমিতে এই রাজপুরুষের কষ্ট হবে মনে করে তাঁর মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিয়ে—রাজার ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত অচলভাবে বসে থাকে। —কন্যাটি সুশীলা, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী তো বটেই তার ওপর অতি সুন্দরী। এমন নারী পসেনদির চোখে পড়লে রাজান্তঃপুরে সে যাবে না এমন হতে পারে না। মল্লিকা রাজা জেনে তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, কিন্তু ঘুম ভাঙলে পসেনদি তৎক্ষণাৎ নিজের পরিচয় দিলেন এবং মল্লিকার পিতার কাছে গিয়ে কন্যাটির পাণি প্রার্থনা করলেন। এরকম তো কতই হয়! কয়েক মাস পরে এই রমণীর ওপর থেকে রাজার ঝোঁক চলে যায় সে তখন রাজার অসংখ্য অন্তঃপুরিকাদের একজন মাত্র হয়ে যায়। কিন্তু মল্লিকার ভাগ্য তেমন হল না। একেই তো তাঁকে রাজা অগ্রমহিষী করলেন, তারপর মাসের পর মাস শুধু মল্লিকার গৃহেই রাত্রিযাপন করতে লাগলেন। দু'জনের মধ্যে গভীর প্রণয়। এখন রাজা দেবী মল্লিকাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। তাই তিনিও সঙ্গে যাবেন। পাঁচ শতাধিক সৈন্য; রক্ষী, আরও পাঁচ শতাধিক জ্ঞাতি, বন্ধু, পরিজন নিয়ে রাজার মঙ্গল-হস্তী সহ বহু হস্তী, ঘোড়া, রথ ইত্যাদি নিয়ে মহানন্দে সাকেত অভিমুখে যাত্রা করলেন মিগার শ্রেষ্ঠী। সময়টা বর্ষা। আকাশ প্রায় সর্বক্ষণই মেঘাচ্ছন্ন। যে কোনও মুহূর্তে আকাশ থেকে নেমে আসবে বারিধারা। পথঘাট হবে কর্দমাক্ত। স্কন্ধাবারে বাস করা অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে। তার ওপর বর্ষার সময়ে নানাপ্রকার কীট, সাপ, পতঙ্গ-পিপীলিকায় ছেয়ে যাবে চতুর্দিক। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বর্ষা উত্তীর্ণ করে শীতের প্রারম্ভে বিবাহোৎসব করতে চেয়েছিলেন। তখন আকাশ থাকবে পরিষ্কার। বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ। কীট-পতঙ্গের উপদ্রব থাকবে না। সর্পেরা ঘুমোতে যাবে। বিবাহের জন্য এই সময়ই প্রশস্ত। তা ছাড়া কন্যার অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করতে সময় লাগবে। কিন্তু মিগার মনে মনে ধূর্ত হাসি হেসে ধনঞ্জয়ের এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন। অবশ্যই অতি সাবধান সম্ভ্রমের সঙ্গে। শ্রেষ্ঠী ক্ষেপে না যায়। তিনি বলে পাঠালেন বাগ্-দানের পর আমাদের কুলে বধূকে এতদিন পিতৃগৃহে ফেলে রাখবার নিয়ম নেই। পুন্নবদ্ধনের মাতা তাঁর নির্বাচনের দুই পক্ষকালের মধ্যে শ্বশুরগৃহে এসেছিলেন। অতএব শ্রেষ্ঠিবর আপনি কন্যাকে প্রস্তুত করুন। আর অলঙ্কার বস্ত্রাদির জন্য অত সময় নেওয়ার প্রয়োজন কী! একমাত্র পুত্রের বধূর সম্মানরক্ষার জন্য মিগার যথাসম্ভব অলঙ্কারাদির ব্যবস্থা করেছেন।

এই লিপি পাবার পর সাকেতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। পেটিকার পর পেটিকা বস্ত্র আসছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারাণসীর নানা রঙের দুকূল, স্বর্ণসূত্রী শাটিকা, রূপা এবং সোনার সুতোর ফুল তোলা বসন, বহুপ্রকার কার্পাসিক, ক্ষৌমবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, সূক্ষ্ম উর্ণার বস্ত্র, সেই সঙ্গে মুক্তা, গজদন্ত, হীরা, পুষ্পরাগ, মরকত, বৈদূর্য, মণি-মাণিক্যের স্তূপ হয়ে গেছে। এই সমস্ত নিয়ে নানা চিত্র করতে ব্যস্ত দেবী সুমনা। সেই সব চিত্র দেখে দেখে সুবন্নকারেরা গহনা প্রস্তুত করছে। তন্তুবায়েরা বস্ত্র বয়ন করছে। বিবাহমণ্ডপের সজ্জা কেমন হবে, বিশাখার অনুচরীরাই বা কীভাবে সজ্জিত হবে, সঙ্গে কী নেবে, পুরনারীরা, দাস-দাসীরা তারা কী বস্ত্র এবং অলংকার পরবে...দেবী সুমনার নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই।

মিগারের পত্রটি দেখে ধনঞ্জয় খানিকটা বিমূঢ় হয়ে অন্তঃপুরে এলেন। —'সুমনা, প্রিয়ে দেখো তো মিগার শ্রেষ্ঠীর অবিবেচনা। এই বর্ষাতেই সে বিবাহ দিতে চায়। ছয় সাত শতেরও অধিক সম্মানিত অতিথি আসছেন শ্রাবস্তী থেকে। এদিকে সাকেতের সবাইকে, গ্রামগুলি, ভদ্দিয়, রাজগৃহ সর্বত্রই তো নিমন্ত্রণ পাঠাতে হবে।'

সুমনা বললেন, 'সে কী! "মহালতা পসাদন" নির্মাণ করতেই তো তিন মাস সময় লাগবে সুবন্নকারেরা বলছে। তার আগে তো হবে না!'

ধনঞ্জয় বললেন, 'বুঝতে পারছি না। মিগার শ্রেষ্ঠী কিংবা রাজা প্রসেনজিৎ কি আমার ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে চান?'

'কেন? যাঁরা নিজেরাই কন্যাকে বরণ করেছেন, যৌতুকের কথা চিন্তা করেননি।' সহসা তাঁরা তোমার ক্ষমতার পরীক্ষা করতে চাইবেন কেন?'

ধনঞ্জয় অপ্রতিভ মুখে বললেন, 'একটা কথা অসতর্কভাবে বলে ফেলেছিলাম প্রিয়ে, বুঝতে পারছি না এসব তারই প্রতিক্রিয়া কি না।'

'কী কথা!' সুমনা অবাক হয়ে বললেন।

'শ্রেষ্ঠীর উপার্জনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তর শুনে মনে হল ইনি আমার সঙ্গে কোনও তুলনাতেই আসেন না। সে কথাটা ব্রাহ্মণদের সামনেই বলে ফেলেছি।'

সুমনা রাগ করে বললেন, 'তুমি বড় অবিনয়ী সেট্‌ঠি। কতবার তোমাকে বলেছি প্রকৃত ধনী যে, সে কখনও দম্ভ দেখায় না। শ্বশুর পিতাকে দেখেছ কখনও সম্পদ নিয়ে গর্ব করতে, অথচ তাঁর তুল্য ধনশালী আর কে আছে ভদ্দিয়তে? তুমি যে অন্তত তিন পুরুষে ধনী সন্তান তোমার আচরণ দেখে কখনও কখনও তা মনে হয় না।'

ধনঞ্জয় প্রকৃতই অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানো সুমনা, কত বিপজ্জনক বাণিজ্যযাত্রা করে, কত অজপথ, জঙ্গুপথ, বেত্রপথ, শঙ্কুপথ পার হয়ে নিজের বীর্যে, বুদ্ধিতে ধন অর্জন করেছি। অত ধনী পিতার পুত্র হয়েও তাঁর ওপর নির্ভর করিনি। আজ যে সাকেতের এই শ্রী-সমৃদ্ধি তার কিছুই কি ধনঞ্জয় ব্যতীত হত? তাই দম্ভ নয়, একটা প্রসন্নতা, প্রত্যয় সব সময়ে আমার হৃদয় অধিকার করে থাকে। আর সংখ্যা গণনার কথাই যদি বলো, চার শত কোটি যে অশীতিসহস্র কোটির কাছে এক কাহনও নয়, এ তো অঙ্কপাত করলেই বোঝা যাবে। সহজ, সরল, সত্য কথা। তাই....।'

সুমনা বললেন, 'তাই, যে গৃহে কন্যা দিতে চলেছ, সেই গৃহের গৃহপতির সম্পর্কে এ উক্তি করবে! তার দূতদের সামনে? তোমার কন্যার সুখশান্তি সবই যে নির্ভর করছে তোমার এই আচরণের ওপরে!'

জীবনে এই প্রথম শ্রেষ্ঠীগৃহে দাম্পত্যকলহ লাগল।

ধনঞ্জয় বারবার বলতে চান—তিনি যা সত্য তাই বলেছেন মাত্র। কাউকে অপমান করার জন্য কিছু বলেননি। তা ছাড়া সে সময় তিনি মিগার-পুত্রকে কন্যা দেবার কথা একেবারেই ভাবছিলেন না। সুমনা রাজগৃহ থেকে ফেরবার পর পরিস্থিতির চাপে পড়েই এ বিবাহ স্থির করেছেন।

সুমনা ততই ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'সত্য কথা আর রূঢ় কথার পার্থক্য ধনঞ্জয় কবে বুঝবেন? এর ওপর যে বিসাখার সারা জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করছে!' সুমনা সহসা সংযম হারান না। কিন্তু তাঁর এখনকার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে তিনি আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বাদপ্রতিবাদের মধ্যে বিশাখা কক্ষে প্রবেশ করেছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, 'বিসাখার সুখশান্তি কখনওই এইসব তুচ্ছ কারণের ওপর নির্ভর করবে না মা, তুমি শান্ত হও।'

সুমনা বললেন, 'কিন্তু মা তুই তো জানিস না, ইচ্ছে করলে শ্বশুর-শ্বশ্রূ যে তোকে কী অসহ্য কষ্ট দিতে পারেন, অপমান করতে পারেন, একবার বিবাহ হয়ে গেলে তোকে আমরা এ সব থেকে বাঁচাব কী করে ?'

বিশাখা বলল, 'ইচ্ছে করলেই শ্বশুর-শ্বশ্রূ বা অন্য কেউই ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখাকে কষ্ট দিতে পারেন না মা, অপমান করতেও পারেন না। আমি দেবী সুমনার কন্যা, দেবী পদ্মাবতীর পৌত্রী।'

সে স্বচ্ছন্দ কিন্তু দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ভাবে কোনও কঠিনতা নেই। কিন্তু রানির মতো এক সহজ মর্যাদাবোধ তাকে ঘিরে। এই বিশাখাকে কেউ কষ্ট দিতে পারে, কেউ এর অমর্যাদা করতে পারে সত্যিই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সদ্য ষোড়শী এই কন্যা তার পিতৃ-মাতৃকুলের গণ্ডির বাইরে যে বিশাল সংসার আছে তার কতটুকু জানে! শ্বশুরগৃহ হল নৈর্ঋত কোণের মতো, সেখান থেকে আসে যত দুঃখ, যত অনাদর, ভাগ্য মন্দ হলে! বিশাখার ভাগ্য কি ভালো! ভালো হলে রাজ-পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার ভয়ে এমন বায়ুবেগে হ্রস্ব-দীর্ঘ কোনও চিন্তা না করে একটা বিবাহ স্থির করে ফেলতে হয় কেন ? ধনঞ্জয় যা বলছেন তাতে তো সুমনার বুক কাঁপছে।

তিনি সভয়ে বললেন, 'কিন্তু তুমি যা বলছ তাতে মনে হচ্ছে আমরা বিশাখাকে যে ভাবে লালন-পালন করেছি তাতে ও সেখানে গিয়ে থাকবেই বা কী করে ?'

এইবার ধনঞ্জয় হেসে বললেন, 'বিশাখাকে মিগার শ্রেষ্ঠীর ঘরে থাকতে হবে কেন ?'

'তার অর্থ ! কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাবে না ?'

'পাঠাব না কেন ? কিন্তু আমার কন্যা তার নিজের সমস্ত প্রয়োজন, নিত্যকৃত্য এবং বিলাসাদির ব্যয়ের জন্য যত অর্থ লাগবে সবই এখান থেকে নিয়ে যাবে। তার দাস-দাসী, সহচরীরা তাকে ঘিরে থাকবে। কোনও কিছুর জন্যই মিগার শ্রেষ্ঠীর মুখাপেক্ষী হতে হবে না।'

'তাহলে তো আরও ভালো ! কন্যার দুর্ভাগ্যের পথটি একেবারে বাঁধিয়ে দিচ্ছ।'

'কেন ? তুমি কি বলতে চাও ধনঞ্জয় তার কন্যাকে যৌতুক দেবে না ? দাস-দাসী দেবে না ? মহাদেবী কোশলকুমারী যখন রাজা বিম্বিসারের মহিষী হয়ে আসেন, কাশী রাজ্যের একটি বৃহৎ গ্রাম শুধু স্নানের ব্যয়-নির্বাহ করবার জন্যই পেয়েছিলেন, তা জানো ?

'তুমি কি মহারাজ মহাকোশলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছ নাকি ?'

'না, তা নয়।' ধনঞ্জয় কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, 'কিন্তু আমার কন্যার অন্ন-বস্ত্র-প্রসাধন-দান-ধ্যান-আমোদ-প্রমোদের জন্য আমি যদি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী যৌতুক দিই কার কী বলার থাকতে পারে ! আর ধরো যে গাভীগুলি পাঠাবো তাদের দুধ তো শুধু বিশাখা আর তার সহচরী দাস-দাসীরাই পান করে ফুরোতে পারবে না, মিগারও খাবেন, তাঁর ধর্মপত্নীও খাবেন, তাঁদের পরিজনদের ভাগ্যেও কিছু মাত্র অল্প পড়বে না। আর বলদ যে সব যাচ্ছে, সেগুলি দিয়ে তো বিশাখা ভূমি কর্ষণ করাবে না !'

'কী অর্থ এসব কথার ?' দেবী সুমনা বিমূঢ় হয়ে বললেন। তিনি একবার হাস্যমুখী কন্যার দিকে তাকাচ্ছেন, আর একবার তাকাচ্ছেন দুষ্টু হাসিতে ভরা মুখ স্বামীর দিকে।' 'বুঝতে যদি না পারো তাহলে বুঝতে হবে অলঙ্কারের রত্ন গণনা করতে করতে আর গহনার রত্নসংস্থানের চিত্র করতে করতে তোমার মস্তিষ্কটি একেবারে সোনা রূপা মণি মুক্তাতেই ঠাসা হয়ে গেছে প্রিয়ে, না হলে...'

বিশাখা হাসতে হাসতে বলল, 'মা, পিতা বলতে চাইছেন অতিরিক্ত যৌতুক পেয়ে আমার শ্বশুর আহ্লাদিতই হবেন। পিতাকে অহংকারী ভেবে ক্রুদ্ধ হবার কোনও কারণ ঘটবে না।'

সুমনা বললেন, 'কত গাভী, কত বলদ দেবে শুনি ?'

'যত গাভী যেতে চায়, যত বলদ যেতে চায়।'

'পশুদের বিসাখা নিজের হাতে যত্ন করে, ওরা বিসাখাকে যত চেনে আর কাউকে তত চেনে না। তা ছাড়া গো-পালকদের মতো বিসাখা তো কখনও ওদের প্রহার করে না। বৎসগুলিকে সরিয়ে রেখে, দুধ দোহন করে নেয় না, সে যায় শুধু ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে, ক্ষতস্থানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রলেপ লাগিয়ে দিতে কিংবা মধুমাখা ঘাসের গুচ্ছ খাওয়াতে। ওরা বিসাখাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে, ল্যাজ তুলে সব ওর পেছন পেছন চলে যাবে।'

'তাহলে সুমনা তুমি গাভীগুলিকে সব দিতে চাইছ না। শুনছিস বিশাখা, মায়ের মনে ভয় হয়েছে তাঁর গোয়াল বুঝি শূন্য হয়ে যায়।'

সুমনা রঙ্গরসিকতার ধার দিয়েও গেলেন না, বললেন, 'যার হৃদয় শূন্য হয়ে যেতে চলেছে তার গোয়ালে গরু থাকলেই বা কী! না থাকলেই বা কী! এ সব অর্থহীন্ কথা বলো না সেট্‌ঠি। কিন্তু এত গোধন পাঠালে, সাবত্থি সেট্‌ঠি তা রাখবেন কোথায়?'

'নতুন নতুন গোশালা নির্মাণ করিয়ে নেবেন, আমি যেমন এই বর্ষায় অতিথিদের রাখবার জন্য নতুন নতুন গৃহ প্রস্তুত করছি।' ধনঞ্জয়ের চোখ ঝিকমিক করছে।

'আর তাদের পালন? পালন করবার জন্যেও তো বহু লোক চাই!'

'চাই-ই তো। তাই-ই অপরিমিত দাস-দাসী পাঠাচ্ছি।'

'বাঃ, আর সেই সব দাস-দাসীর পালন?'

'তার জন্য আবার শকটের পর শকট কার্ষাপণ যাবে।'

'সেগুলি ব্যয় হয়ে গেলে?'

'ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ধনকে সন্তানবতী করার উপায় জানে। সাকেত থেকে শ্রাবস্তী মাত্র এক দিনের পথ। ওদের লালন-পালন বিশাখাই করবে।'

'কিন্তু এত দাস-দাসী, সহচরী ইত্যাদি নিয়ে থাকবার স্থান সঙ্কুলান আছে কি না মিগার সেট্‌ঠির গৃহে সে সংবাদ নিয়েছো? তার নিজেরও নিশ্চয় অনেক আছে।'

'তা আছে। এবং এত দাস-দাসীর স্থান হওয়া সত্যিই সমস্যা।'

'তবে?'

'বিশাখার জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদের নির্মাণ করিয়ে দিচ্ছি। বারাণসী বর্ধকিরা এখানকার কাজ শেষ করেই শ্রাবস্তী চলে যাবে।'

সুমনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু সেট্‌ঠি, এতটা কি ভালো করছ? স্বতন্ত্র প্রাসাদে স্বতন্ত্র দাসদাসী নিয়ে সুখা থাকবে, এ তো রাজবাড়ি নয়, সেট্‌ঠি বাড়ি। গহপতির কি এসব ভালো লাগবে?'

ধনঞ্জয় বললেন, 'আমরা গিয়ে তাঁর পুত্রকে প্রার্থনা করতে যাইনি সুমনা। তাঁরাই সারা মধ্যদেশ ঘুরে আমার কন্যাটিকে সর্বোত্তম বিবেচনা করে, ঝুপ করে তার গলায় আশীর্বাদী হারটি পরিয়ে দিয়ে গেছেন। দূত ব্রাহ্মণদের কাছে নিশ্চয় শুনেওছেন ধনঞ্জয় তার অতিথিদের কীভাবে রাখে। সুতরাং কন্যাকে কীভাবে রাখে সে কথা বলাই বাহুল্য। এমন ঘর থেকে কন্যা নিয়ে যাচ্ছে, মিগার শ্রেষ্ঠীরই তো উচিত স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেওয়া।'

'কী করে জানলে করাননি?'

'ভালো তো। করিয়ে থাকলে ভালোই। অধিক থাকলেই বা ক্ষতি কী? তাঁরটাও থাক, আমারটাও থাক।'

সুমনা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কৃপণং হ দুহিতা।'

'তার সুখের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করছি তবু বলবে দুহিতা কৃপণা? দুঃখিনী?' ধনঞ্জয় সকাতরে বললেন।

সুমনা বললেন, 'সেইজন্যেই তো বললাম! এত ধনসম্পদ! এমন পিতা! তবু এই পরম স্নেহের ধন দুহিতাটিকে পর-ঘরে পাঠাতে হয়। তার সুখদুঃখ নির্ভর করে এমন কতকগুলি মানুষের ওপর যাদের এতদিন ধরে সে চেনেইনি। জানেইনি। কী তাদের অভ্যাস, কী তাদের চরিত্র, তারা কী চায়, এইসব জানতে বুঝতেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা তার ব্যয় হয়ে যাবে। বালিকার অপূর্ব সরলতার স্থান নেবে অভিজ্ঞতাপক্ক সংসারবুদ্ধি। কিশোরী হয়ে যাবে বৃদ্ধা। কৃপণা, বড়ই দুঃখিনী এই দুহিতারা।'

সুমনার বিষণ্ণ মুখ দেখে ধনঞ্জয় কোমল কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু সুমনা, তাকে তো জায়াও হতে হবে। সে যদি তোমার মতো সখিসম্মিত জায়া হয়!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমনা বললেন, 'সে সখিসম্মিত হবে, কিন্তু তার পতিটি যদি সখাসম্মিত না হয়, তোমার মতো।'

মাতা-পিতার বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে বিশাখা মাকে আশ্বস্ত করে বেরিয়ে এসেছিল। তার অনেক কাজ। বারাণসীর নিকটবর্তী বর্ধকিগ্রাম থেকে পাঁচ শতাধিক বর্ধকি এসেছে। সরযূতীরে যেখানে নৌবণিকরা এসে থাকে, বিশ্রাম করে, তারই কাছাকাছি তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। নগরের মধ্যে যে কটি শোভন গৃহ পাওয়া গেছে সেগুলি তো রাজা উগ্রসেনের অনুমতিক্রমে নেওয়া হয়েছেই। তা ছাড়া বেশ কিছু অস্থায়ী বাড়ি প্রস্তুত হবে। এই বর্ধকিরা নিজেদের গ্রামেই গৃহের স্তম্ভ, দ্বার, বাতায়ন, মেঝের জন্য বড় বড় পাটা প্রস্তুত করে আনে। সাকেতের স্থপতিজ্যেষ্ঠক অনুবিন্দ বিশাখার সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের দিয়ে কতকগুলি অস্থায়ী হর্ম্য করাচ্ছেন। কোনটি সপত্নীক মহারাজ প্রসেনজিতের জন্য যাতে তিনি ব্যক্তিগত দাসী ও রক্ষীদের নিয়ে থাকতে পারেন। কোনটি তার শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠীর জন্য। পুত্র এবং ভ্রাতা ও জ্ঞাতিদের নিয়ে তিনি থাকতে পারবেন। কোনটি তাঁর বন্ধু স্থানীয় মহাশ্রেষ্ঠী সুদত্তর। সৈন্যদের থাকবার জন্য অর্ধক্রোশ দীর্ঘ, অশ্বক্ষুরাকৃতি একটি বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে। সঙ্গেই পানীয় জলের জন্য একটি, স্নানের জন্য আরেকটি পুকুর। এই সমস্ত গৃহের সজ্জা কী হবে, পীঠিকাগুলি কেমন, পালংকের কী পরিমাপ, ভোজনপট, ফলকাদি, দীপাধার, পেটিকা বস্ত্রাচ্ছাদন ইত্যাদির পরিকল্পনার ভার বিশাখার। অতিথিশালার সংলগ্ন উদ্যানটিতে শয্যার উপকরণাদি প্রস্তুত হচ্ছে। তুলের আঁশে উদ্যানটিতে যেন কুয়াশা লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। বিশাখার দাসীরা মাঝে মাঝে তত্ত্বাবধান করবার জন্য গিয়ে আপাদমস্তক আঁশ জড়িয়ে এসে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। প্রত্যেকটি গৃহের সংলগ্ন রন্ধনশালা রাখা হয়েছে। সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক পাচক, দাস-দাসী তৈজসাদি। বরানুগামী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যা ইচ্ছা খেতে পারবেন। বিশাখা একটি বৃহৎ খাদ্যতালিকা করেছে, প্রত্যেকটি গৃহের জন্য। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, সায়মাশ, মধ্যবর্তী সময়ের জন্য ফল ও পানীয়। পাচকজ্যেষ্ঠ অতিথিদের রুচি বুঝে খাদ্য পাক করবে।

কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতরা থাকবেন শ্রেষ্ঠীগৃহের অতিথিশালায়, বিশাল সপ্তভূমিক বিমানের বহু কক্ষে। সুমনার মহানসে বহুবিধ পিষ্টক, মোদক, অপূপ, শুষ্ক খজ্জ প্রস্তুত হয়ে চলেছে। অপরিমিত দুগ্ধের নবনীত তোলা হচ্ছে, ক্ষীর প্রস্তুত হচ্ছে, ভারে ভারে আসছে, মাংসর জন্য পশু, পাখি। রন্ধনশালার বিভিন্ন ভাগে এসব হচ্ছে। ফোটানো, সিজানো, ভাপানো, পোড়ানো, সাঁতলানো, ভাজার গন্ধে, পাকশালা ম-ম করছে।

নানাপ্রকার শাক—লাউ, কুমড়ো, বার্তাকু, শিম্বি, ঝিঙা, কন্দ, ইত্যাদি কুট্টিতকরণ হচ্ছে। বাটা হচ্ছে নানারকম সুগন্ধি ভোজ্যে দেওয়ার জন্য।

ভদ্দিয় থেকে এসে গেছেন বিশাখার সব জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত ও তাঁদের পত্নীরা। সব ভাই ভগ্নী। পিতামহ মেণ্ডকপিতা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে গভীর পরামর্শে রত। তাঁর কক্ষ থেকে ধনঞ্জয়কে কেবলই বার হতে দেখা যাচ্ছে। বিশাখার মাতুলগৃহ রাজগৃহ থেকেও ধীরে ধীরে এসে পৌঁছচ্ছেন অনেকে। কিন্তু-আত্মীয় পরিজনের চেয়েও সংখ্যায় বেশি সাকেত এবং তার সন্নিহিত গ্রামগুলির মানুষ। কস্‌সক গ্রামগুলিই তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে কম্মার গ্রাম, কুম্ভকার গ্রাম, কৈবর্ত গ্রাম, তন্তুবায় গ্রাম, নিষাদ গ্রাম, বেণ, রথকার, পুক্কুস, চণ্ডাল—সবাই এই বিবাহোৎসবে কোনও না কোনওভাবে জড়িত, নিযুক্ত। ভোজের নিমন্ত্রণে তাদের কেউই বাদ যায়নি। বর্চ্চকুটিরগুলির মল পরিষ্কার করার জন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে শত শত চণ্ডাল। পথগুলি, দেবালয় ও উদ্যানগুলি সব সময় পরিচ্ছন্ন ও জলসিঞ্চিত রাখার জন্য শত শত পুক্কুস, নিষাদেরা মাংসের জোগান দিয়ে যাচ্ছে, বরাহমাংস, গোমাংস, মেষমাংস, হরিণমাংস, তা ছাড়াও হংস, ময়ূর, বর্তক আসছে রাশি রাশি।

আচার্য ক্ষত্রপাণির সঙ্গে নিভৃতে বহু আলোচনা করে স্থির হল বর্ষা ঋতুর শেষতম লগ্নে কন্যাদান করা হবে। ইতিমধ্যে বরপক্ষ আসছে আসুক। তাঁদের অভ্যর্থনা, আদর যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়। মেণ্ডক বললেন, 'মহারাজ পসেনদি কি অতদিন অপেক্ষা করতে রাজি হবেন ? তাঁর রাজকার্য রয়েছে।'

ধনঞ্জয় হেসে বললেন, 'মহারাজ পসেনদিকে যতদূর বুঝেছি তিনি অত্যন্ত প্রমোদপ্রিয় এবং ভোগবিলাসী। আসছেন বাবাতা রাজ্ঞী মল্লিকাদেবীর সঙ্গে। রাজ্য দেখবার জন্য তো তাঁর সুযোগ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাপতিদ্বয় রইলই। সর্বার্থক, অন্যান্য অমাত্যরা, মহিষী মগধদেবী এঁরাও রইলেন। আমার তো মনে হয় কিছুকাল বিলাসে আলস্যে কাটাতে পারলে মহারাজ আর কিছু চাইবেন না।'

মেণ্ডক বললেন, 'এ কেমন রাজা তোমাদের পুত্র ? রাজার তো অমাত্য, মহামাত্র, সেনাপতি এ সব থাকবেই, তাই বলে এতদিন শুধু বিলাস আর ভোজনের লোভে রাজকার্য থেকে অব্যাহতি নিয়ে এখানে থাকবেন এক শ্রেষ্ঠী-কন্যার বিবাহে ! আমি এ প্রকার দেখিনি। আমাদের মগধরাজ এরূপ নয়। দেখো, পসেনদির রাজ্য বেশি দিন থাকবে না। রাজ্যসীমা তো বাড়িয়েছেন মহারাজাধিরাজ মহাকোশল। ইনি শুধু ভোগ করছেন। আমাদের মহারাজকে দেখো ! রাজকার্যে কী গম্ভীর ! প্রজাদের সুখ-সুবিধা দেখেন স্বয়ং। অপরাধীদের বিচারের জন্য বিনিশ্চয়ামাত্যর ওপর নির্ভর করেন না। এমন কি মাণ্ডলিক রাজাদের ওপরও নির্ভর করেন না। এই তো ক'মাস আগে সহস্র সহস্র গ্রামণীদের নিয়ে সভা করলেন। ভদ্দিয়র এক গ্রামভোজকের কাছে শুনলাম প্রত্যেকের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কথা বলেছেন। অতি মধুর অথচ দৃঢ় তাঁর আচরণ। প্রজারা ক্রমশই সেনিয় বিম্বিসারের ভক্ত হয়ে পড়ছে। মহা মহা সন্ন্যাসী শ্রমণরাও কিন্তু তাঁর রাজ্যে শান্তি আছে বলে সেখানেই বসবাস করছেন। রাজগৃহে ঢুকতে পশ্চিম দিকের পাহাড়টির তো নামই হয়ে গেল ঋষিগিরি। এত সন্ন্যাসী সেখানে কুটির নির্মাণ করে সাধনা করছেন।'

ধনঞ্জয় বললেন, 'দেব-দ্বিজে ভক্তি রাজা পসেনদিরও কিছু অল্প নেই পিতা। তিনি যে ভগবান বুদ্ধের ভক্ত শুনেছি। এদিকে পূরণ কাস্যপও থাকেন ওখানেই। পোক্খরসাদি ও তারুকখ এই দুই ব্রাহ্মণকে তো অতিশয় ভক্তি করেন। তবে এ কথা ঠিক, এ রাজা বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তক্ষশিলার স্নাতক, এত বড় বংশে জন্ম, কিন্তু সুন্দরী নারী আর সু-রসাল ভোজ্য পেলে আর কিছু চান না।'

মেণ্ডক বললেন, 'যাক, রাজচরিত্র নিয়ে আলোচনা করে এখন আর কী লাভ ধনঞ্জয়। তোমার ভাগ্য তোমাকে মহারাজ পসেনদির রাজ্যে এনে ফেলেছে। তবে সাকেত তো শুনছি নাকি কোশলের দ্বিতীয় রাজধানী হয়ে উঠেছে। এ কথা কি সত্য ?'

ধনঞ্জয় গর্বভরে বললেন, 'না পিতা, সাকেত নয়, দক্ষিণ কোশলের রাজধানী কুশাবতী। কিন্তু আপনার পুত্র এখানে এসে বসবাস করবার পর থেকে সাকেতের এতটাই শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে যে লোকে মনে করে সাকেতই বুঝি-বা রাজধানী। লোকের মুখে মুখে চারণদের গানে গানে এ কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। হয়ত শীঘ্রই সত্যি হয়ে উঠবে।'

মেণ্ডক বললেন, 'তোমার মতো যশস্বী পুত্র গর্ভে ধারণ করেছেন বলে তোমার জননী দেবী পদ্মাবতী ধন্য। ধন্য আমি, তোমার পিতাও। অন্য পুত্রগুলি আমার সম্পদ রক্ষা করছে ঠিকই। কিন্তু তোমার মতো সাহসী, বীর্যবান, বুদ্ধিমান তারা কেউ নয়। শুনলাম তুমি সমুদ্র বাণিজ্যেও উৎসাহী। যাচ্ছ নাকি ?'

'এখনও স্থির করিনি।' ধনঞ্জয় সলজ্জে বললেন। আসলে দেবী সুমনা এবং কন্যা বিশাখাকে ছেড়ে অতিশয় বিপজ্জনক কিছু করবার উৎসাহ তিনি অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছেন। যা করেছেন সেই প্রথম যৌবনে, মধ্যযৌবনে। এখন এত সম্পদ, এবং সেগুলি বাড়াবার এত কৌশল তিনি গৃহে বসে বসেই বার করতে পারেন মাথা থেকে যে সমুদ্রযাত্রার ঝুঁকি আর নিতে ইচ্ছা করে না।

মেণ্ডক বললেন, 'সে যাই হোক, রাজা এবং অন্যান্য অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবস্থাদি করেছ তো ?'

'নিশ্চয়ই। লঙ্ঘন-নর্তক আনিয়েছি। আনিয়েছি নট, নটক, কুম্ভথূনিক, ঐন্দ্রজালিক, সোকজ্জায়িক। ঘোড়া এবং হাতির খেলাও দেখানো হবে। পণ্যাঙ্গনাও আনিয়েছি নানাপ্রকার। বেশ্যা, রূপাজীবা ও ভালো ভালো গণিকা। এরা নৃত্যগীতে খুবই কুশলী। সঙ্গে অবশ্যই বংশী, বীণা, মৃদঙ্গ, পটহ বাদকেরা আসবে। অক্ষক্রীড়ার জন্য মণ্ডপ করিয়েছি বিশটি। পিতা, আমাদের ভদ্দিয়র বাড়ির দাসেদের মধ্যে কেউ উচ্চস্তরের ইন্দ্রজাল দেখাক না। পারবে না ?

মেণ্ডক বললেন, 'শল্য আর সুলভকে শিখিয়েছিলাম যত্ন নিয়ে। দু'জনকেই মুক্তি দিয়েছি। তারা এখন কোন দেশে বিচরণ করছে জানি না তো ! তুমি যদি আগে জানাতে দূত পাঠিয়ে দেখতে পারতাম। তোমার কন্যার বিবাহোৎসব শুনলে তারা নিশ্চয়ই সব কাজ ফেলে আসত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেণ্ডক মৃদুমৃদু হাসছেন দেখে ধনঞ্জয় বললেন, 'পিতা আপনি হাসছেন কেন ?'

মেণ্ডক বললেন, 'তোমার কন্যা বালিকা বয়সে আমার কাছে প্রায়ই একটি প্রার্থনা জানাত. তাই ভেবে হাসছি।'

'কী প্রার্থনা, পিতা ?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন ধনঞ্জয়।

'ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজাল শিখতে চেয়েছিল। ভাবছি দুটি-একটি গুপ্তবিদ্যা শ্রাবস্তী যাবার আগে শিখিয়ে দেবো কি না।' মেণ্ডক ও ধনঞ্জয় দু'জনেই প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন।

১৬

প্রত্যূষ। স্নিগ্ধ আকাশ। স্নিগ্ধ বাতাস। শ্রীমতীর গৃহ থেকে বেরিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে চণক। কাল মধ্যরাতে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথগুলি তাই ভিজে। বেশির ভাগ বিপণিই এখনও খোলেনি। পথ ঝাঁট দিতে শুধু বেরিয়ে পড়েছে কিছু পথমার্জক। রাতের প্রহরা সেরে গৃহে ফিরছে নগরদ্বারিকরা, নগররক্ষকরা। সারা রাত আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে কিছু রসিক ব্যক্তিও এখন ঈষৎ লাল চোখে, বিস্রস্ত বেশবাসে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কোনও কোনও পানাগারের বোধ হয় বিশেষ অনুমতি নেওয়া আছে। সারা রাতই মনে হয় খোলা থাকে। ওখানে থাকে দ্যূতক্রীড়ারও ব্যবস্থা। একটি দীর্ঘদেহী, অত্যন্ত কৃশকায় রুগ্‌ণ আকৃতির ব্যক্তি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে এলো। দেখেই বোঝা যায় পাশা খেলায় যা-যা পণ রেখেছিল সবগুলিই হেরে গেছে। বোধ হয় সর্বস্বান্ত। এদের তক্ষশিলাতে যেমন দেখা যায়, তেমন রাজগৃহেও দেখা যায়। অসংযমের রূপ সর্বত্র এক। আজ সন্ধ্যাতেই আবার এ ফিরে আসবে, আবার ঋণ নেবে, নিয়ে পণ রেখে খেলবে, হয়ত সামান্য কিছু জিতবে। কিন্তু হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। চণক ঘোড়ার গতি দ্রুততর করল। তার লক্ষ্য গৃধ্রকূট। এরা বলে গিজ্‌ঝকূট। বড় প্রিয় স্থান চণকের। নির্জন। সহজে ওপরে ওঠা যায়। বৈপুল্ল পর্বত বহু বিস্তৃত এবং উঁচুও খুব। বৈভারে তপোদারামগুলি থাকায় রোগীর ভিড় হয় খুব। ইসিগিলি বা ঋষিগিরিতে কয়েক পা অন্তর অন্তরই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের কুটী। তাই গিজ্‌ঝকূটই চণকের প্রিয় পর্বতশিখর।

পর্বতমূলে পৌঁছবার পর তার মনে হলো ঘোড়াটিকে নিয়েই কি কিছুদূর ওঠা যায় না ? ঘুরে ঘুরে ঘোড়া নিয়ে ওপরে ওঠবার পথ অন্বেষণ করছে, এমন সময়ে পেছনে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। চকিত হয়ে পেছন ফিরে চণক দেখল একটি অশ্বারোহী সৈনিক। বুকে বর্মজালিকা আঁটা। মাথায় করোটিকা শিরস্ত্রাণ। সযত্ন রক্ষিত দাড়ি এবং দীর্ঘ পাকানো গোঁফ। চণকের কাছাকাছি এসে অশ্বারোহী একটি বড় গাছের সঙ্গে ঘোড়াটিকে বাঁধতে লাগল। বাঁধা শেষ হয়ে গেলে অশ্বারোহী বলল, 'এ পাহাড়ে অশ্ব নিয়ে আরোহণ করা সমীচীন নয় ভদ্র।'

চমকে ভালো করে তাকাল চণক অশ্বারোহীর দিকে। তারপর নত হয়ে বলল, 'নমস্কার মহারাজ। একেবারে উষার প্রথম লগ্নেই রাজদর্শন। দিন যাবে ভালো।'

'তুমি আমার ছদ্মবেশ ভেদ করে ফেললে ? এত সহজে ?'

'মাত্র কিছুকাল আগেই আমি গান্ধারের মহামাত্রর কাছে তিরস্কৃত হয়েছি ছদ্মবেশ ভেদ করতে পারিনি বলে। আজ এখানে থাকলে তিনি সুখী হতেন, অধীনস্থ অমাত্যের কিছু উন্নতি হয়েছে দেখে। কিন্তু মহারাজ আপনি বোধ হয় ছদ্মবেশ অন্তত আমার কাছে গোপন করতে চাননি। না-হলে কণ্ঠস্বরের কথা চিন্তা করতেন।'

বিম্বিসার বললেন, 'আচার্যপুত্র, ছদ্মবেশ তোমার কাছ থেকে গোপন করতে চাইনি এ কথা সত্য। কিন্তু কণ্ঠস্বর সম্পর্কে খুব একটা সতর্কতা আমি কখনওই অবলম্বন করি না। এত শ্মশ্রু-গুম্ফ, মুখ এবং দেহের বর্ণ বদল তার পরেও কণ্ঠস্বর বদলাতে হবে ভাবি না তো।'

চণক নিজের ঘোড়াটিকে বেঁধে ফেলে বলল, 'কণ্ঠস্বর একটি অব্যর্থ নির্ণয়-চিহ্ন। চরেরা কণ্ঠস্বরের চর্চা অর্থাৎ কথনভঙ্গি এবং স্বর-শ্রবণ দুটোই অবশ্য শিক্ষিতব্য বলে মনে করে।'

'হবে', বিম্বিসার বললেন, 'আমার ছদ্মবেশ গ্রহণের প্রয়োজন অল্পই হয়। যখন হয়, মৃদু স্বরে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা ছাড়া আর কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি এতদিন। আচ্ছা চণকভদ্র, গান্ধার রাজ্যে কি চরশাস্ত্র খুবই উন্নত ?'

চণক বলল, 'হ্যাঁ মহারাজ। গান্ধার রাজ্যে অন্তর্কলহ অত্যন্ত হতাশাজনকভাবে সক্রিয়। কাশ্মীর, মদ্র, ইত্যাদি সন্নিহিত অঞ্চলগুলি থেকে সব সময়ে অতিকুশলী চরেরা যাতায়াত করছে, এতটুকু ফাঁক পেলেই এইসব রাজ্যগুলি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মদ্র না হয় ভিন্ন রাজ্য, কিন্তু কাশ্মীর তো গান্ধারের অন্তর্ভুক্তই। তবু এই অবস্থা ! ওদিকে অসুর, সুমের, পারস্য দেশ থেকে উপরিশ্যেন পর্বত পেরিয়ে বণিকরা যেমন আসে, তেমন আসে চরেরাও। আমি আগেই বলেছি আপনাকে, পারস্যরাজ কুরুস এদিকে লুব্ধ দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তাঁর ধারণা এই দেশের মাটিতে সোনার রেণু মিশে আছে। সোনার লোভ বিষম লোভ। এদিকে আবার গান্ধার রাজসভায় অমাত্যদের মধ্যে সবসময়ে একটা ক্রূর প্রতিযোগিতা চলে— এতে অংশ নেন অন্তঃপুরিকারাও। অমাত্য পদ ওখানে একরকম পুরুষানুক্রমিক। রাজার ইচ্ছে থাকলেও নতুন কাউকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে পারেন না।... সত্যি কথা বলতে কি রাজার চেয়ে অমাত্যদের ক্ষমতা অধিক। অতএব...'

বিম্বিসার বললেন, 'চলো আচার্যপুত্র আরও ওপরে যাই। এখানে আমাকে মহারাজ বলে সম্বোধন করা ঠিক হবে না। শুধু ভদ্র বলো।'

কিছুক্ষণ পর চণক বলল, 'কোনও বিশেষ কাজে বেরিয়েছেন না কি ভদ্র ?'

'না। আজ শুধু মুক্তি। মুক্তির জন্য বেরিয়েছি। আজ সারা দিন ঘুরে বেড়াব। মিশে যাব রাজগৃহের নাগরিকদের সঙ্গে। এই মাত্র।'

চণক লক্ষ করল দু'জন সামান্যবেশী ব্যক্তি, তার পরে আরও দু'জন অনেক দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে আসছে। সে নিশ্চিন্ত হল।

একটি চত্বালের মতো স্থান বেছে বসলেন বিম্বিসার, পাশে বসতে ইঙ্গিত করলেন চণককে। চণক সামান্য নিচে যথাসম্ভব নিকটত্ব রক্ষা করে বসল। বিম্বিসার দুঃখিত মুখে বললেন, 'রাজাদের কি বয়স্য পাওয়ার অধিকার নেই, চণকভদ্র ?'

চণক মৃদু স্বরে বলল, 'বয়সেও তো আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। সামাজিক স্তরভেদ মেনে চলা ভালো মনে করেছিলাম ভদ্র, আর কিছু নয়।' সে উঠে রাজার পাশে গিয়ে বসল।

রাজা বললেন, 'তুমি কি গান্ধার দেশের জন্য খুব চিন্তিত ?'

'শুধু গান্ধার নয়, আমি সমগ্র উদীচ্য, মধ্যদেশ, প্রাচীর জন্যও চিন্তিত ভদ্র। গান্ধার হল সীমান্ত। এই সীমান্ত অতিক্রম করে যদি পারস্যরাজ কুরুসই বলুন, কি অসুররাজই বলুন কিংবা সমুদ্রপারের যবনরাই বলুন— একবার এসে পড়ে, এই ছিন্নভিন্ন অগ্রথিত রাজ্যগুলির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। আমরা যতই ভিন্ন হই, আমাদের 'আকৃতি, ভাষা, পরিচ্ছদ, ধ্যানধারণা মোটের ওপর একই। সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চল আমাদের আদিপীঠ। গঙ্গা-যমুনা, অচিরবতী সরযূতীরে ছড়িয়ে পড়েছি আমরা ! কিছু কিছু পার্থক্য এসে গেছে ঠিকই কিন্তু উপরিশ্যেন পর্বতের ওপার থেকে যারা আসবে তাদের ভাষা, পরিধেয়, ভাবনা-ধারণা একেবারেই অন্য। আমার বিচারে আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের শস্য, আমাদের খনিজ, আমাদের বিদ্যার আদানপ্রদান করতে পারি, কিন্তু বিজেতা হিসাবে যদি তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিই, তা হলে সমগ্র জম্বুদ্বীপের অধিবাসী তাদের দাস হয়ে যাব। কেউ বাদ যাব না। গান্ধার কাম্বোজ যেমন বাদ যাবে না, তেমনি বাদ যাবে না চেদি-মৎস্য, কুরু-পাঞ্চাল, কাশী-কোশল, অঙ্গ-মগধ, বজ্জি-মল্ল। কেউ না, কেউ না। গান্ধার-কাশ্মীর-মদ্র কুটিল, স্বার্থান্ধ, অমাত্যে পূর্ণ, তারা স্বার্থের বশে অনেকেই হয়ত বিপক্ষে যোগ দেবে। তবে তারাও রক্ষা পাবে না।'

বিম্বিসার মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, 'আচার্য দেবরাতও আমাকে বলেছিলেন চক্রবর্তী রাজা হও। তখন আমি সতের-আঠার বছরের কিশোর মাত্র। কিন্তু তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন, একবার তাকালেন বহুদূরপ্রসারী দিগন্তরেখার দিকে। বললেন মাঝখানে মেরুপর্বত তার চারপাশে অকূল বারিধি। সেখানে চতুষ্পত্র ফুলের একটি পাপড়ির মতো ভাসছে জম্বুদ্বীপ। আরও তিনটি পাপড়ি আছে। মধ্যে মধ্যে সমুদ্র, এই দ্বীপের পেছন দিকে আবারও অথই সমুদ্রের ওদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চক্রবাল। উত্তরকুরু দ্বীপে কেউ যেতেও পারে না, সেখান থেকে কারও আসার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু অপর গোদান ও পূর্ববিদেহ থেকে জম্বুদ্বীপে কালক্রমে সাম্রাজ্যপিপাসুরা আসবেই। তার আগে জম্বুদ্বীপকে একত্র হতে হবে। তুমি সেই চক্রবর্তী রাজা হও, যে জম্বুদ্বীপকে রক্ষা করবে। আমার এখনও তাঁর প্রতিটি কথা স্পষ্ট মনে আছে, চণক। এখন চণক তুমি বলো এই জম্বুদ্বীপ কী ? এই প্রাচী, মধ্যদেশ ও উদীচী, নাকি উদীচীরও ওদিকে যে বহ্লীক দেশ, বখত্রি আছে— এরাও, এমন কি সুমের বা অসুররাজ্যও। আর বিন্ধ্যপর্বত, বিন্ধ্যই কি এই দ্বীপের দক্ষিণ সীমা ?'

চণক বলল, 'না, বিন্ধ্য কখনও জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ সীমা হতে পারে না। হিমবানের মতো বিন্ধ্য দুরতিক্রম্য নয়। বহ্লীক বা বখত্রি দেশ কিন্তু বেদ অনুসরণ করে না কোনদিন, সুতরাং আমাদের বর্তমান অবস্থায় গান্ধার, কম্বোজ, কাশ্মীরের পশ্চিমে যে সব দেশ আছে তাদের সম্পর্কে আমার কোনও আত্মীয়বোধ নেই।'

বিম্বিসার হেসে বললেন, 'চণক কি খুব গোঁড়া বেদপন্থী না কি ? যাগ-যজ্ঞ, সাম গান, ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন ? বেদই যদি আমাদের মানদণ্ড হয় তা হলে কিন্তু মধ্যদেশ ক্রমশই অ-বৈদিক হয়ে যাচ্ছে, আরও পূর্বের তো কথাই নেই। এ অঞ্চল তো তা হলে জম্বুদ্বীপ হলো না।'

চণক ধীরে ধীরে বলল, 'আমার ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ। তবে বেদ-পন্থা বলতে আমি কিন্তু শুধু যাগ-যজ্ঞই বোঝাচ্ছি না। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আগে দিই। না। চণক যাগ-যজ্ঞে সেভাবে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞ করলেই সমৃদ্ধি হবে, সন্তান হবে, দেবতারা তুষ্ট হবেন, পিতৃপুরুষ সুখী হবেন—ঠিক এইভাবে আজকাল বিশ্বাস করতে পারছি না ভদ্র। এ কথা সত্য। কারণ দেখুন, সোমযাগের মতো ব্যয়সাধ্য দীর্ঘ সময়ের যজ্ঞ তিন পুরুষের মধ্যে একবার তো করতেই হয়, কিন্তু, করলে যজমানের ধনক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি নেই। যজ্ঞের প্রত্যক্ষ ফল বলে যদি কিছু লাভ হত, যেমন পুত্রেষ্টি যাগের ফলে যদি পুত্র হত তা হলে নিয়োগ-প্রথার প্রয়োজন হত না, ধর্ম-নাটকেরও প্রয়োজন হত না। চিন্তা করুন নিয়োগ প্রথায় স্বামী অথবা শ্বশুরকুলের জ্যেষ্ঠরা নিজেরাই একজন অপর পুরুষকে নিযুক্ত করছেন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য, আর ধর্ম-নাটক প্রথায় নিয়োগ পর্যন্ত করছেন না, পত্নীকে অথবা পত্নীদের স্বচ্ছন্দ-বিহারের জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন। কোন্ প্রকৃতির মানুষের ঔরসে সন্তান জন্মালো তা নিয়ে পর্যন্ত চিন্তা নেই। এই হীন পন্থা না ধরে একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেই তো পারতেন এঁরা। করেন না কেন ?' বলে চণক থামল, সে মহারাজের কাছ থেকে উত্তর আশা করছে।

কিছুক্ষণ পর সে-কথা বুঝে বিম্বিসার বললেন, 'ঠিক কথা। অর্থাৎ এঁরা অন্তর থেকে ইষ্টি-যাগে বিশ্বাস করেন না।'

'তার চেয়েও বড় কথা,' চণক বলল, 'এই সব পুরুষরা স্বীকার করে নিচ্ছেন তাঁদের পুত্র-উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। পত্নী নির্দোষ। তাঁরা নিজেরাই হীনবীর্য। পুরুষের শুক্র, নারীর শোণিত মিললে তবেই তো সন্তান জন্ম হবে, পিতা যদি হীনবীর্য বা বীর্যহীন হন্ তাহলে ?'

বিম্বিসার চমকিত হয়ে বললেন, 'তোমার যুক্তি তো অব্যর্থ চণক ? তা হলে।'

'হ্যাঁ, ভদ্র, বহু পুরুষই জন্মগত কারণে বা অসংযমের ফলে বীর্যহীন হয়ে থাকে সেইজন্যই তাদের সন্তান হয় না, কিন্তু সে কথা আড়াল করে তারা এবং তাদের সমাজ অক্ষমতার দায় তার পত্নীর ওপর চাপিয়ে দেয়। পরের পর পত্নী ত্যাগ করে, বিবাহ করে একটার পর একটা।'

'আর দেবতা ? শ্রৌত যজ্ঞে যে দেবতাদের আবাহন করা হয় ?'

চণক ধীরে ধীরে বলল, 'আমার মনে নানা সংশয় ভদ্র, সব কথা ঠিক পরিষ্কারও হয়নি এখনও। বলতে সাহস পাই না।'

'অভয় দিলে ?'

'অভয় দিলে বলতে পারি দেবতাদের অস্তিত্বে সেভাবে আজকাল যেন বিশ্বাস হয় না। কে বলুন তো এই ইন্দ্র ? যিনি গৌরব করে বলছেন আমি সালাবৃক দিয়ে যতি অরুর্মুখদের ভক্ষণ করিয়েছি, যিনি বলছেন মাতৃবধ, পিতৃবধ, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি মহা পাতক করলেও তাঁর ভক্তের মনে কোনও অনুশোচনা বা দুঃখ হবে না ! এই অতিরিক্ত সোমপায়ী দেবতাকে তো আমার একজন অত্যাচারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। মানুষ রাজার যে দশবিধ কৃত্য আছে দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দব, তপঃ ও অবিরোধন—এগুলির একটাও কি এই দেবতাদের রাজা পালন করেন ? মানুষ রাজারা যদি ইন্দ্রের মতো সোমপায়ী, ক্ষমতালিপ্সু, পরদারগামী, ক্রোধী, হিংসক, কুটিল, বিশ্বাসঘাতী হন প্রজারা তো বিদ্রোহী হবে, অমাত্যরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, তাঁকে অপসৃত করতে চাইবে সর্বস্তরের প্রজা। চাইবে না ? বলুন ?'

বিম্বিসার হাসলেন, বললেন, 'অবশ্যই। তবে এ একটা আদর্শ। আদর্শকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে কি আমরা সবাই পারি ? পারি না !'

'আমি আদর্শের কথাই বলছি মহারাজ। দেবতারা তো আদর্শেরও আদর্শ।'

'মহারাজ নয় ভদ্র। আমি এখন একজন শ্মশ্রুবিলাসী সৈনিক মাত্র।' বিম্বিসার তাঁর দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন।

'ও, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।' হেসে চণক বলল, 'এ ছাড়া অন্যান্য দেবতাদের কথাও ভাবুন। অগ্নি অনলের দেবতা, বরুণ জলের দেবতা, আদিত্য সূর্যের দেবতা, এই অগ্নি বা জল ইচ্ছামতো নষ্ট করে দিতে পারে জনপদের পর জনপদ, আবার আমাদের কাজেও লাগে, অর্থাৎ এরা বস্তু। সূর্য প্রতিদিন উদিত হচ্ছে, অস্ত যাচ্ছে, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাও তাই। এরাও যদি বস্তুপিণ্ড হয় ভদ্র ! সুন্দর ! অপরূপ সুন্দর ! মহাশক্তিধর ! কিন্তু নিজেদের ওপর এদের কোনও নিয়ন্ত্রণ আছে কি ? আপনি প্রার্থনা করে, তপস্যা করে, যজ্ঞ করে অগ্নিকাণ্ড থামাতে পারবেন ? আপনাকে জলের সাহায্য নিতে হবে। বন্যা থামাতে পারবেন ? আপনাকে নদীর পাড় উঁচু করতে হবে ! অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি থামাতে পারবেন ? সূর্যকে রাত্রে এবং চন্দ্রকে দিনের বেলায় উদিত করতে পারবেন ? যতই যজ্ঞ করুন !'

বিম্বিসার নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন, মুখে মৃদু হাসি, বললেন, 'তুমি তা হলে যাগ-যজ্ঞে বিশ্বাস কর না, দেবতাদের প্রতিও তোমার আস্থা নেই। এমন কি তাদের অস্তিত্ব নিয়েও তোমার মনে সংশয় ! কেমন ?'

চণক বলল, 'আপনি হাসছেন ?'

'হাসছি এই কারণে যে, তোমার কথার সঙ্গে আরও কারও কারও কথার মিল খুঁজে পাচ্ছি। বিশেষত তথাগত বুদ্ধর। তুমি কি তথাগতকে দেখেছো চণকভদ্র ? তাঁর দেশনা শুনেছ ?'

'না, সে সৌভাগ্য আমার এখনও হয়নি।' চণক বলল, তার ভিক্ষু অস্‌সজির কথা মনে পড়ল, সে জোর করে তাঁর কথা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'যাগ-যজ্ঞে সেভাবে বিশ্বাস না করলেও আমি কিন্তু শ্রমণ গৌতমের মতো একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না এগুলো।'

'বিশ্বাস করো না, অথচ উড়িয়ে দিতেও পারো না ? আশ্চর্য !'

'আশ্চর্য নয় ভদ্র, ভেবে দেখুন যাগ-যজ্ঞ কিন্তু খানিকটা সমাজ-উৎসবের মতো। বড় আকারের সত্র হলে বহুদিন ধরে বহু লোকের সঙ্গে মেলামেশা চলে। ছোটখাটো ইষ্টিযাগ বা পশুযাগ হলেও পরিবারবর্গ, জ্ঞাতিকুটুম্ব এঁরা একত্র হন। কিছু সৎ-চিন্তা করেন। শুচিতা, পবিত্রতা রক্ষা করে চলেন। এর মূল্য নেহাত অল্প নয়। সামাজিক বিধিমাত্রেই তো কৃত্রিম। সমাজের স্থিতির জন্য কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে হয়। আজ যদি আপনি একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন পুনরভিষেক বা ঐন্দ্রাভিষেকের আয়োজন করেন, তা হলে তা কৃত্রিম একটি সমাজবিধি হলেও গান্ধার, কম্বোজ, কুরু-পাঞ্চাল, অবন্তী, মিথিলা সব স্থান থেকেই তো রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি এবং নানান বৃত্তির মানুষ আসবেন, মনে করুন কুরুরাজ জনমেজয়ের মহাযজ্ঞের কথা। সেই উপলক্ষে পুরাবৃত্ত, রাজবংশগুলির উদ্ভব, এমন কি বিভিন্ন জনপদের উদ্ভব নিয়েও কত জ্ঞান, কত বিদ্যার আদানপ্রদান হয়েছিল। হয়নি ? এটাই লাভ। বহুজনের কথা জানা, তাদের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া, এটাই লাভ।'

'চণক, তুমি কি আমাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ছল করে জম্বুদ্বীপকে মগধের রাজচ্ছত্রের তলায় আনার পরামর্শ দিচ্ছ ?'

চণক একটু আশ্চর্য হল। তারপর হেসে বলল, আপনার তাই মনে হল ? কিন্তু এ অতি পুরনো উপায়। এখন সময় বদলে গেছে। সময়ের পদধ্বনি শুনতে পান ভদ্র ? সমাজকে বাঁধার জন্য, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যাস নির্মাণ করার জন্য যাগ-যজ্ঞ ছোট আকারে থাকে থাকুক। কিন্তু রাজাদের বোধ হয় এখন আর মহাসত্র করবার সময় নেই। চতুর্দিকে রাষ্ট্রগুলি অস্থির হয়ে রয়েছে। নিশ্চিন্তে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম করার সময়ই এ নয়। অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করতে হবে।'

বিম্বিসার বললেন, 'তুমি হয়ত জানো, হয়ত জানো না, আমার এক মহিষী বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করে আমার কুল উজ্জ্বল করেছেন। তিনি এখন ভিক্ষুণী। আমি নিজেও উপাসক। তথাগত বুদ্ধ, যাঁকে তুমি শ্রমণ গৌতম বলে উল্লেখ করলে তাঁকে আমি আমার দেখা সব মহামানবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। মুখে অবশ্য তা প্রকাশ করি না, আরও অনেক শ্রমণপন্থের তপস্বী আছেন, তাঁদেরও আমি দান করি, তাঁদেরও উপদেশ শুনি। বেদপন্থীদেরও আমার রাজ্যে কোনও অনাদর নেই। কিন্তু পশুযজ্ঞে আমার আর ভেতর থেকে সম্মতি আসে না। ধর্মের নাম করে পশুবধ! নাঃ সে আমি আর পারি না।'

'আমি আপনাকে পশুমেধ করতে বলছি না মহারাজ।'

'কিন্তু মনুষ্যমেধ করতে তো বলছ? চক্রবর্তী রাজা হতে হলে তো যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ মানেই নরমেধ? নয়?'

'তা সত্যি। কিন্তু সেভাবে নরমেধ কি আপনি করেন না? চোর, দস্যু, রাজদ্রোহী, ব্যভিচারিণী, এদের মহাদণ্ড দেওয়া হয় না?'

'তারা তো অপরাধী? অপরাধের শাস্তি ভোগ করে।'

'প্রত্যন্ত প্রদেশে যখন বিদ্রোহ দমন করতে যান?'

'সে-ও তো রাজদ্রোহ!'

'যদি আপনার রাজ্য আক্রান্ত হয়?'

'তা হলে শত্রুবধ করব।'

'শত্রুই হোক, রাজদ্রোহীই হোক, অপরাধীই হোক, সবাই-ই মানুষ। কোনও না কোনও প্রকারে মানুষমেধ আপনি করেই যাচ্ছেন। করতেই হচ্ছে।'

'শোনো চণক, তুমি যত কুযুক্তিই দেখাও, যত উত্তেজিতই করো, দীর্ঘদিন অঙ্গরাজ্য জয় করবার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছি। আবার যুদ্ধের কথা আমি ভাবতে পারছি না।'

চণক হেসে বলল, 'আপনাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করছি না মহারাজ। খালি পিতার আশীর্বাদ সফল করে রাজ-চক্রবর্তী হতে উদ্বুদ্ধ করছি।'

'যুদ্ধ না করে, যজ্ঞ না করে কীভাবে সেটা হওয়া সম্ভব, চণক?'

'সে কথাই অবিরত ভেবে যাচ্ছি। তক্ষশিলা থেকে মগধ আসতে আসতে অবিরত ভেবেছি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে যুদ্ধ এখন অবান্তর মনে হয়। কিন্তু যুদ্ধ না করেও একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিপতি কি হওয়া যায় না? একটু ভাবুন তো মহারাজ! আর কোনও পথ...'

এই সময়ে চণক দেখল মহারাজ হঠাৎ যেন দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দেখল একজন পীতবাস পরা ভিক্ষু, যথেষ্ট দীর্ঘদেহী এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রশান্ত মুখ, অত্যন্ত দ্রুত উঠে আসছেন। এত দ্রুত উঠে আসছেন অথচ সেই তাড়াটা যেন তাঁর চলনে বা আকারে ধরা পড়ছে না। মহারাজ অস্ফুটে বললেন, 'ভগবান তথাগত।'

চণক বলল, 'মহারাজ, আপনি কিন্তু ছদ্মবেশে আছেন। ভুলে যাবেন না।'

'না, ভুলব না, কিন্তু তুমি যাও চণক, উনি কার্তিকী পূর্ণিমার পর যে-কোনদিন যে-কোনও দিকে বেরিয়ে পড়বেন। এমন সুযোগ হেলায় হারিও না।' বিম্বিসার দ্রুত একটি পাথরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

গৌতম উঠে এলেন। তারপর চণকের পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন। চণক চলল তাঁর পেছন পেছন। কিছুটা যাওয়ার পর সে ডেকে বলল, 'ভদন্ত, আপনি কি কিছু খুঁজছেন?'

'আমি কিছু খুঁজছি না ব্রাহ্মণ; আমি পেয়েছি,' সংক্ষেপে বললনে গৌতম, একটু পরে বললেন, 'আমি একটি নির্দিষ্ট স্থানে যাচ্ছি, গিজ্‌ঝকুটের ওপর দিকে একটি চাতালের মতো সমতল স্থান আছে, সেখানেই।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি সঙ্গে গেলে আপনার অসুবিধে হবে, ভদন্ত ?'

'আমার কিছুতেই সুবিধা বা অসুবিধা হয় না আয়ুষ্মন, তুমি আসতে পারো।'

দীর্ঘ ক্ষিপ্র পদক্ষেপে শ্রমণ মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। চণক ভাবল, ইনি যে দেখি, হাঁটার পরীক্ষায় সবাইকে পেছনে ফেলে দিতে পারেন। অদ্ভুত ক্ষিপ্র তো!

অবশেষে তিনটি শিলার মধ্যবর্তী একটি সমতল স্থানে পৌঁছে গৌতম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চণক দেখল পাহাড়ের নানা পাথরের মধ্য দিয়ে দিয়ে একটি বৃদ্ধ এবং একটি তরুণ উঠে আসছে।

তারা পৌঁছতে গৌতম বললেন, 'কেমন ব্রাহ্মণ, এই স্থানটির কথাই বলছিলেন তো ?'

বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই স্থানই বটে সমন, আমার এই পিতৃপোষক সুপুত্র পিতার বড় বাধ্য।' তিনি তরুণটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, 'আর কোনও পুত্র আমার দেখাশোনা তো করেই না, কেউ আমার কথায় কানই দিল না। বুঝলে গোতম আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। বৃদ্ধ হয়েছি কখন পুট করে মরে যাব, আর এরা অমনি কোনও অপবিত্র শ্মশানে নিয়ে গিয়ে আমার অগ্নিক্রিয়াটি করবে। এত সম্পদ আমার, অগ্নিহোত্র রক্ষা করে চলেছি শ্রদ্ধায়, চিরকাল প্রত্যেকটি দর্শযাগ, পূর্ণমাস-যাগ করে এসেছি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে শত শত গাভী দান করেছি। এত পুণ্য, তা সত্ত্বেও হয়ত এইটুকুর জন্য অক্ষয় স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হব।'

গৌতম বললেন, 'ব্রাহ্মণ, শ্মশান কীভাবে পবিত্র বা অপবিত্র হয় তা আমায় বলুন।'

'তুমি তো কিছুই মানো না', ব্রাহ্মণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'তোমায় কী বোঝাবো ? শ্মশান এমনিতেই অতি অপবিত্র স্থান। হীন জাতির লোককে দাহ করলেই সে শ্মশান আরও অপবিত্র হয়ে যায়। এই বৃষলেরা মরেও আমাদের শান্তি দেবে না। আমার পুত্র তো খুঁজে খুঁজে কোনও শ্মশান পেল না নগরে যেখানে কোনও চাঁড়াল, কি নিষাদ, কি পুক্কুস দাহ হয়নি। ওর প্রশ্ন শুনেই তো শবদাহ চাঁড়ালগুলো হা-হা করে হাসে, বলে কি জানো ? "ওরে ব্রাহ্মণ, এইখানে চিতার ওপর যেমন বাঁশের বাড়ি দিয়ে রাজা-রাজড়ার মাথা ফাটাই, বামুন পুরুতের মাথা ফাটাই, স্বর্ণোদের বণিকগুলোর মাথা ফাটাই, তেমনি চাঁড়ালদেরও মাথা ফাটাই। জাতপাত তো কিছু বুঝি না। নিজে মরলেও এই শ্মশানেই পুড়বো, আমার ভাইয়ের পুত হয়ত তোমারই মাথাখানা ফাটাবে!"'

চণকের হাসি পেল, সে দেখল ব্রাহ্মণের তরুণ পুত্রটি অনেক কষ্টে হাসি সংবরণ করে দাঁড়িয়ে আছে।

গৌতম বললেন, 'আপনিই উপসাঢ় পণ্ডিত না ?'

'হ্যাঁ ইনিই।' পুত্রটি এবার সসম্ভ্রমে বলল।

'আপনারা তো অগ্নিকে খুব মানেন। অগ্নি সব শুদ্ধ করে দেন না ?' গৌতম বললেন।

'তা দেন। কিন্তু পরিবেশটিও তো দেখতে হবে! এমনিতেই তো শ্মশান মানেই নোংরা, এখানে নর-কপাল, ওখানে পায়ের হাড়, সেখানে শৃগালের উচ্ছিষ্ট পড়ে রয়েছে। এরূপ স্থানে দাহ হবার কথা ভাবলেই আমার হৃৎকম্প হয়।'

'মৃত্যুর পর তো আর হৃদয় কম্পিত হবে না আর্য!' গৌতম বললেন।

'রসিকতা ছাড়ো শ্রমণ। হীন জাতির শব যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে আমি কিছুতেই দাহ হবো না। না! না! সে আমাকে শ্মশানশুদ্ধিক বলে হাসাহাসিই করো আর যা-ই করো।'

'না, না, আমি হাসিনি', গৌতম বললেন, 'কিন্তু কোনও জাতি মরেনি, এমন স্থান তো রাজগৃহে কেন, সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাবেন না ব্রাহ্মণ উপসাঢ়!'

'সে আবার কী ? এই গিজ্ঝকূটের শিখরেও কোনও বৃষল মরেছে নাকি ?'

'ব্রাহ্মণ আপনি নিজেই এই স্থানে অন্তত চতুর্দশ সহস্রবার ভস্মীভূত হয়েছেন। প্রত্যেকবার আপনি ব্রাহ্মণ বংশজাত ছিলেন না। এ স্থান অনুচ্ছিষ্ট নয়। এ পৃথিবীর আকৃতি কল্পে কল্পে বদলে যায়। এ কল্পে যা তপোভূমি, পরের কল্পে তা আমকশ্মশান, তার পরের কল্পে হয়ত তা বিষ্ঠাক্ষেত্র। ভো ব্রাহ্মণ, পৃথিবীতে এমন কোনও স্থান নেই যা কখনও না-কখনও নর-কপালে আবৃত হয়নি। আর মৃত্যুর পূর্বে সেই সব মৃতদেহ হীন জাতির ছিল কি উচ্চ জাতির ছিল অগ্নি তাদের গ্রাস করার আগে কখনও জিজ্ঞাসা করেনি, শৃগাল, শকুন এরাও জিজ্ঞাসা করে না।' বলতে বলতে গৌতম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও উঁচুতে আরোহণ করতে লাগলেন। গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, 'অগ্‌গোহমস্মি লোকস্‌স। আমি বুদ্ধ, বহু লক্ষ জন্ম পার হবার পর বুদ্ধ জন্ম পেয়েছি। নৈরঞ্জনা নদীতীরে বুদ্ধত্ব লাভ করেছি বহু তপস্যায়। আমি জানি। আমি দেখতে পাই। তোমাদের আগের শতাধিক জন্ম, যখন হীন জাতি ছিলে, তারও আগের আগের সহস্রাধিক জন্ম, যখন তির্যক্ যোনিতে ছিলে, তারও আগের আগের লক্ষাধিক জন্ম যখন ছিলে পাথর, মাটি, বালির স্তূপ, বালুকণা মাত্র। চৈতন্য ছিল না, মন ছিল না, প্রাণ ছিল না। বাতাসে উড়তে, জলে ভেসে যেতে, দারুণ রোদে পুড়তে। এটা শুদ্ধ ওটা শুদ্ধ নয় বলা কারও শোভে না ব্রাহ্মণ। যে বলে সে জানে না। আমি জানি।'

সূর্য সেই সময়ে গৌতমের পেছনে ঠিক তাঁর পায়ের কাছে অবস্থান করছিল। গৈরিক সংঘাটিতে আবৃত দেহের তলার দিকটা দেখাচ্ছিল কৃষ্ণবর্ণ। ছায়ার মতো। ওপর দিকটা দীর্ঘ একটি দীপশিখার মতো জ্বলছিল। তাঁর কথাগুলি যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে চণক এবং অন্য দু'জনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল। উপসাঢ়র তরুণ পুত্রটি গভীর সম্ভ্রম ও ভক্তিতে তাঁর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে জানু মুড়ে বসে পড়ল, বলল, 'আপনি মহামানব, আমরা জানি না, বুঝি না। আমাদের সত্য পথে নিয়ে চলুন ভগবন। আমার এই পিতা বহু বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন, কিন্তু আমরা সবাই বুঝতে উনি আসলে মূঢ়, মুর্খ। ওঁর মৃত্যুর সময় হয়ে এলো। আপনি ওঁর চোখের সামনে থেকে অজ্ঞানের তমঃ অপসারিত করুন। শুদ্ধিবায়ুগ্রস্ত বলে ওঁকে পরিত্যাগ করবেন না।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটিও যখন জোড় হাতে বসে পড়েছেন। তাঁর চোখ দুটি বোজা। গালের লোলচর্মের ওপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। গৌতম দাঁড়িয়ে আছেন শিখরে। তাঁর হাত দুটির একটি ওপরে একটি নিচে যেন অভয় দিচ্ছে। তিনি চেয়ে আছেন ওই দুই ব্রাহ্মণের দিকে। কিন্তু চণক বুঝতে পারল উনি এখন ধ্যানস্থ। কনকচাঁপার গুচ্ছের মতো দেখাচ্ছে তাঁর উর্ধ্বাঙ্গ। কখনও নিষ্কম্প দীপশিখা। এদিকে সূর্য পেছনে লাফ দিয়ে দিয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে কখনও ছায়াময় হয়ে যাচ্ছে গৌতমের জানুদেশ, কখনও কটি, কখনও বক্ষোদেশ, তারপর তাঁর গ্রীবা ছুঁয়ে ঠিক মাথার পেছনে অবস্থান করতে লাগল সূর্য। কিন্তু চণক দেখল গৌতমের মুখটিতে ছায়া পড়েনি। যেন সম্মুখ থেকে অন্য কোনও অদৃশ্যতর সূর্য তাঁকে উজ্জ্বল রেখেছে। দেখতে দেখতে চণক বুঝতে পারল, এ সূর্য গৌতমের ভেতরের। এবং গৌতমের মধ্য থেকে সেই প্রভা তাঁর আর ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছে। সেই সেতু বেয়ে ওই প্রভা গৌতমের শির থেকে প্রবেশ করছে ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্কে, হৃদয়ে। সে এই শক্তিস্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে, অথচ পুরো প্রক্রিয়াটি দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে। একটা দুর্লভ সৌভাগ্য তার হলো আজকে।

দৃশ্যটিকে সামনে রেখে সে পিছু হঠতে লাগল। মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে পথ, তারপর আবার চলছে। কেন যে সে চলে আসছে সে ভাল বুঝতে পারল না। সে কি ভয় পাচ্ছে? যেখানে মহারাজ বিম্বিসারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেখানে এসে আর তাঁকে দেখতে পেল না। সামান্য বেশে যে রক্ষীগুলি আশেপাশে ঘুরছিল তাদেরও না। তার অর্থ মহারাজ চলে গেছেন।

চণক এবার দ্রুত নামতে লাগল। এই তা হলে সেই তথাগত বুদ্ধ। বীরপুরুষের মতো আকৃতি। মুখভাবে একাধারে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এবং গভীর ধ্যানমগ্নতা! কী অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়! কেমন বললেন, "আমিই প্রথম, আমিই এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি জেনেছি।" এই উচ্চারণগুলিতে কোনও অহমিকা ছিল না। ঠিক যেন সে বলছে আমি দেবরাতপুত্র কাত্যায়ন চণক। আত্মপরিচয় দিচ্ছে। নিজের গোত্র, পিতৃনাম এবং নিজস্ব নাম জানালে কি তা অহমিকা হয়? হয় না। এ-ও তেমনি। কিন্তু ইনি সেই স্বপ্নমগ্ন ভিক্ষু অস্‌সজির মতো নন। তিনি যেন মুগ্ধ। পৃথিবীর পরিপার্শ্ব দেখতে পাচ্ছেন না। মগ্ন হয়ে আছেন কী এক উপলব্ধির মধ্যে। গৌতম অন্যধরনের। শ্যেন যেমন দৃঢ় নখে পারাবতকে ধরে, পালাবার পথ রাখে না, ইনিও তেমনি নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের প্রত্যয় দিয়ে ব্রাহ্মণ দুটিকে, তাদের ভ্রমাত্মক ধারণাগুলিকে সবলে ধরলেন। সেগুলির টুঁটি ছিঁড়ে ফেললেন যুক্তি আর জ্ঞানের তীক্ষ্ণধার নখ দিয়ে। কী ভাবে ক্ষিপ্রগতিতে উঠে আসছিলেন! কীভাবে তার প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন। "আমি কিছু খুঁজছি না। আমি পেয়েছি।" "আমর কিছুতেই সুবিধা বা অসুবিধা হয় না আয়ুষ্মন, তুমি আসতে পারো।" কথাগুলি তার মনের মধ্যে যেন বারবার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগল। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল কীভাবে গৌতম গিজ্‌ঝকূট শিখরে গিয়ে দাঁড়ালেন, যেন মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন কোনও মহানট। আকাশ তাঁকে পশ্চাৎপট দিল, সূর্য তাঁকে আলো দিল, বাতাস তাঁর কণ্ঠস্বরকে বেগবান, জোরালো করে তুলল। তারপর তাঁর সেই অভয়মূর্তি! সেই দীপ্ত মুখমণ্ডলী! আচ্ছা উনি কি এই দৃশ্যটির এমন অপূর্ব প্রভাব হবে জেনেই ওভাবে শিখরে উঠে গিয়েছিলেন! স্বস্তি উচ্চারণের ওই অদৃষ্টপূর্ব ভঙ্গি! এটি কি জেনেশুনে আয়ত্ত করা?

হঠাৎ চণকের মনে হল, আচ্ছা সারা রাজগৃহ এঁর ওপর ক্ষিপ্ত। ইনি স্বামীর স্ত্রী, স্ত্রীর স্বামী, পিতার পুত্র-পুত্রী, পুত্র-পুত্রীর পিতাকে কেড়ে নিচ্ছেন। ইনি এঁর শাসনে, এঁর সঙ্ঘে নাকি সবাইকে প্রবিষ্ট করাতে ব্যস্ত। সঞ্জয়ের শিষ্যদের কেড়ে নিয়েছেন। বিখ্যাত কাশ্যপভ্রাতাদের এঁর সঙ্ঘভুক্ত করেছেন। কই, চণকের প্রতি তো এঁর কোনও আগ্রহ দেখা গেল না! ওই ব্রাহ্মণ দুটিকে উদ্ধার করবার জন্য গোটা গিজ্‌ঝকূটটাই একরকম দৌড়ে উঠেছেন, অথচ চণক, উদীচ্য ব্রাহ্মণ, গান্ধার রাজসভার অমাত্য, তাকে সঙ্ঘভুক্ত করার কোনও চেষ্টা তো করলেন না! কেন? মহাবুদ্ধিধর, তক্ষশিলার বহু পুরুষের পণ্ডিতবংশের কুলপ্রদীপ চণক, তার প্রতি শ্রমণ কোনও আগ্রহই দেখালেন না! আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!

রাজ-অতিথিশালার দিকে যেতে যেতে চণকের আরও মনে হল—মহারাজ বিম্বিসারের মধ্যে যেন কী একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে। রাজপ্রাসাদের ভোজনকক্ষে যে মগধরাজের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আর যে ছদ্মবেশী মহারাজের সঙ্গে আজ গিজ্‌ঝকূটে দেখা হল এঁরা ঠিক একই ব্যক্তি নন। সেদিন মহারাজ তাকে আত্মানুসন্ধানী কিংবা ভ্রমণপিপাসু পরিব্রাজক মনে করে হতাশ হয়েছিলেন। তারপর তার পরিকল্পনার কথা শুনে তার পরামর্শ মূল্যবান মনে করেছিলেন। আজ সেই তিনিই অভিযোগ করলেন—চণক তাঁকে যুদ্ধ করে লোকক্ষয় করতে প্ররোচিত করছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ছল করে জম্বুদ্বীপের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পরামর্শ দিচ্ছে। পশুহত্যা করতে পরামর্শ দিচ্ছে।

চণক ভাবল আর এখানে নয়। খুব শীঘ্র বেরিয়ে পড়তে হবে। চণকের যা কাজ, তা চণকেরই কাজ। খুবই অন্যমনস্কভাবে সে অনেকটা পথ পার হয়ে অশ্বশালায় গিয়ে অশ্বরক্ষকদের হাতে চিত্তককে অর্পণ করল। সেই রকম গভীর চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে পার হল বাইরের প্রাঙ্গণ, সোপান বেয়ে উঠল, তারপর কক্ষগুলির সামনের অলিন্দ পার হতে লাগল। শ্রীমতীর গৃহে অতি প্রত্যূষে প্রায় ব্রাহ্মমুহূর্তে খুব ভাল করে চন্দন-অগুরু মিশ্রিত জলে সে স্নান করেছে। এখন আর স্নানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু হাত পা শরীর মুছে ফেলার প্রয়োজন আছে। এতক্ষণ ক্ষুধাবোধ ছিল না। এখন মনে হচ্ছে কিছু পান করার আশু প্রয়োজন, সঙ্গে কিছু খাদ্যও। মধ্যাহ্নভোজনের সময় কি হল? সে দাসীদের কিছু শুষ্ক ফল এবং মৈরেয় আনতে বলে নিজের ঘরের দিকে গেল।

ঢুকতেই একটি পীঠিকায় বসা আগন্তুককে দেখে চমকে উঠল চণক। মহারাজ! তিনি কোনও শীতল পানীয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছেন।

মহারাজের ইঙ্গিতে দ্বার বন্ধ করে বসল চণক। বিম্বিসার বললেন, 'আজ আমি রাজ-অতিথির অতিথি। আপত্তি আছে?'

চণক বলল, 'সিন্ধুনীর কখনও কখনও নিজেই নিজের পূজা করতে চায়! আমি মৈরেয় আর কিছু শুষ্ক ফল আনতে বলেছি।'

'শ্রমণ গৌতমকে কী দেখলে চণক?'

'ইনি একজন অতি বিরল ঋদ্ধিশালী পুরুষ, শুধু দেখাই একটা অভিজ্ঞতা! আমি তো শুনলাম।'

'ধর্মদেশনা শুনলে?'

'ধর্মদেশনা? বোধ হয় না। তবে কিছু শুনলাম। মনে হল ইনি যুক্তিবাদী। পুরনো ধারণার মধ্যে যেসব কুসংস্কার প্রবেশ করেছে সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিতে চাইছেন। নিঃসন্দেহে মুক্ত মনের মানুষ।'

'আর কিছু?'

'মহারাজ, মুক্ত মনের চেয়ে বড় কথা, বড় গুণ আমার কাছে আর কিছু নেই।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বিম্বিসার বললেন, 'আচার্যপুত্র, তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক তা নয় মহারাজ।' চণক চিন্তিত স্বরে বলল, 'কিন্তু আমার মনে সংশয়। আপনিই কি আচার্য দেবরাতের সেই শিষ্য, যাঁর সম্পর্কে আচার্য তাঁর মৃত্যুকালে শেষ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন ? আপনি কেন চণককে আপনার অর্থধর্মানুশাসক করতে চেয়েছিলেন তা-ও বুঝলাম না। শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘন ঘন অমাত্য বদলান। সে কি তাঁদের অক্ষমতার জন্য ? না, অপরাধ নেবেন না মহারাজ, আপনারই অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য ?'

বিম্বিসার উঠে দাঁড়ালেন, পদচারণা করতে করতে বললেন, 'চণক, কিছুদিন আমি বড় বিভ্রান্ত, বড় অসহায় বোধ করছি। বুঝতে পারছি, আমার কথাবার্তার মধ্যে, ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না।'

চণক কোমল গলায় বলল, 'কিন্তু মহারাজ, যাঁদের কাঁধে গুরুদায়িত্ব, যাঁরা সাধারণ নন, তাঁরা তো চিরকাল একাই। এই একাকিত্ব কী করে বহন করতে হয় আজ গিজ্ঝকূট শিখরে শ্রমণ গৌতমকে দেখে শিখেছি।'

বহুক্ষণ চুপ করে থেকে বিম্বিসার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'নারী, নারীই যত দুঃখ, যত অশান্তির মূল।'

'এ কথা বলবেন না মহরাজ', চণক প্রতিবাদ করে উঠল, 'নারী আমাদের জন্ম দেয়, নারী আমাদের প্রেমতৃষ্ণা মেটায়, আমাদের সন্তান গর্ভে ধারণ করে, আমাদের গৃহকে গৃহ করে তোলে। নিজেদের প্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারি না বলে নারী থেকে আমরা দুঃখ পাই।'

'হয়ত ঠিকই বলেছ বন্ধু চণক। কিন্তু, প্রিয়া নারী যখন একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যায় ? অপমানের জ্বালাকে কৃতার্থম্মন্যর হাসিতে পরিণত করতে হয় ? শূন্য বক্ষের হাহাকারকে যখন গোপন করতে হয়, অথচ পারা যায় না ?'

চণক মৃদু স্বরে বলল, 'মহারাজ, পত্নী প্রব্রজ্যা নিলে দুঃখ হয়ত হতে পারে, অপমানের জ্বালা হবে কেন ? আমি বুঝি না।'

'আমিও বুঝিনি, আচার্যপুত্র, কিন্তু হল। যখন তিনি কেশগুচ্ছ ফেলে দিলেন, যে সুগন্ধ, অপরিমিত কেশ কতদিন...কতদিন আমি বক্ষে ধারণ করেছি, যখন তিনি পরিত্যাগ করলেন আমার দেওয়া মহার্ঘ বস্ত্র-অলঙ্কার যা তাঁকে মাত্র কিছুদিন উপহার দিয়েছি, মনে হল যেন আমাকেই ফেলে দিলেন, আমাকেই আবর্জনার মতো পরিত্যাগ করলেন ! জ্বালা হল। ভেতরে যেন বৃশ্চিক দংশন অনুভব করছি সর্বক্ষণ। যখন আমার অন্তঃপুরে ছিলেন যথাযোগ্য সমাদর করিনি, করতে পারিনি। রাজার জীবনে অনেক বিধিনিষেধ বন্ধ্ন, অনেক কূটনীতিতে কণ্টকিত, কিন্তু তিনি মানিনী ছিলেন। একটু সমাদর করলেই তাঁর ভেতরের সেই অভিমান ফণা তুলত। না, এসব থাক। আমি প্রলাপ বকছি।' রাজা চুপ করে গেলেন। চণক অপেক্ষা করে রইল। একটু পরে তিনি আবার বললেন, 'তুমি প্রশ্ন করছিলে না, কেন তথাগত বুদ্ধকে সামনে দেখেও চলে এলাম ? এই জন্য। এই জন্য। তাঁর ঋদ্ধিতে, তাঁর অসামান্য রূপবৈভবে, গুণগ্রাম অনুভব করে মুগ্ধ ছিলাম আমি। এখনও আছি। কিন্তু হৃদয়ের সেই জ্বালা তাঁকে দেখলে এখন বেড়ে যায়। আমি সইতে পারি না। তাই তাঁর দর্শন কিছুদিন এড়িয়ে চলছি। তা ছাড়া, তোমার চোখে দিয়ে তাঁকে দেখবার, তাঁকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছে হয়েছিল।'

'কী দেখলেন মহারাজ ?'

'একটি অন্য মানুষকে যেন দেখলাম। ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু অন্য মানুষ।' রাজা একটু থেমে দ্বিধামিশ্রিত স্বরে বললেন, 'চণক, যে কথা কারুর কাছে প্রকাশ করতে পারিনি, তা আজ তোমার কাছে প্রকাশ পেলো। রাজা ক্ষত্রিয় বটে। রাজ্যরক্ষার ভার তার ওপর। সেটাই তার মুখ্য দায়িত্ব। সত্য। সবই সত্য। কিন্তু রাজা তো মানুষও !'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা দেখালেন বটে সাকেতের সেট্‌ঠি। বস্‌সার তিন তিনটি মাস ধরে কি না দীয়তাং, ভুজ্যতাম্‌ !'

'যা বলেছিস ! তা-বড় তা-বড় অতিথ্‌রা তো আছেই। রাজা-রাজড়া, অমাচ্চ, পারিষদ, সেনাদল, রক্ষী, গহপতি, বোধ হয় সাকেত- সাবত্থি-ভদ্দিয়র কোনও বড় মানুষকে বাদ রাখেনি।'

'আর রাজগহ ? রাজগহর নাম কল্লি না ? রাজগহর বড় বড় আঢ্য ব্যক্তিও তো এসেছিল। অলঙ্কার কী সব ! দেখলে চোখ ফেরে না।'

'কত লোক খেটেছে বল তো ? এখনও খেটে যাচ্ছে। এক পাকশালেই তো শত শত মাপক, কুট্টক, পেষক, পাচক, পরিবেশক। অতিথ্‌দের দেখাশোনার জন্যে গাম থেকে সুপ্রচুর সংখ্যায় ভৃতক-ভৃতিকা নিয়েছে সেট্‌ঠি। লোকগুলো এই তালে ধন করে নিল বটে ! বস্‌সায় পথ নষ্ট হচ্ছে বলে তো সব্বদা কাঁকর আর বালু ফেলছে, ফেলছে আর পিটিয়ে পিটিয়ে সমান করছে।'

'বারাণসী বদ্‌ধকিদের দেখেছিলি ? ভেলকি দেখালো যেন। কাঠের থাম আর পাটাগুলো আনছে, কাঠামো আনছে আর যেন ফুস মন্তরে এক-একখানা সুরম্ম হম্ম নিম্মান করে ফেলছে। পথ ঝাঁট দিচ্ছে সব সময়। পথে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে, যেন পথ নয়কো, বড় মানুষের গা !'

'তা যেমন খেটেছে, তেমনি পেয়েছে সব। ভোজ তো তিন মাস ধরে খেলই। তার ওপরে পেল জোড়া জোড়া কাপড়, কাহন, তণ্ডুল, যব, মোদক...'

'সে না হয় হল, কিন্তু শুনেছিস একশ' গ্রাম থেকে নাকি সেট্‌ঠি একশ' রকম উপহার নিয়েছে ! নিদ্‌দেস ছিল ! অনেক গরিবগুরবো গ্রামও তো আছে, তারা তো ভয়ে সারা ! কী দেবে !'

'এ সব মিছে অপ্‌যশ। সেট্‌ঠি কি আর চেয়েছে ? গামে গামে নেমন্তন্ন গেছে। মোড়লগুলোর তো লোক-দেখানি কিছু করা চাই ! অমনি সব নিদ্দেস চলে গেল। ছন্দক চাই, ছন্দক চাই। কনের জন্যে উপহার নিম্মান হবে ! আমাদের গ্রাম থেকে তো উৎকৃষ্ট দই এক শকট পাঠানো হয়েছে। বাস ! তোদের ?'

'শুনলুম উপরত্ন দেওয়া গজদাঁতের কাঁকন। চোখে দেখিনি ভাই।'

'ভালো। তবে অতশত হিরামণিমাণিক্যের মধ্যে তোদের উপরত্নের গহনা কি সেট্‌ঠি কন্যা পরবে ?'

'কে জানে ! দিতে হয় দেওয়া। সেট্‌ঠি কন্যা পরবে বলে তো আর দেওয়া হয়নি !'

'হ্যাঁ রে, রাজামশাইকে দেখেছিলি ?'

'কোন্‌ রাজা ? আমাদের উগ্‌গসেন ?'

'না রে ! আমাদের কোসলের রাজা পসেনদি ? কী মোটকা ! এত মেদ যে হাসলে চোখ বুজে যায়।'

'তুই কোথায় দেখলি ? সব সময়ে তো রক্ষী দিয়ে ঘেরা থাকে !'

'কে বলেছে ? ইন্দ্রজালের সভায় বসে ঠাঠা করে হাসছিল। ঠিক আমাদের গামনির মেজ পুতের মতো ! মোটকা হোক। মনটা খুব ভালো। হাতে সব সময় পানপাত্তরটি ধরা থাকে।'

'এই বয়সে তো আবার একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করেছে শুনছি !'

'আহা, তা তো করতেই পারে। রাজার আবার বয়েস !'

'বাজিকরদের দেখলি ?'

'অদিট্‌ঠপুব্ব। সত্যি ভাই জাদুর খেলা যা দেখলুম, সারা জীবন আর ভুলতে পারব না। বংশধাবন তো করল বিদ্যুতের মতো। তার পর দড়া বাজিকর তালপাতার ছাতা হাতে কেমন হেলেদুলে দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে গেল ? কচি ছেলেটাকে নিয়ে যা লোফালুফি করছিল, আমার তো নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। আমরা ভাই একটু-আধটু সাপের খেলা, কি বানর খেলা দেখেছি গ্রামে। বংশধাবনও দেখেছি। কিন্তু এর সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না।'

'আর জাদুকর ! ওই যে শল্ল আর সুলভ, নাকি এক সময়ে বিসাখার পিতাম'র দাস ছিল। কোথা থেকে খবর পেয়ে চলে এসেছে। মাটিতে বীজ পুঁতল, গাছ হল, পাঁচ রকমের ফল ধরল, সেই ফল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেটে কেটে সব্বাইকে খাওয়ালো—বাব্ বাঃ।'

'কী করে এ সব করে বল তো?'

'অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। নানা রকম ভূতপ্রেত সব বশে থাকে। জানিস না মেণ্ডক সেট্‌ঠির ইদ্ধি আছে।

'তা এরূপ ইদ্ধি তোর আমার হয় না কেন? শল্ল, সুলভ ওরাও তো আমাদের মতোই সাধারণ লোক। ছিল তো ক্রীতদাস! বিসাখার পিতাম'র। আমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থা বই ভালো না। আমরা তো নিজেদের গেহে, নিজেদের বউ-পুত-কন্যা নিয়ে খাচ্ছি, দাচ্ছি, খাটছি, পিটছি। বাপ-মা আরও সব জেট্‌ঠদের উপদেশ পাচ্ছি। আর ওরা?'

'দ্যাখ, ওরা দাস হলেও কিন্তু বড় ঘরের দাস। বিসাখার পিতাম'র ধনের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই, তা জানিস! এই যে বিসাখার বিয়ে হল! এরকম দশটা বিয়ে এক্ষুনি দিতে পারে, গায়ে লাগবে না। ওদের ঘরের দাসরা নিত্য সুগন্ধ চালের অন্ন খায়, কাসিক বস্তর পরে। সেট্‌ঠিরা লোকও ভালো তো। দাসেদের যত্ন করে, কষ্ট দেয় না।'

'কী করে জানলি?'

'শুনেছি। এই তো এই বিয়ের জন্যেই ভদ্দিয় থেকে কত দাস এসেছে। এক-একজনের আকৃতি কী! দেখলে ঠিক বুঝবি কুলপুত্তুর। তো সবাই তো আর সমান অহংকারী নয়, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল কত কথা— তাইতেই বুঝলাম। শল্ল আর সুলভ, ও জাদুকর দুজন তো ওদের প্রভুর কাছ থেকেই শিখেছে সব।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ রে মেণ্ডক সেট্‌ঠি নিজে অনেক রকম জানে, বললামই তো ইদ্ধি আছে। এমন কি ওঁর পত্নী দেবী পদুমাবতী পর্যন্ত জানেন অনেক কিছু।'

'বাব্বাঃ, তা হলে তো দেখছি বড় ঘরের দাস হওয়াও অনেক ভালো।'

'এটা কি বললি চন্দ, ছি! ছি! কত জন্ম পাপ করলে তবে কেনা-দাস হয়, তা জানিস? সেই শূকর আর বলদের গপ্পোটা জানিস না?'

'কোনটা? সেই শূকর রোজ ভালো ভালো খেত, আর বলদগুলো পেত না সেইটা?'

'হ্যাঁ সেইটা। তা ওই শূকরের মতো মোটা-সোটা হয়ে মাংসের জন্য বধ হওয়া ভালো?'

'দুটো এক হল? সেট্‌ঠি কি দাসেদের কেটে খায়?'

'তুই বড় মাথামোটা চন্দ, কেটে খাবে কেন? কিন্তু খাটায় তো? অসাগর খাটায়। তার ওপর প্রভু যখন যা বলবে করতে হবে। তেমন তেমন প্রভু হলে মেরে উচ্ছন্ন করে দেবে।'

'সবাই তো আর দেয় না। বড় ঘরের দাসেরা ভালোই থাকে। আমাদের কস্‌সকদের খাটুনি কি অপ্পো? রোদে-জলে, কীটপতং, সপ্প, জোঁক মাথার ওপর দিয়ে সারাটা দিন বয়ে যাচ্ছে। পায়ের তলায়...'

'কিন্তু যখন সবুজ সবুজ ধানগাছগুলি লতলতিয়ে ওঠে? যখন শিষ আসে? যখন সন্নবন্ন হয়ে যায় ক্ষেত! হাত পায়ে তেল মালিশ করে কুটিরের সামনের চত্তালে বসে দেখিস, তখন?'

চন্দ হেসে ফেলল, বলল, 'যাই বলিস ওই জাদুকর দুটোকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে। ছিল দাস, প্রভু নিজের বিদ্যে শেখালেন, শিখিয়ে মুক্তি দিয়ে দিলেন, এখন দেশ-বিদেশে জাদু দেখিয়ে কেমন করে খাচ্ছে!'

'সে দেখ, ওদের ভাগ্যের জোর। নয়তো এত তো সেট্‌ঠি ছিল, মেণ্ডক সেট্‌ঠির ঘরেই বা দাস হয়ে যাবে কেন? এত তো দাস ছিল সেট্‌ঠির, ওরা দু'জনেই বা বিদ্যেটা পেল কেন? ওদের আগের জন্মের কোনও পুন্নফল ছাড়া আর কী?'

পাশ দিয়ে একটি চার ঘোড়ার রথ ছুটে গেল।

'কে যায়? কে যায় গো?'

সারথি মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল, উত্তর দিল না।

গুমোর দেখলি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখলাম।'

হুম হুম করে শিবিকা আসছে। পটিচ্ছন্ন। বস্তর দিয়ে ঢাকা। কিন্তু বস্তর একটু ফাঁক করে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারপাশ দেখছে রমণীরা।

'কে যায় ? কে যায় ?'

'অযোধ্যা সেট্‌ঠির গেহের পুরাঙ্গনারা।'

আরও একটি রথ আসছে। এ পথ এখন বিশাখার বিবাহের কল্যাণে রথ্যা অর্থাৎ রথ চলবার উপযুক্ত হয়ে গেছে। যেমন প্রশস্ত, তেমনি সমান।

'কে যায় গো ?'

'রাজগহ যাই।'

গো শকট আসছে, দু'তিনখানা।

'কে যাচ্ছ গো ?'

বলদের পিঠে ছপটি মেরে চালক বলে, 'গামনি, গামভোজক সব আছে, পরিবারসুদ্ধু।'

'কোথাকার গামনিরা বল্ তো ? আমাদের গামনি তো আমাদের সঙ্গেই এলো। সব্বাই একপ্রকার হলিদ্দায় ছোপানো বত্তর পরে, নতুন উত্তরীয় কাঁধে, গলায় মল্লিকার মালা, পায়ে কাঠ্‌ঠপাদুকা পরে শনশন করে চলে এলাম। সঙ্গে রমণীদের আনিনি।'

'কেন ? রমণীদের আনলি না কেন ?'

'দুর। ওরা সঙ্গে থাকলে সব আনন্দই মাটি। তার ওপর এতটা পথ, বলবে "শকট করো, মাষক-কাহন কিছু নেই নাকি কস্‌সকের ঘরে ? নেই যদি তো বিবাহের সাধ হয়েছিল কেন ?" তারপর দেখ এই যে এখানে এত অলংকার এত সব শাটক, বেশভূষা দেখবে, অন্ততপক্ষে এক যুগ মাথা ঘুরে থাকবে। বলবে, "আমারও অমনি সাত লহর চাই। আচ্ছা সাত না পারো পাঁচ লহর দাও। অমনি কাঁকন, অমনি কেয়ূর", সব চিত্রের মতো বুঝিয়ে দেবে তোকে। কোথায় মরকত থাকবে, কোথায় হীরক, কোনখানটা সপ্পমুখের মতো হবে, কোনখানটা মকরমুখের মতো হবে। চত্তালে বসে বসে স্বপ্ন দেখবে সব। চেয়ে চেয়ে কাঞ্জিকা পাব না, অন্ন আধসেদ্ধ থাকবে, মচ্ছগুলো হয়ত বিড়ালেই খেয়ে যাবে, গাই দুইবার সময় বয়ে যাবে।'

'বাব্‌বাঃ, এতও ভেবেছিস্ ? তবে তোর দুরদিট্‌ঠি আছে, বলতেই হবে। রমণীরা এমনিই করে বটে। আমাদের তো গ্রাম থেকেই ঠিক হল রমণীরা যাবে না। বালক-বালিকারাও না। কে জানে, কেমন ব্যবহার করবে ! বড় ঘরের ব্যাপার ! তবে বালক-বালিকাগুলিকে না এনে এখন বড় দুঃখ হচ্ছে রে ! এমন খেলা, হাতি ঘোড়ার খেলা, নর্তকের খেলা, এমন জাদু দেখতে পেল না ! কাছাকাছি গ্রামের থেকে সব এসেছিল। বালক-বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও করেছিল।'

'গণিকাদের দেখেছিলি ? রাজগহ, সাবত্থি, চম্পা থেকে পর্যন্ত নাকি নেমন্তন্ন পেয়ে নৃত্যগীতকুশলা গণিকারা এসেছিল।'

'বাব্‌বাঃ তাদের জন্য তো সুরম্য হর্ম্য প্রস্তুত হয়েছে, নৃত্য ও সঙ্গীতের জন্য মণ্ডপ ভেতরে। আমরা যাই সাধ্য কি ? ওসব রাজভোগ্যা, ধনীভোগ্যা নগরশোভিনী। ওদের সঙ্গীতাদি শোনবার অধিকারও আমাদের নেই। নানা স্থান থেকে আসা সেট্‌ঠিপুত্তুর আর ক্ষত্তিয়কুমাররা তো ওখানেই সেঁটে ছিল।'

'কেন, সৈন্যদের বাসগহের কাছে তো অল্প মূল্যের বারবধূও ছিল। যাসনি ?'

'তুই গিয়েছিলি না কি ?'

'গেলাম বইকি। পুরো মূল্য দিয়ে গেলাম, তা মাঝরাতে এক বর্শা ধনুকধারী অশ্বারোহী আসতে আমায় বার করে দিলে।'

'তা তুই কি ভেবেছিলি মূল্য দিয়ে ওকে সারা রাতের জন্য কিনে নিয়েছিস !' চল, চল, পা চালিয়ে চল, মনে দুঃখু করিস না।'

সাকেতের প্রান্তিক গ্রাম থেকে অতিথির স্রোত আসা-যাওয়া করতেই থাকে। করতেই থাকে। যারা কাজ করছে এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত কি বন্ধুস্থানীয় তারা তো যতদিন পারছে, থাকছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য গ্রামগুলিকে গুচ্ছ করে করে খাইয়েছে শ্রেষ্ঠী। সারা দিন জাদুর খেলা দেখো, খাওদাও, ইচ্ছে হলে লক্ষ লক্ষ দীপমালায় শোভিত সাকেত নগরীর সন্ধ্যাশ্রী দেখো। তারপর ফিরে যাও। ভোজনের সময়ে নাতি-উচ্চ মঞ্চের ওপর সর্বালঙ্কারভূষিতা, অপরূপ বেশবাসে সজ্জিতা বিশাখা এসে নত হয়ে দাঁড়ায়, সঙ্গে সুবেশী সহচরীরা। শ্রেষ্ঠী কিংবা তার ভাইদের কেউ নিজে তত্ত্বাবধান করে। গ্রামণীর দেওয়া উপহারটি গ্রহণ করে স্মিতমুখে নমস্কার জানায় বিশাখা। অনেকক্ষণ ধরে উপহারটি হাতে চিত্রের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এমন শ্রেষ্ঠীকন্যা কেউ কখনও দেখেনি।

এবং সারাক্ষণ পঞ্চশত সুবর্ণকার, মণিকার মিলে সহস্র নিষ্ক পরিমাণ স্বর্ণ, রজত, মুক্তা, প্রবাল, হীরক, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, বৈদুর্য নীলকান্ত মণি ইত্যাদি দিয়ে অনলসভাবে প্রস্তুত করে যায় 'মহালতাপসাদন'। সে এক অদ্ভুত অলঙ্কার। অন্যান্য অলঙ্কার তো ধনঞ্জয় দিয়েইছেন। কিন্তু 'মহালতা' এক অতি বিচিত্র, দুর্লভ গহনা। এই গহনা নমনীয় অথচ এতে কোনও সুতো নেই। সব সুতোই রুপোর। পরলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহটিই এক অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব উপায়ে অলঙ্কৃত হবে। পায়ের ওপর সোনার চক্র, জানুদ্বয়ে দুটি, কটিদেশে দুদিকে দুটি, কণ্ঠে একটি, দুই বাহুসন্ধিতে দুটি, কানের ওপর দুটি এবং শিরের ওপর একটি। মহালতার উপরার্ধ একটি ময়ূরের মতো, যেন পেখম ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁদিকের পেখমে পাঁচশ', ডানদিকের পেখমে আরও পাঁচশ' সোনার পালক। ঠোঁট প্রবালের, চোখগুলি মণির, কণ্ঠ এবং পুচ্ছের পালকগুলিও বহু মণিখচিত। পালকের মধ্যশিরা রজতের, অনুরূপভাবে ধারগুলি এবং চরণও রজতের। বিশাখার মাথার ওপরে ঠিকভাবে বসিয়ে দিলে মনে হবে পর্বতশিখরে আনন্দিত ময়ূর নৃত্য করছে। আর সেই সহস্র পালকের মধ্যশিরা থেকে নড়া-চড়া মাত্রই সুমধুর, স্বর্গীয় সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। পেখম-ছড়ানো একটি মণিমাণিক্যখচিত ময়ূরের মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দরী বিশাখা। খুব কাছে এলেই বোঝা যাবে এটি সত্যি ময়ূর নয়।

কেউ বলল নব্বই কোটি ব্যয় হয়েছে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্যে এবং আরও দশ কোটি গেছে গড়াতে। কেউ বলল, অতটা হবে কী ? কেউ বলল, এ তো বোধ হয় অল্প করে বলা হল। মণিমাণিক্য, কত নষ্ট হয়েছে কাটাকাটিতে। রুপোর জালি নির্মাণ করতে সোনার চক্রগুলি বসাতেও এদিক-ওদিক অনেক গেছে, সে সব ধরলে আরও বেশি। বিশাখার গতজন্মের মহাপুণ্য ছিল নিশ্চয়ই, তাই-ই এমন অলঙ্কার পেল। কেউ আবার বলল, অলঙ্কার পেলেই তো হল না, তার উপযুক্ত রূপও থাকতে হবে। ধনী শ্রেষ্ঠী তো আরও আছেন। তাঁদের ঘরে কন্যাও আছে। কিন্তু এই গহনা পরবার জন্য ভাগ্য দুই প্রকার চাই। ধনভাগ্য এবং রূপভাগ্য। এই যে নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব আকার, ক্ষীণ কটি, পদ্মকোরকের মতো বক্ষের আকার, নাতিব্যাপ্ত নাতিপৃথুল শ্রোণি, সুচিক্কণ কম্বু গ্রীবা, অতুলনীয় আঁখি এবং ওষ্ঠাধর। মহালতা ধারণ করবার জন্য আদর্শ আকৃতি এই। এর চেয়ে ক্ষুদ্রকায় হলে, গহনার ভারে চাপা পড়ে যেত, দীর্ঘকায়, কিংবা স্থূলকায় হলে গহনা সমেত একটা অনৈসর্গিক প্রাণী বলে বোধ হত; কিন্তু এখন ছড়ানো ময়ূর পেখমের মধ্যে, ময়ূরের ঝুঁটিসুদ্ধ মুণ্ডটা মাথায় মুকুটের মতো ধারণ করে, বালার্ক বর্ণের স্বর্ণসূত্রী কাসিক দুকূল পরে বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে, সোনার চরণচক্র, কটিচক্র, জানুচক্র, কণ্ঠচক্র শোভা পাচ্ছে। মণিবন্ধে, বাহুতে, কণ্ঠে রত্নের ঝিকিমিকি। এ যেন সকল সৌন্দর্যের সার। মানুষী রূপের পরাকাষ্ঠা।

রথটিও তেমন। রূপা আর হাতির দাঁতের কারুকার্য করা। মাথার ওপরের ছাত থেকে মুক্তার ঝালর নেমেছে। সাতটি দুগ্ধধবল সৈন্ধব অশ্ব বাহন। তার পাশাপাশি আর-একটি রথে চলেছে গহপতিপুত্ত পুন্নবদ্ধন। দিব্যি দেখতে। একটু বেশি সুখুমাল। টানা টানা কালো চোখ, ধনুকের মতো বাঁকা ভুরু। ঠোঁট দুটি টুকটুকে। সরু গোঁফের রেখা। আকুঞ্চিত কেশদাম। প্রচুর অলঙ্কার পরেছে সেও। শুভ্র পট্টবস্ত্র, চন্দনাবলেপ, যূথীমাল্য, নরম সাদা শশকচর্মের পাদুকা। ঠিক যেন বীরপুরুষ বীরপুরুষ মনে হয় না। বীরপুরুষ হবে কি না সে নিয়েও যেন তার দ্বিধা আছে। গোঁফের প্রান্তগুলি মাঝে মাঝেই সে পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে। যথেষ্ট মোম দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ঠিক প্রার্থিত বক্রতাটা পাওয়া যাচ্ছে না। দেব-গন্ধর্বদের যেসব চিত্র লেখা হয়, হাতে মুরলি অথবা মৃদঙ্গ ! অনেকটা যেন সেইপ্রকারের পুন্নবদ্ধন। সামনে পেছনে সু-উচ্চ সব পেশল আজানেয় অশ্বের ওপর রাজা পসেনদি, তাঁর রক্ষীরা, পুন্নবদ্ধনের পিতা গহপতি মিগার, গহপতি সুদত্ত কুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেত, এবং শ্রাবস্তীর আরও গণ্যমান্য জনেরা। মহারানি মল্লিকার পটচ্ছিন্ন শিবিকাটি তার সোনার দণ্ড ঝলসাতে ঝলসাতে চলে গেল, পাশে পাশে অশ্বের পিঠে নারী রক্ষিণীরা, পেছনে আরও শিবিকায় রানির দাসীরা।

রথের ওপর সুসজ্জিত আসন আছে। বিশাখা নিমেষ কয়েক ভাবল। তারপর সে তার সহচরীকে বলল পিতাকে ডেকে দিতে। ধনঞ্জয় এসে বললেন, 'কী মা ? কী হল ?'

বিশাখা চুপিচুপি বলল, 'পিতা সব দিক থেকে দৃশ্যমান না হলে তোমার এই মহালতার পূর্ণ মহিমা তো বোঝা যাবে না। তুমি রথের পাশের ও পেছনের বস্ত্রাচ্ছাদনও সরিয়ে দাও। আমি কিন্তু শ্রাবস্তীতে রথ ঢুকলেই উঠে দাঁড়াব। দণ্ডায়মান বিশাখাকে মহালতার কেন্দ্রমণিরূপে তারা দেখুক।'

ধনঞ্জয় হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছ মা। কিন্তু এখন নয়। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। একটি রজ্জুতে টান দিলেই আবরণী সরে যাবে।'

সুতরাং সূচীশিল্পীরা এলো, এলো সূত্রধর, কৌশল করে রজ্জু গ্রথিত হল রথের আবরণীতে। সাত ঘোড়ার রথটি চলতে লাগল মধ্যম বেগে।

শঙ্খ বাজছে মুহুর্মুহু। অমঙ্গলাশ্রু লুকিয়ে ফেলছেন সুমনা। এখন আর বিশাখা পেছন ফিরে দেখবে না। নিয়ম নেই।

এবার ধনঞ্জয় যৌতুক দিতে আরম্ভ করলেন।

পাঁচশ' শকট অর্থ চলে গেছে। পাঁচশ' শকট স্বর্ণপাত্র। পাঁচশ' শকট রজতপাত্র, তাম্রপাত্র। পাঁচশ' শকট দুকূল বস্ত্র, নবনীত, সুগন্ধি চাল, নানা প্রকার সৌগন্ধিক সব পাঁচশ' শকট করে। লাঙল ইত্যাদি কর্ষণের যন্ত্রপাতিও চলল বহু। রথে শিবিকায় বিশাখার রক্ষী ও অনুচরীরা।

শোভাযাত্রা খানিকটা এগিয়ে যেতে ধনঞ্জয় হঠাৎ হেঁকে বলে উঠলেন, 'গোষ্ঠের দ্বার খুলে দাও।' অমনি হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে বেরিয়ে এলো শত শত গাভী। শুভ্র মেঘের মতো, ধবল, আবার কুচকুচে কালো, পাটল রঙের কেউবা, চিত্রবর্ণও অনেকে। একে অপরের গা ঘেঁষে গাভীর দল চলতে লাগল বিশাখার রথের পেছন পেছন। কানগুলি খাড়া খাড়া হয়ে উঠেছে। তৈলচিক্কণ শিংগুলিতে মালা জড়ানো, কালো নিরীহ চোখগুলি যেন একই সঙ্গে হাসছে এবং কাঁদছে। হাসছে তাদের প্রিয় মাতা বিশাখার সঙ্গে যেতে পারছে বলে। কাঁদছে এতদিনের গৃহ, গৃহস্বামী, গোচরক্ষেত্র এসব ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে।

এইভাবে ধনঞ্জয় বলদ দিলেন, বাছুর দিলেন। গোষ্ঠের বেষ্টনীটি বন্ধ করে দেবার পরেও বহু বলদ ও গাভী লাফিয়ে সে বেষ্টনী পার হয়ে চলে গেল।

সাকেতের আশেপাশে যে চোদ্দটি গ্রাম তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, সেখান দিয়ে অবশেষে অনুরাধপুর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলেন ধনঞ্জয় এবং যেতে যেতে বললেন, 'এখানে যারা যারা বিশাখার সঙ্গে যেতে চাও, যেতে পারো।' বলে তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে মহারাজ পসেনদি ও গহপতি মিগারকে যথাযথ অভিবাদন করে তাঁদের হাতে কন্যা সমর্পণ করে ফিরে এলেন।

এদিকে মিগার তাঁর ঘোড়া থেকে দেখতে পেলেন এক বিশাল জনতা পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে পেছন পেছন আসছে।

'এরা কারা ?' তিনি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'এরা আপনার স্নুষার আজ্ঞা পালন করবার জন্য যাচ্ছে। প্রজাবর্গ।'

'এত জনকে কে খাওয়াবে ? সর্বনাশ। তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও, মেরে তাড়াও।' তাঁর কথায় সঙ্গী রাজভটরা লাঠি উঁচিয়ে জনতার দিকে তেড়ে গেল।

বিশাখা উৎকণ্ঠিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করছেন, কী করছেন পিতা, মারবেন না, মারবেন না।'

তার পিতা তাকে পাঁচশত শকট অর্থ দিয়েছেন, তা ছাড়াও তার নিজেরই সঙ্গে রয়েছে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ। তার প্রসাধনের ব্যয়নির্বাহের জন্য। ভাবনা কী ?

কিন্তু মিগার শ্রেষ্ঠী তখনও চেঁচাচ্ছেন, 'কল্যাণি, প্রয়োজন কী এদের ? কে এদের খাওয়াবে ?'

রাজভটরা মাটির ডেলা ছুঁড়তে লাগল। লাঠি দিয়ে প্রহার করতে লাগল, তাতেও কয়েক জন ফিরল না। তখন মিগার ক্লান্ত হয়ে রাজভটদের বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে, এই ক'জনকে আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাও।'

বিশাখার পতিগৃহ যাত্রার পূর্বাহ্ণে ধনঞ্জয় সাকেতের সব শ্রেণীর জ্যেষ্ঠকদের সঙ্গে একটি সভায় বসেছিলেন। তাঁর মনে বড় শঙ্কা! এই মিগার শ্রেষ্ঠীর হাবভাব তাঁর ভালো লাগেনি। বিশাখাকে তাঁরা লালন করেছেন শুধু কন্যার মতো নয়, পুত্রের মতোও। তার বিবেক, তার কর্মক্ষমতা, নানা বিষয়ে তার দক্ষতা, স্বাধীনচিত্ততা—এই সবই গুণ। কিন্তু পরিবেশ-ভেদে এগুলোই তো দোষ হয়ে দেখা দিতে পারে! একটি বনে যদি শুধুই শৃগাল এবং শৃগালেতর প্রাণীই থাকে, সেখানে সহসা সিংহের আবির্ভাব হলে শৃগালেরা কি বলাবলি করবে না—'দেখ দেখ, এই প্রাণী কী কুৎসিত? এর মাথায় কেমন জটা? মুখ ব্যাদান করলে কী করম তীক্ষ্ণ শুভ্র দন্তরাজি দেখা যায়! থাবাগুলিই বা কী! এক একটি শল্লকীর মতো! চলে কি রকম দেখ্, যেন অলস কোন কাজ নেই! ও কি রে, বিদ্যুদ্বেগে ওটা কী চলে গেল? ওই প্রাণীটাই কী? ওর কি কাজকর্মে কোনও সামঞ্জস্য নেই? কোনও সুষমা নেই!'

সিংহের ডাক শুনলেও তারা বলবে, 'কী অসভ্যের মতো ডাক! আমাদের কী সুন্দর তীক্ষ্ণ হ্রস্ব ডাক, একজন ডাকলেই সবাই মিলিত হয়ে ডেকে উঠি। আর এ দেখো, ডাকছে তো ভূমি পর্যন্ত কেঁপে উঠছে, বাতাসে থম ধরে যাচ্ছে। কোনও প্রত্যুত্তরই তো এখনও পর্যন্ত আর কেউ দিল না। তা হলে, চল্ কলাকৌশল করে একে তাড়াই, কিংবা মেরে ফেলি।'

ধনঞ্জয়ের কথা শুনে শ্রেণিজ্যেষ্ঠকেরা সবাই প্রাণভরে হাসলেন। তারপর একজন বললেন, 'ধনঞ্জয় ঠিকই বলেছেন।' অন্যরাও সমর্থন করলেন।

তখন ধনঞ্জয় বিনীতভাবে বললেন, 'সেরকম কিছু হলে আমার কন্যার রক্ষা ও বিচারের জন্য আমি তা হলে আপনাদের এবং শ্রাবস্তীর গহপতিদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নির্বাচন করে দিতে বলি?' সকলেরই মত হল। তখন কোশল রাজের সেনাপতির উপস্থিতিতে তিনি শ্রাবস্তীর চারজন ও সাকেতের চারজন মোট আটজন গহপতিকে বিশাখার কাজকর্মের বিচার করবার দায়িত্ব দিলেন।

সৈন্যশ্রেণী চলতে চলতে বলতে লাগল, 'রান্নার কাঠের কী আকালটাই না হবে ভেবেছিলাম। বর্ষায় সব তো ভিজে স্যাঁতসেঁতে হবে। কিন্তু যেই প্রথম অভাব দেখা দিল অমনি গহপতি ভেঙে-পড়া হাতিশাল, ভাঙা কাঠের বাড়িগুলো সব জ্বালানির জন্য দিয়ে দিলেন। আর সমস্যা রইল না।'

রক্ষীরা বলল, 'আমাদেরও তো হয়েছিল, কাঠের অভাব। গহপতির লোকেরা কী করল জানিস? ভাণ্ডার খুলে যেখানে যত স্থূল, রুক্ষ বস্ত্র ছিল, সেগুলো দিয়ে সলতে পাকিয়ে তৈলে ডুবিয়ে জ্বালানির ব্যবস্থা করে দিল।'

রাজভটরা বলল, 'আমরাই তা হলে সবচেয়ে মহার্ঘ ইন্ধন পেয়েছি। চন্দন কাঠ দিয়ে রান্না হয়েছে আমাদের।'

একটা হাসির রোল উঠল। অনেকেই বলল, 'চন্দনের গন্ধঅলা শূকর মাংস কেমন লাগল? সাত্ত্বিক আর তামসিকের এমন মিলনকে কী বলা হবে?' 'রাজসিক, রাজসিক!' বহুজনে বলে উঠল।

'সত্যিই তিন মাস ধরে এমন রাজভোগ জীবনে কখনও কল্পনা করিনি! প্রথম যখন সাকেতে রাজবাহিনীর সঙ্গে যাবার নির্দেশ এলো মনটা দমে গিয়েছিল, বাড়ি ঘর ছেড়ে যেতে হবে। পুত্ত দুটো খুবই ছোট, তাদের মা কি সব দিক দেখতে পারবে? পিতামাতা অথর্ব হয়ে পড়েছেন, তাঁদের সেবাও তো আছে। তা এসে যা খেলাম, আর যা দেখলাম, এখন ভাবছি আগের জন্মে কী সুকর্ম করেছিলাম যে এমন ভাগ্য হল?'

একজন রাজভট বলল, 'ভেবেছিলাম সাকেত-সাবত্থির পথে তো চোর আর দস্যুদের উপদ্রব লেগেই আছে। না জানি কত চোর দমন করতে হবে। একটু ভয়ই পেয়েছিলাম, সৈন্যবাহিনী দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। তা এখন তো দেখছি নিরীহ কিছু গ্রামবাসীকে লাঠির প্রহার, তর্জন, আর কর্দমগোলক ছুঁড়ে মারা ছাড়া আর তেমন কিছু কাজই করতে হল না।'

শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠ পার হয়ে গেল। প্রধান তোরণদ্বারের কাছে আসতেই সরসর করে খুলে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রথের আচ্ছাদন। মুক্তার ঝালর দেওয়া রজতছত্রের তলায় বিশাখা দাঁড়িয়ে উঠল। শ্রাবস্তীবাসীরা চোখ ভরে, প্রাণ ভরে দেখতে লাগল, এ ওকে বলতে লাগল, 'এই তা হলে সেই পঞ্চকল্যাণী বিশাখা! কী অপরূপা। এ যে, সাক্ষাৎ শ্রী! এইই মহালতাপসাদন? এই অলংকার প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি বলেই গহপতি ধনঞ্জয় তিন মাস ধরে মিগার সেঠ্‌ঠির সমস্ত ঞ্জাতিবগ্‌গ, মিত্তবগ্‌গ, রাজা, রাজসেনা, রাজরক্ষী সব্বাইকে রাজভোগ্য সমাদর করে রেখেছিলেন! তা বাপু স্বীকার করতেই হয় অলংকারের মতো অলংকার। অদিট্‌ঠপুব্ব।'

'আরে, অলংকার তো অদৃষ্টপূর্ব। কিন্তু বধূটি? এমন বধূ কোথাও কখনও দেখেছ? এ তো দেখছি সাবত্থির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এত দিনে সাবত্থিতে এলেন। কোথায় ছিলে মা এত দিন, সন্তানদের ছেড়ে?' ভাবাবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কেউ কেউ এমনও বলতে লাগল।

বধূর আগমন উপলক্ষে ভারে ভারে উপহার এসে পৌঁছতে লাগল মিগারের ঘরে। পুন্নবর্ধনের মাতা বললেন, 'একেই তো বৈবাহিকের গৃহ থেকে অপরিমিত যৌতুক এসেছে? কোথায় সেসব রাখবো ভেবে পাচ্ছি না। তার ওপর আবার এই! উৎসবটি যে করব, সে অবসরও তো দিল না সাবত্থির ঞ্জাতিবগ্‌গ, মিত্তবগ্‌গ। তার ওপর এত লোকজন, দাসদাসী। আমি বাপু এসবের কিছু জানি না।'

বিশাখা বলল, 'কেন মা! আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ধনপালী, কহ্না, ময়ূরী যাও তো অন্যান্যদের সাহায্য নিয়ে নতুন গৃহে সমস্ত যৌতুক গুছিয়ে রাখো।'

তারপর বিশাখা উঠে এসে শ্রাবস্তীবাসীদের পাঠানো উপহারগুলি দেখতে লাগল। শাশুড়ি-মাতাকে বলল, 'আমি এখুনি এগুলির ব্যবস্থা করছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।' সে একেকটি উপহার তুলে নেয়, মিগারের ঘরের পুরাঙ্গনাদের কাছে উপহারদাতার পরিচয় জেনে নেয় আর মহার্ঘ বস্ত্র, অলংকার, পট, পেটিকা ইত্যাদির একটি তুলে দিয়ে সঙ্গে ছোট ছোট এক একটি পত্র লেখে, 'আমার মাতাকে প্রণতি জানাই, আমার ভগ্নীকে ভালোবাসা, আমার ভ্রাতাকে সৌভাগেচ্ছা।' 'আমার পিতাকে পরম শ্রদ্ধায়।' এইভাবে উপহারদ্রব্যগুলি এক এক ঝুড়ি মোদকের সঙ্গে দাসীদের দিয়ে রথে করে সে পাঠিয়ে দিল। বিতরণ করে দিল। যাঁরা পেলেন তাঁরা দু হাত তুলে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কারণ বিশাখা পুরাঙ্গনাদের কাছ থেকে এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ শুনে নিয়েছিল। কোনও ধনী বাড়ির কন্যা তার পাঠানো গজদন্তের কঙ্কণ হাতে পরে মুগ্ধ হয়ে নিজের হাতটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলে—ঠিক এমনই একটি শুভ্র কাঁকন, সোনার সপ্পমুখওয়ালা, এমনটাই আমি মনে মনে চাইছিলাম, বধূ বিসাখা কী করে জানল?'

আবার কোনও দরিদ্রঘরের বধূ, সোনার লহর কণ্ঠে পরে বারবার ঘটের জলে নিজের রূপ দেখতে থাকল। এমন লহর তার স্বামী তাকে কোনদিনই দিতে পারেনি। বিসাখা তো দেখি আমার নিজের ভগিনীরও বাড়া।

মৃগচর্মের বৃহৎ খবিকা হাতে নিয়ে কোনও গহপতির মুখে হাসি ধরে না। সুবন্ন কহাপণগুলি তিনি এতেই রাখবেন।

গেরুয়ার ওপর লোহিত চিত্র করা কাসিক ক্ষৌম বসনটি হাতে তুলে কোনও গৃহের গৃহিণী ভাবলেন, 'হিমঋতু এলো বলে, এই বসনে শীত কাটবে ভালো।'

আগাগোড়া রুপো দিয়ে নির্মিত হরিণশিশুটি নিয়ে বালক খেলা করতে গেলে, তার মা ভর্ৎসনা করে বলল, 'এটি খেলার জন্য নয়, দেখছ না, শিঙের শাখাপ্রশাখাগুলি কী সূক্ষ্ম! এটি সাজিয়ে রাখবার জন্য। তুমি বরং এই কন্দুকটি নাও।'

বালক কেঁদে উঠল, 'এটা তো মাতুলানী বিসাখা আমাকে দিয়েছে, তুমি কেন কেড়ে নেবে? না, আমি কন্দুক নেব না। হরিণ নিয়েই খেলব।' তার মা কোনক্রমেই রজত মৃগটি বালকের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পেরে অবশেষে রাগ করে চলে যায়। বালকটি তার নানাবিধ খেলনার মধ্যে হরিণটিকে সাজিয়ে রাখে, তাকে দৌড় করায়, আবার সাজিয়ে রাখে। অবশেষে বুকের ওপরে নিয়ে ঘুমিয়ে তেলে ভেজানো তূলের মতো হয়ে যায়।

এইভাবে বিশাখা শ্রাবস্তীসুদ্ধু ঞ্জাতি এবং মিত্রদের হৃদয় জয় করে নিল। কিন্তু তার শ্বশ্রূ বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এ কী প্রকারের সুহ্যা গো ! অত মহার্ঘ উপহারগুলি সব বিলিয়ে দিলে ! না হয় ঘরে কিছুদিন স্থানের অকুলানই হত, না হয় কিছু দ্রব্য অতিরিক্তই হত ? না হয় আমিই যা হোক বুঝে শুনে করতাম, না হয় সবাইকার সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ আমিই করতাম, না হয়.... ।'

বিশাখার কানে কথাগুলি এলো। সে ভাবল, 'এঁদের তো দেখি মতি স্থির নেই। এই বললেন এত বস্তু কোথায় রাখব, ভেবে পাচ্ছি না। মহাবিরক্ত মনে হল! যত শীঘ্র গৃহ অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তু থেকে মুক্ত হয়ে যায় ততই তো ভালো! সাকেতবাসীদের কাছ থেকে যা যা পেয়েছি সে সবও তো আমি নিজেই ইচ্ছামতো বিতরণই করে দিয়ে এসেছি। মাতা পিতা তো কিছুই বলেননি! সম্ভ্রান্তদের তো এরূপ আচরণই শোভা পায়! দ্রব্যগুলি তো তারা আমাকেই দিয়েছিল। আমার তাদের দিতে ইচ্ছা হল। ধনীর উপহারটি দরিদ্রকে, দরিদ্রের উপহারটি ধনীকে পাঠিয়ে দিলাম। উপহারের বা যে কোনও বস্তুর ব্যাপারে এই প্রকার সুবণ্টনই তো সবচেয়ে ভালো ? তা হলে ? শ্বশুরগৃহের পুরাঙ্গনা, পুরুষরা তো আমার পিতার কাছ থেকে অপরিমিত উপঢৌকন পেয়েছেন, আমার সঙ্গে যা যৌতুক এসেছে তাতে এঁদের বেশ ক বৎসরের ভোজন হয়ে যাবে। তা হলে ? আমি কি ভুল করেছি ? না। আমার বুদ্ধিতে যা ঠিক মনে হয় তাই-ই করব। তা ছাড়া শ্বশ্রূমা তো বলেই দিলেন 'আমি বাপু এ সবের কিছু জানি না।' তা সে কি তাঁর মনের কথা নয় ? তা যদি হয়, বিসাখার সান্নিধ্যে মনের কথা স্পষ্ট করে বলা তাঁকে শিখতে হবে। এখন এটাই তো আমার গৃহ, প্রথম থেকেই এ গৃহে যদি রাজ্ঞীর মতো থাকতে না পারি তা হলে তো দাসীদের নিচে আমার স্থান হবে! মা দেখছি ঠিকই বলেছিলেন। আসবার সময়ে পিতা কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলোর অর্থ আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। আমাদের গৃহে এরকম রহস্য করে কথা বলার রীতি আছে। শয়নকক্ষে, নিভৃতে মাও অনেক উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলির দেখছি আরও গুরুত্ব। মিগারগৃহে পদার্পণ করতে না-করতেই কাজে লাগছে।

AMARBOI.COM

৮

গৃধ্রকূট শিখরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে আঙুল দেখিয়ে বিম্বিসার বললেন—এই যে সম্মুখে প্রসারিত বিশাল রাজ্য, এ আমার চণক। আমি বাহুবলে জয় করেছি। যখন জয় করি তখন আমার কতই-বা বয়স হবে! জীবক কোমারভচ্চের চেয়েও অল্পবয়স্ক হবো। পশ্চিমে দেখো, শুধু পাহাড়, আর পাহাড়। ওই পাহাড়ের ওপর ছিল পুরনো গিরিব্রজ। দুর্গ নগরী। সেইখান থেকে সুপ্রাচীন কালে শুনেছি বার্হদ্রথ জরাসন্ধ একসময়ে মগধ শাসন করেছেন ক্রূর কঠিন হাতে। তিনি রাজচক্রবর্তী হতে চেয়েছিলেন, সমগ্র দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। শুনেছি, তিনি নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করছিলেন। ছিয়াশি জন ক্ষত্রিয় রাজন্যকে বন্দি করেছিলেন। তাঁদেরই রুদ্রদেবের কাছে বলি দেবার অভিপ্রায় ছিল। সে সব ছিল অতি বর্বর যুগ। পূর্ব প্রান্তে চেয়ে দেখো, আমার নতুন রাজগৃহ নগর। এ-ও গিরি দিয়ে ঘেরা, কিন্তু পাহাড়ের ওপরে নয়। মাত্র দুটি সংকীর্ণ পথ দিয়ে এ নগরে প্রবেশ করা যায়। সেও আমি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছি। পনেরো ক্রোশ বিস্তৃত। দেড় মানুষ সমান উচ্চ এবং প্রায় তিন মানুষ সমান প্রস্থবিশিষ্ট। তলায় পাষাণ। ওপরে ইষ্টক। পনেরো ক্রোশে, পনেরোটি অট্টালক আছে। তুমি দেখেছ সন্ধ্যায় নগরতোরণ বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমি প্রবেশ করতে চাইলেও পারব না। এই নগরী আমার প্রাণ। প্রথমে নাম ছিল কুশাগ্রপুর। তখন বজ্জিদের গণরাজ্য আর কোশলের মধ্যে বহু ছোট ছোট পার্বত্য অঞ্চল ছিল। এক একটি অঞ্চলে এক একজন ভূস্বামী প্রখর হয়ে উঠতেন, অন্যদের বশে আনতেন। আমার পিতা এইভাবেই কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চলের স্বামী হয়ে উঠলেন, তিনিই আমাকে প্রথম স্বপ্ন দেখান। কুশাগ্রপুর আগুন লেগে পুড়ে গেল। তখন সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর আমি নতুন নগর গড়ে তুললাম। স্থপতি মহাগোবিন্দ এই নগর আর রাজপ্রাসাদের পরিকল্পনা করলেন। আর শুধু কাঠ নয়, ভিত্তিতে পাষাণ, তার ওপর ইষ্টক গেঁথে প্রস্তুত হয়েছে ওই প্রাসাদ, এবং নগরীর অধিকাংশ হর্ম্য। ভেতরে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। তুমি দেখেছ কত উদ্যান, কত সুশোভন হর্ম্য, কত সরোবর দিয়ে সাজিয়েছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এ নগর। আছে বেণুবন, আছে সিতবন, লঠ্‌ঠিবন, আছে বিশাল আম্রবন বেশ কতকগুলি, যার মধ্যে সুন্দরতমটি আমি আয়ুষ্মান জীবককে দিয়েছি। বেণুবন দিয়েছি তথাগত বুদ্ধকে।

অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তর সঙ্গে পিতার শত্রুতা ছিল। অঙ্গ তখন সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, পাশেই এই পার্বত্য অঞ্চলে গোষ্ঠীপতিদের শক্তিশালী হয়ে ওঠা তাঁর মনঃপূত হয়নি। তিনি সৈন্যদল পাঠিয়ে আমার পিতাকে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করেন, তখন তিনি আমায় সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন বিধিমতো। বললেন, সেনিয় তুমি আর গোষ্ঠীপতি নও, তুমি স্বাধীন রাজা। যাও নিজের রাজ্যসীমা বাড়াও। পিতার স্বপ্ন সফল করতে আমার তরুণ দেহের সমস্ত শক্তি, উৎসাহ, তরুণ মনের সমস্ত বুদ্ধি নিয়ে ব্রহ্মদত্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যুদ্ধ চলেছে। অবশেষে কেউ যা কল্পনাও করতে পারেনি তাই ঘটল। অঙ্গরাজ্যের পতন হল, বিম্বিসার নিজেকে অঙ্গ, মগধের রাজা ঘোষণা করল। তারপর কোশলরাজ মহাকোশল আমাকে জামাতা করলেন, বজ্জিদের সঙ্গে বিবাদ হল, তাতেও জয়ী হলাম, তারাও আমাকে কন্যাদান করল, তারপর যে উদীচী আমার এই ভূমিকে একদিন কীকট দেশ বলে ব্যঙ্গ করেছে, ব্রাত্য বলে বিদ্রূপ করেছে, সেই উদীচী থেকে মদ্ররাজকন্যা মহিষী হয়ে এলেন আমার ঘরে।

'চণক, এখন আমার রাজ্য তিন শত যোজন বিস্তৃত। আশি সহস্র গ্রাম আছে এ রাজ্যে, আছেন বহু পণ্ডিত, বিদ্বান, তপস্বী, শ্রমণ—এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই শ্রমণপন্থের। বেদপন্থী নন। তবে কিছু কিছু বৈদিক ব্রাহ্মণও আছেন, তাঁদেরও আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। উত্তরে কোশল, বৈশালী, পশ্চিমে কৌশাম্বী, অবন্তী আমার বন্ধু-রাজ্য। এঁদের কয়েকজনের সঙ্গেই আমার বৈবাহিক সম্পর্ক। প্রজারঞ্জক বলে আমার সুযশ হয়েছে। মহামাত্র, রাজন্য উপরাজ ও গ্রামণীদের সাহায্যে শাসনকার্যের একটা সুব্যবস্থা করে ফেলতে পেরেছি। এই উত্তরাখণ্ডে আমিই প্রথম যার চতুরঙ্গিণী সেনা আছে, যুদ্ধবিগ্রহের জন্য সবসময়ে প্রস্তুত। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আমার পরামর্শেই বেতনভোগী সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে আরম্ভ করেন। এখন তুমি বলো আমি কীভাবে আচার্যের আদেশ পালন করব। পালন করবার কোনও উপায় যদি বারও হয়, তা হলেও কি শুধুমাত্র আচার্যের আদেশ বলেই তা অন্ধের মতো পালন করব ? না, তার সত্যিই কোনও গভীর প্রয়োজন আছে ?'

চণক বলল, 'মহারাজ তার পূর্বে আপনি আমাকে বলুন আমার সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপের সময়ে আচার্যের আশীর্বাদের কথা স্মরণ করে আপনি অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন কেন ?'

বিম্বিসার বললেন, 'চণক, চক্রবর্তী ত্রিবিধ—চক্রবাল-চক্রবর্তী, দ্বীপ-চক্রবর্তী এবং প্রদেশ-চক্রবর্তী। চক্রবর্তী-রাজার যে সপ্তরত্ন থাকে তার একটি অর্থাৎ চক্র বাদে অন্য সবগুলি অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক এ সকলই আমার আছে। আমি তো প্রদেশ-চক্রবর্তী হয়েছিই। শুধু শাস্ত্র-বর্ণিত চক্রের সন্ধান এখনও পাইনি। অলৌকিক ঋদ্ধিসম্পন্ন না হলে চক্রের মতো একটি শস্ত্র কীভাবে আমার পুরোভাগে যেতে পারে তাও আমি বুঝতে পারি না বন্ধু। বোঝবার চেষ্টা করি। অন্য অনেকের মতো চক্র ধারণ করে হাস্যাম্পদ হই না। তুমি যখন বললে আচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে, আমি উল্লসিত হলাম, কারণ তিনি তো দেখে যাননি অঙ্গ আমার পদানত হয়েছে, দেখে যাননি এতগুলি রাজ্যের সঙ্গে আমার কূটনৈতিক সম্পর্ক হয়েছে। আমি তো অন্তত প্রদেশ-চক্রবর্তী হয়েছি।'

চণক বলল, 'না মহারাজ, আমি যখন আপনাকে পূর্বে দক্ষিণে রাজ্যসীমা বাড়াবার ইঙ্গিত দিই তখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কী করে আপনার মনের কথা জানলাম। কী পরিকল্পনার কথা ভেবে আপনি এ কথা বললেন, জানতে আগ্রহ হচ্ছে।'

'চণক, তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, দক্ষিণ পূর্বে কী বিশাল বন ! দক্ষিণের বন ক্রমে বিন্ধ্যারণ্যের সঙ্গে মিশেছে, পূর্বে কজঙ্গল। অঙ্গ অবধি আমার করায়ত্ত। এখন এই কজঙ্গলের বিশাল বন যদি কেটে কেটে আমি প্রজা বসাই। কে আমাকে নিষেধ করবে ?'

'বন্যরা আছে, তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তাদের দুর্গ রক্ষা করতে।'

'বন্যদের আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। তারা কী করবে আমার চতুরঙ্গিণী সেনার সামনে ?'

'মহারাজ কিছুদিন আগে যুদ্ধ উপলক্ষে নরমেধের সম্ভাবনায় শিহরিত হচ্ছিলেন, বন্যরা তা হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ নয় ? তাদের বধ করতে হলে, মহারাজের বিবেক-বুদ্ধি পীড়িত হবে না ?’

‘বন্যরা মানুষ ? অবশ্যই হাত পা কান নাক চোখ সবই আছে মানুষের মতো। তারা ইচ্ছামতো মানুষ বধ করে। নরমাংসও খায় শুনেছি।’

‘কে বলতে পারে মহারাজ, আমরাও একদিন অমনি বন্য ছিলাম না ? শুনঃশেফকে তো যূপের সঙ্গে বাঁধা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল, তার পিতা অজীগর্ত স্বয়ং তাকে বধ করতে রাজি হয়েছিলেন। রাজা জরাসন্ধের কথাও স্মরণ করুন ! সভ্য মানুষ যারা প্রাসাদে, কি কুটিরে বাস করে, ক্ষেত্র কর্ষণ করে, পশুপালন করে খাদ্য সংগ্রহ করে, মন্ত্রী, অমাত্য, পারিষদবর্গ নিয়ে রাজ্য চালনা করে সুষ্ঠুভাবে তারাই যদি নরমেধে উদ্যত হতে পারে, তা হলে যারা বনে বাস করে, আর্যমানুষের কোনও সুবিধাই পায় না, তারা নরমেধ করবে—এতে আশ্চর্যের কী আছে ? তাতে তাদের মানুষ নাম থেকেই বা বঞ্চিত করা হবে কেন ?’

বিম্বিসার অবাক হয়ে চণকের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আজ একটা নূতন কথা শোনালে আচার্যপুত্র, বন্যরা মানুষ ! যারা যক্ষ, রাক্ষস, তারা ? তাদেরও তো হাত-পা ইত্যাদি, সমস্ত মনুষ্যলক্ষণই আছে !’

চণক বলল, ‘এরা, এই বন্যরা যখন ধরা পড়ে, বন্দি হয়ে সভ্য রাজ্যের সীমার মধ্যে আনীত হয়, তখন এদের নিয়ে কী করা হয় মহারাজ ?’

‘অতিরিক্ত হিংস্র হলে বধ করা হয়। নইলে ধীরে ধীরে বাধ্য বশংবদ হলে কাজে লাগানো হয়। দাস হয়ে কাজ করে।’

‘আপনার যেসব অ-বন্য দাস আছে তাদের থেকে এই একদা বন্য দাসেদের কাজকর্মের ক্ষমতা বা দক্ষতা বা প্রকৃতি কি অন্য প্রকার ?’

‘না তো চণক ! অনেক বন্যই দাস হয়ে যোগ দিয়ে শেষে খুবই কুশলী ধনুর্গ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার সেনাদলে এরূপ অনেক আছে।’

‘তা হলে ! ওই সব অরণ্য তো আপনারও নয় মহারাজ আমারও নয়। যারা দীর্ঘকাল সেখানে বাস করছে তাদেরই। মাতা বসুমতী কারও ক্রীতদাসী নন, তিনি জননী, যেখানে তাঁর যে সন্তান উৎপন্ন হয়েছে তাকে তিনি সেখানেই লালন করছেন।’

‘চণক, তোমার যুক্তি মানলে তো জঙ্গলের দিকে রাজ্যসীমা বাড়ানোও আমার অনুচিত।’

‘মহারাজ আপনি যুদ্ধ করে জম্বুদ্বীপ জয় করবার সম্ভাবনায় নরমেধ হবে মনে করে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তাই এ সব কথা বললাম। অরণ্য কেটে বসতি করতে গেলে বন্যরা ক্রমশই দূরে আরও দূরে সরে যাবে। সহসা প্রতিরোধ করতে সাহসী হবে না। আমরা যেমন তাদের ঘৃণা করি, ভয় করি, তারাও তেমন আমাদের ঘৃণা করে, ভয় করে।’

‘তা হলে ? কী তুমি বলতে চাইছ আচার্যপুত্র ?’

‘মহারাজ, প্রথম যখন মগধ অভিমুখে যাত্রা করি, আমার শুধু পিতার মগধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীই স্মরণে ছিল। বিম্বিসার রাজ-চক্রবর্তী হবে। মগধ আদর্শ চক্রবর্তী-ক্ষেত্র। তখন সত্যি বলতে কি আমার কল্পনায় যুদ্ধই ছিল মুখ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ও যে ছিল না এমন নয়। প্রতিদিন যা যা দেখেছি, যে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে প্রতিদিন পাল্টে গেছে চিন্তার ধারা।’

চণক থামল। গিজ্ঝকূট শিরে আবারও অস্তাচলের সেই প্রদীপ্ত মায়া-মুহূর্ত। সেই দিকে তাকিয়ে বিম্বিসার বললেন, ‘বলো, তোমার চিন্তার কথা।’

চণক বলতে লাগল, ‘চিন্তারও আগে কী দেখলাম শুনুন মহারাজ। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, জনপদের পর জনপদ, নদীর পর নদী, বনের পরে বন—এই হল বসুন্ধরা। এর ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে জীবনস্রোত। দেখলাম সহজ সাধারণ কর্ষক, পাটনি, কর্মার, সূত্রধর, নলকার, ঘটিকার, তন্তুবায় সব যেযার ছোট্ট সীমার মধ্যে আপন কর্মে আপন সুখ-দুঃখে মগ্ন। তারা জানেও না রাজা, রাজধানী কী প্রকার, শত্রু বলতে কী বোঝায়, কেই বা শত্রু, কেই বা মিত্র। আরও দেখলাম, বড় বড় সার্থ নিয়ে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে সার্থবাহ। বহু শকটে পণ্য। এক স্থান থেকে পণ্য সংগ্রহ করে, আরেক স্থানে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করে, কখনও কখনও এরা কেনা-বেচার জন্য দীর্ঘদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক স্থানে বসে যায়, কিছুদিনের মতো একটি গ্রাম সৃষ্টি হয়ে যায় তাতে। তারপর ঘরে ফেরে—কোষাগার পূর্ণ হয়, বিলাস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ধনরক্ষা করতে আরও দাস-দাসী, আরও কর্মকর, আরও লেখক গণক, আরও পত্নী, পুত্র প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে এরা সাড়ম্বরে দান করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের, শ্রমণদের, কদাচ দরিদ্রদের, কিন্তু সর্বক্ষণ বাড়িয়ে চলে নিজের সম্পদ, নিজের প্রয়োজন এবং পরিজন। ক্ষমতা, সত্যিকার ক্ষমতা এদের হাতেই আছে, শুধু অস্ত্র নেই। তাই ক্ষত্রিয় রাজাদের এরা একটা সম্ভ্রম ও আনুগত্য দেখায়, ব্রাহ্মণদেরও ভক্তিশ্রদ্ধা দেখায়। কিন্তু সবটাই নীতি। তারা এই পথ বেছে নিয়েছে সমাজের শিখরে ওঠার জন্য। আরও দেখলাম আছে চোর, দস্যু, এরা উত্তরের বাণিজ্যপথের নানান স্থানে দল বেঁধে অবস্থান করে, সার্থর পণ্য, বা অর্থ কেড়ে নেওয়াই এদের জীবিকা। এরা মনুষ্য সমাজের বাইরে। দেখলাম হীনজাতিসম্ভূত আরও অনেক প্রকার কর্মকরদের, তারা সমাজের প্রান্তে বাস করে—আর দেখলাম যত্রতত্র সংসারবৈরাগী শ্রমণ, সন্ন্যাসী। এত সংখ্যাধিক্য এঁদের যে, মানুষের প্রায় দুটি বিভাগ করলেই চলে—সংসারী ও সংসারবিরাগী। এই সুপ্রচুর সংখ্যায় বৈরাগী—ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—এও এক অদ্ভুত ব্যাপার।

বিম্বিসার বললেন, 'বন্য ? বন্যদের দেখেছ ?'

'দেখেছি মহারাজ, তাদের অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করেছি। জেনেছি তারা মানুষই। অপ্রাকৃত প্রাণী নয়।'

'আর কি দেখলে ? বলো চণক।'

'আর দেখলাম সহসা এই গ্রাম, নগর, জনপদ, নদ-নদী, পাহাড়, পথ, যেখানে যা আছে, যে আছে সমস্ত ওই পশ্চিমাকাশের মতো লাল হয়ে উঠল। প্রথমে শুধু এক খণ্ড রক্তবর্ণের মেঘ। বাকি আকাশ নীল। তারপর সেই লোহিত বর্ণ সারা আকাশময় ছুটোছুটি করতে শুরু করল মহারাজ। বর্শা, তীর, ভল্ল, গদা, চক্র, পাশ, তরোয়াল, পরিঘ ঘুরছে, সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সেনা বিশাল এক লৌহিত্য নদে পরিণত করে দিচ্ছে সব। কিন্তু এই কর্মার, তন্তুবায়, কর্ষক, এই সার্থ, লেখক গণক, এই শ্রমণ তীর্থিক, সন্ন্যাসী, এই চণ্ডাল, নিষাদ আর সবার ওপরে এদের রক্ষক, শাসক, রাজারা যে যার সংকীর্ণ সীমা, সংকীর্ণ লক্ষ্য নিয়ে এমন মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে আছেন যে, কেউ নিজের গণ্ডি থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছেন না, পরস্পরের হাত ধরতে পারছেন না। এমন কোনও ক্ষমতা নেই যে, ভেরী-ঘোষণা করে সবাইকে নিজের ছত্রতলে সমবেত করেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে সবাই, সর্বশ্রেণীর মানুষ। আবার মার খেতে খেতে একে অপরকেও মেরে ফেলছে, আর মানুষের রক্তে, এতদিনের সঞ্চিত বিদ্যার রক্তে, নিহত কৃতির রক্তে ক্রমেই লোহিত আরও লোহিত হয়ে উঠছে এই বসুন্ধরা। আদীপ্ত জম্বুদ্বীপ, হুতাশনে জ্বলছে, তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে জ্বলছে। মহারাজ ওই দেখুন জম্বুদ্বীপের সূর্য অস্ত গেল।'

মুহূর্তে আবছা, ঈষৎ রক্তাভ ছায়া নেমে এলো গিরিশিরে, প্রসারিত সুন্দরী নগরীর দেহের ওপর, গিরিশিরে উপবিষ্ট দুটি মানুষের ওপর।

বিম্বিসার অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'তারপর ?'

চণক বলল, 'তারও পর ? তারও পর থাকে! যদি থাকে মহারাজ, তা হলে তা এই অন্ধকার। এই ছায়াময় ভবিষ্যৎ। ক্রমে নীরন্ধ্র রাত্রি, এবং শ্মশাননৈঃশব্দ্য। আর কিছু নেই।'

অনেকক্ষণ দু'জনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হল। নিচে নগরীতে দীপালোক দেখা যেতে লাগল বিন্দু বিন্দু। আগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে আলোকবিন্দুগুলি যেন হারিয়ে যাচ্ছে। শেষ পাখির দল আশপাশ দিয়ে পক্ষবাতে দু'জনকে ব্যতিব্যস্ত করতে করতে উড়ে চলে গেল। মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল এতক্ষণ, এখন হাওয়ার বেগ ক্রমশ বাড়তে লাগল। আকাশময় তারার প্রলাপ। চাঁদ উঠবে বিলম্বে। তাও কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়া চাঁদ। সে শুধু অন্ধকারকে আরও তীব্র করে তুলবে। অন্ধকার তখন যেন এক ভীষণ কালপুরুষের হাতে ভীষণতর নারাচ। রাত্রির আকাশে পৃথিবী ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে।

চণক মৃদুস্বরে বলল, 'আপনার সাম্রাজ্যলিপ্সা না থাকতে পারে, আপনি তথাগত বুদ্ধের উপাসক হয়েছেন বলে অহিংসক হতে পারেন, কিন্তু সকলেই তো একরূপ হতে পারে না! পারস্যরাজ কুরুস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো কখনই আপনার মতো শান্তিকামী নন। প্রথম রাজা, পৃথিবীর আদি রাজা সৃষ্টি হয়েছিলেন সবাইকার সম্মতিক্রমে। তাই তাঁর নাম বা উপাধি মহাসম্মত। এ শুধু একটা ব্যবস্থা। ধনজনপূর্ণ জনপদবাসী অনুভব করেছিল, তাদের উৎপাদনকর্মে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য, সমাজে স্থিতিরক্ষার জন্য একজন যোগ্য মানুষ প্রয়োজন। এই মহাসম্মত ছিলেন তাঁর প্রজাদের নিযুক্ত কর্মকর, তিনি সেটা জানতেন। কিন্তু কালক্রমে রাজারা এসব ভুলে গেলেন। বাহুবল, অস্ত্রবল, আজ্ঞাবল এই তিন প্রকার বলে বলীয়ান হয়ে তাঁরা প্রজাদের মনে করতে লাগলেন তাঁদের ভৃত্য, পৃথিবীকে মনে করতে লাগলেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখন এই প্রমাদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে, দূর করবে কে ? কিন্তু এই প্রমাদের বলি কেন আমরা হবো ? অথচ এইভাবে বিচ্ছিন্ন, স্ব-স্ব গণ্ডির মধ্যে কূপমণ্ডূক হয়ে থাকলে বলিই আমাদের হতে হবে। ভাবুন, মহারাজ ভাবুন। কীভাবে জম্বুদ্বীপকে একত্র করা যায় !'

দু'জনেই উঠে দাঁড়ালেন। এবার নামতে হবে। নামতে নামতে এক পাক দূরে শিলাতলে অস্‌সজিকে আজও ধ্যানমগ্ন দেখতে পেলেন দু'জনে। কদিনই দেখা যাচ্ছে। বিম্বিসার সসম্ভ্রমে বললেন, 'ভিক্ষু অস্‌সজি শীঘ্রই অর্হত্ব লাভ করবেন। এবারের বর্ষাবাস তথাগত করছেন বেলুবনে। এক সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান ছাড়া প্রধান ভিক্ষুদের প্রায় সকলেই তাঁর কাছাকাছি রয়েছেন। কিন্তু তথাগতর নির্দেশ আছে যে, কোনও ভিক্ষু নির্জনবাস করবার জন্য ইচ্ছা হলে অন্যত্র, বনে, পাহাড়ে, গ্রাম-প্রান্তে থাকতে পারেন। ভিক্ষু অস্‌সজি দেখছি বেশ কিছুদিন ধরে গিজ্‌ঝকূটকেই তাঁর সাধনক্ষেত্র স্থির করেছেন। সদ্ধর্মে এনেছেনও ইনি অনেক জনকে।' সাবধানে পাশ কাটিয়ে নেমে গেলেন দু'জনে। মহারাজ যে অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট সেটা তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তিনি চণকের কথা ভাবছেন, না অস্‌সজির অর্হত্ব লাভের কথা ভাবছেন, চণক বুঝতে পারল না।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুই আরোহী। পাশাপাশি চলেছেন মন্দ্র তালে। বিম্বিসার সহসা বললেন, 'তা হলে আমাদের জানতে হয়।'

'কী জানতে হবে মহারাজ ?' ক্লান্ত স্বরে চণক বলল।

'জানতে হবে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।'

চণক মুখ ফিরিয়ে তাকাল, বলল, 'মহারাজ, এতক্ষণে আমার যুক্তিপথ অনুসরণ করছেন।'

'এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা তো রাজার নিজের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তা তো নয়ই।'

'চরেরা কিন্তু এই সংযোগ স্থাপন করে।'

'উদ্দেশ্য অন্য, তারা শুধু রাজস্বার্থ দেখে।'

'অথচ যোগাযোগের জন্য বিশিষ্ট মানুষ প্রয়োজন।'

'আমি সেই বিশেষ কাজের কথাই বলছিলাম মহারাজ', চণক বলল, 'আমি এই দেশ ঘুরে ঘুরে দেখব, যাবো প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যাবো বন্যদের কাছেও, যারা আর্যবাক্‌ বলে না।'

'তুমি আজ যা শোনালে চণক, তাতে মনে হচ্ছে, তোমাকে যেতে হবে মধ্যদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও, এমন কি উত্তরেও, কারণ তাঁরাও তো এভাবে ভাবেন না। এই দেখো না, অবন্তীরাজই তো গান্ধারের সঙ্গে বিবাদ লাগিয়ে বসে রয়েছেন।'

'মহারাজ আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু উদীচীকে আমি ভালো করে জানি বলেই প্রথমে তাঁদের কাছে যাবার চিন্তা করিনি। যারা সাধারণ, ধরুন একপ্রকার মূর্খই, যারা এখনও আমাদের কেউ নয়, তাদের কাছেই যাবার কথা, তাদেরই বোঝাবার কথা ভাবি।'

'কিন্তু চণক কী দিয়ে তাদের বোঝাবে ? কোনও একটা সূত্র তো চাই ! ভাষা, বর্ণ, অভ্যাস, ধর্ম...'

চণক বলল, 'আমি চেষ্টা করছি সেই সূত্রটি আবিষ্কার করবার। যতক্ষণ না এদের সঙ্গে মিশছি, যতক্ষণ না দেখছি সেসব প্রত্যন্ত অঞ্চল, ততক্ষণ তো সে সূত্র বার করতে পারব না। তত্ত্বচিন্তা করে তো কোনও লাভ নেই !'

বিম্বিসার বললেন, 'তুমি তা হলে আর বিলম্ব করতে চাইছ না চণক !'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না মহারাজ।'

'ভালো। ইতিমধ্যে আমি রাজনীতির এই নতুন দিকটির সম্পর্কে আমার মিত্ররাজাদের সঙ্গে কথা বলি!'

'বলবেন? এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। মহারাজ, হঠাৎ একটা পরিকল্পনা আমার মাথায় আসছে। আপনি একটি রাজসংঘ গঠন করার চেষ্টা করুন না কেন! বহু রাজার সম্মিলিত সংঘ, তাঁদের মধ্যে একজনকে সবাই নেতা বলে মেনে নেবেন, বিশেষত বিপদের সময়ে।'

'অস্পষ্টভাবে এই রকম কিছুই একটা আমার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরছিল, বন্ধু। অতি অস্পষ্ট...'

'আমার প্রসঙ্গ এবং নাম উহ্য রাখবেন মহারাজ।'

'কেন?'

'রাজারা সর্বদাই সন্দেহপরায়ণ। কে এক উত্তরদেশীয় ব্রাহ্মণযুবক আপনাকে কী বলেছে, সেইজন্যই আপনি এ চেষ্টা করছেন, জানলে এঁদের হয় মনে গুরুতর সংশয় হবে, নয় এঁরা গুরুত্ব দেবেন না চিন্তাটিকে। উত্তরের সঙ্গে মধ্যদেশের বিশেষত প্রাচী-ঘেষা মধ্যদেশের এক অলিখিত তিক্ত সম্পর্ক আছে সে কথা তো আপনি জানেন।'

'সেটা আমরা ওঁদের মতো আচারপরায়ণ নই বলে, বৈদিক ধর্মের চেয়ে শ্রমণ পন্থগুলিকে গুরুত্ব দিই বলে। কোনও রাজনীতিক কারণে কিন্তু নয়। রাজাদের সবাইকার স্বার্থরক্ষার ওপর যদি ঝোঁক দিই, তা হলে হয়ত শুভ ফল হতে পারে।'

চণক কিছু বলল না। রাজার স্বার্থ রক্ষার ওপর ভিত্তি করে যদি রাজসংঘ হয়, তা কি প্রজাবর্গের আন্তরিক অনুমোদন পাবে! রাজা ক'জন রাজপুরুষই বা ক'জন। বেশির ভাগই তো প্রজা, সাধারণ বর্গ, ইতর জন। তাদের হৃদয় জয় করতে না পারলে...কিন্তু নিজের দ্বিধা চণক প্রকাশ করল না। হতে পারে রাজাদের সংঘভুক্ত করবার প্রয়াস যদি মহারাজ বিম্বিসারের দিক থেকে হতে থাকে, এবং তলার দিক থেকে একই সঙ্গে চলতে থাকে তার প্রয়াস, হয়ত কিছু ফললাভ হবে।

এখন তারা বিস্তৃত রাজমার্গে প্রবেশ করেছে। পরিচ্ছন্ন পথ, মাঝে মাঝে দীপস্তম্ভ। সুন্দর বেশে, প্রসাধিত নরনারী চলাচল করছে। পুরুষের তুলনায় রমণী কিছু অল্প। যারা বেরিয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই দাসী জাতীয়। কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেকেই বিলক্ষণ সুবেশী, যথেষ্ট সুশ্রী। শিবিকা চলে গেল দু-একটা। একটি চার ঘোড়ার রথ। এটি রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠীর, কদিনে চেনা হয়ে গেছে চণকের। এই দৃশ্যটির দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হয় এমন শান্তি, এমন রম্যতা, এত সুখ আর কোথায় পাওয়া যাবে? চিন্তার কী-ই বা আছে? অনর্থক অশুভ-চিন্তায় কালক্ষেপ করে কাজ কী? তার চেয়ে চলে গেলেই হয় কোনও উচ্চশ্রেণীর পানাগারে। সুসজ্জিত, সদালাপী সম্ভ্রান্তবংশীয় কিছু পানরসিক যুবকের সঙ্গে পানপাত্র হাতে বসে গেলেই হয়। পানাগারিকদের সুন্দরী কন্যা হয়ত পানীয় পরিবেশন করবে স্ফটিকের পাত্রে, সেই সঙ্গে ঢেলে দেবে লাস্য। মাধ্বীর মৃদু উত্তেজনা শিরায় শিরায় বইবে, নানা গম্ভীর এবং তরল বিষয়ে আলোচনা হতে থাকবে, বাদ-প্রতিবাদ, তর্কাতর্কি এসবও হতে পারে। কিংবা যাওয়া যেতে পারে শ্রীমতীর গৃহে। সেখানে যদি নিরবচ্ছিন্ন কয়েক দণ্ড বীণা শোনা যায়, শোনা যায় শ্রীমতীর গান। কিংবা তার সেই কৃষ্ণকায় মৃদঙ্গবাদকটির অদ্ভুত বাদন। শ্রীমতী নাচে, কিন্তু মৃদঙ্গবাদকের হাত এবং আঙুলগুলি? তারাও অদ্ভুত ছন্দোময় হয়ে ওঠে। মুখ নিচু করে বাজায় মানুষটি। কিন্তু তার চারদিকে কয়েকটি অদৃশ্য নৃত্যপর আকৃতি আছে মনে হয়। তারা মৃদঙ্গের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কখনও সমবেতভাবে নত হয়ে মাটিতে পা ঠোকে, কখনও চক্রাকারে ঘুরে যায়, কখনও উর্ধ্বে নিজেদের উৎক্ষিপ্ত করে। একদিন তার এই অদ্ভুত মনে হওয়ার কথা বোধিকুমারকে বলেছিল চণক।

'ভদ্র দেখেছেন, এর বাদনের ফলে চারপাশে একটা অদৃশ্য নৃত্য হতে থাকে!'

বোধিকুমার বলে, 'সুনক্ষত্র তো শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব! ও তেমনভাবে বাজালেই অপ্সরারা নেমে এসে নৃত্য করতে থাকে। তাই-ই এ প্রকার অনুভব হয়।'

চণক অবাক হয়ে বলে, 'অপ্সরা? গন্ধর্ব? আপনি কি কাব্যরচনা করছেন, না সত্য বলছেন!'

'সত্যই বলছি' বোধিকুমার বলে। 'বাঃ চণকভদ্র আপনি তো অদ্ভুত! কাব্য রচনা করলে এভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করব ?'

'কী জানি !' চণক মৃদু হেসে বলে, 'কবিরা কখন কল্পলোকের কথা বলছেন, কখন এই মরলোকের কথা বলছেন, বোঝা তো না যাওয়াই সম্ভব !'

বোধিকুমার যেন একটু আহত, 'কেন, চণকভদ্র, আপনি গন্ধর্বলোক আছে এ কথা মানেন না ? স্বর্বেশ্যারা তাদের বাদনের সঙ্গে নাচে এ কথা শোনেননি !'

'শুনেছি মাঝে মাঝে, ভেবেছি কবি-কল্পনা।' চণক স্তব্ধ হয়ে যায়। তার মনে হয় সুনক্ষত্র এতই সিদ্ধবাদক যে, তার হাত থেকে উত্থিত শব্দগুলি, নানা জটিল ভঙ্গে-বিভঙ্গে বার হতে থাকে। শব্দপাত নয় তাই, শব্দনাচ। এই শব্দ-নৃত্য একটি ছন্দ ও সুরের নিরবচ্ছিন্ন পশ্চাৎপট নির্মাণ করে দেয়, শ্রীমতীর গান ও নাচ তারই সঙ্গে অতি নিপুণভাবে তাল মেলানো, সুর মেলানো। তাকে অতিরিক্ত কিছু করতে হয় না। সে ওই তালে তাল মিলিয়ে একটি দুটি চরণক্ষেপ করে। নূপুর বেজে ওঠে মৃদু গুঞ্জনে। একটি দুটি মুদ্রা, শব্দ মুদ্রাকে যেন রূপ দেয়। সুনক্ষত্রর মৃদঙ্গবাদনের এই গূঢ় রহস্যের কথা নিশ্চয় জানা আছে শ্রীমতীর। বোধিকুমার ছন্দ ও বাক্যের চর্চা করলেও তাঁর কাছে, যে কোনও কারণেই হোক, এ রহস্য ধরা পড়েনি।

বিম্বিসার বললেন, 'চণক, কী ভাবছ ?'

চণক বলল, 'সঙ্গীত এবং নৃত্য। এবং সুর এবং ছন্দ।'

বিম্বিসার স্থানকাল ভুলে অট্টহাস্য করে উঠলেন। বললেন 'যাক, আমার একটা মহাচিন্তা দূর হল।

'কী চিন্তা মহারাজ ?' চণক হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল।

'আমি ভাবতাম দেবরাতপুত্র দণ্ডনীতি, রাজকর্তব্য, সসাগরা বসুন্ধরার আরক্ষা, এ ছাড়া আর কোনও বিষয়েই আগ্রহী নয়। মনে মনে আলোচনা করতাম, কীভাবে এই সন্ন্যাসীসুলভ একমুখীনতা, এই বহু বিলম্বিত ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করা যায়। চণক, কে বলতে পারে হয়ত পরের জন্মে আর এমন সুগঠন, এমন নিব্যাধি দেহ, এমন সুসংস্কৃত মন, এমন উচ্চবংশে জন্ম, পৃথিবীকে ভোগ করবার এমন সব সুযোগ আর পাব কি না। হয়ত যে মগধে আজ রাজা হয়ে জন্মেছি, কাল সেই মগধেই পথদস্যু হয়ে জন্মালাম ! চণক, তখন হয়ত তুমি আমার মাতৃস্বসাপুত্র আর এক তস্কর। একই সঙ্গে রক্তকরবীর মালা পরে বধ্যভূমিতে যাচ্ছি।...' বলতে বলতে বিম্বিসার আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন।

চণক বলল, 'তা হলে বলুন, নিজেকে পাপী বলে চিনতে পেরেছেন মহারাজ, পাপী না হলে এমন জন্ম হবে কেন ?'

'আমি তো আর দেব তথাগতর মতো বর্ষাবাস করি না। কত কীটানুকীট প্রতিক্ষণে পদদলিত, অশ্বক্ষুরদলিত করছি, জল পান করছি না ছেঁকে, তাতেও চলে যাচ্ছে কত লক্ষ কীট এই উদরগহ্বরে, তারপরে দেখো, তুমিই উল্লেখ করলে কত শত অপরাধীর প্রাণদণ্ড দিচ্ছি। সেগুলিও তো আমাতেই বর্তাচ্ছে। সুতরাং পাপকে এড়ানোর কোনও উপায়ই আমি দেখতে পাচ্ছি না, বন্ধু। পরজন্ম সম্পর্কে কোনও নিশ্চয়তা নেই।' বিম্বিসার আবার হাসতে লাগলেন।

চণক মনে মনে আনন্দিত হল। মহারাজের মনের মধ্যে এতদিন বর্ষা থমথম করছিল। গর্জায় না, বর্ষায় না। খালি কালো কালো মেঘে আড়াল থাকে আকাশ-নীল, আটক থাকে বাতাসের স্বচ্ছন্দ সাবলীল বিচরণ।

সে প্রসন্ন মুখে বলল, 'মহারাজ, আমরা তো আজ অতিথিশালার দিকে যাচ্ছি না ! আপনার কি আরও কোথাও যাবার ইচ্ছে রয়েছে ?'

বিম্বিসার বললেন, 'বন্ধু, আমরা কি গো-জাতীয় ? যে সন্ধ্যা হলেই নিত্য একই গোষ্ঠে ফিরে যাবো ! তুমি যে পরিব্রজনে শীঘ্রই বেরোবে, তাতে তো পদে পদে অনিশ্চয়তা, অনামা বিপদ, আজকে সামান্য একটু বিপথে নিয়ে যাচ্ছি বলে উদ্বিগ্ন বোধ করছ কেন ? একটু উৎকণ্ঠা সহ্য করো, দেখাই যাক না পথের শেষে কী আছে !'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমশ জনবিরল হয়ে এলো পথ। একটি সুন্দর কাননের মধ্যে প্রবেশ করলেন দু'জনে। উদ্যানপাল এসে নমস্কার করে স্বাগত জানালো। অদূরে একটি সুরম্য হর্ম্য। সহসা দেখলে চিত্রশালা বলে মনে হয়। উচ্চ ভূমির ওপর কয়েকটি স্তম্ভ। তার ওপরে ছাদ। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ছাদের ওপরে সু-উচ্চ কতকগুলি ছত্র দেখা যাচ্ছে। প্রবেশদ্বারটিতে তক্ষণ করা সর্পমিথুন, মধ্যে মুরলীধারী নারী। সোপানগুলি পাথরের।

বিম্বিসার বললেন, 'চণক, আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আম্রকাননটি দিয়েছি আয়ুষ্মান জীবককে, অপূর্ব সুন্দর বেণুবন আরাম সহ দিয়েছি ভগবান বুদ্ধকে, এই জম্বুবন তোমার।'

'সে কী মহারাজ! আপনি তো জানেন...'

'সবই জানি বন্ধু, কিন্তু তুমি তো রাজগৃহে মাঝে মাঝেই ফিরবে? অতিথিশালায় তোমার বসবাস আমার মনঃপূত হয় না। তুমি জানবে রাজগৃহের এই জম্বুবনে তোমার নিজস্ব গৃহ। সেখানে উদ্যানে মগধের সবচেয়ে মিষ্ট জম্বুফলের গাছ আছে, কিন্তু সে দশ বারোটা। তা ছাড়া যা আছে তা শুধু কুসুম, এ এক কুসুমকুঞ্জ। বারাণসী বর্ধকীদের একটি দল গেল সাকেত-গহপতি, ধনঞ্জয়ের কন্যা বিশাখার বিবাহ উপলক্ষে বাড়ি করতে। আরেকটি দলকে এখানে এনে আমি তোমার জন্য এই গৃহ নির্মাণ করিয়েছি কাননের মধ্যে। তোমার অশ্বশালা, গোশালা, দাস-দাসী সবই আছে। চলো।'

রাজা স্পর্শ করতেই যেন জাদুবলে বন্ধ দুয়ার খুলে গেল, দুদিকে দুটি সুবেশ দাস। ওরা কি পূর্ব থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল! আসনশালায় ঢুকলেন দু'জনে, চারদিকে প্রাচীরের গায়ে মাঝেমাঝেই সুন্দর তক্ষিত মূর্তি, লতা, পদ্ম। সুবাসিত জল ও মালা নিয়ে এলো দাসীরা। রাজা খুললেন তাঁর করোটিকা শিরস্ত্রাণ। পাদুকাগুলি খুলে নিয়ে গেল দাসীরা। তার পরে বড় বড় পাত্র থেকে জল নিয়ে পা ধুইয়ে দিল, অতিশয় নরম মার্জনী বস্ত্র দিয়ে মুছিয়ে দিল পা। খুলে দিল রাজার বক্ষের লৌহজালক। চণকের উত্তরীয়। নতুন, সুরভিত উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে দিল দু'জনের। কপালে পরিয়ে দিল গোরোচনার তিলক। গলায় যূথীর মালা, মণিবন্ধেও জড়িয়ে দিল মালা। শরীর মন স্নিগ্ধ এখন। রাজা তাঁর ছদ্ম শ্মশ্রুগুম্ফের মধ্যে থেকে মৃদু মৃদু হাসছেন।

চণক বলল, 'মহারাজ, আপনার অতিথিশালায় যত্নের কোনও ত্রুটি তো হত না! এত বাহুল্য আপনি আমার জন্য কেন করলেন! আমি তো এখানে থেকে আপনার রাজধানীর খ্যাতিবৃদ্ধি করবো না জীবকভদ্রের মতো। ধর্মদেশনা শুনিয়ে আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়া বা অনাগামিমার্গে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই তথাগত বুদ্ধের মতো। আমি তো আর দু-এক দিনের মধ্যেই চলে যাবো। কবে আবার ফিরব, জানি না।'

বিম্বিসার ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি বলেছিলে, যেখানেই থাকো আমার জন্য বন্ধুত্ব তুমি হৃদয়ে বহন করবে, সে কথা কি এখন ভুলে গেছ চণক।'

'না মহারাজ।'

'তা হলে? বন্ধুর সান্নিধ্যে বন্ধুকে বারবার ফিরতেই হয়। যখন বহু দূরে, দেশে দেশান্তরে ভ্রমণ করে ফিরবে, নতুন মানুষ, নতুন জীবনচর্যা, নতুন বন্ধু দেখবে, চণক তখন রাজগৃহের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই জম্বুবন, এর কুসুমকুঞ্জ, এই গৃহ যার কোনও দ্বিতীয় এ নগরে নেই, এখানকার পরিচর্যা এ সব তোমার মনে পড়বে। তুমি ঘরে ফেরার তাড়া অনুভব করবে রক্তের মধ্যে। এ উপহার হলেও শুধুই উপহার নয় চণক, এ আমার স্বার্থ।'

চণক কথা বলল না। শুধু একবার তার এই রাজসখার দিকে তাকাল। বয়সের পার্থক্য অনেক, পার্থক্য অবস্থার এবং অবস্থানের, অভিজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতার, জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যও যে পুরোপুরি এক, এ কথাও বলা যায় না। এঁর রয়েছে সুযোগ্য সব পুত্র, উপায়কুশল মহামাত্রবর্গ, কত শত অনুগত পারিষদ, রয়েছেন রানিরা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই তাঁর মনোবৃত্ত্যনুসারিণী। সর্বোপরি রয়েছেন চন্দ্রাতপের মতো আশ্রয় বিস্তার করে তথাগত বুদ্ধ। তাঁর প্রদর্শিত পথে চলাই এঁর অভিপ্রায়। তা হলে? কাত্যায়ন চণক মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সুদূর তক্ষশিলা থেকে এসে এঁর জীবনের কোন্ শূন্যতাকে পূর্ণ করল, বা পূর্ণ করার আশ্বাস দিল যে চণকের জন্য এঁর আকূতি এত তীব্র! এত গভীর! রাজসুলভ কপটতা, দয়া-দাক্ষিণ্য তো এ নয়! চণকের ভেতর থেকে যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষীরতরুর মতো ক্ষীরস্রাব হচ্ছে। ভেতরে কেউ নতজানু হয়ে বসছে এই বন্ধুতার সামনে। কৃতাঞ্জলি। এই অনুভূতি চণক চেনে না।

ভেতরের খোলা দুয়ারপথে দুটি দাসী প্রবেশ করল। তাদের হাতে রৌপ্য ভৃঙ্গার, হাতে স্ফটিকের পানপাত্র, রৌপ্য থালিতে ভোজ্য। সেগুলি তারা একটি দারুফলকের ওপর রাখল। তারপর চলে গেল। চণকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মাটিতে। সে এখনও ভাবিত, আবিষ্ট। হঠাৎ মেঝের ওপর সে দেখতে পেলো দুটি মণিময় চরণপত্র ফুটে উঠছে, তাতে অলক্তকের চিত্র, শ্বেত দুকূলের ওপর মনঃশিলাবর্ণের লতাচিত্রকরা বসন চরণ দুটিকে জড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। রুপোর বিস্তৃত জালিকাময় কাঞ্চী, তার ওপর অনুপম এক দেহকাণ্ডের ঊর্ধ্বভাগ, রজতসূত্রী এক শ্বেত উত্তরীয় ঊর্ধ্বাঙ্গে, উত্তরীয়ের মধ্য থেকে মণিমাণিক্যের ঝিকিমিকি বোঝা যায়। মাথার স্বর্ণাভ কৃষ্ণকেশ, উঁচু করে তুলে কবরী বাঁধা। তাইতে পুষ্পমালা। কণ্ঠেও মালা দুলছে। অতি শুভ্র মুখ, পাতলা ঠোঁট দুটি রঞ্জিত, কান থেকে হীরকের দীর্ঘ কর্ণাভরণ দুলছে। বিশাল নীলাভ চোখ দুটিতে কি যেন এক দুর্ভেদ্য রহস্যময় ভাবের দ্যোতনা। জিতসোমা।

দু'জনকে নমস্কার করে জিতসোমা অদূরে পারসিক গালিচায় বসল।- মৃদুস্বরে বলল, 'মহারাজ পানীয় গ্রহণ করুন, আর্য চণক ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, দাসী জিতসোমার সেবা গ্রহণ করুন।'

যন্ত্রচালিতের মতো মাংসখণ্ড মুখে তুলল চণক। ভৃঙ্গার থেকে সুরা ঢেলে দিল জিতসোমা। মৎস্য, মিষ্টান্ন, ফল, আরও সুরা ঢেলে দিচ্ছে জিতসোমা।

'মহারাজ আরেকটু নিন, বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়েছে এই মৃগমাংস। নিন চণকভদ্র।' আরও সুরা পরিবেশন করছে জিতসোমা।

চণক বলল, 'না'।

চোখে প্রশ্ন, দু'জনেরই। চণক বলল, 'আর না।'

মহারাজ পাত্র নিঃশেষ করে এনেছিলেন। বললেন, 'আমারও আজ এইখানেই ইতি।'

দাসীর হাতে সব পাত্র তুলে দিয়ে চলে গেল জিতসোমা।

বিম্বিসার বললেন, 'চললাম সখা। তুমি তোমার নিজের গৃহে বিশ্রাম করো। আবার দেখা হবে। ঘোড়ায় চড়তে চড়তে মৃদুস্বরে বললেন, 'এই নারীরত্ন রাজোচ্ছিষ্ট মনে করো না যেন চণক।' রাজার কশাঘাতে শ্বেত অশ্বটি মুহূর্তে উদ্যানপথে রাজমার্গে প্রবেশ করল, তার পর অনেক দূর চলে গেল।

AMARBOI.COM

১৯

সাকেতের সীমানায় তিষ্য ও মন্দ্রার ভোর হল। রাত্রে যখন শেষ যামের ভেরী ঘোষণা হচ্ছে তখন অতি গোপনে গৃহত্যাগ করে তিষ্য। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর বাড়ি বিবাহোৎসব আরম্ভ হবার বহু পূর্বেই চলে আসবার ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু পারেনি। পিতা একটার পর একটা কাজে তাকে নিযুক্ত করছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে সংবর্ধনা করবার দায়িত্বও পিতা তারই ওপর দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, কোশলরাজও তক্ষশিলার স্নাতক, তিষ্যও তাই। উপরন্তু তিষ্য এখন বেশ কিছুদিন শ্রাবস্তীতে কোশল সেনাপতি বন্ধুলের অন্তেবাসী। সুতরাং সে-ই উপযুক্ততম ব্যক্তি মহারাজকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য। গহপতি ধনঞ্জয়ও তাকে ডেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। তার দায়িত্ব পালন করেছে তিষ্য। তার পিতার বিশেষ ইচ্ছা ছিল এই সুযোগে সে মহারাজের আরও নিকটস্থ হয়, পরিচয় গভীর হয়, তাতে পরে কোশলসেনাতে উচ্চপদ পাওয়া এবং রাজার সু-দৃষ্টিতে থেকে ক্রমশই উন্নতি করার পথ খুলে যাবে। কোশলরাজ তাকে ভালোই চিনেছেন। এবং সম্ভবত এর পর শ্রাবস্তীতে গেলে তার সমৃদ্ধি কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু তিষ্য শ্রাবস্তী যেতে চায় না। সে কোশল-সেনাতে উচ্চপদ চায় না। তার শস্ত্রাচার্য বন্ধুল মল্লর ওপর তার একটা আন্তরিক টান আছে। আচার্য তাকে ভালোবাসেন, উৎসাহ দেন। কিন্তু আপাতত সেই টান সে প্রাণপণে উপেক্ষা করার চেষ্টা করছে। এইভাবে গৃহত্যাগ করা ছাড়া তার অন্য উপায় ছিল না। সাকেতের নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃত হট্টরোল, উৎসবের বাতাবরণ, প্রতিটি হর্ম্য এবং মার্গ দীপ দিয়ে সাজানোর আধিক্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীদের সাজ-সজ্জার উল্লাস, পুরুষদের গর্দভের মতো স্বরে বাদ্‌বিতণ্ডা, পথে পথে সৈন্যদের ভ্রমণ এবং অশ্লীল উচ্চহাসি, সাপের খেলা, বানর খেলা, লঙ্ঘকদের 'দেখে যান, দেখে যান, এমনটি আর দেখবেন না,' মণ্ডপে নর্তকীদের নাচ, আর সর্বোপরি ইতর, আর্য, গ্রামবাসী, নাগরিক সবাইকার, কুৎসিত ভোজনলোলুপতা। অসহ্য। অসহ্য।

'ভো ব্যবস্থাপক, আজ সৈন্য শিবিরে খাদ্যতালিকা কী ? ময়ূরের মাংস আজও হচ্ছে তো ? মাধ্বীর ব্যাপারে একটু যেন কৃপণতা করেছিলে, যাই বলো !'

'আহা, কী খেলাম রে মধু, কী খেলাম, এমন শূলপক্ব শূকরমাংস কোনদিন খাইনি। আমরাও তো মাঝে মাঝে বুনো বরা নিষাদদের থেকে কিনে ঝলসে খাই, তার তো কই এমন সোয়াদ হয় না !'

'এ শূকর, কত প্রকার ভালো ভালো ভোজ্য খেয়ে মানুষ হয়েছে, তা জানিস ?'

'মানুষ ! মানুষ হয়েছে ! হাঃ, হাঃ, তবে এক প্রকার নরমাংসই খেলাম বল, আহা মুখে দিতেই, নবনীতে ভেজানো তূলের টুকরোর মতো জিভ দিয়ে পিছলে চলে গেল। কণ্ঠ থেকে আবার তাকে দাঁতের তলায় আনি। কী গন্ধ। কী বর্ণ ! কী বা স্বাদ !'

মানুষ যে এত খেতে পারে ! নিত্য ! এবং প্রতিদিন আরও আরও আশা করতে পারে এভাবে, নিজে না দেখলে, নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করত না তিষ্য। ধিক। ধিক। শত ধিক এদের। তার যেন এই অবিরাম ভোগের গন্ধে বিবমিষা আসছে।

একবার পেছন ফিরে তাকাল তিষ্য। শেষ রাতের তরলিত অন্ধকারে নগরীর দীপালোক হারিয়ে গেছে। ফুটে উঠছে একটি দুটি প্রাসাদের চূড়া। কে জানে কতকাল আর সাকেতে ফেরা হবে না ! কাউকে না জানিয়ে এভাবে আসা হয়ত ঠিক হল না। গৃহের সবাই উৎকণ্ঠিত হবে। হয়ত একটি পত্র লিখে এলে সে ভালো করত। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আর এখন কোনও ঠিকানা থাকবে না। কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যও কি থাকবে ?

আবার ছুটে চলল তিষ্য। মন্দ্রা বারবার কেন যেন তীব্র ডাক ডেকে উঠে পেছন ফেরবার চেষ্টা করছে। সে কি বুঝতে পেরেছে, তিষ্য নিরুদ্দেশের যাত্রী ! কিন্তু সে তো পশু ! তার আবার ঘর কী ! কোথায় কোন কম্বোজবাসীর জালে ধরা পড়েছিল তার পিতা-মাতা, তারপর অশ্ববণিকের মন্দুরায় প্রতিপালিত হয়েছে। গৃহপোষ্য হয়ে আরণ্যক জীবেরও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেমন চলে যায় দেখো ! সহসা তিষ্যর মনে হল, সে কিন্তু মুক্ত। তার কোনও আকর্ষণ নেই। না গৃহের প্রতি, না আত্মজনের প্রতি, না তার মাতৃভূমি ওই নগরীর প্রতি ! কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের বন্ধনও যেন তার নেই। যা জালিকা হতে পারত, সেই প্রণয়ের এক আঘাতে নির্মূল হয়ে গেছে তার সমস্ত কেতুকাম্যতার, উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকড়। মুক্তপুরুষ বলতে সত্যই যদি কেউ থাকে তো সে তিষ্য। রাজকুমার নয়, সাকেতক নয়, তক্ষশিলক নয়, শুধু একজন পরিচয়হীন, লক্ষ্য সম্বন্ধে উদাসীন মানব, তিষ্য।

দুপুরের কাছাকাছি সময়ে কাশীরাজ্যে প্রবেশ করল তিষ্য। একটি গ্রাম অদূরে রয়েছে মনে হচ্ছে। গ্রামপ্রান্তে চারণভূমি দেখে ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল সে। একটি ছোট্ট জলাশয় রয়েছে। অসমান তার ধারগুলি। লোক, বিশেষত গরু চলাচলের জন্য স্বাভাবিকভাবেই সোপান হয়ে গেছে। অসমান, তবু নামা যায়। অঞ্জলি ভরে জল পান করে, উত্তরীয়ের প্রান্ত ভিজিয়ে সমস্ত শরীর জলসিক্ত করে নিল সে। ছায়াবৃক্ষ বলতে বিশেষ কিছু নেই। গো-পালক বালকগুলি কোথায় বসে ? রক্তপত্র বিশিষ্ট একটি ঝোপ রয়েছে। তার পাশে সামান্য ছায়া। তিষ্য সেখানে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। কদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি। গতকাল তো বিনিদ্রই গেছে। এতটা সময় ঘোড়ার পিঠে প্রায় না থেমে চলে আসা। সব মিলিয়ে চোখ বুজে এলো। বসে বসে ঘুমোতে ঘুমোতে কখন যে সে শুয়েও পড়েছে তিষ্য জানে না।

যখন জেগে উঠল তীব্র ক্ষুধা। উদরে যেন আগুন জ্বলছে। মাথার ওপরে সূর্যের তাপও অনুরূপ। অগ্নিবৎ। সে উঠে বসে চারদিকে তাকাল। গভীর ক্লান্তির পর ঘুমিয়ে উঠলে যেমন হয়, সে সহসা কিছুই চিনতে পারল না। মুক্ত আকাশের তলায় সে শুয়ে আছে কেন ? চারদিকে ঘাসে-ছাওয়া ভূমি ! কী ব্যাপার ? কোথায় ? তারপর সব মনে পড়ে গেল। মন্দ্রা ! মন্দ্রা কোথায় ! সে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। দিগন্ত পর্যন্ত অনায়াসে দৃষ্টি চলে যায়। দু-চারটি মাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরু চরছে। কোনও গোপালক কোথাও চোখে পড়ল না। এবং মন্দ্রা নেই।

মন্দ্রা ! মন্দ্রা ! ডাক ছেড়ে হেঁকে উঠল তিষ্য। জলাশয়টির কাছে গেল, নেই। চরে বেড়াচ্ছিল মন্দ্রা। প্রথমে প্রাণ ভরে জল পান করে, তারপরে চরে বেড়াচ্ছিল। চারণক্ষেত্রটি ঘাসে একেবারে উপচে পড়ছে। তার মধ্যে মন্দ্রার ক্ষুরের চিহ্ন কিছুটা অবধি অনুসরণ করতে পারল সে, তারপর আরও অনেক যষ্টি বা ওই জাতীয় চিহ্নের সঙ্গে সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। মানুষের পায়ের চিহ্নর মতো কিছুও সে খুঁজে পেল। কিন্তু ভূমিটি মধ্যভাগে বৃষ্টি পড়ে পড়ে কেমন আর্দ্র হয়ে রয়েছে। সেখান থেকে আর বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুধু তার পা দুটিই কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। মন্দ্রা তাহলে চুরি গেছে ! বাঃ, কোশলরাজ বাঃ, তুমি মাত্র আঠার কি বিশ ক্রোশ দূরে বসে মৈরেয়র পাত্র হাতে হা হা করে হেসে উঠছ, কোনও চাটুকারের অশ্লীল কৌতুকে সুবর্তুল মুখে অত হাসিতেও বিশেষ কুঞ্চন পড়ছে না ! এদিকে ফটফটে দিনের বেলায় একজন কুলপুত্রের আজানেয় ঘোড়া চুরি যাচ্ছে ! চমৎকার ! অতি চমৎকার ! আর হবে নাই বা কেন ! এই রাজাটি তো সবসময়েই বিলাসে-ব্যসনে-বয়স্যে-বনিতায় মত্ত থাকেন। মাঝে মাঝেই নানান স্থান থেকে সংবাদ আসে গ্রামকে গ্রাম লুঠ করে নিয়ে গেছে দস্যুরা। কিংবা বিদেশি সার্থের সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে পথে। বন্ধুলভদ্র স্থূল চর্মের বর্ম পরতে পরতে বলেন, 'চলো হে তিষ্য, গোটাকতক দস্যু মেরে আসি। এ জন্মে তো আর সত্যিকার যুদ্ধের সাধ পূর্ণ হবার নয় ! চোর আর দস্যু মেরে মেরে হাতে দুর্গন্ধ হয়ে গেল।'

মল্লদের গৌরবরবি অস্ত গেছে। কুশিনারা আর পাবায় কয়েকটি মল্লকুল নিজেদের দুর্গে জ্ঞাতিবর্গ নিয়ে থাকেন। মল্লদের সৌভাগ্যসূর্য আর উদিত হবে না বুঝে বন্ধুল বেরিয়ে পড়েছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। বলতেন 'কোলিয়রা কোশলের পদানত হল, পদানত হল শাক্যরা, কালামরা। লিচ্ছবিরাই এখনও পর্যন্ত তাদের সার্বভৌমত্ব ঠিকঠাক টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। মল্লদের সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। বুঝলে তিষ্য ! তাই যখন পারলাম না, কূপের মধ্যে পড়ে থাকব কেন, নিজেও এলাম, ভ্রাতুষ্পুত্র চারায়ণকেও নিয়ে এলাম। অর্থ, মান, যশ কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু এই কি বীরপুরুষের জীবন ! কতকাল হয়ে গেল সামান্য কটা প্রত্যন্ত বিদ্রোহ দমন ছাড়া যুদ্ধের সুযোগই পেলাম না। শুধু দস্যু-তস্করের ওপরেই পরীক্ষা করার জন্য কি শস্ত্র-বিদ্যা শিখেছিলাম।'

'মন্দ্রা ! মন্দ্রা !' ডাকতে ডাকতে গোচারণের সীমানায় এসে পৌঁছল তিষ্য, ক্ষুধাতৃষ্ণায় তখন তার শরীর অবসন্ন, উপরন্তু মন্দ্রা চুরি যাওয়ায় ক্রোধে সর্ব শরীর জ্বলছে। লোকালয়ের মধ্যে আসতে আসতে সূর্য একেবারে মাথার ওপরে চলে গেল। একটি কূপ না ? কয়েকটি রমণী না তার পাশে ? তিষ্য একরকম ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

'তোমরা কেউ একটি ঘোড়াকে এদিকে আসতে দেখেছ ?'

'একটি কালো ঘোড়া তো ?' একজন বলল। 'ঘোড়া না অশ্বতর ?' আর একটি রমণী বলল।

ক্রুদ্ধ তিষ্য বলল, 'কালো-টালো নয়, সর্বশ্বেত, খদির বর্ণের কয়েকটি সুন্দর দাগ আছে, চিত্রাশ্ব !'

'এমন কোনও ঘোড়া তো আমরা দেখিনি অজ্জ ?' একটি বর্ষিয়সী মহিলা বলল।

'এখানে কিছু খাদ্য কিনতে পাওয়া যাবে ?'

কথা শুনে রমণীগুলি হেসে আকুল হয়ে গেল। একজন বলল, 'শুধু শুধু হেসে কুলপুত্তটিকে পীড়া দিচ্ছিস কেন ? ক্রোধে কেমন কন্নমূল পজ্জন্ত রাঙা হয়ে গেছে দেখছিস না ?'

তখন আর একজন বলল, 'দলিদ্দ গাম। হাট নেই, বিপণি-আপণি কিছুই তো নেই গো অজ্জমশায়, খজ্জ কিনবে কোথা থেকে ?'

তিষ্য বলল, 'তোমাদের কূপে জল আছে তো ? না কি কূপও দলিদ্দ ?'

'দলিদ্দ কুয়ো, দলিদ্দ কুয়ো' বলে মেয়েগুলি আবার হাসতে লাগল। তখন আগেকার সেই বর্ষিয়সী রমণী বলল 'কুয়োয় জল আছে অজ্জ, কিন্তু আমরা বেণ-দের ঘরের ইত্থি, খাবে কি না বুঝে দ্যাখো।'

তিষ্য বিরক্ত হয়ে বলল, 'একটু সরে যাও, সরো তোমরা।'

মেয়েগুলি সরে বসল, কেউ দাঁড়িয়ে উঠল। কেউ একটু দূরে চলে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াল।

ডোঙায় করে জল তুলে পান করতে গিয়ে তিষ্য যত না খেল, তার চেয়ে বেশি ভিজে গেল। মেয়েগুলি আশে-পাশে, অদূরে, দাঁড়িয়ে বসে খিলখিল করে হাসছে।

'কিছু শুষ্ক খাদ্য অন্তত আমার চাই-ই, মূল্য দেবো।' তাদের হাসাহাসি গায়ে না মেখে তিষ্য বলল।

বর্ষিয়সী রমণী বলল, 'বললুমই তো হট্ট-ঘট্ট কিছু নেই এ গামে, আমার গেহে যাও তো কিছু খজ্জের চেষ্টা দেখতে পারি।'

'চলো, যাচ্ছি।' তিষ্য বলল অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে।

বর্ষিয়সী সঙ্গে সঙ্গে এক কলস জল নিয়ে চলতে আরম্ভ করলো, বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।' রমণীগুলি অধিকাংশ কালো, কেউ বা অল্প, কেউ অধিক। তিষ্যর মনে হল, এরা অ-সভ্যও। কিন্তু সে এখন এর পেছন পেছন যাওয়া ছাড়া কি-ই বা আর করতে পারে।

খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট একটি কুটির। আরও কয়েকটি দেখা যাচ্ছে দূরে দূরে। খোঁটার সঙ্গে একটি ছাগলী বাঁধা। পরিষ্কার প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকে তিষ্য দেখল অজস্র বেতের ঝুড়ি, একটার পর একটা বসিয়ে চুড়ো করা রয়েছে। সে বলল, 'তোমরা কি এইগুলি প্রস্তুত করো!'

'হ্যাঁ অজ্জ, কাছেই নদী। প্রচুর বেত জন্মায়। আমাদের পুরুষরা কেটে নিয়ে আসে। আমরা সবাই মিলে বানাই।'

'বিক্রি করো কোথায়? হাটে?'

'হা কপাল অজ্জ, হাট কোথায় পাবো? যোজনের পর যোজন গেলে তবে হাট পড়ে। কাঁধে পিঠে করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা পোষায় না। একটিও গো-যান নেই আমাদের গামে। মাঝে মাঝে তিন গাম পেরিয়ে গো-যান নিয়ে আসা হয়, তাতে সবার সব ঝুড়ি-ঝোড়া তুলে নিয়ে অনেক দূরের হাটে যাওয়া হয়। তবে মাঝেমাঝেই আসে বণিকরা, তারাই গো-যান নিয়ে আসে। কিনে নিয়ে যায়। আমরা তাদের থেকে চাল চিনি, যব কিনি, তেল কিনি।'

'কেন? তোমাদের গ্রামে জমি জায়গা তো প্রচুর? কর্ষণ করো না?'

কস্সনের কাজ তো আমরা জানি না অজ্জ! এই কুটিরের সঙ্গেই যে ভূমি রয়েছে সেখানে কিছু ফল কিছু শাক জন্মায়, বীজ পড়ে আপনি জন্মায়, তাই খাই। নদী থেকে মচ্ছ আনি মাঝে মাঝে। এই ছাগল আছে কটা। গরু তো সবার নেই। অনেক মূল্ল বাপু, কে দেবে?'

রমণীটি মাটির পাত্রে শুকনো চিঁড়ে, দুটি শুকনো কলা আর এক ডেলা গুড় নিয়ে এলো। প্রাঙ্গণের এক দিকে মাটির উঁচু বেদীর ওপরেই বসেছিল তিষ্য। খাদ্যগুলি দেখে তার উৎসাহ নিবে গেল। রমণীর হাতে মাটির পাত্র। সে বলল, 'একটু দুধ দুয়ে এনে দিচ্ছি, তুমি দুধে ভিজিয়ে চিঁড়াগুলো খেয়ে ফেলো।'

চারিদিকে চেয়ে তিষ্য দেখলো, এদের কুটিরে চিঁড়ে কোটা, ধান কোটা ইত্যাদির কোনও ব্যবস্থাই নেই। অর্থাৎ এই চিঁড়েও এদের ঝুড়ির বদলে সংগ্রহ করতে হয়।

ছাগলের দুধে তার গন্ধ লাগে। তবু সদ্য-দোয়া একঘটি দুধ দিয়ে সে খাদ্যগুলি কোন প্রকারে খেয়ে ফেলল। তারপর প্রাঙ্গণের এক পাশে হাতমুখ ধুয়ে এসে, রমণীটি আশেপাশে নেই দেখে, তার পাঁচ তলিকা পাদুকার প্রথমতল খুলে সেখান থেকে পাঁচটি রুপোর কাহন বার করল, রমণী এলে তাকে দিয়ে বলল, 'নাও, তোমার খজ্জের মূল্য।'

'না না, তুমি অতিথ্। মূল্য দিতে হবে না।' রমণীটি পিছিয়ে গেল, তারপর তার হাতে চকচকে রুপোর মুদ্রাগুলি দেখে, একই সঙ্গে লুব্ধ ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কি এমন অনেক আছে?'

'তোমার তাতে প্রয়োজন কী?' তিষ্য তার কটিবন্ধ ভালো করে আঁটতে আঁটতে বলল।

'তুমি কি বণিক?'

'তাতেই বা তোমার প্রয়োজন কী?'

'বলো না, তুমি কি রাজভট?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যদি বলি হ্যাঁ !'

'শোনো অজ্জকুমার, তোমার ঘোড়াটি আমাদের গ্রামেরই দু'-তিনজন পুরুষ চুরি করে নিয়ে বারাণসীর দিকে গেছে, যেখানে প্রথম ক্রেতা পাবে, বেচে দেবে। তুমি যদি সময়মতো গিয়ে উপস্থিত হতে পার, উদ্‌ধার করতে পারবে।'

তিষ্য বলল, 'এতক্ষণ এ কথা বলোনি কেন ? আরও আগে গেলে ধরে ফেলতে পারতাম তাদের। এই জন্যেই বলে অনার্য ! একেই বলে হীন জাতি।'

রমণীর কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল, সে হঠাৎ তেড়ে উঠে বলল, 'তবে দূর হয়ে যা অজ্জ আমার আঙন থেকে। তেষ্টা দেখে জল দিলুম, খিদে দেখে নিজের অন্নভাগ দিলুম, বলে কিনা অনজ্জ ! হীন জাতি ! ভালো করবো তোদের চিত্ত-ঘোড়া চুরি করব, অনেক মুল্ল পাওয়া যাবে সৈন্ধব ঘোড়াটার, যদি বুদ্ধি করে দুটো চারটে গরু কিনে আনে এরা, তো বেশ হয় !' সে কুটিরের দরজা শব্দ করে বন্ধ করে দিল।

সূর্য এখন সামান্য পশ্চিমে হেলেছে। দিক-নির্ণয় করে সোজা পুব দিকে হাঁটা দিল তিষ্য। যত দ্রুত পারে। মন্দ্রাকে তার খুঁজে বার করতেই হবে।

সন্ধ্যার পূর্বে সে যেখানে পৌঁছলো মনে হল একটি নিগম গ্রাম। কুটির রয়েছে যথেষ্ট। কিছু লোক চলাচল করছে। সে তাদের জিজ্ঞাসা করে করে হাটে পৌঁছলো। যাকেই পায় জিজ্ঞাসা করে, একটি শ্বেতের ওপর খদির বর্ণ চিত্রাশ্ব কেউ বিক্রি করতে এনেছিল ? কিছু জানো ? কেউ কিছু বলতে পারল না। হতাশ হয়ে সে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'অতিথিশালা আছে এখানে ?'

তার আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে লোকটি বলল, 'বড় গাম। কত বণিকের চলাচল, থাকবে না কেন ? তবে আপনি কি সেখানে থাকতে পারবেন ? বড় ঘরের পুত্ত মনে হয় !'

তিষ্য বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোনদিকে অতিথিশালাটা সেটাই বলো না কেন, বড় ঘরের পুত্ত কি কী ঘরের পুত্ত তাতে তোমার প্রয়োজন কী ?'

তার ভ্রূকুটির দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ভয় পেয়ে লোকটি অতিথিশালার দিকটি দেখিয়ে দিল।

কিন্তু লোকটি যে ঠিকই বলেছিল, সেটা অতিথিশালার প্রাঙ্গণে পা দেওয়া মাত্র সে বুঝতে পারল। চালগুলোতে ফুটো। মাটির দেয়ালে চিড় ধরেছে। কারা থেকে গেছে ঘরটিতে কে জানে, বড় নোংরা। সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। অতিথিশালার রক্ষী বলে কেউ নেই। খোলা সব পড়ে আছে। ঘরের বাইরে উঁচু অঙ্গনের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে রইল তিষ্য। মন্দ্রা অত্যন্ত প্রভুভক্ত অশ্বী। কিন্তু সে অতিশয় সুশীলাও। কোনও আরোহীকেই সে ফেলে দেয় না চট করে। মানুষের মধ্যে যেমন মূঢ়ও আছে, চতুরও আছে, পশুদের মধ্যেও তেমনি আছে। মন্দ্রা মূঢ়ের দলে পড়ে। কিন্তু মানুষের যা নেই পশুর সেই সহজাত বোধ আছে। মন্দ্রা যখন বুঝতে পারবে ওই লোকগুলি তার প্রভুর অনুমতি না নিয়েই তাকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে, তখন ! তখন সে কী করবে ! তবে তখন হয়ত অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়ে থাকবে। তার পায়ে বাঁধন, মুখে শক্ত রজ্জুর গ্রন্থি। এতক্ষণ মন্দ্রা থাকলে সে কতদূর এগিয়ে যেতে পারত ! এতটা পথ এক রকম দৌড়ে এসে সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করছে। দুপুরে খাওয়াও তেমন হয়নি। এখন, সাকেতে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর স্থাপিত অস্থায়ী মহানসগুলির থেকে নিষ্ক্রান্ত সুখাদ্যের গন্ধ যেন তার নাকে প্রবেশ করতে লাগল। আর বমি আসছে না। এখন ওই শূকরমাংস কি ময়ূরমাংস পেলে সে গোগ্রাসে খেয়ে নিত। তিষ্যর মনে হল, পৃথিবীতে কোথাও সমতা নেই। কোথাও খাদ্য উপচে পড়ছে, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। কোথাও কিছু নেই। কোথাও সারা রাত ধরে দীপ জ্বলে আছে, কোথাও রাত্রি নিষ্প্রদীপ, কোথাও বহুজনের হট্টরোল, কোথাও আবার একটি রক্ষী কি একটি দাস কি একটি গ্রামবাসীর পর্যন্ত দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, যার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় এই আপৎকালে। এমন তো নয় যে সে ভ্রমণ করেনি ! সাকেত থেকে শ্রাবস্তী হয়ে মধুরা, উদুম্বর, ভদ্রঙ্কর হয়ে তক্ষশিলা পর্যন্ত দীর্ঘ পথে সে কত যাতায়াত করেছে। তারপরে সাকেত থেকে শ্রাবস্তী প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। এমন বিপদে সে কখনও পড়েনি। সে উঠে পড়ল। এই গ্রাম সন্ধ্যার আগেই ত্যাগ করে যেতে হবে। এখানে কোনও সাহায্য পাবার আশা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাম প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে, এমন সময় তিষ্য দেখল বিপরীত দিক থেকে এক প্রব্রাজক আসছেন। হনহন করে এগিয়ে আসছেন। আর একটু কাছাকাছি হতে সে বুঝল ইনি প্রব্রাজক নন, প্রব্রাজিকা। মাথায় কুণ্ডলীকৃত কৃষ্ণ কেশ, নতুন গজিয়েছে বলে মনে হয়। হাতে একটি দণ্ড। হাত তুলে তিষ্যকে থামতে ইঙ্গিত করলেন প্রব্রাজিকা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়ল তিষ্য।

প্রব্রাজিকা রীতিমতো বলিষ্ঠ। মুখের ভাবও খুব দৃপ্ত। ক্লান্তির কোন চিহ্নই চোখেমুখে নেই। প্রব্রাজিকা বললেন, 'সাকেত আর কত দূর হবে যুবক?'

'পঁচিশ ছাব্বিশ যোজন হবে।'

'পেছনে যে গ্রামগুলি ফেলে এসেছ, সেখানে রাত্রে বাস করার উপযুক্ত অতিথিশালা আছে?'

'আছে, তবে তাতে রক্ষী নেই, অর্গল নেই।'

'ও, তবে তো ঠিকই শুনেছি।'

'কী শুনেছেন, আর্যে?'

'তুমি কোথা থেকে আসছো আয়ুষ্মান?'

'সাকেত,' সংক্ষেপে বলল তিষ্য।

'গন্তব্য?'

'জানি না।'

তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন প্রব্রাজিকা। বললেন, 'উদ্‌ভ্রান্ত কেন? কিছু অশুভ ঘটেছে?'

'আপনার তাতে প্রয়োজন কী?' তিষ্য বিরক্ত হয়ে বলল।

এই সংসারত্যাগী শ্রমণ-শ্রমণাদের দেখলেই ভক্তিতে নত হয়ে পড়বার নিয়ম। তিষ্য এঁদের দেখতে পারে না। প্রকাশ করে না অন্য সময়ে। কিন্তু আজ হা-ক্লান্ত, হতাশ, উদ্বিগ্ন। আজ সে তার ব্যবহার ঠিক রাখতে পারল না। সে এগিয়ে যাচ্ছিল, যষ্টির অগ্রভাগ দিয়ে তার পথ রোধ করলেন প্রব্রাজিকা। বললেন, 'কিসের এত অহংকার যুবক? রূপের? কুলের? বিত্তের? না শিক্ষার? জানো, যে কোনও মুহূর্তে আমার হাতের এই দণ্ডের মতো কালদণ্ড অশনিসম্পাতে ওই উদ্ধত মস্তক বিদীর্ণ করতে পারে? জানো তোমার আত্মাটি তোমার এই সুছন্দ দেহ থেকে বেরোবার পর অনুভব করবে চুরাশি লক্ষতম জন্মটিও তোমার বৃথাই গেল। কিছুই শেখোনি। অষ্টাদশ বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য তক্ষশিলায় গিয়েছিলে? জন্মের কারণ জানো! মৃত্যু কেন হয়? হতাশা কিসের? প্রণয় মায়া। ফল বিরাগ, কুলশীল ত্যাগ করে পথে পথে ঘোরা— এই মাত্র।'

তিষ্য অপরিসীম বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রব্রাজিকা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'যাও।'

তিষ্য ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি কে আর্যে! আপনি কি স-ব জানেন?'

'সব জানি না। যেমন জানি না, কী তোমার নাম, গোত্র? জানতে চাইও না। অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ বস্তু সব। মনে হল বিপন্ন, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। প্রব্রাজিকার কোনও কৌতূহল নেই।'

তিষ্য বুঝতে পারল, ইনি সব জানেন। এমন কি প্রব্রাজক, বিশেষত প্রব্রাজিকাদের পুরুষের মতো বেশ-বাস, নারীত্ব অস্বীকার করে কুশ্রী সাজবার চেষ্টার জন্য সে যে তাঁদের দ্বিগুণ অরুচির চোখে দেখে, সে কথাও এঁর অজ্ঞাত নেই।

সে সসম্ভ্রমে বলল, 'আমার প্রিয় অশ্বীটি ওই দিকের একটি গ্রামে চুরি গেছে।'

'যাবেই তো। সামান্য অসতর্কতার ফলে জীবন চলে যায়, তায় অশ্ব। ওই গ্রামগুলি সব চৌরগ্রাম।'

'আপনি জানেন?'

'জানি।'

'তবে, এখন বেলা পড়ে আসছে, ওদিকে যাবেন?'

'ভয় কাকে বলে জানি না যুবক, রাজগৃহের এক পর্বতশিখরে রেখে এসেছি আমার ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ, বাসনা। ফিরে যাও ওই চৌরগ্রামে, একটি যেমন-তেমন অশ্ব কিনে নাও। তারপর দ্রুত বারাণসী চলে যাও, অশ্বচোররা ভালো মূল্য পাবে বলে তোমার অশ্বীটিকে নিয়ে সেখানেই যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশুর হাটে গিয়ে নিজের অশ্বটিকে যদি দেখতে পাও, দাবি করবে। নাম ধরে ডাকবে। অশ্বটি সাড়া দেবে। তাহলেই অশ্বটি তোমার, প্রমাণ হয়ে যাবে। বোহারিকের কাছে বিচার প্রার্থনা করবে। কোনও চোর, কোনও দস্যুকে কখনও শুধু শুধু ছেড়ে দেবে না।'

তিষ্য প্রব্রাজিকার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চলল। অতিথিশালার কাছে গিয়ে প্রব্রাজিকা হাঁক দিয়ে বলে উঠলেন, 'ভো গ্রামবাসী, কে কোথায় আছো।'

নিমেষের মধ্যেই অতিথিশালার পেছন থেকে দুটি লোক বেরিয়ে এলো। তাদের হাত জোড় করা। মুখে বিনয়।

'এই কক্ষে আজ রাতে আমি থাকব। আমাকে একটি সম্মার্জনী এনে দাও।'

লোক দুটি তাড়াতাড়ি বলল, 'না মাতা, আমরাই সব পরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথিশালার ঘর পরিষ্কার করে, কোথা থেকে নলপট্টিকা এনে সেখানে বিছিয়ে দিল লোকটি। কলস ভর্তি পানীয় জল নিয়ে এলো। কয়েকজন কিছুক্ষণ পরেই মাটির পাত্রে ফলমূল এবং এক ঘটি দুধ এনে হাত জোড় করে দাঁড়াল। প্রব্রাজিকা বললেন, 'এগুলি খেয়ে নাও যুবক।'

'আপনি খাবেন না ?'

'আমি শীতল জল পান করব। সূর্যাস্তের পর আর না খেলেও চলে।'

'এতটা পথ হেঁটে এসেছেন, কিছুই খাবেন না।'

দেখা গেল লোকগুলি আরও এক ঘটি দুধ এনে রেখেছে।

'পান করুন মা, দয়া করুন।'

দীপ্ত চোখে তাদের দিকে তাকালেন প্রব্রাজিকা। বললেন, 'এই যুবককে এখুনি বারাণসী যেতে হবে, একে একটি অশ্ব দিতে পারো ? এ মূল্য দেবে।'

'অশ্ব তো সারা গ্রামে একটিও নেই মা।'

'তাই নাকি ? আমি তো ভেবেছিলাম এ গ্রামে শুধু অশ্ব পালনই করা হয়। চমৎকার সব আজানেয় চিত্রাশ্ব ? হয় না ?'

লোকগুলির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিষ্য নিশ্বাস রুদ্ধ করে রয়েছে।

একটি লোক প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, 'আমরা কিছু করিনি মা, ভিন গামের লোক, আমাদের কিছু বলতে নিষেধ করে ঘোড়াটি নিয়ে ছুটে চলে গেল।'

'অশ্বের মূল্য থেকে কিছু ভাগ দেওয়ার কথাও তো বলে গেছে ?'

এবার একেবারে কেঁদে ফেলল লোকটি। বাকি লোকগুলিরও একই দশা।

'কী ? বলে গেছে তো ?

'হ্যাঁ মা।'

'চোর নোস তোরা ? চোরের অন্ন-পান আমি গ্রহণ করি না।'

'আমরা চেষ্টা করছি মা। আপনি তৃষ্ণার্ত। দুধটুকু খান।'

'আচ্ছা যা, দেখ্।'

লোকগুলি শশব্যস্তে চলে গেল। তিষ্য বলল, 'আর্যে আমি খাচ্ছি, আমার ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন লাগছে।'

'খাও, খেতেই তো বললাম যুবক।'

'আপনি ?'

বস্ত্রের মধ্য থেকে একটি সুকুমার হাত বেরিয়ে এলো। ঘটিটি এক হাতে ধরে প্রব্রাজিকা অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগলেন দুধে। তিষ্য এতক্ষণে অবাক হয়ে দেখল ইনি একজন অল্পবয়সী যুবতী। মুণ্ডিত মস্তকে হ্রস্ব কুঞ্চিত কেশ, অঙ্গ ঢাকা বসন এবং তার নিজের উদ্‌ভ্রান্ত ও বিরক্ত মনোভাবের জন্য এতক্ষণ সে বুঝতে পারেনি। তার চেয়ে ইনি বয়সে বড় তো ননই, সমবয়সী বা ছোটও হতে পারেন।

সে বলল, 'আর্যে, এরা যদি আমাকে একটি ঘোড়া এনে দিতে পারে, আপনাকে কাল আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাকেত নগরীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'আর আজ রাত্রে ?'

'এই অতিথিশালায় তো আরও কক্ষ আছে, থাকব সেখানে।'

খুব সামান্য একটুকরো হাসি প্রব্রাজিকার মুখের ওপর দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

বললেন, 'কেন ?'

'আপনি নারী, এই চৌরগ্রামে একাকিনী'... দ্বিধা হচ্ছে কেন যেন, তিষ্য থেমে গেল।

'বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি আর বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে নারীকে, নয় ?'

তিষ্য কিছু বলল না।

হঠাৎ হেসে উঠলেন প্রব্রাজিকা। বললেন, 'কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে না। চিত্তবৃত্তি তোমাকে যে পথে নিয়ে যাবে সেদিকেই যেতে হবে। মানুষ খোঁটায় বাঁধা ছাগ। গলরজ্জু তাকে যত দূর যেতে দেবে, তত দূরই সে যাবে। সে যখন ভাবছে সে মুক্ত, তখন প্রকৃত পক্ষে পেছনে আসছে অজপালক, বুঝলে?' একটু পরে বললেন, 'প্রব্রাজিকার কোনও রক্ষক প্রয়োজন হয় না, জানো না ? নির্গ্রন্থ নাতপুত্র রক্ষা করবেন... কিংবা রক্ষা করবেন না।'

'আপনার গুরু আপনাকে রক্ষা করবেন, এ বিশ্বাসও আপনার নেই ?'

'আমাকে রক্ষা করাই তো তাঁর একমাত্র কাজ নয়, যুবক !'

'যদি রক্ষিত না হন, সত্যিই ?'

'কতদূর আর হবে, বড় জোর মৃত্যু ! নশ্বর দেহ চতুর্মহাভূতে মিলিয়ে যাবে। ক্ষতি কী ? তবে তা হবে না।'

'হবে না, নিশ্চিত জানেন ?'

'নিশ্চিত জানি।'

'আপনার ঋদ্ধি আছে, তা বুঝতে পারছি, কিন্তু...' সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল তিষ্য।

কথা শেষ না হতেই প্রব্রাজিকা বলে উঠলেন, 'ঋদ্ধি আছে কিনা জানি না যুবক, তবে বুদ্ধি আছে। একবার এক চোর এক কুলকন্যাকে পূজা দেবার ছল করে গিরিশিখরে নিয়ে যায়, কন্যার অঙ্গভরা অলঙ্কার, সেই অলঙ্কারগুলি হস্তগত করে সেই কুলকন্যার প্রাণনাশের অভিসন্ধি ছিল চোরটার। কিন্তু সেই কন্যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। সেও প্রণয়ের ছল করে চোরটাকে গিরিশিখর থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। এমনি করে।' হাতের দণ্ডটিকে দাঁড় করিয়ে তাকে আঙুলের টোকা দিয়ে ফেলে দিলেন প্রব্রাজিকা।

AMARBOI.COM

শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল তিষ্যর। প্রব্রাজিকা বললেন, 'নারীরা সবসময়ে বলহীন, বুদ্ধিহীন হয় না।'

'সে সাহসিকা নারী কে আর্যে ? আপনি চেনেন ?'

'চিনতাম এক সময়ে। রাজগৃহের এক রাজপুরুষের কন্যা।'

'কী নাম রাজপুরুষের ? কন্যারই বা কী নাম ?'

'অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ করো কেন যুবক ? নামরূপে কী কাজ ? ওই বোধহয় তোমার ঘোড়া এলো। যাও।'

লোকগুলি ভয়ে ভয়ে দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঘোড়া পাইনি, একটি অশ্বতর জোগাড় করেছি।'

প্রব্রাজিকা বললেন, 'মূল্যটা দিয়ে দাও যুবক, তারপর শীঘ্র যাও।'

তিষ্য করজোড়ে নমস্কার করল।

প্রব্রাজিকা বললেন, 'স্বস্তি, স্বস্তি, জয়তু, জয়তু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০

বারাণসীর পশুহাটে গিয়ে তিষ্য কিন্তু মন্দ্রাকে পেল না। তবে অশ্ববণিকদের সঙ্গে সাবধানে আলাপ করতে সে ছাড়ল না। ভালো মন্দ নানা রকম অশ্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সবই তো দেখছি পিঙ্গল, সাদা, কালো, অন্য প্রকার নেই ?'

'কি রকম চান ? ছোপ ছোপ ?'

'হ্যাঁ, ভেতরে অশ্বশালায় নিয়ে গেল লোকটি। কয়েকটি চিত্রাশ্ব আছে। কোনটাই মন্দ্রা নয়।'

এরই মধ্যে একটিকে দেখিয়ে সে বলল, 'ধরুন, এই রূপই শ্বেত। কিন্তু পিঙ্গল, আরও গাঢ় পিঙ্গল, বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার সব দাগ থাকবে।'

বণিক বলল, 'একটি তো ছিল। বিক্রি হয়ে গেছে।'

'কোথায় ?'

'তা কী করে জানব অজ্জ, অশ্বীটি সুশিক্ষিত, অতি সুন্দর ছিল। কিন্তু যারা তাকে নিয়ে এসেছিল, তারা অশ্বের কিছুই জানে না, বোঝে না। আমরা কেনবার সুযোগ পেলাম না। লোকগুলি সুচতুর। একজন রাজপুরুষকে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে, কহাপনগুলি বাজাতে বাজাতে চলে গেল। মনে হয় চোরাই অশ্ব।'

'আপনি বলতে পারেন, যে রাজপুরুষ তাকে কিনেছেন, তিনি কোথায় থাকেন ?'

বণিকটি বলল, 'অশ্বটি আপনার না কি ?'

তিষ্য ঘাড় নাড়তে, বণিক বলল, 'চুরি গেছে ? তখনই ধরেছি চোরাই অশ্ব। কীভাবে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হ্রেষা করছিল। আমরা অশ্ব চিনি। বলে দিতে পারি। কিন্তু অজ্জ, আমরা আসছি সেই সিন্ধু দেশ থেকে। এখানে বাণিজ্য করতে আসি। ক্রেতা রাজপুরুষকে তো চিনি না।'

তিষ্যর মুখ হতাশায় কালো হয়ে যাচ্ছে দেখে সে বলল, 'খুবই দুঃখের বিষয়, ঘোড়াটা চমৎকার ছিল। কিন্তু কী আর করবেন বলুন, বরং এই ঘোড়াটাকেই কিনে নিয়ে যান, অল্প করে মূল্য নেব।'

তিষ্য মুখ ফিরিয়ে বলল 'না, চিত্রাশ্ব আমার আর চাই না। আমায় একটি পিঙ্গল বর্ণের অশ্ব দিন, ওই যে বাইরে যেটা দেখছিলাম।'

দুজনে বাইরে এলো। মাজা তামার মতো রঙ ঘোড়াটার। সাজ-সমেত এক শত পঞ্চাশ কহাপন দিয়ে তাকে কিনে তিষ্য নগরের দিকে ধীরে ধীরে চলল। এ ঘোড়াটার হাব-ভাব দেখে সে বুঝেছে এর কিছু শিক্ষা আছে, একেবারে বন্য নয়। বণিক গর্ব করছিল, তিন পুরুষে শিক্ষিত সৈন্ধব আজানেয়, কিন্তু অতটা নয়। তবে ঘোড়াটি মন্দ্রার চেয়েও অল্পবয়স্ক। কেশরগুলি চলার সময়ে ভারি সুন্দর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। তার মনটা শান্ত হয়ে এলো। যদিও বিষণ্ণতা গেল না। পিতা মাতা, ভাই, বোন, নিজের দেশ সবই ত্যাগ করে চলে এসেছে, তবু প্রিয় বাহনটির জন্য মমতা তাকে ভেতরে ভেতরে যেন কাঁদাতে লাগল।

দু একজন পথিককে জিজ্ঞেস করে সে একটি আবসথাগারে পৌঁছল। এখানে স্নান, বেশ পরিবর্তন, ও উত্তম ভোজনের পর সে একটু সুস্থ বোধ করল। এবং নিজের কক্ষে এসেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে শয্যায় শোয়নি। বসেছিল শুধু। তার পাঁচ তলিকা বিশিষ্ট পাদুকার মধ্যে তার যাবতীয় অর্থ। এক প্রস্থ বস্ত্র সে সঙ্গে এনেছে। আর কিছু নেই। পাদুকা দুটি সাবধানে খট্টার তলায় রেখে সে দুয়ারে অর্গল দিয়ে দেয়। তারপর শয্যায় এসে বসে। বসে বসেই কখন ঘুম এসেছে, শুয়ে পড়েছে নিজেই জানে না। অনেকক্ষণ পরে, সন্ধ্যা হবে হবে, সে দেখল তার কক্ষের অর্গল খুলে যাচ্ছে। সভয়ে সে উঠে বসল। কোষ থেকে ছুরিকা বার করল টেনে। ঢুকলেন সেই যুবতী পরিব্রাজিকা। চোখ তেমনি দীপ্ত, মুখ গম্ভীর, দাঁড়ানোর ভঙ্গি তেজস্বান।

'আপনি !' সবিস্ময়ে তিষ্য বলে উঠল।

'কী চাও যুবক ? লক্ষ্য স্থির করোনি ?'

'এখনও তো তেমন কিছু...'

'একটি সামান্য অহংকারী বালিকার জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়লে ! ধিক্ তোমাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, তা নয়। এখনও ভেবে উঠতে পারিনি।'

'শোনো। তোমার জীবনে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। বৃথা সময় ব্যয় করো না। রাজগৃহে যাও।'

'রাজগৃহে ? সেখানেই সেই সাহসিকা কন্যা আছে না ?'

সাহসিকা কন্যা ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে রাজগৃহে, যা শ্রাবস্তীতে নেই। সাকেতে নেই। তক্ষশিলায় নেই। যাও।' বলে প্রব্রাজিকা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'কোথায় যান ? শুনুন, একটু শুনে যান...।' তিষ্য ডেকে উঠল। তারপরেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। শূন্য পান্থশালার ঘরে একলা শয্যায় ঘুমচোখে সে কাকে চিৎকার করে ডাকছে ? কোথাও কেউ নেই। অর্গল বন্ধ। সন্ধ্যা সত্যই ঘনিয়ে এসেছে। সে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু কী জীবন্ত স্বপ্ন ! নিশ্চয় ওই কুণ্ডলকেশ প্রব্রাজিকা ঋদ্ধিবলে এসেছিলেন। সে লক্ষ্যভ্রষ্ট, যত্র তত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল। ভুলে গিয়েছিল তার একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য আছে। সে স্বপ্ন দেখে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবার। কিন্তু সে তো একদিনে হবার নয় ! তার জন্য আয়োজন চাই ! প্রব্রাজিকা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন তার আদর্শের কথা, বলে দিয়ে গেলেন কোন পথে গেলে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। সে স্থির করল, আগামীকাল প্রত্যুষেই সে রাজগৃহের পথে যাত্রা করবে। কিন্তু আজ ? আজ সন্ধ্যা, রাতের প্রথম যাম অন্তত বারাণসী নগরী ঘুরে-ফিরে দেখা প্রয়োজন।

অশ্বশালায় গিয়ে ঘোড়াটির পিঠে আদর করে থাবড়া মেরে সে বলল, 'কি হে তাম্রক, খাওয়া-দাওয়া সব ঠিকঠাক হয়েছে তো ?'

রক্ষক বলল, 'ভারি সুশীল অশ্বটি, ভালো করে ঘাস খাইয়েছি অজ্জ।'

রক্ষককে কয়েক কাহন দিয়ে সে তাম্রকের পিঠে চড়ে বসল।

বারাণসীর পথগুলি শ্রাবস্তীর চেয়েও জনবহুল। পথগুলিও তেমন ভালো না। অথচ এই নগরীর আশেপাশে সে শুনেছে দন্তকার বীথি আছে। গজদন্তের নানা বস্তু সেখানে প্রস্তুত হয়। বারাণসীর বস্ত্রের তো পৃথিবীজোড়া খ্যাতি। কাষ্ঠের কাজেও এরা দক্ষ। নগরীর থেকে অল্প দূরেই আছে বর্ধকিগ্রাম। সেখানে নিকটবর্তী বনভূমি থেকে গাছ কেটে, দীর্ঘদিন ধরে কাঠ প্রস্তুত হয়, তারপর তা থেকে অন্যান্য দ্রব্য, যেমন, পর্যঙ্ক, খট্টা, চতুষ্পদিকা, ভদ্রপীঠ, এসব তো হয়ই। বড় বড় হর্ম্যের কাষ্ঠকর্মগুলি প্রস্তুত হয়। দ্বার, বাতায়ন, অলিন্দ, সোপান, এসব তো বটেই, স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর— সব। এদের কথা সে জানতো না। এবার সাকেতে বিশাখার বিবাহের কল্যাণে জানল, দেখল। ঠক ঠক, খট্টা, খট্টা, শব্দে কিছুদিন কান পাতা দায় হয়ে উঠেছিল, তারপর দেখা গেল, চমৎকার চমৎকার সব প্রাসাদ উঠে গেছে। সেইসব বর্ধকি, তক্ষা, দন্তকার সবাই তো এই জনপদে বাস করে ! এমন সমৃদ্ধ, উন্নত স্থান ! অথচ দেখো নগরীর পথগুলি, সম্ভবত ঘোড়া, হাতি, রথ, পণ্যদ্রব্যবাহী গো-শকট ইত্যাদির আসা-যাওয়ার ফলেই, ভেঙে ভেঙে গেছে। প্রধান পথগুলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তিষ্যর ধারণা হল বারাণসী বৃহৎ নগরী হতে পারে, পট্টন হতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যে সাকেত কেন শ্রাবস্তীর সঙ্গেও তার কোনও তুলনা হয় না। সে দেখে শুনে একটি শোভন-দর্শন পানাগারে গিয়ে বসল।

বেশ সুন্দর শয্যা বিছোনো রয়েছে। স্থূল, নানা আকারের উপাধান, বসতেই পানাগারিকের কর্মকর তার সামনে একটি নিচু ত্রিপদী রেখে গেল। সে কাপোতিক সুরা চাইল। অল্প দূরেই দল বেঁধে কয়েকজন গল্প করতে করতে সুরা পান করছিল। অতিরিক্ত চেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যাস এদের। কিছুক্ষণ পর তাদের একজন বলল, 'আমরা চম্পা থেকে আসছি ভদ্র, আপনি কোথা থেকে ?'

'সাকেত।' অতি সংক্ষেপে উত্তর দিল তিষ্য, অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

'একা একা পান করবেন কেন, আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। আমরা বণিক। আপনি ?'

'রাজকুমার।' এখনও তিষ্যর স্বরে কোনও আগ্রহ নেই।

'আসুন আসুন।' তিষ্য না এগোলেও, তারা নিজেদের উপাধান এবং পানপাত্র নিয়ে তিষ্যর আশেপাশে এসে বসে পড়ল। তিষ্য প্রথমটা বিরক্ত হয়েছিল। এদের কৌতূহল অতিরিক্ত হলে তার অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু দেখা গেল, এরা নিজেদের গল্পেই মত্ত। পুণ্যশীল নামে একটি যুবক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, 'আমি যদি কখনও সুযোগ পাই তো সমুদ্রবাণিজ্যে যাবোই। শুনেছি সমুদ্রপারের দেশগুলিতে আমাদের দেশের সামান্য বস্তুরও অনেক মূল্য পাওয়া যায়।'

সুজাত নামে একটি যুবা তিষ্যর দিকে চেয়ে বলল, 'শুনুন ভদ্র, সুযোগ পেলে, ও না কি সমুদ্রবাণিজ্যে যাবেই। যবে থেকে পুণ্যশীলকে দেখছি এই কথা ওর মুখ থেকে শুনে আসছি। ও সমুদ্রে যাবেই। সুযোগ বলতে ও কী বোঝাচ্ছে, বলুন তো?'

সঙ্গে সঙ্গে একটা হট্টগোল উঠল 'সত্যিই তো পুণ্যশীল, সুজাত ঠিকই বলেছে। সুযোগ বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছো?'

'পিতার সঞ্চিত অর্থও তোমার অল্প নয়। নদীবাণিজ্যে হাত পাকালে তা-ও অনেক দিন হল।'

সবাই চেপে ধরলে পুণ্যশীল বলল, 'গৃহে কান্না আরম্ভ হয়, সমুদ্রে যাবার কথা বললেই। কী করি বল?'

'গৃহে? অর্থাৎ তোমার পত্নী?'

'পত্নী, মাতা।'

'তা, পত্নী বা মাতার কান্নাকাটি তো কোনদিনই থামবে না, রমণীর কান্না থামবার আশায় বসে থাকলে তো বাণিজ্যই বন্ধ করে দিতে হয়। তা হলে শুধু শুধু বড়াই করো কেন! যা পারবে, তা বলবে। যা পারবে না, তা কখনও বলবে না।'

পুণ্যশীল বলল, 'সে তোমরা যতই উপহাস করো, আমি বলব। সব মানুষেরই একটা স্বপ্ন থাকে। হতে পারে, আমি কোনদিনই যেতে পারব না। কিন্তু একদিন যাবো এই আশাটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলে, সত্য বলছি, আমার জীবন বৃথা মনে হবে।'

'কেন তুমি কি যথেষ্ট উপার্জন করছো না? পিতৃধন অন্তত দেড়গুণ তো বাড়িয়েছ ভাই। তুমি যথেষ্ট চতুর বণিক। সেবার শ্রাবস্তীর কাংস্য তৈজসগুলি মদ্রদেশের গ্রামে কী ভাবে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করলে?'

পুণ্যশীল বলল, 'আহা-হা উপার্জনের কথা হচ্ছে না। চার পুরুষে জলবাণিজ্য করছি ভাই, এখনও যদি এটুকু চাতুর্য না এসে থাকে স্বভাবে, তাহলে বণিকবৃত্তি তো ত্যাগ করাই ভাল। কিন্তু সমুদ্রবাণিজ্য আমাকে টানে উপার্জনের জন্য নয়, সমুদ্র-যাত্রার রোমাঞ্চের জন্য। চিন্তা কর তো অকূল বারিধি, স্থলভূমির দেখা নেই। নক্ষত্র দেখে দিঙ্ নির্ণয় করে করে চলেছি। ঝড় উঠল।'

'—হ্যাঁ হ্যাঁ, জলস্তম্ভ উঠল। সেটি ভীমবেগে তোমার পোতগুলির ওপর আছড়ে পড়ল। তারপর তুমি তোমার পণ্য-সন্য লোকজন সব নিয়ে জলের তলায় নাগলোকে গিয়ে বাসুকি ভদ্রের সঙ্গে দেখা করলে...'

'বাসুকি ভদ্র তোমাকে বেশ কয়েকটি নাগকন্যা এবং উজ্জ্বল একটি মণি দিলেন তার বিভায় তুমি স্বর্লোক পর্যন্ত সমস্ত দেখতে পেলে...'

সবাই হাহা হোহো করে হাসতে লাগল। তিষ্যরও অধরের কোণে মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠল।

পুণ্যশীল কিন্তু দমল না। সে বলল, 'আছে, সে সম্ভাবনাও আছে। ঝড়, জলস্তম্ভ এ-সব হতে পারে। আবার এ-ও তো হতে পারে বন্ধু যে, একেবারে ববেরু দেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে ময়ূরের নৃত্য দেখিয়ে স্বয়ং রাজা-রানিদের বশ করলাম, এক একটি ময়ূরের পরিবর্তে সমান ওজনের সোনা পেলাম। না, না, প্রথমে ময়ূর নয়, প্রথমে দেব কাক; তার পরে বার করব কপোত, তার পরে কোকিল, কোকিলের গান শুনিয়ে ওদের মুগ্ধ করব, তার পর শেষকালে বার করব ময়ূর।'

'তুমি ওই আনন্দেই থাকো ভাই পুণ্যশীল। ববেরু দেশে পাখি নেই, সামান্য একটা কাকও সেখানে সিংহশাবকের মতো সম্মান পায় এসব পুরনো কথা আমরাও জানি। কিন্তু এই চমৎকার জীবন ছেড়ে, ধন-সম্পদ, আরাম-বিলাস ছেড়ে সমুদ্র-বাণিজ্যের বিপদে সাধ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে যে চায় সে মূঢ়, মূঢ় ছাড়া কী? বলুন ভদ্র!' সুজাত নামে বণিকটি তিষ্যর দিকে তাকিয়েছে। তিষ্যর চকিতে মনে হল পুণ্যশীল নামে এই যুবকটি বৃত্তিতে বণিক হতে পারে, কিন্তু মনোবৃত্তিতে তার এর সঙ্গে মিল রয়েছে। তার ভেতরে একটি মধুর অথচ জোরালো নারীকণ্ঠ বলে উঠল, 'হঠকারিতা, এসব হঠকারিতা।' আবার আর একটি আরও তেজস্বী নারীকণ্ঠ বলে উঠল, 'তোমার জীবনে অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্নতির সম্ভাবনা দেখছি। রাজগৃহে যাও।'

এর আগে যখন নতুন দেশে গিয়ে নতুন জনপদ স্থাপন করবার কথা সে ভেবেছে, পথে কত রকম বিপদ আসতে পারে সেগুলি নিয়ে অধিক চিন্তা করেনি। মনে হয়েছিল অতি সহজ হবে সবটাই। মাঝে মাঝে অস্ত্রবল দেখাবার সুযোগ আসবে। তাতে তো সে অবশ্যই জয়ী হবে। বাকিটা অতি পরিষ্কার। এবার গৃহত্যাগ করে সত্যি সত্যি একা হওয়ার পর তার যেটুকু অভিজ্ঞতা হল, তাতেই সে খানিকটা দমে গিয়েছিল। সামান্য একটা অশ্ব সে রক্ষা করতে পারেনি। কতকগুলি গ্রাম্য তস্কর তাকে বুদ্ধিতে, ক্ষিপ্রতায় হারিয়ে দিয়েছে। অনার্য রমণীগুলি পর্যন্ত তাকে যেন গ্রাহ্য করল না। তবে কি তার পক্ষে স্বাধীন রাজ্য গড়বার কল্পনা করা হঠকারিতাই ?

সে বণিকযুবার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'দেখুন ভদ্র, সুরক্ষিত গৃহ, আত্মীয় পরিজন, ধনসম্পদ, পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি এরই মধ্যে কেউ সুখে থাকতে চায়। কারুর আবার এই জীবনকে বদ্ধ জলাশয়ের মতো মনে হয়, তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে এই প্রতিবেশে, সে নতুন দেশে পা বাড়াতে চায়। হয়ত হঠকারী। কে জানে হয়ত বা মূঢ়ও। কিন্তু কী করা যাবে ! এটাই তার স্বধর্ম।'

পুণ্যশীল নামে যুবাটি বসে বসেই প্রায় যেন নৃত্য করতে লাগল, 'কেমন ? কেমন ? বলিনি ? ক্ষত্রিয়কুমার বীরপুরুষ, তিনি আমার স্বপ্নের মর্ম বুঝতে পেরেছেন, তোমরা কী জানো ? গড্ডলিকা। সামনে তোমাদের পালক চলেছে, তোমরা কিচ্ছু দেখছ না শুনছো না, শুধু সামনের গড্ডলটি যেদিকে যাচ্ছে, মুখ নিচু করে, শিঙ বাঁকিয়ে সেই দিকেই চলেছ।' উৎসাহে সে আঙুলে ছোটিকার শব্দ করতে লাগল।

তিষ্য বলল, 'আচ্ছা ভদ্রগণ, আমি এবার উঠি।'

'কোথায় যাবেন ? কার গৃহে ?'

'কারও গৃহে তো নয় ! পান্থশালায় ফিরব।'

'পান্থশালা ? সে কী ? কেন ?'

সুজাত নামে বণিক যুবা বলল, 'কোনও বিশেষ পক্ষপাত বা রুচির ব্যাপার না থাকলে ভদ্রাবতীর ওখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। বারাণসীর সবচেয়ে মহার্ঘ গণিকা।'

পুণ্যশীল বলল, 'আবারও বলছি, তোমরা সব গড্ডল। ভদ্রাবতী সবচেয়ে মহার্ঘ হতে পারে, এবং সেইজন্যই তোমরা চোখ কান বুজে সেখানে চলে যেতে পার। যাও। তবে ভদ্র, আপনাকে আমি এমন একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি, যার গান আপনি জীবনে ভুলতে পারবেন না। পরিচর্যাও।'

'কার কথা বলছ পুণ্যশীল।'

'সে আমি তোমাদের বলছি না। যদি এই ক্ষত্রিয়কুমার, কী যেন নাম আপনার ?'

'তিষ্য।'

'হ্যাঁ এই তিষ্যকুমার যদি যেতে চান, নিয়ে যেতে পারি।'

তিষ্যর ভেতরটা বিতৃষ্ণায় কুঁকড়ে গেল। প্রথম যৌবন থেকে সে বিশাখাকে, শুধু বিশাখাকে ভেবে এসেছে। অন্য কোনও নারী তাকে আকর্ষণ করেনি কখনও। এটা তার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

পুণ্যশীল বলল, 'চলুন।' সে উঠে দাঁড়াল।

তিষ্য বলল, 'আপনি যান। আমাকে কাল অতি প্রত্যুষে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'বেশ, যাবেন না। আসুন, আপনার পান্থশালাটিতে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।' বলে পুণ্যশীল তার কাঁধের ওপর তার ভারী হাতটা রাখল।

তিষ্য এ ধরনের অন্তরঙ্গতা ভালবাসে না। লোকটির হাত কর্কশ এবং লোহার মতো ভারী। নাম পুণ্যশীল হলেও এর মধ্যে পুণ্য বা শীল কোনটারই অস্তিত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু এত লোকের সামনে বণিকটি তাকে নিয়ে টানাটানি করবে, বেশ কিছু সরস মন্তব্যের আদান-প্রদান হবে তাকে ঘিরে, এটা তার মনঃপূত হল না। সে সুরার মূল্য দিয়ে পানাগার থেকে বেরিয়ে পড়ল। অশ্বরক্ষক তাম্রককে নিয়ে আসতে পুণ্যশীল বলল, 'ও, আপনার সঙ্গে ঘোড়া রয়েছে। ভালই হল,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার পেছনে বসেই চলে যাব।'

লাফিয়ে সে তিষ্যর পেছনে উঠে পড়ল, তার অনুমতির অপেক্ষা করল না। তিষ্যর বিরক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। কী ভেবেছে এ লোকটি! এক পানাগারে বসার সূত্রে সে কি তিষ্যর সমকক্ষ হয়ে গেল! এই সব বণিকদের আচার-আচরণ একেবারেই ভাল না। যদিও তার জীবনে এমন নির্লজ্জ সে অল্পই দেখেছে, তবু তার ধারণা, ক্ষত্রিয়দের তুলনায় আর সকলেই হীন। এই লোকটিকে ঝেড়ে ফেলতে না পারলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না। সে বলল, 'চলুন, আপনাকে কোথায় পৌঁছে দিতে হবে দিয়ে আমি নিজের পান্থশালায় যাব।'

'তা হলে তো চমৎকার হয়! চলুন আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

ক্রমশই নদীর দিক থেকে শীতল বাতাসের স্রোত আসতে লাগল। অস্পষ্ট কোলাহল, পুণ্যশীল বলল, 'আমরা পট্টনের দিকে যাচ্ছি, বুঝেছেন তো!'

'আপনার পোত কি পট্টনে নোঙর করা আছে না কি?'

'হ্যাঁ। আমরা সাতজন বণিক আছি দলে। পনের ষোলটি তরী রয়েছে।'

'চম্পা থেকে আসছেন, বললেন না? ওখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ, চম্পাতেই আমাদের তিন পুরুষের বাস। আমার পিতামহ রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বজ্জিদের একটি গ্রাম থেকে ওখানে গিয়ে বসবাস করেন।'

'রাজা ব্রহ্মদত্ত! কে তিনি?'

'ব্রহ্মদত্ত অঙ্গদেশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন, জানেন না? বৃদ্ধ বয়সে মগধের ওই উঠতি রাজার সঙ্গে বিবাদ লাগালেন। হয়ে গেল সর্বনাশ। দেশটি ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন তো লোকে বলে অঙ্গ-মগধ। অবশ্য তাতে আপনারই কি, আমারই বা কি! আমার অল্পবয়সে উপরাজ বিম্বিসার অঙ্গ শাসন করতেন, চম্পায় থেকে, তার পরে এখন তো তাঁর পুত্র অজাতশত্রু করছেন। আমরা পার্থক্য কিছু বুঝছি না। তবে পিতা বলেন, ব্রহ্মদত্তের সময়ের থেকেই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। গঙ্গাবক্ষে দস্যুদের উপদ্রব প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আরও একটা সুবিধে হয়েছে। আগে প্রতি পট্টনে স্বতন্ত্র শুল্ক দিতে হত, যত পট্টন, তত রাজা। এখন রাজা একই হওয়ায় অঙ্গ-মগধে শুল্কে অত ব্যয় হয় না। পিতা বলেন, সমস্ত উত্তরাখণ্ড এক চক্রবর্তী রাজার অধীনস্থ হলে আমাদের সুবিধে হয়। যাতায়াত যত অবাধ হবে আমাদের পক্ষে ততই ভাল। মুদ্রাও এক হয়! এখন ধরুন, চম্পা থেকে গঙ্গাপথে যদি যমুনায় বাঁক নিয়ে হস্তিনাপুর পর্যন্ত যাই, মুদ্রা নিয়ে বড়ই বিপর্যয় হয়। বৈশালী, কোশল, বৎস, মধুরা, কুরু, পঞ্চাল, প্রত্যেক রাজ্যে স্বতন্ত্র শুল্ক, স্বতন্ত্র মুদ্রা।'

'স্বতন্ত্র মুদ্রা বলবেন না, চিহ্নগুলি স্বতন্ত্র।'

'ওই হল। আমরা তো এই কারণেই এখনও বিনিময়-রীতি চালাচ্ছি। কিন্তু তার কত অসুবিধা বলুন! কোন পণ্যের কী মূল্য হবে স্থির করার কোনও ব্যবস্থা নেই।'

'কেন অর্ঘকারকরা রয়েছেন তো?'

'সে তো শুধু রাজভাণ্ডারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য। অর্ঘকারক তো অন্য কিছুরই মূল্য স্থির করে দেন না! ফলে, ওই যে আমার বন্ধুরা বলছিল না, আমি চতুর! ওই চাতুর্যের আশ্রয় নিতে হয়।'

'কী প্রকার?' তিষ্য কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'ধরুন, এই যে বারাণসী থেকে বহুবিধ বস্ত্র তুলব, গজদন্তের দ্রব্য, কাঠের দ্রব্য তুলব, এ সব নিয়ে এ বছর যে বণিকদল সর্বাগ্রে বিদেশের পট্টনে গিয়ে পৌঁছতে পারবে, সে সবচেয়ে ভাল মূল্য পাবে।'

'আপনারা তো সাতজনে দল বেঁধে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনি একা কীভাবে সুবিধে পেতে পারেন?'

'দল বেঁধে যাচ্ছি যতক্ষণ নদীতে আছি, ততক্ষণ। পট্টনে নেমে যে যার মতো ক্রেতা সন্ধান করে বার করি। আমি কি করি জানেন? পট্টনে নেমেই অমনি অন্যদের মতো সব পণ্য বিকিয়ে দিই না। কতকগুলি নিদর্শন নিয়ে একটু ভেতরের দিকে চলে যাই। সেখানে গিয়ে সত্যঙ্কার (বায়না) নিয়ে আসি। তারপর সেই সব ক্রেতারা শকটে করে আমার পণ্য সব নিয়ে যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা আপনার সহচর বণিকরা এ কৌশল লক্ষ করেনি ? তারাও যদি এই উপায় নেয়, তখন কী করবেন ?'

'ওরা লক্ষ করেছে বই কি ? গোপনে কাজ সারার চেষ্টা করলেও কেউ কেউ লক্ষ করেছে। কিন্তু ওই যে বললাম— গড্ডলিকা। যা সবাই করে, তাই করবে। অন্য পথে পা বাড়াবে না। তা ছাড়া, ভদ্র, আপনি বণিক নন বলেই এ সব কথা আপনাকে বললাম, অন্য বণিকদের কাছে সাবধানে মন্ত্রগুপ্তি রাখি। বণিকের একটা মস্ত প্রয়োজনীয় গুণ কী জানেন ? বাক্‌পটুতা। আমি তো বেশির ভাগ সময়েই ভাব দেখাই আমার আর তর সইছে না, আমি পট্টনে কোনও মুহুত্তিয়ার কাছে যাচ্ছি। মুহুত্তিয়া জানেন তো ?' তিষ্য কিছুটা অনুমান করেছিল কিন্তু সঠিক জানবার জন্য বলল, 'না।'

'এহ্, আপনি দেখছি একেবারে নাবালক ! তবে কি জানেন, আপনারা তো পট্টনে থাকেন না, বা বাণিজ্য করতে করতে বৎসরের পর বৎসর গৃহ ছাড়া থাকতে বাধ্য হন না তাই এত সব জানেন না। মুহুত্তিয়া হল পণ্যস্ত্রীই। বণিকদের প্রবাসে গৃহসুখ দেয়। একেক জন এত ভাল হয়, কী বলব !'

সাকেতে সরযূতীরে আজকাল বণিকদের আসা-যাওয়া যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু তিষ্য তাদের পট্টনে মুহুর্তিকা আছে বলে মনে করতে পারল না। থাকলে সরযূতীরে এদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। সে যতটুকু সাকেতে থেকেছে, এদের দেখেনি। সাকেতের ব্যাপার অবশ্য স্বতন্ত্র। সাকেতের সবই অভিজাত, শ্রীমণ্ডিত। একটি অপেক্ষাকৃত সরু পথের সামনে এসে পুণ্যশীল বলল, 'এইখানে আমি নামব। আপনি আসুন না। যে গায়িকার কথা বলেছিলাম, এইখানে থাকে।'

তিষ্য বাঁকা হেসে বলল, 'আপনার মুহুত্তিয়া ?'

—'ঠিক ধরেছেন।' পুণ্যশীল যেন একটু লজ্জা পেলো। তারপর বলল, 'আপনাকেও সে অভ্যর্থনা করবে, সেবা করবে। আমি কিছু মনে করব না, আসছি না।'

তিষ্য রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'আমি গান ভালবাসি না।' ঘোটকের পেটে চাপ দিতেই সে ঘুরে দাঁড়াল, তিষ্য অস্বাভাবিক চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি যান ভদ্র পুণ্যশীল, আমি স্ত্রীলোকও ভালবাসি না। ঘৃণা করি বললেই হয়। সংগীত, নৃত্য, নারী সব।

বিস্মিত বণিক যুবকটিকে পথের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখে তিষ্য পূর্ণবেগে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

পরে পুণ্যশীল নামে ওই বণিক যুবা সহচর বন্ধুদের এই গল্পটি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে করে। সে বলে, 'কুমারটি অসম্ভব দাম্ভিক। কিন্তু প্রথমটায় আমি তা একেবারেই বুঝতে পারিনি।'

একজন বন্ধু বলে, 'কুমারটি নিজের মনে বসেছিল। প্রথমটা তো আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায়নি।'

'সেটা অপরিচয়ের আড়ষ্টতাও হতে পারে।'

'লক্ষ করেছিলে, ও বিশেষ কথা বলেনি !'

'না, না। কথা তো বলল। ওই যখন আমরা সবাই মিলে পুণ্যশীলকে উপহাস করছিলাম সমুদ্রবাণিজ্য নিয়ে, তখন তো অনেক কথাই বলল।'

'দেখো, আমরা গুরুগৃহে যাইনি, কোনক্রমে উপনয়ন সংস্কারটি নামে হয়েছে। তারপর থেকে তো অর্থের সাধনাই করছি। ওই কুমারটি আমার মনে হয় উচ্চশিক্ষিত। উচ্চারণ দেখেছিলে ? ক্ষত্রিয় মাত্রেই আজকাল ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, এ ব্যক্তি তো আবার রাজকুমার, তার ওপর উচ্চশিক্ষিত। দাম্ভিক তো হবেই !'

পুণ্যশীল বলল, 'আশ্চর্যের কথা এই, প্রথমটায় কিন্তু আমার একবারও লোকটিকে দাম্ভিক-টাম্ভিক মনে হয়নি। সুখে লালিত, এবং ওই যা বললে, উচ্চশিক্ষিত। এ প্রকার রাজকুমারের রূপ এবং বাগ্‌ভঙ্গিতে একটা স্বাতন্ত্র্য তো থাকবেই। আমাদের মতো রোদেপোড়া, জলেভেজা, সাত ঘাটের জল খাওয়া তো আর নয় ! খুব মন দিয়ে আমাদের বৃত্তির কথা শুনছিল। কোথা থেকে কীভাবে পণ্য আনি, কোথায় বিকোই, অনেক প্রশ্নও করছিল।'

সুজাত এতক্ষণ নীরব ছিল, এবার বলল, 'থামো থামো, আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি।'

সবাই মিলে অনেকক্ষণ অনুরোধ করবার পর সুজাত বলল, 'বুঝতে পারলে না, লোকটা চর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনলে না সাকেত থেকে আসছে। কোশলের চর। বণিকরা কোথায় কী লাভ করছে, কোন রাজার প্রতি কী মনোভাব, এ সমস্ত সমেক্ষণ করছে। কে জানে পুণ্যশীল গবগব করে আবার কী বলে ফেলেছে!'

২১

শয়নকক্ষের দুয়ারে উপর্যুপরি করাঘাতে বিশাখার ঘুম ভেঙে গেল। এই কক্ষে এখন সে একাই ঘুমোয়। মিগার গৃহের পাশেই একটি প্রশস্ত অঙ্গন, তারপর এই নতুন বাড়ি তুলে দিয়েছেন ধনঞ্জয়। বিশাখা ব্যবস্থা করেছিল তার দাস-দাসীরা এই গৃহে থাকবে, আর একটি প্রাঙ্গণ পার হয়ে কিছু দূরে অশ্বশালা ও গোশালা, এদের দেখাশোনার সুবিধাও হবে। এই দাস-দাসীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তারই। কিন্তু গৃহটি এতই সুন্দর যে, এ ব্যবস্থা তার শ্বশ্রূ মেনে নিতে পারেননি। প্রশস্ত সুন্দর সুসজ্জিত শয়নকক্ষ বিশাখার। শ্বশ্রূর আদেশে সে এখানেই রাতে ঘুমোয়। কিন্তু পুণ্যবর্ধন পুরনো বাড়িতে তার পুরনো কক্ষেই রাত্রিযাপন করে। এই ব্যবস্থায় বিশাখা ভেতরে ভেতরে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে যেন এক প্রকার মুক্তিও পেয়েছে। সে এবং তার পুরো দাস-দাসীর দলটিকে যেন স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে। সে এতে উৎকণ্ঠিত, কিন্তু বেশ স্বস্তিও পাচ্ছে। এই প্রকার বিপরীত মনোভাব তার হচ্ছে।

পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে প্রথম আলাপের রাতটি ছিল বড় অদ্ভুত।

দাসীরা তাকে সাজিয়ে, শয়নকক্ষটি সুবাসিত সুসজ্জিত করে চলে গেল। সে ঘরে ঢুকে দেখল পুণ্যবর্ধন তার প্রিয় সোনার ধনুকটিতে তীর যোজনা করতে করতে হাসছে। বিশাখা ঢুকে পর্যঙ্কের ওপর বসল।

পুণ্যবর্ধন মাথা তুলে বলল, 'ও কি? আমি অনুমতি না দিতেই বসলে যে!'

বিশাখা অবাক হয়ে বলল, 'বসতে হলে আপনার অনুমতি নিতে হবে, এমন নিয়মের কথা তো আমি শুনিনি?'

'আচ্ছা, ক্ষমা করলাম। এখন বলো তো বিসাখা, তোমার পিতার কত অর্থ আছে?'

'এ আবার কী প্রসঙ্গ!' বিশাখা বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমার পিতার অর্থ নিয়ে এখন আলোচনার প্রয়োজন কী?'

'না। যৌতুকের পরিমাণ দেখে মনে হল রাজা-রাজড়ার সঙ্গে কোনও পার্থক্যই নেই। আচ্ছা ধরো, আমার পিতার মৃত্যুর পর, সব ধন হাতে পেয়ে আমি যদি আমার ইচ্ছামতো ব্যয় করে উড়িয়ে দিই, তোমার পিতা আমাকে আবার যত ধন লাগবে সব দিতে পারবেন তো?'

বিশাখা তার স্বভাবিক দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আর্যপুত্র, ইচ্ছামতো ব্যয় করে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া ধনের আর কোনও ব্যবহার যদি আপনার জানা না থাকে, তা হলে আপনি যাতে ধন হাতে না পান, বিসাখা তা দেখবে। এবং বিসাখা বরং মৃত্যুবরণ করবে তবু পিতাকে কখনও জানাতে পারবে না যে তাঁর জামাতা অমিতব্যয়ী। উপার্জন করতে জানে না।'

চমৎকৃত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে এই সময়ে পুণ্যবর্ধন বলেছিল, 'বাহা, বাহা, বাহা, তুমি তো দেখছি অম্বপালীরই মতো। অমনি রূপ, অমনি মহিমা,' তার চোখে প্রশংসা, সেই সঙ্গে লোভ।

'অম্বপালী কে?'

'অম্বপালী কে, জানো না? হাঃ হা, অম্বপালী বৈশালীর শিরোমণি। অম্বপালী লিচ্ছবিদের হৃৎকমল। বৈশালীর জনপদকল্যাণী, নগরশোভিনী।'

বিশাখার মনে পড়ল তার দাসীরা তাকে জনপদকল্যাণী বলেছিল। সেইসঙ্গে উল্লেখ করেছিল গণরাজাদের দেশে সুন্দরী নারীদের প্রতিযোগিতা হয়, শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে গণভোগ্যা হতে হয়।

সে বলল, 'আপনি দেবি অম্বপালীকে দেখেছেন?'

'দেবী অম্বপালী!' হা হা করে কিছুক্ষণ হাসল পুণ্যবর্ধন। তার পরে বলল, 'দেবী? তা হবেও বা! তার রূপের মধ্যে যতটা আকর্ষণীশক্তি ঠিক ততটাই তেজস্বিতা। অবশ্য সে ভালো অভিনয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানে, তেমন তেমন নাগরের জন্য তেজস্বী ভাবটা ত্যাগ করে শুনেছি। তখন শুধুই মধুর। মধুরে মধুর।'

'আপনি তাঁকে এই প্রকার ভাব পরিবর্তন করতে দেখেছেন ?'

'তোমাকে বলব কেন ? আগে আমার পা সংবাহন করে দাও।'

বিশাখা বলল, 'আপনার কি পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে ?'

'না তো !'

'তা হলে শুধু শুধু পা সংবাহন করতে যাবো কেন ?'

'তা হলে আমি বলবও না।'

'ঠিক আছে। আমার শুনে কাজ নেই।'

'আচ্ছা আচ্ছা, বলছি। অম্বপালীর কাছে দল বেঁধে যাওয়ার নিয়ম নেই। মাঝে মাঝে সে তার অত্যুৎকৃষ্ট নৃত্য ও গীতের সভা বসায়। নিজগৃহের মণ্ডপেও হয়, কোনও ধনী বা রাজা কোনও উদ্যানে ব্যবস্থা করলেও হয়। সেখানেই গুটিকতক লোক আমন্ত্রণ পায়। কিন্তু এ ছাড়া রাত্রিবাসের জন্য সে এক বারে এক জনকে ছাড়া ঢুকতে দেয় না।'

'এক জনের বেশি প্রবেশ করবে ? এক বারে !' দারুণ বিস্মিত হয়ে বিশাখা বলল।

'তুমি তো বালিকামাত্র, কামকলার কী-ই বা তুমি জানো ? নির্জন ভোগের স্বাদ একপ্রকার, আবার সখাদের নিয়ে একত্রে ভোগের স্বাদ অন্য প্রকার।' বলে পুণ্যবর্ধন সাগ্রহে তাকে আলিঙ্গন করতে আসে।

বিশাখার তখন বুকের মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে। সে বালিকা হতে পারে, কিন্তু পুণ্যবর্ধনও এমন কিছু বয়স্ক নয়। তিষ্যর থেকে যদি সামান্য বড় হয়। এ এই বয়সেই কামকলার স-ব জানে ? নির্জন ভোগের স্বাদ, সখাদের নিয়ে একত্র ভোগের স্বাদ—এ সব কী বলছে এ ? তখন গদগাদ স্বরে পুণ্যবর্ধন বলছে, 'বিসাখে, অম্বপালীকে পাঁচ শত কহাপণ দিয়ে কিনলাম, কিন্তু সে তার দৃপ্ত তেজস্বী ভাব আমার সামনে একবারও ত্যাগ করেনি। আমার কামতৃপ্তি হল না। চলে আসবার সময়ে শুনতে পেলাম সে তার প্রধানা দাসীকে বলছে, "এ যে বালক, আমার পুত্রের বয়সী ! এদের ঢুকতে দিস কেন ? ওহ্ আর কতকাল হে শক্রদেব ? আর কতকাল এই ঘৃণ্য কাজ করতে হবে ! কী সে মহাপাপ হে দেবতা, যার জন্য পারিজাতকুসুমকে দুর্গন্ধ বিষ্ঠাক্ষেত্রে এমনি করে নিক্ষিপ্ত হতে হয় !" তা যতই বলো, যতই করো, নগরবধূ হয়েছ যখন তখন যে তোমার মূল্য দেবে, তাকে তো সেবা করতেই হবে ! জানো বিসাখে সেই থেকে আমার পঞ্চকল্যাণীর সাধ। তা তুমিও দেখছি অম্বপালীর মতোই তেজস্বী...' আরও অনেক কিছু বলছিল পুণ্যধর্বন। বলে যাচ্ছিল।

কিন্তু বিশাখার চৈতন্য তখন অস্পষ্ট হয়ে আসছে, সে ভাবছে এই লম্পট শ্রেষ্ঠিকুমার বালকের মতো দেখতে, বৃদ্ধের মতো কামলোলুপ—এরই জন্যে আমি তিষ্যর একান্ত প্রণয় নির্মমভাবে ফিরিয়ে দিয়েছি, উপেক্ষা করেছি রাজপুত্রবধূ হওয়ার আহ্বান... এর চেয়ে মন্দ কিছু কি হত সেখানে ! প্রণয়ের কথা ভেবেছিলাম... প্রণয় তো আকাশকুসুমের চেয়েও দুর্লভ দেখছি ! সংসার সেবা করব মনে করেছিলাম, কই, তাও তো আমার আয়ত্তের বাইরে থেকে যাচ্ছে ! হায়... এই ব্যক্তি হবে আমার সন্তানের পিতা ! ভাবতে ভাবতে সে কখন হারিয়ে গেছে। আর কেউ নেই। সুসজ্জিত কক্ষ তার সুবাসিত সাত স্তর শয্যা সহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে পুণ্যবর্ধনের মুখ, সে নিজেও হারিয়ে গেছে।

যখন চৈতন্য হল তখন অবিরত জল সিঞ্চনে তার মাথার চুল প্রায় সমস্ত ভিজে গেছে। বিশাখা কিছু জানে না। সে অবসন্নের মতো পাশ ফিরল। তার শ্বশ্রূর কণ্ঠ শুনতে পেল যেন, 'এমন মূর্ছা ওর মাঝে মাঝেই হয় নাকি ?'

ধনপালীর গলা, 'না তো দেবি, কোনওদিন এ প্রকার তো দেখিনি।'

'সত্য বলছ তো ?'

'সত্যই বলছি দেবি !'

'জানি নে বাপু, কী প্রকার সুহা এলো গেহে। একরাশি রূপ ! তো সে তো চিত্রগৃহে সাজিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখা যাবে না ! রমণী হবে জলের মতো, যখন যে পাত্রে, তখন তেমন।'

তিনি পুণ্যবর্ধনকে কিছু বলেছেন কি না বিশাখা জানে না, কিন্তু সেই থেকে পুণ্যবর্ধন আর রাত্রে এ শয়নকক্ষে আসছে না। পিতা, পুত্র যখন ভোজন করেন মধ্যাহ্নে সে উপস্থিত থাকে, পরিবেশন করে স্বহস্তে। তখন পুণ্যবর্ধন এক একবার চোখ তুলে কখনও কেমন সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে, কখনও আকুল চোখে, কখনও অপরাধীর মতো তাকায়। কিন্তু রাত্রে আর এ গৃহের দিকে পা বাড়ায় না।

বিশাখা কোনও দুর্লক্ষ্য দৈব-উপস্থিতির কথা মনে করে ঠিক অম্বপালীর মতোই উচ্চারণ করে, 'গত জন্মে কী মহাপাপ করেছিলাম হে তথাগত যে, পারিজাতকুসুমকে দুর্গন্ধ পঙ্কে এমন করে নিক্ষিপ্ত হতে হয় ! কত কাল ! সারা জীবন ?'

দুয়ারে উপর্যুপরি আঘাত। বিশাখা উঠে বসে। বেশ-বাস গুছিয়ে নিয়ে দ্বার খুলে দেয়। তার মূর্ছা হওয়ার পর শ্বশ্রূর আদেশ হয়েছিল ঘনিষ্ঠ দাসীরা যেন তার কক্ষে শোয়। প্রথম ক'দিন তাই হয়েছিল। ভিষক্ এসেছিলেন। তারপর সে তো এখন যথেষ্ট ভালো আছে। শ্বশ্রূ জানেন না, সে দাসীদের স্বতন্ত্র কক্ষে পাঠিয়ে দিয়েছে। দ্বারের বাইরে তার তিন ঘনিষ্ঠ সহচরী। ধনপালী, কহ্লা আর ময়ূরী। কহ্লা বলল— 'বিসাখাভদ্দা ঘোটকীটার প্রসববেদনা উঠেছে। কী করব !'

'আমি যাচ্ছি', বিশাখা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তোরা যথেষ্ট গরম জল ঈষদুষ্ণ তেল আর মধু নিয়ে আয়।'

আগে আগে উল্কা নিয়ে যাচ্ছে ময়ূরী। পেছনে পেছনে বিশাখা। গৃহের বাইরে প্রাঙ্গণ পার হয়ে অশ্বশালা। প্রথমেই গর্ভবতী অশ্বীটির জন্য স্বতন্ত্রিত স্থানে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েকজন অশ্বীটিকে প্রায় বহন করে সেখানে নিয়ে গেছে। অশ্বীটি ব্যথা পাচ্ছে। অশ্বরক্ষককে জিজ্ঞাসা করল বিশাখা, 'এত কষ্ট পাচ্ছে কেন, এ অশ্বীটি !'

অশ্বরক্ষক বলল, 'বন্য অশ্ব তো নয় দেবী। এইসব আজানেয় অশ্বীর একটু কষ্ট সহ্য করতেই হয়।'

বিশাখা অশ্বীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ধনপালী এবং আরও কয়েকজন মিলে গরম জল নিয়ে এসে পৌঁছল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি চমৎকার রজতকান্তি বৎস প্রসব করল অশ্বীটি। উভয়কে পরিচ্ছন্ন করে, প্রসবাগারে তাদের আরামের ব্যবস্থা করে, বৎসটিকে ভালো করে তৈল সংবাহন করে দিয়ে, মুখে মধু দিয়ে বিশাখা যখন গৃহে ফিরল, তখন রাত সামান্যই আছে। তবু সহচরীদের অনুরোধে সে আর একটু ঘুমিয়েও নিল।

AMARBOI.COM

ভোরবেলা অন্যান্য দিনের মতো স্নান প্রসাধন সমাপ্ত করে সে যখন দাসীদের সঙ্গে তার শ্বশুর এবং শ্বশ্রূর সেবা করতে গেল, দেখল তাঁদের মুখ যেন অন্যান্য দিনের চেয়েও গম্ভীর। সে বিধিমতো তাঁদের চরণ বন্দনা করল, পাকশাল থেকে নিজ হাতে সুগন্ধ, সুমিষ্ট যবাগু নিয়ে এলো তাঁদের প্রাতরাশের জন্য, তার স্বামীও এসে বসল। কিন্তু কেউই তাকে কোনও প্রশ্ন করলেন না। রাত্রে ঘুম হয়েছিল কি না, শরীর ভালো আছে কি না— এসব জিজ্ঞাসা করলেন না। পরে সে নিজগৃহে গেলে ধনপালী বলল, 'বিসাখাভদ্দা, কাল যখন আমরা দীপবর্তিকা নিয়ে অশ্বশালে গেলাম, তোমার শাস শ্বশুর ও বাড়ির বাতায়ন থেকে দেখছিলেন। বললেন, "ওই দ্যাখো, গৃহের অগ্নি বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।"

বিশাখা বলল, 'ভালো।' সে মনে মনে হাসল। কিন্তু কারও সঙ্গেই শ্বশুর-শ্বশ্রূ বা স্বামীর চরিত্র বা আচরণ নিয়ে আলোচনা করতে পিতা বারণ করে দিয়েছেন। তার নিজেরও এ প্রবৃত্তি নেই। যদিচ ধনপালী ক্রমশই তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। শুধু ধনপালীই বা কেন, এই ত্রয়ী—ধনপালী, কহ্লা ও ময়ূরী তাকে যা ভালোবাসে, শ্রাবস্তীতে আসার পর তারা যেভাবে তাকে আগলে রাখে, বিবেচনা ও বুদ্ধির পরিচয় দেয় তাতে বিশাখার এক এক সময় লজ্জা হয় যে, সে এখনও এদের সঙ্গে প্রকৃত সখীর মতো আচরণ করতে পারে না।

সে হঠাৎ ধনপালীকে জিজ্ঞাসা করল, 'পালি, তোর বিবাহ করতে ইচ্ছা হয় না !

ধনপালী লজ্জা পেয়ে বলল, 'এ কথা কেন বিসাখাভদ্দা ?'

'না, তুইও তো, তোরা সকলেই তো বিবাহযোগ্যা, আমার ইচ্ছা হয় তোরা সংসার করিস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনপালী বলল, 'একটা কথা বলব ভদ্দা !'

'একটা ছেড়ে দশটা বল না !'

'দাঁড়াও আগে তোমার চুল শুকোনোর ব্যবস্থা করি !'

ধনপালী বড় বড় পাত্রে মৃদু আগুন নিয়ে এসে তাতে সুগন্ধিচূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দ্বার বন্ধ করে দিল। বিশাখার চুলগুলো নেড়েচেড়ে শুকোতে শুকোতে বলল, 'কহ্না বড় উৎকণ্ঠিত রয়েছে।'

'কেন রে ?'

'এ গৃহের একটি দাস মিত্তবিন্দ ওকে বিবাহ করতে চায়।'

'মিত্তবিন্দ কোন জন ?'

'ওই যে প্রভুপুত্তের রথ চালায়।'

'ও, সূত ! তো কহ্না কী বলে ?'

'কহ্নারও সম্মতি আছে। কিন্তু...'

'কিন্তু কী ?'

'তুমি যদি ক্রুদ্ধ হও !'

'আমি ক্রুদ্ধ হবো কেন ?'

'যদি এ গেহের প্রভু অসন্তুষ্ট হন।'

'সে আমি বুঝব'খন। কহ্না যদি সম্মত থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই এ বিবাহ হবে। কহ্নাকে আমি মুক্তি দিয়ে দেবো।'

ধনপালী বলল, 'সেটাই তো কথা। কহ্না মুক্তি চায় না। বিসাখাভদ্দা, আমরা কেউই তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাই না।'

বিশাখা বুঝতে পারল ধনপালীর গলায় অশ্রুর আভাস। সে নম্রকণ্ঠে বলল, 'পালি, কেন মুক্তি চাস না ! ওই দ্যাখ পিঞ্জরে শুকটা বসে রয়েছে, পায়ে সোনার শেকল। ও যতই সুন্দর বুলি বলুক না কেন, দেখলেই আমার মনে হয় ওর শেকলটা কেটে দিই।'

'তুমি আমাদের ভালো না বাসতে পারো। আমরা তোমাকে এখন কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারব না।'

'কে বলে, আমি তোদের ভালবাসি না ? তোরা তা হলে মূর্খ, কিছুই জানিস না। কিন্তু এখন ছেড়ে যেতে পারবি না বলছিস কেন ?'

ধনপালী মুখ নিচু করে ধীরে ধীরে বিশাখার কেশের মধ্য দিয়ে আঙুল চালাতে লাগল।

'বল !'

'কী বলব ! সব কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে !'

বিশাখা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, পালি বল !'

ধনপালী বলল, অপরাধ নিও না ভদ্দা, কিন্তু এমন গেহে তোমার বিবাহ হবে, তা কি আমরা কখনও ভাবতে পেরেছি ? তোমার মতো সুহ্না পেয়েও এঁরা সুখী নন। দিবারাত্র প্রভু আর তাঁর পত্নী শলা-পরামর্শ করছেন। আর... আর... ভদ্দা... রাগ করো না... প্রভুপুত্ত আমাদের ডেকে ডেকে তোমার সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। পিতৃগৃহে তুমি কোন কোন আচার্যর কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেছ। এমন কি, এমন কি... ময়ূরীকে জিজ্ঞাসা করেন, ওখানে কারও সঙ্গে... কোনও দাসের সঙ্গেও যদি প্রণয় থেকে থাকে !'

বিশাখা ধনপালীর হাত থেকে কেশগুলি টেনে নিয়ে ঘুরে বসল, বলল, 'কী বললি ! সত্য বলছিস ?'

'সত্য বই মিথ্যা বলব কেন, ভদ্দা : কত চিন্তা করেছি, তোমাকে বলতে কত দ্বিধা করেছি, কিন্তু আজ কথায় কথায় বেরিয়ে গেল।' ধনপালীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

বিশাখা বলল, 'এতদিন গোপন রেখে ভালো করিসনি ধনপালি। এর পর থেকে কিছুই আমার কাছে গোপন করবি না। যদি আমার মঙ্গল চাস।'

'আমাদের মুক্তি দিয়ে দেবে না তো ভদ্দা !'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন পালি, মুক্ত হয়ে ইচ্ছা হলে ভৃতিকা হয়ে থাকবি। ক্রীতদাসীর যে পুত্র-কন্যা সবই প্রভুর সম্পত্তি হয়ে যায়। আজ না হয় আমি প্রভু, এর পর তো আমার পুত্র-কন্যারা প্রভু হবে। তারা যদি আমার মতো না হয়!'

ধনপালী কেঁদে ফেলে বলল, 'তোমার পিতার ঘরে দাস-পিতার মেয়ে হয়ে জন্মেছি। তোমার সকল সুখ-দুঃখে পাশে পাশে থেকেছি। আর কিছু জানিওনি, শিখিওনি। তোমাকে ছাড়া পৃথিবী আঁধার দেখি যে ভদ্দা! অন্যদের কথা একেবারে সঠিক হয়তো বলতে পারি না। কিন্তু আমাকে তুমি কোনদিন তোমার কাছ-ছাড়া করলে আমি মরে যাবো।'

শ্রাবন্তীশ্রেষ্ঠীর গৃহে দ্বিপ্রহরে নিমন্ত্রণ। ধনপালী চুল শুকোনো শেষ করে কহ্না ও ময়ূরীকে ডাকল, তিন জনে মিলে বিশাখাকে সাজিয়ে দিল। বিশাখা বেছে নিল শ্বেত বসন। তাতে সবুজ রঙের পট্টিকা বসানো, শুভ্র বক্ষবন্ধনী, শুভ্র উত্তরীয়। মুক্তার অলংকারে সর্বশ্বেত। তার ঘন ময়ূরপুচ্ছের মতো কেশ সে দিনের বেলায় খুলে রাখতে ভালোবাসে। কেশে ছোট ছোট পদ্মকুঁড়ির মালা জড়িয়ে দিল ময়ূরী। কহ্না ভ্রূমধ্যে রক্ত ও শ্বেতচন্দনের পত্রলেখা এঁকে দিল।

তিন সহচরীকে নিয়ে মিগার-পত্নীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল বিসাখা। গম্ভীর মুখে শ্বশ্রূ বললেন, 'মাথায় গুণ্ঠন তুলে দাও বিশাখা।'

বিশাখা বলল, 'মাতা, প্রাকৃত রমণীর ন্যায় আমার গুণ্ঠিত হতে বলছেন কেন। গুণ্ঠনের মূল কারণ সম্ভ্রম রক্ষা, কায় মন ও বাক্ যার সংযত তাকে তো সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অবগুণ্ঠিত হতে হয় না।'

মিগার পত্নী বললেন, 'তুমি বড় বেশি বিদ্যা শিখে ফেলেছ, আমি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড় বলো তো? আমার মুখের ওপর কথা বলছ!'

বিশাখা নীরব রইল। কিন্তু অবগুণ্ঠন দিল না।

তার শ্বশ্রূ বললেন, 'কী হল, ধনীকন্যা বলে কি পূজনীয় বয়োজ্যেষ্ঠদের কথাও শুনবে না?'

বিশাখা বলল, 'বয়োজ্যেষ্ঠদের পূজা নিশ্চয় করব, সেবাও করব। কিন্তু তাঁরা যুক্তিসিদ্ধ বাক্ না বললে মানতে পারব না। অবগুণ্ঠন দিলে স্বীকার করে নেওয়া হয় আমার কায়সংযম নেই। অথচ আমি ভিক্ষুণীর মতো সংকচ্ছিকা ব্যবহার করি, উত্তরীয় দ্বারা উত্তমরূপে অঙ্গ আবৃত করে বেরোই। আর মাতা, আমার এসব আচরণের সঙ্গে ধনের কোনও সম্পর্ক নেই। ধনীকন্যা বলে নয়, বিসাখা বলেই আমি এমন করে থাকি।'

কিছুক্ষণ বাক্যহীন হয়ে রইলেন মিগার-পত্নী। ভেতরে-ভেতরে ক্রুদ্ধ। কিন্তু এ কথা সত্যি, অবগুণ্ঠন দেওয়ার কোনও বাধ্য-বাধকতা নেই। শেষে তিনি বললেন, 'তুমি জনপদকল্যাণী বধূ। তোমার রূপ দেখে যদি কেউ লুব্ধ হয়! হরণ করতে আসে!'

বিশাখা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সাবত্থিতে এমন ঘটনা হয় নাকি? কই আমাদের সাকেতে তো হয় না মা! তবু যখন কুমারী ছিলাম, কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হত চলাফেরার ব্যাপারে, কিন্তু এখন তো বধূ হয়ে গেছি! কে এমন লম্পট আছে যে, প্রকাশ্য রাজপথে বধূর প্রতি লুব্ধতা প্রকাশ করবার পরেও নিজেকে নাগরিক বলবে? মা, আপনি ভয় করবেন না, আমার সহচরীরা তো রইলই, তারা না পারলেও বিসাখা একাই দশজন পুরুষকে ভূলুণ্ঠিত করে দিতে পারে।'

সে শ্বশ্রূ-মাতার পদধূলি নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে শিবিকায় গিয়ে উঠল। হুম হুম করতে করতে শিবিকাটি চলে গেলে মিগার-পত্নী কপাল চাপড়ে স্বামীকে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠালেন।

'এ কি বধূ না দস্যু? কারও কথা শুনবে না, মানবে না, বলে কি না দশজন পুরুষকে ভূলুণ্ঠিত করে দিতে পারে!'

অসময়ে অন্তঃপুরে এসে পত্নীর এই খেদোক্তি শুনে মিগার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'কী ব্যাপার?' বারে বারে জিজ্ঞেস করেও উত্তর পান না। অবশেষে রাগ করে আবার ফিরে যাচ্ছেন, তখন পত্নী সব খুলে বললেন। শুনে মিগার বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর সুহ্নাটি রূপে ধনে বলবতী। সে যদি বলে থাকে দৈহিক বলও তার আছে, তো নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেনি। ক্ষত্রিয়দের ঘরের কন্যারা শরীর-চর্চা শস্ত্র-চর্চা করে বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠীদের ঘরে?... নাঃ ততটা চল নেই। কিন্তু কে নিজের প্রাসাদ-প্রাচীরের আড়ালে কীভাবে কন্যাপালন করছে কে জানে! সন্দেহ নেই তিনি উচ্চতর বংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে বধূ এনেছেন। সে এখানে অবলীলায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছে। তাঁরাই— তিনি, তাঁর পত্নী, কে জানে হয়ত বা পুত্রও বরং মানাতে পারছেন না। তবে হ্যাঁ, তাঁর হাতে এখনও অস্ত্র আছে বইকি! কন্যার প্রতি ধনঞ্জয়ের উপদেশগুলি স্মরণ করে তিনি মনে মনে বেশ হৃষ্ট হয়ে ওঠেন। ধনঞ্জয় ও তাঁর কন্যা উভয়কেই দমন করার উপায় তাঁর জানা আছে। পত্নীকে সেগুলি খুলে বলেন। পত্নী একটু আশ্বস্ত হন।

ওদিকে বিশাখার শিবিকা শ্রাবস্তী শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরে গিয়ে পৌঁছলো। গৃহের যে যেখানে আছে সবাই বরণ করে নিতে এলো বধূকে। শ্রেষ্ঠী স্বয়ং রাজসভায় যাবার আগে তাকে আশীর্বাদ করে গেলেন। শ্রেষ্ঠী-পত্নী মহাসমাদরে তাকে সম্ভাষণ করলেন। নিজেদের গৃহ, উদ্যান সব দেখালেন। এবং বিশাখার শ্রেষ্ঠ লাভ হল— সে-গৃহের বধূ সুপ্পিয়ার সঙ্গে সখিত্ব। সুপ্রিয়ার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। কিন্তু তবু কোথায় যেন গভীরতর এক সাদৃশ্যের বন্ধন!

শ্রেষ্ঠী-পত্নী তাকে বহুবিধ পদ সহকারে ভোজনে আপ্যায়িত করলেন। পরে বললেন, 'বধূ বিসাখা, তুমি সাবত্থির হৃদয়-লক্ষ্মী। আমাদের সবাইকে তোমার রূপে-গুণে বশীভূত করে ফেলেছ। কিন্তু তোমার আপন ঘরের মানুষগুলিকে জয় করতে পেরেছ তো?'

বিশাখা সদানন্দময়ী। সে স্মিতমুখে বলল, 'মাতঃ, আপনাদের তো আর নিত্য বিসাখার সঙ্গে বাস করতে হয় না, আপনাদের জয় করা সহজ।'

সুপ্রিয়া হাসতে হাসতে বলল, 'দেখেছেন মা, বিসাখা মিথ্যা বলে না, কিন্তু নিন্দাবাদেও তাকে সহজে প্রবৃত্ত করা যাবে না।'

সুপ্রিয়ার শাশুড়ি বললেন, 'আমরা তো মিগার-পত্নীকে চিনি, নানান সমাজ-উৎসবে দেখাশোনা হয়, আমাদের গহপতিও মিগার-সেটঠিকে ভালোই চেনেন তো। বড় কৃপণ। ব্যয়েও কৃপণ, আচরণেও কৃপণ। কত পুণ্য না জানি করে এসেছিলেন, তাই ওঁরা তোমার মতো সুহ্না পেয়েছেন।'

সুপ্রিয়া মৃদু হেসে বলল, 'আর আপনারা বুঝি পুণ্য অল্প করেছিলেন মা, তাই সুপ্পিয়ার মতো সুহ্না পেয়েছেন?'

বিশাখা তার কথা শুনে হাসতে লাগল। বলল, 'এখন কী উত্তর দেবেন মাতা, দিন। সুপ্রিয়া প্রকৃতই দুঃখ পেয়েছে। দেখুন ওর চোখদুটি কেমন ছলছল করছে!'

সুপ্রিয়ার শাশুড়ি অমনি তাকে কাছে টেনে আদর করে বললেন, 'আমরা যে অনেক পুণ্য করে সুপ্পিয়াকে পেয়েছি তাতে কি আর সংশয় আছে! আমি বলছিলাম মিগার সেটঠির ঘরের কথা। ওঁরা কেউ অত পুণ্য করেছেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না বচ্চে।'

সারাক্ষণই সুপ্রিয়া তার শাশুড়ির বক্ষলগ্ন হয়ে কটাক্ষে বিশাখার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল। তাদের কৌতুক শাশুড়ি-মা ধরতে পারেননি।

এর পর বিশ্রামের জন্য সুপ্রিয়া বিশাখাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ফুল দিয়ে সাজানো প্রেঙ্খায় বসে দুলতে দুলতে দুই সখী বহু বিষয়ে আলাপ করল। শ্রাবস্তীর রীতি-নীতি, রাজা প্রসেনজিৎ, জেতবন বিহার প্রস্তুত হচ্ছে, তার কথা। বিশাখার মতে, সাকেত অনেক সুন্দর, রুচিসম্মত। সুপ্রিয়া বারাণসীর মেয়ে। সে বলল, 'প্রথম প্রথম আমারও ওই প্রকার মনে হত বিসাখা, কিন্তু এই সাবত্থি মহানগরীর আকর্ষণ এক মহা-আকর্ষণ। ধীরে ধীরে দেখবে সাবত্থিই তোমার আপন, তোমার ধ্যান হয়ে উঠছে।'

বিশাখা কখনও বারাণসী যায়নি। কিন্তু পিতার কাছে শুনেছে সে এক মহা হট্টরোলের স্থান। সে মনে মনে বলল— সাকেত, সাকেত, তার অঞ্জনবন, তার সরযূতীর, তার সেট্‌ঠি-গেহ নিয়ে অনন্য। এখন তার কাছে ভদ্দিয়র স্মৃতি ম্লান হয়ে গেছে, জাগরূক রয়েছে ধনঞ্জয়-সুমনার নির্মিত সাকেত। এ সব কথা সে এক্ষুনি সুপ্রিয়াকে বলল না। পরে এক সময়ে বলবে। এখন মাতা-পিতার কথা মনে করে তার চোখে জল আসছে।

গৃহে ফিরতে বিশাখার সন্ধ্যা হয়ে গেল। সুপ্রিয়ার শ্বশ্রূ-মা শিবিকার সঙ্গে সাতটি উল্কা দিয়ে দিলেন। সারি সারি আলোর মধ্যে দিয়ে গৃহে ফিরে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সংবাদ নিল বিশাখা। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজ কক্ষে বেশবাস পরিবর্তন করতে গেল। ধনপালী বলল, 'ভদ্দা, তুমি যখন হাতে উল্কা নিয়ে গেহে ঢুকছিলে ও বাড়ির অলিন্দ থেকে তোমার শ্বশ্রূ-মা দেখছিলেন।' অতঃপর ওঁরা উভয়েই নেমে এলেন। গহপতি বললেন, 'বাইরের অগ্নিও তো ঘরে নিয়ে এলো দেখছি!'

বিশাখা হেসে বলল, 'ভালো।'

তারপর একদিন মিগার ও তাঁর পত্নী বিশাখাকে ডেকে বললেন, 'আমরা তোমাদের নতুন বাড়িতে অগ্নিগৃহ করে দিচ্ছি। তুমি পিতৃগৃহ থেকে এত দাস-দাসী, রক্ষী, সূত, শিবিকাবাহক, আজ্ঞাপালক, ধনরত্ন, গাভী, অশ্বাদি নিয়ে এসেছ যে, সে সব দিয়ে একটা স্বতন্ত্র গ্রামই করে ফেলা যায় ইচ্ছা হলে। আমাদের অধীনে তোমাদের থাকবার প্রয়োজন কী? অগ্নিগৃহ হোক। অগ্নিহোত্র পালন করে দু'জনে যথাযথ দম্পতি হও। গার্হস্থ্যধর্ম পালন করো।'

বিশাখা বলল 'পিতা, আমি তো অগ্নিহোত্র পালন করতে পারব না!'

মিগার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সে আবার কী! যে কোনও গৃহস্থেরই কর্তব্য অগ্নিহোত্র পালন করা। গার্হপত্য অগ্নি দিয়ে গার্হস্থ্যকর্ম করবে, আহবনীয় অগ্নিতে দেবতাদের হব্য দেবে, দক্ষিণাগ্নিতে হব্য দেবে পিতৃপুরুষকে। তোমার পিতৃগৃহে দেখোনি?'

শেষের প্রশ্নটি অগ্রাহ্য করল বিশাখা, তাদের গৃহে অগ্নিহোত্র পালন করা হয়। কিন্তু বিশ্বাস করা হয় না। শুধু লোকাচার। এক প্রকার বিশ্বাস করা হবে, আর এক প্রকার হবে আচার— এ বৈষম্য তার অভিপ্রেত নয়। সে বলল, 'জানি পিতা। কিন্তু অগ্নি যে কোনও দেবতা নয়, বস্তুমাত্র, প্রাকৃতিক শক্তিমাত্র—এ কথা তথাগত বুদ্ধ প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি আর অগ্নি পরিচর্যা করব না। যা বিশ্বাস করি না তার আচরণও করতে পারি না পিতা।'

'বলো কী? বুদ্ধ বুদ্ধ সাবত্থিতে তো রাতদিন শুনছি। বুদ্ধ হয়েছেন! অতই সহজ! তো সেই বুদ্ধ সাকেতকেও ভেদ করেছে নাকি?'

বিশাখা শ্বশুরের এইসব উক্তির উত্তর দিল না। শুধু বলল, 'তা ছাড়া, আপনি আর মাতা আমার পরমপূজ্য। এই গৃহের সব কিছুই আমার পরিচর্যার অপেক্ষা রাখে। এই পূজা ও কর্তব্য থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন কোন অপরাধে?

তখন মিগার কুটিল চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন! তোমার পিতা তোমাকে সুখাসনে বসতে, সুখে ভোজন করতে, সুখে শয়ন করতে উপদেশ দিয়েছেন না?'

বিশাখা মনে মনে হাসল, ইনি তার পিতার উপদেশের মর্ম বুঝতে পারেননি। মুখে বলল, 'তাই-ই তো বলছি পিতা— আপনাদের সেবা না করে তো আমি অশনে-বসনে-শয়নে সুখ পাবো না!'

পুত্রবধূর বিনয়বচনে সুখী হতে পারলেন না মিগার। এ বালিকার মুখের দিকে তাকালে মুগ্ধ হতে হয়, বচন শুনলে সম্ভ্রম জাগে, আচার-আচরণে একটা অনায়াস কর্তৃত্ব। এ তো দেখি সত্যসত্যই মিগার-গৃহের সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠছে! মিগার-দম্পতি আর কী করেন! তখনকার মতো নিবৃত্ত হতেই হল। এবার বধূকে পরিপূর্ণ গৃহধর্মে গ্রহণ করতেই হয়। তিনি তাঁর গুরু নিগ্‌গণ্ঠ নাতপুত্তকে সংবাদ পাঠালেন। উৎসবের আয়োজন করতে হবে। নববধূকে তাঁরা আশীর্বাদ করবেন।

ইতিমধ্যে হিমঋতু এসে গেছে। মিগারের কর্মান্ত গ্রাম থেকে সংবাদ আসে শস্যক্ষেত্রগুলো এবার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ উৎপাদন করেছে। গাভীগুলো যা দুধ দিচ্ছে তাতে নবনীত এবং ঘৃত হচ্ছে অপরিমিত। সারা বর্ষা অবন্তীর কতকগুলি গ্রামে ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্ত করে মধুরা, ইন্দ্রপ্রস্থে বাণিজ্য করে কাশ্মীরের দিকে চলে গেছে তাঁর বণিকদল। সার্থবাহ দ্রুতগামী এক অশ্বারোহীর হাতে পত্র পাঠিয়েছে। বর্ষা কেটে গেল, তবু ফিরল না দেখে মিগার হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, এরা নিশ্চয়ই দস্যুর হাতে বিনষ্ট হয়েছে। গেছে পাঁচ শো শকট। তার মধ্যে তিন শো শকটই তাঁর। সঙ্গে আপনজনের মধ্যে গেছে তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র। সার্থবাহ শ্রাবস্তীরই অতি দক্ষ লোক। শ্রাবস্তীর সমস্ত শ্রেণীজ্যেষ্ঠক সে যাচ্ছে জানলেই নিজেদের পণ্য চোখ বুজে দিয়ে দেয়। কিন্তু মিগারের ভয় ছিল। তাঁর সব সময়েই ভয় হয়, সংশয় হয়, দ্বিধা হয়। এই ভ্রাতুষ্পুত্র দুটিকে গ্রামের গৃহ থেকে এনে কাজ-কর্ম সব বোঝাচ্ছেন। নিজের পুত্রটি তো তার মায়ের চোখের মণি, তাকে মায়ের অঞ্চলচ্যুত করে কাজে পাঠানো অতি দুরূহ ব্যাপার। সে-ও আছে ভালো। আজ কাব্যসভা, কাল বিতর্কসভা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর দিবস নৃত্যসভা, তারও পরদিন গীতসভা। গণিকা গৃহে যে শুধু চারুকলা চর্চা হয় না তিনি ভালো করেই জানেন। অল্প বয়সে নিজেও বহুবার গিয়েছেন। ধনক্ষয়ের এমন ব্যবস্থা তাঁর আর জানা নেই। অথচ পুণ্যবর্ধন দু-তিন দিন পর বাড়ি ফিরলে তিনি যদি অসন্তোষ প্রকাশ করতেন, সে বলত, "ও সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার পিতা, আপনি কী বুঝবেন ? বাস তো করেন স্বর্ণপিণ্ডের স্থূল জগতে !" তার মা-ও এতে যোগ দিতেন। পুত্রকে তক্ষশিলায় না পাঠিয়ে যে কী ভুল করেছেন।

যা-ই হোক, সার্থবাহর পত্র নিয়ে দূত এসেছে। আশাতীত লাভ হওয়ায় তারা কাশ্মীর গেছে। নূতন পণ্য নিয়ে ফিরতে ফিরতে হয়ত আরও ছয় মাস কাটবে। কিন্তু মিগার যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। দূতের সঙ্গে স্থবিকা-ভর্তি স্বর্ণও পাঠিয়েছে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।

মিগারের গণক ও লেখকরা এক বাক্যে বলছে— এসব নববধূর ভাগ্যে ঘটছে। সত্যি, রাজা প্রসেনজিৎ পর্যন্ত যে- কোনও উপলক্ষে বধূর নাম করে মহার্ঘ উপহার পাঠান। বধূর উপোসথ ? রাজবাড়ি থেকে ভারে ভারে ফল, ক্ষীর, মিষ্টান্ন, ক্ষৌমবস্ত্র, তৈজস সব এসে পৌঁছল। রানি মল্লিকার পুরে নিমন্ত্রিত হয়ে গেল বধূ। স্বর্ণদণ্ডী নিজের শিবিকায় করে নিয়ে গেলেন রানি। এক গা গহনা তো দিলেনই, শিবিকাটিও রানি বিশাখাকে দিয়ে দিলেন। গহনা, শিবিকা সমস্ত আবার বিশাখা এসে তার শ্বশ্রূকে অর্পণ করল। কাজেই, মিগার-গৃহ এখন এমন একটি কলস যার দুগ্ধ কখনও ফুরোয় না, এমন মোদকের পাত্র যা থেকে যত মোদক নেবে, ততই তা আরও পূর্ণ হয়ে উঠবে। অন্যান্য শ্রেষ্ঠীরা, এমন কি অন্যান্য লোক যেমন সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা রাজ পরিবারের মানুষও বলতে আরম্ভ করেছে— বিশাখা সুভগা বধূ। সে আসার দিন থেকেই শ্রাবস্তীর সর্ববিধ শ্রেণীতে সমৃদ্ধি আসছে। এখন শ্রাবস্তীর যে-কোনও গৃহের, যে-কোনও উৎসবে বা সংস্কারে বিশাখাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও গর্ভিনীর পুংসবন হবে বিশাখা যাবে, কার পুত্রের নামকরণ কি উপনয়ন উৎসব হচ্ছে গুরুগৃহে যাবার জন্য, বিশাখা যাচ্ছে। কে বিশেষ তিথি উপলক্ষে উপোসথ পালন করবে বিসাখাকে চাই, একত্রে ধর্মচর্চা করবে। বিসাখার সদা-হাস্যমুখী, সহমর্মী উপস্থিতি ছাড়া কোনও কাজ যেন আরম্ভই হতে পারে না।

নতুন শালিধানের সরু চাল কর্মান্ত গ্রাম থেকে বহু বহুতর শকটে করে এসে পৌঁছল। সেই সঙ্গে তৈল, ঘৃত, নবনী, শাক, পর্ণ, গুড়, তিল, কী নয় ! মিগার-পত্নী ডাক দিলেন 'বিসাখা !' ডাকবার আগেই বিশাখা এসে গেছে। মিগারের ঘরের দাস-দাসীগুলি তো রইলই, আরও রইল বিশাখার দাসীরা। সব ভাণ্ডারজাত করতে হবে। সারা বৎসরের ব্যবস্থা। ঝাড়া, বাছা, ধোওয়া, শুকোনো, সব বিশাখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করালো। সারা দিন পরিশ্রমে বিশাখার মুখ যেন আরক্ত কমলের মতো দেখাচ্ছে। শ্বশ্রূ-মা আজ তার ওপর সত্যিই সন্তুষ্ট। তাঁর সন্তোষের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সে দেখল পুণ্যবর্ধন সাজ-সজ্জা করে বসে আছে। তার কণ্ঠে স্বর্ণহার, বাহুতে অঙ্গদ, কানে কুণ্ডল।

বিশাখাকে দেখেই সে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে উঠল, 'এসো এসো প্রিয়ে, বসো, বসো।'

বিশাখা তাকে অভিবাদন করে অদূরে একটি ভদ্রপীঠে বসল।

পুণ্যবর্ধন বলল, 'এত দিন বিরহে বড়ই কষ্ট পেয়েছ প্রিয়ে, আমায় ক্ষমা করো। কাজে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম।'

বিশাখা মৃদু হেসে বলল, 'সারা রাতই আপনি কাজ করেন ? অমন করলে শরীর নষ্ট হয়ে যাবে যে !'

'কৌতুক করছ ?' পুণ্যবর্ধন হেসে উঠল। সে রসিক। তা ছাড়া আজ এতদিন পর বিশাখার কক্ষে আসার অনুমতি পাওয়ায় তার মনটা অত্যন্ত স্ফূর্তিতে আছে।

বিশাখা বলল, 'আর একটা প্রশ্ন করব, সেটাকে যেন কৌতুক বলে নেবেন না।'

'করো, করো। আজ তোমাকে শত প্রশ্ন করার বর দিলাম। সব প্রশ্নের যথাযথ সুসঙ্গত উত্তর পাবে।' দু' হাত প্রসারিত করে বর দান করল পুণ্যবর্ধন।

'শত প্রশ্ন নয়। একটাই প্রশ্ন আছে। আমার কোন দাসীটি আপনার সবচেয়ে মনঃপূত ?'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দাসী তো তোমার সবগুলিই চমৎকার !'

'তবু, তার মধ্যে ?'

'কেন বিসাখা ! হঠাৎ এ প্রসঙ্গ !'

'আপনি আমার দাসীদের মধ্যে একজনকে শয়নসঙ্গিনী বেছে নিন। অবশ্য তারও সম্মতি চাই। যে সম্মত হবে তাকে পাবেন, অন্যদের না।'

পুণ্যবর্ধনকে যেন কেউ কশাঘাত করেছে। সে বলল, 'কী বলছ বিসাখা ! আমি দাসী নিয়ে কি উপপত্নী নিয়ে রাত্রিযাপন করবো, আর তুমি ?'

'এই গৃহে আরও কক্ষ আছে। সমান সুখদ ও মনোহর, আমি সেইখানে শয়ন করবো।'

'কেন ?'

'অনেক কুলপুত্রই তো দাসীদের সঙ্গে ব্যভিচার করে থাকেন, কেউ তো দোষ দেয় না ! এমন কি দাসীরাও তো সম্পত্তিই ! তাদের ব্যবহার করলে, তা তো ব্যভিচার বলেও গণ্য হয় না দেখি। আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ?'

গর্বিত কণ্ঠে পুণ্যবর্ধন বলল, 'তা যদি বলো, আমার রুচি অতি সূক্ষ্ম বিসাখা, তুমি জানো না তাই বলছ। এ গৃহে তুমি আসবার পূর্বেও যৌবনবতী দাসী ছিল। আমি কোনওদিন তাদের শয্যায় ডাকবার কথা চিন্তাও করিনি। মূর্খ, নীচ ওই সব স্ত্রীলোক হবে পুণ্যবর্ধনের শয্যাসঙ্গিনী !'

'তবু আপনাকে এখন বিসাখার পরিবর্তে বিসাখার দাসীতেই তুষ্ট হতে হবে। কারণ বিসাখা দাসের সঙ্গে প্রণয় করতে পারে এ কল্পনা যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, তা হলে সুমনাপুত্রী আপনাকে দাসীভোগ্য ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না।'

'ও হো, আমি তোমার সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলাম বলে ক্রুদ্ধ হয়েছ ?'

পুণ্যবর্ধন তার কুন্দশুভ্র দাঁতের পঙ্‌ক্তি বার করে, তার সুকুমার ওষ্ঠাধর বিস্তৃত করে হাসতে লাগল, 'সে দেখো বিসাখা, তুমি নববধূ, কুমারী কন্যা, অথচ আমার প্রতি তোমার কোনও আকর্ষণ দেখছি না, আমার মনে সংশয় হবে না ! তার পরে দেখো, নারীরা স্বভাবতই কামপরায়ণ। পণ্ডিতেরা বলেন স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করবে না। সেই কৃষ্ণা নামের রমণীর গল্প জানো না ? যার পাঁচ পাঁচটি রূপবান, গুণবান, বীর্যবান পতি ছিল, তবু সে এক কুব্জ পরিচারকের প্রণয়াসক্ত হয়ে, তার অনুগত হয়ে পতিদের প্রবঞ্চনা করত। রমণীরা সুযোগ পেলেই স্বামীর সখা, সূত, দাস, এমন কি ভ্রাতা বা পিতার সঙ্গেও...'

বিশাখা গম্ভীর গলায় বলল, 'স্তব্ধ হোন। আর একটিও ইতরবাক্য উচ্চারণ করলে তার ফল ভালো হবে না।'

পুণ্যবর্ধন বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা না-ই বললাম।' কিন্তু তার মুখ এবার অপ্রসন্ন।

'নারীদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা যে পোষণ করে সে আমার দাসীদেরও যোগ্য নয়', বলে বিশাখা কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হল।

পুণ্যবর্ধন এক লাফে উঠে এসে তার হাত শক্ত করে ধরল, কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'এত সাহস তোমার যে, সামান্য নারী হয়ে স্বামীকে, প্রভুকে উপেক্ষা করো ! গালি দাও !' বলতে বলতে সে বিশাখার মৃণালের মতো সুগোল কমনীয় মণিবন্ধটিতে মোচড় দিতে লাগল।

বিশাখা সামান্য একটা হাত ঝাড়ার মতো ভঙ্গি করতেই পুণ্যবর্ধন ছিটকে পড়ে গেল শয্যার ওপরে। তার নিম্নাঙ্গ পালংক থেকে ঝুলছে। বিশাখা অটল মহিমায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'সামান্য নারী বিসাখা নয়। কিন্তু তুমি অতি অধমেরও অধম পুরুষ। তোমার লজ্জা নেই তাই অগণিত গণিকাগৃহে গিয়ে গিয়ে নিজের কৌমার নষ্ট করেছ। অন্যান্য সঙ্গীদেরও তাই করতে দেখেছ। তারও পরে তোমার নারী-নিন্দা করবার সাহস হয় ! প্রভু ! স্বামী ! এ পৃথিবীতে বিসাখার প্রভু কেউ নেই। আর বিবাহিত স্বামী বলে যদি নিজেকে বিসাখার প্রভু বলতে চাও, বলতে পারো। কিন্তু বিসাখা কোনওদিন তোমার মতো হীন ব্যক্তিকে প্রকৃত স্বামী বলে স্বীকার করবে না।'

বিশাখার উত্তেজিত বাচনে, তার বক্তব্যে, তার কথার বাঁধুনিতে এবং ক্রোধে যত না বিস্মিত হয়েছিল, তার চেয়েও অনেক বিস্মিত হয়েছিল পুণ্যবর্ধন তাকে ওভাবে এক ধাক্কায় শয্যায় ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ায়। সে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি নারীবেশী পুরুষ ? কোনও ঋদ্ধিমান জাদুকর ? কে তুমি ?'

বিশাখা তপ্তকণ্ঠে বলল, 'সেদিন শ্বশ্রূ-মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোনও দুর্বৃত্ত তোমাকে আক্রমণ করলে কী করবে ? আমি তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলাম এই বলে যে, দশজন পুরুষকে ধরাশায়ী করাও আমার কাছে কিছু না। তখন ভাবিনি আমার বিবাহিত পুরুষই হবে প্রথমতম দুর্বৃত্ত, যাকে আমায় ধরাশায়ী করতে হবে। শোনো পুণ্যবর্ধন, ঋদ্ধিও নয়, জাদুবিদ্যাও নয়, আমার পিতা-মাতা আমাকে মল্লবিদ্যা, শরসন্ধান, ভারোত্তোলন সব শিখিয়েছেন। তা তোমারই ওপর প্রথম প্রয়োগ করতে হল। ধিক, ধিক তোমাকে। বিসাখা নারী কি পুরুষ, কি ছদ্মবেশী দেবতা জল্পনা করতে থাকো, আমি এখন চললাম।'

হতবুদ্ধি পুণ্যবর্ধনকে শয্যার ওপর উপবিষ্ট রেখে, কক্ষ ত্যাগ করল বিশাখা। ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মতো নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে নিজের প্রসাধনগৃহে ঢুকল। ধনপালী কিছু অবশিষ্ট কাজ সারছিল। সে দেখল তার স্বামিনীর মুখ একেবারে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। যেন কিংশুক ফুটেছে একগুচ্ছ। চোখ দুটি অঙ্গারখণ্ডের মতো জ্বলছে। তার পদক্ষেপ অতি দৃঢ় এবং সশব্দ। সে যেন স্বয়ং দক্ষিণাগ্নি মূর্তি ধরেছে। কিংবা যক্ষী, কালপুরুষী, ঠিকমতো হব্য না দেওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

ধনপালী ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ছুটে এলো, 'ভদ্দা, বিসাখাভদ্দা, কী হয়েছে ?'

বিশাখা ততক্ষণে প্রসাধন ঘরের পর্যঙ্কিকায় শুয়ে পড়েছে। সে বলল, 'কস্তুরী-গন্ধ জল নিয়ে আয় পালি, আমার সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দে। দেহ যে জ্বলে যায়, মন জ্বলে যায়। ধূপ জ্বালা, বড় দুর্গন্ধ। বাতায়নগুলো খুলে দে না। না, বন্ধ করে দে, বন্ধ কর। এখানে কি কাছাকাছি কোথাও মলক্ষেত্র আছে ? হায় পালি, পিতা কই আমার ? পিতা! মা! মাতা কোথায় গেলেন ? আমায় আমার মাতার কোলে, পিতার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে আয়। আর তা যদি সম্ভব না হয় তো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড কর, বারাণসী-বর্ধকিদের এই শিল্পকীর্তি ভেঙেচুরে যজ্ঞের আয়োজন কর, মহাযজ্ঞ। আহুতি দে, আহুতি দে বিসাখাকে। কে, কোথায় কোন দেবতা আছেন জানি না, বিসাখা-মাংস আহুতি দিয়ে তুষ্ট কর, তুষ্ট কর সেই নিষ্ঠুরকে...' বলতে বলতে শয্যার ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল বিশাখা, যেন সত্যিই তার সারা শরীরে আগুন লেগে গেছে।

ধনপালী ততক্ষণে দ্রুত হাতে কস্তুরী-জল নিয়ে এসেছে। ছুটে ছুটে খুলে দিয়েছে সব গবাক্ষ। ঘণ্টা বাজিয়ে ডেকেছে কহ্না ও ময়ূরীকে। দুয়ার বন্ধ করে তিনজনে মিলে যা যা কৌশল জানে সমস্ত প্রয়োগ করে শান্ত করবার চেষ্টা করছে বিশাখাকে। দেবী সুমনা বলে দিয়েছিলেন, "বিবাহের পর গোড়ায় গোড়ায় অনেক সময়ে শয়ন-কলহ হয়। তোমরা বিসাখার প্রতি দৃষ্টি রেখো। সে বড় তেজস্বী কন্যা।" কিন্তু এখন বিশাখাভদ্রার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এ শুধু শয়ন-কলহ নয়। তাদের প্রভুকন্যা তেজস্বী হলেও চিরদিন সংযত, আত্মস্থ। আজ যেন সে নিজের ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ পর যখন বিশাখা অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে এসেছে, বারবার সুবাসিত স্নিগ্ধ জল দিয়ে তার শরীর মোছা হয়েছে, হাতে-পায়ে গণ্ডে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে, ময়ূরপাখার বীজনী দিয়ে বাতাস করা হয়েছে সমানে, সে তার অশ্রুমুখী তিন দাসীর দিকে চেয়ে তর্জনী তুলে বলল, 'ময়ুরি, কহ্না, পালি, আজ থেকে তোরা আমার সই, কেউ যেন তোদের দাসী না বলে।'

ময়ূরী তার পায়ের ওপর মাথা রেখে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমরা তোমার সেবা করতেই যে চাই ভদ্দা! তোমাকে সাজিয়ে দেবো, তোমার শুশ্রূষা করবো, তোমার আজ্ঞা পালন করব— এতেই আমাদের সুখ। এর অধিক সুখ, সত্যি বলছি, আমাদের আর কিছুতেই নেই।'

বিশাখা উপুড় হয়ে শুয়ে তার অশ্রুজল গোপন করল। নিতান্ত সাধারণ স্বামিনীর মতো সে এই সুন্দর মেয়েগুলিকে পুণ্যবর্ধনের দিকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, নিজে বাঁচবার জন্যে। ধিক, ধিক তাকে। সে বাষ্পভরা গলায় বলল, 'তোরা যেভাবে থেকে আনন্দ পাস পালি, সে ভাবেই থাক। কিন্তু জেনে রাখিস তোদের শেকল কেটে দিয়েছি। তোদের পিঞ্জর খুলে রেখেছি। ধনশালী পিতার কন্যা বলে যে আকাশে উড়তে শিখেছি সেই আকাশে তোদের ওড়াবো। উড়তে শেখাবো। দাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা আর কখনও উচ্চারণ করবি না।’

ধীরে ধীরে বিশাখার চোখ বুজে আসে। কহ্না তার পা সংবাহন করছে। ধনপালী তার মাথাটি কোলে নিয়ে বসে ধীরে ধীরে নতুন করে চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে দিচ্ছে। ময়ূরী সারা শরীরে তার কোমল আঙুলগুলি বোলাচ্ছে। বিশাখা ঘুমোচ্ছে বুঝতে পেরে তারা এক সময়ে ধীরে ধীরে নেমে যায়, কাষ্ঠকুট্টিমের নানান স্থানে নিজেদের শয্যা পেতে শুয়ে পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে। এ ওকে পাশ ফিরিয়ে দেয়, ও এর বুকের ওপর থেকে হাত নামিয়ে রাখে। সাবধান। নাসিকা গর্জনে আবার ভদ্দার ঘুম ভেঙে না যায়!

বিশাখা ঘুমোয় অথচ ঘুমোয় না। তার ভেতরে, অন্তরের অন্তস্তলে কোথাও সে যেন জেগে থাকে। দেখতে থাকে কৃষ্ণবর্ণ আকাশ, দীপ্যমান নক্ষত্র সব। এই জ্যোতিষ্কগুলির অনেকেই নাকি মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। সত্য? এ কথা সত্য? তা হলে কর্মফল কী? মানুষের জীবন নক্ষত্রসকলের নিয়ন্ত্রণে? না কর্মফলচক্রের নিয়ন্ত্রণে? ওই আকাশের আচ্ছাদনটি খুলে ফেললে কি ওপারে স্বর্গলোক দেখা যাবে? সেখানে দেবতারা বিচরণ করেন? কে এই দেবতারা? এঁরাও তো ক্ষমতাশালী? এঁরাও তো মানুষের ওপর ক্রোধ, দ্বেষ, প্রীতি দেখান। অগ্নি, বায়ু, এগুলি জড় প্রাকৃতিক শক্তি, তথাগত বলেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র? সোম? এঁরা! এঁদের সম্বন্ধে তো কিছু বলেছেন বলে মনে পড়ছে না। ইন্দ্র, সোম, রুদ্র এঁদের তুষ্ট করতে পারলেও তো বাঞ্ছিত বস্তু মেলে। তা হলে এঁরাও জীবন-নিয়ন্ত্রণে অংশ নিচ্ছেন! প্রকৃত নিয়ন্তা কে? কে ঠিক করে দিল বিশাখা ধনঞ্জয়-সুমনার গৃহে জন্মাবে? মিগারের ঘরে নয়? কে ঠিক করল বিশাখা বিশাখাই হবে। ধনপালী, খুজ্জ উত্তরা বা তিষ্য কি তিষ্যর সেই বন্ধু আত্রেয় নয়? কে স্থির করল বিশাখার জননী সুমনা প্রণয় জানবেন কিন্তু তাঁর কন্যা বিশাখা জানবে না! কোথায় ছিল এই পুন্নবদ্ধন আর তার পিতামাতা! তার জীবনের কোনও কোণেই তো ছিল না! কার নির্দেশে সহসা সে উৎক্ষিপ্ত হল সাকেতের ধনঞ্জয়লোক থেকে সাবত্থির মিগারলোকে? কে জুড়ল এই দুটি মানুষকে যাদের কোথাও কোনও সাদৃশ্য নেই! অথচ যাদের হৃদয় বিনিময় করতে বলা হচ্ছে, দেহে মিলিত হতে বলা হচ্ছে, প্রজা উৎপাদন করতে বলা হচ্ছে, শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত থেকে সন্ততির ক্রমপ্রসরমাণ ধারা দেখে যেতে বলা হচ্ছে, কার ব্রতে সে হৃদয় দেবে? কাকে অনুসরণ করবে? কাকে হবিঃ দেবে? কাকে! কাকে! কাকে!

AMARBOI.COM

২২

কৃষ্ণপক্ষের রাত। ওপরে আকাশে যেমন নক্ষত্রগুলি বিশেষ জ্যোতিষ্মান, নিচের বনভূমিতে, কাননেও তেমনি অসংখ্য খদ্যোৎ জ্বলছে নিবছে, জ্বলছে নিবছে। ঝিল্লির ঝনন ক্রমশই আরও, আরও সশব্দ হয়ে উঠছে। বহু প্রকার নৈশকুসুমের গন্ধে রাজগৃহ নগরের অঞ্চলপ্রান্ত আমোদিত। অট্টালিকাগুলিতে আজকের মতো দীপ নিবে গেছে। খালি জম্বুবনের মধ্যবর্তী এই সদ্য নির্মিত কাঠের একতল প্রাসাদের প্রধান কক্ষে দীপ জ্বলছে। দীপটিকে মৃদু করে দেওয়া হয়েছে। তবু কিছু বন্য কীট তার আলো লক্ষ করে ঘুরছে, মাঝে মাঝে পোড়া কীটদেহের কটু গন্ধে ভারি হয়ে উঠছে বাতাস। পরক্ষণেই, বাতায়নের পাশে রাখা সুগন্ধিচূর্ণের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে ঘরে ঢুকছে, সঙ্গে সঙ্গে সুরভিত হয়ে যাচ্ছে সব।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর চণক গভীর স্নেহ ও স্বস্তিভরা চোখে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘বলো সোমা, কী করে এ অসম্ভব সম্ভব করলে? তুমি নিশ্চয় জানো, আমার গান্ধার ত্যাগ করার একটি কারণই ছিলে তুমি। যখন দিবারাত্র ভাবছি কী করে তোমাকে মুক্ত করবো সেই সময়ে হঠাৎ একদিন তুমি আমাকে হতাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করে রাজপ্রাসাদে চলে গেলে।’

চণক দীর্ঘ ঘরটির মধ্যে পদচারণা করছে, এক একবার থামছে, কোনও স্তম্ভের বেদীতে ডান পা তুলে দিয়ে কনুই তার ওপর রেখে দাঁড়াচ্ছে। কথা বলছে আবার পদচারণা করছে। তার পক্ষে যতটা উত্তেজনা প্রকাশ করা সম্ভব বোধ হয় সে করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিতসোমা মাটিতে বসে। সে আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছে মেঝেয়। কখনও তার বাঁ হাতের অনামিকা থেকে বৈদূর্যমণির বিশাল অঙ্গুরীয়টি খুলে ফেলছে, আবার পরছে। দুজনেই যে অতিশয় উত্তেজিত তা তাদের আচরণ দেখলেই বোঝা যায়। অদূরে একটি ভৃঙ্গারে শীতল পানীয় রেখে গেছে দাসীরা। কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকার উজ্জ্বল চিত্র-করা পানপাত্র। জিতসোমা একটি পাত্রে পানীয় ঢেলে মৃদুস্বরে বলল, 'এটা পান করে নিন। রাত্রের আহার্য তো কিছুই স্পর্শ করেননি!'

চণক বলল, 'সে কি তুমিই করেছ? সোমা, আজ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যাওয়ার দিন। বলো, শীঘ্র বলো, আমি অধীর হয়ে রয়েছি।'

'আপনি জানেন না মা আমাকে কী বলে গিয়েছিলেন!' সোমা বলল।

'কেমন করে জানবো? কিছুটা হয়ত অনুমান করতে পারি!'

'মা আমাকে বলেন, এই তোর পিতৃপরিচয় সোমা, আর সে জন্যই চতুঃষষ্টিকলাতেই যাতে তোর মন না থেমে থাকে তাই তোকে বেদবিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তুই গণিকাবৃত্তি নিস না।' একটু থেমে সোমা বলল, 'এ কাজ কত কঠিন, তা তো আপনি জানেন! যতদিন মা ছিলেন আমাকে আড়াল করে ছিলেন, তার পর?'

'জানি', নিশ্বাস ফেলে চণক বলল, 'আর তাই-ই মহামাত্র যখন তাঁর উপঢৌকনের ঝুলি থেকে ঐন্দ্রজালিকের মতো তোমায় বার করলেন তখন যত না বিস্মিত হয়েছিলাম, তার চেয়েও বেশি হয়েছিলাম বিষণ্ণ।'

'বিষণ্ণ কেন?'

'সে কী? এক রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর থেকে আরেক রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে স্থানান্তরিত হয়ে গেলে, প্রকাশ্য সভায় তোমায় দান করে দেওয়া হল, এতেও বিষণ্ণ হব না! তবে সোমা কষ্টিপাথরে সোনার ক্ষীণ রেখার মতো একটু আলোও যেন দেখতে পেয়েছিলাম।'

জিতসোমা মুখ তুলে বলল, 'সত্যি! কেন?'

'গান্ধারে গণিকার মুক্তির উপায় নেই, কিন্তু মগধে দেখছি আছে। গণিকা-কন্যা এমন কি গণিকারও বিবাহের কথা শুনছি এখানে। সে যদি রাজকোষ থেকে ভৃতি পায় তো তার জন্যে নিষ্ক্রয় দিয়ে তাকে মুক্ত করা যায়। মগধ অনেক উদার, অকুণ্ঠ, নতুন নতুন চিন্তাধারা সাদরে গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে সোমা, মগধই আমাদের ভবিষ্যৎ। তোমার আমার শুধু নয়, আমাদের সবার। এ সম্পর্কে পরে তোমাকে আরও অনেক কথা বলবার আছে। এখন তুমি বলো কীভাবে তক্ষশিলার রাজান্তঃপুর থেকে এ পর্যন্ত এলে।'

জিতসোমা বলল, 'কীভাবে এলাম তার চেয়েও বড় কথা আর্য, কেন এলাম! কী তীব্র মুক্তির ইচ্ছা তার পেছনে কাজ করছিল।'

'বলো, বিশদ বলো।'

'আমার জননী যদি স্তান হয়ে থেকে নানাভাবে আমাকে মুক্তির কথা না বলতেন, তা হলে আমি হয়ত ভাবতাম, গতজন্মের কুকর্মের ফলেই গণিকার ঘরে জন্মেছি।' কিন্তু মা বলতেন: "আমি তো গণিকার ঘরে জন্মাইনি, ভাগ্য নয়, একটার পর একটা মানুষের ষড়যন্ত্রের ফলেই গণিকা হয়েছি।" জানেন নিশ্চয় মা ছিলেন কাশ্মীরের এক আচার্যের কন্যা। বড় আদরের। বছর দশেক বয়স পর্যন্ত আচার্যের অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে নিয়মিত বিদ্যাভ্যাস করতেন। ভয়ানক অহিবাতক রোগে আমার সেই মাতামহ-মাতামহী, তাঁদের শিষ্যগুলি, শিশুপুত্র সবাই মারা যান। তখন রাজারই উচিত ছিল মায়ের মতো অনাথ-অনাথাদের ব্যবস্থা করা। তা তো তিনি করলেনই না, উপরন্তু গ্রামের একজন লোভী লোক সেই দশ বছরের বালিকাকে তার জ্ঞাতকদের কাছে পৌঁছে দেবার নাম করে তক্ষশিলায় এনে বেচে দিল। ক্রেতা ছিলেন মহামাত্র দ্যুমৎসেন। দর্ভসেনের পিতা। তাঁর স্নানের সময়ে ঘটে করে জল এনে দেওয়া ছিল মায়ের কাজ। একদিন মহামাত্র বললেন, এ বালিকা তো দেখি অতিশয় রূপসী! রাজাকে জানাতে হচ্ছে! রাজকোষ থেকে এর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শুনে, জানেন আর্য, মা ভেবেছিলেন তাঁর বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন হচ্ছে বুঝি। তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। একটি বয়স্কা দাসীকে সে কথা বলায় সে তো হেসেই আকুল! কিছুদিন পর প্রৌঢ়া গণিকা অভয়ার কাছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে তাঁকে চতুঃষষ্টিকলা শেখাবার ব্যবস্থা হল। সঙ্গীত, নৃত্য, বীণাবাদন, কাব্যরচনা, দ্যূতক্রীড়া, গন্ধযুক্তি, সজ্জা, অলঙ্করণ, অলঙ্কার নির্মাণ, রত্নপরীক্ষা, বিষনির্ণয় তার প্রতিবিধান। আর্য চণক এ সবই আমাকেও শিখতে হয়েছে। আচ্ছা আপনিই বলুন, বিদ্যাগুলি কি মন্দ ?'

'কখনওই নয়। এ সব বিদ্যা যে জানে সোমা, সে তো বিশেষ সম্ভ্রমের যোগ্য।' চণক ভাবতে ভাবতে বলল, 'সে সম্ভ্রম যে তাঁদের দেওয়া হয় না, তাও নয়। সমাজ-উৎসবগুলিতে নগর-গণিকার সমাদর তো দেখেইছ সোমা। আচ্ছা, এই যে রাজপুরুষরা তাঁদের "আসুন আসুন" বলে বিশেষ অভ্যর্থনা করে, সাধারণেরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়, অলঙ্কৃত বিশেষ আসনে তাঁদের বসবার ব্যবস্থা হয়— এই সমাদর কি সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য ?'

সোমা বলল, 'সোনার পিঞ্জরে ময়ূর দেখেছেন আর্য ? এ সেই প্রকার সমাদর। মা বলতেন— "সঙ্গীত, নৃত্যকলা কী গভীরভাবেই না ভালোবেসেছিলাম! তার পরে ধীরে ধীরে বুঝলাম এইসব ছন্দোবদ্ধ অঙ্গক্ষেপ যার নাম নৃত্য, যা আমাকে আনন্দের তুরীয়লোকে নিয়ে যায়, আর এই যে সুরলহরী—বীণা থেকেই আসুক, কি কণ্ঠ থেকেই, যা আমার নাম, রূপ, অস্তিত্ব সব ভুলিয়ে দেয় তা কিছু কামলোলুপ মানুষের দেহে-মনে উত্তেজনা জাগাবার কাজে লাগবে। সত্যিকারের কলারসিকের দেখা সারা জীবনে যে পাইনি, এ কথা বললে অন্যায় হবে। কিন্তু অধিকাংশই সুরাপানের বিকল্প বলে, ইন্দ্রিয় উত্তেজক বলে, দেহভোগের ভূমিকা বলে দেখে নৃত্য-গীতকে। লোকের বিকৃত রুচিকে তুষ্ট করতে কামকলার কত যে খুঁটিনাটি শিখতে হয়েছে!" এই সব বলতে বলতে আমার হতভাগিনী জননী কখনও কখনও খালি কাঁদতেন, কখনও ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর মতো নিশ্বাস ফেলতেন। আর বারবার বলতেন—"তুই চলে যাবি সোমা, তুই এই বিষবৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাবি।" তারপর তো অল্পদিনের ব্যাধিতে মারাই গেলেন!'

জিতসোমা নীরবে তার অঙ্গুরীয়টি আঙুলের ওপর ঘোরাতে লাগল। এটাই সম্ভবত তার মুদ্রাদোষ।

চণক বুঝল সে এখন কাঁদছে। বাইরে নয়, ভেতরে ভেতরে। আর্দ্র হয়ে রয়েছে তার হৃদয়-মন। দেখতে দেখতে সে ভাবল—এই আর্দ্রতার পাশাপাশি কি অগ্নিও আছে? যা জিতসোমার মা জনপদশোভিনী আর্যা দেবদত্তার ছিল! তাঁর নৃত্য-গীত দেখবার সুযোগ কখনও হয়নি চণকের। সোমাকে বেদবিদ্যা শেখাতে গিয়ে সে আর অনঘ এই দীপ্তিমতীকে দেখেছিল, দেখত প্রায়ই। তারা শুনেছিল তাঁর অগ্নিগর্ভ বাক্। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যেতে যেতে তিনি তাদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সহসা-মনে-আসা শব্দযূথ আবৃত্তি করতেন। চণক বসে আছে। জিতসোমা নিবিষ্ট মনে তার ভাষ্য শুনছে। সহসা সেই গরিমাময় কণ্ঠস্বর:

ঋম্ময়ী আগে ছিলাম শুনতে আসত ভাবুক
বায়ুর মতো বয়ে গেছি সংহিতায় তখন
জলের মতো হিল্লোলে কল্লোলে জীবন
এখন তবে কিংময়ী ? আসছে কেন কামুক ?
মাটির ঘট ভাঙ্ তোরা উর্জে ওঠ্ আগুন
ঝলসে দিক সর্বদিক সর্বজীব সর্বদেব অহম্ আবাং বয়ম্

এই আগুন যদি থাকে, তবেই জিতসোমার কান্নার জল বাষ্প হবে। ভেতরে এক মহাশক্তির উত্থান হবে। যেমন নদীসকলের জলের ওপর সূর্যের তেজ ক্রিয়া করলে বাষ্প উত্থিত হয়। এই বাষ্প উর্ধ্বে উঠে যায়, জন্মায় মহামেঘ। মেঘে মেঘে ঘৃষ্ট হলে তবেই উৎপন্ন হবে মহাশক্তি—বিদ্যুৎ, বজ্র।

নিজেকে খানিকটা শান্ত করে জিতসোমা বলল, 'মা-ই আমাকে বলেছিলেন মহামাত্র দর্ভসেনকে তুষ্ট করে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে স্থান করে নিতে। বলেছিলেন—"বরং রাজকুমারীদের সৈরিন্ধ্রী হয়ে থাকবি, কদাপি রাজা বা রাজকুমারদের ছত্রধারিণী, চামরগ্রাহিকা, সংবাহিকা এসব হবি না।" অবশেষে যেতে পারলাম, মহামাত্র দর্ভসেনকে তুষ্ট করে—' বলতে বলতে জিতসোমার চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠতে লাগল, সে হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্ত ঘৃণায় বলে উঠল, 'গণিকাদের কামকলার এত খুঁটিনাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখায়, কিন্তু গণিকাভোগী পুরুষগুলোকে তো দেখি কিছুই শেখায় না। প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত সব এক একটি গর্দভ, জরদ্গব হয়ে থাকে···' শিউরে শিউরে উঠতে লাগল সে। বেশ কিছুক্ষণ পর তার বোধ হয় চেতনা হল— সে মাথা হেঁট করে বলল, 'ক্ষমা করুন আর্য। এ সব কথা আপনার সামনে আমার বলা উচিত হয়নি।'

চণক একটি বেদীতে বসেছিল, নত মুখে। সে সেভাবেই বলল, 'না, না, সোমা উচিত-অনুচিতের কথা নয়। তোমার কাছ থেকে আমি অনেক নতুন কথা জানতে পারছি। পুরনো জানার ওপর ভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত হচ্ছে। কিছুই তুমি বাদ দিও না। জীবনের দিগ্‌দর্শন করতে হলে পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে যথাযথ মূল্য দিতে হয়। কে বলতে পারে, তুমিই হয়ত আমাকে পথ দেখাবে!'

জিতসোমা এতক্ষণে হেসে ফেলল, বলল, 'আচার্য চণককে পথ দেখাতে পারবো কি না জানি না, কিন্তু নিজের যে এক ধরনের ভূয়োদর্শন হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হয়। মা আরও কী বলতেন জানেন?'

'কী?'

'বলতেন, রাজকুমারীদের, রানিদের তুই যা-যা জানিস সব শিখিয়ে দিবি। বিদ্যাগুলি তো ভালোই। কুলনারীরা সামান্য কিছু সাজসজ্জা, অলঙ্করণ, রন্ধনবিদ্যা এই তো শেখে, তাই প্রমোদের সন্ধানে পুরুষগুলো অন্যত্র যায়। কুলনারীরাও যখন নৃত্য-গীত শিখবে, কাব্যরচনা করতে পারবে, দ্যূতক্রীড়ায়, তর্কে, আলোচনায় পুরুষের সঙ্গী হতে পারবে তখন ওগুলি গৃহসীমার মধ্যে থাকতে শিখবে। সত্যিকার গৃহস্থ হবে।'

চণক দাঁড়িয়ে উঠে সবিস্ময়ে বলল, 'সত্যিই তো সোমা, এভাবে এ কথা কেন আমার আগে মনে হয়নি?'

সে যেন আবিষ্কারের আনন্দে বাম হাতে ডান হাত দিয়ে মুষ্ট্যাঘাত করল। আপন মনে বলল, 'এক শ্রেণী গৃহরক্ষা করবে, প্রজা উৎপাদন করবে। আরেক শ্রেণী চিত্তের, মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতর ক্ষুধাগুলি মেটাবে। আশ্চর্য, এই সুস্পষ্ট বিভাজন কবে থেকে হল, কেন হল, কেমন করে হল? তোমরা কি চিরদিনই এমনি ছিলে সোমা? আমি তোমার আচার্য ছিলাম আমি জানি কোনও পুরুষ-শিষ্যর থেকে মেধা, উদ্ভাবনীশক্তি, প্রয়োগক্ষমতা তোমার ন্যূন নয়। আমার দুই ভগ্নী ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণধী। তা হলে?'

সে আবার পদচারণা করতে করতে মাঝে মাঝে থেমে বলতে লাগল, 'আমি সাধারণ বারস্ত্রী বা বেশ্যার কথা বলছি না। কিন্তু যাঁরা এই বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁদের কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যয়েই শিক্ষিত করা হয়, যেমন আর্যা দেবদত্তাকে করা হয়েছিল। কী অদ্ভুত দেখো! রাষ্ট্রের কী স্বার্থ এতে?'

জিতসোমা বলল, 'কেন আর্য? ধরুন বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। যে নগরে খ্যাতনামা গণিকা থাকেন, সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে বণিক আসে তুলনায় অনেক। আসেন রাজপুরুষরাও। শুধু স্বদেশের নয়, বিদেশেরও। আপনি কি জানেন, এই যে মগধের সঙ্গে লিচ্ছবিদের বন্ধুত্ব এর মধ্যে বৈশালীর বারমুখ্যা আম্রপালীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে!'

'সত্য নাকি?'

'হ্যাঁ আর্য। তখন মহারাজ বিম্বিসারের অল্প বয়স, সবে রাজগৃহনগরী গড়ে উঠেছে। কোশলের সঙ্গে সখ্য হয়েছে, মহারাজের চিত্র দেবী আম্রপালীর হাতে পড়ে, মহারাজও দেবীর খ্যাতি শুনে ছিলেন, উভয়ে উভয়ের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তখন লিচ্ছবিদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নয়, মহারাজ ছদ্মবেশে আম্রপালীর কাছে যান। পরে সব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, তাইতেই তো লিচ্ছবিকুমারী ছেল্লনা দেবীকে বিবাহ করে মহারাজ তাদের শান্ত করেন। আপনি আম্রপালীর পুত্র কুমার বিমলকে দেখেননি?'

'নাঃ। আমি রাজার সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরি। রাজপরিবারের কারও সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।'

'কুমার বিমল স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। যাই হোক, তা হলে দেখলেন, গণিকার পৃষ্ঠপোষকতার পেছনে কীভাবে রাজস্বার্থ কাজ করে! বিদেশের সংবাদ, অনেক গোপন সংবাদ গণিকার জানা হয়ে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। দেশের রাজপুরুষরাও অনেক প্রকার চক্রান্তে মত্ত থাকেন, গণিকার কাছে সেসব প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন জিতসোমা জানতে পেরেছিল কাত্যায়ন চণককে মগধে দূতজ্যেষ্ঠক করে পাঠানোয় মহামাত্র দর্ভসেন ক্রোধে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন।'

'তাই-ই, না ? এবং দেব পুষ্করসারী তাঁকে আমার পৃষ্ঠরক্ষার ছলে পাঠাতে এক প্রকার বাধ্যই হন। আমি তা হলে ঠিকই অনুমান করেছি ?'

জিতসোমা হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল।

চণক বলল, 'তা হলে গণিকারা মুখ্যত না হলেও গৌণত চর। কিন্তু চরকীট গণিকাপুষ্পের মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। বর্ণ, গন্ধ, রূপ এসব দিয়ে কীটটি ঢাকা থাকে। এই-ই রাজস্বার্থ! কিন্তু সোমা, কুলনারী আর বারনারীর মধ্যে শিক্ষার এই স্পষ্ট ভেদরেখা কার স্বার্থে ? আমি সত্যই বলছি, বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ত হবার ফলে উচ্চশ্রেণীর গণিকার মধ্যে একটা গরিমা আসে, যা অধিকাংশ কুলনারীর থাকে না।' একটু থেমে সে বলল, 'থাকলে ভালো হত।'

জিতসোমা বলল, 'কেন হবে না বলুন ? কীভাবে দাঁড়াতে হবে, কী ভাবে বসতে হবে, কী প্রকার স্বরে কাব্যালোচনায় যোগ দিতে হবে, সবই তো আমাদের শেখানো হয়। শেখানো হয় বুঝতে নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কোনটি ? কোনটি সবচেয়ে কুশ্রী। কী ভাবে সুন্দরটিকে অতিব্যক্ত করে কুশ্রীতাকে অব্যক্ত রাখতে হবে। আপনি অলম্বুষাকে চিনতেন ?'

'সে কে ?'

'আমাদের ওই পল্লী থেকে অদূরে থাকত। সঙ্গীতের জন্য বিশেষ খ্যাত ছিল।'

চণক হেসে বলল, 'তুমি কি মনে করেছ দিগ্‌দর্শনের জন্য আমি সব গণিকার গৃহেই যাতায়াত করে থাকি ?'

জিতসোমাও হাসছে। এতক্ষণে তার মধ্যেকার বিষাদের ধূসরতা ছাপিয়ে কৌতুকের রশ্মিচ্ছটা যেন দেখা যাচ্ছে। সে বলল, 'অলম্বুষা ছিল শ্যামাঙ্গী। কিন্তু তার চোখ দুটি অদ্ভুত। দীর্ঘ, সামান্য একটু বক্র, চোখের মণি দুটি গোমেদের মতো উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ। সে হিঙ্গুলচূর্ণ ব্যবহার করে ত্বকের উজ্জ্বলতা তো বাড়িয়ে ছিলই, চক্ষু দুটিকে কাজল দিয়ে এমনভাবে শোভিত করত যে, তার ওষ্ঠের দিকে কারও দৃষ্টিই পড়ত না।'

AMARBOI.COM

চণক স্মিতমুখে বলল, 'ভালো। গণিকার সূক্ষ্ম আকর্ষণের অনেকটাই তা হলে শিক্ষানির্ভর। এখন এই শিক্ষা পুরস্ত্রীদের কাছ থেকে গুপ্ত রাখা হয়েছে কেন ? যাতে তারা পুত্রার্থে ছাড়া অন্য কোনভাবেই সমাদর না পায় ? দেখো সোমা, গণিকাদের বলে স্বাধীনা। কোনও কুলস্ত্রীকে স্বাধীনা বললে সেটা পরিবাদ হবে। এ সব এক দিনে হয় না। আমার জানতে ইচ্ছে করে যযাতির সময়ে, তার আগে, তারও আগে কী ছিল। বিদুষী রমণী যে ছিলেন না বা নেই তা তো নয়— অম্ভৃণ কন্যা বাক, বাচক্নবী গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী বা সুলভার কথা মনে করো। আমাদের ছাত্রাবস্থায় তক্ষশিলায় দেখেছি উপাধ্যায়া সুমতি ও দৃষদ্বতীকে। এখানে এসে দেখছি নির্গ্রন্থদের প্রব্রাজিকাদের। এদের সম্পর্কে লোককে বলতে শুনি, নারী হয়েও এঁরা যেন পুরুষ। অথচ তোমাকে বা আমার ভগ্নীদের দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে জানি, বিদ্যার কোনও পক্ষপাত নেই। সে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে-কোনও নিষ্ঠাবান পাত্রকেই আশ্রয় করতে পারে। অথচ কেন এই ধারণা! বিদ্যা আয়ত্ত করলে নারী আর নারী থাকছে না। চারুকলা আয়ত্ত করে নিজের রূপ ও বাচনকে পরিমার্জিত করলে সে গণিকাসম হয়ে যাচ্ছে। কেন এই অদ্ভুত বিপ্রতীপ আচরণ ? এতে করে কি পরোক্ষে পুরুষদের গণিকাসংসর্গ করতে বাধ্য করা হচ্ছে না! গণিকাবৃত্তিকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না! সে কি তাদের কাছ থেকে অনেক পরিমাণে রাজবলি আসে বলে ? ওদিকে পুরস্ত্রীকে বাধ্য করা হচ্ছে কুক্কুরীর মতো প্রজাবৃদ্ধি করতে। গর্দভীর মতো গার্হস্থ্যের বিপুল ভার বইতে। সে তার রূপ-যৌবন জীবনের অর্থ সব হারিয়ে ফেলছে। গণিকারও যেমন আপন ইচ্ছা বলে কিছু নেই, পুরস্ত্রীরও ঠিক তেমনই। কারওই কোনও উপায় নেই। অত্যন্ত দুঃখ এবং লজ্জার বিষয় সোমা, তোমার এবং তোমার জননীর সঙ্গে পরিচিত না হলে এসব কথা কোনদিন হয়ত ভাবতাম না। আজ তোমার সঙ্গে আলোচনাচ্ছলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে এলো কত কথা ! তুমি না থাকলে পিতার অসমাপ্ত "রাজশাস্ত্র" শেষ করবার জন্যই হয়ত জীবন দিয়ে দিতাম। ভূয়োদর্শনের জন্য ভ্রমণে বেরোতাম ঠিকই। কিন্তু যে-মন দেখে, বিচার করে, নির্বাচন করে চিন্তার সূত্রগুলি সাজায় সেই মন একচক্ষু হয়ে থাকত। আমি একজন বিদ্বান বলে পরিচিত ব্যক্তি, একজন চিন্তক, আমিই যদি এরূপ অন্ধ হই, কোনও সমাজবিধিকে প্রশ্ন না করি তো ইতরজনে কী করবে ?' কিছুক্ষণ পর চণক ঈষৎ তরল গলায় বলল, 'তা সোমা, রাজবাড়ির মেয়েদের তোমার বিদ্যা শেখাতে পেরেছিলে ?'

সোমা বলল, 'রাজবাড়ি বা ধনীঘরের মেয়েদের কিন্তু বেশবাস, গন্ধযুক্তি এসব কিছু কিছু শিখতে হয়। আমি চেষ্টা করেছিলাম বিশেষ করে তাদের নৃত্য-গীত শেখাতে। পাশা খেলা শেখাতে।'

'শিখল ?'

জিতসোমা বলল, 'ছন্দ ও সুরের প্রকরণ আয়ত্ত করতে আমাদের কত দিন, কত রাত বিপুল পরিশ্রম করতে হয় জানেন ? শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। পা আর চলছে না, খেলাম পায়ে লাঠির এক ঘা। সুরের একটি খণ্ডাংশে আয়ত্ত হচ্ছে না কিছুতেই, আদেশ হল যতক্ষণ না আয়ত্ত করতে পারছি, কঠিন খাদ্য কিছু খেতে পাবো না। সে তিন প্রহরও হতে পারে, তিন দিবসও হতে পারে। তা রানিই বলুন, রাজকুমারীই বলুন, তাঁদের কি এত ধৈর্য থাকে ? তবে আমি রাজা পুষ্করসারীর যে কন্যাটির কাছে ছিলাম সে সন্ধিৎসু স্বভাবের ছিল। তাকে বলতাম...' বলে জিতসোমা হাসতে শুরু করল। হাসিতে তার উত্তরীয়ে আবৃত শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

চণকের মধ্যেও তার হাসি সংক্রামিত হয়েছে। সে স্মিতমুখে বলল, 'কী বলেছিলে তাকে ? এত হাসির কী হল ?'

জিতসোমা অতি কষ্টে হাসির বেগ সংবরণ করে বলল, 'তাকে বলতাম, তোমার তো একদিন বিবাহ হবে, সপত্নী চাও ?'

'না, না, একেবারেই না।'

'তোমার পতি তোমাকে ফেলে গণিকালয়ে যাবে চাও ?'

'না, এরূপ পতির সঙ্গ করতে হবে ভাবলেও আমার জুগুপ্সা বোধ হয়।'

'তা হলে আমি যেসব বিদ্যা জানি সেসব মন দিয়ে শেখো। পতিকে বেঁধে রাখতে পারবে। সেই কুমারীটি তার গৃহে আরও কুমারীদের নিয়ে আসত, ভাবী পতিদের বেঁধে রাখবার আশায় তারা প্রাণপণে নৃত্য-গীত শিখত।'

'কত দূর সফল হয়েছিলে ?'

'যাদের স্বাভাবিক সুকণ্ঠ ছিল তারা তো ভালোই শিখেছিল। কিন্তু যারা কেকাকণ্ঠী তাদের কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারতাম না যে নিয়মিত চর্চা করলে স্বর পাল্টে যাবে। আর নৃত্যের কথা কী বলবো আর্য। ময়ূরের যেমন নৃত্য স্বভাবের অঙ্গ, মেয়েদেরও তেমনি নৃত্য আপনা থেকে আসে। তবে কঠিন, কুশলী নৃত্যের কথা স্বতন্ত্র।'

'তা হলে কিছু নারীকে অন্তত সপত্নীদুঃখ, পতির গণিকাসক্তিদুঃখ ইত্যাদি থেকে বাঁচিয়ে এসেছ বলো।'

জিতসোমা হেসে বলল, 'পাশা খেলা এমন শিখিয়েছি যে, নিষ্কর্মা পতিগুলো হয়ত স্বগৃহেই পাশার গুটিকা নিয়ে মত্ত থাকবে। পণের অর্থ সব আবার পত্নীর হাতেই ফিরে আসবে। তবে আর্য, অগ্নিতে যতই হবিঃ দিন না কেন, অগ্নি কি প্রশমিত হয় ? সে আরও চায়, আরও শিখা বিস্তার করে। বাসনার আগুন বড় বিচিত্র বস্তু। হব্য নয়, হয়ত একমাত্র নির্বাসনার ভস্ম চাপা দিলেই আগুন নেবে।'

জিতসোমার কথাগুলো চণকের মনের মধ্যে কেমন প্রতিধ্বনির মতো শোনালো। এ কথা যেন সে কোথায়, কার মুখে শুনেছে ! মনে করবার চেষ্টা করছে। পারছে না। শাস্ত্রবাক্য কী ?

জিতসোমা বলল, 'কী করে তক্ষশিলা থেকে মগধে এসে পৌঁছলাম জানতে চাইলেন না তো ?'

'হ্যাঁ, এ এক আশ্চর্য সমাপতন। নানা কথা, নানা ভাবনার মাঝখানে তোমার ভ্রমণকাহিনীর সূত্রটি যেন কেমন করে হারিয়ে গেছে।'

'মোটেই সমাপতন নয়', সোমা প্রতিবাদ করে উঠল, 'এর জন্য মহামাত্রকে আমায় বহু কৌশল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

করে বোঝাতে হয়েছে।'

চণক আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তাই বুঝি ?'

'আপনি এত বিজ্ঞ হয়ে এসব ঘটনাকে সমাপতন বা দৈব কী করে ভাবেন আর্য ? সাধারণে ভাবতে পারে। আপনি তো সব ঘটনার আড়ালে সেই কূটকক্ষের কথা জানেন যেখানে নীতি নির্ধারিত হয়, দৈব নির্ধারিত হয় ! রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশের মূল্যস্বরূপ আমাকে কতবার দর্ভসেনের কুঞ্জে যেতে হয়েছে জানেন ?'

চণক কথা বলল না। একটু পরে জিতসোমা বলল, 'একদিন দর্ভসেন বললেন, "যাক মহারাজকে সম্মত করাতে পেরেছি। আমি সর্বাধিনায়ক হয়ে রক্ষী সৈন্য নিয়ে মগধ যাত্রা করছি শীঘ্রই। শুধু একটা কথাই ভাবছি। চণক তো মগধরাজের উপঢৌকন নিয়ে গেছে আটটি শাল। কীভাবে আরও কিছু নিয়ে গিয়ে তার মনে বিশ্বাস জন্মানো যায় আমিই প্রকৃত দূত, দূতজ্যেষ্ঠক, তাই অবশিষ্ট উপহারগুলি নিয়ে এসেছি। পারস্যের বণিকদের কাছ থেকে মহামূল্য সভাচ্ছদ কিছু কেনা হয়েছিল, ওরা বলে গালিচা। তা-ই ভাবছি একটি নিয়ে যাবো। আমাদের উত্তরের দিকে রাজারা এই সভাচ্ছদ ব্যবহার করলেও মধ্যদেশে হয়ত এ বস্তু এখনও যায়নি। কিন্তু, মাত্র একটি উপহার দিয়ে কি চণককে বোঝানো সহজ হবে ?" তখন আমি বলি, 'আপনারা তো দাস-দাসী দ্যান, "তা দিই। কিন্তু ও উপহার বড় সাধারণ হয়ে গেছে, যাগ-যজ্ঞে অনবরত দেওয়া হচ্ছে। আমি চমকপ্রদ কিছু দিতে চাই।" আমি বলি— অনেক দেবেন কেন ? দাসীই বা দেবেন কেন ? একটি মাত্র নৃত্য-গীত কুশলী নটী নিয়ে যান না, এমন একজন যে একাই যথেষ্ট হবে। উনি বললেন, "দু একদিনের মধ্যে কোথায় এখন এমন পাই, বলো ?" তখন আমি বললাম— আমি কি যথেষ্ট রূপসী, যথেষ্ট নৃত্যগীতদক্ষ বলে আপনার মনে হয় না ! উনি বললেন, "তুমি ! তুমি স্বেচ্ছায় যেতে চাইছ সেই দূর বিদেশে, অচেনা রাজার অন্তঃপুরে ?" আমি বললাম—গান্ধারের সেবা করার এমন একটা সুযোগ ! আমার তুচ্ছ জীবন দিয়ে এটুকু যদি করতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করব। দর্ভসেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন। দু একদিন পরেই রাজাদেশ অন্তঃপুরে এসে পৌঁছল। আমার শিষ্যা রাজকুমারীগুলি কান্নাকাটি করতে লাগল। আমি তাদের বললাম— পারো যদি নিজেদের জীবনে ক্রীতদাসীদের এই অনিশ্চিত জীবনযাত্রা, তাদের প্রতি এই তৈজসের মতো ব্যবহার মানাবার চেষ্টা করো, কেঁদে কী ফল ? তা তারাই আমার পেটিকা গুছিয়ে দিল, রাজকোষ থেকে যা যা এসেছিল তার ওপর তাদের উপহার। এই যে রুপোর কাঞ্চী পরে আছি এটি আমিই চিত্র নির্মাণ করে করিয়ে দিই রাজকুমারী রম্ভার জন্য। সে কাঁদতে কাঁদতে এটাই আমায় পরিয়ে দিল, বলল, 'এটা পরলে তোমার আমার কথা, আমাদের কথা মনে পড়বে।'

'কোন সাহসে, কী আশায় তুমি এত বড় দায় নিলে সোমা ?' চণক আশ্চর্য হয়ে বলল।

'কী আশা তা জানি না আর্য, আমি শুধু ভাবছিলাম বহু দূর চলে যাবো। গর্তের মধ্যে মরা ইঁদুরের মতো আমার মৃতদেহটা যেন কাউকে কোনদিন গান্ধার রাজপুরীর অন্তঃপুর থেকে টেনে ফেলে দিতে না হয়। কে বলতে পারে কী ঘটবে ? অশুভ যা তা তো ঘটেই আছে ! এর চেয়ে মন্দ আর কী হবে ? মনে মনে এও ভেবেছিলাম আপনার দেখা তো পাবই, তখন আপনি হয়ত কিছু করবেন।'

চণক বলল, 'কত চেষ্টা করলাম সোমা, মহামাত্রকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারলাম না। উনি তোমাকে উপঢৌকন দেবেনই। তুমি জানো না পারলে আমি মহামাত্রকে হত্যা করতাম !'

জিতসোমা বলল, 'ওঁর তত দোষ তো নেই ! আমিই ওঁকে সর্বক্ষণ প্ররোচিত করছিলাম।'

'সে কী ? কেন সোমা ?'

'না হলে কী হত ? আবার তো গান্ধারে ফিরে যেতে হত। আবার সেই রাজপুরী। সেই মহামাত্রের কুঞ্জবন।... আপনি কি মনে করছেন মহামাত্রর কাছ থেকে আমায় কিনে নিতে পারতেন ?'

'পারতাম না ?'

'কখনই না। মহামাত্র যদি একবারও টের পেতেন আমার ওপর আপনার বিশেষ স্নেহ আছে, তিনি আরও যত্ন করতেন কীভাবে আমাকে আপনার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। কাজেই ও চেষ্টা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলবতী হত না। অথচ দেখুন, মগধের রাজধানীর প্রান্তে, এই অনুপম গৃহের কক্ষে আমরা—আমি ও আপনি সেই তক্ষশিলার সুন্দর দিনগুলির মতো আলাপ-আলোচনা করছি। করছি না?'

জিতসোমা উৎফুল্ল মুখে চণকের দিকে তাকাল। চণক বসে পড়ে বলল, 'এও কি সমাপতন নয় সোমা? রাজা তো বন্ধু চণকের জন্য অন্য কাউকেও পাঠাতে পারতেন!'

'না, পারতেন না', সোমার মুখে রহস্যময় হাসি।

'এর মধ্যেও তা হলে তোমার চক্রান্ত আছে বলো', চণকের মন এখন অনেক শান্ত, অনেক লঘুভার।

জিতসোমা বলল, 'আমাকে পাঠানো হল মহাদেবী ছেল্লনার প্রাসাদে। আড়াল থেকে শুনলাম তিনি একজনকে বলছেন— ভগিনী উপচেলা! এ যে দেখছি মহাসপ্পিনী! রূপে গনগনে অগ্‌গি! রাজা আর কত পুড়তে চান? দেখতে দেখতে তো এ রাজার এক অগ্‌গমহিষী হয়ে উঠবে!'

'এর পর রাজা ছেল্লনা দেবীর গৃহে এলেই আমার কথা জিজ্ঞেস করতেন। দেবী অমনি সন্ত্রস্ত হয়ে বলতেন—গান্ধার নটী অসুস্থ। শুয়ে আছে। আমরা বেজ্জ দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছি। রাজা চলে গেলে একদিন আমায় ডেকে বললেন—সচ্চ বলো তো মেয়ে? কী অভিপ্পায় তোমার? রাজার বয়স হয়েছে, তোমার মতো নবযুবতী তাঁর কাছে কী চায়?'

'তাতে আমি বিনত হয়ে বললাম—আমার কোনও অভিপ্রায়, অভিসন্ধি নেই দেবি, যেমন নিযুক্ত হবো, তেমনই করবো। তখন ওঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমাকে কুমার কুনিয়র প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন।'

চণক বলল, 'সর্বনাশ।' গলায় শব্দটা আটকে সে ভয়ানক কাশতে লাগল। দাস-দাসীরা ছুটে এলো। জিতসোমা তার মাথায়, ঘাড়ে হাতের পাতার পাশ দিয়ে মৃদু আঘাত করতে লাগল। তারপর তাকে জল পান করতে দিল। একটু সুস্থ হয়ে চণক বলল, 'একটা কাণ্ডই বাধিয়েছ সোমা!'

বিষণ্ণ গলায় সোমা বলল, 'শত হলেও তো আমি নিজের কর্ত্রী নই!'

'তুমি মুক্তি চাইলে না কেন? বুঝতে পারছ তো ছেল্লনা দেবী তোমাকে তাঁর প্রতিযোগিনী ভেবে পুত্রের দিকে ঠেলে দিতে চাইলেন।'

'বুঝব না কেন? কিন্তু মুক্তি চাইলেই কি তাঁরা দিতে পারতেন? সে অধিকার কি তাঁদের ছিল? তা ছাড়া মুক্ত হয়ে এই বিদেশে একজন নটী কোথায় শেষ পর্যন্ত যেতে পারে ভাবুন! অত সহজে স্থৈর্য হারিয়ে ফেললে জিতসোমাকে আর এখানে এসে পৌঁছতে হত না।'

'তার পরে?'

'কুমার কুনিয় তখন চম্পায় ছিলেন। আমি কিছুটা সময় পেলাম চিন্তা করবার। আমাকে কুমারের প্রাসাদের প্রধানা নিযুক্ত করা হয়েছিল। ওরা বলত কম্মিকা-জেট্‌ঠা। সবাই জানত আমার নৃত্য-গীত কুশলতার কথা। সাধারণ দাসীর কৃত্য তো আমায় দিয়ে করাতে পারে না! কুমারের প্রাসাদের সাজসজ্জা, পরিচ্ছন্নতা, তাঁর পরিচর্যার ব্যবস্থা অর্থাৎ তিনি এলে কী পাক হবে, কোন দাস, কোন দাসী তাঁর কোন কাজের ভার নেবে—এসবের ব্যবস্থা করলাম। কিছুদিন পর মহাদেবী ক্ষেমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ উপলক্ষ্যে কুমার রাজগৃহে এলেন। প্রব্রজ্যা-উৎসব তাই নগরীর প্রাসাদের বাতাবরণ ছিল ভিন্ন প্রকার। সকলেই গম্ভীর। কিংবা ভক্তি গদ্‌গদ। এর মধ্যে কুমার নৃত্য-গীতাদিতে উৎসাহ দেখাবার সুযোগ পাননি।

'ও দিকে মহাদেবী বেণুবনে চলে গেলে, কুমারও চম্পায় ফিরে গেলেন। দাসীদের কাছে শুনেছি মহারাজ একদিন ছেল্লনা দেবীর গৃহে এসে কথায় কথায় আমার প্রসঙ্গ তোলেন। কুমার কুনিয়র প্রাসাদে পাঠানো হয়েছে শুনে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তিনি নাকি উত্তেজিতভাবে পদচারণা করতে করতে বলছিলেন—এই গান্ধার রমণী গান্ধার পুরুষের কাছেই যাবে। আমি তার ব্যবস্থা করছি। যেন অন্যথা না হয়। পল্লবিত হয়ে কাহিনীটি আমার কাছে পৌঁছল। গান্ধার পুরুষ কে হতে পারে বুঝিনি। একটি প্রতীহারীই বলল—গান্ধার দূতদের মধ্যে কে একজন আছেন রাজার আচারিয়পুত্ত। তিনি এখনও রাজগহেই আছেন। রাজার সঙ্গে নাকি গভীর মিত্ততা। তখন, একমাত্র তখনই আমি বুঝলাম আমার এতদিনের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হতে চলেছে। বুঝলাম দেবতারা আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দয়া করেছেন। আমার মুক্তি। এইবার আমার মুক্তির সময় এসে গেছে।'

গান্ধারবাসীরা মগধের মানুষদের মতো আবেগপ্রবণ ধাতুর নয়। তবু জিতসোমার চোখ থেকে এখন বিন্দু বিন্দু অশ্রু তার কোলের ওপর ঝরে পড়তে লাগল। চণকের ভেতরেও আনন্দ-বিষাদ মিলিয়ে এক কণ্ঠরোধকারী অনুভূতি। এই আবেগের হাত থেকে রক্ষা পেতে, জিতসোমাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যও বটে, সে একটু ইতস্তত করে বলল—নারী গণিকা হয়েছে মূলত রাজস্বার্থে, রাষ্ট্রস্বার্থে, এমন একটা মত যদি পোষণ করি, তা হলে তার বিপরীতে নারী ক্রমশই উপনয়ন বঞ্চিত গৃহবন্দী হয়ে যাচ্ছে কেন বলে তোমার মনে হয় সোমা ?'

জিতসোমা চোখ মুছে বলল, 'জানি না। জানি না আর্য। আমি নিজে দাসীত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি এই চিন্তা ছাড়া এখন আর আমার মাথায় কিছুই নেই। সত্যিই মুক্তি পেয়েছি তো ? আপনি তো কই কিছুই বললেন না ?' তার গলায় অশ্রুর আভাস।

চণক তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে হাত দুটো ধরে বলল, 'বাহুল্য বলে বলিনি সোমা। তোমার কি এখনও সংশয় আছে এ সম্বন্ধে ? তোমার বিবাহ দেবো আমি। বলছিলাম না মগধই আমাদের ভবিষ্যৎ ! সোমা, কেন মনে করলে তোমার মুক্তিতে আমি আনন্দিত হইনি ? তোমার মুক্তি যে আমার প্রথম সাফল্য ! যদিও এ মুক্তি সম্ভব করেছ তুমিই। সত্যি বলতে, আমি আজকাল ভাবি "রাজশাস্ত্র"র যে পরিকল্পনা পিতা করেছিলেন, তার অনেক কিছুই পাল্টাতে হবে। আরও বিস্তৃত হবে এর সীমা। পিতা মানবযূথকে বৃত্তি অনুযায়ী ভাগ করেছিলেন— আচার্য, কর্ষক, মণিকার, সূত্রধার, যুদ্ধব্যবসায়ী, বণিক, কিন্তু সোমা অন্য একটি দিক থেকে দেখতে গেলে আরও একটি মৌলিক ভাগ আছে মানবসমাজের। নর এবং নারী। তুমি দেবী দেবদত্তার যোগ্য কন্যা। এই মৌলিক বিভাজনের কথা তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দিলে।

জিতসোমা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাকে প্রণাম করে বলল, 'আপনি আমার আচার্য বা অন্য কোনও সম্পর্কের জন্য নয়, আপনি পূজ্য বলেই আপনাকে প্রণাম করলাম। কিন্তু আপনি বিবাহের কথা কী বলছিলেন ? আমার অনুরোধ ও চিন্তা বা চেষ্টা আপনি করবেন না। আমি মুক্তি পেয়েছি, এই-ই আমার অনেক।'

চণক চিন্তিত হয়ে বলল, 'কিন্তু বিবাহ না করলে সেই মুক্তি নিয়ে তুমি কী করবে সোমা ? তাকে রক্ষা করবে কী করে ? হয় গণভোগ্যা, নয় দাসী, আর নয় কুলনারী— বিবাহিতা ও গৃহকর্ত্রী— এর বাইরে তো কোনও পথ খোলা দেখতে পাই না !' একটু থেমে সে বলল, 'না, আরেকটি পথ আছে। নারীদের ধর্মাচরণে কেউ বাধা দেয় না দেখি। শ্রমণা হতে পারো। কিন্তু শুধু আর কোনও পথ খোলা নেই বলে, শুধু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, কোনও প্রবণতা না থাকা সত্ত্বেও, বৈরাগ্য বিনাই প্রব্রজ্যা ? সে-ও তো বন্দিত্বই ? একটা শেকল অত কষ্ট করে ছিন্ন করে সোমা তুমি কি তবে আরেকটা শেকল পরবে ?'

চণক যেন শুধু সোমাকে প্রশ্ন করছে না ? জিজ্ঞাসা করছে কক্ষের প্রাচীরগুলিকে, বাতাসকে। সে যে কোথাও থেকে কোনও সদুত্তর পাবে না—এ-ও যেন সে আগে থেকেই জেনে গেছে। সেই হতাশার দীর্ঘশ্বাস এবং নিরুপায় ক্রোধ তার গলায়।

জিতসোমা ধীরে ধীরে বলল, 'আপনিই যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, কে তবে আর পারবে ? আমি অপেক্ষা করে থাকবো। অপেক্ষা করবো এবং চিন্তা করবো। হয়ত আর কেউ না পারলে আমাকেই সন্ধান করে বার করতে হবে এর উত্তর। এবার বিশ্রাম করুন আর্য।'

সে উঠে দাঁড়াল। চণকের শয্যার আচ্ছাদনের ওপরটা হাত দিয়ে ঝেড়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। যেন কিছু বলবে, তার পরে চলে গেল কিছুই না বলে।

কিন্তু চণক অত সহজে ঘুমোতে পারল না। সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাতায়নপথে দুর্লক্ষ্য ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে রইল। শৈশবে মাতৃহীন চণক পিতা দেবরাতের কাছে একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছিল, সঙ্গে তার দুই জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। পিতার শিষ্যদের সঙ্গে একত্রে তিনজনে বিদ্যাভ্যাস করত। ভগ্নীদের যখন বিবাহ হয়ে গেল পিতা বড় দুঃখ পেয়েছিলেন, বলেছিলেন— এ দুটিও পুত্র হলে দেবরাতের বিদ্যা নির্ভয় হত। কন্যা দুটিকে দিয়ে অনেক কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করাবো ভেবেছিলাম। তখন, একমাত্র তখনই কিশোর চণক অনুভব করে স্ত্রী-জাতীয়দের ভাগ্য ভিন্ন প্রকার। গৃহ ও সন্তান ধারণের জন্য তাদের বদ্ধ হতে হয়। বিদ্যা খর্ব করতে হয়। হয়ত তার নিজের মাকে দেখা ছিল না, হয়ত কোনও পূর্ব সংস্কার ছিল না বলেই সে গভীরভাবে ভাবিত, আহত হয়েছিল। তারপর জিতসোমার আচার্যত্ব, নগরশোভিনী দেবদত্তার সঙ্গে পরিচয়। যা হয়ত কখনও দেখতে পেত না দেবদত্তা তাই দেখালেন। যা কখনও অনুভবের সীমার মধ্যে আসত না জিতসোমা তাই অনুভব করালো। কারণ একমাত্র শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রেমই আমাদের প্রশ্ন করতে বাধ্য করে এরূপ হয়েছে কেন ? অন্য রূপ কেন নয় ?

অবশেষে অনেক রাতে চণক তার পেটিকার মধ্য থেকে একটি পুঁথি বার করল। কখনও কাজলের রস, কখনও কুঙ্কুম রাগ দিয়ে পুঁথিটি লেখা। অসমাপ্ত। সে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করল। নারী—রাষ্ট্রব্যবস্থায় তার স্থান—বিভিন্ন ভূমিকা, বৃত্তি—ভবিষ্যৎ। লিখছে সে অনন্য মনে।

কিন্তু এই ভূর্জপত্রের ওপর তার পালকের লেখনী দ্রুত চলতে চায় না। চিন্তা তার চেয়ে অনেক দ্রুতগ। লিখতে লিখতে সে আরেকটি মন দিয়ে ভাবতে লাগল। লেখার এই অসুবিধা দূর করবার কোনও চেষ্টাই কেউ করে না। লিপিরও অনেক ত্রুটি। সমস্ত বিদ্যাই কণ্ঠস্থ করবার নিয়ম। লেখার প্রয়োজন হয় শুধু গণক-লেখকদের এবং পত্ররচনার জন্য। কিন্তু আচার্য দেবরাত যে শাস্ত্রের কথা ভাবছিলেন তা উচ্চতর দণ্ডনীতি। অনেক চিন্তার পর, প্রত্যক্ষ-দর্শন ও বিচার-বিশ্লেষণের পরে লেখা। তিনি পুঁথি রচনার কথাই তাই ভেবেছিলেন। অনেক সময়ে চণকের মনে হচ্ছে কোনও কোনও অধ্যায় নতুন করে সাজানো প্রয়োজন। এর জন্য কত ভূর্জপত্র নষ্ট হবে। কোনও উপায়ে যদি অন্য কোনও প্রকার পত্র পাওয়া যেত, এবং কোনও রস, যা দিয়ে সহজে লেখা যাবে। লেখনী নিয়েও সে নানা পরীক্ষা করছে। রস নিয়েও। কিন্তু ভূর্জপত্র ভঙ্গুর। পিতা দেবরাত ও পুত্র চণকের রাজশাস্ত্র যদিবা শেষ পর্যন্ত লিখিত হয়, কত দিন পর্যন্ত তা রক্ষা করা যাবে ? বিশেষত তাকে যে ভ্রমণ করতে করতে লিখতে হবে।

১৩

বারাণসীতে গঙ্গা পার হওয়ার পর থেকে ক্রোশের পর ক্রোশ চলেছে তাম্রক। তার সাজসজ্জায় ধুলো। আরোহীর দশাও তেমনই। মাঝে কোনও নিগমগ্রাম পড়লেও থামেনি তিষ্য। ফল, দুধ, মিষ্টান্ন দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। তাম্রককে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন বুঝলে ঢুকে পড়েছে কোনও উপবনে। সেখানে আরামিক কেউ থাকলে নিশ্চিন্তে জল খেয়েছে, তাম্রককেও ঘাস-জল খাইয়েছে। কিন্তু বারাণসীর পর থেকে নিদ্রাকে সে আর প্রশ্রয় দেয়নি। সাকেত থেকে রাজগৃহের পথে বহু দস্যু, চোর আছে, এটা সে জানত। কিন্তু পুরো গ্রামই চোর হবে, তার প্রতিবেশী গ্রামও চোরগ্রাম হবে এটা তার জানা ছিল না। নগর ছেড়ে যতই রাজ্য সীমানার দিকে এগিয়েছে ততই অরাজক অবস্থা দেখা গেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে কেন কোশলরাজকে মাঝে মাঝেই সীমান্তে দস্যু-দমন করতে যেতে হয়। গ্রামের পর গ্রাম যদি ক্ষুধার্ত থাকে তা হলে তো তারা বিদ্রোহী, দস্যু হবেই। মগধের সীমার মধ্যে প্রবেশ করার পর গ্রামগুলিকে খানিকটা সুবিন্যস্ত দেখল সে। কতকগুলি হাটে লোহিত অধোবাস, লোহিত উত্তরীয় ও যষ্টিধারী রাজভটদেরও সগর্বে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। কিন্তু তাদের সাহায্য নেওয়ার ইচ্ছে তার হয়নি। ভাবা যায় সাকেতের রাজকুমার, বন্ধুল মল্লর প্রিয় শিষ্য তিষ্য সামান্য রাজভটর অনুগ্রহ চাইছে! নিজের বাহুবল ও বুদ্ধিবলেই সে পথভয় জয় করবে। খালি মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করছে—কোশল। তার দেশ। এত বড় রাজ্য। মাথার ওপরে রাজা, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজার কনিষ্ঠ ভাইরা সব উপরাজ। অত ধনসম্পদ, বণিকদের যাতায়াত, যত দূর সে জানে শুল্কের জন্য কর্মিক, বিচারের জন্য বোহারিক। সেনা দেখাশোনার জন্য সেনাধ্যক্ষ। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য গ্রামভোজক এবং চোর ও দস্যুদমন করবার জন্য রাজভটরা রয়েছে। অর্থাৎ ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তা সবই আছে। অথচ কাজ ঠিকমতো হয় না। সব যেন অরক্ষিত, অরাজক। নগরীতে তো এসব বোঝা যায় না, বোঝা যায় দূরে বেরোলে। আর ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেণদের গ্রামটিই বা অমন কেন ? অত সুন্দর গোচর রয়েছে, গোধন নেই ? ছাগ বা মেষও তো দেখা গেল না, সামান্য দুটি গাভীর জন্য সেই স্ত্রীলোকটির কী আকূতি ! মন্দ্রাকে বিক্রি করে ওরা গাভী কিনতে চায়। মন্দ্রার কথা মনে করে ক্রোধে, হতাশায় তিষ্যর নিশ্বাস গাঢ় এবং গরম হয়ে উঠতে লাগল। ওই বেণগুলি কী বোকা অথচ কী ধূর্ত ! অত ভূমি পড়ে রয়েছে ! বলে কি না কস্সন তো জানি না ! রাজার কী এসব সন্ধান রাখা কাজ নয় ! দলিদ্দ গাম ! ভূমিগুলি কর্ষণ করলেই তো ওদের অবস্থা ফিরে যাবে। অথচ ! সে, তিষ্য যখন রাজ্য স্থাপন করবে তখন দেখবে প্রজাদের মধ্যে সব বৃত্তির লোক আছে কিনা। কূপ এবং পুষ্করিণী থাকবে প্রত্যেক গ্রামে পর্যাপ্ত সংখ্যায়। এবং ভূমি এরূপ অকর্ষিত ফেলে রাখা-চলবে না। এই সব হীন জাতি যারা বংশানুক্রমে একটি বৃত্তি নিয়ে আছে, তাদের যদি দারিদ্র্য না ঘোচে তো কর্ষণ শিখতে হবে। নিজেদের খাদ্যটুকু অন্তত নিজেরা উৎপাদন করে নিক ! তার রাজ্যেও পথে পথে রাজভট থাকবে, রক্ষীদের আগার থাকবে কিন্তু দস্যুবৃত্তি করার প্রয়োজনই হবে না, এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা সে করবে। হোক ছোট রাজ্য। না হোক কোশল বা মগধের মতো সম্পদশালী। হীরক যেমন আকারে ক্ষুদ্র হলেও কুশলী মণিকারের হাতে পড়লে ঝকঝক করে, তার রাজ্যও হবে তাই। তিষ্যর স্বপ্ন সফল হবেই।

অবশেষে রাজগৃহ। বিশাল প্রাচীর। তোরণ। ইন্দ্রকীল। যাতে হাতিতে ভাঙতে না পারে। তোরণ পেরিয়ে যখন সে প্রশস্ত রাজমার্গে পৌঁছল, তখন সকালের আলো সবে ফুটতে আরম্ভ করেছে। রাত্রে বিশ্রাম বা নিদ্রা বলতে তেমন কিছুই হয়নি। তবু নতুন দেশে, নতুন নগরে আসার উত্তেজনায় তার অদ্ভুত রোমাঞ্চ হচ্ছিল। প্রথম দর্শনেই মনে হচ্ছে নগরীটি সুন্দর। একে চিত্রের মতো করে সাজানো হয়েছে। বিশেষত দু' দিকেই পাহাড়। কোলে কোলে বহু ছায়াবৃক্ষ। যেতে যেতে সে বাঁ দিকের একটি সরু পথে ঢুকল। বন্ধুর পথ। সম্ভবত পাহাড় কেটেই নির্মিত হয়েছে, ঢেউ খেলে খেলে চলেছে পথটি। তার ওপর তাম্বকের ক্ষুরের আওয়াজ শোনাচ্ছে খট্টমট্ট, খট্টমট্ট, খট্টমট্ট।

এক পথিককে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল 'এই পথ কোথায় গেছে ?'—ইসিগিলি— বলে লোকটি চলে গেল। তার হাতে বেতের সাজিতে ফুলের মালা, বিল্ব, তুলসীপত্র, ধূপ প্রভৃতি বহু উপকরণ। কারও বন্দনা করতে যাচ্ছে নাকি ? বিদেশের কথা বলতেও উৎসুক মনে হল না। বিদেশি দেখেও কৌতূহল নেই। অথচ, সে শুনেছিল, মগধবাসীরা নাকি সর্বদাই বকবক করে। শোনা কথায় আর নিজের চোখে দেখা, নিজের কানে শোনায় অনেক পার্থক্য। সে-কথা তিষ্য ভালোভাবেই বুঝতে পারছে এখন। শ্রাবস্তীতে রাজসভার কোনও পদপ্রাপ্তির জন্য ফিরে না-গিয়ে সে ভালই করেছে সুরক্ষিত স্থান এবং বহুজনের পদচিহ্ন লাঞ্ছিত পথ তাকে সমৃদ্ধি দিতে পারে, স্বস্তিও দিতে পারে, কিন্তু সে যে অন্য কিছু করতে চায়। ওই যে পুণ্যশীল নামে বণিক যুবাটি বলছিল সবই গড্ডলিকা। সে-ও তাই মনে করে। তবে এই গড্ডলস্রোতেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা গড্ডলদের জন্যই। সবাই যদি মৌলিক চিন্তা করবে তবে তার প্রয়োগ হবে কাদের ওপর ? সবাই যদি অজপালক হবে তো অজ হবে কারা ? সে চিন্তক, পালক। সাকেতকুমার, সর্বশাস্ত্রবিদ, তক্ষশিলার সম্মানিত স্নাতক তিষ্য প্রণয়ে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে দর্পী আঢ্যকন্যার দ্বারা। তার ঘোড়াটিও চুরি গিয়ে থাকতে পারে প্রথমবারের অনবধানতায়। কিন্তু সে তো আর গড্ডল নয় !

এই সময়ে, একটি বাঁক ফিরতেই সে পাহাড়ে ওঠার আঁকাবাঁকা ঊর্ধ্বমুখ পথটি সুদ্ধ ইসিগিলি পাহাড় দেখতে পেল স্পষ্টভাবে। পাহাড়ের কোলে কোলে কুটী। সবচেয়ে কৌতুকের বিষয় পথের দু' পাশে সে কয়েকজন নগ্ন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল। অন্য সময় হলে সে বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিত। কিন্তু সন্ন্যাসীগুলি এমন গাছের শুকনো, মরা ডালের মতো দেখতে, মাথাগুলি এমন নিঃশেষে মুণ্ডিত, তার ওপরে এক পায়ে এমন বকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে, তার কৌতূহল হল। এঁরা কি আজীবক ? এ ধরনের তপস্বী সে আগে দেখেনি। তক্ষশিলার সংলগ্ন বনে সে বহু মুনি দেখেছে। তাঁরা ব্রাহ্মণের অবশ্যকৃত্য যজ্ঞাদিও করে থাকেন। বনবাসী জ্ঞানীজনেরা অধিকাংশই শিষ্যগ্রহণ করেন। বিবাহাদি করেন, প্রায়ই একাধিক। জীবনকে ভালই উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু এরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করেন এমন তপস্বী সে উত্তরের দিকে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। তবে শ্রাবস্তীতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাকেতে এই কুশ্রী, মলিন লোকগুলিকে দেখেছে। প্রকৃত কথা, তপস্বী, শ্রমণ সন্ন্যাসী এঁদের দেখবামাত্র সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কোনও দিন ভালভাবে লক্ষ্য করে না। সম্প্রতি এক ঋদ্ধিমতী শ্রমণার সঙ্গে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যাওয়া এবং তাঁর গরিমামণ্ডিত আচরণ ও অলৌকিক ক্ষমতার দর্শনে তার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। সে দেখল, তার থেকে সবচেয়ে দূরে যিনি দাঁড়িয়ে সেই তপস্বীর সঙ্গে একজন কাষায়ধারী গৌরবর্ণ শ্রমণ যেন কথা বলছেন। তা হলে, তপস্যারত হলেও এঁরা কথা বলে থাকেন! সে তাম্রকের পিঠ থেকে নেমে তার রাশ ধরে এগিয়ে গেল।

গৌরবর্ণ শ্রমণ তার দিকে পাশ ফিরে আছেন। তাঁর উন্নত শির, দীর্ঘ সুগোল গ্রীবা, বৃষস্কন্ধ এবং দাঁড়াবার অপূর্ব রাজকীয় ভঙ্গি দেখে তিষ্য মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মনে পড়ে গেল কুণ্ডলকেশী শ্রমণার কথা। এঁরা কি একই সম্প্রদায়ের? শ্রমণা কিন্তু শ্বেত বস্ত্র পরেছিলেন, এই শ্রমণ পরেছেন রক্তকাষায়। পথের পাশে দণ্ডায়মান তাপসদের সঙ্গে এই শ্রমণের কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

শ্রমণ তাপসদের বললেন—আবুস, একভাবে এ প্রকার দাঁড়িয়ে আছ কতদিন?

—তা তিনদিন তো হবেই সমন।

—কিন্তু এভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে কী লাভের আশা করছ?

—পূর্ব জন্মের পাপগুলি সব জীর্ণ করছি সমন, নূতন পাপও আর হচ্ছে না, এইভাবে শীঘ্র কর্মক্ষয় হয়ে আগামী জন্মেই সব দুঃখের অবসান হবে।

—আচ্ছা নিগ্গণ্ঠ তাপস, তোমরা পূর্বজন্মে ছিলে কি ছিলে না, জানো কী?

—না, তা জানি না, নাতপুত্ত বলেছেন তাই জানি।

—আচ্ছা, পূর্ব জন্মে পাপ করেছিলে কি করোনি অন্তত এটুকু নিশ্চয় জানো।

—না, তা জানি না।

—আচ্ছা, তবে পাপগুলি কী প্রকারের ছিল, তা জান?

—না, এটাও জানি না।

—বেশ, তোমাদের কতখানি দুঃখ নষ্ট হয়েছে, কতটা এখনও অবশিষ্ট আছে?

—তা-ও জানি না।

—তা হলে কিছুই নিশ্চিত না জেনে তোমরা এরূপ কষ্ট বরণ করবে?

একজন বয়স্ক তাপস তখন বললেন, আয়ুষ্মান গোতম, সুখে সুখ পাওয়া যায় না। দুঃখেই সুখ পাওয়া যায়। যদি সুখে সুখ পাওয়া যায় তা হলে রাজা বিম্বিসার আয়ুষ্মান গোতমের থেকে অধিক সুখী। কেমন কিনা?

বয়স্ক তাপসের শুকনো আমলকীর মতো মুখটি ঝিকমিক করছে, ভাবটা—কেমন বিপাকে ফেলেছি?

তিষ্য এই ধরনের তর্কাতর্কি, তক্ষশিলায় থাকতে কোনও কোনও আচার্য গৃহে শুনেছে। সে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে ইনি কী উত্তর দেন।

মৃদু হাসলেন কাষায়ধারী শ্রমণ। বোঝা যাচ্ছে ইনি বেশ রসিক ব্যক্তিও। তারপর বললেন— হে নিগ্গণ্ঠ, ভালো করে বিচার করে এ কথা বললে কী? বলি, রাজা বিম্বিসার সাতদিন অনবরত সোজা হয়ে বসে একটিও কথা না বলে নির্জনসুখ অনুভব করতে পারবেন?

তাপসরা মাথা নাড়লেন—না। তা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয় বটে।

—সমন গোতম কিন্তু ওভাবেও, অর্থাৎ নির্জনব্রতেও সুখ অনুভব করতে পারেন। তা হলে এখন রাজা বিম্বিসার ঐশ্বর্য নিয়ে অধিক সুখী না সমন গোতম চীবর বস্ত্র আর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে?

—যদি তা-ই হয় তাহলে সমন গোতমকেই অধিক সুখী বলা উচিত।

শ্রমণের জয়ে তিষ্য মনে মনে আহ্লাদিত হয়। 'সাধু সাধু' বলে উঠবে কি না ভাবে। কিন্তু শ্রমণ তার আগেই কথা বলে উঠলেন।

—কিন্তু আবুস, সমন গোতম সর্বাবস্থায় সুখী থাকার এই ক্ষমতা কৃচ্ছ্রসাধন করে অর্জন করেননি। তিনি প্রথমে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। তিনি এমন তপস্যা করেন যে, তাঁর শরীরের গাঁটগুলি অসীতক লতার মতো দেখাত, মেরুদণ্ড সুতার গুটির মালার মতো হয়ে যায়, ভাঙা ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁটিগুলি যেমন নড়বড়ে হয়ে যায় তাঁর ঘাড়ও সেইরূপ হয়ে গেল। চোখের তারা এত ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল যেন গভীর কুয়োতে নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়েছে। শিরদাঁড়া ও পেটের চর্ম এক হয়ে গিয়েছিল। শরীরে হাত বুলোলে রোমগুলি আপনি ঝরে পড়ত। কিন্তু তাতে তাঁর দুঃখনিবৃত্তি হয়নি, সুখে বিচরণ করবার ক্ষমতাও হয়নি। শরীরকে অধিক দুঃখ দিলে চিত্ত অস্থির হয়, আবুস। অস্থির চিত্ত দ্বারা শুভ বিতর্কে মনকে স্থাপন করা যায় না। মন সংস্থাপিত না হলে ধ্যান সম্ভব হয় না। একমাত্র ধ্যান দ্বারাই বাসনাচ্ছেদ করা যায়। বাসনাচ্ছেদই সুখী হবার একমাত্র উপায়।

—সমন গোতমের কথা যুক্তিসিদ্ধ। একজন তাপস বললেন।

আরেকজন বললেন—কিন্তু নাথপুত্তের কথা আমাদের ভালো লাগে। পরের জন্মে সব দুঃখের অবসান হবে ভাবলে এ জন্মে আমি অগ্নি থেকে উত্থিত ধোঁয়া পান করেও কাটাতে পারি।

সৌম্য শ্রমণ ততক্ষণে চলতে শুরু করেছেন। তাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র। তিষ্য লক্ষ্য করল তাঁর মাথায় কুঞ্চিত কেশ সবে জন্মাতে আরম্ভ করেছে। মাথার মাঝখানটা একটু উঁচু। হঠাৎ দেখলে মনে হবে মাথায় ছোট একটি চূড়া বাঁধা হয়েছে। শ্রমণ নগরের দিকে প্রবেশ করছেন। তিষ্যও তাঁকে বিরক্ত না করে তাঁর পেছন পেছন যেতে লাগল।

হঠাৎ পেছন থেকে তিন-চারজন নগ্ন তাপস ছুটে এসে শ্রমণের পথ রোধ করে দাঁড়াল। একজন বলল—ভন্তে, আপনি কি বলছেন তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় হয় না?

—অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রে শক্তিই ক্ষয় হয় আবুস, পাপ ক্ষয় হয় বলে জানি না।

—আপনি যে-পথ আবিষ্কার করেছেন তাতে সুখী হওয়া যায়?

—অনন্ত সুখের অভিমুখে যা নিয়ে যায় তাই সদ্ধম্ম।

—আমরা যদি আপনাকে অনুসরণ করি, নিয়মমতো আহার করতে পারব? বস্ত্র পরতে পারব? এভাবে লোকালয়ে যেতে আমাদের লজ্জা হয়।

তিষ্য দেখল শ্রমণের মুখ সামান্য স্মিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'সাক্কপুত্তীয় সমনরা একবেলা আহার করে, রাত্রে দুগ্ধ বা ঘোল পান করতে পারে, উত্তমরূপে শরীর আবৃত না-করে জনপথে বের হওয়া তাদের নিষিদ্ধ।'

—আর তপস্যা?

—ধ্যান মার্গ। অন্য তপঃ নেই। আচারিয়র কাছে কর্মস্থান জেনে নিয়ে ধ্যান করতে হয় হে নিগ্‌গণ্ঠ তাপস। নিজের সমস্ত কাজ করতে হয়। সংঘের যে কাজের ভার পাবে, তা-ও।

—সংঘং সরণং গচ্ছামি—একজন তাপস বলে উঠলেন।

শ্রমণ মৃদু হেসে বললেন—সত্যই যদি সমন গোতমের কথায় আস্থা হয়ে থাকে তবে তিসরণ নিতে হবে। বেলুবনে যেও, তখন কথা হবে। এখন আমি ভিক্ষায় বেরিয়েছি।

শ্রমণ এগিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে একজন তাপস হঠাৎ তিষ্যর দিকে এগিয়ে এসে বললেন—ভদ্দ, আমাদের কৌপীন বস্ত্রের মতো টুকরো কিছু দিতে পারেন? এভাবে বেলুবনে গেলে সাক্কপুত্তীয় ভিক্খুরা আমাদের উপহাস করবে।

তিষ্য বলল—নীল রঙের বস্ত্রে হবে? আমার কাছে যে উত্তরীয় ও শাটক আছে তাতে আপনাদের চারজনেরই লজ্জা রক্ষা হয়ে যাবে।

—যদি অনুগ্রহ করে দেন।

তিষ্য তৎক্ষণাৎ তার বেত্রপেটিকা থেকে বস্ত্র বার করে দিল। তাপসরা সে দুটি নিয়ে আবার ইসিগিলির দিকে প্রস্থান করলেন। তিষ্য পেছন থেকে হেঁকে বলল—কই শ্রমণ। আমাকে তো আশীর্বাদ করলেন না?

যেতে যেতে একজন মুখ ফিরিয়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললেন—দান করার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যফল পাবে। আশীর্বাদের প্রয়োজন কী?

তাদের শুকনো ডালের মতো শরীর। কালিবর্ণ দেহত্বক। তার ওপরে গাঢ় নীল বস্ত্র কী রকম মানাবে কল্পনা করতে গিয়ে তিষ্যর হাসি পেয়ে গেল। সে তাম্রকের পিঠে চড়ে আপনমনেই হাসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসতে এগোল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উজ্জ্বলকান্তি শ্রমণকে ধরে ফেলল সে। বেশ হনহন করে চলছিলেন শ্রমণ। অথচ এই দ্রুতগতির মধ্যেও কোনও তাড়া ছিল না। তিনি যখন কথা বলছিলেন, মনে হচ্ছিল আরেকটু বলুন। এখন চলছেন, মনে হচ্ছে আর একটু চলুন। বস্তুত তার সারা জীবনে তিষ্য এমন কান্তিমান কাউকে কখনও দেখেনি। সন্ধ্যা হলে সে মনে করত ইনি কোনও দেবতা। হয়ত স্বয়ং ইন্দ্রই নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে। সন্ধ্যা হলে দেবতার আবির্ভাব সে কেন বিশ্বাস করতে পারত, দিনের আলো বলে কেনই বা বিশ্বাস করতে পারছে না এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে অবশ্য বলতে পারবে না। এখন তাকে অতিথিশালার সন্ধান দেখতে হবে, একটি দাস কিনতে পারলে ভালো হয়, বস্ত্র যা ছিল নগ্ন তাপসদের দিয়ে দিয়েছে, তাও কিনতে হবে। স্নানাহার, নিদ্রা, রাজগৃহে অতঃপর সে কী করবে এ নিয়েও নানা চিন্তা করবার আছে। কিন্তু এই শ্রমণকে সে যেন কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। ইনি শ্রমণ গোতম। থাকেন বেলুবন নামক স্থানে। এটুকু জানা গেছে। এঁর সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী সে।

শ্রমণের পাশে পৌঁছে সে এক লাফে ঘোড়া থেকে নামল। চেঁচিয়ে বলল—ভো শ্রমণ! আমার কথা একটু শুনবেন!

শ্রমণ দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু মনে হল তিনি অন্যমনস্ক। কিছু একটা ভাবছেন। তিষ্য বলল—আমি সাকেত থেকে আসছি। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। ক্লান্তও। এ নগরের কিছুই জানি না। ওই যে বেলুবনের নাম করলেন। ওখানে কি আমার আশ্রয় হতে পারে?

শ্রমণ বললেন—আয়ুষ্মান, তুমি কি পব্বজ্জা নিতে চাও?

—না, না।

—ধম্মের আশ্রয় যে নিতে চায়, সে বেলুবনে যেতে পারে। পৃথক-জনেরা যাক রাজমার্গের আবসথাগারে। এখান থেকে দক্ষিণে গেলেই প্রশস্ত মার্গ পাবে।

—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন, শ্রমণ?

—তথাগত কোথাও যান না আয়ুষ্মান, তিনি পৌঁছে গেছেন। তিনি শুধু ধীরে ধীরে চারণ ও চংক্রমণ করেন।

—কিন্তু আমি তো দেখলাম আপনি অত্যন্ত দ্রুতবেগে যাচ্ছেন!

—তথাগতের পক্ষে যা ধীরতা, পৃথকজনের পক্ষে তাই দ্রুতি। তথাগত যা সহজে পারেন, পৃথক-জনের তাই করতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে পারে।

শ্রমণ আর দাঁড়ালেন না। সেই একই প্রকার উদাসীন মুখে যেদিকে যাচ্ছিলেন, চলে গেলেন।

তিষ্য রাজমার্গের দিকে চলতে চলতে ভাবল এঁরা অর্থাৎ ইনি এবং সেই কুণ্ডলকেশী শ্রমণা এঁরা সকলেই কেমন রহস্য-ভাষায় কথা বলেন। যেন যা বলছেন তার চেয়ে অনেক বেশি বলছেন মনে হয়। যেন অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পান এঁরা। ভবিষ্যৎ জানেন। সাধারণ জ্যোতিষীর মতো নক্ষত্রের অবস্থান দেখে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা নয়। কোনও স্থান, কোনও মানুষকে দেখবামাত্র এগুলির সম্পর্কে সব জানতে পারেন। ঋদ্ধি। এ এক প্রকার ঋদ্ধি!

এই শ্রমণ নিজেকে তথাগত বলছেন। এই শব্দটা সে যেন কোথায় শুনেছে। মনে করতে পারছে না। যাক এঁর বাসস্থান কোথায় জানা গেছে। সে আগে একটা আবসথাগার ঠিক করে নিক। বেলুবনে সে যাবে।

যে অতিথিশালায় রাজকুমার তিষ্য আশ্রয় নিল সেটি রাজগৃহের অপর প্রান্তে। নগরীর উত্তরদিকের প্রাকার আর কিছুদূর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। আশ্রয় পাবার পর তিষ্য বুঝতে পারল সে কত ক্লান্ত। বস্তুত তার তেইশ-চব্বিশ বছরের জীবনে দীর্ঘপথ ভ্রমণ সে অনেকবার করেছে। সাকেত থেকে তক্ষশিলা, শ্রাবস্তী থেকে সাকেত। কিন্তু এই যাত্রাগুলোর শেষে সবসময়েই কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকত। আশ্রয়ের আশ্বাস তো থাকতই। আরও শেখা হচ্ছে, আরও জানা হচ্ছে। উন্নতির পথ ক্রমশই প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে, এরপরে সব কাম্যই পাওয়া যাবে এইরকম একটা স্থির ধারণা থাকত। তা-ই-ই সম্ভবত ক্লান্তি আসত না, এলেও দূর হত অচিরেই।

দীর্ঘ পথ পার হয়ে তক্ষশিলায় যখন পৌঁছল আচার্য সংকৃতির কাছে তখন শিষ্য বলে গৃহীত হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় লাগেনি। তক্ষশিলার প্রান্তীয় অরণ্যে তাঁর আবাস। প্রচুর গোধন। তারা সব ছাত্র মিলে সেই গরুগুলির সেবা করত, সমিধ্ আহরণ করে আনত, পানীয় জল আনত। পূণ্য শিষ্যরাই অবশ্য করত অধিক। কিন্তু তাদেরও যথেষ্ট করতে হত। তারপর ঋক্ আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হত প্রতিদিনের পাঠ। সারাদিন থেমে থেমে চলত। আলস্যের কোনও অবকাশই ছিল না। গুরুপত্নীরা মাঝে মাঝেই উত্ত্যক্ত করতেন। তাঁদের নানা প্রকার অনুরোধ-উপরোধ-আদেশ থাকত। বিশেষত কনিষ্ঠা গুরুপত্নী অলভা ছিলেন তার থেকে সামান্য বড়। স্বভাবে চঞ্চল। ভয়ানক জ্বালাতন করতেন। বিশেষ করেই তিষ্যকে।

—তিষ্য কুমার, তিষ্য! ফুল তুলে আনো। শীঘ্র যাও। মালা গাঁথব। ফুল তুলে আনার পর অসন্তোষ প্রকাশ করতেন—শুধু শ্বেত ফুল এনেছ কেন? এর সঙ্গে পীত, রক্তবর্ণ সব মিলিয়ে আনবে তো? এ কি তোমার বৃদ্ধ গুরুর জন্য না কি?

—তবে কার জন্য?

—গুরুপত্নীর জন্য। যার মাথার কেশগুলির সব পাকা সে পরুক গিয়ে শ্বেত মালা, বলতে বলতে হাসতে থাকেন অলভা। আবার ছোটাতেন তিষ্যকে। ফিরে এলেই বলবেন —বিপণি থেকে এলাচি এনে দেবে আমায় কাল? এলাচি, যাউতে দেবো। সে যদি বলত তার গুরু সুধন্বার কাছে যাবার আছে, অলভা চোখ পাকিয়ে বলতেন—গুরুপত্নীকে দক্ষিণা না দিলে কোনও বিদ্যাই লাভ হবে না তা জানো? গুরুকে একবারে দিলেই হয়। গুরুপত্নীকে দিতে হয় বারে বারে। যাও এখন পুরোডাশের যবপিণ্ডটি থেসে দাও তো! শক্ত হয়ে গেছে। তোমার পেশীবল বাড়বে। কই দাঁড়িয়ে রইল কেন, যাও?

তিষ্য রাগ করে বলত—আপনি তবে কী করবেন?

—আমি এখন উডুম্বর পাড়তে যাচ্ছি', বলে অলভা গাছেই উঠে বসে থাকতেন। এ ছাড়াও ঘৃত প্রস্তুত হচ্ছে, অতিরিক্ত পুড়ে না যায় দেখো। দুগ্ধ জ্বাল হচ্ছে; দাঁড়িয়ে থাক ঠায়। গুরুপত্নীরা সব গা ধুয়ে সাজসজ্জা করতে ব্যস্ত। তার অনেক সহাধ্যায়ী এসব সাগ্রহে করত। এই সব কাজ পাঠের একঘেঁয়েমির মধ্যে বৈচিত্র্য আনত হয়ত। অনেকের আবার দৃঢ় ধারণা ছিল গুরুসেবা করলে পাঠ্য তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্থ হবে। গুরুর আশীর্বাদ না পেলে বেদ হৃদয়স্থ হবে না।

তিষ্য কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছিল যেদিন অতিরিক্ত গৃহকর্ম করতে হত সেদিন তার পাঠের পরিমাণও কমে যেত। গুরুর ব্যাখ্যা মাথায় ঢুকত না। ঘুম এসে যেত। আচার্য তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। বিনয়ে অবনত অমনোযোগী ছাত্রের চেয়ে তিনি মেধাবী মনোযোগী ছাত্রদের ভালবাসতেন। সেবা একটু অল্প করলেও কিছু মনে করতেন না। একদিন সাহস করে সে জিজ্ঞাসা করেছিল—পুরাকালে শুনেছি অনেকে শুধু গুরুসেবা করেই বিদ্যা লাভ করেছেন, এমন হয়?

আচার্য হেসে বলেছিলেন—কেন? তিষ্যর কি মেধা হঠাৎ অল্প হয়ে গেল? না কি অধ্যয়নে আর মন নেই?

—তিষ্যর মেধা বা মনোযোগের কথা তার আচার্যদেবই ভালো জানেন। কিন্তু যার মেধা নেই, সে কি শুধু সেবা করেই...

আচার্য গম্ভীর হয়ে বললেন— না তিষ্য। কথাটা ঠিক তা নয়। কিন্তু মেধা অনেক সময়ে সুপ্ত থাকে। সম্যক বাধাপ্রাপ্ত হলে তবে জাগ্রত হয়। এ ছাড়াও আবার অনেক অল্পবুদ্ধি শিষ্য সেবার মধ্য দিয়ে অনেক ব্যবহারিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, আপনা থেকেই তার মনে প্রশ্ন জাগে, একাগ্রতা আসে। প্রশ্ন জাগানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই প্রশ্নের পথ ধরেই আসেন বেদ।

—কিন্তু আচার্য, আমরা তো সবই নির্বিচারে কণ্ঠস্থ করতেই শিখি।

আচার্য বললেন—কী আছে না জানলে কী প্রশ্ন করতে হবে জানবে কী করে! তা ছাড়া তিষ্য, বিদ্যা এক, কিন্তু তার প্রয়োগ বহু। অধিকারভেদ আছে। প্রতি বৎসর আমাদের কাছে শত শত শিষ্য আসে। সকলেই কী এক কাজ করবে? আচার্য হবে, কিংবা চিন্তক হবে, জীবনের মূল রহস্যগুলি ভেদ করতে চাইবে এমন শিষ্য কজন? তুমি নিজেই বলো না, তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছ এখানে? পণ্ডিত হবে? বৈয়াকরণ হবে? জীবনরহস্যের সমাধান করবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না, আচার্য, তা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি যোগ্য রাজ্যের যোগ্য রাজা হতে চাই। কিন্তু রাজা হতে গেলে শুধু ধনুর্বেদ জানাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি না। বড় বড় মানুষরা কী ভেবেছেন, ভাবছেন, সেই তত্ত্বগুলি জানতে জানতে আমার চরিত্র শোধিত, শীলিত, মার্জিত হয়ে উঠছে। এই বিদ্যা আমার মনকে সঠিক পথে চিন্তা করতে শেখাচ্ছে, প্রত্যয় দিচ্ছে।

তিষ্য আরও বলতে যাচ্ছিল, আচার্য তাকে থামিয়ে বললেন, তাই-ই বলছিলাম বিদ্যা এক, কিন্তু বহুধা হয়ে যায়। প্রয়োগ ভেদে, উদ্দেশ্য ভেদে। অধিকারী-ভেদে। এখন বুদ্ধিও তো সবার সমান নয়! নিরলস সেবার গুণে যদি গুরুর বিশেষ স্নেহদৃষ্টি খুলে যায় তা হলে তিনি কঠিন বিষয়কে সরলতর করে বুঝিয়ে দেবার প্রেরণা পান। গুরু-শিষ্য পরস্পরকে এইভাবে সাহায্য করেন। তবে অতিশয় নির্বোধ হলে আর কিছুতেই কিছু হয় না। সেই লাঙলের ঈষের কাহিনী জানো না?

—কী কাহিনী আচার্যদেব?

—নির্বোধ শিষ্য বহু সেবা করার পর গুরু মনে করলেন তাকে সহজতম পন্থায় শেখাবেন! তিনি তাকে কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করে আনতে বললেন। ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলেন—কী দেখেছ?

—সর্প দেখেছি।

—সর্প কী প্রকার?

—লাঙলের ঈষের মতো। —এইভাবে হাতি দেখে এসেও সে বলল—হাতি ঈষের মতো।

গুরু ভাবলেন, হাতির শুঁড়ের কথা মনে করে এই উপমা ব্যবহার করছে শিষ্য। তিনি হৃষ্টচিত্তে তাকে আবার পাঠালেন। কিন্তু নির্বোধ যা দেখে আসে তাকেই লাঙলের ইষার মতো বলে বর্ণনা করে। তিনি ভেবেছিলেন উপমা প্রয়োগ ও কার্যকারণ সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞান থেকে তার শিক্ষারম্ভ হবে। এখন তিনি বুঝলেন—না, এর দ্বারা কিছু হবে না।

গুরু সংকৃতির কাছ থেকেই তিষ্য জানতে পারে বহু আচার্য এইভাবে, সেবা লাভ করবার জন্য সেবার মাহাত্ম্য রটিয়ে থাকেন। যাঁদের প্রচুর ভূমি এবং দাস আছে তাঁদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষে দাস-দাসী পাওয়া গেলেও ভূমি অত সহজে মেলে না। ভূমি না থাকলে দাস-দাসী পালন করা যায় না। ভূমি নিয়ে এইসব কুলপতি আচার্যরা করবেনই বা কী? ভূমি-কর্ষণের জটিল কাজ পরিদর্শন করবারই বা তাঁদের সময় কই! তাই তাঁরা অধিকাংশই দাস-দাসীগুলি বিক্রি করে দেন। শিষ্যরা গৃহকর্ম, গো-সেবা করে দিলে খুবই সহজে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আচার্য অবশ্য ঠিক এভাবে বলেননি। শুধু ইঙ্গিত করেছিলেন। তার থেকেই তিষ্য বুঝতে পারে গুরুসেবা করে বিদ্যা লাভ করবার কাহিনীগুলি চতুর মস্তিষ্কের উদ্ভাবন। তবে এসব কথা জানবার, বোঝবার পরেও সে তার যেটুকু কর্তব্য সেটুকু সেবা দিয়েছে। কখনও কখনও ভেতরে ভেতরে একটা অহঙ্কার মাথা তুলত— আমি সহস্র কার্ষাপণ দক্ষিণা দিয়ে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে তার মন তাকে বোঝাত গুরু বিরূপ হলে বহু সহস্র কার্ষাপণেও কিছু হবে না। সামান্য বাঁকা হাসি ভেতরে ভেতরে হেসে সে তার ভাগের গাভীগুলিকে দোহন করত, সকাল-বিকেল পরিচর্যা করত। সতীর্থ ছিল অনেক। কিন্তু প্রাণের বন্ধু কেউ না। বেদ-বেদাঙ্গগুলি শিখে পরম সন্তুষ্ট হয়ে স্নাতক হয়ে চলে যেত। কারও কাছেই মনের গোপন প্রশ্নগুলি করতে পারত না তিষ্য। হঠকারিতা করে তো কোনও লাভ নেই। অন্যান্য আচার্যের শিষ্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা সে যে করেনি তা নয়, কিন্তু সকলেই নিজের অধ্যয়নে এত একাগ্র যে, বন্ধুত্বে তেমন গাঢ়তা জন্মাবার সুযোগই হত না। গুরু সংকৃতি তার অস্থিরতা উপলব্ধি করে মাঝে মাঝে বলতেন— গুরুগৃহে শিক্ষার কাল পূর্বজদের আহৃত বিদ্যা হৃদয়ঙ্গম করার কাল, বৎস। প্রশ্নগুলি সমাবর্তনের পর যখন দেশে দেশে জীবিকার জন্য ভ্রমণ করবে তখন কোরো।

—তখন আপনাকে কোথায় পাবো?

সংকৃতি হেসে বলতেন—তখন দেখবে পথে, ঘাটে, নদীতে, অরণ্যে, রাজদ্বারে, শ্মশানে সর্বত্রই গুরু। শুধু চিনতে পারলেই হল।

—সর্বত্রই গুরু? গুরু অতো সুলভ হলে এত যোজন পথ পার হয়ে আমরা তক্ষশিলায় আসি কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—যার থেকে সামান্যতম হলেও জ্ঞান লাভ করা যায়, সেও গুরু। এই যে তুমি ত্রিবেদ শিক্ষা করলে, তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, যদি ক্ষত্রিয় বৃত্তিই অবলম্বন করো, তা হলে এ বিদ্যা তোমার সেভাবে কাজে লাগবে না। এ শুধু তোমাকে দেবে একটি সম্যক দৃষ্টি। সে দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে পারবে। আর পাবে একটি অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষটি ভেতরে থাকলে জীবনের কোনও কাজ কঠিন লাগে না, নীরস লাগে না।

—কিন্তু আচার্য আপনি যে বলেছিলেন প্রশ্নের পথ ধরেই বেদবিদ্যা আসে ?

—সে স্বতন্ত্র প্রশ্ন বৎস তিষ্য। আমার এক সহাধ্যায়ী ছিলেন সুহোত্র। সামান্য পর্ণিকের পুত্র। তিনি তো দ্রষ্টা ঋষি হয়ে যান। প্রতিদিন শতাধিক গাভী নিয়ে গো-চারণে চলে যেতেন ভোরবেলায়। দেখতেন কীভাবে ধীরে ধীরে রাত কেটে ভোর হচ্ছে। সতেজ ঘাসগুলি উদর পুরে খাওয়ার পর সুহোত্রর ধেনুরা এতই সন্তুষ্ট হত যে, সেই গো-চরেই তাদের দুগ্ধক্ষরণ হত। সুহোত্রর অসুবিধা হবে বুঝে ধেনুগুলি একের পর এক তার দুগ্ধভাণ্ডগুলির ওপর এসে দাঁড়াত। কেউ তাদের শেখায়নি। সেই দেখতে দেখতে সুহোত্রর হৃদয়ে ঋক্ প্রবেশ করল।

আদিত্যের গোষ্ঠ থেকে আলো
ধেনুর মতো ধাক।
আকাশ মাঠে চরতে যাক তারা
প্রাণের ক্ষীর ক্ষরাক ॥

আকাশ আছে ধেনুতে
ধেনুও আছে আকাশে।
দুগ্ধ যেমন ভূমিতে
ভূমিও তেমন দোহতে ॥

বাক্ স্বয়ং যদি বরণ না করেন, তবে ঋষি ঋক্ দেখতে পান না। সুহোত্র দেখতে পেতেন। তাই বলতেন :

হে ধেনু এবার হরষিত করো
আমার চিত্ত ভূমি।
পান করাও। স্নান করাও
ভাসাও, ডোবাও, দেখাও আলোর উৎসরণের ভূমি ॥
আলোয় আঁধার হয়ে পান করো
জীবন, তোমার পেয়
আঁধারে মানিক হয়ে জ্বলে ওঠো
দেখাও কোথায় গেহ ॥

গুরু সংকৃতি তিষ্যকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে সেবার তত্ত্ব থেকে আলোর তত্ত্ব, আলোর তত্ত্ব থেকে অমৃতের তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন ঋষি সুহোত্র। কীভাবে জীবনের মূল তত্ত্ব জানবার পর মৃত্যুভয় জয় করেছিলেন। সুহোত্র বলতেন, পূর্বজরা যে গো কামনা করতেন তার সবটাই শুধু গোধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা নয়, তাঁরাও অনেক সময়ে 'গো' বলতে আলো বুঝিয়েছেন। 'দ্বয়ি' অর্থে সব সময়ে পার্থিব ঐশ্বর্য নয়, আলোর তত্ত্ব জানতে চাইতেন। যজ্ঞগুলি তাই নিরর্থ হয়ে যায় যদি মন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ না-বুঝে শুধু ধেনুর কামনাতেই যজ্ঞ করা হয়। সুহোত্রর মত ছিল যজ্ঞ— মানসযজ্ঞ। অরণ্য-পৃথিবী-আকাশ বেষ্টিত মানুষের প্রাণপণে সৃষ্টিতত্ত্বের ভেতরে প্রবেশ করতে চাওয়া। সুহোত্রর এই ব্যাখ্যায় অনেকেই তুষ্ট হতে পারেনি। বিশাল কর্মকাণ্ডের অনেকটাই তো তাহলে মিথ্যা হয়ে যায়। যজ্ঞ, যজ্ঞ উপলক্ষ্যে মহতী সভা, সাধুজন সমাবেশ, দান-দক্ষিণা সবই বন্ধ হয়ে যায়। কেউ অস্বীকার করছে না, যজ্ঞে যজমান নিজেকেই দেবতার কাছে বলি দেন। পশুগুলি যজমানেরই প্রতীক। কিন্তু সুহোত্র বলতে থাকেন এই প্রতীকের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই ঋত্বিকের। যজ্ঞ মানে দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ। নিজের যা সবচেয়ে প্রিয় সেই আপনাকে ত্যাগ হলেই যজ্ঞ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থময় হয়ে ওঠে। এতে প্রয়োজন নেই ঋত্বিকের। মানুষ নিজেই অধ্বর্যু, নিজেই হোতা, নিজেই ব্রহ্মা, নিজেই অগ্নীৎ। নিজেকে সম্পূর্ণ তন্ময় করাই আত্মোৎসর্গ। তবে সুহোত্রর তাঁর মতামতগুলি প্রচারে মন ছিল না। তিনি থাকতেন তাঁর ছোট কুটিরে। অল্পসংখ্যক অনুরাগী শিষ্যের ওপর নির্ভর করে। ঘুরে বেড়াতেন আপন আনন্দে। সে সময়ে রাত্রে দেখা যেত নক্ষত্রময় কালো আকাশের তলায় আবিষ্টের মতো ঘোরাফেরা করছে একটি দীর্ঘদেহী, দীর্ঘকেশ মানুষ। ঋক্ প্রকাশিত হচ্ছেন তাঁর কাছে। সুহোত্র অল্প বয়সেই মারা যান। তঁর ঋক্‌গুলি রয়ে গেছে কোনও কোনও শিষ্য, কোনও কোনও অনুরাগীর কণ্ঠে :

ওই জ্যোতিষ্কগুলি জয় করবার পিপাসা নিয়ে আমি
এই রাত্রির স্তরে স্তরে রেখে গেলাম আমার আয়ুধ।
প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, হৃৎ, চিৎ এবং অহম্।
হে বাক্! বরদাত্রী, মধুক্ষরী বধূ, সন্তত হও, সন্তত হও
আমাকে সন্তত করো ভূলোকে, দ্যুলোকে
তারও পরে যা আছে সেই অনন্ত বিভাময় বিভাবরীতে
আমাকে সন্তত করো !

রাজগৃহের প্রান্তবর্তী আবসথাগারের শীতল ছায়াময় কক্ষের মধ্যে ক্লান্তি দূর করতে করতে কুমার তিষ্যর মনের মধ্যে এইসব পূর্বস্মৃতি ঘোরাফেরা করে তাদের সূক্ষ্ম গন্ধ, স্পর্শ, রস নিয়ে। সেই সমিধে ফুঁ দিয়ে আগুনকে তেজস্বান করা। দুধ আহুতি দেবার পোড়া গন্ধ। আজ্যাহুতির তীব্র সুগন্ধ, সহাধ্যায়ী পূর্ণ অর্যমা, বরুণ, তক্ষশিলার সেই হিমরাত্রিগুলি যখন খড়ের গাদার ওপর উর্ণার কম্বল গায়ে দিয়ে শীত কাটত না। তুষের আগুন করতে হত কুটিরের একধারে। বহুদিন পর্যন্ত সেই পর্ণ কুটিরে ঘুম হত না তিষ্যর। সে ভাবত সাকেতের সুগন্ধ ছায়াময় পথগুলির কথা। প্রহরে প্রহরে মায়েদের, দাস-দাসীদের পরিচর্যার কথা। বন্ধুদের সঙ্গে অশ্বতরের পিঠে চড়ে প্রতিযোগিতা।

তারপর তক্ষশিলা থেকে সমাবর্তন শেষে বাড়ি ফিরল। তখন সে অন্য তিষ্য। তার বাহু, পা, পেট, বুক, কাঁধের পেশীগুলি দিয়ে অন্য শক্তিস্রোত বইছে, মুখে তারুণ্যের সঙ্গে বিদ্যাজাত প্রত্যয় এবং কর্তৃত্ব করবার সহজ ক্ষমতা এমনভাবে মিশেছে যে নিজের পিতাই তাকে সমীহ করতে আরম্ভ করেন। মা ও অন্য ভাইদের তো কথাই নেই। তিষ্য তখন শুধু যাউ খেয়েও সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারে। আবার বহু উপচারের ভোজনও তার কাছে কিছুই নয়। দু তিন দিন শুধু জল বা বনের ফল খেয়ে থাকা তার কাছে সহজ ব্যাপার। সারা দিন পথ চলতে পারে সে। ক্লান্তি কাকে বলে জানে না। গৃহে অনবরত দাসেদের পরিচর্যা তখন কিছুদিন তার কাছে অসহ্য মনে হত। অসহ্য মনে হত গতানুগতিক, তুচ্ছ কথাবার্তা। সেইজন্যেই আরও সে শ্রাবস্তীতে বন্ধুলের কাছে চলে যায়।

জীবনে ওই একটি মানুষের মতো মানুষ দেখেছে তিষ্য। বন্ধুল মল্ল।

প্রথম যেদিন দেখা হল, নিজের অস্ত্রাগারে হাঁটু গেড়ে বসে তরোয়ালে শান দিচ্ছিলেন আর পানীয়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ পানীয় হাতে উচ্চাসনে। বিশাল মানুষটি বন্ধুল। খালি গায়ে পেশীর পর পেশীর তরঙ্গ। তরোয়ালটা সামনে পেছনে বিদ্যুদ্বেগে আসছে যাচ্ছে, আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে, আর তাঁর পেশীর তরঙ্গে হিল্লোল উঠছে। মুখটা বালকের মতো। সরল, হাসিতে ভরা।

বন্ধুল বলছিলেন, মহারাজ, এই যে কৃপাণটিতে শান দিচ্ছি, এইটি দিয়েই কিন্তু আপনার মূল্যবান গলাটি কুচ করে কেটে নিতে পারি। নিভৃত এই অস্ত্রাগার। কেউ দেখতেও আসবে না।

প্রসেনজিৎ হাহা করে হেসে বললেন, তোমার অস্ত্রাগারে বুঝি ওই কৃপাণের সঙ্গে লড়বার মতো আর কোনও অস্ত্র নেই, বন্ধুল ? আমার ক্ষিপ্রতাতেও সন্দেহ প্রকাশ করছো না কি ?

—আপনার ক্ষিপ্রতা এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি মহারাজ, একথা ঠিক। কিন্তু এ অস্ত্রাগারের অস্ত্ররা একমাত্র আমার কথাই শোনে যে।

—সে ক্ষেত্রে দ্বাররক্ষীরা আছে। তারা আমার বৃত্তিভোগী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না মহারাজ, তারা আগে আমার ভৃতক, তারপর আপনার। যুদ্ধের নিয়ম ওদের আমি যা শেখাই তা হল আগে ওদের উর্ধ্বতন প্রত্যক্ষ প্রভুর আজ্ঞা পালন করবে। ওরা আপনাকে সম্মান করবে। কিন্তু প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার কারণ ঘটলে আমারই পক্ষে যাবে। ওরা আমার বশ।

—বলো কি বন্ধুল! তাহলে তো তোমার পেছনে চর লাগিয়ে রাখতে হয়। এমন চর যে কৃমিকীটের মতো তোমায় আঁকড়ে থাকবে! —প্রসেনজিৎ হাসছেন। সবকিছু অগ্রাহ্য করার, তুচ্ছ করার হাসি। একটা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস। বন্ধুলও হাসছেন, কিন্তু ভারি বুদ্ধিমন্ত হাসি। বললেন— চর নিয়োগ করতে কি এখনও বাকি রেখেছেন নাকি মহারাজ? বারে বারে বলি সতর্ক হোন। সতর্ক হোন। একটা ভোঁতা তরোয়াল কটিতে না ঝুলিয়ে রেখে সত্যিকার অস্ত্র বহন করুন। সঙ্গে নিজস্ব রক্ষী রাখুন। এইভাবে যে কোনও কাননে, পানশালায়, পথে, বিপথে ... না মহারাজ আপনি বড়ই অসতর্ক।

—তা যদি বলো বন্ধুল, কোশলের প্রতিটি রন্ধ্র এই অসতর্ক প্রসেনজিৎকে ভালোবাসে। সকলেই বলে...

এই সময়ে তিষ্যর ওপর চোখ পড়ল দু জনের।

—ও, তুমি সেই সাকেত কুমার না? বন্ধুল বলে উঠলেন, কদিন ধরেই আমার অতিথি গৃহে এসে রয়েছ?

—হ্যাঁ আচার্য।

—আমার অন্তেবাসী হতে চাও?

—সে রূপই ইচ্ছা।

—তক্ষশিলায় শিক্ষা।

—হ্যাঁ।

—কার কাছে ধনুর্বেদ শিখেছ?

—আচার্য সুধন্বা।

—তবে তো ভালো আচার্যই পেয়েছো! তরবারি, ভল্ল, মুষলের ব্যবহার জানো? রথ এবং অশ্ব থেকে যুদ্ধ চালনার কৌশল শিখেছ?

—অস্ত্রগুলির ব্যবহার ভালোই জানি। কিন্তু রথযুদ্ধ, অশ্ব বা হস্তীর পৃষ্ঠে যুদ্ধ ভালো আয়ত্ত হয়নি। তক্ষশিলায় অভ্যাসের সুযোগ ছিল না, আচার্য।

—আমি এখনও তোমার আচার্য হইনি কুমার। স্তুতিবাদে আমি সুখী হই না।

তিষ্যর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে স্বভাবে অহঙ্কারী, নত হওয়া তার স্বভাব নয়, কার্যোদ্ধারের জন্য স্তুতিবাদের তো কথাই নেই। সে বলল— তাহলে অনুমতি দিন, আমি ফিরে যাই।

—সে কী? ক্রোধ হল নাকি? হা হা করে হাসলেন বন্ধুল। রাজার দিকে ফিরে বললেন— এই হল যথার্থ ক্ষত্রিয়, বুঝলেন? নীচ আচরণ তো করবেই না, নীচ আচরণের অভিযোগ সহ্য করবে না। আপনার সভায় এই জাতীয় ক্ষত্রিয় ক'জন আছে, মহারাজ?

তিষ্যর দিকে ফিরে এবার বন্ধুল বললেন—ইনি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ। অভিবাদন করো আয়ুষ্মান।

তিষ্য রক্ষীদের সঙ্গে ঢুকে আগেই দুজনকে অভিবাদন করেছিল। কিন্তু এঁরা গল্পে মত্ত ছিলেন, লক্ষ্য করেননি। সে আগে কোশলরাজকে, পরে বন্ধুলকে অভিবাদন করল। কিন্তু শুষ্ক অভিবাদন। মুখের ক্রুদ্ধভাব তখনও রয়ে গেছে।

পরে বন্ধুল তাকে বলেছিলেন— তিষ্য তুমি দুর্বিনীত না হলেও, তেমন বিনয়ীও নও! তিষ্য চুপ করেছিল।

হঠাৎ হেসে উঠে বন্ধুল বলেছিলেন, শুধু এই কারণেই সেদিন তোমায় অন্তেবাসী বলে গ্রহণ করলাম। বিনয়-টিনয় আমি ভালোবাসি না। অহঙ্কার। অহঙ্কার থেকেই আসে আত্মশক্তি। আত্মশক্তি না থাকলে তুমি কীভাবে মানুষকে পরিচালনা করবে। মানুষ তো আর অজপাল নয়?

—কিন্তু আচার্য। আমি তো দেখি মানুষ অজপালই!

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— বঙ্কুলের অট্টহাসিতে বুঝি মল্লক্ষেত্র ফেটে যাবে। কিছুক্ষণ পর তিনি আত্মসংবরণ করে বললেন— ভালো। এই হল প্রথম অহঙ্কার। আর সব অজপাল, আমি একা স্বতন্ত্র। সিংহ। কী বলো ?

—সিংহ না হলেও, অন্ততপক্ষে অজ নই !

—শোনো তিষ্য, ক্রমে দেখবে অজ হলেও মানুষ কিন্তু পুরোপুরি অজও নয় আবার। কখন কোথায় হঠাৎ স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হবে, দেখা দেবে শ্বদন্ত, অজপাল হয়ে যাবে বৃকপাল তা তুমি জানো না। তাই দ্বিতীয় অহঙ্কার হল— অন্যরা অজই হোক, বৃকই হোক, আমিই প্রকৃত মানুষ। পশুগুলির প্রাণ আছে, কিছু সংস্কার আছে, কিন্তু আমার বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিই আমার শৌর্য, বুদ্ধিই আমার অস্ত্রজ্ঞানকে প্রকৃত শক্তি যোগায়।

তিষ্য নীরবে শুনছিল।

—কিছু বলবে না ?

—না, আচার্য, শুনছি।

বঙ্কুল মৃদুস্বরে বললেন— এর ওপরেও তৃতীয় অহঙ্কার আছে এক। কী বলো তো ?

ভেবে-চিন্তে তিষ্য বলল—জানি না আচার্য।

—জানবে না। কেন না তোমার এখনও সে অহঙ্কার আসেনি তিষ্য। তৃতীয় অহঙ্কার হল— চতুর্দিকে মানুষ। বুদ্ধিবল সম্পন্ন, বীর্যবল সম্পন্ন, যোগ্য, কর্মক্ষম মানুষ। কিন্তু যতই বুদ্ধিমান, যতই বীর, যতই যোগ্য হোক, আমি যোগ্যতম। "তর" নয়, "তম"। এই "তম"তা যদি তোমার অহংবোধে প্রবেশ করে তবেই তুমি সত্যি-সত্যি অহঙ্কারী হলে। যে অহঙ্কার দিয়ে কিছু করা যায়। পাহাড় চূর্ণ করা যায়, যেমন ইন্দ্র করেছিলেন, নদীর স্রোত বিপরীতমুখী করা যায়, যেমন করেন ভগীরথ, লোকপাল রাজা হওয়া যায় যেমন আজও প্রকৃতপক্ষে কেউ হয়নি, শুধু আমাদের কল্পনাতেই আছে...

—কিন্তু আচার্য, আমরা শিখেছি বিনয়ই প্রকৃত গুণ।

আবার হাসছেন বঙ্কুল।

—বিনয় না থাকলে বিদ্যা মিথ্যা, কেমন ? আচার্য সংকৃতি, আচার্য সুধন্বা এইসব শিখিয়েছেন তো ? তিষ্য জেনো, বিনয় হল একটি নীতি, দণ্ডনীতির সূক্ষ্মতম তত্ত্ব। ভালো করে ভেবে দেখো আমাদের লক্ষ্য কী ? কিছু প্রাপ্তি, কিছু সম্পাদন করতে পারা। বীর্য দিয়ে নয়, আস্ফালন দিয়ে নয়, স্পর্ধা দিয়ে নয়, বিনয় দিয়েই তা অনেক সময়ে সবচেয়ে সহজে হয়। হয় না ?

গায়ে মাটি মেখে অনায়াসে তাকে মাথার ওপর দুপাক ঘুরিয়ে মল্ল ক্ষেত্রে ফেলে দিয়েছেন বঙ্কুল। বলছেন— এই দৈহিক বল, এই মল্লবিদ্যার কূটকৌশল আদ্যোপান্ত জানা— এর থেকে তোমার মুখভাবে গর্ব, দীপ্তি, ফুল্লতা আসবে, তাকে বিনয়ের আবরণে ঢেকে প্রতিপক্ষের কাছে যেতে হবে। পুরাকালে নিয়ম ছিল স্পর্ধা করে প্রতিপক্ষকে রাগিয়ে দেওয়া, এখন নিয়ম সূক্ষ্মতর হয়ে গেছে, এখন বিনয় প্রকাশ করে প্রতিপক্ষকে প্রতারিত করতে হয়।

সরোবরে স্নান করছেন দুজনে। সর্বশ্বেত বসন পরে ফুলের মালা ধারণ করে, শ্বেতচন্দনে সেজে অন্তঃপুরে ঢুকতে ঢুকতে হেঁকে বলছেন বঙ্কুল— মল্লিকা, মল্লিকা তিষ্যকে ভালো করে ষণ্ডমাংস খাওয়াও, সঙ্গে যবের পুরোডাশ। বলবীর্য না বাড়লে তিষ্য কী করে বীরশ্রেষ্ঠ হবে ! সামান্য বঙ্কুলের সঙ্গেই পারছে না।

—সামান্য বঙ্কুল ! বলছেন কী আচার্য ! একটু আগেই যে বিনয়ের নিন্দা করছিলেন !

—করছিলাম বুঝি ? কী বলেছিলাম বলো তো !

—বলছিলেন বিনয় প্রকৃতপক্ষে প্রবঞ্চনা, ছল। বিনয় একটা নীতি যাকে অবলম্বন করে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়।

—বলেছিলাম ?— বঙ্কুল ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে সকৌতুকে তাকালেন। তারপর মুখ নিচু করে হঠাৎ ভীষণ মনোযোগ দিয়ে খেতে লাগলেন।

তিষ্যর খাওয়ার গতি শ্লথ হয়ে গেছে। তার ভেতরে চিন্তা ঢুকেছে। একটু পরে তার মনে হল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কুল নিজেকে সামান্য বলে তাকে আরও তাতিয়ে দিতে চাইছেন। আর কিছুই না। নীতিই বটে! কতো কাজে লাগে!

তাম্রকের পিঠে চড়ে ছোট্ট রাজগৃহ নগরটির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত শুধু ঘুরে বেড়ায় তিষ্য। যেন তার কোনও কাজ নেই। কখনও চলে যায় হাটে, কখন আপণশ্রেণীর পথে। সে যায় না নির্জন গিরিশৃঙ্গে, কি কাননগুলিতে। বেলুবনের কথা, ইসিগিলির কথাও যেন সে ভুলে গেছে। সে নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করে জনযাত্রা। একান্ত মনোযোগে শোনে মানুষের কথা। আপণে, হাটে, সুরাগৃহে, পথে। সবাই দারুণ ব্যস্ত। কে কয়েক কাহনের শাক ও পর্ণ কিংবা গুড় বা চাল কিনবে, মূল্য ঠিক করতে বিবাদ লেগে যাচ্ছে। ওই কয়েক কাহনের ওপর যেন ক্রেতা-বিক্রেতার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। এক দল রমণী চলে গেল পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, অতি সামান্য কথা, কিন্তু এমন ডুবে আছে সেই কথার ভেতরে যেন ওইখানেই জীবনের পরমার্থ পেয়েছে। ঘোড়া কিংবা রথে চড়ে চলে গেল কেউ, হয়ত যাচ্ছে গণিকাগৃহে, কি শৌণ্ডিকগৃহে, কি হয়ত রাজসভায় উপস্থিত হতে, ওই গন্তব্যটুকুই যেন শেষ লক্ষ্য। তিষ্যর মনে হয় এরা সব ঘুমিয়ে রয়েছে। সাকেতেও এ কথা মনে হত। শ্রাবস্তীতেও। কিন্তু ঠিক কী মনে হচ্ছে সে বুঝতে পারতো না। এতদিন পরে রাজগৃহের জনপথে এসে সে নিজের অনুভূতি যথাযথ বিশ্লেষণ করতে পারল। অভ্যস্ত কাজকর্ম প্রতিদিন করে যাওয়া, অভ্যস্ত চিন্তায় কাল কাটানো, অভ্যস্ত সামাজিক আচরণের চতুঃসীমার মধ্যে নিরন্তর ঘোরাফেরা করা তো নিদ্রাই! কালনিদ্রা! এইসব নগরীর বাইরের সৌন্দর্য আর ভেতরের অন্তঃসারশূন্যতা সে যেন পাশাপাশি দেখতে পায়। একেক সময়ে দুঃসহ লাগে তার। গলায় মালা পরে, নির্বোধের মতো হাসতে হাসতে যে লোকগুলি সন্ধ্যার পর পথে পথে ভিড় করে তাদের ঝাঁকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার। মনে হয় বলে— ওহে, মাগধ কী করছো? করছো কী? এইভাবেই চালিয়ে যাবে নাকি? এই ভাবেই কাল কাটাবে?

দাঁত-বার-করে-হাসতে-থাকা মূঢ় নাগরিকগুলিকে ঝাঁকাবার পরিবর্তে সে নিজেকেই ঝাঁকিয়ে নেয় অবশ্য। ভাবে, তবে কি এতদিনে সে বঙ্কুল-বর্ণিত দ্বিতীয় অহঙ্কারের পর্যায়ে পৌঁছল? এই মানুষগুলি মানুষ নয়, পশুমাত্র, সে একাই মানুষ? এই উপলব্ধি হচ্ছে না কি তার? না কি এ পর্যায়ও পার হয়ে সে তৃতীয় অহঙ্কারে পৌঁছে গেল? চূড়ান্ত অহঙ্কারে? না। চূড়ান্ত নয় বোধহয়। কেন না কোথায় সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের রূপরেখা? কোথায়ই বা সেই দৃঢ়তা তার প্রত্যয়ে? সে তো এখনও পথই খুঁজে যাচ্ছে! পথই খুঁজে যাচ্ছে!

এইভাবে, চূড়ান্ত একাকিত্বের এক স্বরচিত বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে, কখনও ক্রুদ্ধ, কখন হতাশ, কখনও বিমর্ষ হতে হতে একদিন তিষ্য রাজগৃহের পথে এমন একজনকে আবিষ্কার করল, যার সঙ্গে দেখা-হওয়ার সৌভাগ্য কোনদিন হবে, সৌভাগ্যই বলতে হবে, কেন না এ তার বহুদিনের সাধ, সে কল্পনাও করেনি।

২৪

শ্রাবস্তী আর বৈশালী প্রায় পাশাপাশি নগরী মাঝে ব্যবধান বিস্তীর্ণ গ্রামভূমির। নগরী দুটি রাজধানী। মাঝে আছে শাক্যক্ষেত্র ও মল্লক্ষেত্র। শাক্যনগরী কপিলবস্তু বা মল্লনগরী কুশিনারা এদের সঙ্গে তুলনায় আসে না। বৈশালী গণরাজাদের দেশ। কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীতে একজনই রাজা। শ্রাবস্তী কোশলের রাজধানী। দুটি নগরই ধনে-জনে পরিপূর্ণ। দুটিই শ্রমণদের প্রিয়। নিজেদের মত প্রচারের জন্য শ্রোতা মেলে প্রচুর। ভিক্ষার অভাব নেই। অনেক ধনীর বাস। সুতরাং পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ভাবনা করতে হয় না। বৈশালীর একটি গর্ব আম্রপালী। সৌন্দর্যে, নৃত্য-গীতে অতুলনীয়। বৈশালীর দ্বিতীয় গর্ব নির্গ্রন্থ নাথপুত্র বা নিগ্‌গণ্ঠ নাথপুত্ত। কুন্দগ্রামের জাতক, সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। বিবাহও করেছিলেন। কিন্তু ত্রিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। গৃহস্থ-জীবনের নাম ছিল বর্ধমান। এখন তিনি বিবসন শ্রমণ। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিন অর্থাৎ মুক্তপুরুষ বলে জানে। নির্গ্রন্থদের সঙ্গে আজীবকদের এক সময়ে যথেষ্ট সখ্য ছিল। কেন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্গ্রন্থদের গুরু বর্ধমান আজীবকদের গুরু মক্‌খলি গোসালের দিগম্বর-ব্রত গ্রহণ করেন। বর্ধমানের আগে পার্শ্বমুনির সম্প্রদায় একবস্ত্র কিম্বা তিনবস্ত্র পরতেন। বর্ধমান বা নাতপুত্তর সময় থেকে এঁরা নির্বস্ত্র হলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মক্‌খলি গোসালের সঙ্গে নাতপুত্তর তুমুল বিবাদ লাগল। উভয়েই মানতেন মানুষের জন্ম হল চুরাশি লক্ষ বার। কিন্তু মক্‌খলি গোসাল আরও মানতেন নিয়তিবাদ। অর্থাৎ সর্ব জীব নিয়তি সঙ্গতি বা পরিস্থিতি ও স্বভাবের বশে নানা পরিণতি প্রাপ্ত হয়। বল নেই, বীর্য নেই, পুরুষ শক্তি নেই। বুদ্ধিমান, মূর্খ, সকলেই চুরাশি লক্ষ মহাকল্পের চক্রের মধ্য দিয়ে যাবার পর দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে। গোসালের এই মত নাথপুত্ত মানতে পারলেন না। তাঁর মত তপস্যা ও চতুর্যাম পালন করলে বিগত সব জন্মের পাপ ক্ষয় হয়ে এক জন্মেই কৈবল্য লাভ করা সম্ভব। নাতপুত্তের মতবাদ লোকের ভালো লাগল। যদিও তিনি কঠোর তপশর্যা করতে বলছেন, তবু তো কৈবল্যলাভের আশ্বাস দিচ্ছেন! পাপক্ষয়ের আশ্বাস দিচ্ছেন। মক্‌খালি গোসালের মত মানতে গেলে পাপ-পুণ্য শুদ্ধি-অশুদ্ধি বলে কিছু থাকে না। কর্মের কোনও অর্থ থাকে না। চেষ্টার কোনও মূল্যও থাকে না। এক গভীর হতাশা এবং আলস্য এসে ছেয়ে ফেলে অস্তিত্ব। সুতরাং নাতপুত্তর শিষ্য-সংখ্যা দিন দিন তো বাড়ছিলই। গৃহী শিষ্যও তাঁর মধ্যদেশের নগরগুলিতে প্রচুর।

এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রাবস্তীর মিগার শ্রেষ্ঠী। এবার বৈশালী থেকে তাঁর শ্রাবস্তী যাবার প্রধান কারণ মিগারের গৃহে উৎসব। সে পুত্রের বিবাহ দিয়েছে। পুত্রবধূকে গুরুর কাছে উপস্থিত করতে চায়। গুরুর আশীর্বাদ ভিন্ন তাকে পুরোপুরি গৃহধর্মে গ্রহণ করতে পারছে না। অনেক দিন ধরেই বলছে। কিন্তু নাতপুত্ত ব্যস্ত ছিলেন। বর্ষাবাস করেছেন বৈশালীতে। সে সময়ে তিনি বা তাঁর সম্প্রদায়ের কেউই ভ্রমণ করেন না, বহু প্রকার কীট অনুকীট গুল্ম ইত্যাদি জন্মায়। চলতে চলতে তাদের পদদলিত করবার সম্ভাবনা। শ্রাবস্তীতেও তাঁর সম্প্রদায়ের শ্রমণরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়েও কাজ চালিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু মিগার সে-কথা শুনবে না। অগত্যা কার্তিকী পূর্ণিমার পর যাত্রা করে নাতপুত্ত এসে পৌঁছেছেন শ্রাবস্তীতে।

মিগারের গৃহ আজ বিশেষ সাজে সজ্জিত। উদ্যানের মধ্যে শ্বেত চন্দ্রাতপ খাটিয়ে সশিষ্য গুরুর বসবার জন্য মনোরম পরিবেশ রচনা করেছেন মিগার। গৃহে রান্না হচ্ছে নানা প্রকার সুখাদ্য। ভিক্ষার সময়ে কেউ মৎস্য মাংস দিলে নাতপুত্ত আপত্তি করেন না। কিন্তু তাঁরই জন্য মারা হয়েছে এমন পশু-পাখির মাংস তিনি গ্রহণ করেন না। সুতরাং আজ নানা প্রকার শাক, অন্ন, পায়স, মোদক প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে।

AMARBOI.COM

বিশাখার আজ মনে অকস্মাৎ যেন মুক্তির বাতাস লেগেছে। উৎসবের আনন্দ, তার ওপর সে উৎসব কিছু সাধু-ব্যক্তিকে ঘিরে। এতে সে তার পিতৃগৃহের, বিশেষত ভদ্দিয়র স্মৃতি ফিরে পায়। মিগার-গৃহে সবসময়ে শুধু ধন সংগ্রহ এবং সঞ্চয় নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকে। এঁরা যথেষ্ট ধনী হওয়া সত্ত্বেও এখনও ধনপ্রাপ্তিতে এমনভাবে উল্লসিত হন যে বিশাখার মার্জিত রুচিতে বড় আঘাত লাগে। তার পিতা ধনঞ্জয়ও তো ছিলেন ধনবান শ্রেষ্ঠী। কিন্তু নিজের কর্মগৃহের বাইরে বেরোবার পর ধনঞ্জয় আর ধনপ্রসঙ্গ তুলতেন না। বিশাখাও যখন তাঁর কাছে কাজ-কর্ম শিখত তখন এবং সেখানেই ধনপ্রসঙ্গ শেষ করে দিয়ে আসত। ধনঞ্জয় বলতেন— 'ধন সংগ্রহ করি আমার পরিজনরা নির্ভাবনায় নিজের নিজের প্রকৃতিদত্ত গুণাবলীর চর্চা করতে পারবে বলে। আমার বৃত্তি অল্প ধন নিয়োগ করে অধিক ধন অর্জন করা। আমি এ নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও থাকতে পারি। কিন্তু আমার পরিজনরাও সেইভাবে ভাবিত হবে এ আমি চাই না।'

কিন্তু মিগারগৃহে উঠতে বসতে খালি ধনেরই কথা। দ্বিপ্রহরে মিগার ভোজনে বসলে তাঁর পত্নী প্রতিদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন— 'আজ কতো উপার্জন হল?' মিগার পরম পরিতোষ সহকারে একটি সংখ্যা বলবেন; ততোধিক পরিতোষের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বলবেন 'তাম্র কহাপন? না স্বর্ণ কহাপন? ঠিকঠাক বলো!' উত্তর শুনে বিমর্ষ মুখে বলবেন— 'এর চার ভাগের তিন ভাগই তো চলে যাবে পরিজন প্রতিপালন করতে। কী-ই বা লাভ উপার্জন করে!'

এঁরা বড় কৃপণও। উৎসবে ছাড়া শালিধানের চাল খান না। ভৃতক ও দাসদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা আছে।। নিজেদের খাদ্যের মানও যে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট তা বলা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিগার-পত্নী বিরাট ভাণ্ডারের প্রতিটি বস্তুর সংবাদ নেন প্রতিদিন। যে দাসীরা ভাণ্ডারের দায়িত্বে আছে তারা তিতিবিরক্ত হয়ে যায়। প্রায়ই তাদের চোর অপবাদ শুনতে হয়। ভৃতি দেন যথাসম্ভব অল্প। কর্মান্ত গ্রাম থেকে সরল লোকগুলিকে আনান, ভূতের মতো খাটান, তারপর তাদের যেই একটু বুদ্ধি হয়, অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে অমনি তাড়িয়ে দেন। মিগার-পত্নী সারা দিন এ ঘর ও ঘর, এ আঙিনা সে আঙিনায় ঘুরে বেড়ান আর আতঙ্কিত মুখে বলেন— 'এইভাবে ব্যয় হতে থাকলে তো আমরা কিছুকালের মধ্যেই গজ-ভুক্ত কপিত্থের মতো হয়ে যাবো! সবগুলি রাক্ষস। রাক্ষস! রক্ত চুষে খাচ্ছে।'

কাদের কথা তিনি বলতে চাইছেন পরিষ্কার ভাবে না বললেও বিশাখার এবং তার অন্তরঙ্গদের এতে অপমান বোধ হয়। এ গৃহের দাস-দাসীরা অবশ্য প্রভু-পত্নীর কথা শুনে হাসাহাসি করে। কুলোয় করে চাল ঝাড়ছে দাসীরা। অদূরে প্রভু-পত্নীকে দেখা গেলেই এ ওকে ঠেলবে, বলবে— 'আক্ষস, আক্ষস! অক্তগুলি সব চুষে খেয়ে নিলে রে।'

দাসেরা হয়ত গো দোহন করছে। বড় বড় পাত্রে সফেন দুধ পড়ছে। ভরে যাচ্ছে একটার পর একটা পাত্র। মিগার পত্নী এসে দাঁড়াবেন, কটিতে দু হাত রেখে বলবেন 'বিসাখা, বিসাখা, দেখে যাও।'

সুন্দর ভোর বেলাটি। বিশাখার স্নান প্রসাধন সারা। সে গো দোহনের সময়ে উপস্থিত থাকে। সে কাছে আসলে শ্বশ্রূ বলবেন— 'বলেছিলাম কি না!'

কী বলেছিলেন, মা!

গোচরেই এরা কিছুটা করে দুধ দুয়ে নেয়। দেখছ না ভাঁড়গুলি সব পুন্ন হয় নি!

দাসেরা সবই শুনতে পাচ্ছে। এদের মধ্যে বিসাখার সাকেতের দাসরাও আছে। বিসাখা লজ্জিত, অপ্রতিভ বোধ করে। মৃদু স্বরে বলে— ও সব আপনার ভ্রম মা! ভাঁড়গুলি পূর্ণ হলে তো দুধ উপচে পড়বে! নষ্ট হবে!

সে আর দাঁড়ায় না। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চলে যায়। সাকেতের দাসগুলির মুখ গম্ভীর। কিন্তু শ্রাবস্তীর দাসেরা বিশাখা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল আরম্ভ করে দেয়। প্রভু-পত্নীর সঙ্গে যথেচ্ছ কৌতুক করে। একজন বলবে— 'আপনি জানতেন না মা! আমরা তো গাভীর বাঁটে মুখ লাগিয়ে চোঁ চোঁ করে খানিকটা দুধ খেয়ে নিই আগে। নিজের উদর না ভরলে কি আর পরের উদর ভরানোর কাজে মন লাগে মা?

প্রথমটা তাদের কৌতুক বুঝতে পারেন না মিগার গৃহিণী। তর্জন করে বলেন—'কী? স্বীকার করলে তো! তা হলে তোমাদের প্রভুকে বলি! বলি।' দাঁত বার করে আরেক জন বলে 'শুধু দুধ নাকি! এই গৃহের যেখানে যা ভোজ্য আছে সবই আমরা চুরি করে করে খাই। আমরা সব আপনার গৃহপালিত মার্জার যে! বিলার সব বিলার।'

এইবারে কৌতুকের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাদের প্রভু-পত্নী ক্রুদ্ধ হয়ে সেখান থেকে চলে যান।

পরে সাকেতের দাসেরা এসে বিশাখার কাছে অভিযোগ করলে, সে বলে শ্বশ্রূ-মা আমার পূজনীয়। তাঁর নিন্দা শুনতে আমার ভালো লাগে না, তোমরা যদি মুক্তি চাও আমি তোমাদের মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা অন্য কোনও স্বামীর গৃহে মনোমত কাজ খুঁজে নাও।

কেউ কেউ এতে সাগ্রহে সম্মত হয়ে যায়। অন্যরা যেতে চায় না। কয়েকটি দাসকে এভাবে মুক্ত করে দেবার পর, মিগার-পত্নীর কানে আসে কথাটা। তিনি বলেন— "তুমি কী প্রকার সুহ্না বিসাখা, আমার অনুমতি না নিয়ে দাসগুলিকে মুক্তি দিলে?

বিশাখা বলে— 'ওরা উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছিল। ওদের অন্নসংস্থান করতেও তো সেট্‌ঠি-বাড়ির ধনক্ষয় হয় মা! অনর্থক!'

খানিকটা হৃষ্ট হয়ে মিগার-পত্নী বলেন— 'কথাটা সত্যি। কিন্তু আমার অনুমতি নেওয়া কি তোমার উচিত ছিল না!

বিশাখা বলে— 'ওদের আমি যৌতুক পেয়েছি পিতার কাছ থেকে। ভেবেছিলাম আমিই ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম কর্ত্রী। যৌতুকের দাসগুলিকে অন্নক্ষয়ের ভয়ে মুক্তি দিতে হচ্ছে ভেবে যদি আপনি অপ্রতিভ হন— তাই আর বলি নি।

বিশাখার কূট চালে মিগার-গৃহিণী দোলাচল। হৃষ্ট হবেন না রুষ্ট হবেন ভেবে পান না। বলেন— 'মুক্তি না দিয়ে বিক্রয় করে দিলে ভালো মূল্য পাওয়া যেত!'

বিশাখা এবার ক্লান্ত কণ্ঠে বলে— 'উদ্বৃত্ত মা, শ্রাবস্তীতে প্রতি গৃহে দাস প্রয়োজনের তুলনায় বড়ই অধিক হয়ে গেছে মা। কে-ই বা কিনবে?

আজ সেই কৃপণ গৃহের বাতাবরণ প্রফুল্ল, প্রসন্ন। পায়সের সুগন্ধে গৃহের রন্ধনশালার কাছাকাছি স্থানগুলি আমোদিত হয়ে রয়েছে। অন্যান্য পদ পাচকরা রাঁধলেও পরমান্ন বিশাখা নিজের হাতেই প্রস্তুত করছে। ধনপালী ও ময়ূরী তার নির্দেশে কাঠের দর্বী দিয়ে বিশাল কড়াইয়ে উৎকৃষ্ট দুধ ঘন করছে। কহ্না এলাচ ও অন্যান্য সুগন্ধি চূর্ণ করছে। মাপমতো উৎকৃষ্ট চাল, অত্যুৎকৃষ্ট ঘিয়ে ভেজেছে বিশাখা। চতুর্দিকে তার পবিত্র গন্ধ।

দীর্ঘ অলিন্দে সব স্থূল ফুলের মালা ঝুলছে। ধূপ। বড় বড় পাত্রে আরও নানা সুগন্ধি চূর্ণ ধীরে ধীরে পুড়ছে।

সাধুরা সব এসে গেছেন। চন্দ্রাতপের তলায় উচ্চাসনে বসে নানা প্রকার তত্ত্বালোচনা করছেন। মিগার-পত্নী সহ অন্য কুলস্ত্রীরা অদূরে বসে শুনছেন। মিগারও যাতায়াত করছেন। তাঁর নির্দেশ সুহ্না রন্ধনশালার কাজ সেরে স্নান ও প্রসাধন করে প্রস্তুত হোক। ইতিমধ্যে নিগ্গণ্ঠরা ভোজন করে পরিতৃপ্ত হোন, তারপর নাতপুত্ত ধর্মদেশনা আরম্ভ করবেন। সেই সময়ে সুহ্না যাবে, গুরুবন্দনা করবে। পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্রে উপস্থিত করলেই ভালো হত। কিন্তু পুত্রের সহসা কর্মে মতি হয়েছে। সে প্রথমে শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে তাঁর কর্মান্ত গ্রামে যায়। সেখানে কিছুদিন কাজ-কর্ম দেখাশোনার পর পিতাকে বলে পাঠায় সে বারাণসী যাচ্ছে। অতঃপর বারাণসী থেকে মূল্যবান বস্ত্র ও গজদন্তের দ্রব্য নিয়ে সে নাকি কৌশাম্বীর দিকে যাত্রা করেছে। ভালো। মিগার অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছে। এই সুহ্নাটি গৃহে আসায় তাঁর গৃহে যে-সব শুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে, তাদের মধ্যে এইটিই শুভতম। গৃহিণীও সুখী। নববিবাহের পর বিশাখার মতো রূপবতী গুণবতী ভার্যার সঙ্গে অধিক দিন বসবাস করলে পুত্রটি হয়তো তার বশীভূত হয়ে যেত। সে আশঙ্কা থেকে আপাতত তিনি মুক্ত। বিশাখাকেও ঠিক বিরহক্লিষ্ট দেখায় না। প্রোষিতভর্তৃকার মতো আচরণও সে করে না। পতি-পত্নীতে নিভৃতে আলোচনা করেন, সুহ্নাটি কিছুটা বালিকা স্বভাব। এখনও পতি কী বুঝতে শেখে নি। খেলাধুলো, গৃহকর্ম, স্নান প্রসাধন, সখীদের সঙ্গে শ্রাবস্তীর ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ রক্ষা, সুপ্রিয়া ইত্যাদি সখীদের সঙ্গে কোনও কাননে গিয়ে আমোদ-প্রমোদ, এইসবেই মন।

শুভ্র কাসিক রেশম পরে, গন্ধমাল্যে সুসজ্জিত হয়ে বিশাখা আসছে, সঙ্গে তার প্রিয় সখীরা। অলিন্দ পার হল, নববধূর মতো সলজ্জ পদক্ষেপে। মুখ নিচু। কাননে আসতে মিগার সাদরে তাকে নিয়ে গেলেন নাতপুত্তর কাছে। বসেছিলেন গুরুদেব। আশীর্বাদ করবেন বলে দুই হাত প্রসারিত করে উঠে দাঁড়ালেন। বিশাখা পলাশবর্ণ হয়ে এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে। —'এ আমাকে কার কাছে আনলেন, পিতা! শুনেছিলাম সাধু।' তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ গোপন নেই।

সভাশুদ্ধ সবাই হতচকিত। মিগার ব্যস্ত হয়ে বললেন— ইনিই তো সেই সাধু পুরুষ। নিগ্গণ্ঠ নাতপুত্ত। ইনি জিন। বারো বছরের কঠোর তপস্যায় সর্ববিধ ইন্দ্রিয় জয় করেছে।

—ইনি অশালীন, অসভ্য। ধিক্, ধিক্ আপনাদের। এই নির্বসন উন্মাদের কাছে আমায় আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে নিয়ে এসেছেন? —বিশাখা তার তিন সখীকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সভা-ত্যাগ করল। মিগারের বাড়িতে দাঁড়াল না পর্যন্ত। সোজা চলে গেল নিজের গৃহে।

নাতপুত্তর সমবেত শিষ্যরা কোলাহল করে উঠল। — কী দুঃসহ স্পর্ধা বালিকার! যথোচিত শাস্তি হওয়া উচিত এর।

যারা নাতপুত্তর দেশনা শুনতে সমবেত হয়েছিল, সেই সব পুরস্ত্রীরা, দাস-দাসীরা ভয়ে চুপ। তার মধ্যে দিয়ে নাতপুত্তর ভীষণ কণ্ঠ শোনা গেল— 'অলক্ষণা ওই সুহ্নাকে এক্ষুণি ত্যাগ করো মিগার। এই মুহূর্তে। নইলে তোমার গৃহে অকল্যাণ নেমে আসবে।' তিনি মঞ্চ থেকে নেমে শিষ্য সমেত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তক্ষুনি চলে গেলেন। যাবার সময় পাশেই যে নিগ্‌গণ্ঠটি ছিল তাকে মৃদুস্বরে বললেন— 'এ নির্ঘাৎ সেই পাপাত্মা সমনটার শিষ্য। রাজগহেও আমাদের সম্প্রদায় থেকে এমন ভাঙিয়ে নিয়েছে, এখানেও নিচ্ছে। দেখো মিগার যেন একে অবিলম্বে ত্যাগ করে।'

মিগার হতবাক। তিনদিন ধরে উৎসব হবার কথা। সেই মতো আয়োজন হয়েছে। শ্রাবস্তীতে নাতপুত্তর অনেক শিষ্য। তাঁদের অনেকেই দেশনা শুনতে এসেছেন। এখন সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে চলে যাচ্ছেন। গৃহের মধ্যে বিশৃঙ্খলা। বিশাখা বা তার সখীদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মিগার নিজের কক্ষে গিয়ে পত্নীকে বললেন— সুহ্নাটাকে ডেকে নিয়ে এসো।

গৃহিণী বললেন— 'যা বলবে ভেবে বলো। তিনি বিশাখাকে ডাকতে পাঠিয়ে চলে গেলেন। কী কাণ্ড! এই জটিল সমস্যার ভেতরে তিনি মোটেই থাকবেন না। মিগার বুঝুন এখন।

বিশাখা এসে দাঁড়িয়েছে। মিগার বললেন— 'তুমি নগ্ন সন্ন্যাসী, তীর্থিক, আজীবক এদের আগে দেখো নি?

—না।

—তোমার পিতা এঁদের নিমন্ত্রণ আপ্যায়ন করতেন না?

—না।

—তাহলে কি তোমরা শুধু বেদপন্থীদেরই পূজা করো, সাকেতে?

—আমাদের পুরোহিত আচার্য ক্ষত্রপাণি আছেন। গৃহের যাবতীয় পূজা হোম ইত্যাদি তিনিই করেন।

—যাগ-যজ্ঞ করেন না কি তোমার পিতা?

—না। তবে অগ্নিগৃহ আছে। গৃহ্য কর্মগুলি হয়। যেমন আমার বিবাহই তো হল। কিন্তু শ্রৌত যাগ আমার পিতামহই বন্ধ করে দিয়েছেন।

—তবে? এই তো তাঁরা বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের অসারতা বুঝতে পেরেছেন। আমরাও তোমার পিতা-পিতামহের মতো বিবাহ, বাস্তু প্রতিষ্ঠা, উপনয়ন, ইত্যাদি গৃহ্য ব্যাপারে বেদপন্থী। কিন্তু পূর্ণিমা অমাবস্যায় যাগ, সোমযাগ এ সব জটিল ব্যাপারে আর লিপ্ত থাকি না। আমরা শ্রমণ পথই শ্রেষ্ঠ পথ মনে করি। তোমার পিতা-পিতামহ এঁরা কাকে বিশ্বাস করেন?

বিশাখা ধীরে ধীরে বলল— তথাগত বুদ্ধকে।

—'কিন্তু কল্যাণি। এই যে নিগ্‌গণ্ঠ ইনি এমন তপঃ করেছিলেন যে এঁকে লোকে মহাবীর বলে। ইনি জিন। একজন সমনকে পিতৃগৃহে বন্দনা করতে বলে, আরেকজন সমনকে শ্বশুর-গৃহে এসে অশ্রদ্ধা দেখাবে, এ কেমন শিক্ষা তোমার?

বিশাখা বলল—পিতা আমি দুঃখিত। কিন্তু সমনরা যে যতবড় জিনই হোন না কেন যখন লোকশিক্ষার্থে সমাজে বাস করছেন, তখন সমাজের ন্যূনতম নিয়ম তাঁদের মেনে চলতেই হবে। অরণ্যে, পাহাড়ে, কন্দরে থাকেন সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এতো লোকের সামনে, বিশেষত নারী, তরুণী নারীদের সামনে বিবসন হয়ে ধর্মোপদেশ দিতে এসেছেন? এঁদের লজ্জা হওয়া উচিত!

—এঁরা লজ্জা জয় করেছেন বিসাখা।

—এঁরা জয় করে থাকতে পারেন, কিন্তু শ্রোতারা, দর্শকরা, নারীরা, তরুণ তরুণী বালক-বালিকাগুলি? তারাও কি লজ্জা জয় করেছে? কিম্বা পিতা, হঠাৎ যদি তারা বলে আমরাও নাতপুত্তের দেশনা শুনে লজ্জা-ত্যাগ করেছি, আর বসন পরব না, তা হলে আপনার, এই সমাজের, নগরের কী অবস্থা হবে? চিন্তা করুন। আপনি কি তা মেনে নেবেন?

—'না, তা কী করে মেনে নেবো! বিসাখা!

—'তা হলে? সাধু ব্যক্তিদের এমন কিছু করা উচিত নয় যা অনুসরণ করলে সমাজের লজ্জার কারণ হতে পারে। তথাগত বুদ্ধ কখনও এরূপ কিছু করেন না।'

সমন গোতম তো শুনেছি মায়াবী। মায়া দিয়ে মানুষকে বশ করে। মিথ্যা মিথ্যা বলে সে অমৃত লাভ করেছে। আজীবক তীর্থিক, নিগ্‌গণ্ঠ সবার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, অন্যদের শিষ্য ভাঙিয়ে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাখা বলল, পিতা, আমি বড় হবার পর আর তথাগতকে দেখিনি। বালিকা বয়সের স্মৃতি যা আছে, তাই থেকেই বলছি, তথাগত বুদ্ধকে দেখলে তাঁর ধম্ম ব্যাখ্যা শুনলে আপনি শান্তি পাবেন। তিনি এ প্রকার রুক্ষ, শুষ্ক, লজ্জাহীন সাধু নন।

বিশাখা চলে গেলেন মিগার ভাবতে লাগলেন। গুরু বলেছেন বধূটি দুর্লক্ষণা, অকল্যাণী। অথচ চার মাস কালের কিছু অধিক সে তাঁর গৃহে এসেছে। সুখ-সৌভাগ্য, ধন-জন, উথলে পড়ছে। সবাই, গৃহের গোবৎস গুলি পর্যন্ত তার বশীভূত। দাসেরাও জানে বিশাখা সুভগা বধূ। মিগার-গৃহে, শ্রেষ্ঠী-পল্লীতে, এমন কি সারা শ্রাবস্তীতে সে সৌভাগ্য এনেছে। তাঁর অকালকুষ্মাণ্ড পুত্রটা? সেটা পর্যন্ত কাজ কর্মে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। নাতপুত্ত বললেই তো আর সে অকল্যাণী হয়ে গেল না! তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুশীলা শালীন, অভিজাত ঘরের কন্যা যদি নগ্নতা দেখে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হয় তো সত্যিই বলবার কিছু নেই।

একটু পরে যখন পত্নী এসে জিজ্ঞাসা করলেন— কী স্থির করলে? মিগার বললেন— গুরুর কথায় ধনঞ্জয় সেট্‌ঠির কন্যাকে পরিত্যাগ করে মরি আর কি? এমন বধূ আর কার ঘরে আছে? বলুন ওঁরা। বলতে দাও। আমি অন্যভাবে ওঁদের তুষ্ট করবো এখন। সুহ্নাকে পরিত্যাগ করার প্রসঙ্গ যেন তুলো না।

মিগার পত্নী বললেন— ঠিক বলেছ।

মিগার বিনীতভাবে গেলেন গুরু নাতপুত্তর কাছে। বললেন নেহাত বালিকা আমার সুহ্নাটি। অতিশয় লজ্জাশীলাও। কোনদিন নগ্নতা দেখেনি সে। তাকে ক্ষমা করুন ভন্তে।

নাথপুত্ত বললেন— তবে অবশিষ্ট দু দিন তোমার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আর আমরা যাচ্ছি না।

মিগার বললেন— আমি আপনাদের এখানেই ভোজনে আপ্যায়িত করব। কষ্ট করে আমার গৃহে যাবার প্রয়োজন নেই। আমার পরিজন সব এখানেই আসবে, তাদের আপনার উপদেশ শুনিয়ে কৃতার্থ করুন ভন্তে। তারপর আমার সুহ্নাকে আমি আপনার দেশনা শোনবার যোগ্য করে নিই। ধীরে ধীরে সে আপনাকে বুঝতে শিখবে। জিনকে বোঝা কি আর সেদিনের বালিকাটার কম্ম?

নিগ্‌গণ্ঠ নাতপুত্ত ক্রোধ জয় করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর প্রশান্তি ক্ষুন্ন হয় বটে। কিন্তু এখন তিনি আবার উদাসীন। মুখে অপ্রসন্নতার চিহ্নও নেই। একটি তিক্ত ঘটনা ঘটেছে। তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এখন আর সেই ক্রোধ তিনি পুষে রাখতে ইচ্ছুক নন। তিনি মিগারকে অভয় দিলেন।

অতএব পরের দুদিন মিগার-গৃহ থেকে পুরাঙ্গনারা, কর্মকররা, যে যেখানে আছে সব নাতপুত্তর কাছে উপদেশ শুনতে গেল। ভারে ভারে পক্ক খাদ্যও গেল শ্রমণদের আপ্যায়নের জন্য। শুধু বিশাখাই তার অন্তরঙ্গ সখীদের নিয়ে নিজগৃহে রইল।

ধনপালী বলল— ঠিক করেছ ভদ্দা। ছি ছি ছি। দেখে তো আমি লজ্জায় মরি। বিশ পঁচিশ জন পুরুষ, একেবারে কি না ল্যাংটা?

কহ্না মুখ বেঁকিয়ে বলল— আহা, কী শ্রীই খুলেছিল, দু পায়ের ফাঁকে সব দীর্ঘ দীর্ঘ লিঙ্গ ঝুলছে! আমার তো হাসি পাচ্ছিল।

ময়ূরী বলল— এ প্রকার বলিস না। শত হোক সমন এঁরা। সংসার ত্যাগ করে কষ্টসাধ্য তপস্যা করেছেন সব, অমৃত পেয়েছেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবেন।

কহ্না মুখভঙ্গি করে বলল— কোন স্বর্গে যাবে রে ওরা? আমাকে তো সেই স্বর্গে নিয়ে যেতে চাইলেও যাবো না। ইন্দ্রিয় সংযম করতে হলে বস্তরত্যাগ করে ফেলতে হবে এমন কথা তো জন্মেও শুনি নি। বুঝিও না। পথে বেরোলে কুকুর তাড়া করে না? দেখবি একদিন এঁরা দারুণ বিপদে পড়বেন। নগরে-হাটে ঘোরেন। একদিন যেখানে যত কুকুর আছে ঘিরে ফেলবে। যেটুকু মাংস শরীরে আছে ছিঁড়ে নেবে। তখন এঁরা আবার বস্তর পরবেন!

ধনপালী বলল আমি দেখছি দ্বিতলের বাতায়ন থেকে বালক বালিকাগুলি ঝুঁকে ঝুঁকে কী দেখছে আর হাসছে। দেবী সুপ্‌পিয়ার শিশুপুত্তুরটি তো মুখে আঙুল পুরে সেই যে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রইল, তাকে আর ভোজনের জন্য ঘরে আনতেই পারি না।

বিশাখা বিরক্ত হয়ে বলল— 'তোরা স্তব্ধ হবি ? উঃ, কী বকতেই না পারিস !' সে প্রাণপণে হাসি চেপে মুখের ভাবে বিরক্তি ফুটিয়ে তুলেছে।

ময়ুরী বলল— কিন্তু, সমন বিসাখাভদ্দাকে কী ভাবে গালি দিলেন ? অলক্ষণা ! অকল্যাণ হবে ! গহপতিকে তো বললেন একে পরিত্যাগ করো ! আমার কিন্তু বুক কাঁপছিল। অভিসম্পাত যে ! এঁরা রেগে গেলে কী না করতে পারেন। ইদ্ধি আছে তো !

বিশাখা এবার হেসে বলল— আমিও বহু প্রকার জানি। ইদ্ধি না হলেও জাদু জানি। তা জানিস ! মায়ের কাছ থেকে পিতার কাছ থেকে তো শিখেছিলামই, আবার পিতামহ যে বিবাহের আগে এসে সাকেতে রইলেন, পিতামহর কাছ থেকেও শিখে নিয়েছি। আমাকে আঘাত করলে আমিও প্রত্যাঘাত করতে জানি।

কহ্না দুষ্টু হাসি হেসে বলল— তা হলে এমন কোনও জাদু করো না বিসাখাভদ্দা যাতে ওই সমনগুলো হঠাৎ লজ্জায় অভিভূত হয়ে যায় ! ল্যাংটা থাকা ঘুচে যাবে একেবারে।

বিশাখা বলল— তার জন্য ইদ্ধি চাই। জাদুতে হবে না। তবে এ গেহ থেকে ওদের তাড়াবার জন্যে যা করার প্রয়োজন তা আমি অবশ্যই করবো।

এবং এই সংকল্পের জন্যই বিসাখার জীবনের পরবর্তী সংকট ঘনিয়ে এলো।

উৎসবের তৃতীয় দিনে গুরু এবং গুরুভাইয়ের ভোজনাদি করিয়ে মিগার ফিরে এসেছেন। বিসাখা নিজের হাতে যত্ন করে তাঁকে খেতে দিয়ে বসে বসে ব্যজন করছে। এমন সময়ে দ্বারের কাছে কাষায় চীবর পরিহিত এক শ্রমণ এসে দাঁড়ালেন, হাতে ভিক্ষাপাত্র। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা অধিকাংশ সময়েই মুখ ফুটে ভিক্ষা চান না। নিষেধ আছে। ভগবান বুদ্ধ এইভাবেই ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। তাই তাঁর সংঘের ভিক্ষুরাও অনেকেই তাঁকে অনুকরণ করেন।

বিশাখা বলল— পিতা, একজন শ্রমণ ভিক্ষার্থে এসেছেন।

মিগার মনোযোগ দিয়ে খেতে লাগলেন। যেন শুনতেই পান নি।

এবার ভিক্ষু পুরোপুরি দ্বারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কাষায় বস্ত্রের আভা সূর্যালোকে দীপ্ত হয়ে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করছে। মৃদু স্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন শ্রমণ।

মিগার একবার চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে আবার খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

তখন বিশাখা উঠে গিয়ে ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে বলল—ভগবন, এ গৃহের স্বামী পুরানো খান। আপনি অন্যত্র দেখুন।"

এতদিনে মিগারের ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি পায়সের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলে চিৎকার করে উঠলেন : 'কী বললে ? আমি পুরানো খাই ? উত্তম অন্ন দিয়ে উত্তম পায়স প্রস্তুত হয়েছে, গুরুকে ভোজন করিয়ে এখন নিজে সেই সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ করছি, আর তুমি বললে আমি পুরানো খাই ? ধনী পিতার গর্বে তুমি জ্ঞান হারিয়েছো। বহু অপরাধ তোমার ক্ষমা করেছি। আমার গুরুকে সর্বসমক্ষে অপমান করলে তা পর্যন্ত ক্ষমা করেছি অবোধ বালিকা বলে, কিন্তু আর না। তোমাকে অবিলম্বে সাকেতে প্রেরণ করবো। পরিত্যাগ করবো।

মিগারের কণ্ঠ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। দাস-দাসী, পুরস্ত্রীরা মিগার-পত্নী সব যে যেখানে ছিল ছুটে এলো।

এই ধনগর্বী দুর্বিনীত সুহ্নাকে আমি ত্যাগ করলাম— আবার ঘোষণা করলেন মিগার। রাগে তিনি কাঁপছেন।

বিশাখা প্রথমটা একটু হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এতোজনকে সমবেত দেখে সে দৃপ্তকণ্ঠে বলল— পিতা আপনি বললেই তো আমি ত্যক্ত হতে পারি না। আমি তো একটা সাধারণ রমণী নই যাকে পথ থেকে দয়া করে তুলে এনেছেন ! রীতিমতো দূত পাঠিয়ে, বহু অনুসন্ধানের পর আমার রূপ, গুণ, কুলগৌরব সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে তবেই যথেষ্ট সাধ্যসাধনা করে আমার পিতার কাছ থেকে আমাকে প্রার্থনা করে এনেছেন। আমি এই গৃহের সুহ্না। এ গৃহে আমার পূর্ণ অধিকার আছে। প্রমাণ করুন আমি অপরাধ করেছি। সবার সামনে প্রমাণ হয়ে যাক কে ভুল করছে, কে ঠিক। আমি অরক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নই, পিতা আমার দোষ-গুণ বিচারের জন্য যাঁদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আসুন তাঁরা।

তখন, মিগারের মনে পড়ল তাই তো! এমন একটা ব্যবস্থা ধনঞ্জয় সেট্‌ঠি করেছিলেন তো বটে! তিনি বিনা বিচারে একার সিদ্ধান্তে এই সুহ্নাটিকে ত্যাগ করতে তো পারেন না। কী বিপদেই না পড়া গেল!

ততক্ষণে বিশাখা সে স্থান ত্যাগ করে নিজের গৃহে চলে গেছে। চলে গেছে তার দাস-দাসী, সখী যে যেখানে ছিল সবাই। মিগার গৃহে অকস্মাৎ যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। সব থমথম করছে। পুরাঙ্গনা ও দাস দাসী যারা ছিল, সবার মুখই শুকিয়ে গেছে। কারো কারো চোখে অশ্রু। বিশাখা এই ক' মাসেই এদের আপন করে নিয়েছে। তার স্বাভাবিক গরিমা; সরলতা, উদারতা এবং প্রীতির ক্ষমতায় সে মিগার গৃহের সবাইকেই জয় করে নিয়েছে।

কিন্তু মিগার এবার তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তিনি মধ্যস্থতা করবার জন্য শ্রাবস্তীর চার গৃহপতিকে ডাকতে পাঠালেন। সাকেতেও অশ্বারোহী দূত চলে গেল ঝড়ের বেগে।

যে কাননে মাত্র কদিন আগে নিগ্‌গণ্ঠদের নিয়ে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল সেখানে সেই চন্দ্রাতপের তলায় সেই মঞ্চেই আজ আটজন বয়স্থ মানী ব্যক্তি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখার বিচার করবার জন্য এসে বসেছেন। এসেছেন মিগার গৃহের সবাই। দাস-দাসীরাও আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বিশাখা তার প্রসাধন কক্ষ থেকে বেরোল। সোনার কাজ করা রক্তবর্ণ দুকূল তার পরনে। সে যত্ন করে প্রসাধন করেছে। মহালতাপসাদন ধারণ করে চলছে যেন আনন্দময়ূরী। স্থির আনন্দের অকম্প শিখা তার মুখে। তার ডান হাতে একটি পত্র। মা সুমনা উদ্বিগ্ন হয়ে লিখেছেন : "বিসাখা আদরিণী কন্যা আমার, শ্রাবস্তী থেকে যে সংবাদ এসেছে তা সুখের না দুঃখের বুঝতে পারছি না। যাঁরা তোমাকে বুঝলেন না তাঁদের সঙ্গে যত শীঘ্র তোমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় ততই মঙ্গল। তোমার পিতা বলছেন তুমি চলে এসো সসম্মানে। তোমার মোক্ষক্রিয়া (বিবাহ-বিচ্ছেদ) এখান থেকেই সম্পাদন করাবো।

তোমার জননী কিন্তু নিশ্চিত আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে বিসাখা এমন কিছু করবে যাতে বোঝা যাবে সে বিসাখাই। সে অন্যান্য কারো মতো নয়। সে শুধু নিজের সম্ভ্রম, নিজ পিতৃকুলের এবং নারীদের গৌরবই বৃদ্ধি করবো না, সে এমন একটা কীর্তি স্থাপন করবে যা বহুকাল ধরে সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল থাকবে। সুমনা উৎকণ্ঠিত নয় জেনো।"

পরিশেষে মা তাকে স্নেহচুম্বন করছেন। আশীর্বাদ করছেন সে জয়ী হবে। সেই পত্রটিই সে তার ডান হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরে আছে।

ধনপালীর চোখে অশ্রু। সে বলল— ভদ্দা এতো সেজেছ আজ? বিশাখা বলল— আজ আমার বড় আনন্দের দিন পালি আমি পিতৃগৃহে ফিরে যাবো। আমার প্রবাসের কাল শেষ হয়েছে।

কহ্না বলল— সেই ভালো। এই কৃপণ সেট্‌ঠির ঘরে আমারই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে! তার তুমি। বলছে কিন্তু তার মুখ যেন বারিগর্ভ মেঘের মতো।

ময়ূরী তার স্বামিনীর অপমানের ভয়ে এতোই বিবশ হয়ে গেছে যে তার জ্বর এসে গেছে। সে গিয়ে তার নিজের ঘরে শুয়েছিল। বিশাখা তাকে শয্যা থেকে তুলে আনল। ময়ূরী ভেবে পায় না ভদ্দার মুখের প্রসন্ন হাসির কারণ। পিতৃগৃহে যাওয়া আনন্দের কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে, এই ভাবে?

ঋষি মধুচ্ছন্দার বর্ণিত উষার মতো যে অনুপম লাবণ্যবতী বেশে শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করেছিল সেই ভাবেই সভাগৃহে এলো সে। খালি উষার মৃদুতার স্থান নিয়েছে এক যোদ্ধৃর দৃপ্ততা কিম্বা সে এমন একজন যে এখনও জম্বুদ্বীপের কল্পনায়, জম্বুদ্বীপের পুরাণে জন্মায়নি। কোনও আসন্ন ভবিষ্যতের সে বীজরূপা।

মিগার বললেন— আপনারাই বিচার করুন। এই সুহ্না ঘোষণা করে বলে আমি নাকি বাসি খাই। আমি গৃহপতি মিগার। সাবত্থির সবচেয়ে মাননীয়, সবচেয়ে ধনীদের মধ্যে একজন। আমি এতো কৃপণ যে আমি বাসি খাই। আর এই কথা বলা হল কখন? না আমি যখন উত্তম সুগন্ধযুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ন দিয়ে, উত্তম পাটল গাভীর দুধ দিয়ে প্রস্তুত পায়স খাচ্ছি। দ্বারে এক সমন এসেছিল, তাকে এ বলল— এ গৃহের স্বামী পুরানো খান, আপনি অন্যত্র যান।

এ কথা শুনে সাকেতের বলভদ্র শ্রেষ্ঠী বলে উঠলেন— এ কী বলছেন মিগারভদ্র, আপনি পুরানো ভক্ষণের অর্থ জানেন না? আমরা তথাগত বুদ্ধের প্রদর্শিত মার্গকে নূতন বলি। তাই তুলনায় অন্যান্য শ্রমণ পন্থের মতগুলিকে পুরানো বলে থাকি। বচ্চে বিসাখা, তুমি এ কথা তোমার শ্বশুরকে বুঝিয়ে বলো নি?

বিশাখা বলল— আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারি নি ইনি কেন এতো ক্রুদ্ধ হয়েছেন। যখন বুঝতে পারলাম, ততক্ষণে এঁর আমাকে ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করা হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে গৃহের যে যেখানে ছিল ছুটে এসে মহা কোলাহল আরম্ভ করে দিয়েছে। শ্রাবস্তী কোসলের রাজধানী। এখানে কত শ্রমণপন্থ, কত সন্ন্যাসীর আসা-যাওয়া। কিন্তু এই সামান্য নূতন মার্গ পুরাতন মার্গ, নূতন ভক্ষণ, পুরানো ভক্ষণের কথা যে এঁরা জানেন না, আমি কী করে জানবো?

মিগার অত্যন্ত অপ্রতিভ হলেন। মধ্যস্থ গৃহপতিরা সকলেই তাঁর দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। কে কোথায় যেন হেসে উঠল।

মিগার তাঁর লজ্জা চাপা দেবার জন্য আরও বীররসাত্মক ভঙ্গিতে বলে উঠলেন তা যেন হল, কিন্তু এই সুহ্না তো এর পিতার দেওয়া উপদেশগুলিও পালন করে না। অত্যন্ত অবাধ্য। পিতা নিষেধ করে দেওয়া সত্ত্বেও এ গৃহের অগ্‌গি বাইরে নিয়ে যায় গভীর রাতে, আবার বাইরের অগ্‌গি ভিতরে নিয়ে আসে। গৃহাগত দেবতাদের পূজা করতে বলেছিলেন আমার বৈবাহিক। এ বধূ তো আমার গুরুর চরণ স্পর্শ না করেই ধিক্কার দিয়ে ফিরে এলো। গুরু কি গৃহাগত দেবতা নয়?

তখন বিশাখা বলল— পিতৃব্যগণ, ইনি আমার পিতার উপদেশের মর্মার্থ বুঝতে পারেননি। গৃহের আগুন বাইরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ, গৃহের গোপন কথা বাইরে আলোচনা করা, বাইরের আগুন ঘরে আনার অর্থ, বাইরে শ্বশুরগৃহের সম্পর্কে কোনও নিন্দাবাদ শুনলে তা তাঁদের কর্ণগোচর করা। এ গুলি করলে গৃহে শান্তি থাকে না। তাই পিতা আমাকে এ উপদেশ দ্যান। আমি রাত্রিতে একটি ঘোটকীর প্রসববেদনা ওঠায় তার পরিচর্যার জন্য উল্কা নিয়ে অশ্বশালায় গিয়েছিলাম। আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে গৃহে ফিরতে সন্ধ্যা হলে উল্কা নিয়ে অন্ধকার পথ দিয়ে ফিরি। বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি!

AMARBOI.COM

সকলেই মাথা নেড়ে বললেন— না, না। এর মধ্যে অপরাধের কী আছে। বরং বিসাখার করুণা, কর্তব্যবোধ এবং সতর্কতারই চিহ্ন এগুলি।

বিশাখা বলল— আমার পিতা গৃহাগত দেবতা বলতে অতিথিদের বুঝিয়েছিলেন। তাঁদেরই পূজা অর্থাৎ সেবা করতে তিনি উপদেশ দ্যান। এখন আপনারাই বলুন...

মিগার তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে নেড়ে বলে উঠলেন— 'তা যেন হল, কিন্তু ধনঞ্জয় যে অগ্নিপূজা করতে উপদেশ দিলেন তুমি তো সোজাসুজি বলে দিলে অগ্নিগৃহ স্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। অগ্নিপূজা তুমি করবে না। এবার বলো, উত্তর দাও!' তিনি বিজয়গর্বে চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

বিসাখা মৃদু হেসে বলল— অগ্নি বলতে পিতা শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে বুঝিয়েছেন। অগ্নিহোত্রীর আগুন নয়। আমি আপনাদের সেবা, আপনাদের বন্দনা করব বলে, ভিন্ন গৃহে যাওয়ার যে প্রস্তাব আপনি করেছিলেন, তাতে সম্মত হইনি। আরও শুনুন, আমার পিতা বলেন যে দেয়, যে দেয় না উভয়কেই দেবে। যে দেয় সে সচ্ছল ধনী স্নাতক, যে দেয়না সে দরিদ্র আত্মীয় পরিজন। এবং অন্যান্য দরিদ্রজন। শ্রেষ্ঠীর গৃহে প্রচুর ধন থাকে, উদ্বৃত্ত অন্ন থাকে। যার গৃহে প্রচুর থাকে তাকে এ ভাবে দান করতে শিখতে হয়, না হলে তো দেশে খালি ধনীরাই বেঁচে থাকবে, দরিদ্ররা ধীরে ধীরে অল্পাহারে পশুরও অধম জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে। পৃথিবীতে সমাজে এইভাবেই সৌষম্য রক্ষা করতে হয় দানের দ্বারা। এ কথা পিতা আমাকে শিশুকাল থেকে শিখিয়েছেন। আরও বলি শুনুন পিতা আমাকে সুখে উপবেশন, ভোজন এবং শয়ন করতে বলেছিলেন। এখন যদি এঁরা ভাবেন তার অর্থ হল কোমল শয্যায় শয়ন, উচ্চাসনে উপবেশন এবং সর্বদাই মহার্ঘ খাদ্য ভোজন তাহলে তো মহা বিপদ! প্রকৃতপক্ষে, সুহ্নার ক্ষমতা থাকলে সাধ্যমতো শ্বশুর-শ্বশ্রূর পরিচর্যা করা উচিত। তাঁরা মান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের উপস্থিতিতে উচ্চাসনে বসাই অস্বস্তি: কারণ, তাঁদের ভোজন না হলে সুহ্না ভোজনে সুখ পায় না। তাঁরা নিদ্রা না গেলে সে নিজেও নিশ্চিন্তে নিদ্রাও যেতে পারে না। আমা" সাধ্য আছে, তাই পিতা আমাকে এ রূপ উপদেশ দিয়েছেন।

গৃহপতিরা একযোগে বলে উঠলেন— 'সাধু! সাধু! বিসাখা তুমি যথার্থই উচ্চবংশের কন্যা। তোমারই যথার্থ শিক্ষা হয়েছে। তুমি যেমন বিনয়ের পাঠ নিয়েছ, তেমনি অন্যায় অভিযোগের বিরুদ্ধে বিতর্কে দাঁড়াবার পাঠও পেয়েছো। ধন্য তোমার পিতা মাতা। গৃহপতি মিগার আপনি ধন্য যে এমন সুহ্না পেয়েছেন। এ-ই আপনাদের গৃহের প্রকৃত অগ্নি। একে সযত্নে রক্ষা করুন।'

তখন পরিজনেরা আনন্দে কোলাহল করে উঠল। অনেকের চোখে সুখের অশ্রু দেখা দিল। মিগার যার-পর-নাই অপ্রতিভ হলেন। লজ্জায় অধোদন হয়ে বসে রইলেন, কিছুই বলতে পারছেন না। তাঁর এতো দিনের শানানো তীরগুলি এখন তাঁর নির্বুদ্ধিতা প্রমাণ করে তাঁরই বুকে ফিরে এসে আঘাত করেছে। এমন বৃহৎ জন সমাবেশ যেখানে বয়স্থ, মানী গহপতি থেকে কুল-ইত্থিরা, দাসরা, দাসীরা পর্যন্ত উপস্থিত রয়েছে সেখানে এমনভাবে অপদস্থ হওয়া! নিজের দোষে! কেউ হাসছে না, তবু তিনি যেন চারদিক থেকে কৌতুকের হাসি শুনতে পাচ্ছেন। এর পর কি আর তাঁর দাস-দাসী ভৃতক কর্মকররা সেভাবে তাঁকে মান্য করবে? পথে বেরোলে যদি ধিক্ ধিক্ ধ্বনি শুনতে পান? সাবত্থি অত্যন্ত পরচর্চা-পরায়ণ নগর। এখানে কাকের মুখে সংবাদ ছড়ায়। সুহ্নাটার ওপর তাঁর ক্রোধ হচ্ছে। কেমন একটা ধারহীন ক্রোধ। তাকে কিছু বলা প্রয়োজন— সান্ত্বনার কথা ক্ষমাপ্রার্থনার কথা, কিন্তু তিনি শত চেষ্টাতেও মুখ খুলতে পারছেন না।

এই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত। মিগারপত্নী যিনি এতো দিন অন্তঃপুরের ভেতরে থেকে শুধুই মিগারের কৃপণতা, অনুদারতা ও বুদ্ধিহীন কার্যকলাপের অনুকরণ করে যাচ্ছিলেন, যেন বাইরেও যেমন মিগার-নীতি ভেতরেও তেমনি মিগার-নীতি চলতে থাকে, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে অকস্মাৎ কেমন একটা শিহরন, একটা গৌরববোধ হতে লাগল। ওই যে বধূটি প্রজ্বলিত বহ্নির মতো, বহ্নির অধূমক শিখার মতো দাঁড়িয়ে সভার বহু পুরুষের সামনে অকম্প্র সাহসে আত্মপক্ষ সমর্থন করছে, ও যেন তাঁরই সুপ্ত বাসনা। তাঁরই হৃদয়ের নিদ্রিত মানবতা। জেগে উঠেছে। শিশুকাল থেকে তিনি একটি কাহিনী শুনে আসছেন। পাঞ্চাল-কন্যা, কুরুকুলবধূ কহ্নাকে নাকি দ্যূতসভায় পণ রাখা হয়েছিল, এবং সভামধ্যে তাঁর বস্ত্রহরণ করা হয়েছিল। এই কাহিনী শুনে তাঁর মা ও তাঁর অজজা-মার মতো তিনিও একসময়ে রোষে ফুলে ফুলে উঠতেন, আজ তাঁর সুহ্না যেন কেমন ভাবে সেই কহ্না কাহিনীটিরই কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আপন মর্যাদা আপনি রক্ষা করল। যেন এতদিনের রোষের, লজ্জার শান্তি হল। তিনি ধীরে ধীরে সভার মধ্যে এগিয়ে এসে বিশাখার পাশে দাঁড়ালেন, বললেন— 'এসো মা!'

তখন বিশাখার চক্ষে অশ্রু ঝিকমিক করতে লাগল কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল— 'মাতা, পিতৃব্যগণ, বিসাখার বিচারের আয়োজন হয়েছিল, বিসাখা নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে পেরেছে। তার পিতা-মাতার মর্যাদা সে রক্ষা করতে পেরেছে। কিন্তু এই শ্বশুরগৃহের ওপর যে অধিকারের কথা সে পূর্বে বলেছিল, এখন সে তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে যাচ্ছে।'

সখীদের দিকে তাকিয়ে সে বলল—পালি, রথ প্রস্তুত করতে বল্। আমি সাকেত চলে যাবো।'

তখন সেই স্তব্ধ উৎকণ্ঠিত সভার মধ্যে মিগার সেট্‌ঠি সহসা বিশাখার সামনে একেবারে শুয়ে পড়লেন। বললেন—'আমাকে ক্ষমা করো বিসাখা, আমি মূঢ়, তোমার ওপর অত্যন্ত অন্যায় করেছি, কিন্তু এখন অপরাধ স্বীকার করছি। আমায় ক্ষমা করো। চলে যেও না মা।'

বিশাখা অভিমানিনীর মতো মুখ ফিরিয়ে রইল, সে যেন সত্যিই এক আদরিণী বালিকা এখন। ঠোঁট দুটি ফুলে ফুলে উঠছে। চোখ দুটি সজল। কিন্তু অশ্রুপাতও করছে না তাই বলে। মিগার অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর অবশেষে সে অশ্রুভরা চোখে বলল—থাকতে পারি। এক শর্তে। যদি তথাগত বুদ্ধকে এ গৃহে আপ্যায়ন করতে পারেন। যদি এই কাননে ওই মঞ্চে তাঁর দেশনা শুনতে পাই। তবেই।

মিগার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন— 'তাই হবে। তাই হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন মিগার পত্নীর বুকে তার দৃপ্ত মুখ গুঁজে দিয়ে বিসাখা নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ময়ূরী দূর থেকে সে দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ সবার অলক্ষ্যে সভা থেকে বেরিয়ে যায়। সে নিজের কক্ষে যাচ্ছে। তার বুকের মধ্যে কী এক অজানা অনুভূতি। এ কি আনন্দ না সব-হারানোর শূন্যতা? তার স্বামিনী এত দিনে শ্বশুরগৃহে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল একথা সে বুঝতে পারছে। মর্যাদায় এবং ভালোবাসায়। শ্বশ্রূ কী ভাবে দু হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে আছেন! সুখী হওয়ার কথা। অথচ তার চক্ষু জ্বালা করে জল আসছে। এ তো আনন্দাশ্রু নয়। এ যেন শোক! প্রিয় বিচ্ছেদের দুঃখ! ময়ূরীর, কহ্লার, ধনপালীর কি এবার কাজ ফুরোল? সত্যিই কি এতো দিনে তাদের স্বর্ণপিঞ্জরের সোনার শেকল কাটল না কি?

২৫

চণক ভদ্র! চণক ভদ্র!—বাতাসের সঙ্গে ক্ষীণ ডাক ভেসে আসে। যেন উত্তরের বাতাসই ডাকছে। চণকের এমনিই মনে হয়। উত্তর, তার দেশ, এখন সুদূর হয়ে গেছে। এক সময়ে তার দেশ তার কাছে বদ্ধ জলাশয়ের মতো মনে হয়েছিল। তক্ষশিলার গুরুকুলও সাধারণভাবে সেই বদ্ধতার দায়ভাগী। সমগ্র গান্ধার জুড়ে ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় আচার্যর ঘরে, সম্পন্ন গৃহস্থর ঘরে, রাজন্য, রাজপুরুষদের ঘরে খালি যজ্ঞের ধোঁয়া কুণ্ডলীকৃত হয়ে উঠছে। বাতাসে কান পাতলেই শোনা যাবে 'অগ্নে ব্রীহি বৌষট্'—অগ্নি তুমি খাও এবং দেবতার জন্য বহন করে নিয়ে যাও, 'সোমস্য অগ্নে ব্রীহি বৌষট্'—অগ্নি, তুমি সোম ভক্ষণ করো, বহন করো। শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে চণকের এক সময়ে মনে হয়েছিল—কী প্রয়োজন এই অতি বিশদ, জটিল যজ্ঞপদ্ধতির? এগুলি কেন? কেন?

'চণক ভদ্র! চণক ভদ্র!' পেছনে ধুলোর কুণ্ডলী উড়িয়ে এক অশ্বারোহী আসছে। পাহাড়ের পথে অশ্বর ক্ষুরের শব্দ শোনাচ্ছে বৌ-ষট্ বৌ-ষট্ বৌ-ষট্। চণক ফিরে দাঁড়াল। অশ্ব থেকে এক লাফে নামছে অশ্বারোহী। এক সুন্দর যুবক। কেশগুলি মনোহরভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। উত্তরীয়র একপ্রান্ত কটিবন্ধে যুক্ত করে বাঁধা। অন্য প্রান্তটি বাতাসে উড়ছে। পতাকার মতো। বুকে উপবীত দেখা যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে আসছে যুবক।

—চণক ভদ্র আপনি এখানে? বালকের মতো উল্লাসে মুখ উদ্ভাসিত করে বলে উঠল যুবক—আমাকে একটুও স্মরণ করতে পারছেন না?

—কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? মুখটি চেনা-চেনা। তক্ষশিলায়, না?

—আমি তিষ্য। গুরু সংকৃতির কাছে ছিলাম। শস্ত্রগুরু সুধন্বার ওখানে আপনাকে দেখেছি। দেখেছি অনেক স্থানেই। পরিচয় হয়নি। আচার্য দেবরাতের অন্ত্যেষ্টির সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। এক নিশ্বাসে সাগ্রহে অনেক কথা বলে গেল তিষ্য। তার চোখে সম্ভ্রম, সে যেন কোনও মহৎ প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় হাত পেতে আছে।

দু এক মুহূর্ত। তারপরেই তিষ্যকে আলিঙ্গন করল চণক। বলল—সুখী হলাম।

উদ্ভাসিত মুখে তিষ্য বলল—আমি সাকেতের রাজা উগ্রসেনের জ্যেষ্ঠকুমার। আপনি বন্ধুল মল্লর নাম শুনেছেন?

—শুনেছি।

—ওঁর কাছেও কিছুদিন অস্ত্র শিক্ষা, রণকৌশলের পাঠ নিয়েছি। এই সব পরিচয় এবং তথ্যকে সে যেন চণকের সঙ্গে আলাপিত হবার যোগ্যতা বলে নিবেদন করতে চায়। দুজনে গৃধ্রকূট বেয়ে উঠছে এখন। বড় বড় পায়ে, সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে। চণক বলল, কোশল রাজসভায় কর্ম করেন?

—না। না। শুধু রণকৌশল শিখছিলাম।

—সাকেতে পিতার রাজ্যপাট দেখেন?

—তাও না। তিষ্য উজ্জ্বল মুখে বলল, চণক ভদ্র, আমি জানি না বুঝি না আমার বিদ্যা, অভিজ্ঞতা, দর্শন এসবের যথার্থ প্রয়োগ কোথায়, কীভাবে হতে পারে। আমি একটা বিভ্রান্ত বিমূঢ় অবস্থার মধ্য দিয়ে কালক্ষেপ করছিলাম, কাউকে খুঁজছিলাম, আপনার মতো কাউকে, যিনি আমায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ দেখাতে পারবেন, যাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলাপ করতে পারবো। চণক ভদ্র 'আপনি' বলবেন না আমায়। আমি আপনার অনুজের মতো। আপনি যখন সদ্য সদ্য সমাবৃত্ত হবার পরই দণ্ডনীতির বিশেষ পাঠ দিচ্ছিলেন তখন কোনও কোনও আলোচনাসভায় বিমুগ্ধভাবে উপস্থিত থেকেছি। আচার্য সংকৃতির অবমাননার ভয়ে আপনার শিষ্য হতে পারিনি। আমায় ভাই না হোক বন্ধুর স্থান অন্তত দিন। তিষ্য যে অত্যন্ত উত্তেজিত তার কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

মধ্যদেশ—চণক ভাবলো। এখানে রাজা থেকে কবি, রাজপুত্র থেকে বনের মানুষ পর্যন্ত কথা বলে অনেক। উচ্ছ্বাস-আবেগ গোপন করে না। এক অর্থে আত্মাভিমান লক্ষণীয়ভাবে অল্প। দ্রুত বন্ধুত্ব করতে পারে। উত্তরের মানুষগুলি স্বল্পভাষী। নিজেকে অপরের কাছে প্রকাশ করে ধরার অভ্যাস তাদের নেই। এবং প্রচণ্ড দাম্ভিক। এভাবে দূর থেকে অল্প পরিচিত একজনকে দেখে উচ্ছ্বসিত হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় করা, সখ্যে পৌঁছে যাওয়া—এ গান্ধারবাসীরা ভাবতেও পারে না। চণক নিজেও এর ব্যতিক্রম নয়। সে হেসে বলল—বন্ধু ? আপনি আমার বন্ধুত্ব চাইছেন আমায় না জেনে ?

—আমি আপনাকে জানি। কে না জানে তক্ষশিলায় ? দৈবরাত চণককে ? আপনি আচার্য দেবরাতের আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করছেন। আপনি ভাবছেন সূক্ষ্মতর দণ্ডনীতি নিয়ে...আমি জানি। অনেক কাল থেকে আপনাকে বন্ধুরূপে পাবার বাসনা আমার।

চণক আকাশের দিকে তাকাল। তরল নীল আকাশ। সূর্য এখন উত্তরায়ণে। তির্যকভাবে রোদ পড়েছে গৃধ্রকূটের মাথার ওপর। সঞ্চিত বারি শেষ করে দিয়ে মেঘগুলি এখন শ্বেত, লঘু। সে হঠাৎ কটি থেকে তরোয়াল খুলে ধরে সেটি আকাশের দিকে তুলে দাঁড়ালো। বলল, ভালো, তিষ্য, আকাশ সাক্ষী। রৌদ্র সাক্ষী। আজ থেকে চণক তিষ্যর বন্ধু, সাকেতক তিষ্যর, কেমন ?

তিষ্য তরোয়ালের উপর ন্যস্ত চণকের মুঠির ওপর হাত রাখল। বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলল, বন্ধু। মেঘগুলি সাক্ষী। গৃধ্রশিখর সাক্ষী। সাক্ষী রাজগৃহ।

—রাজগৃহ তোমার ভালো লেগেছে, তিষ্য ?

—রাজগৃহ অনবদ্য। অনবদ্য !

—কেন ?

—কেন ?—চণকের পেছন পেছন উঠতে উঠতে তিষ্য চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল একবার। বলল, একই সঙ্গে পাহাড়, অরণ্য। মধ্যদেশে তো পাহাড় সুলভ নয় ভদ্র, গয়া থেকে এদিকে এলে প্রচুর পাহাড় দেখা যায়, কিন্তু সে সব বড় রুক্ষ। এ পাহাড়গুলি পুরোপুরি শ্যামল না হলেও যেন অত কঠিন, নীরস নয়। পাহাড়ের সানুদেশে প্রচুর গাছ। দুরারোহও নয় পাহাড়গুলি, নগরীটি যেন দেবতারা সুরক্ষিত করে দিয়েছেন।

ভালো। আর কোনও কারণ ?

এইটুকু পরিসর এ নগরের। তবু চোখ এবং মন ক্লান্ত হয় না। বৈচিত্র্য আছে। শুধু গৃহ, পথ এবং কানন বিন্যাসের বৈচিত্র্য নয়। আরও কিছু...আরও কী, তিষ্য ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চণক বলল, আর কী, বন্ধু তিষ্য ?

তিষ্য চিন্তিত মুখে বলল, আছে কিছু। এখুনি তাকে বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারছি না ঠিক। কিন্তু কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীর ঐশ্চর্যও তো দেখেছি। রাজগৃহও রাজধানী। এখনকার সবচেয়ে বড় না হোক, সবচেয়ে সমৃদ্ধ না হোক, সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রাজ্যের রাজধানী। এখানে সেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় বোধ হয়। যদিও প্রজাদের চোখে-মুখে শুধু সমৃদ্ধির চিহ্ন ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনি। তবু...

চণক বলল, সাধু, তিষ্য, সাধু। তোমার দেখার সঙ্গে আমার দেখা অনেকটাই মিলে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ কখনোই আকস্মিক নয়। আমাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল। অবশ্যই কথা ছিল।

দুজনে উঠতে উঠতে পাথরের চন্দ্রাতপের তলায় ভিক্ষু অস্‌সজিকে দেখতে পায়। আজকাল এই সময়ে অস্‌সজি ধ্যানমগ্নই থাকেন। তিনি পাছে উত্যক্ত হন, তাই ইদানীং চণক গিরিশিরে ওঠার এই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজ পথটি এড়িয়ে যায়। আজ তিষ্যর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে গিয়েছিল। তাকে অভ্যস্ত পথে চালিয়ে নিয়ে এসেছিল তার মন। সেই অঞ্চলটুকু পার হয়ে তিষ্য মৃদুস্বরে বলল, চণক ভদ্র, আপনার কখনও মনে হয় না সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক এঁদের সংখ্যা এত কেন ? সমগ্র কোশল, মগধ, উত্তরাঞ্চলও যেন দিনে দিনে ভরে যাচ্ছে শ্রমণে।

চণক চমকে তাকাল, বলল, এভাবে মনে হয়নি। তুমি বললে বলে মনে হয়। এর হেতু কী বলতে পারো ?

তিষ্য লজ্জিত হয়ে বলল, প্রশ্নই আসে মনে। উত্তর দিতে পারি না। উত্তরে দেখতাম প্রব্রজ্যা নিলে সন্ন্যাসীরা একেবারে জনহীন দুর্গম হিমবন্তে গিয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে এসে লোকালয়ে কিছুদিন বাস করে যেতেন। কিন্তু আমাদের এদিকে পথে বেরোলেই কোনও না কোনও পরিব্রাজক শ্রমণের সঙ্গে আপনার ঠোকাঠুকি হয়ে যাবে। এঁরা যেমন পাহাড়ে বা কাননে বাস করেন, তেমনি লোকালয়েও নিত্য নেমে আসছেন।

—কিন্তু তিষ্য, তোমার জন্মেরও বহুকাল আগে থেকেই তো এই প্রকার চলে আসছে !

—তা আসতে পারে ভদ্র। কিন্তু তাই বলে তাকে প্রশ্ন করব না ?

—তা বলছি না। শিশুকাল থেকে যা দেখে আসা যায়, মানুষ সাধারণত তাকে নিজের অজ্ঞাতেই মেনে নেয়। প্রশ্ন করে না। তুমি করছো। তোমার দৃষ্টির একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে।

—কী জানি কেন চণক ভদ্র, শ্রমণ-সন্ন্যাসী এঁদের দেখলেই চিরকালই আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা হয়। বুঝতে বা বোঝাতেও পারি না কেন। তাই-ই হয়ত প্রশ্ন জেগেছে।

—বিতৃষ্ণা কেন। এ প্রশ্নের উত্তর আগে তোমাকে ভেবে বার করতে হবে তাহলে।

দুজনে নীরবে উঠতে লাগল। বেশ খানিকটা ওঠবার পর বসার স্থান ঠিক করে চণক বসল। তার মুখ দক্ষিণে। ওই দিকে বন, যে বনের চরিত্র জানবার জন্য তার পরিব্রজন-ব্রত নেওয়ার কথা ছিল। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে তার এই ব্রতকে বিলম্বিত করে দিচ্ছে। রাজগৃহে আসবার আগে সে ছিল একজন বন্ধনহীন মুক্ত যুবক। তার জীবনের প্রধান কাজ তখন "রাজশাস্ত্র" সমাপ্ত করা। এই শাস্ত্র যথাযথ লেখবার জন্য যে চিন্তাই যথেষ্ট নয়, জীবনের সঙ্গে, বহু স্তরের মানুষের সঙ্গে ভাবনাকে মিলিয়ে মিলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন এই কথা বুঝে সে গান্ধার থেকে বেরোবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। রাজ্যগুলি দেখবে, বিশেষত মগধ, আদর্শ রাজা, রাজ্য এবং তন্ত্র কোথায় পাওয়া যায় অনুসন্ধান করবে, সেই সঙ্গে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিন্যাস, শ্রেণীগুলির ধ্যান-ধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে আসবে এমনটাই তার অভিপ্রায় ছিল। তার মনের সূক্ষ্ম পরিবর্তন হল ওই বনে। এই বন্যরা কোনও বিন্যস্ত শ্রেণীতে নেই। এদের আটবিক বলে উল্লেখ করা হয় এবং সেই উল্লেখের মধ্যে নিহিত থাকে সমাজের একটি মন্তব্যও—এরা উৎপাত। উপদ্রব। কিন্তু এদের কাছাকাছি বাস করে চণক বুঝেছে জম্বুদ্বীপের মাটিতে যদি তাদের, অর্থাৎ শ্বেতকায়দের অধিকার থাকে, যদি মিশ্রবর্ণ নাতিশ্বেত মানুষদের অধিকার থাকে, তাহলে ওই কৃষ্ণকায় মানুষগুলিরও পুরোপুরি অধিকার আছে। এই মাটিতে, এই অরণ্যেই ওরা যুগের পর যুগ, বংশের পর বংশ জন্মেছে, বড় হয়েছে, নিজেদের গোষ্ঠীর নিয়মগুলি মেনে জীবনযাপন করেছে, মরে গিছে, আবার জন্মেছে। এদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোনমতেই না। এমন কি চণকের একেক সময়ে সংশয় হয় এই আটবিকরাই কি জম্বুদ্বীপের আদি অধিবাসী ? তারা কি পরে এসেছে ? তারা যে প্রথমে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে ছিল, তারপরে ছিল সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মধ্যভাগে, তারও পরে এসেছে গঙ্গা-যমুনার অববাহিকায়, অর্থাৎ ক্রমশই উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্বে এবং দক্ষিণ-পূর্বে তারা ছড়িয়ে পড়েছে—এ কথা সে বেদ অধ্যয়ন করবার সময়েই বুঝতে পেরেছিল। তাহলে ? যখন তারা শুধু সপ্তসিন্ধু অঞ্চলেই বসবাস করছিল, তখন এই মধ্যদেশ কী রূপ ছিল ? এখন পূবদেশ, দক্ষিণদেশ যেমন ঘন অরণ্যে আবৃত তেমনই নিশ্চয়ই। কারা তখন এখানে বাস করত ? তার যুক্তি তাকে বলে—আটবিকরা। বন্যরা। অর্থাৎ যেখানেই বন, সেখানেই এরা বসবাস করত। এখন কল্পনা করা যাক, শ্বেতকায় মানুষগুলি আরও ভূমির সন্ধানে অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্র নিয়ে ক্রমশই এই মহাবনের ভেতরে প্রবেশ করছে। কেটে ফেলছে গাছ। পরিষ্কার করে ফেলছে যতেক গুল্ম। হিংস্র জন্তুগুলিকে হত্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। আটবিকরা তাদের বিরাট সংখ্যা, উন্নত অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। পালিয়ে যাচ্ছে, আরও গভীরে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। মাঝে মাঝে চোরের মতো আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে তুলছে শ্বেতকায়দের। কিন্তু তাড়াতে পারছে না। বিজয়ী এবং বিজিতের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তা-ও কিন্তু তাদের সঙ্গে আটবিকদের এখনও পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি। এই যে মহারাজ বিম্বিসার অঙ্গ রাজ্য জয় করেছেন, তার অর্থ কি তিনি অঙ্গে বসবাসকারী সমস্ত মানুষকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ! তা তো নয়। তারা যেমন তাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসরণ করে জীবনযাপন করছিল, তাই-ই করে যাচ্ছে। শুধু রাজশক্তির পরিবর্তন হয়েছে, হয়ত কতকগুলি নীতিও স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। এই পর্যন্ত। কিন্তু বন্যদের বেলায়, তাদের সমস্ত অধিকার যেন অস্বীকার করা হচ্ছে। হিংস্র জন্তুগুলিকে পর্যন্ত এভাবে শেষ করে দেওয়া হয় না। শাকভোজী পশুগুলিকে তো বিচরণ করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েই থাকে। নাঃ। আর্যমানুষের একটি প্রাচীনতম অপরাধ এই আচরণ। এরই জন্য অংশত জম্বুদ্বীপ কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নরগোষ্ঠীর সমষ্টি। একটি সুন্দর বস্ত্র যদি মাঝে মাঝেই ইঁদুরে কেটে দেয় বস্ত্রটি যেমন তার মহিমা হারায়, অব্যবহার্য, অর্থহীন হয়ে পড়ে—জম্বুদ্বীপও তাই হয়েছে। কোনও অর্থ নেই এর।

চণক তার এই নতুন ভাবনায় কাউকে দীক্ষিত করতে পারেনি। মহারাজ বিম্বিসার তার কথা মন দিয়ে শুনেছেন। পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন এমন কোনও লক্ষণ দেখাননি। তবে নতুন ভাবনার কাজ বাতাসে-ওড়া তুলোর বীজের মতো। উড়ে উড়ে বেড়াবে, তারপর পড়বে ভূমিতে কোথাও, ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় চলে যাবে মাটির গভীরে, তারপর অনেক রোদ, জল পান করে এক সময়ে অঙ্কুর মেলবে। লোকে নেবে কি নেবে না এই ভেবে চিন্তক কখনও তাঁর চিন্তাগুলিকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবেন না। থাকা উচিতও নয়।

এই আটবিকদের, যদি আর্যমানুষদের আচরিত সমাজবিধির মধ্যে নিয়ে আসা না যায়, তাহলে আর্যমানুষরা এদের কোনদিন স্বীকার করবে না। বিম্বিসার রাজার প্রতিক্রিয়া থেকেই তা বোঝা যায়। অথচ...এদের...এই বন্যদের কি পরিবর্তিত করা যাবে ? আদৌ ? এদের জীবনযাত্রার গভীরে না-ঢুকলেও যেটুকু সে জেনেছে তাতে মনে হয় এদেরও সমাজ-বিধি আছে নির্দিষ্ট। সেই বিধি এদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। এদের আছে যথেষ্ট আত্মাভিমানও। আর্যমানুষরা যেমন এদের অশুচি মনে করে এরাও তেমনি আর্যমানুষদের অশুচি-অস্পৃশ্য মনে করে। এদের নিজেদের মতো 'সু-সভ্য' করা কঠিন কাজ মনে করেই কি দীর্ঘ সময় ধরে এদের মেরে নিঃশেষ করে দেওয়া হচ্ছে ? এ কাজ কি সভ্যমানুষ সচেতনভাবে পরিকল্পনা করে করছে ? না, না-ভেবেই করে যাচ্ছে ? প্রথমে সমাজ ছিল শুধু বৈদিক। এখন বেদ-পন্থা অস্বীকার করেও তো বহু মানুষ চমৎকার জীবনধারণ করে আছে ? সুতরাং বেদ মানা না মানার ওপর এখন মোটেই সভ্যতার পরিমাপ নির্ভর করছে না। অথচ একটি সূত্র চাই। একটা কিছু সামান্য সূত্র যাতে এই বিশাল দেশের সব নরগোষ্ঠীকে এক ও আপন করতে পারে !

অথচ, জীবনে এখন এমন জটিলতার উদ্ভব হয়েছে যে চণক বেরোতে পারছে না। জিতসোমা যদি পুরুষ হতো অনায়াসে তাকে নিয়ে এই দুরূহ যাত্রাপথে সে বেরিয়ে পড়তে পারতো। কিন্তু সোমাকে ফেলে সে কোথায় যাবে ? কে জানে কী দুর্দৈব আবার নেমে আসবে ওই প্রিয় নারীর জীবনে, সে যদি তাকে একা এখানে রেখে যায় ! সোমার ভাবনাও তার জীবনের একটা মূল ভাবনা। সোমা তক্ষশিলার রাজপুরে চলে যাবার পর সে গভীরভাবে বিষণ্ণ, ক্রুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-ও বোধহয় একজন সুযোগসন্ধানী এবং কাপুরুষ। তার মধ্যে তেজের অভাব আছে। তা নয়ত সোমার এই রাজপুরী-যাত্রা সে মেনে নিল কেন ? কোনক্রমেই কি সে সোমাকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারতো না ? তার ভেতরের কাপুরুষটা দায়িত্ব নামিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল। হ্যাঁ, কর্কশ লাগলেও এটাই সত্য কথা। এখানে, রাজগৃহে মহামাত্র দর্ভসেন যখন সোমাকে দান করে দিলেন, তখন ? তখনও তো সে বিদ্রোহ করেনি ! শুধু কৌশলে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। না পেরে,আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। সোমার বুদ্ধিতে এবং ঘটনাচক্রে মহারাজ বিম্বিসারের বদান্যতার কারণে সোমা মুক্ত হয়েছে। এখন সে প্রতিদিন নতুন করে অনুভব করছে নিজের অক্ষমতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিষ্য দেখল অপরাহ্ণের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। ক্রমশ তা চণকের মুখের ওপর এক গাঢ় বিষণ্ণতার চক্র রচনা করল। তারা দুজনে বহুক্ষণ নীরবে বসে আছে। এই চণক তার কিশোর ও তরুণকালের আদর্শ। সে যখন নিজের সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে তৃপ্ত হতে না পেরে আলোচনাসভায় বিতর্কসভায় ঘুরে বেড়াত অস্থির হয়ে তখন চণককে দেখেছে। দেখেছে খুব সংযতভাবে বিতর্কে যোগ দিতে, মন দিয়ে আলোচনায় যোগ দিতে, আলোচনা করতে। প্রথম প্রথম অতিশয় দাম্ভিক বলে মনে হত। তক্ষশিলায় তার শেষ বছরগুলিতে তিষ্য বুঝেছিল চণক কোনও চিন্তায় ডুবে থাকেন, আচ্ছন্ন থাকেন, সেই সব দুরূহ চিন্তার জগতে তিনি নিঃসঙ্গ। তক্ষশিলায় সবাই চণককে সমীহ করত। অনেকেই বলতেন—'এ যুবক নিতান্ত অল্প বয়সে আচার্য হয়ে গেল। এটা ঠিক নয়। ও ধারাবহির্ভূত চিন্তা করছে।' কেউ কেউ সংশয়ী মুখে বলতেন—'ও বিদ্রোহী।' কিন্তু তারজন্য চণকের সম্মান কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। তিষ্য সে সময়ে স্বপ্ন দেখত সে চণকের সঙ্গে বসে নিজেদের একান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে, দেখত বসে আছে কোনও তরুমূলে সে ও চণক। কেমন করে সে স্বপ্ন সফল হল ? সম্ভব হল ? সে কি কখনও ভেবেছিল তক্ষশিলার বিদ্যা ও জ্ঞানের মণ্ডল ছেড়ে চণক এই ব্রাত্য মধ্যদেশে কোনদিন আসবেন ? তার নিজেরই দেশে প্রায় চণকের সঙ্গে তার পথের বাঁকে দেখা হয়ে যাবে ! যেন এ রূপ হয়েই থাকে। এ একটা সাধারণ ঘটনা ! সে কি ভেবেছিল প্রথম দেখায় নিজের প্রীতির কথা সে এইভাবে স্বচ্ছন্দে বলতে পারবে এবং চণক এইভাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন স্বীকার করে নেবেন ? এইরূপ অস্ত্র, আকাশ, ভূমি সাক্ষী রেখে।

এই সময়ে চণক মুখ ফিরিয়ে বলল, কী তিষ্য ? কী ভাবছো ? তার মুখে একটু অস্পষ্ট হাসি।

সত্যি কথা কি বলতে চণকই ভাবছিলেন, তিষ্য তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখে নীরব ছিল মাত্র। কিন্তু এখন সে সে-কথা উল্লেখ করল না। বলল সংসার ত্যাগী পরিব্রাজক ও সন্ন্যাসীর আধিক্যের একটা হেতুর কথা আমার মনে এসেছে ভদ্র।

—বলো, বলো। চণক উৎসাহিত হয়ে উঠল।

—আমাদের বৈদিক ভাবনাই তো সন্ন্যাসকে গুরুত্ব দিয়েছে। সন্ন্যাসকে মানুষের জীবনের শিখরে স্থান দিয়েছে। এই লোক নয়, লোকোত্তর কোনও সত্যই যে খোঁজা হচ্ছে এমন ইঙ্গিত কি বারবার আমরা যজ্ঞবিধির মধ্যেও পাই না ?

—অথচ এই যজ্ঞবিধি বা সংহিতার সূক্তগুলির ঋষি যাঁরা, তাঁরা তো পরিপূর্ণভাবেই গৃহী ছিলেন। চণক বলল এমন কি ব্রহ্মবাদের প্রবক্তা যাঁরা। যেমন রাজা প্রবাহণ বা চিত্র গার্গ্যায়ন এঁরা তো রাজা ছিলেন। একই সঙ্গে রাজত্ব করা, রাজৈশ্বর্য ভোগ করা এবং লোকোত্তর রহস্যের চিন্তা করা যে সম্ভব তা-ই তাঁরা দেখিয়েছেন। তবু এত সংসার-বিরাগী, কেন ?

তিষ্য বলল, তবে কি এই বিশাল সংখ্যার মানুষের সত্যিই সংসার ভালো না লাগবার কোনও কারণ ঘটে, চণক ভদ্র ? এঁরা কি সংসারে কষ্ট পেয়েছে ? প্রত্যেকে ?

চণক বলল, ঠিক এই কথা, অর্থাৎ সংসার দুঃখের, জীবন দুঃখময়, এই কথাই তো শ্রমণ গৌতম বলছেন।

—শ্রমণ গৌতম ? তিষ্য উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, ওঁকে আমি দেখেছি, যেদিন প্রথম রাজগৃহে এলাম। তর্ক করতে পারেন, ভালো। অন্যান্যদের নিজের মতে নিয়ে আসার ক্ষমতা অসাধারণ।

—কী করে জানলে ?

—আমার সামনেই তো কতকগুলি শ্রমণকে নিজের মতো আনলেন। তারা সব নিগণ্ঠ মত ত্যাগ করে বেলুবন নামক স্থানে চলে গেল।

চণক আশ্চর্য হয়ে বলল—তুমি দেখলে ?

—দেখলাম। শুনলাম।

—আমিও দেখেছি। শুনেছি। দেবতার মতো সৌম্যদর্শন। অসাধারণ বুদ্ধিমান ইনি। কিন্তু তিষ্য, আমি যতদূর শুনেছি ইনি বেদ তো মানেনই না। তুমি যেভাবে সংসার-বিরক্ত হওয়ার কথা বলছো ইনি সেভাবে হননি। ব্যক্তিগত জীবনে এঁর মতো সুখী কেউ ছিল না। ধনবান, ক্ষমতাশালী পিতা, মমতাময়ী মা, সুন্দরী পত্নী যিনি ছিলেন একেবারে সঙ্গীর মতো। একটি পুত্রও হয়, তারপরই

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইনি গৃহত্যাগ করেন। এখন নিজেকে সুখী বলেন, সুখী যে তা মুখভাবেই বোঝা যায়। এই সুখী অভিজাতপুত্র দুঃখবাদের কথা বলেন। নিবৃত্তি ও নির্বাণের কথা বলেন। অথচ তিষ্য, আমি চণক শৈশবে মাতৃহীন, যৌবনারম্ভে পিতৃহীন, সংসারে একা, এঁর মতো ধন-সম্পদ-বিলাসও আমার আয়ত্তে নেই, অথচ এই আমি পৃথিবীকে, জীবনকে আনন্দময় মনে করি। এতো আনন্দময় যে নির্বাণের কথা শুনলে আমার হৃৎ-কম্প হয়। তা ছাড়াও আমার মনে হয়, মনে হয়...জীবনকে সংসারকে আরও সুন্দর, সুশৃঙ্খল করাই আমার কাজ। শুধু আমার কেন, আমাদের সবার। তিষ্য, তুমি কি ব্যক্তিগত সুখের কথা ভাবো ?

তিষ্য এক ধরনের গৌরববোধে দৃপ্ত মুখে বলল, সে কথা ভাবলে গৃহত্যাগ করতাম না চণক ভদ্র। আমি ভাবি সুন্দর, সুষমাময়, সুবিচারশীল রাজ্যসৃষ্টির কথা।

—সত্য ? তাহলে তিষ্য, সেই রাজ্যের সুবিচার তুমি কেমন কল্পনা করো ? বলবে আমাকে ? সেই রাজ্যের সমাজ নিয়েও তুমি নিশ্চয় ভাবো !

—ভাবি বই কি ! সে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে, সব বৃত্তির লোক থাকবে। খাদ্য উৎপাদন, বস্ত্র উৎপাদন, যন্ত্র এবং তৈজসপত্র উৎপাদন, রথ প্রস্তুত। পথ সু-সমান এবং পরিষ্কার রাখা, পথ-ভয় দূর করা এ সমস্ত ব্যাপারেই সজাগ থাকবে সে রাজ্যের শাসনযন্ত্র।

—বিচারের কথা বলো।

—ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সুবিচার যাতে পায়, তার ব্যবস্থা থাকবে।

ধনী-দরিদ্র বলে যাদের নির্দেশিত করছো, তারা কারা, তিষ্য ?

—অর্থাৎ ?

—তারা কি আমাদের মতো মানুষ ? সবাই ?

—বুঝলাম না চণক ভদ্র।

—ধরো কৃষ্ণকায় মানুষ।

—তারাও তো প্রজা, তারাও সুবিচার পাবে।

—ধরো যারা বনে থাকে, তারা ?

—নিষাদদের কথা বলছেন ? নিষাদরাও অবশ্যই সুবিচার পাবে।

—নিষাদও নয়। যে-সব বন্যদের সঙ্গে আমাদের কোনও আদান-প্রদান নেই, তারা।

—ভদ্র আমি দক্ষিণে অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্বতের ওপারের আদর্শ রাজ্য স্থাপনের কথা চিন্তা করি। শুনেছি সেখানে গভীর অরণ্য। হিংস্র নরখাদক যক্ষ ইত্যাদিতে পূর্ণ সে-সব। এরাই সবচেয়ে বড় বাধা। কিন্তু এদের সবাইকে হত্যা করবার মতো সৈন্যবল আমি কোথায় পাবো। যথাসম্ভব এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নীতিই গ্রহণ করতে হবে।

—তাহলে এই বন্যদের তুমি মানুষ বলেই মনে করো ?

—মানুষই তো এরা। অশিক্ষিত, অসভ্য, কিছুটা হিংস্র এইমাত্র। আমরা শিশুকালে শুনতাম এদের মাথায় শিং আছে। দাঁতগুলি হাতির দাঁতের মতো বেঁকে বেঁকে বাইরে বেরিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সাকেতের গৃহেই দুটি বন্য দাস আছে। তারা মোটেই এ রূপ নয় ! শিশুকাল থেকে তাদের দেখছি। নিকটের বন থেকেই নাকি এক সময়ে তাদের ধরে আনা হয়েছিল। এখন তারা আমাদের অন্যান্য দাসেদের মতোই। কোনও প্রভেদ নেই।

চণক অবাক হয়ে শুনছিল। সে বলল, ধরো দক্ষিণে যেসব বন্য-মানুষের সংস্পর্শে তুমি আসবে তাদের সবাইকে তুমি দাস করে রাখবে ?

—চাইলেই কি তা পারবো চণক ভদ্র ? তাদের নিজেদের দেশে তারা আমাদের থেকে শক্তিশালী হবে। তা ছাড়া দেখুন, তাদের বুদ্ধিতে যদি সেবা ব্যতীত অন্য কোনও কাজ সম্ভব না হয়, তা তো তারা সেবক ছাড়া আর কী-বা হবে ?

—কিন্তু যে বনে তারা বাস করছে তুমি রাজ্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে সেখানে না-যাওয়া পর্যন্ত তারা স্বাধীন। তাদের কোনও বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে না তারা কোন কাজের যোগ্য। তিষ্য, ভালো করে ভেবে দেখো, তুমি তাদের কাছে অবাঞ্ছিত, উপদ্রব, তাদের শত্রু। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা হরণ করবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিষ্য বলল, আপনার কথা আমি বুঝলাম, আবার বুঝলাম না। অর্থাৎ চণকভদ্র, আপনার যুক্তি আমি স্বীকার করছি, কিন্তু... কিন্তু... রাজ্য জয় করবার অধিকার কে-ই বা কাকে দেয় ? যে মনে করে রাজ্য চাই, সে-ই রাজ্য জয় করে, তাই না ?

চণক বলল, তাই-ই। কিন্তু তুমি ন্যায়ের কথা বলছিলে, সুবিচারের কথা বলছিলে, তাই এ সব কথা আমার মনে হল। তিষ্য, একদিনে এই জটিল সমস্যার সমাধান হবে না। চলো আমরা এবার নামি।

—নামতে নামতে তিষ্য ম্লানমুখে বলল—আপনি দণ্ডনীতির ওপর শাস্ত্র লিখছেন। রাজা, রাজ্য স্থাপন, রাজ্য বিস্তার এ সব না থাকলে দণ্ডনীতির প্রয়োজন কী ভদ্র ? বন্যরা মানুষ, কিন্তু তারা বদ্ধ। তাদের যদি সে ভাবেই থাকতে দেওয়া হয় তো বিদ্যার অর্থ কী ? সমাজ-জীবনে তো কোনও গতি থাকবে না সে-ক্ষেত্রে !

চণক বলল, তুমি ঠিকই বলেছ তিষ্য। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা জটিল গ্রন্থি আছে বন্ধু। যেটি আমি মোচন করতে পারছি না, এবং তুমি বোধহয় দেখতে পাচ্ছো না। কোথায় থাকো তুমি ?

—অতিথিশালায়।

—চলো, সন্ধ্যা হল। আমার একটি গৃহ আছে। তিষ্য, তুমি অতিথিশালা ছেড়ে সেখানে থাকতে পারো।

তিষ্য বলল, পরে ও কথা হবে। আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে বলে দিন। আমার অতিথিশালাটি উত্তর সীমান্তে। জম্বু-বীথিকার পথে।

চণক আশ্চর্য হয়ে বলল, আমার গৃহের কাছেই তো থাকো তুমি। এত কাছে ছিলাম আমরা। সর্ব অর্থে। অথচ এত দূরে ! আশ্চর্য !

AMARBOI.COM

গৃধ্রকূটের সানুদেশ এখন নির্জন হয়ে এসেছে। পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে কিছু দরিদ্র পল্লী। নগরের দিকে যেতে হলে এ পল্লী চোখে পড়ে না। কিন্তু বাইরের দিকে যেতে গেলে, পাশ দিয়ে যেতে হয়। চণক যে সময়ে অটবীতে আশ্রয় নিয়েছিল, তখন অনেকবার দেখেছে। আজ দুজনে ঘোড়ায় উঠছে। সেই পল্লীর দিক থেকে কয়েকটি রমণী ছুটে এলো। একজন উৎকণ্ঠিতভাবে বলল—অজ্জ, অজ্জ আপনারা কি একটি বালক ও একটি বালিকাকে এদিকে আসতে দেখেছেন ?

—কই না তো ? চণক এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল।

রমণী দুটি কপালে করাঘাত করে কাঁদতে লাগল।

—কী হয়েছে ? বলো, আমরা সাধ্যমতো সাহায্য করব।

একটি রমণী বলল, এর মেয়ে আর আমার ছেলে বড় দুঃসাহসী। খেলতে খেলতে কখনো পাহাড়ে, কখনও বনের দিকে চলে যায়। বনে রাক্ষস আছে মানে না। পাহাড়েও শ্যেন পাখির উপদ্রব। এই গিজ্‌ঝকূট থেকে গতকালও ওদের সন্ধ্যার আগে ধরে নিয়ে গেছি। এদিকে যখন আসেনি, নিশ্চয় বনের দিকে গেছে। এখন কী হবে ?

চণক বলল, সর্বনাশ ! একটু পরেই তো প্রাকারের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। তোমরা একজন কেউ আমার ঘোড়ার পিঠে উঠে এসো। তিষ্য, তুমি পাহাড়ের দিকটা অনুসন্ধান করো তো।

রমণীটি ঘোড়ায় চড়তে ইতস্তত করতে লাগল।

—বিলম্ব করো না— অসহিষ্ণু স্বরে বলল চণক। হাত বাড়িয়ে রমণীটিকে উঠতে সাহায্য করলেন। বেশ বাস রুক্ষ ধরনের হলেও এর স্বাস্থ্য চমৎকার। চুলগুলি কোনমতে জড়িয়ে নিয়েছে। ঘোড়ায় চড়তে কোনও অসুবিধাই হল না। বলল, অজ্জ আমরা হাটে শাক বেচি। গাম থেকে নিয়ে আসে আমার পতি। আমার ছেলে বড় দস্যি। এক নিমেষও তাকে এক স্থানে বসিয়ে রাখা যায় না। সাত বছর বয়স। আমাদের প্রতিবেশীর মেয়েটিও অতি চঞ্চল। দুজনে মিলে এমন দস্যিপনা করে ! প্রহারও খায় ! কিন্তু শিক্ষা হয় না। দেখুন না, আমাদের পতিরা গামে গেছে শাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনতে, এসে যদি দেখে এই কাণ্ড !

চণকের ঘোড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাকার দ্বারে পৌঁছে গেল। রক্ষী জ্যেষ্ঠক তাঁকে চেনে। চণক বলল, এই রমণীটির পুত্র-কন্যা, দুটি সাত আট বছরের বালক-বালিকাকে তোমরা কেউ দেখেছ না কি ?

প্রতিদিন এই বিশাল দ্বার দিয়ে কত মানুষ আসা-যাওয়া করছে, রক্ষী জ্যেষ্ঠক কী করে বলতে পারবে ?

কিন্তু তার সহকারী একজন রক্ষী বলল, বালক-বালিকা বুঝিনি। দুটিই বালক। মাথায় চূড়া বাঁধা কী ?

রমণীটি সাগ্রহে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—চোখে কাজল ?

—হ্যাঁ, ওই তো...

—প্রহর কয় আগে দ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কোথায় যাও ? তা বললে—পিতা আছেন বাইরে। পিতার কাছে যাচ্ছি। এখনও ফেরেনি ?

রমণী কাঁদতে কাঁদতে বলল, কোথায় পিতা সে বালক জানবে কী করে। নিশ্চয় পথ হারিয়েছে।

চণক বলল, শীঘ্র চলো। দ্বার বন্ধ করতে একটু তো বিলম্ব আছে ?

—আর এক প্রহরের মতো। দেখে আসুন। রক্ষী বললো।

কিছুদূর এগিয়ে গেলেই একদিকে পথ চলে গেছে উরুবেলার দিকে। কিছুটা এগিয়ে এই পথ দুভাগ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় শাখাটি যাবে অঙ্গের দিকে। ডান দিকে আরম্ভ হচ্ছে অরণ্য। প্রথমে ছাড়া ছাড়া গাছ, গুল্ম, ক্রমেই ঘন হয়ে উঠবে। কিছুদূর উরুবেলার পথে যেতেই ওদিক থেকে কয়েক জন লোক মাথায় বোঝা নিয়ে আসছে দেখা গেল। রমণীটি ত্বরিতে ঘোড়া থেকে নেমে সেদিকে ছুটে যেতে যেতে বলল, ওই তো আমার পতি।

চণক দাঁড়িয়ে রইল। রমণী তার পতিকে সঙ্গে নিয়ে এলো। উৎকণ্ঠিতভাবে বলল, গামের দিকে ওরা যায়নি অজ্জ।

পুরুষটি বনের দিকে দৌড়তে লাগল, তার বোঝা ফেলে। চিৎকার করে ডাকছে, চুন্দ ! চুন্দ ! ঘোষা ! ঘোষা !

পেছনে পেছনে তার স্ত্রীও ছুটছে। প্রাণপণে ডাকছে ঘোষা ! ঘোষা ! ঘোষা ! চুন্দ ! চুন্দ !. বনভূমি তাদের উৎকণ্ঠিত ডাক যেন গিলে নিচ্ছে।

চণক ঘোড়া নিয়ে বনের মধ্যে খানিকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। মানুষ চলাচলের একটি ক্ষীণ পথ আছে। কিন্তু কোথাও সে কিছু চিহ্ন দেখতে পেল না। পরে ফিরে বলল, কিন্তু এই বনে তো হিংস্র পশু তেমন নেই ! আর সাত আট বছরের বালক-বালিকাকে শৃগালে টেনে নিয়ে যেতে পারে না।

—এই বনে যক্ষরা থাকে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে পুরুষটি বলল।

রমণীটি উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল।

নগরদ্বার থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। দ্বার এবার বন্ধ হয়ে যাবে তারই ইঙ্গিত।

চণক পর্ণের বোঝা সমেত রমণীটিকে তুলে নিল, পুরুষটি পেছনে ছুটতে ছুটতে আসছে।

দ্বারের কাছে পৌঁছে রমণীটি আর্তগলায় চেঁচিয়ে উঠল, দ্বার বন্ধ করো না প্রহরী। বালক-বালিকা দুটি যদি ফিরে আসে, ঢুকতে পাবে না !

প্রহরীরা কথা না-বলে ঘড় ঘড় শব্দে লোহার দরজা বন্ধ করতে লাগল। রমণীটি সেখানেই লুটিয়ে পড়ল—চুন্দ ! চুন্দ রে ! কোথায় গেলি বাপা !

দিনটি যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল, সেভাবে শেষ হল না। রমণীগুলির কান্নার শব্দ পেছনে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। কিন্তু হৃদয় থেকে মিলোল না। ওরা রাজসভায় বিচার প্রার্থনা করবে। এমন সুন্দর নগরী, এত বড় রাজ্যের রাজধানী সেখানে শিশু বা বালক হারিয়ে গেলে রাজ্যের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করার কোনও ব্যবস্থা নেই ? তিষ্য বলল, কী হয়েছে মনে হয় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চণক বলল, বুঝতে পারছি না তিষ্য। যদি অরণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে থাকে, তাহলে রাত হলে ভয়েই শিশুদুটি মরে যাবে। যথেষ্ট সংখ্যক রক্ষী বা রাজভট সঙ্গে নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অরণ্যে আমাদের প্রবেশ করা উচিত ছিল। রক্ষীগুলি তো বলল সন্ধ্যার পর স্বয়ং রাজা আদেশ করলেও দ্বার ওরা খুলতে পারে না। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

তিষ্য বলল, দেখছেন তো, শাসনযন্ত্রে কত প্রকার ত্রুটি থাকে ? যতক্ষণে সকাল হবে, রাজাদেশে রক্ষী ও রাজভটরা প্রস্তুত হবে, ততক্ষণে কি আর শিশু দুটি জীবিত থাকবে মনে করেন ?

কিছুদিনের মধ্যেই রাজগৃহের প্রান্তবর্তী পল্লীগুলিতে দারণ আতঙ্কের সৃষ্টি হল। শিশু চুরি যায়। আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রাত্রির অন্ধকারে কয়েকটি কালো কালো ছায়া দেখে কেউ। সে তাদের ভয়ের ছায়া না সত্য তা-ও বোঝা যায় না। অধিকাংশ শিশুই একেবারে শিশু। প্রাচীরের ও দিকের দরিদ্র, অন্ত্যজ পল্লীগুলিতে বাস করে। মহাভয়ে তারা রাত্রি জাগতে আরম্ভ করল। রক্ষীরা সতর্ক হল। রাজার কর্ণগোচর হল সংবাদ। জনশ্রুতি—নরমাংসাদ যক্ষ- যক্ষিণীর আবির্ভাব হয়েছে। যখের ভয়ে সন্ধ্যার পর নগরীর কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সব স্থান জনবর্জিত হয়ে আসতে লাগল। আরও তাড়াতাড়ি নগরের দ্বার গুলি বন্ধ করবার ব্যবস্থা হল। নগরের বাইরে কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা করা গেল না। রাজভটগুলি রাজার ভয়ে গিয়ে দাঁড়ায় বটে। তাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে সারারাত প্রহরা দেবার কথা। কিন্তু তারা চোর, দস্যু এদের ধরতে বা শাস্তি দিতে যথেষ্ট বীরত্ব দেখালেও অপ্রাকৃত প্রাণীর ভয়ে অন্ধকার হতেই গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে হানা দেয়।

দুমদাম আঘাতে ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে গৃহস্থ হয়ত মুখটি বার করল। রক্তবর্ণ বসন পরা, লাঠি, তলোয়ার ও ধনুর্বাণে সজ্জিত রাজভটটি বলবে, অনেকক্ষণ প্রহরা দিয়েছি। রাত হয়েছে একটু আশ্রয় দেবে ?

গৃহস্থ—এটা চণ্ডালপল্লী কিন্তু ভদ্দ। আমরা অশুচি।

—তাতে কী হল ? ঘরের একধারে বসে বসে রাতটা ঠিক কাটিয়ে দেবো।

—পাহারার কী হবে ?

—আরে চণ্ডাল, নিজেদের শিশুগুলিকে ঘরের ভেতর বেঁধে রাখো না। আমি দ্বারের কাছে বসে রইলাম। ভয় কী ?

চণ্ডাল হেসে বলবে, ভয়টিকে তো ধরতে হবে, ভদ্দ ? ধরার জন্যই তো আপনাদের নিয়োগ করা হয়েছে !

—উহু হু। প্রেত কি ধরা যায় ? হাত নেই, পা নেই, ধরবো কী করে ?

—হাত নেই তো আমাদের ঘরের বাচ্চগুলিকে ধরে কী করে ?

—নিশ্বাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় রে। নিশ্বাসের বাতাসে উড়িয়ে নেয়।

—তাহলে তো ঘরের মধ্যে থেকেও উড়িয়ে নিতে পারে।

—পারেই তো। তাই তো বলি শিশুগুলিকে বেঁধে-ছেঁদে রাখ। ওরে বাপা, উহুহুহু।

চণ্ডাল হেসে বলে, শ্মশানে মশানে ঘুরি। কখনও প্রেত দেখলাম না, ভদ্দ। মড়ার মাথার খুলির ভেতর দিয়ে হাওয়া বয়, মনে হয় প্রেতে চিৎকার করছে। শিবা, তরক্ষুর ডাক শুনে মানুষ ভয় পায়। পাগল, পাগলিনী শ্মশানে ঘোরে, অদ্ভুত তাদের বেশ বাস, অদ্ভুত কথাবার্তা, লোকে বলে প্রেত। আমরা জানি পাগল।

—তবে যে তোরা ভূত-প্রেতের কথা বলে ভয় দেখাস !

চণ্ডাল হেসে বলে, ভয় না দেখালে আমাদের শ্মশানের রাজ্যটুকুও তো আর নিজের থাকবে না। লোভী লোকগুলি আমাদের প্রাপ্যেও ভাগ বসাবে। সাক্কপুত্তীয় সমনরা তো এখনই শ্মশান থেকে বস্তর নিতে আরম্ভ করেছে। এর পর শয্যা, রুপা, তামা, সোনা যা পাওয়া যায় সেগুলিও নিতে থাকবে হয়ত।

এইভাবে গল্প করতে করতে রাজভটটি প্রাচীরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। গৃহস্থ ও তার স্ত্রী সারারাত শিশুগুলিকে পাহারা দিয়ে জেগে থাকে। সকালের আলো ফুটলে, ক্লান্ত রক্তিম চোখ নিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যার কাজে যায়।

কিন্তু, এরপর দিনে-দুপুরেও শিশু চুরি হতে লাগল। চোরেরা বনের দিকে থেকে আসে। বনে চলে যায়। শৃগালের মতো চতুরতার সঙ্গে কাজ সারে। রাজগৃহে আতঙ্ক, প্রান্তিক পল্লীগুলিতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। নরমাংসাদ যক্ষিণী। অনেকেই নাকি তাকে দেখেছে। কৃষ্ণকায়, বিকৃত দর্শন। সঙ্গে যক্ষ। উভয়েই অতি ভয়ানক। নিমেষের জন্য দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়।

রাজাদেশ হল—এই যক্ষ-দম্পতিকে ধরতে হবে—জীবিত বা মৃত। যে ধরবে সে পুরস্কার পাবে।

একদিন সকালে তিষ্যর অতিথিশালায় এসে চণক দেখল সে বুকে লৌহজালিকা আঁটছে। অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত।

—কোথায় যাচ্ছো, তিষ্য ?

তিষ্য হেসে বলল, যক্ষ ধরতে, চণক ভদ্র।

চণক বলল, একটু অপেক্ষা করো তিষ্য, আমিও যাবো।

চণক এতদিন কেন যায়নি ! ওই মহাবন, অন্তত তার কিছু অংশ তো তার পরিচিতই ! সেই পরিচয়ের ওপর নির্ভর করেই তো সে যক্ষের সন্ধানে যেতে পারতো ! কেন উদ্যোগ নেয়নি চণক ! সে কি নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে চায়নি ? না না। সে তো নিরস্ত্র ওই অরণ্যের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে এসেছে ? তবে ? কী জটিল রহস্য তোমার চরিত্রে, তোমার আচরণে হে উদীচ্য ব্রাহ্মণ ! যা কৃত্য কর্ম বলে মনে করো, যেসব বিষয়ে এতো গভীর চিন্তা করো, বিষণ্ণ হও, চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করে যাও লিপির এবং লেখনীর বহু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, কেন তার কোনটাই করতে উদ্যোগ নাও না ? তোমার কর্মোদ্যোগহীন, চিন্তক চরিত্র কি এইবার নির্দিষ্ট হয়ে যেতে আরম্ভ করল ? দেখো তো, তিষ্যকুমার, ক্ষত্রিয়যুবা কেমন দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পেরেছে ! কবচ আঁটছে এখন। তোমার মতো জ্ঞানী না-হলেও, সে-ও কিন্তু চিন্তা করে, সেই সঙ্গে কর্মোদ্যোগও তার চরিত্রে স্পষ্ট। সে যা ভাবে, তাই করে। একদিন তুমিই না এই রাজগৃহের পথে দাঁড়িয়ে এক মাগধকে বলেছিলে—তুমি আপাতত ব্রাহ্মণ কিন্তু বৃত্তির পরিবর্তনও হতে পারে। কী মনে ছিল তোমার চণক ? কী ভেবেছিলে ? কোন বৃত্তির কথা ? রাজা বিম্বিসার তোমাকে উচ্চপদ দিতে চেয়েছিলেন রাজসভায়। তা-ও তো তুমি নাওনি ? সে পদ মিললেও করার মতো কাজ অনেক করতে পারতে। তখন বলেছিলে তুমি মুক্ত থাকতে চাও। জম্বুদ্বীপ পরিক্রমা করে দেখবে কোথায় তার সীমা ! যাবে পূর্ব দিকে। আবিষ্কার করবার চেষ্টা করবে জনমনের সেই মূল সূত্রটি, যা জম্বুদ্বীপকে সংহত করবে। হায় গ্রন্থকার, চিন্তক, ভাবক, প্রজ্ঞাবান ব্রাহ্মণ আর কতদিন ! কত দিন এই দ্বিধা, এই দোলাচল চিত্ত নিয়ে তুমি কোন কর্তব্য সম্পাদন করবে ?

তিষ্য বলল, তাহলে কবচ পরে নিন ভদ্র। আমার কাছে দ্বিতীয় তো নেই। চলুন আপনার গৃহে যাই।

—কবচ প্রয়োজন হবে না তিষ্য। তুমি সশস্ত্র চলো। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। ভয় কী !

—কিন্তু বিষাক্ত তীর কোনওদিক থেকে যদি এসে বেঁধে ?

—মাথায় উষ্ণীষ পরে নিচ্ছি। এই উর্ণার উত্তরীয় যথেষ্ট স্থূল।

—চণক ভদ্র আপনার জীবন মূল্যবান। এভাবে আপনাকে বিপন্ন হতে দিতে আমি পারি না।

—শ্রমণরা তো বিনা অস্ত্রেই সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। কিছু তো হয় না !

—আপনি তো শ্রমণ নন !

তিষ্য কিছুতেই সম্মত না হওয়ায়, তার ভৃতক চণকের গৃহ থেকে কবচ ও ধনুর্বাণ এনে দিল।

বাহুবলে বলীয়ান ক্ষত্রিয়র পেছন পেছন চিন্তাবিদ ব্রাহ্মণ চলল অরণ্যের অন্ধকার জয়ের প্রথম অভিযানে।

তাদের জীবনে প্রথম হলেও, এ অভিযান সত্যিই প্রথম কী ? বিস্মৃত অতীতে যাননি কি এভাবে ইন্দ্র, এবং ত্বষ্টা ? পাণ্ডব এবং দ্রোণ ? অর্জুন এবং কৃষ্ণ ? সুদূর ভবিষ্যতেও এভাবে যাবেন না এঁরা ? বীরপুরুষ এবং ভাবুক পুরুষ ? কর্মী এবং তাত্ত্বিক ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি বলা যায় তিষ্যকুমার তো পুরোপুরি কর্মী ও বীর নয়। তার মধ্যে কর্মৈষণার সঙ্গে মিলে আছে প্রশ্নোপনিষদ। প্রশ্নের কাছে নিরন্তর গতায়াত। যদি বলা যায় দৈবরাত চণকও তো নয় শুধু তাত্ত্বিক। তার কর্মের পরিকল্পনা অস্পষ্ট ভাবজগৎ থেকে স্পষ্টই নেমে এসেছে ভূমি স্পর্শ মুদ্রায়, তাহলে বুঝতে হবে ভেতরে ভেতরে মাটি ভেঙে দিক পরিবর্তন করছে যুগজীবন, যুগমানস। কতটা পারছে, পেরেছিল তার চেয়েও বড় কথা—চাইছে। তারা চেয়েছিল।

২৬

গৌতম বুদ্ধ বললেন—শিশুদুটিকে আগে খেতে দাও।

—কী দেবো, ভগবান ? আমাদের তো কিছু সঞ্চয় নেই! —আনন্দ বললেন। তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারার মতো করুণা ঝরে পড়ছে। যেন কাষায়ধারী শ্রমণ নয়, পিতা। কিন্তু গৃহস্থ পিতার চোখে কি এমন করুণা ঝরে ? যেন শিশুদুটির সর্বাঙ্গ শুধু নয় তাদের অন্তর, তাদের বর্তমান, তাদের ভবিষ্যৎ—সবই তিনি অভিষিক্ত করে দিচ্ছেন।

শিশুদুটি জীবকের আম্রবনের গাছের ফাঁকে ফাঁকে খেলা করে বেড়াচ্ছে। কৃষ্ণবর্ণ দুটি ব্যাঘ্রশিশুর মতো। সুকুমার ত্বক দিয়ে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ফুটে বেরোচ্ছে। পায়ের ভাঁজগুলি, কী সুন্দর! অবোধ শিশু। নিজেদের পরিবেশে যে নেই সে কথা বুঝতে পারছে না। বা অস্পষ্টভাবে বুঝলেও তাদের কোনও ভাবান্তর নেই।

চণক বলল—আমরা যাচ্ছি। দুধ কিনে আনছি। যত তাড়াতাড়ি পারি আসব। কাননের প্রান্তে ঘোড়াদুটি বাঁধা ছিল। দু'জনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

তিষ্য কৌতুকে মুখ উজ্জ্বল করে বলল—শিশুদুটিকে নিয়ে কী করবেন শ্রমণ গৌতম ? ওদের ওপর কি ওঁর বিখ্যাত ইন্দ্রজাল খাটবে, চণকভদ্র ?

চণক হেসে বলল—দুধ না খেয়েই ওরা যেভাবে মল্লযুদ্ধ করে যাচ্ছে, তাতে শ্রমণ গৌতম এবং তাঁর ভিক্ষুরা খুব শীগগীরই রীতিমতো পর্যুদস্ত হয়ে পড়বেন মনে হচ্ছে। এরপর উদরপূর্তি হয়ে গেলে কী করবে কে জানে!

আজ চণক ও তিষ্যর বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে, বর্ম এঁটে দু'জনে বনপথে হারানো শিশু এবং জনশ্রুতির যক্ষযক্ষিণীর সন্ধানে বেরিয়েছিল। যে চণ্ডাল-পল্লী থেকে সবচেয়ে অধিক সংখ্যায় শিশু চুরি গেছে, সেই পল্লীর কাছের বনাঞ্চলে ঢোকে তারা। ঝোপঝাড়, লতা এ সব ভেঙে পড়ে থাকায়, তাদের মনে হয় এটি একটি যাতায়াতের পথ। খানিক দূর যাবার পর তারা আশ্চর্য হয়ে দ্যাখে শ্রমণ গৌতম তাদের আগে আগে চলেছেন। দু'জনে দুদিক থেকে গিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরে—ভদন্ত, কোথায় চলেছেন ?

মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। গৌতম বললেন—বৃথা শব্দ করো না। রাক্ষস ধরতে যাচ্ছি।

তিষ্য বলে—আমরাই তো সে জন্যে আছি। সংসার-ত্যাগী শ্রমণের কষ্ট করবার প্রয়োজন কী ?

—ত্যাগী কোথাও আবদ্ধ নয়, তার পক্ষেই ধরা সহজ আয়ুষ্মন।

তৃণগুল্ম এবং শুষ্ক পত্রাদির শব্দ হতে থাকে। সাবধানে উপানৎ হাতে ধরে দু'জনে শ্রমণের পেছন পেছন গিয়ে আবিষ্কার করে—একটি পরিষ্কৃত স্থান। মাটিতে অগভীর গর্তের মধ্যে নিভে-যাওয়া আগুন। কাছেই একটি অপরিচ্ছন্ন পর্ণকুটির। সামনে দুটি কৃষ্ণকায় উলঙ্গ শিশু খেলা করছে।

শ্রমণ গৌতম বললেন—সম্ভবত এখানেই রাক্ষসীর বাস। আয়ুষ্মন, কুটিরের মধ্যে এবং চারপাশে একটু দেখে এসো তো শিশুগুলির সন্ধান পাও কি-না।

তিষ্য চলে যায়। এই সময়ে চণক অগ্নিকুণ্ডটির কাছে এগিয়ে গিয়ে একটি বৃক্ষশাখা দিয়ে ভস্মস্তূপটি পরীক্ষা করতে করতে একটি শিশুর কনুই পর্যন্ত আধপোড়া হাত দেখতে পায়। সেদিকে শ্রমণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি সহসা বলেন—ওই শিশুদুটিকে তুলে নিয়ে এসো।

ততক্ষণে তিষ্য কুটির পরিক্রমা সেরে বেরিয়ে এসেছে। —'কই, কাউকেই তো দেখতে পেলাম

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তবে এইগুলি পেয়েছি।' সে পেতলের কয়েকটি ছোট ছোট বালা দেখাল। চণক নীরবে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কেই শিশু-হাতটির দিকে আঙুল দেখায়। তিষ্য শিউরে চোখ বুজে ফেলল। চণক শিশুদুটিকে দু'হাতে তুলে নিতে তারা প্রথমটা তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে। বড়টি তাকে কামড়েও দেয়। সেই সময়ে হঠাৎ শ্রমণ গৌতম এগিয়ে এসে দুই বাহুতে দুটি শিশুকে শক্ত করে কক্ষের কাছে চেপে ধরে, দ্রুত নগরীর দিকে ফিরে যেতে থাকেন।

সেই শিশুদুটিই এখন আম্রবনে নিশ্চিন্তে পরস্পরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছে। এবং চণক ও তিষ্য তাদের জন্য দুধের সন্ধানে গোপ-পল্লীর দিকে যাত্রা করেছে।

যথেষ্ট পরিমাণে দুধ এবং কিছু খেলনা কিনে আম্রবনে ফিরে এসে ওরা দেখল বড় শিশুটি শ্রমণ গৌতমের কোলে বসে তার বিস্মিত চোখ দিয়ে শ্রমণের মুখ নিরীক্ষণ করছে। কচি কচি আঙুল দিয়ে তাঁর কান টানছে। গালে হাত বুলোচ্ছে, চীবর নিয়ে টানাটানি করছে।

ওদিকে ছোটটি ঠোঁট ফুলিয়েছে। আনন্দ নামে শ্রমণ তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিতে সে আনন্দর একটি আঙুল মুখে পুরে চুষতে লাগল।

বর্ষার অন্তে অনেক ভিক্ষুই এদিক ওদিক ভিন্ন গ্রামে, জনপদে বেরিয়ে গেছেন প্রচার কর্মে। অল্প কয়েকজনই আছেন। তাঁদের মধ্যে অল্পবয়স্করা শিশুদুটির কাণ্ড দেখে হাসছেন। একজন প্রৌঢ় ভিক্ষু আরেকজনকে মৃদুস্বরে বললেন—রাহুল জন্মাবার পর শিশুর মায়া কাটাবার জন্যেই তো ভগবান আরও সত্বর গৃহত্যাগ করলেন। রাহুই বটে। তা এখন কী করবেন ? নিজপুত্রকে কখনও কোলে করেননি। এখন এই বন্যশিশুকে কেমন খেলা দিচ্ছেন দেখো !

অন্য ভিক্ষুটি বললেন—আমি দেখেছি, বেলুবনে একদিন ধ্যানভঙ্গ হবার পর উনি রাহুলের পরিবেণের কাছে বহুক্ষণ পদচারণা করতে থাকলেন। রাহুলের ঘুম ভাঙার সময় হলে যেন বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেলেন।

—দেশনা করবার সময়ে ওঁর চোখ যখন রাহুলের ওপর পড়ে, আমি দেখি যেন স্নেহ টলটল করছে ! ভগবান তীর্থিক কি আজীবিকদের মতো শুকনো সন্ন্যাসী তো নন !

—তা যদি বলো, রাহুলকে দেখলে আমার করুণা হয়। রাজার পুত, রাজার বংশ ধর ; ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই ভিক্ষাপাত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—শ্রমণ হয়ে এ কথা বলছো ?

—আমি তো শ্রমণ হয়েছি পরিণত বয়সে। পুত্রদুটি অকালে মারা গেল। পত্নী কেমন যেন শোকবিহ্বল হয়ে গেলেন। আমার মনে হল এই দুঃখই সত্য। এতদিন যা ভোগ করেছি সে সবই মায়া, মিথ্যা। একদিন ভগবানের দেশনা শুনতে বেলুবনে গিয়েছিলাম উভয়ে। ফিরে এসে দু'জনেই স্থির করলাম প্রব্রজ্যা নেবো। তা দেখো ধর্মশীল, সন্তানের অকালমৃত্যুর শোক কী আমি জানি। সন্তান-স্নেহ কী বস্তু তা-ও আমি ভুলিনি। কিন্তু রাহুল ওই বালকটি জন্ম থেকে পিতৃস্নেহ জানল না। মাতৃস্নেহই কি জেনেছে ? পাঁচ সাত বছরের শিশুকে যখন দেবী রাহুলমাতা পিতৃধন চাইবার জন্য ভগবানের কাছে পাঠালেন তিনি কি জানতেন না পার্থিব ধন বলতে কিছুই তাঁর কাছে নেই ? তিনি বুদ্ধিমতী নারী। চেয়েছিলেন পুত্রের দায়িত্ব পিতা নিক। সে যে-ভাবেই হোক। পিতৃহীন শিশু মায়ের স্নেহচ্ছায়ে বড় হতেও তো পেল না। রাহুল খেলা জানল না, বিচিত্র খাদ্যরস জানল না। পিতামাতার স্নেহ জানল না। দুঃখভোগের আগেই তাকে দুঃখনিরোধের কঠিন পথে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। উপরন্তু, রাহুল বন্ধনস্বরূপ এইরূপ নাম দিয়ে তাকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করা হল।

—আপনি কি ভগবানকে নিন্দা করছেন ভিক্ষু ধর্মরক্ষিত ?

—নিন্দা করি না। বুঝতে পারি না তাঁর সব কিছু এটাই বলেছি। আর রাহুলের প্রতি করুণা প্রকাশ করেছি।

—ওকে দেখলে কি আপনার মৃত পুত্রদের কথা মনে হয় ?

—হয় ধর্মশীল, হয়। বলতে বলতে ভিক্ষু দ্রুত স্থান-ত্যাগ করলেন।

চণক অদূরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষুদের আলোচনা শুনছিল। তিষ্য একটি শ্রমণের সঙ্গে শুকনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাল-পাতা জ্বালিয়ে দুধ গরম করছে। দেখতে দেখতে, এবং শ্রমণদের কথা শুনতে শুনতে কেন কে জানে তার শ্রীমতীর কথা মনে পড়তে লাগল। শ্রীমতী তাকে সযত্নে খাওয়াচ্ছে। ব্যজন করছে। শ্রীমতী তার হাতে জল দিল। ওই শ্রীমতী তার বীণা নিয়ে তাকে, একমাত্র তাকেই গান শোনাবার জন্য বসেছে। এতো ধীর, এতো নম্র, করুণ! সে বহুদিন শ্রীমতীর কাছে যায়নি, তার সংবাদ রাখে না। অথচ এক গভীর আত্মিক সঙ্কটে শ্রীমতীই তাকে সঙ্গ দিয়েছিল। সে তার কাছে প্রার্থী হয়ে গিয়েছিল। আত্মসমর্পণ করেছিল। শ্রীমতী তাকে পুরোপুরি সাহায্য করেছে। সে কিছু দেয়নি ওই নারীকে। গৃহস্থ, বিবাহিত পুরুষের মতো গন্ধ, মাল্যবস্ত্র ইত্যাদি কিনে নিয়ে গিয়েছিল একদিন। অভিমান ভরে শ্রীমতী বলেছিল—'মূল্য দিচ্ছেন নাকি?' চণক কিন্তু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেননি—এ ঠিক মূল্য দেওয়া নয়। তার হৃদয়ের প্রীতিরই প্রকাশ এ। সে শুধু ক্ষান্ত হয়েছিল। আর ওইসব বস্তু কেনেনি। সহসা তার জিতসোমার কথাও মনে হল। জিতসোমা আর সাজ-সজ্জা করে না। অতি সাধারণ রমণীর মতো বেশ করে। শ্রদ্ধাভরে চণকের রাজশাস্ত্রর প্রতিলিপি করছে সে। চোখের সামনে সে যেন দেখতে পেল জিতসোমা হাতে পালকের লেখনী নিয়ে লিখতে লিখতে মুখ তুলে তাকাল। কেমন বিষণ্ণ দৃষ্টি। কী ভবিষ্যৎ জিতসোমার? চণক অস্পষ্টভাবে চিন্তা করে কিন্তু জিতসোমার প্রতিই কি তার কর্তব্য পালন করতে পারছে সে?

শিশুদুটি দুধ খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়ল। মাটির পাত্র দুহাতে ধরে ঢকঢক করে খেয়ে নিল। তারপর চোখ বুজে আসতে লাগল তাদের। বুদ্ধ বললেন—আনন্দ, ওদের ভিক্ষুণীদের উপাশ্রয়ে দিয়ে এসো। বলবে, ওদের পালন করতে, যতদিন না আবার চাই।

আনন্দ বললেন—যাই, ভগবান।

আনন্দ একজনকে কোলে নিলেন, আরেকজন ভিক্ষু বড়টিকে নিলেন।

মধ্যাহ্ন পার হয়ে যাচ্ছে। দু'জনে গৃহের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তিষ্যকে আজও নিজের গৃহে আপ্যায়ন করতে পারেনি চণক। যবে থেকে সে বুঝতে পেরেছে চণকের গৃহে একজন রমণী থাকেন, সে কোন মতেই কোনও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে চায় না। থাকা তো দূরের কথা।

প্রধান পথ রাজগৃহে মাত্রই দুটি। কতগুলি উপপথ দক্ষিণে এবং বামে চলে গেছে শাখা-প্রশাখার মতো। বৈভার গিরির কোল ঘেঁষে চণকের গৃহে যাবার পথটি। দু'ধারে সমান ব্যবধানে ছায়াতরু। ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের ঢাল দেখা যায়। দক্ষিণের পথটি ক্রমে রাজপুরীর প্রাচীরে পৌঁছেছে। বামের পথটি ধরে যেতে যেতে ক্রমশই জামগাছ বাড়তে থাকে। মহীরুহ সব। তারপর উত্তর প্রান্তে গিয়ে বাঁদিকে আরও একটি বাঁক নিলে শুধুই জামগাছ। পথটি এমন ছায়াময় হয়ে থাকে যে মধ্যাহ্ন-সূর্যও যেন একে তপ্ত করতে পারে না। এখন বর্ষা চলে গেছে। হিমঋতু এলো বলে। এ পথ দিয়ে যাতায়াতের সময়ে উত্তরীয়টি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। চণক এবং তিষ্যর এখনও বর্ম পরা রয়েছে। যোদ্ধবেশ। এই বেশও নগরীর মধ্যে অতি সুলভ নয়। সেনারা বাস করে নগর থেকে অদূরে সেনানীগ্রামে। নগরের মধ্যে অল্পস্বল্প অস্ত্রধারী যাদের দেখা যায় তারা হল রাজভট এবং রক্ষী। রক্ষীদের আগার রয়েছে নগরের উত্তর ও দক্ষিণ প্রাকারের দ্বারের কাছে। রাজপুরীতেও অবশ্য আছে তারা যথেষ্ট সংখ্যায়।

পথে লোক অল্প। যারা চলছে, কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে দুই অশ্বারোহীকে দেখছে। হয়ত রক্ষী ভাবছে। বিশেষত তারা চলেছে উত্তর সীমান্তের দিকে। তিষ্য তার অতিথিশালার দিকে বেঁকে যাবার সময়ে বলে গেল অপরাহ্ণে সে জীবকাম্রবনে যাচ্ছে। চণক বলল—সে-ও যাবে।

কাননে ঢোকবার পর তার দাসেদের হাতে অশ্বটি দিয়ে চণক গৃহের দিকে চলল। মুক্ত বাতায়নপথে দেখা যাচ্ছে জিতসোমা রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের শব্দ শুনে ফিরে দাঁড়াল। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চণক দেখছে—না জিতসোমা হাসছে। সে দ্বার দিয়ে ঢুকে দাঁড়াতে এগিয়ে এসে তার বর্ম খুলতে খুলতে বলল—কী? যক্ষ-রক্ষ ধরতে পারলেন?

চণক হেসে বলল—আমরা ধরিনি, তবে শ্রমণ গৌতম ধরেছেন মনে হচ্ছে? সোমা অবাক হয়ে বলল—শ্রমণ গৌতম? যক্ষ ধরেছেন? ইন্দ্রজাল জানেন, না কী?

চণক বলল—কিছুই বুঝতে পারছি না। যক্ষিণীর শিশুপুত্রদুটিকে ধরে নিয়ে এসেছেন। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্যাখো, একটি শিশু আমাকে কীভাবে কামড়ে দিয়েছে !

সোমা শিউরে উঠে হাতটি পরীক্ষা করতে করতে বলল—'সর্বনাশ ! যক্ষের শিশু ! দাঁতে যদি বিষ থাকে !

চণক বলল—ভয় নেই গাছের পাতার নির্য্যাস দিয়ে ভিক্ষুরা মনোরম চিকিৎসা করেছেন। আর শিশুটি, যক্ষের ঘরের হলে হবে কি, অবিকল আমাদের ঘরের শিশুদের মতো দেখতে। শুধু অমাবস্যার আকাশের মতো ধূম্রবর্ণ। তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতগুলিও অবিকল মানব-শিশুর দাঁতের মতো। দুধও খায়। যদিও আমাকে কামড়ে দিয়েছে, তবু রক্তপিপাসু বলে ঠিক মনে হল না। আজ অপরাহ্ণে যাবো। দেখি শ্রমণ গৌতমের কী পরিকল্পনা।

সোমা তার উষ্ণীষটি নিতে নিতে বলল—'শ্রমণ গৌতম কেমন ?'

—তোমার-আমারই মতো। আবার স্বতন্ত্র। সোমা শ্রমণ গৌতম অদ্ভুত মানুষ। এই দেখবে আকাশের চাঁদ, আবার পরক্ষণেই দেখবে পথের পাশে তোমার প্রতিদিনের দেখা তরু। তোমার দেখতে ইচ্ছা হয় ?

—আগে হয়নি। আজ হচ্ছে। অপরাহ্ণে আপনার সঙ্গে যাবো।

চণক সাগ্রহে সম্মত হল। এই প্রথম সোমা বাইরে যেতে চাইল। কোনও বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করল।

এতদিনে এখানে এসেছে, কিন্তু সোমা রাজগৃহ চেনে না। এক অন্তঃপুর থেকে আরেক অন্তঃপুরে যাতায়াত করেছে শুধু। তক্ষশিলার পথ-ঘাট তবু চেনা ছিল। নিজস্ব যান তো ছিলই। পায়ে হেঁটে চলাফেরাও সম্ভব ছিল। রাজগৃহে সে বিদেশিনী। তাকে দেখলেই বিদেশিনী বলে চেনা যায়। এখানে সে বড় বেশি অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

অপরাহ্ণে সে দেখল দ্বারের কাছে একটি চারঘোড়ার রথ এসে থামল। চণক বলবামাত্র দাসেরা গিয়ে রাজপুরী থেকে রথ নিয়ে এসেছে। অতঃপর এই রথটি তাদের কাননেই থাকবে—রাজ-অশ্বশালার প্রধান বলে পাঠিয়েছেন।

আজ সোমা প্রথম এ নগরের পথঘাট দেখল। নিজেদের কাননে সে অবসর সময়ে ঘুরে বেড়ায়। তখন দেখে দূরের পাহাড়। কিন্তু সারাপথই যে এইভাবে পাহাড় সঙ্গে সঙ্গে যাবে সে জানত না। চণক তাকে দেখায়—'ওই যে দূরে যে পাহাড় দেখছ। ওর ওপরে আছে তপোদারাম। পাহাড়ের অভ্যন্তর থেকে তপ্ত বারি বেরিয়ে আসছে। সর্বরোগহর।'

সোমা আশ্চর্য হয়ে বলল—'এই নগরীর ওপর দেখি দেবতাদের অশেষ কৃপা ! মহারাজ বিম্বিসার মহাত্মা বলেই কি অগ্নিদেব, বরুণদেব এভাবে তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। আর্য ?

চণক হেসে বলল—'মহারাজ বিম্বিসারকে দেবতারা তপোদারামগুলি দেননি। এগুলি এবং অন্যান্য নানা সুবিধাগুলি আছে বলেই, চতুর রাজাটি এইখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছেন।

—কিন্তু এতো শ্রমণ ! সন্ন্যাসী ! দেখুন দেখুন !

পাহাড়ের দিকে দু'জন শ্রমণ চলে যাচ্ছেন সোমা দেখাল। তারপর বলল—আমি কানন থেকেও দেখি, আর্য। বহু শ্রমণ বাস করেন এখানে। এ-ও তো মহারাজের একটা পুণ্যফল !

—পাহাড়গুলি দেখেছ সোমা ? শ্রমণ ও সন্ন্যাসীরা পাহাড়ে থাকতে ভালোবাসেন। তাই ওঁরা এতো অধিক সংখ্যায় আছেন এখানে। মহারাজও সব মত সব পথের সন্তদের সমাদর করেন। এদিকে শ্রমণ গৌতমকে তথাগত বুদ্ধ বলে প্রণাম করছেন, ওদিকে আবার নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্রকে জিন বলে সমাদর করছেন। অজিত কেশকম্বলীর নাম শুনেছ ?

—কই না তো।

—উনি একজন অদ্ভুত শ্রমণ। সর্বাঙ্গে ভল্লুকের মতো রোম। নাস্তিক। কোনও দেবতায় বিশ্বাস করেন না। মনে করেন মৃত্যুর পর জীব চার মহাভূতে মিশে যায়, পুনর্জন্ম নেই। যতদিন জীবিত আছো, সৎভাবে সুখে বাঁচো।

—আশ্চর্য তো ! আর্য চণক, এরূপ কি সম্ভব ?

—কী সম্ভব সোমা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এই...দেবতা নেই। ব্রহ্মা প্রজাপতি নেই। মৃত্যুর পর দেহ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, এ-ও কি সম্ভব ?

—দেবতারা আছেন কি না, প্রজাপতি আছেন কি না, কোনও মানুষ মৃত্যুর পর আবারও কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে কি না তা-ও তো আমরা দেখিনি, জানি না সোমা। কোনও প্রমাণ নেই। কোথাও কেউ বলেছে সে ইন্দ্রকে দেখেছে ? অগ্নির শিখার মধ্য থেকে কোনও দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে ?

—তাহলে যজ্ঞে যে আমরা হবিঃ দান করি, সে কাকে, আর্য ? পশুমাংস, যবের পুরো ডাশ আহুতি দিই, সে কি কোথাওই পৌঁছয় না ?

—এঁরা বলছেন এইসব যাগযজ্ঞ, তিনবেদ, অগ্নিহোত্র, কিম্বা ত্রিদণ্ডধারণ, ভস্ম মাখা এগুলি সব পৌরুষ ও বুদ্ধিহীন মানুষের জীবিকা-অর্জনের উপায় মাত্র।

—কী আছে তাহলে ? কোন আচরণই বা ঠিক আর্য !

—এখনও জানি না সোমা। তবে এতদিন যা পালন করে আসছি, বিশ্বাস করে আসছি তার ভেতর কোথাও একটা বিরাট ভুল বোঝা আছে যা এই মধ্যদেশের শ্রমণরা নাকি ধরতে পেরেছেন। আজ যে শ্রমণ গৌতমের কাছে যাচ্ছি, উনিও যাগযজ্ঞ মানেন না। তোমার যদি আগ্রহ থাকে, আজ যদি ওঁর কথা ভালো লাগে, তাহলে আমরা মাঝেমাঝেই ওঁর কাছে যেতে পারি।

সোমা বলল—মহারাজ বিম্বিসার জটাজুটধারী বেদবিৎ সন্ন্যাসীদেরও পূজা করেন কিন্তু। একইসঙ্গে বিপরীত মতবাদে বিশ্বাস করা যায় ?

চণক হেসে বলল—মহারাজের সঙ্গে দেখা হলে, এরপর কথাটা তুমি নিজেই জিজ্ঞেস করো। তবে আমার মনে হয় রাজা-মহারাজাদের ক্ষেত্রে বিশ্বাসটাই বড় কথা নয়। নানা মতের চিন্তকদের সমর্থন পাওয়ার জন্যই এঁরা এরূপ করে থাকেন। এটা ধর্ম নয় সোমা, রাজনীতি। তুমি যে পুঁথির প্রতিলিপি করো সেখানে এ কথা পাবে। পিতা স্বয়ং লিখে গেছেন।

AMARBOI.COM

সোমা বলল—তাহলে আপনারা এতো চিন্তা করে যা স্থির করলেন, মহারাজ বিম্বিসার সহজাত বোধেই তা বুঝে গেলেন ? ইনি তো সাধারণ রাজা নন !

চণক বলল—ইনি কোনমতেই সাধারণ রাজা নন। এ কথা একশবার সত্য। তবে ভুলো না, রাজনীতির পাঠ ইনি নেন আচার্য দেবদত্তের কাছে।

—আর্য চণক, রাজশাস্ত্রে আপনি যে একরাট্ এর কথা বলেছেন, চক্রবর্তীর কথা বলেছেন, এই রাজা তা হতে পারেন না ?

—ক্ষমতা আছে, অভিরুচি নেই বোধহয় সোমা।

—তাহলে সমগ্র জম্বুদ্বীপ জুড়ে এক চক্রবর্তীর রাজ্য যা আপনারা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন, তা কীভাবে সম্ভব হবে ?

—অহিংসার পন্থ যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে, তাতে ব্যাপারটা ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মৌলিক বেদপন্থা আমাদের বীরপুরুষ হতে বাধা দেয়নি। এই শ্রমণদের উপদেশ লোকে গ্রহণ করতে থাকলে কয়েক পুরুষের মধ্যেই আমরা নির্বীর্য অস্ত্রভীরু হয়ে যাবো। রক্ত দেখলে মূর্ছা যাবো। —চণকের মুখ ক্রমশ গম্ভীর, চিন্তাকুল হয়ে উঠতে লাগল। —সে কিছুক্ষণ পরে বলল—কিন্তু এ-ও সত্যি যে বেদের কর্মকাণ্ড এখন এতো বিশদ হয়ে গেছে, সাধারণজনের জীবন থেকে এতো সরে গেছে যে বহু সৎ চিন্তাশীল মানুষের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। বেদের মন্দর সঙ্গে বেদের ভালোও এঁরা অস্বীকার করতে চাইছেন ?

—কিন্তু বেদ তো অপৌরুষেয় আর্য। তাকে অস্বীকার করতে চাইছেন ?

—বেদ অপৌরুষেয় কী অর্থে সোমা ? আমি অনেক ভেবেছি। বেদ যে ধ্রুব নয়, সে কথা কিন্তু প্রতিদিন প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, প্রমাণ করে দিচ্ছেন শ্রমণ গৌতম, যাদের দেবতা বলা হয়েছিল তারা যে প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তি এ বিষয়ে অনেকেই এখন নিঃসংশয়। তারপরে দেখো, বেদ ঋষিদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন এই কথাটি ধরেই আমি বলতে পারি আমার পরিচিত এক কবি বোধিকুমারের বর্ষা-শ্লোকও তাঁর কাছে স্বপ্রকাশ হয়েছিল। এই কবি আমাকে বললেন তিনি আম্রকুঞ্জে বসেছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন সময়ে বৃষ্টি এলো। বৃষ্টি দেখতে দেখতে শ্লোকগুলি পরপর তাঁর সামনে যেন উদ্‌ভাসিত হল। সোমা এই শ্লোকসমূহকেও তাহলে অপৌরুষেয় বলো। ঋষি বামদেব তো এই অভিজ্ঞতার কথাই বলছেন, মনে পড়ছে ?

সোমা বলল—"এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ
শতব্রজা রিপুণা নাবচক্ষে।
ঘৃতস্য ধারা অভি চাকশীমি
হিরণ্যয়ো বেতসো মধ্যে আসাম্..."

—'তবে ?' চণকের চোখদুটি হর্ষে জ্বলছে। সে বলল—এই যে শতধারায় উজ্জ্বল রসের ধারা হৃৎ-সমুদ্র থেকে বইছে, যার মধ্যে ঋষি সোনার বেতসের মতো দুলছেন—এ কি বোধিকুমারের মতো কোনও কবির অভিজ্ঞতা নয় ? আবার দেখো ঋষির নিজেরও যে কিছু কর্তৃত্ব আছে ঋক্‌রচনায় তারও নির্ভুল প্রমাণ রয়েছে তক্ষ ধাতুর ব্যবহারে। অগ্নির উদ্দেশে ঋভুরা বাণীতক্ষণ করছেন, ইন্দ্রর জন্য মন্ত্রতক্ষণ করছেন নোধা গৌতম। অর্থাৎ সবটাই স্বতোৎসারিত নয়। সযত্নে কেটে-ছেঁটে মসৃণ করে তবে মন্ত্র নির্মাণ হচ্ছে।

—তাহলে ? আপনি কী বলতে চান ? বেদ-বিদ্যাকে আমরা ত্যাগ করবো ?

তা কেন সোমা। এতৎ সত্ত্বেও বেদ কিন্তু এক মৌলিক, বিশ্বজনীন চিন্তার অবয়ব নির্মাণ করে দিয়েছেন। যত বিচিত্র পথেই তোমার চিন্তা যাক না, তার সঙ্গে বেদের সম্পর্ক রয়েই যায়। বৈদিক চিন্তাই নানান নতুন মতের জন্ম দিচ্ছে ঠিক যেমন এক সিন্ধু পাঁচ নদীর জন্ম দিয়েছিল। যেমন এক গঙ্গা থেকে শত শাখানদী কত দিকে চলে যাচ্ছে।

—কিন্তু এই নাস্তিক্যবাদ ?

—নাস্তিকরা যে চতুর্মহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর কথা বলেছেন, সে চারটি তত্ত্ব তো বেদেই রয়েছে। ধরো আমি যদি বলি, যাকে এঁরা বস্তু বলে উপস্থিত করছেন, বেদের ঋষি তাকেই দেবতা বলে স্তুতি করেছেন, মানুষের জীবনে তার অশেষ প্রভাবের কথা স্মরণ করে ?

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেদ তো দেবলোক, অমৃতলোকে বিশ্বাস করেন।

—সোমা, তুমি ব্রহ্মবাদের কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। জৈবলি প্রবাহণ থেকে বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য পর্যন্ত সবাই ব্রহ্মের কথা বলছেন।

—শুনেছি। আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

—ঋক্ সংহিতার দশম মণ্ডলে নাসদীয় সূক্ত ব্যাখ্যা করেছিলাম। মনে আছে সোমা ?

নাসদাসীন্ নো সদাসীত্ তদানীং নাসীদ্ রজো নো ব্যোমা পরো যৎ
কীমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্ অম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্... ?

তখন অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না, কোনও লোক ছিল না, সব লোকের পারে যে ব্যোম তা-ও ছিল না। কে কাকে আবৃত করবে ? কার আশ্রয়ে ? গহন গভীর যে সলিল, তা-ও তো ছিল না।

সোমা বলল—মৃত্যু ছিল না। অমৃত ছিল না। দিনরাত্রির কোনও চিহ্ন ছিল না। আপন শক্তিতে নির্বায়ু অবস্থাতেও নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন সেই একম্।

চণক স্মিত মুখে বলল—এই তো, তোমার স্মরণে আছে। দেখো, এই যে নেই, আবার প্রাণন কার্য করছে, এই ধরাছোঁয়ার বাইরে বিশ্বের আদি প্রাণ—এর থেকে যেমন ব্রহ্মবাদ, তেমন নাস্তিক্যবাদও এসেছে বলে আমার মনে হয়। এই অজ্ঞেয়তার মধ্যে, জীবনের মূল কোথায় এই প্রশ্ন করতে জীবনের পরিণতি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা জাগে। নাস্তিকরা এই অজ্ঞেয়তাবাদের মধ্য থেকে সংশয়টুকু তুলে নিয়েছেন। তাকেই পুষ্ট করেছেন। এখন বলছেন প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোনও প্রমাণ মানব না। শ্রমণ গৌতম কিন্তু পুনর্জন্ম মানেন। তিনি কী বলতে চান দেখা যাক।

জীবকাম্রবনে আজ শ্রোতার সংখ্যা অন্যান্য দিনের মতো নয়। অন্য দিন ভরা দিঘির মতো লাগে শ্রমণ গৌতমের দেশনাস্থল। চণক ইতস্তত দৃষ্টিপাত করে দেখল কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। যেমন রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী অহিপারক, রক্ষী-জেষ্ঠক, কয়েকজন পরিচিত রাজপুরুষ, ভিক্ষুরা এবং ভিক্ষুণীরা। শ্রেষ্ঠীদের গৃহ থেকে রমণীরাও এসেছেন। জিতসোমা তাঁদের কাছে গিয়ে বসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষার অন্তে বুদ্ধ পরিব্রজন করেন। করেন অন্যান্য ভিক্ষুরাও। ভিক্ষুণীদের মধ্যে যাঁরা ইচ্ছা করেন, তাঁরাও যান। রাজগৃহের বুদ্ধভক্ত সাধারণজন অনেকেই জানে না বুদ্ধ এখন ঠিক কোথায়। চণকের পাশে বসা এক বর্ষীয়ান কুলপুত্র পাশের জনকে জিজ্ঞেস করলেন—ভগবান আর কতদিন রাজগৃহে থাকবেন, জানো না কি? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন—উনি তো ঠিক রাজগৃহে নেই। সেনানীগ্রাম ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলেন। কোনও কারণে আবার এসেছেন। হয়ত কালই দেখবেন, চলে গেছেন।

তিষ্য এসে চণকের পাশে বসল। চণক দেখল মহারাজ বিম্বিসার আসছেন। নিজস্ব কুটি থেকে শ্রমণ গৌতম বেরোলেন। সংঘাটিতে ভালোভাবে সারা দেহ আচ্ছাদিত। পেছনে পেছনে আনন্দ আসছেন। সকালে দেখা সেই শ্রমণ দুটিকেও বসে থাকতে দেখল সে।

তিষ্য মৃদুস্বরে বলল—আনন্দ নামে ওই শ্রমণটির কথা কিছু জানেন?

—উনি শ্রমণ গৌতমের কেমন ভাই হন।

—তাই এত মিল! অর্থাৎ ইনিও শাক্য! শাক্যদের কী দুর্দিন চণকভদ্র! একেই তো ওরা কোশলের পদানত হয়ে গেছে। তার ওপর এঁদের মতো সক্ষম, প্রতিভাবান পুরুষরা সব সংসার ত্যাগ করলেন।

—শুধু ইনি নন তিষ্য, চণক বলল, শাক্যদের আরও রাজকুমাররা নন্দ, অনিরুদ্ধ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল এঁরা, শ্রমণবুদ্ধের মা, পত্নী পুত্র, বহু শাক্যরমণী সংঘে প্রবেশ করেছেন।

তিষ্য বলল—শ্রমণ গৌতমের মা ও পত্নী, কিংবা শাক্যরমণীদের প্রব্রজ্যা নেওয়া বুঝতে পারি। কিন্তু যুবক রাজকুমাররা কেউ স্বদেশ স্বজাতির প্রতি তাঁদের কর্তব্যের কথা ভাবলেন না? একেই তো স্বাধীনতা হারিয়েছেন।

—হয়ত সেটাই কারণ তিষ্য। দীর্ঘদিন ধরে পরসেবী থাকতে থাকতে একটা জাতির মধ্যে গভীর আত্মগ্লানি জমা হতে পারে, আত্মগ্লানি থেকেই দুঃখবাদ, ঔদাস্য, সংসার-বিরাগ।

—কিন্তু চণকভদ্র, হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও তো এঁরা করতে পারতেন!

—তার আগে বলো, বিজিত জাতি রূপে কোশলের কাছে এঁরা কী ব্যবহার পান?

তা যদি বলেন, কোশলরাজ এঁদের যথেষ্ট সম্মান করেন। কপিলবস্তু এবং সন্নিহিত অঞ্চলে রোহিণী নদীর ওপারে শাক্যরা নিজেদের মতো থাকেন। কুলগৌরব অত্যন্ত বেশি। অহঙ্কারী বলা যায় এঁদের। কেননা, অন্যান্য বিজিত জাতির মতো এঁরা শ্রাবস্তীর রাজসভায় কোনও কাজ নেননি এসে। বন্ধুল, কোশলের সেনাপতি মল্ল জাতীয়। বজ্জি ও শাক্যদের মতো মল্লদেরও এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। কিন্তু এখন সে সব ভেঙে গেছে খুব সম্ভব অন্তর্কলহের ফলে। পাবা আর কুশীনারায় ওঁদের দুটি শাখা রয়েছে কোনওক্রমে টিকে। বন্ধুল বলেন, বদ্ধ জলের মতো সে-সব মল্লরাজ্য। তিনি তো কোশলরাজ্যের কাছে কাজ নিয়েছেন। সৈনাপত্য করেন বলে তবু খানিকটা সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও সন্তোষ পেয়েছেন।

সামনের পঙ্ক্তিতে বসা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে বললেন—কী তখন থেকে বকবক করছেন? দেখছেন না ভগবান তথাগত সভায় এসে গেছেন।

তিষ্য আরক্ত মুখে নীরব হয়ে গেল। তার কপালে ভ্রূকুটি।

ওদিকে মহারাজ বিম্বিসার উঠে দাঁড়ালেন বলে উঠলেন—আপনার কাছে কিছু নিবেদন ছিল ভন্তে।

বুদ্ধ নিজের আসন থেকে বললেন—বলুন মহারাজ।

—আমি সংবাদ পাচ্ছি বহু সৈনিক নাকি পব্বজ্জা নেবার উদ্যোগ করছে। এ কথা কী সত্য ভন্তে?

—হতে পারে, ধীর গলায় বললেন তথাগত। মহারাজ, সেনানীগ্রামে কদিন দেশনার পর উত্তরোত্তর ভিড় বাড়ছিল।

—কিন্তু ভন্তে, সৈনিকরা যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, রাজ্য রক্ষা করবো আমি কাদের দিয়ে?

বুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত সভাও সেই সঙ্গে স্তব্ধ।

—মহারাজ, বুদ্ধর গম্ভীর অনুরণনময় কণ্ঠ শোনা গেল—মানুষ বদ্ধ জীব। জীবনের বন্ধন। কর্মের বন্ধন। সমাজ পরিবার পরম্পরার বন্ধন। সর্বত্রই শুধু অধিকার হরণের খেলা। একমাত্র পব্বজ্জা গ্রহণের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।'

—কিন্তু ভগবান, জাতির প্রতি, দেশের প্রতি দায়িত্ব বলেও তো কিছু আছে! আজ আমি যদি পব্বজ্জা নিয়ে চলে যাই, মগধবাসীর প্রতি তা সুবিচার হবে কী ?

—তবু আপনার সে অধিকার আছে মহারাজ।

অধিকার থাকুক। আমার দায়িত্ববোধ আমাকে উপাসকত্ব নির্বাসন করতে বলে। মগধবাসীর মুখ চেয়ে।

—হয়ত আপনার মনে পূর্ণ বৈরাগ্য উদয় হয়নি, মহারাজ।

—এ কথা বহু সৈনিকের সম্পর্কে, আরও বহু পব্বজ্জাকামী মানুষের পক্ষেও সত্য হতে পারে ভগবন্। বৈরাগ্য উদয় হয়নি। কিন্তু কর্মত্যাগ করার সুযোগ অনেকেই ছাড়তে চায় না। যুদ্ধক্ষেত্র, সংগ্রাম, প্রাণ যাবার সম্ভাবনা, এ সবের চেয়ে শ্রমণ-জীবন যাপন করা অনেক নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাপার।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। তারপর বুদ্ধ বললেন—তাই হবে। সৈনিকরা সংঘে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি স্তব্ধ হয়েই বসে রইলেন। ধীরে ধীরে তাঁকে নমস্কার করে অধিকাংশ লোকই চলে গেল। আজ দেশনা হবে না, বুঝতেই পারা যাচ্ছে।

মহারাজ বিম্বিসার মাথা নত করে বসে আছেন। সভা প্রায় শূন্য হয়ে এলে তিনি বললেন—আমার উপায় ছিল না ভগবন্। তথাগতের পথ আর রাজকর্তব্যের পথ, দুটির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন...

—সামঞ্জস্যের চেষ্টা যে তথাগত করছেন না, এ কথা তো সত্য নয় মহারাজ! আপনার অনুরোধেই উপোসথ প্রবর্তিত হয়েছে প্রতি পূর্ণিমাতে, অমাবস্যায় শুধু লোকরীতির প্রতি শ্রদ্ধাবতশই, নয়তো সংঘবাসী ভিক্ষুরা তো সর্বদাই সংযম পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, স্বতন্ত্রভাবে উপোসথের সংযমের কোনও প্রয়োজন নেই।...

এই সময়ে বিপরীত দিক থেকে একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার, কিছু বাদ-প্রতিবাদের শব্দ শোনা গেল। অচিরেই সভাস্থলে ঝড়ের মতো প্রবেশ করল এক নারী। কৃষ্ণকায়। চুলগুলি পিঙ্গলবর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, মাথার চারপাশে যেন বিষধর সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছে। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। সামান্য একটি মলিন, ছিন্ন বসন কোনমতে কটিতে জড়ানো।

—আমার ছেলে দুটো কে হরেছে, কে হরেছে ? বলতে বলতে সে তার লাল চোখ চারদিকে ঘোরাতে লাগল।

বুদ্ধ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন—কে তুমি, জননী!

—হারিটি, আমি হারিটি। আমার ছেলে কে হরেছে ? তুই ? বলে যক্ষিণী বুদ্ধর দিকে ধেয়ে গেল। দীর্ঘ নখ সমেত তার হাতগুলি সামনে প্রসারিত। তিষ্য এবং চণক সবিস্ময়ে দেখল, যক্ষিণী বুদ্ধের বেদীর ওপর আছড়ে পড়েছে। বুদ্ধ সরে গেছেন। যক্ষিণী আবার উঠে ক্রোধে অন্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পেছনের আম গাছের কাণ্ডে এবার আছড়ে পড়ল সে। বুদ্ধ সরে গেছেন। এইভাবে সে ডাইনে ঝাঁপালে বুদ্ধ বাঁ দিকে সরেন, সে বাঁ দিক ঝাঁপালে তিনি চকিতে ডাইনে সরে যান, কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিটির মুখে, বুকে রক্ত দেখা দিল। সে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ক্ষান্ত হল। গর্জনের সঙ্গে কান্না মিশিয়ে সে বলল,—আমার ছেলে দে! জাদুকর!

বুদ্ধ বললেন—আমাদের শিশুগুলি দাও আগে।

—তোদের ছেলে আমি জানি নে, জানি নে।

—তোমার শিশুদের কথাও আমি জানি না।

তখন যক্ষী কাঁদতে লাগল। সে কী ভয়ানক কান্না! ঝড়ের পরে যেন প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে।

—ও যতি, আমার ছেলে দে। ও জাদুকর, আমার ছেলে দে। আমি ওয়াদের না দেখে থাকতে পারি নে। ও যতি, আমার বুক টনটনাচ্ছে। কতক্ষণ ওয়ারা এসে দুধ খায়নি।—কাঁদে আর দাঁত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কড়মড় করে সে।

আরও একটি কালো ছায়া প্রবেশ করল ধীরে ধীরে। একটি নগ্নপ্রায় পুরুষ। এতক্ষণ সম্ভবত গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল। সে এগিয়ে আসতে তিষ্য এক দিক থেকে, চণক এক দিক থেকে তাকে শক্ত করে ধরল। যক্ষিণীটি এমন অতর্কিতে এসে হানা দিয়েছিল, যে তারা কিছু বোঝবার আগেই সে বুদ্ধকে আক্রমণ করে।

যক্ষ বলল—আমি কিছু করব না, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি পাঞ্চি। হারিটি আমার বউ। ও জ্ঞান হারিয়েছে দুঃখে। ওকে নিয়ে যাবো।

বুদ্ধ বললেন—পাঞ্চি রাজগৃহের শিশুগুলিকে ফিরিয়ে দাও। তাদের মায়েরা ঠিক তোমার পত্নীর মতোই শোকে জ্ঞান হারিয়েছে।

পাঞ্চি বলল—কী করে ফিরিয়ে দেবো ? সেগুলিকে তো হত্যা করে খেয়ে ফেলেছি।

অমনি চারদিক থেকে একটা হুতাশের ধ্বনি উঠ। সমবেত ভিক্ষুরা, উপস্থিত রমণীরা যে যেখানে ছিলেন সবাইকার বুক চিরে একটা আর্তনাদ। কোনও কোনও রমণী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আম্রবনে একটা যেন সাড়া পড়ে গেল, কে জল আনছে। কে কাকে ডাকছে প্রাণপণে।

এরই মধ্যে বিম্বিসার তাঁর রক্ষীদের ইঙ্গিত করলেন, তারা গিয়ে হারিটিকে ধরল।

বুদ্ধ বললেন—এখানে যাঁরা রয়েছেন কেউ শিশুগুলির মাতা বা পিতা নয়, তবু এঁরা দুঃখে মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। হারিটি তুমি কি ভেবেছিলে, তুমি একাই মা ? তোমার শিশুই শিশু ? আর কেউ মা নয়, অন্য মায়েদের শিশুগুলিকে তাদের মায়েরা স্নেহ করে না ?

হারিটি তীব্র স্বরে বলল—অজ্‌জদের আমরা আমাদের মতো ভাবি না। ভাবি না ! তারা আমাদের বন নিয়ে নিয়েছে। পশুগুলো মেরে শেষ করে দিয়েছে। আমরা ভিক্ষে করে খাই। তাও এই নগরের লোকেরা মুখের ওপর দোর বন্ধ করে দেয়। বলে বন্য, ঘৃণ্য, কুৎসিত, কদাকার। কী করে জানব অজ্‌জরা ছেলেদের ভালোবাসে !

বিম্বিসার রুক্ষ কণ্ঠে বললেন—রক্ষীন, এই যক্ষ-যক্ষী দুটিকে বন্দীশালায় নিয়ে যাও।

—একটু অপেক্ষা করুন মহারাজ, বুদ্ধ বললেন—হারিটি, পাঞ্চি—কান্না থামাও ! শুনতে পাচ্ছো ? শুনতে পাচ্ছো ! তাঁর কণ্ঠ যেন জলভরা মেঘের ডাকের মতো সজল, গম্ভীর।

চণক দেখল রমণীরা সকলেই কাঁদতে কাঁদতে ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। ভিক্ষুদের চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল পড়ছে।

আনন্দ মুখ ঢেকে বসে আছেন। ভিক্ষু ধর্মরক্ষিত হাহাকার করে বললেন—তোমরা আমাকে নিয়ে গেলে না কেন ? আমাকে হত্যা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারতে, আর্যদের ওপর তোমাদের এত রাগ ! আমাদের মতো সংসার-বিরক্ত পরিব্রাজকের হত্যা করে শোধ তুলতে পারতে। শিশুগুলি, আহা অবোধ শিশুগুলি তো কিছুই জানে না, কিছুই করেনি। পাপ কী, এখনও তা জানে না ! কী করলে তোমরা ! এ কী করলে ! বলতে বলতে ভিক্ষু ধর্মরক্ষিত কাঁদতে লাগলেন।

তখন একটি অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি হল। বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন অম্ব বৃক্ষতলে বেদীর ওপর। মুখের ভাব অসাধারণ কোমল, করুণ। চোখ দুটি ভরা দীঘির মতো। মহারাজ বিম্বিসার বসে আছেন প্রস্তরমূর্তির মতো। রক্ষীগুলি হাতের পাতা দিয়ে চোখ মুছছে। তিষ্য প্রাণপণে আত্মসংবরণের চেষ্টা করছে, পারছে না। চণক আরেক প্রস্তর মূর্তি। ভিক্ষুগুলি অস্ফুটে হাহাকার করছেন। ওদিকে রমণীদের মধ্যে মূর্ছা, পতন, হাহাকার চলছেই, চলছেই।

হঠাৎ হারিটি ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ পড়ে গেল। উপুড় হয়ে। সে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। পাঞ্চিও বসে পড়েছে। দু হাতে সে নিজের বুকে আঘাত হানছে।—উঃ, শিশুগুলিকে আমরা খেয়েছি। শিশুগুলিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে খেয়েছি। আমাদেরই শিশু তারা। আমাদেরই...আমাদেরই...

পাঞ্চি দু হাত বাড়িয়ে বলল—ধরো, বাঁধো, আমাকে নিয়ে যাও গো রক্ষীরা। মেরে ফেলো।

হারিটি বলল—ও জঙ্গল-মা, জঙ্গল-মা, ও বেলগাছের দেবতা, বটগাছের দেবতা আমি সইতে পারছি নে। আমাকে মেরে ফেলো। মেরে ফেলো গো !

বুদ্ধ মৃদু, দৃঢ় স্বরে বললেন—মহারাজ ওদের ধরার, বন্দী করার প্রয়োজন নেই।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ধীরে ধীরে বেদী থেকে নেমে নিজের কুটির দিকে চলে যেতে লাগলেন। তাঁর পেছন পেছন চলে গেলেন ভিক্ষুরা, ভিক্ষুণীরা। সবাই স্তব্ধ, যেন এক শোকযাত্রা চলেছে। আম্রবনের পত্রজাল যেন শোকে ধূসর হয়ে গেছে।

মহারাজ বিম্বিসার রক্ষীসহ বেরিয়ে এলেন। চণক ও তিষ্য বেরিয়ে এলো। সোমা বেরিয়ে এলো। নিস্তব্ধ মানুষগুলি যে যার গৃহের দিকে চলে গেল। যেন সবাই একটা গভীর বিষাদের ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

তিষ্য আজ আর নিজের আবসাথাগারের দিকে গেল না। চণকের সঙ্গে জম্বুবনে প্রবেশ করল।

আসনশালায় বসে চণক মদৃস্বরে জিজ্ঞাসা করল—সোমা, কেমন দেখলে ?

সোমার চোখ দুটি এখনও অরুণবর্ণ হয়ে রয়েছে। সে বল—বুদ্ধ তথাগত যে মানববেশী দেবতা তাতে কোনও সংশয়ই নেই!

চণক বলল—বড় তৃষ্ণা, সোমা, কিছু পানীয়ের ব্যবস্থা করো।

দুজন দাসী এসে দাঁড়িয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল। স্ফটিকের পাত্রে পানীয় এলো। সোমা পাত্র তুলে দুই বন্ধুর হাতে দিল।

চণক বলল—তুমি নাও সোমা। সে তিষ্যর দিকে ফিরে বলল—তুমি কি সোমার সঙ্গে একমত ? শ্রমণ গৌতম মানববেশী দেবতা ?

তিষ্য বলল—ওঁকে যে মহারাজ বিম্বিসার সেনাপতির পদ দিতে চেয়েছিলেন, শুধু শুধু নয়।

—এ কথা কেন বলছেন ? সোমা জিজ্ঞাসা করল।

তিষ্য বলল—ভদ্রে, আমি মল্লবিদ্যা শিক্ষা করেছি ভালা করে, যদিও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করি না এখনও। কিন্তু আমার আচার্য বন্ধুলকে দেখেছি তো! ইনি, এই বুদ্ধ, তাঁর চেয়েও কুশলী। মল্লক্ষেত্র আর শাক্যক্ষেত্র প্রায় পাশাপাশি। ইনি মল্লবিদ্যার এই দ্রুত স্থান-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এমন শিখেছেন যে, সহসা দেখলে ইন্দ্রজাল মনে হয়।

চণক উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বলল—তিষ্য, তুমি সংশয়ী বটে! অজিত কেশকম্বলী কিংবা প্রক্রুধ কাত্যায়নের থেকেও।

তিষ্য হাসল, বলল—কিন্তু চণকভদ্র, ইনি আমাকে চমৎকৃত করেছেন অন্য কারণে।

—বলো শুনছি—চণক পানীয়ে চুমুক দিয়ে বলল।

—চণকভদ্র, জীবনে এই প্রথম আমি কাঁদলাম। সে কী বিপুল দুঃখের বেগ ভদ্রা, আপনিও বোধ হয় তার থেকে মুক্ত ছিলেন না। চণক আমি দেখলাম, চোখের সামনে দেখতে পেলাম যেন নিষ্পাপ শিশুগুলিকে এরা দুজনে মিলে হত্যা করছে। সেই অগ্নিকুণ্ডটি চোখের সামনে ভাসিত হল। আধপোড়া শিশুদের শব। ওহ্, চণক, আমার কিন্তু ক্রোধ হল না। সঙ্গে সঙ্গে বধ করতে পারতাম ওই যক্ষীকে। কিন্তু ক্রোধের আগুন যেন নিবিয়ে দিল দুঃখের জল। যতক্ষণ বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে গৌতম ওইভাবে কথা বলছিলেন বা শুধু দাঁড়িয়েছিলেন সমগ্র আম্রবনে করুণা, ক্রন্দনের একটা তরঙ্গ উঠছিল। এত তীব্র যে কাননের গাছগুলিও বোধ হয় তা থেকে মুক্ত ছিলে না।

একটু থামল তিষ্য। তারপর বলল—চণকভদ্র, আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলছি ?

—বুঝেছি,তুমি ওঁর প্রভাবশক্তির কথা বলছ।

—এ প্রকার প্রভাব ঋদ্ধিমান পুরুষ না হলে থাকে না—সোমা বলল। পানীয়টি এখনও তার হাতে ধরা—তা ছাড়া আর্য চণক, আমরা কি একটা বাইরের প্রভাবে অত কষ্ট পেলাম! তা নয়, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে বৎসহারা জননীর ব্যথা আছে, তাকেই উনি যেন চেতিয়ে তুললেন। সেই ব্যথার সূত্র ধরে এলো আমার ব্যক্তিগত সমস্ত ব্যথার দুঃখ, তারপর...তারপর আরও যে যেখানে আছে, সবার সর্বপ্রকার দুঃখের মধ্যে মিলে গিয়ে তা এক মহাদুঃখ হয়ে হৃদয় দীর্ণ করতে লাগল। অন্তত আমার।

তিষ্য মুখ নত করে বলল—আমারও ঠিক এই অনুভূতি। ঠিক এই। ভদ্রা অবিকল বর্ণনা দিয়েছেন। হৃদয়টি যেন ইন্দ্রকীল, দুঃখগুলি সব হস্তিযূথ। প্রাণপণে হৃদয় ভেঙে দিচ্ছে।

সোমা পানপাত্র নামিয়ে ত্বরিতপদে ভেতরে চলে গেল। অনেকক্ষণ পরে তিষ্য মৃদুস্বরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল—চণকভদ্র উনি কে ? এই ভদ্রা ?

—ওঁর পূর্ণ পরিচয় তোমায় পরে দেব তিষ্য। এখন শুধু জেনে রাখো এই নারী বিদূষী, সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদি বহু চারুকলায় এঁর সমকক্ষ পাওয়া কঠিন কাজ। ইনি আমাদের পিতা-পুত্রের জীবনের প্রধান কৃতি রাজশাস্ত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করছেন।

—ইনি আপনার পত্নী বা পত্নীস্থানীয়া নন ? সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করল তিষ্য।

—না, না। তিষ্য, একেবারেই না।

দাসীরা এসে জানাল—রাত্রের আহার্য প্রস্তুত।

বহু প্রকার খাদ্য-দ্রব্য ভারে ভারে সামনে এনে রাখল দাসীরা। অদূরে ছায়ামূর্তির মতো বসেছে সোমা। কারওই আহারে তেমন রুচি নেই। সোমাও কাউকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করছে না। সে জানে আজ এদের খাদ্যে রুচি থাকবে না। তিষ্য অবশেষে দুধের পাত্র তুলে নিল। পান করতে করতে ভাবল—এই ভদ্রা কে ? ইনি ব্যক্তিগত দুঃখের কথা কী বলছিলেন ! এঁর মুখশ্রী গম্ভীর। বৃথা ভদ্রতা করেন না। এঁর ব্যক্তিগত দুঃখগুলি কী ? এখন যেমন স্থির বসে রয়েছেন, আম্রবনেও তেমনি ছিলেন। শুধু চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। গাল ভেসে যাচ্ছিল। ইনি বিবাহিতা বলে মনে হচ্ছে না। অথচ বৎসহারা জননীর কথা কী যেন বলছিলেন ?

২৭

নগরীতে ভয়ানক গোলমাল। চণক তিষ্যকে নিয়ে যাচ্ছিল এক গোষ্ঠীতে। বোধিকুমার, চারুবাক এঁরা তো থাকেনই, আরও চার-পাঁচজন বিশিষ্ট কবি, বিদ্বান, কুলপুত্র আসেন এখানে। চণকের উদ্দেশ্য ছিল তিষ্যকে এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। একটু আগেই বেরিয়েছে ওরা। চণক বলল— চলো অনুচিত্তর পানাগারে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি। এত শীঘ্র গেলে হয়তো অনর্থক অপেক্ষা করতে হতে পারে।

AMARBOI.COM

অনুচিত্তর পানাগারটি হাটের একেবারে মাঝখানে। নানা ধরনের লোকেরা তার ক্রেতা। দুধারে গন্ধ, মাল্য, ফুল ইত্যাদির আপণ। এইখানেই কয়েস মাস আগে একটি মাগধ চর, কিংবা হয়ত চর নয়, চতুর এক নাগরিক চণকের ছদ্মবেশ ভেদ করে তাকে মহা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। স্থানটি প্রধান রাজপথের একটি শাখা, বৈপুল্লগিরি থেকে যাওয়া-আসার পথে পড়ে। প্রধান রাজপথগুলির দু পাশে কানন, প্রাসাদ। প্রাসাদগুলিও অধিকাংশই কানন বেষ্টিত। কিন্তু হাট বা কোনও আপণ নেই। মৎস্য, মাংস, শাক এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুর হাট উত্তরের এবং দক্ষিণের দুটি উপপথে রয়েছে। সেখানেও পানাগার আছে, তবে তা একেবারে নিম্নশ্রেণীর জন্য। বৈপুল্লগিরির সানুদেশের এই পথটিকে বিলাসদ্রব্যের হাট বলা যায়। সূক্ষ্ম বসন, শিশুদের খেলনা, কিংবা অন্য শিল্পদ্রব্য যেমন ইন্দ্রর মূর্তি যক্ষিণী মূর্তি—এ সবই এখানে পাওয়া যায়।

মালা কিনবার জন্য দুজনে একটি বড় আপণের সামনে থাকল। আপণের সামনে কয়েকজন বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল।

একজন আরেক জনকে বলল—তুমিই বলো না অসুরেন্দ্র, এর পর ওই মুণ্ডক শ্রমণ রাজ্য চালাবে, না আমাদের মহারাজ ! অন্যান্য শ্রমণরা নিজেদের আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে থাকেন। ধ্যান-ধারণা করেন, লোকে চাইলে উপদেশ বা ভাষণ দেন, দুটি ভিন্ন পন্থের মধ্যে বিতর্ক হলেও আমরা উপকৃত হই। উত্তেজক হয় ব্যাপারটা। এই মুণ্ডকের মতো কেউ সব বিষয়ে নাক গালচ্ছে কী ? কাকে শাস্তি দিতে হবে না-হবে, সে রাজা বুঝবেন !

অসুরেন্দ্র নামে লোকটি বলল—রাজা নিজেই সমাদর করে করে এঁর মাথাটি চর্বণ করেছেন। এখন বুঝুন !

তিষ্য এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে ভদ্র ?

অসুরেন্দ্র বলল—আর বলবেন না আয়ুষ্মন্ আমরা এই রাজগহের নাগরিকরা জ্বলেপুড়ে গেলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বলেপুড়ে গেলাম। আপনি নিশ্চয়ই এখানে আগন্তুক ?

—হ্যাঁ, দু এক মাস হল এসেছি।

—তাই জানেন না। এক ন্যাড়ামুণ্ড শ্রমণ কয়েক বছর ধরেই এ নগরে যাতায়াত করছে। নিজেকে বলে বুদ্ধ। আমাদের মহারাজকে এমনভাবে সম্মোহিত করে ফেলেছে যে তিনি এর সমস্ত বাক্য বেদবাক্যের মতো মানতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

এই সময়ে অন্য একটি লোক মৃদুস্বরে কী বলল। অসুরেন্দ্র তাতে একটু না দমে বললেন—চর ? চর আমার কী করবে ? আমি অন্যায় কিছু বলেছি ? যক-যক্ষিণী নাগরিকদের শিশু চুরি করে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলল। কেউ তাদের ধরতে পারছিল না। কী করে ধরবে ! ভিক্ষুক সেজে ছল করে লোকের বাড়িতে ঢুকত আর শিশুগুলিকে চুরি করত। ওই মুণ্ডকের বুদ্ধিতে না হয় তাদের ধরা গেল। রাজার রক্ষীরা তাদের বেঁধেছিল, এমন সময়ে মুণ্ডক কি না বলে ওদের ছেড়ে দাও ! মহারাজও দিব্য ছেড়ে দিলেন ! শুনছি নাকি আবার সাক্যপুত্তীয় সমনরা নিজেরে ভিক্ষাভাগ ওদের নিত্য দেবে। ওদের দুঃখে হৃদয়গুলো সব গলে জল হয়ে গেছে। রাক্ষসীর উদরে যে আমাদের শিশুগুলি জীর্ণ হচ্ছে সেটা কিছু না। রাজা নাকি যক্ষিণীর পল্লীতে রক্ষী নিয়োগ করেছেন, যাতে ওদের কেউ ক্ষতি করতে না পারে।

মালা কিনে চণক ততক্ষণে পানাগারের দিকে পা বাড়িয়েছে। তিষ্যর পেছন পেছন রাজগৃহর এই নাগরিকগুলিরও একই গন্তব্য। যে-যার আসনে বসে, সুরার কথা বলে আবার একই প্রসঙ্গ আরম্ভ করল ওরা।

কয়েকটি পীঠের ওপর পরিষ্কার স্থূল আচ্ছাদন পেতে দিয়েছে এরা। উপাধান ইতস্তত ছড়ানো। চতুর্দিকে ফুলের মালা ঝুলছে। কয়েকটি বড় বড় মাটির কলসে সুরা রয়েছে নানাপ্রকার। তীক্ষ্ণ এবং মৃদু উভয়ই রয়েছে। অনুচিত্তর দুজন সুবেশ দাস ও সুবেশা দাসী সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রে সুরা পরিবেশন করছিল।

চণক পানীয়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল—আপনাদের কারও গৃহে কি শিশু চুরি গেছে ?

অসুরেন্দ্র বললেন—কী যে বলেন ভদ্র। আমার...আমাদের সবার গৃহই যথেষ্ট সুরক্ষিত। ধনী সেট্‌ঠিদের মতো দ্বারপাল না থাকতে পারে কিন্তু শিশুগুলিকে দেখাশোনা করবার জন্য দাসদাসীর অভাব নেই। ধাত্রীরা রয়েছে, মায়েরাও সতর্ক। এসব শিশু চুরি ঘটেছে প্রান্তিক পল্লীতে।

চণক বলল—আমিও তাই ভেবেছিলাম।

অসুরেন্দ্র বললেন—দেখুন ভদ্র, আমাদের উচ্চশ্রেণীর গায়ে না লাগলে আমরা যদি এসব ব্যাপারে গুরুত্ব না দিই, ভবিষ্যতে তাতে কি আমাদের ভালো হবে ? আমরা নগরবাসীরা প্রতিদিনের কার্যাকার্যে এই নিম্ন শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল। আজ ছ'দিন হল আমাদের বর্জ্য কুটিরের মল পরিষ্কার করার জন্য নিযুক্ত অন্ত্যজরা আসেনি। মাতঙ্গ নামে এক চণ্ডাল ওদের নেতা। মাতঙ্গর একমাত্র সন্তান নাকি যক্ষীর উদরে গেছে। এখন ভদ্র, চণ্ডাল হলেও তো সে পিতা ; শিশুঘাতিনীর শাস্তি না হলে সে ক্রুদ্ধ হতেই পারে। কী হে ভৃগু তোমার কী মত ?

ভৃগু নামে ব্যক্তি বললেন—ঘটি কলস তৈজসাদি চুরি করলে যেখানে হাত পা ছেদন করে শাস্তি দেওয়া হয়, সেখানে একজন শিশুঘাতিনী যক্ষীকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া হল, আবার তার নিত্যভোজনের ব্যবস্থা হল, এর মধ্যে কোনও যুক্তি আছে ? এই বুদ্ধ সমন আমাদের সর্বনাশ করবেন।

আরেক ব্যক্তি বলে উঠল—মহারাজ বিম্বিসার এতদিন প্রজাপ্রিয় লোকপাল ছিলেন। আমরা গর্বিত ছিলাম আমাদের রাজ্য ন্যায়ের রাজ্য, শান্তির রাজ্য বলে। আর এখন ?

পানীয় শেষ করে চণক তিষ্যর দিকে তাকাল, নিম্নকণ্ঠে বলল—এখন আর গোষ্ঠীতে গিয়ে কাজ নেই, চলো একবার আম্রবনে গিয়ে দেখি শ্রমণের দেখা পাই কি না।

যতই আম্রবন এগিয়ে আসে ততই অস্বস্তি বাড়তে থাকে উভয়ের। পথে যেন ভিড় বাড়ছে। আম্রবনের প্রবেশপথে তারা একদল নিম্নশ্রেণীর লোক দেখতে পেল। পরনে কটিবস্ত্র। ঊর্ধ্বাঙ্গে অধিকাংশেরই কিছু নেই। কেউ কেউ বাকল জাতীয় বস্ত্রও পরে রয়েছে। এরা অপরিচ্ছন্ন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্মশ্রু-গুম্ফ বিশেষ কাটে না। গায়ের বর্ণ সবারই যে কৃষ্ণ তা নয়, কয়েকজন তাম্রবর্ণ, এমন কি গৌরবর্ণও আছে, কিন্তু বড় মলিন। ভিড়ের মধ্যে একটি বিশালদেহী যুবককে আঙুল দিয়ে দেখাল তিষ্য—দেখুন, চণকভদ্র দেখুন!

লোকটির কটিতে রক্তবসন, মাথায় কেশগুলি কুণ্ডলীকৃত হয়ে রয়েছে। হাতে একটি যষ্টি। চোখগুলি একে রক্তবর্ণ, এখন যেন তাতে আগুন জ্বলছে। সে উন্মত্তের মতো বলছে—রাক্ষসীর শিশু ফিরিয়ে দেওয়া হল, আমার শিশু, আমাদের শিশুগুলিকে কে ফিরিয়ে দেবে? সমন তার জাদু দেখাক। দিক ফিরিয়ে আমার চন্দকে। দিক, আমি কিচ্ছু বলব না। দেওয়ার সাধ্য তার আছে?

বলতে বলতে মাতঙ্গ ঝড়ের মতো আম্রবনে ঢুকতে লাগল। কিছু দূর থেকে চণক ও তিষ্য তাদের অনুসরণ করল।

—কী করবে ওরা? তিষ্য উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, শ্রমণ গৌতমকে বধ করতে যাচ্ছে না কি?

চণক বলল—তা মনে হয় না, তবে এদের কথার উত্তর শ্রমণকে দিতে হবে। তিনি কী উত্তর দেবেন তিনিই জানেন।

আম্র তরুমূলে বেদীটি শূন্য। একজন ভিক্ষু বেরিয়ে এলেন, বললেন—কে তোমরা? কী চাও?

—বুদ্ধ কোথায়? বুদ্ধ?—মাতঙ্গ কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড ক্রোধ ও ব্যঙ্গভরে বলল।

—তথাগত আজ ভোরেই পরিব্রজন করতে বেরিয়ে গেছেন। এখন তো আর ফিরবেন না। তাঁর সন্ধান করছ কেন আবুস?

মাতঙ্গ বলল—যক্ষিণী আমার শিশুকে খেয়েছে, তার শাস্তি তিনি বন্ধ করেছেন কেন? উত্তর দিন! আপনি কে? সমন বুদ্ধকে না পেলে আমরা আপনার কাছ থেকেই উত্তর চাইব।

—আমি তথাগত বুদ্ধর অগ্‌গসাবক মোগ্‌গল্লান। তোমরা কার শাস্তি চাও? এসো, দেখো।

মোগ্‌গল্লান মাতঙ্গের দলকে একটি কুটিরের দিকে নিয়ে গেলেন। সবাই দেখল স্বল্প-পরিসর কুটিরের মধ্যে দুটি বন্য নরনারী শুয়ে আছে। অচৈতন্য। তাদের সর্বাঙ্গ ক্ষতে পূর্ণ। কোনও কোনও ক্ষত দিয়ে এখনও রক্ত ঝরছে। যক্ষীটির গলার চারপাশে আঙুলের চিহ্ন।

মাতঙ্গর দলের একজন অবাক হয়ে বলল—শ্রমন ওদের এভাবে শাস্তি দিয়েছেন?

মোগ্‌গল্লান ধীরে ধীরে বললেন— সেই শাস্তিই সবার বড় শাস্তি যা মানুষ নিজে নিজেকে দেয়। দুদিন, দুই রাত ধরে এই বন্য দম্পতি উন্মাদের মতো নিজেদের হত্যা করবার চেষ্টা করেছে। এতদিনে এদের হৃদয় জেগেছে বুঝতে পেরেছে কী পশুর মতো আচরণ করেছে এরা। অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে অন্তর। তিনি দলটির দিকে চেয়ে বললেন 'কে তোমাদের দলপতি? নাম কী?'

কয়েকজন বলে উঠল— মাতঙ্গ। মাতঙ্গ।

মোগ্‌গল্লান বললেন— মাতঙ্গ! তোমাদের তো চিরকালই ওই প্রান্তিক পল্লীতে বনের ধারেই থাকতে হবে?

—তা তো হচ্ছেই। মাতঙ্গ রুক্ষ কেশভরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—'তোমরা চিরকালের মতোই নিরাপদ হতে চাও তো?'

একজন বলল— তা তো চাই-ই সমন, নিত্যি-নিত্যি ঝামেলা কে পোয়াবে?

—আজ একজন যক্ষীকে হত্যা করলে কাল আরেকজন শিশুঘাতী যক্ষ আবির্ভূত হবে না এ কথা কেউ বলতে পারে?

—হতেই পারে। এই বনে যক্ষই থাকে তো!

—ওদের নরমাংস খাওয়া ছাড়াতে পারলে, সভ্য মানুষের মতো কাজকর্ম করে বাঁচবার সুযোগ দিলে ওদের মধ্যে থেকে এই ঘৃণ্য অভ্যাস তো চলে যেতে পারে?

—ওরা রাক্ষস, ওরা আমাদের মতো মানুষ নয়, সমন!

বেশ ওদের দেখে এসো ভালো করে, রাক্ষসের কী লক্ষণ ওদের আছে দেখো। আমাদেরই মতো হাত পা, মুখ, কেশ, আমাদেরই মতো চোখ মুখ। শুধু ভাষা একটু ভিন্ন। তা-ও আমরা বুঝতে পারি এমন কথা ওরা বলতে আরম্ভ করেছে। অজ্ঞান, অনাহার, অভাব এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি থেকে ওরা এই কাজ করেছে। এখন যদি ওদের হত্যা করা হয়, বন্যরা আরও ভয় পেয়ে যাবে মাতঙ্গ, আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত্রু হয়ে উঠবে। কিন্তু একজনকে যদি ক্ষমা করা যায় ওরা আমাদের বিশ্বাস করবে, শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসতে আরম্ভ করবে। তোমাদের পল্লী যক্ষভয় থেকে চিরকালের জন্য রক্ষা পাবে। মাতঙ্গ, ওরাই বনের মধ্যে তোমাদের রক্ষী হয়ে থাকবে। এ সুযোগ তোমরা হাতছাড়া করো না।

জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠল। তিষ্য দেখল বিশাল বক্ষপট চেতিয়ে মাতঙ্গ ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসছে। সে পায়ের দুমদাম শব্দ করে চলে গেল। তার মুখ মেঘাচ্ছন্ন। অন্য লোকগুলি ভিক্ষু মোগ্‌গল্লানকে নমস্কার করল। অনেকে বলে উঠল—সমন, সত্যি সত্যি আমরা এবার নিরাপদ তো ?

—আমি জানি এই পাঞ্চিক আর হারীতি, তোমাদের এবং তোমাদের শিশুদের রক্ষা করবে। ওদের সভ্য, শিষ্ট মানুষ হয়ে উঠতে আর বিলম্ব নেই। তোমরা সাহায্য করো।

—কিন্তু শিশুগুলিকে তো আর আমরা ফিরে পাবো না। আমাদের অনেকেরই শিশু গেছে।

—তোমাদের ঘরে আরও শিশু আসুক আবুস। যেগুলি গেছে তারা মুক্তাত্মা। মহাত্মা। সংসারের দুঃখচক্র থেকে মুক্তি নিয়ে চলে গেছে। তাদের জন্য শোক করো না।

লোকগুলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। মাতঙ্গ যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রবল বেগে একবার মাটিতে পা ঠুকলো। তারপর শব্দ করে থুৎকার করল—থুঃ, থুঃ, থুঃ।

সে একা একা প্রায়ান্ধকার পথ বেয়ে চলে গেল। অন্য লোকগুলি চলতে চলতে বলতে লাগল—আমাদের বচ্চগুলি চণ্ডাল পুক্কুশের জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে। সমন বলেছেন ওরা মহাত্মা।

—সমন বলেছেন ওরা মহাত্মা। আমাদের নন্দু লোহিচ্চ, সচ্চ—সব মহাত্মা।

—ভবচক্র থেকে মুক্তি পেয়েছে।

—মুক্তি পেয়েছে ... ওরা মহাত্মা। এই ঘৃণিত জীবন থেকে ওরা রক্ষা পেয়েছে।

—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্তিয়, বৈশ্যরাই শুধু মুক্তি পায় না গো, নিচু বন্নের মানুষও মুক্তি পেতে পারে। মহাত্মা হতে পারে। সমন বলেছেন।

জীবকাম্রবন ছাড়িয়ে অনেকটা চলে আসার পর দুজনেরই লক্ষ্য পড়ল গোষ্ঠীতে যাবার পথ তারা ছাড়িয়ে এসেছে। দীপদণ্ডগুলি জ্বলতে আরম্ভ করেছে পথের পাশে। অজানা বুনোফুলোর মাদক গন্ধ পাহাড়ের দিক থেকে বয়ে আনছে বাতাস। তপোদারাম যাবার উপপথটির মুখে আসতে বেশ কয়েকজন তীর্থিক পন্থের শ্রমণকে দেখতে পাওয়া গেল। তাঁরা পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছেন। রথ এবং ঘোড়ায় চড়ে কিছু নাগরিক চলাচল করছেন। দু একটি শিবিকাও চলে গেল। শান্ত রসের সন্ধ্যা।

তারা দুজন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াদুটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নইলে কথা বলবার সুবিধে হয় ন।

তিষ্য বলল— এই মোগ্‌গল্লানকে পূর্বে দেখেছেন না কি, চণকভদ্র ?

—নাঃ।

—এঁরা সকলেই সম্মোহন বিদ্যা জানেন দেখছি।

—তিষ্য, তুমিও যে দেখছি রাজগৃহের নাগরিকদের মতো হলে ?

—আপনি কি বলছেন শ্রমণের ওই সব কথা সত্য ? শিশুগুলি মহাত্মা, মুক্ত হয়ে চলে গেছে ?

চণক হেসে বললেন— মৃত্যুর পর মানুষ জড় উপাদানসমূহের বন্ধন থেকে মুক্তই তো হয়। আত্মায় বিশ্বাস করি না করি, এটুকু তো অন্তত বুঝতে অসুবিধা নেই।

—কিন্তু মহাত্মা ? শ্রমণ কি যক্ষীর জঠরে যাওয়া সব শিশুগুলিকে দেখেছেন ? দেখে না থাকলে তারা মহাত্মা এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন অনুমান ছাড়া কী ? এক যদি এই শ্রমণরা সর্বজ্ঞ হন।

—শ্রমণ গোতম নাকি বলেন কেউ সর্বজ্ঞ নয়। হতে পারে না।

—তাহলে ?

—তিষ্য তুমি সম্মোহন দেখছ, আমি দেখছি কূটনীতি। শ্রমণ গোতম কূটনীতি প্রয়োগ করে বন্যদের বশ করলেন। তাঁর শিষ্য মোগ্‌গল্লান কূটনীতি প্রয়োগ করে বিদ্রোহী চণ্ডাল-পুক্কুশদের বশ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। এমন আমি আর দেখিনি।

—একে আপনি কূটনীতি বলছেন চণক ভদ্র ? কূটনীতির মধ্যে একটা চতুরতার প্রবঞ্চনার ব্যাপার আছে। জেনেশুনে তাকে প্রয়োগ করেন কূটনীতিক। এই শ্রমণদের ঠিক ধূর্ত, চতুর মনে করতে আমার দ্বিধা হচ্ছে।

চণক বলল—সাধারণ রাজপুরুষ যিনি গতানুগতিক পথে চলেন তাঁর হাতে কূটনীতি চতুরতাপ্রসূত হতে পারে তিষ্য। কিন্তু আমি যে কূটনীতির কথা বলছি তা রাজশাস্ত্রের সূক্ষ্মতম এমন কি বলতে পারো মহত্তম নীতি। এর জন্ম হৃদয় থেকে, রাজায় রাজায়, রাজায় প্রজায় পরিপূর্ণ মৈত্রী স্থাপনের হার্দ্য ইচ্ছা থেকে।

কিছুক্ষণ থেকেই পেছনে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এই সময়ে অশ্বারোহী দুই পথিকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। এক লাফে নেমে অশ্বারোহী বললেন—'মান্যবর, আপনাদের আলোচনায় যোগ দিতে পারি ?'

তিষ্য অবাক এবং বিরক্ত হয়ে দেখল একটি সৈনিক। শ্মশ্রু, গুম্ফ বেশ যত্নে লালিত। বক্ষে লৌহজালিকা। মাথায় করোটিকা শিরস্ত্রাণ। চণকের থেকে সামান্য খর্ব। কিন্তু বিশাল বক্ষপট। কটিদেশ বৃকর মতো। বীরপুরুষ বটে। কিন্তু তিষ্য অত সহজে মুগ্ধ হবার পাত্র নয়। সে ভ্রূকুটি করে বলল— 'না পারেন না। আপনি উচ্চপদস্থ যোদ্ধা হতে পারেন, কিন্তু সহসা পথের পেছন থেকে এসে কোনও আলোচনায় যোগ দিতে হলে আপনাকে আমাদের পরিচিত হতে হবে।'

অশ্বারোহীর শ্মশ্রু-গুম্ফের ফাঁকে হাসি খেলে গেল। বললেন— অবশ্যই। যদিও নাম রূপ ক্ষণকালীন, নিতান্ত নশ্বর বস্তু, যে কোনও মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে যেতে পারে, তবু আপনার প্রীতির জন্য জানাই আমি জনৈক সৈনিক। দেখতেই পাচ্ছেন, মগধের সৈন্যদলে কাজ করি। নাম লোকপাল। পদের তুলনায় নামটি কিঞ্চিৎ ভারী। উপাধি নেই। পিতা স্বর্গত। তাঁর সঙ্গে তো এখন আর বিবাদ করা যায় না।

চণক বলল— ভদ্র লোকপাল, পথে পথে আলোচনা না করে আমার গৃহে যদি আসেন। এই অল্প দূরেই, এসে পড়েছি।

লোকপাল সহাস্যে বললেন কিন্তু আপনার সঙ্গী যুবাটি সম্মত হবেন কী ? আমার নাম বললাম, বৃত্তি বললাম, কিন্তু আয়ুষ্মন আপনি তো পরিচয় জানালেন না ?

তিষ্যর বিরক্তি এখনও যায়নি। সে অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল—উনি চণক। তক্ষশিলার নমস্য আচার্য দেবরাতের পুত্র, আপনাদের মহারাজ বিম্বিসারের বিশেষ প্রীতিভাজন। আমি তিষ্য, সাকেতের রাজকুমার।

—আপনি কি মহারাজ বিম্বিসারের অপ্রীতিভাজন না কি ?

তিষ্য বলল— আপনাকে বয়সে বড় মনে হচ্ছে। আপনার অসম্মান করতে চাই না, কিন্তু অকারণ প্রগল্‌ভতায় কাজ কী ?

লোকপাল নামে সৈনিক হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠলেন।

চণকের জম্বু কানন এসে গেছে। সে বলল—আসুন ভদ্র লোকপাল, তিষ্য এসো।

তিষ্য অপ্রসন্ন মুখ বলল— আমি বরং আজ যাই।

সহসা তার ডান হাত শক্ত করে ধরে লোকপাল বললেন—আপনার মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান, গম্ভীর যুবা উপস্থিত না থাকলে আলোচনার রস নষ্ট হয়ে যাবে। দয়া করে আসুন।

চণক বলল—'তিষ্য, আপত্তি করো না। আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। বিশেষ তোমার পক্ষে।'

তিষ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢুকল। অশ্বশালার দাসেরা তিনটি ঘোড়াই নিয়ে গেল। আসনশালায় প্রবেশ করতেই কোথা থেকে সোমা ছুটে এসে সৈনিককে আভূমি প্রণাম করল। তারপর সৈনিকের বর্ম, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি খুলতে সাহায্য করতে লাগল। তারই ইঙ্গিতে সম্ভবত দাসীরা ছুটে এলো। তাদের হাতে বড় বড় সুগন্ধি জলের পাত্র, মার্জনী বস্ত্র।

সোমা বলল—কী পানীয় আনব দেব ?

—কিছু না, জল খালি। বিশুদ্ধ পানীয় জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—উষ্ণ কিছু আনব না ? হিমে এতখানি পথ এলেন !

—তিষ্যকুমার, আপনার কী অভিরুচি ?

তিষ্য কিছু বলবার আগেই চণক বলল—তিষ্য, ইনি মহারাজ বিম্বিসার।

তিষ্য এতো চমকে গেছে যে সে সঙ্গে সঙ্গে তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখের বর্ণ দেখবার মতো।

সেদিকে চেয়ে মহারাজ বিম্বিসার হাত বাড়িয়ে বললেন—প্রগলভতার জন্য ক্ষমা করো আয়ুষ্মন। গম্ভীর রাজ-পরিবেশে দিন কাটাতে কাটাতে একটু চপলতার জন্য, লঘু কৌতুকের জন্য বড় তৃষ্ণা বোধ করি। চণক, ছদ্মকণ্ঠ ধারণ করতে পেরেছি তো ?

তিষ্য ততক্ষণে নতজানু হয়ে নমস্কার করছে। হাত ধরে তাকে তুলে বিম্বিসার বললেন—সাকেতের রাজকুমার বললে—রাজন্য উগ্রসেনের পুত্র না কি ?

—হ্যাঁ, দেব—তিষ্য কোনমতে বলল।

—পিতার কোন কাজে রাজগৃহে এসেছ ?

—পিতার কাজ নয়। নিজেরই আগ্রহে। ভ্রমণ করছি।

—ও, সেই সূত্রেই চণকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ? ভ্রমণ পিপাসা ?

চণক বলল—মহারাজ, তিষ্যকুমার তক্ষশিলার স্নাতক। শ্রাবস্তীতে বন্ধুল মল্লর কাছেও অস্ত্রশিক্ষা করেছে। ও উচ্চ পদের যোগ্য। অনুসন্ধিৎসু স্বভাবের যুবক।

—সে কথা আমি আগেই বুঝেছি— বিম্বিসার স্মিত মুখে বললেন—এখন সোমাকে উত্তর দাও তিষ্যকুমার শীতল পানীয় খাবে না উষ্ণ কিছু ?

তিষ্য বলল—যা ঘটল আজ, তাতে তীক্ষ্ণ সুরা না হলে স্বস্তি ফিরে পাবো বলে মনে হচ্ছে না।

বিম্বিসার হেসে বললেন—যাক, তিষ্য কুমারের মন প্রসন্ন হয়েছে। সোমা, তীক্ষ্ণ সুরা আনো, আমাদের আজ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।

সোমা নম্র কণ্ঠে বলল—আমি উপস্থিত থাকতে পারি ?

—অবশ্যই।

দাসীরা পানীয় নিয়ে এলো। বিবিধ খাদ্যও। চণক বলল—'মহারাজ কি আম্রবনে উপস্থিত ছিলেন না কি ?'

—'সংবাদ এলো, অন্ত্যজ পল্লীতে অসন্তোষ। ওরা আম্রবনে ভিক্ষুদের আক্রমণ করবে। সৈনিক পাঠিয়েছিলাম কিছু। কিন্তু নিজেরও অত্যন্ত কৌতূহল ছিল।' রাজা বললেন—'স্বয়ং উপস্থিত থেকে দেখতে চেয়েছিলাম কী হয়।'

চণক বলল— মহারাজ, শ্রমণ মোগ্‌গল্লান একরূপ উত্তর দিয়ে বিদ্রোহী অন্ত্যজদের ক্ষান্ত করলেন। আমার জানতে ইচ্ছা হয় আপনার মত কী ! আপনি হলে কী উত্তর দিতেন।

রাজা কিছুক্ষণ নীরবে থেকে ধীরে ধীরে বললেন—অন্ত্যজদের অভিযোগ তো সত্য চণক। সম্পূর্ণ সত্য। যাদের পুত্র-কন্যার ওই নৃশংস পরিণতি হয়েছে তারা কী করে বন্যদের ক্ষমা করবে ? অথচ তথাগতর কথাও সত্য। কোথাও আমাদের পারস্পরিক হিংসার এই কর্মকাণ্ড থামাতে হবে। রাজা অন্যায়কারীর শাস্তিবিধান করতে পারেন কিন্তু তথাগত তার যে মানসিক পরিবর্তন ঘটালেন তা কি অলৌকিক নয় ? তিষ্যকুমার তুমিও তো স্বচক্ষে দেখেছ, বলো !

তিষ্য দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল—'দু পক্ষই যেখানে ঠিক, সেখানে সুবিচার করা কী ভাবে সম্ভব হবে, মহারাজ !'

—সেই কথাই ক দিন ধরে ভাবছি তিষ্যকুমার। এর পরে যখন চৌর্য, দস্যু-বৃত্তি, প্রতারণা, হত্যা ইত্যাদির জন্য শাস্তিবিধান করতে যাবো, তখন আমার অন্তরের মধ্যে তর্জনী আস্ফালন করে ওই মাতঙ্গ কি বলবে না—তোমার বিচারের পেছনে কোনও নীতি নেই রাজা, বিচার হবে সবার জন্য এক। বিচারের মানদণ্ড দুই প্রকার হয় না। ...

হাতের পাত্রটি নিয়ে রাজা শুধু নাড়াচাড়া করছেন, পান করছেন না। বিষণ্ণ, নীরব।

কিছুক্ষণ পর চণক বলল— 'মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে কোথাও আপনার একটা সূক্ষ্ম ভুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে। সভ্য মানুষ, সামাজিক মানুষ যখন চৌর্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি করে তখন জেনে শুনে করে। আপন সমাজের মানুষের প্রতি অন্যায় করে। কিন্তু বন্যরা প্রথমত সভ্য নয়, দ্বিতীয়ত তারা আমাদের ভিন্ন শ্রেণীর জীব বলে মনে করে। শুনলেন না ওই যক্ষী কী বলছিল ? আমরা ওদের বন নিয়ে নিয়েছি। বনের পশু মেরে শেষ করে দিয়েছি। ভিক্ষা চাইতে এলে দ্বার বন্ধ করে দিই। ... ওদের জয় করতে হলে, ওদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে হলে আপনার দিক থেকে ওদের ভয় ভাঙতে হবে, বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা করতে হবে।'...

তিষ্য বলল—চণক ভদ্র, আপনি তো শ্রমণ মোগ্‌গল্লানের মতো বলছেন অবিকল।

চণক বলল—এ-ও হতে পারে তিষ্য ওই শ্রমণ চণকের মতো করে ভাবেন। অবিকল। চণক পুনরাবৃত্তি করছে না। চিন্তার এই সূত্র চণকের মনের মধ্যে কিছুকাল থেকেই ঘোরাফেরা করছে। তবে চণক ওঁর মতো মানুষকে অভিভূত করবার ক্ষমতা রাখে না।

—দৈবরাত চণক প্রথম থেকেই বন্যদের পক্ষে রাজা লঘু গলায় বললেন। তারপর তিষ্যর দিকে ফিরে বললেন—তিষ্যকুমার, এই যে আজ বন্যদের জয় করতে গিয়ে অন্ত্যজদের অসন্তুষ্ট করতে হল, তথাগত বুদ্ধর কথাকে মান দিতে গিয়ে প্রজাদের ন্যায্য অভিযোগের মীমাংসা করতে পারলাম না, এর ফল কী হতে পারে, মনে করো ? তুমিও তো দণ্ডনীতি বোঝো।

তিষ্য বলল—শ্রমণ মোগ্‌গল্লান তো ওদের বুঝিয়ে দিয়েছেন মহারাজ। ওদের শিশুগুলি সব মহাত্মা ছিল, ভবচক্র থেকে মুক্তি পেয়েছে। চণকভদ্র আমায় বলছিলেন এই-ই হল কূটনীতির পরাকাষ্ঠা। হার্দ্য কূটনীতি।

চণকের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন বিম্বিসার। চণক বলল—হ্যাঁ মহারাজ, আমি তিষ্যকে উন্নত ধরনের কূটনীতির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলাম যা হৃদয়ের যথার্থ মৈত্রী ভাবনা থেকে উৎপন্ন হয়। আমি যে চক্রবর্তী রাজার কল্পনা করি তাঁর কূটনীতি হবে গভীরতম মানবধর্ম থেকে উৎসারিত। সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার অস্ত্র নয়।

মহারাজ একটু বিষণ্ণ হাসলেন, বললেন—আচার্যপুত্র, আজ দেখি তথাগতর দেশনা আর তোমার রাজনীতির তত্ত্ব কোথাও মিলে যাচ্ছে। আমি হয়তো উভয়কেই অনুসরণ করে দেখব। আমার বিবেক তাই বলে। কিন্তু লোকচরিত্রে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার অধিকারে বলছি অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ প্রজার প্রশ্নহীন ভক্তি, আনুগত্য ভালোবাসা আমি ধীরে ধীরে হারাতে থাকবো। তথাগত এবং তাঁর সংঘের ভিক্ষুদের মতো মানুষকে অভিভূত করার সাধ্য আমারও নেই।

সোমা এই সময়ে মৃদুস্বরে বলল—মহারাজের জয় হবে।

চণক বলল—অন্তত পক্ষে তার জন্য চেষ্টা তো করতে হবে।

তিষ্য সহসা অসংলগ্নভাবে বলল—মহারাজ, আমি প্রস্তুত।

বিম্বিসার অন্যমনস্ক ছিলেন, চমকে মুখ তুলে বললেন—তোমরা সবাই আমার শুভার্থী ? বাঃ। তিষ্যকুমার, তুমি কিসের জন্য প্রস্তুত ?

—আপনার যাতে জয় হয়, তা করতে মহারাজ।

বিম্বিসার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'তাহলে তিষ্য তোমায় যদি শ্রাবস্তীতে কিছুকালের জন্য পাঠাই, মগধের রাজপ্রতিনিধি বলে ! আপত্তি আছে ?

তিষ্যর মুখের ওপর দিয়ে যেন একটা ছায়া সরে গেল। একটু পরে সে বলল—দূত ?

দূত নয়। রাজপ্রতিনিধি। তোমার কী করণীয় হবে রাজপুরীতে কূটকক্ষে বিশদ আলোচনা করব আগামী কাল। পরে এভাবেই তোমায় যেতে হবে অবন্তী, কৌশাম্বী, ইন্দ্রপ্রস্থ।

মহারাজ বিদায় নিয়ে চলে গেলে চণক উদ্বিগ্ন হয়ে বলল— তিষ্য, তোমার যে দক্ষিণ দেশে যাবার আকাঙ্ক্ষা, সে কথা মহারাজকে বললে না কেন ? সহসা আবেগের বশে এ কী করলে ?

সোমা উৎকণ্ঠ চোখে তাকিয়ে ছিল। কিছু বলছিল না। তিষ্য ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে বলল—চণকভদ্র, দক্ষিণ দেশে রাজ্যস্থাপন করার প্রসঙ্গ তুলে আমায় আর লজ্জা দেবেন না। কিছুই জানি না, কোনও অভিজ্ঞতা নেই। লোকবল নেই। স্বপ্ন দেখি শুধু। আপনার মতো চিন্তক, ভদ্রা জিতসোমার মতো বিদুষী, মহারাজ বিম্বিসারের মতো কুশলী মহাপ্রাণ রাজা, আর ওই শ্রমণদের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন মানুষদের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছি আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। তারপর যদি সময় থাকে ... যদি অর্জন করতে পারি কিছু ... তাহলে ... তখন দেখা যাবে।

সে দুজনকে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে চলে গেল। যেন স্বপ্নচালিতবৎ।

২৮

হিম ঋতুর শান্ত ভোরবেলা। কুজ্ঝটিকায় আবৃত চারিদিক। শ্রাবস্তী নগরী যেন জলের তলার নগরী। পাতালপুরী। রাজগৃহ বা সাকেতের মতো পরিকল্পিত নগরী নয় শ্রাবস্তী। ঠিক শ্রেষ্ঠী-পল্লী বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু এখানে নেই। মিগারের ত্রিতল প্রাসাদ ও বিশাখার বিবাহ-যৌতুকের দ্বিতল বিলাসগৃহটি যে সুন্দর কাননের মধ্যে অবস্থিত, তার আশেপাশে আর কোনও ধনীগৃহ নেই। আছে কিছু একতল ইষ্টক নির্মিত বা দারুময় গৃহ। উচ্চতায় বা গঠন সৌকর্যে আভিজাত্যের গর্ব করতে পারে না। কিন্তু প্রাঙ্গণ, কক্ষ, অন্তঃপুর, বাহির্বাটি মিলিয়ে প্রায় প্রত্যেকটিই অনেকটা স্থান নিয়ে আছে। বিশৃঙ্খলভাবে। যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে, ঘর তোলা হয়েছে। বিশাখা এরূপ দৃশ্যে অভ্যস্ত নয়। সৌন্দর্য, সুষমা, শালীনতা এগুলিতে তার চোখ, কান, মন এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, কুশ্রী কিছু দেখলে, শুনলে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তার গৃহটি কাননের এক প্রান্তে হওয়ায়, বাতায়ন ও অলিন্দ থেকে সে বাইরের দৃশ্য, অন্যান্য গৃহের অন্তরঙ্গ দৃশ্যও দেখতে পায়।

ও পাশের গৃহটির অঙ্গনে দাসীর সঙ্গে গৃহিণীর তুমুল কোন্দল লেগে যায়, যখন তখন। চাল ঝাড়া, মণ্ড প্রস্তুত করা, শস্য শুকোনো সবই ওই অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। গভীর রাতে ঘুম না এলে এই অলিন্দ থেকে সে ওই অঙ্গনে নরনারীর সঙ্গম দৃশ্যও দেখেছে। খুব সম্ভব দাসী ও প্রভুপুত্র। দাসী ও বর্ষীয়ান প্রভুটিও হতে পারেন। এ ছাড়াও এ পল্লী খানিকটা নির্জন বলে কাছাকাছি কোনও কাননে বোধহয় প্রণয়ীরা মিলিত হয়। পথ দিয়ে নীলকৃষ্ণ বসন-পরা মাথায় অবগুণ্ঠন দেওয়া অভিসারিকা রমণীদের দ্রুত চলে যেতে দেখা যায়। তাদের প্রণয়ীরাও যায় পায়ে হেঁটে। এরা সব সময়ে তরুণ-তরুণী হয় না। তার বাতায়নের তলায় কাননপ্রান্তে একদিন সে চুম্বনরত এক প্রণয়ী-যুগলকে দেখতে পায়। পুরুষটি প্রৌঢ়। নারীটি কোন শ্রেণীর তা সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে বিবাহিত। চুম্বনের ফাঁকে ফাঁকে সে নিজ পতির মুণ্ডপাত করছিল। মিগারের গৃহেও এর কোনও ব্যতিক্রম নেই। মিত্তবিন্দ নামে যে সূতটি কহ্লাকে প্রণয় নিবেদন করেছিল এখন দেখা যাচ্ছে সে আরও অনেককেই অনুরূপ কথা বলেছে। কহ্লা আঘাত পেয়েছে। ধনঞ্জয়-গৃহে আজন্ম লালিত সে। বিশাখার সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে তাদের সবার রুচিই খানিকটা বিশাখার মতো হয়ে গেছে। কহ্লা মিত্তবিন্দকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা সত্ত্বেও লোকটি যখন-তখন কহ্লাকে বিরক্ত করে। এ সব কথা গৃহকর্তার কানে তুললে মিত্তবিন্দর কপালে দুঃখ আছে। তাই কহ্লা বা বিশাখা নিজে কিছুই বলে না। মিগার ও তাঁর গৃহিণী দাস-দাসীদের ওপর নির্মম। যদি শাস্তি দেবেন মনে করেন, তবে কঠোর শাস্তিই দেবেন।

শ্রাবস্তীতে পচন ধরেছে। পচে গেছে নগরীটি। বিশাখা কুজ্ঝটিকাগ্রস্ত পথ-ঘাট গৃহ-প্রাঙ্গণ কানন ইত্যাদির দিকে চেয়ে মনে মনে বলে— কোশল, কোশল দেশটাই পচে গেছে। তার বালিকাকালের সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা মনে হয়। সে দেশে দেশে ভ্রমণ করতে চেয়েছিল। বাল্যকাল সম্ভবত দর্পণের মতো। তখনই সঠিক চিন্তা সঠিক আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতিবিম্ব পড়ে মনোভূমিতে। বাল্যকালে তো কেউ পুরুষ অথবা নারী থাকে না, সেই সময়টাই শ্রেষ্ঠ সময়। তবে কি সে পুরুষ হতে পারেনি বলে দুঃখ বোধ করে ? তাও তো নয়। পুরুষ মাত্রেই কেমন রুক্ষ, কর্কশ, ব্যাভিচারী, অমার্জিত। সে পুরুষ হয়নি বলে তার দুঃখ নেই। দুঃখ একটাই। তার ভেতরে সে বিপুল শক্তির নড়াচড়া টের পায়। কর্মৈষণা। কর্মের ক্ষমতা। রাজদণ্ড হাতে রাজ্যশাসন করতে পারলে হয়তো সে তৃপ্ত হত। কুমার কুনিয়র রানী নয়, দেবী মল্লিকার মতোও নয়। সে মহারাজ বিম্বিসারের মতো সভা ডেকে,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজানিচয়ের মঙ্গলবিধান করবে, সীমান্ত-দস্যুদের দমন করবে, ভিন্ন দেশের রাজদূতদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দণ্ডনীতির বিষয়ে আলোচনা করবে, কূটগৃহে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করবে। এর সুযোগ, অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও সুযোগ একটা এসেছিল, একটা নয় দুটো। তিষ্যর মাধ্যমে, এবং কুমার কুনিয়র সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনায়। কিন্তু বিশাখা তখন মনে মনে প্রণয়ভিক্ষু ছিল। সে জানতো না, প্রণয় বলে কিছু নেই। কিছু থাকবে না। আবেগের মোহন আবরণে ঢাকা দেহ-কামনাকেই লোকে প্রণয় বলে।

সে যদি পিতার মতো শ্রেষ্ঠী হতো? বিবাহ না করলেই সে তা হতে পারতো। পিতা তো তাকে শেখাচ্ছিলেনই। মায়ের যে দুঃসাহসিক বাণিজ্য যাত্রার কথা সে শুনেছে, সেইভাবে সেও যেতো। দেশে দেশে, অশ্বপৃষ্ঠে, জলযানে, যাতায়াত করত। গৃহে ফিরে ছোট বণিকদের গোষ্ঠী পরিচালনা করতো। না হয় অমাজুরা, জরৎকুমারী বলতো লোকে, নিন্দা করতো আড়ালে। সে পেত এমন জীবন, যা কর্মে পরিপূর্ণ, অর্থপূর্ণ কর্মে। সর্বোপরি নিজের জীবনটি তার নিজের হাতেই থাকত। কিন্তু একবারও তার এসব কথা তখন মনে হয়নি। বিবাহ যেন রক্তের মধ্যে সংস্কার হয়ে ঢুকে ছিল। উপরন্তু, তার হৃদয় ছিল প্রণয়ের জন্য উন্মুখ। এখন সে কী করবে?

তা হলে কি সে নারী বলেই এই নিয়তি তাকে মেনে নিতে হবে? নারী হলেও সে যে মিগার-পত্নী, এমনকি তার সখী সুপ্পিয়ার মতোও নারী নয়। তার রক্তে যে দেবী সুমনার উত্তরাধিকার। সে এই সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে আছে, কিংবা পিছিয়ে আছে কী? মা সুমনা, পিতামহী পদ্মাবতী তাকে, তাদের কাহিনী শোনাতেন সব নারী যোদ্ধার—মুদগলিনী, বিশ্পলা বধ্রিমতী শশীয়সী...। আরও কাহিনী শুনেছে সে ঋষি বাক্, ঋষি সূর্যার, মহাবিদুষী গার্গী কীভাবে বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যর সঙ্গে বিদেহ রাজসভায় ব্রহ্মবাদ নিয়ে তর্ক করেছিলেন। ঠিক যে নারী যোদ্ধা অথবা ব্রহ্মবাদিনী হওয়ার দিকেই তার ঝোঁক তা-ও বলা যায় না। বিশাখা তার নীলকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ হাতে নিয়ে তদ্গত হয়ে যায়। এই কেশ সে বড় ভালোবাসে। ভালোবাসে এই অনুপম হাতগুলি, হাতের অগ্রভাগে আধ-ফোটা পদ্মকলির মতো হাতের পাতা আর আঙুলগুলি। বস্তুত তার অতুলনীয় সৌন্দর্য বিশাখার জীবনের গভীর আনন্দ, আত্মপ্রত্যয় ও প্রসন্নতার একটি উৎস। সে কখনও এই সৌন্দর্যকে তুচ্ছ বলে মনে করেনি। এ যে দেবতাদের দান, এক অমূল্য আশীর্বাদ এবং বিশেষ সুবিধা তার জীবনে তা প্রতিদিন অনুভব করেছে সে। সে কি গর্বিত? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করে বিশাখা। না, ঠিক গর্ব নয়। বিশিষ্ট হবার অহঙ্কার কী? না, বোধ হয় তাও না। তা হলে? তা হলে? প্রকৃত কথা, দৈহিক সৌন্দর্য তার মানসিক গঠন, গুণাবলী, চরিত্র এ সবের সঙ্গে এমন খাপ খেয়ে গেছে যে, সর্বদা এই সৌন্দর্য সম্পর্কে মোটেই সচেতন থাকে না সে। আজ এখন কুয়াশায় ভরা ভোর বেলাতে যখন পৃথিবী শান্ত, পাখিদের ঘুম-ভাঙা স্বর সবে শোনা যেতে আরম্ভ করেছে তখন সহসা নিজের আঙুলগুলির দিকে চোখ পড়ে, মনে পড়ে যায় তার কেশও ঠিক অমনি সুন্দর। চোখগুলিও। হাত, পা, সমস্ত অবয়বই কী সুন্দর! বিশাখার মনে হয় সে বোধহয় স্বয়ংসম্পূর্ণ। পুণ্যবর্ধন যে তার মনোমতো, তার যোগ্য পতি হল না, এ দুঃখকে সে আর প্রশ্রয় দেয় না। প্রথমটা একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তা যতটা দুঃখে তার চেয়েও বেশি অপমানে। সে পিতা-মাতার জন্য, সাকেতের জন্য, বিবাহ-পূর্ব জীবনের স্বস্তি ও শান্তি, আদর ও স্নেহের জন্য আকুল হয়ে কেঁদেছিল। কিন্তু সেই ভয়ংকর রাতেই বোধ হয় বিশাখার কৈশোরের ওপর পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে। পুরনো বিশাখার ভস্ম-স্তূপের মধ্য থেকে নতুন বিশাখা দাঁড়িয়ে উঠেছে। তার চারপাশ থেকে আরক্ষার স্নেহচক্রগুলি যত খসে পড়ছে, ততই একা হয়ে যাচ্ছে সে। ততই যেন তার নিজস্ব শক্তি আবিষ্কার করছে সে। বিশাখা স্বভাবে নেত্রী। যোদ্ধ্রী। কিন্তু যুদ্ধ তো শুধু রণক্ষেত্রে হয় না!

তার প্রথম জয় হল পুণ্যবর্ধনের পলায়ন। পুণ্যবর্ধনের কথা ভাবলে এখন বিশাখার আর রাগ হয় না, হাসি পায়। ভীরু। মায়ের আদরের পুত্র হতে পারে, কিন্তু মাকে ভয় পায়, পিতাকে তো পায়ই। এখন, পত্নীকেও ভয় পাচ্ছে। হতভাগ্য মানুষটির কোনও চরিত্রই গড়ে ওঠেনি। বারাণসীতে গুরুগৃহে গিয়ে কী শিখে এসেছে, শক্রদেবই জানেন। কুসঙ্গে পড়ে আর অর্থহীন প্রশ্রয়ে দাসেরও অধম হয়ে গেছে। বিশাখাকে অল্পবয়সী ও সুকুমারী দেখে পৌরুষ দেখাতে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন ছিটকে শয্যায় পড়ে গেল ! কী হতবুদ্ধিই না হয়ে গিয়েছিল ! বিশাখার ক্রোধেরও যোগ্য নয়। দু দিন আর গৃহে ফেরেইনি। তৃতীয় দিনে এলো। সন্ধ্যাবেলায় ময়ূরীকে ডেকে বলল, 'তোমার স্বামিনীকে বলো, আমি উপার্জন করতে বিদেশ যাচ্ছি।'

মিগার প্রায়ই বলছেন এতদিনে পুত্তটার সুবুদ্ধি হয়েছে। তার শ্বশ্রূও আহ্লাদিত। বিশাখা ঘটনাটি পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। যদি পুণ্যবর্ধন শুধু চলেই যেত, তা হলে মনে হতো, সে রাগ করেছে। বিশাখার সঙ্গে আর বসবাস করতে চায় না। কিন্তু বলে চলে যাওয়ায় মনে হচ্ছে, হতভাগ্য তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে। উপার্জন করতে যাচ্ছে বলে গেল, অর্থাৎ সে তার পুরনো অলস, বিলাসী জীবন ত্যাগ করে নতুন কিছু করতে চায়, বিশাখার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার এটাই এখন একমাত্র পন্থা মনে করেছে। মুখোমুখি হল না। হয়তো একটু অভিমানও আছে। যাই হোক, আপাতত এই লোকটি এ গৃহ থেকে চলে যাওয়ায় সে স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু যতই উপার্জন করুক, আর অলস জীবন ত্যাগ করুক পুণ্যবর্ধন কি কোনওদিন শ্রদ্ধার যোগ্য হয়ে উঠতে পারবে ? পচে গেছে। এই শ্রাবস্তীর মতো, এই কোশলরাজ্যের মতো, এই সমাজের মতো পুণ্যবর্ধন একেবারে পচে গেছে। ইদানীং এখানে এই প্রকার নরনারীই দেখা যাচ্ছে। এই পচা-গলা কুৎসিত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষটিকে কি সে কোনওদিন স্বীকার করতে পারবে ? যাক, আপাতত সে অনুপস্থিত। তাই সমস্যাটাও নেই।

কিন্তু বিশাখা আরও যুদ্ধ জয় করেছে। সে বহুজনের সামনে নিজেকে নিরপরাধ এবং মিগার শ্রেষ্ঠীকে ভুল, প্রমাণ করতে পেরেছে। সে মিগার-পত্নীকেও জয় করতে পেরেছে। সেই বিচার-সভার দিন থেকে কোনও রহস্যময় কারণে তার শ্বশ্রূ তাকে অত্যন্ত সমাদর করছেন। মাঝে মাঝেই বলেন— সদ্য সদ্য বধূ ঘরে নিয়ে এসে তার অপরাধের বিচার করবার জন্য সভা না বসালেই চলছিল না ? নিজেকেই অপদস্থ হতে হলো তো ! ভালো হয়েছে। গহপতি এবার বুঝুন। তাঁর কথাই শেষ কথা নয়।

আবার কখনও কখনও বিশাখাকে ডেকে বলেন— নিগ্‌গণ্ঠদের তিরস্কার করে ভালো করেছে বিশাখা। গহপতির ঘরে ভোজ্য-খজ্জ খেয়ে উদর পুরে, কতকগুলি নীরস, অর্থহীন কথা বলে যাবে— সবাইকে হাত জোড় করে তদ্‌গত হয়ে শুনতে হবে। কেন ? সবার যদি ভালো না লাগে ? কী ভাবে কর্তৃত্ব করে আবার নগ্ন সমনগুলি। ঘরে এসেই দর্প প্রকাশ করবে। আমরা এই তপস্যা করি, সেই তপস্যা করি। বলি, মুখে বস্ত্রখণ্ড বেঁধে রাখলে কী হবে, ছেঁকে জল খেলেই বা কী হবে, বাতাসে যদি কীট কীটাণু থাকে তা হলে যখন ভোজন করছেন, তখনও তো সেগুলি মুখের মধ্যে ঢুকছে, না কী ? সব শঠ, প্রবঞ্চক ! বিশাখা ওগুলিকে তাড়াও, তাড়িয়ে ছাড়ো। বোঝা যাচ্ছে মিগারপত্নী দীর্ঘদিন ধরে নির্গ্রন্থদের নিয়ে মিগারের বাড়াবাড়ি ভক্তি ভালো মনে করেননি। সববিষয়েই কর্তার ইচ্ছা মেনে চলাও তাঁর মনোমত ছিল না।

আজ সশিষ্য বুদ্ধ তথাগত আসবেন। মিগার তাঁর কথা রেখেছেন। নির্মীয়মাণ জেতবন বিহারে গিয়ে বুদ্ধ এবং তাঁর সংঘকে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। তবে এখন বর্ষাবাসের সময় তো নয়। সংঘের ভিক্ষুরা এখন মধ্যদেশের নানান স্থানে ছড়িয়ে আছেন। বুদ্ধ ভগবান নিজেও অল্প দু-এক দিন হল শ্রাবস্তীতে এসেছেন। আবার শীঘ্রই বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা। জনা দশেক ভিক্ষু নিয়ে তিনি আসবেন। বিশাখার নিজ গৃহের ভোজনশালায় তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে। বিশাখা বলেনি কিছু। মিগার নিজেই বললেন— 'তোমার আগ্রহেই নিমন্ত্রণ। বিসাখা, তোমার গৃহেই আয়োজন করো।' ভালো। বিশাখা তাই করবে। তাই করেছে।

ভোজনশালাটাকে ঘষে মেজে তকতকে করেছে তার দাস-দাসীরা মিলে। সমস্ত গৃহটিই মার্জনা করা হয়েছে। কিন্তু ভোজনশালাটি বিশেষ করে। দু-তিন দিন ধরে অনবরত চন্দনচূর্ণ পুড়িয়ে ঘরটি সুগন্ধ করা হয়েছে। রন্ধনগৃহে যাবার দ্বারে গৈরিক বস্ত্রাবরণী। বড় বড় অশ্বত্থ পাতায় শিউলি ফুল দিয়ে সুন্দর সুন্দর অলঙ্করণ রচনা করেছে তার সইয়েরা। সেগুলি কক্ষপ্রাচীরে বসানো হয়েছে। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ মৃৎ-কলসে আম্রপল্লবের, কুমুদ কহ্লারের সজ্জা। বসবার আসনগুলি স্থূল কোমল কম্বলের। তার ওপর গৈরিক রেশমের আচ্ছাদন। ভোজন ফলকগুলি সব চন্দনকাঠের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়া-অলা। সব নতুন নির্মিত হয়েছে বিশাখার নির্দেশ অনুযায়ী। গজদন্ত বর্ণের কাসিক বস্ত্রের ওপর বিশাখা সেই অশ্বত্থবৃক্ষের চিত্র লিখেছে, যে বৃক্ষের তলায় গৌতম বোধিলাভ করেছিলেন। চিত্রটি কক্ষের মাঝখানের প্রাচীরে প্রলম্বিত আছে।

দুই গৃহের মধ্যবর্তী অঙ্গনটিও আজ দু-তিন দিন ধরে বহু পরিশ্রম করে মাজা-ঘষা হয়েছে। সেখানে একটি আম গাছের মূলে নাতি-উচ্চ বেদী নির্মিত হয়েছে।

প্রাঙ্গণটি সুন্দর সব অঙ্গদেশীয় নলপট্টিকায় ঢাকা। বড় বড় মৃৎপাত্রে তুষের আগুন রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভিক্ষু সংঘ আসবার কিছুক্ষণ আগে থেকেই তাতে চন্দনচূর্ণ ছড়ানো হবে।

বিশাখা এখন নিশ্চিন্ত, পরিতৃপ্ত। পরিমার্জন, চিত্রণ বিশেষত চন্দনচূর্ণের কল্যাণে তার গৃহের বাতাবরণ থেকে আজ সমস্ত অপ্রসন্নতা, অপবিত্রতা, হতাশার গ্লানি দূর হয়ে গেছে। কোনও উদ্বেগ নেই, আছে একটি শান্ত প্রতীক্ষা। ভদ্দিয়তে সেই সাত আট বছর বয়সের পর সে আর বুদ্ধ ভগবানকে দেখেনি। তাঁর সম্পর্কে তার ভক্তির চেয়েও কৌতূহল বেশি। অল্প বয়সে তখন বুঝতো না। অভিভূত হবারই বয়স সেটা। কিন্তু পরে সে দেখেছে তার পিতা ধনঞ্জয়, মাতা সুমনা এঁরা কেউই ঠিক যাকে বলে ভক্তি গদ্‌গদ্— তা হননি। তাঁরা লোকাচার পালন করেন, পারিবারিক বিধি পালন করেন, বুদ্ধের উপদেশগুলিকে বিচার করে যা নেবার নেন, অবশিষ্ট সম্পর্কে নীরবে থাকেন। অর্থাৎ সবার ওপরে কাজ করে তাঁদের নিজেদের বিচার-বুদ্ধি, মন। বিশাখাও সেই রীতিতেই চলতে অভ্যস্ত। তারও বিচার-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। সে যে কী পাবার আশায় বুদ্ধ-সংঘকে নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছে, তা তার কাছে স্পষ্ট নয়। ভক্তি নয়, স্মৃতি, বাল্যস্মৃতির ঘোর। সমর্পণ নয়, শ্রদ্ধা। আবেগ নয়, সন্ধিৎসাই খুব সম্ভব আজ তার এই নিমন্ত্রণের পেছনে কাজ করছে।

ধনপালী তাকে স্নানের জন্য তাড়া দিতে এসেছে। তার এই তিন সই আজ দারুণ উত্তেজিত। তাদের উত্তেজনার কারণ অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমত তারা সকলেই শুনেছে এই বুদ্ধ ভগবান অসাধারণ সুদর্শন। এখন তাঁর চল্লিশের যথেষ্ট ওপরে বয়স হয়েছে, কিন্তু দেখায় নাকি তরুণের মতো। এই সুন্দর পুরুষটি কেমন সুন্দর— এই তাদের প্রধান কৌতূহলের বিষয়।

ময়ূরী ঘোষণা করেছে— দেখিস, যতটা লোকে বলে ততটা নয়। সব কিছু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা লোকের স্বভাব।

ধনপালীর মত— বজ্জিদের মতো সুন্দর তো কেউ নয়। কিন্তু ওই নাতপুত্ত ? উনি তো বজ্জি। উনি কি সুন্দর ? একটুও নয়। তবে ? বুদ্ধ তথাগতও এক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কিছু না। কহ্লার কৌতূহল— শোনা যায় এঁর দেহে বত্রিশটি মহাপুরুষ-লক্ষণ আছে। সে ওই লক্ষণগুলি গুনে গেঁথে দেখতে চায়।

ময়ূরী তাতে বলে— তুই কি তবে বুদ্ধ ভগবানকে মুখ হাঁ করতে বলবি ? চল্লিশটা দাঁত আছে কি না দেখবার জন্য ?

সবাই তাতে হাসতে আরম্ভ করলে ময়ূরী বলে— অন্যগুলি দেখব। কত দীর্ঘ হাত। মাথায় সহজাত উষ্ণীষ আছে কিনা। দেহ-ত্বকে সত্যি সত্যি ধুলো লাগলে ঝরে যায় কিনা !

তখন আবার ময়ূরী বলে— তুই কি ওঁর গায়ে ধুলো ছুঁড়ে দেখবি ? কহ্লা কিছু বলে না। মৃদু মৃদু হাসে।

বিশাখা তাইতে সাবধান করে দিয়েছে ওদের— কোনও অভদ্র আচরণ ওরা যেন আবার করে না ফেলে।

স্বামিনীর দেহটি নবনী ও হরিদ্রার অবলেপ্য দিয়ে বেশ করে মাজবার পর এবার ওরা তাকে পীঠিকায় বসিয়ে কলসে করে দুগ্ধমিশ্রিত জল ঢালছে। বিশাখার চুলগুলি এখন চুড়ো করে বাঁধা। দধি এবং ভেষজ দিয়ে আগেই তাদের পরিষ্কার করা হয়েছে। কোমল ক্ষার মৃত্তিকা দিয়ে এবার সর্বাঙ্গ লেপে দিল ধনপালী। চন্দন জল ঢালল তারপর। সবশেষে পরিষ্কার কাকচক্ষুর মতো নির্মল জল দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব ধোয়া হল। এবার অতি কোমল মার্জনী বস্ত্র দিয়ে মুছিয়ে দেবার পর চন্দনের পাপড়ির মতো কোমল, পদ্মবর্ণ দেহত্বক দেখা দিল, আরও উজ্জ্বল, আরও কান্তিমান।

চুলগুলি মেলে দিয়েছে বিশাখা। জ্বালা হয়েছে সুগন্ধি ধূপ। ব্যজনী দিয়ে বাতাস করছে ময়ূরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনপালী সেগুলিকে খুলে মেলে মেলে দিচ্ছে। কহ্না বস্ত্র বার করেছে পেটিকা থেকে। লঘুভার সূক্ষ্ম চম্পক বর্ণের দুকূল। বার করে কহ্না বলল— ভদ্দা, এই বর্ণ কিন্তু কাষায়বর্ণের কাছাকাছি। সমনরা আবার এই দেখে তোমাকে পব্বজ্জা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না তো ?

বিশাখা বলল— কেন ? যদি নিই-ই পব্বজ্জা !

অমনি তিন সই ছুটে এসে বিশাখার দুই পা, দুই হাত নিজেদের হাত দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

—কী করিস ? কী করিস ? —বিশাখা হাসতে থাকে।

কহ্না দৌড়ে গিয়ে চম্পকবর্ণের দুকূলটি তুলে ফেলল। —না, এই বসন তুমি আজকে পরবে না ভদ্দা। আমরা তোমার বেশকারিণী, আমরা যা বলব তাই শুনতে হবে। সই বলো না আমাদের ? —সে একটি আকাশের মতো নীল, অথচ সকালের রোদের মতো স্নিগ্ধোজ্জ্বল বসন বার করে।

বিশাখা সেদিকে এবার তাকিয়ে বলে— যদি তথাগত মনে করেন আমি রূপগর্বিত ! দেবী ক্ষেমার মতো আমার অবস্থা করেন যদি ! এই নীল দুকূলে বড় বেশি সজ্জিত লাগে আমাকে।

ধনপালী বলল— সজ্জিত বলো না, সুন্দর বলো। তা কোন বর্ণে তোমাকে অসুন্দর দেখাবে বলো তো। বলে দাও। সেটাই বার করি।

বিসাখা বলল— শ্বেতবর্ণ দে।

ময়ূরী বলল— শ্বেতবর্ণে তোমাকে পূজনীয়া দেবীর মতো লাগে। বেশ তাই ইচ্ছা হয় তাই পরো, কিন্তু ভিক্ষুরা ভক্তি গদগদ হয়ে প্রণাম করলে আমরা জানি না।

বিশাখা ভর্ৎসনা করে বলল— ছি ময়ূরি, এত অহংকার ভালো না। যাঁরা নির্বাণ পথের পথিক তাঁদের কাছে সুন্দরী ও বানরীতে কোনও পার্থক্য থাকে না।

—তুমি কী করে জানলে ?

—আমি ঠিক জানি। শ্বেত দুকূলটি কটিতে বাঁধতে বাঁধতে বিশাখা বলল। শ্বেত নীবিবন্ধে বাঁধা পড়ল বসনটি। উর্ধ্বাঙ্গে শ্বেত উর্ণার উত্তরীয় আলোভাবে জড়িয়ে নিল বিশাখা। সর্বশ্বেত। শুধু তার স্তনপট্টের শ্যামল বর্ণ উত্তরীয়ের মধ্য দিয়ে আভাসিত হতে লাগল।

এই ভাবেই রন্ধনগৃহে গেল সে। ভিক্ষুদের জন্য পায়স ও অপূপ নিজ হাতে প্রস্তুত করল। উডুম্বর, অলাবু, কুষ্মাণ্ড, বতিঙ্গণ সৌভঞ্জন বিভিন্ন শাক ও মেথিকা পলঙ্ক্য ইত্যাদি পর্ণ দিয়ে সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়েছে। উত্তম ঘৃতৌদন, তিলৌদন, দধি, মিষ্টান্ন। ঘৃত, নবনীত, গুড়, সুবৃহৎ সুমিষ্ট কদলী।

মিগার-পত্নী এসে আয়োজন দেখে প্রশংসা করলেন। বললেন— এই দশবলকে দেখতে আমি বড় উৎসুক রয়েছি বিসাখা ! ইনি মহারাজ প্রসেনজিৎকে পর্যন্ত বশ করেছেন।

মধ্যাহ্ন সমাগত। পুরনারীরা সবাই সমবেত। বিশাখা মিগার সেট্‌ঠিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। অবশেষে তার একজন দাস এসে জানাল, মিগারকে তাঁর গৃহের পেছন দিককার কাননে নিগ্‌গণ্ঠ শ্রমণদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখা গেছে। নিগ্‌গণ্ঠরা নাকি দলে দলে এসে মিগারকে তাঁর কর্মকক্ষ থেকে এক প্রকার তুলে নিয়ে গেছেন। দাসটি এসে বলল— প্রভু বললেন, বধূই নিমন্ত্রণ করে এনেছে। বধূর গৃহেই ভোজনের আয়োজন হয়েছে, বধূই ভিক্ষুদের আপ্যায়ন করুক। তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন।

এমন সময়ে ময়ূরী এসে সংবাদ দিল দেখো, দেখো, সমনেরা আসছেন ! ধনপালী ও কহ্না তাড়াতাড়ি শাঁখে ফুঁ দিল। বিশাখা তার গৃহের উন্মুক্ত সুসজ্জিত দ্বারদেশের সামনে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দাঁড়াল।

খর রোদে কাষায় চীবরগুলির ওপর যেন আগুন লেগেছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। শীতসকালের আকাশপটে ছড়িয়ে থাকা ময়ূখসমূহই কি সংহত হয়ে শ্রাবস্তীর পথে নামল নাকি ? পার হয়ে আসছে মিগার-গৃহের দ্বার, কানন, বিশাখার পরিমার্জিত, সজ্জিত প্রাঙ্গণে ঢুকবে বলে ? নাকি এগুলি সেই হব্যবাহন অগ্নির শিখা সমুদয়, যে অগ্নির সেবা করতে বিশাখা অস্বীকৃত হয়েছিল ? বিশাখা অদ্ভুত এক সম্মোহে, দৃষ্টিবিভ্রমে দেখে আগুনের শিখাগুলি কাঁপছে—লেলিহান নয়, তাই ভয় জাগায় না, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বলছে। দীপ্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে , ওই এবার কাননে প্রবেশ করলো। জ্বলছে, অথচ দাহ নেই তো ! চোখ ঝলসে দিল দীপ্তিতে, দাহে নয়। কানন পার হয়ে যখন তার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো তখন সে সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল, এ আগুন, শীতল আগুন। তার চিত্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোণগুলিতে প্রবিষ্ট হচ্ছে এ আগুনের শীতল ভাস্বর শান্তি। গুনগুন করে কোনও সূক্ত বলতে বলতে সারিবদ্ধভাবে আসছেন ওঁরা। প্রত্যেকের দেহদণ্ড কাষায় চীবরে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত, পরিষ্কার মুণ্ডিত মস্তকগুলি দেহদণ্ডের ওপর দীপের মতো শোভা পাচ্ছে, চলার কী অনুপম ছন্দ ! যেন কোনও অদৃশ্য মৃদঙ্গের তালে তাল মিলিয়ে ওঁরা আসছেন। আরও নিকটবর্তী হলে সে সেই মৃদঙ্গের ধ্বনিগুলি, বাণীগুলি শুনতে পেল :

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিসসং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তনহানং খয়মজ্ঝগা।

গৃহকারককে তোমার দেখেছ হে সমনগণ ! এ কথা সত্য ? অনেক জন্ম ঘুরে ঘুরে সন্ধান করেছ ! ব্যর্থ হয়েছ, তবু ছাড়োনি ? এই দেহগৃহের রচক ! কে সে ? সংস্কার, তৃষ্ণা সব খসে পড়ে গেছে ? গৃহকূট ভেঙে তবেই বিপুল শান্তি ? আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য কথা বলছো ? আমি যে এই গৃহকূটকেই ভালোবেসেছি, কষ্ট পাচ্ছি, একেই যে পরম বলে মনে করেছিলাম।

ধনপালী সোনার ভৃঙ্গার এগিয়ে দেয় —ভদ্দা ! ভদ্দা ! কী করছো ! আত্মবিস্মৃত হলে যে ! সমনদের অভ্যর্থনা করো !

এক আঘাতে দেহগৃহে ফিরে আসে বিশাখা, ধূলিলিপ্ত চরণগুলিতে জল ঢালে, জল ঢালে, জল ঢালে।

সখি, সখি— কে উচ্চারণ করছেন ? কে ?

প্রত্যেকেই। প্রত্যেকেই তো ! অথচ যেন মনে হচ্ছে একজন !

স্বস্তি উচ্চারণ করে ভিজে পায়ের চিহ্ন ফেলে ঢুকছেন, মিগার-পত্নী মার্জনী বস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসছেন। প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই সেবা নিচ্ছেন না সমনরা। স্মিত মুখে মার্জনী-বস্ত্র হাতে নিয়ে চরণ মুছে নিচ্ছেন...সখি, সখি।

—সব্বে সত্তা সুখিত্তা হোন্তু...

রৌদ্র-ভরা, মোহদিগ্ধ চোখ দুটি এতক্ষণে তোলে বিশাখা। তার সামনে দাঁড়িয়ে পঙ্‌ক্তির সর্বশেষ শ্রমণ। রূপলোকের দেবতারা যেখানে থাকেন সেখানে কি একটি পলাশবৃক্ষ আছে ? মহা মহীরুহ ? সেই পলাশই তবে আজ ফুটেছে এখানে। দেবকাননের দিব্য পলাশ ! কী মহান ! কী স্নিগ্ধ ! কী অপার করুণাময় চোখ দুটি ! সমস্ত হৃদয় জলের মতো তরল হয়ে টলটল করে তারপর স্রোত হয়ে ধুয়ে দিতে চায় ওই চরণ দুটি।

প্রবেশ করছেন উনি শ্লোকের শেষে পূর্ণচ্ছেদের মতো। বুঝি অনন্তযৌবন। দৃঢ়কায়, কিন্তু অসামান্য কোমল। সাত বছর বয়সে ওঁকে দেখেছিল। সেই স্মৃতি ছিল একটি অস্পষ্ট চিত্রের মতো। তাকে আজ পরিমার্জনা করে, উজ্জ্বল করে তার ভাগ্য তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। কে বলে পুরুষ রুক্ষ, কর্কশ, অমার্জিত ! এই তো পুরুষ। এই পুরুষের জন্যই কতকালের প্রতীক্ষা তোমার নারী ! বলিষ্ঠ অথচ রুক্ষ নয়, দৃষ্টিতে মহাপ্রেম মহাক্ষেম। কই রিরংসা তো নেই ! কী লাবণ্য অথচ কী দার্ঢ্য ! সঙ্গীরা বলেছিল না সিদ্ধার্থই সেই পুরুষ যিনি...

বিশাখা নিজেকে সবলে ভেতর থেকে আঘাত করে। এ কী চিত্তবিকার ! তার হাত পা কাঁপছে কেন ? অঙ্গে রোমহর্ষ। বিন্দু বিন্দু স্বেদজল কপালে। সে যেন স্বপ্নের ঘোরে। এবং কোথা থেকে কেউ ডাকছে 'ভদ্দা, ভদ্দা, শীঘ্র এসো, আপ্যায়ন করো, ভগবান তথাগত ও সমনদের ভোজনে আপ্যায়ন করো।' বনকপোতের ডাকের মতো দূরাগত উন্মনা আহ্বান।

কুমারী বিশাখা এগিয়ে যাচ্ছে। এখনও সে কুমারীই। দত্তা কিন্তু গৃহীতা নয়। সে পথ দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাচ্ছে না। আবিষ্টের মতো এগিয়ে যাচ্ছে। কহ্না আর ময়ূরী দু পাশ থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। তারা খুব সম্ভব বুঝতে পেরেছে তার বিহ্বল অবস্থা।

শ্রমণ দলের পুরোভাগে বুদ্ধ তথাগত। ওঁর হাতে জল ঢেলে দিতে হবে। তখন উনি এই ভোজন-আপ্যায়ন গ্রহণ করতে সম্মতি দেবেন। দান গ্রহণের এই-ই নিয়ম। হতবুদ্ধির মতো বিশাখা তথাগতর দিকে চায়, হাতে জল দেয়। উনি স্মিত মুখে গ্রহণ করেন। এ কি রহস্য হে শক্রদেব! সারির প্রথমেও তথাগত। শেষেও তথাগত? ইনি বলিষ্ঠ এক প্রাজ্ঞ পুরুষ, সিংহকটি। জ্বল জ্বল করছে দেহত্বক। মুণ্ডিত শিরের মধ্যভাগ অল্প উঁচু। ওরা বলেছিল, ওঁর মাথায় সহজাত উষ্ণীষ আছে। প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডল, যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে এমনি চম্পক গৌরাঙ্গ। দুই ভ্রূর মাঝখানে দুর্বাঘাসের মতো এক গুচ্ছ রোম। যেন তৃতীয় নয়নের অধিষ্ঠান বোঝাচ্ছে। যে নয়ন দিয়ে তিনি লোকাতীতকে প্রত্যক্ষ করেন, প্রত্যক্ষ করেন লক্ষ বছরের ইতিহাস, এবং আগামী সময়। প্রণত হল বিশাখা। পুরোভাগে যদি তথাগত তবে পঙ্‌ক্তির শেষে উনি কে? কাকে সে সিদ্ধার্থ ভেবেছিল? ইনি যদি দিব্য আগুন, উনি তবে দিব্য পলাশ। ইনি যদি পশুরাজ উনি তবে মৃগযূথপতি! বিশাখা মুখ নত করে রইল।

শ্রমণেরা ধীরে ধীরে বসছেন। বিশাখার গৃহ আলোময় হয়ে উঠছে। তথাগত শ্রমণদের পরিচয় দিচ্ছেন। মুখে প্রসন্ন মৃদু হাসি। বিসাখা— ইনি সারিপুত্ত। এঁকে ধম্মসেনাপতি বলা হয়। মহাপণ্ডিত। আর ইনি হলেন মোগ্‌গল্লান—মহাইদ্ধিমান। এঁরা তথাগতর অগ্‌গসাবক। এঁরা দুজনেই ধম্মের সবচেয়ে কুশলী প্রবক্তা। যদি তোমার বা পুর-ইত্থিদের কারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তথাগতকে প্রশ্ন করবে না বচ্চে, এঁদের দুজনকে প্রশ্ন করবে।

বয়স্থ দুই অগ্রশ্রাবক এবং অন্যরাও স্মিতমুখ। কৌতুকে উজ্জ্বল মুখ পুরনারীদের। তথাগত তাহলে অন্য সমনদের মতো গুরুগম্ভীর নন! লঘু আনন্দের হিল্লোল মৃদু স্বস্তিকর দখিনা বাতাসের মতো ছুঁয়ে যায় বিশাখার ভোজনশালা।

—ইনি তিস্‌স—বিশাখা চমকে ওঠে— লোকে এঁকে স্থূলতিসস্ বলে, অন্য সমনরা তাতে বাধা দিতে পারেন না। যা সচ্চ তাকে তো স্বীকার করতেই হবে। বলো? ইনি ভোজনপটু। তোমার আয়োজনের সদ্ব্যবহার করবেন। স্থূলতিস্স হাসছেন। কিন্তু তাঁকে ঠিক লোভী বলে মনে হচ্ছে না।

এবার নারীদের মধ্যে হিল্লোল আরও একটু স্পষ্ট হয়। যদিও সবাই কায়সংযমের কথা স্মরণে রাখে।

—ইনি কৌণ্ডিন্য। মৃগদায়ে তথাগতকে প্রথম আসন দিয়েছিলেন। না দিলে তথাগত আজও মৃগদায়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ইনি অর্হৎ যশ— অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। সত্যই যশস্বী।

ইনি উপালি —সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ বিনয়ধর হয়ে উঠছেন ক্রমশই।

ইনি ভিক্ষু অনঘ আর ইনি ভিক্ষু সুভদ্দ —এঁরা সংঘের প্রথম গান্ধার দেশীয় ভিক্ষু। এঁরা তথাগতর উদীচ্য-জয়ের স্মারক বলতে পারো বিসাখা।

আর ইনি। এঁকে দেখো বচ্চে। ইনি আনন্দ। নিজেকে সবার পেছনে রাখতে ভালোবাসেন। যদিও আদৌ পশ্চাৎপদ নন। বরং অসামান্য সুকৃতির অধিকারী। ভিক্ষুণীসংঘ এঁর ইচ্ছাতেই স্থাপিত হয়েছে। নারীদের দুঃখ ইনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন।

জ্যোতির্ময় শাক্যসিংহ আম্রবৃক্ষের তলায় সুরচিত মৃৎবেদীর ওপর থেকে মধুর গম্ভীরস্বরে কী উপদেশ দিলেন, বিশাখা তা জানল না। শুধু ধ্বনি শুনল। অপূর্ব কোনও মৃদঙ্গের মতো। সে জানল না, শাক্যসিংহ লক্ষ করেছেন গহপতি উপস্থিত নেই। তাঁর দেশনাকে তাই তিনি সচেতনভাবে করেছেন আরও মর্মস্পর্শী। পার্থিব জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকে তিনি দু হাতে ধরে ভালো করে ঝাঁকিয়ে এক একটি অয়োমুখ শায়কের মতো নিক্ষেপ করছেন এবং তা নির্ভুল লক্ষ্যে আবরণীর পেছনে বসা মিগার সেট্‌ঠির হৃদয়ে বিঁধে যাচ্ছে। তথাগত যেন ব্যক্তিগতভাবে জানেন মিগারের সব অপমানের দুঃখ, প্রতিযোগিতায় হারের দুঃখ, প্রিয়সঙ্গগুলি না পাওয়ার দুঃখ, অপ্রিয় সঙ্গের দুঃখ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনক্ষয় হওয়ার দুঃখ, বয়স বৃদ্ধির দুঃখ, জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রতি মুহূর্তের নিরন্তর সংগ্রামের দুঃখ, মনোমত সন্তান না হওয়ার দুঃখ, জীবনের সব ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ হওয়ার দুঃখ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেহত্বকের মতো জীবের গায়ে লেগে যায় এই সমস্ত দুঃখ। সম্মা দিট্‌ঠি, সম্মা সংকপ্পো, সম্মা বাচা, সম্মা কম্মন্তো, সম্মা আজীবো, সম্মা ব্যায়ামো, সম্মা সতি, সম্মা সমাধি— এই আটটি সম্যক্‌ পালন করলেই জীবচক্র থেকে মুক্তি পাবে। যেতে হবে না কৃচ্ছ্রের কঠিন সাধনে, শুধু অপরিমিত বিলাস ও ভোগের স্রোতে গা ভাসিও না, সচেতন থাকো, দান করো হে কৃপণ, ধন কুক্ষিগত করে রেখো না। দানই সেই সহায়ক যা তোমাকে নির্বাণলোকে নিয়ে যাবে।

বিশাখা দেখল, তার রুক্ষমূর্তি, কটুভাষী শ্বশুর অসহিষ্ণু মিগার সেট্‌ঠি বুদ্ধকে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করছেন। ও কি, তিনি যে এবার তাকিয়ে আছেন তারই দিকে। চোখে শ্রদ্ধা বিস্ময়— বিসাখা বিসাখা সুহ্না আমার, বালিকা বলে তোমাকে উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তুমিই এতদিনে মিগারের সত্যিকার দাহশান্তির কারণ হলে। মাতৃস্তনধারার মতো শান্তিধারায় তুমি আমায় স্নান করালে মা। আজ থেকে তুমি মিগারের মাতা। ভন্তে, আপনি কদিন নিত্য মিগারের ঘরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।

তথাগত স্মিতমুখে মৌন হয়ে রয়েছেন। হতাশ নির্গ্রন্থের দল ক্রুদ্ধ মুখে কানন থেকে চলে যাচ্ছে। তারা সারাক্ষণ অন্তরাল থেকে দেখেছে এই দ্বৈতযুদ্ধে কীভাবে নাতপুত্তকে পরাজিত করে সমন গোতম অনায়াসে জয়ী হলেন। মায়াবী। সত্য সত্যই ইন্দ্রজাল আয়ত্ত করেছে লোকটি।

উনি আসবেন? ওঁরা আসবেন। মিগারের গৃহে! বিশাখার গৃহে? বিশাখার আপন গৃহে? উনি? উনি আসবেন তো? ওই পরমানন্দ? কত কি বলার ছিল বিশাখার। হে শব্দদেব, ভাষা দাও, হে ইড়া, সরস্বতী, বাক্‌ হয়ে জিহ্বায় ভর করো। কিংবা এমন ভাষা দেবে কী? যা না বলেও বলতে পারে?

৯

যোতীয়, কাকবলীয়, জটিল, পুণ্ণক— এঁরা সবাই রাজগৃহে থাকেন। পঞ্চ মহাশ্রেষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র মেণ্ডকই বেছে নিয়েছেন ভদ্দিয়। তিনি ছাড়া আর চারজন আজ সমবেত হচ্ছেন রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী অহিপারকের গৃহে। অহিপারক অন্যদের চেয়ে ধনে ন্যূন হলে হবে কি, তিনি মগধের রাজসভার স্বীকৃত শ্রেষ্ঠী। রাজা ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ। তাঁর মর্যাদাই স্বতন্ত্র।

অহিপারকের বহির্বাটিতেই, কিন্তু তাঁর নিজস্ব নিভৃত কক্ষে আজ মৃদু কিন্তু উৎকৃষ্ট সুরার ব্যবস্থা হয়েছে। শূকর-বৎসের তুলতুলে মাংসখণ্ড সব ভাজা হয়েছে। ভাজা হয়েছে রক্তালুক বা রাঙালুর খণ্ডও। তিল ও উত্তম গুড় দিয়ে মোদকও প্রস্তুত হয়েছে। শ্রেষ্ঠীরা এলে তাঁদের যথাবিধি অভ্যর্থনা করে খাদ্য ও সুরা দাসীরা দিয়ে যাবে। তার পর আর কেউ যেন ব্যাঘাত না করে, সেই মতোই ব্যবস্থা করেছেন অহিপারক। শ্রেষ্ঠী-জ্যেষ্ঠক হলেন যোতীয়। ইনি রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীদের মুখপাত্র তো বটেই, সারা মগধে বিভিন্ন স্থানে যত ছোট বড় বণিক আছে, তারা নিজেদের নগরী অথবা গ্রামে ক্ষুদ্রতর বণিক সঙ্ঘ করেছে। সেই বণিক সঙ্ঘগুলি আবার রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী-জ্যেষ্ঠকের কাছে তাদের যা-কিছু অসুবিধা-আবেদন নিবেদন জানায়। মগধের চার শ্রেষ্ঠী এবং শ্রেষ্ঠী অহিপারক আজ এই জাতীয় কোনও বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসবেন। আবেদনগুলি স্বভাবতই এসেছে যোতীয়র কাছে, তিনি জানিয়েছেন অন্যদের। তাঁর গৃহেই সভা বসত। কিন্তু অহিপারক কোনও বিশেষ কারণে নিজ গৃহেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এঁদের।

সময়টা সন্ধ্যা। দীপদণ্ডগুলি জ্বললেও, বাতাসের অভাবে সান্ধ্য কুয়াশা সূক্ষ্ম লূতাতন্তুর মতো নগরীর ওপরে বিস্তৃত রয়েছে। সন্ধ্যা আর একটু গাঢ় হলেই সরে যাবে। এখন নগরীর সব রন্ধনশালায় কাঠের আগুন জ্বালানো হয়েছে উনানগুলিতে। সেই ধোঁয়াও কুয়াশায় অংশ নিয়েছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীতের জন্য লোক চলাচল ধীরে ধীরে অল্প হয়ে যাচ্ছে। বেরিয়েছে তিন শ্রেণীর মানুষ। দাস-দাসীরা, তাদের কোনও-না-কোনও কাজের কারণে ; বণিক ও পর্ণিকরা, তাদের নানাবিধ আপণ ছড়ানো রাজগৃহের হাটে, না বেরোলে তাদের চলে না। আর বেরিয়েছে সেইসব প্রমোদ-বিলাসীরা যাদের প্রমোদ-তৃষ্ণার আকর্ষণ দুর্বার। বেরিয়েছে সুরালুব্ধ নাগরিক, সারা দিনের পর শৌণ্ডিকগৃহে না গেলে এদের অন্ন জীর্ণ হয় না। গণিকাসক্ত নাগরেরাও বেরিয়েছে, কেউ একা, কেউ সদলে। নৃত্য গীত বাদন, গণিকার সঙ্গে রসালাপ— এ তাদের নিত্যকৃত্য। গৃহে প্রচুর সঞ্চিত ধন, গ্রামাঞ্চলের শস্যক্ষেত্র থেকে এসে যাচ্ছে। পরিশ্রম নেই, কায়ক্লেশ নেই। সারা দিন গৃহের বাইরের কক্ষে সেই সম্পদের গোনাগাঁথা করে। কিছু মল্লক্রীড়া বা নিতান্ত বালসুলভ শস্ত্র-শস্ত্র খেলা খেলে, সন্ধ্যা হতেই এরা বেরিয়ে পড়ে। এদের মিলিত হবার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা হল গোষ্ঠী। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে রাজগৃহের ধনী, সচ্ছল, নানা বিষয়ে আগ্রহী পুরুষেরা মিলিত হয়ে বহুপ্রকার আলোচনায় কাল কাটায়। পাশা খেলা হয়, তবে পণ রেখে পাশা খেলার আরও ভালো ব্যবস্থা সুরাগৃহগুলিতে। সেখানে সুরা পরিবেশন করবার জন্য অধিকাংশ সুরাবণিকই নিয়োগ করে সুন্দরী দাসীদের। কখনও কখনও সুরাবণিকের নিজের কন্যা বা কন্যাস্থানীয়রাও আপ্যায়ন করে ক্রেতাদের। আর গণিকাদের গৃহে গেলে সর্ববিধ প্রমোদের সুপ্রচুর আয়োজন পাওয়া যায়। সুরা, চারুকলা, নারী, নানান উচ্চশ্রেণীর বিদ্যা ও জ্ঞানের আদানপ্রদান।

রাজগৃহ যখন প্রথম গড়ে উঠেছিল তখন এ নগরের গণিকাসম্পদ বলবার মতো কিছু ছিল না। অতি তরুণ রাজা তখন রাজ্য বিস্তার, অর্থাৎ সংগ্রাম এবং নিজের রাজ্যে সর্বপ্রকার প্রজার সুখবিধান করতেই ব্যস্ত ছিলেন। ধনসম্পদে ঋদ্ধ শ্রেষ্ঠীশক্তি সেই সময়ে রাজার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেয়। সার্থবাহ অর্থাৎ বণিক দলের নেতারা বিভিন্ন জনপদে ঘুরে ঘুরে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসতেন। কোন্ রাজ্যের কী বিশেষত্ব, কোথায় কোন্ কারণে বণিক সমাগম অধিক হয়, এসবের চতুর বিশ্লেষণ একমাত্র তাঁরাই করতে পারতেন। দ্যোতীয়, জটিল এঁরা তাই-ই করেছিলেন— রাজগৃহে নদী না থাকায় তাঁরা পাটলি গ্রামটিকে বাণিজ্যদ্বার বলে ব্যবহার করতেন, এখনও করে থাকেন। এখানে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহর সঙ্গম। পাটলি গ্রাম বারাণসীর মতো পট্টন না হলেও, অতিশয় সমৃদ্ধ একটি নিগম গ্রাম। এঁরাই রাজাকে পরামর্শ দেন বৈশালীর মতো রাজনটীর প্রথা প্রবর্তন করতে। এই নটীকে রাষ্ট্রের ব্যয়ে শিক্ষিত করা হবে। এর আকর্ষণে পাটলিতে পণ্য নামিয়ে চলে যাবে না বণিকরা। একটু পথ এগিয়ে রাজগৃহে আসবে। আর কে না জানে, বণিকদের চলাচলই যে-কোনও নগরীর, যে-কোনও রাজ্যের সমৃদ্ধির উৎস। শালবতী নামে এক সুন্দরীকে অতঃপর নিয়োগ করা হল। তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে শালবতী হলেন নৃত্যগীত ও অন্যান্য গুণে অলঙ্কৃতা এক অপরূপা গণিকা। তাঁর জন্য তাঁর মা দাবি করলেন এক রাত্রির জন্য সহস্র কার্ষাপণ। বৈশালীর গণিকা-শ্রেষ্ঠা আম্রপালীর দক্ষিণা ছিল তার অর্ধেক। এই নিয়ে রাজগৃহ ও বৈশালীর মধ্যে তীব্র মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। যাই হোক, এখন এই শালবতী বা সালাবতী ছাড়াও রাজগৃহে আরও তরুণী সুন্দরী গণিকাদের বসবাস হয়েছে। সকলে শালবতীর মতো উচ্চমূল্যের এবং রাজা ও রাজপুরুষ-ভোগ্যা নন। নানা শ্রেণীর পুরুষের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রাজগৃহে প্রবর্তন করেছেন শ্রেষ্ঠীরা। বা বলা যায় তাঁদের প্রথম উদ্যোগের পর আপনা-আপনি এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কেননা, নগরী, বিশেষত রাজধানীতেই তো যত ধনী, অবসরপ্রাপ্ত যুবাপুরুষদের ভিড়। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরাও অবশ্য বাদ যান না। মগধের বিভিন্ন স্থান থেকে, সংলগ্ন রাজ্যগুলি থেকেও এই গণিকাদের আকর্ষণে আসে বহু লোক। বাণিজ্য রমরম করতে থাকে। সর্বপ্রকার বাণিজ্য। আবসথাগার, আরাম, সুরাগৃহ, বহুবিধ বিলাসদ্রব্য, বসন, অলঙ্কার, ভৈষজ, খাদ্যদ্রব্য। শ্রেষ্ঠীরা যথার্থই বলতে পারেন— এই নগরীর প্রতিষ্ঠার, স্থান নির্বাচনের, আরক্ষার গৌরব যদি মহারাজ বিম্বিসারের, নগর-পরিকল্পনার গৌরব যদি স্থপতি মহাগোবিন্দর, তবে এর সমৃদ্ধি এবং সমারোহের গৌরব নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠীদের। তবে তাঁরা এসব কথা প্রকাশ্যে বলেন না। ভাবুক না রাজারা, ক্ষত্রিয়রা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবাতে তো কোনও দোষ নেই! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-পুরোহিত এঁরাও নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবতে থাকুন। ক্ষত্রিয়রা বা সাধারণভাবে সব শস্ত্রধারী যোদ্ধাই, সে ক্ষত্রিয়ই হোক, ব্রাহ্মণই হোক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রামে প্রাণ দিয়েও ভূমি-ধনসম্পদ রক্ষা করবে। তাদের আত্মশ্লাঘার প্রসন্নতায় স্থিত রাখা ভালো। পণ্ডিত-পুরোহিত-আচার্যরাও বহু ক্লেশ করে ধরে রেখেছেন জাতির সঞ্চিত বিদ্যা। এঁরাও দেশের গৌরব। কিন্তু প্রকৃত শক্তির স্বাদ পাচ্ছেন এখন শ্রেষ্ঠীরা।

প্রধানত আজ এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু এই-ই। এই নবলব্ধ শক্তি কীভাবে আরও বাড়ানো যায়, কীভাবে এ শক্তির যথার্থ প্রয়োগ করা যায়— এ নিয়েই এঁরা চিন্তিত।

যোতীয় এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর কেশ তো শুভ্র বটেই, শ্মশ্রুগুলিও পেকে গেছে। তার ওপর তিনি সিংহভ্রূ। যোতীয়র গাত্রবর্ণ তামাটে। তিনি শ্বেত বস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু পরেন না। কপালে তিন-চারটি স্পষ্ট বলিরেখা, হাসলে চোখ এবং ওষ্ঠাধরের পাশে কুঞ্চন দেখা যায়। কিন্তু নাতিদীর্ঘ দেহটি বলিষ্ঠ, দেহত্বক এখনও লোল হয়নি। উর্ণার আচ্ছাদনে তিনি ভালো করে ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢেকেছেন, পায়ে কোমল মৃগচর্মের উপানৎ। হঠাৎ তাঁকে দেখলে সম্ভ্রম হয়। কিন্তু শ্বেত স্থূল ভ্রূর তলায় তাঁর চোখ দুটি অতিশয় ধূর্ত এবং দর্পী। তিনি অতি স্থূল বা অতি কৃশ নন।

যোতীয় রথ থেকে নামতেই, অহিপারকের ভৃতকরা তাঁকে সাহায্য করবার জন্য সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলো। যোতীয় হাতের যষ্টিটি আস্ফালন করে বললেন, 'সাহায্যের প্রয়োজন নেই, দূরে যাও'— তাঁর বলবার ভঙ্গি ঈষৎ রুক্ষ।

অহিপারকের মুখ্য লেখক বসু অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চোখের ইঙ্গিতে ভৃতকদের নিরস্ত করে শ্রেষ্ঠীকে পথ দেখিয়ে মন্ত্রণাগৃহে নিয়ে গেলেন।

প্রশস্ত মণিকুট্টিমের ওপর বসবার জন্য শয্যা বিছানো। তার ওপর ইতস্তত উপাধান। কতকগুলি ত্রিপদীও ইতস্তত ছড়ানো আছে। যোতীয় আসতেই অন্যরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

শ্রেষ্ঠী কাকবলীয় একটি খর্বকায় বলিষ্ঠ প্রৌঢ়। তাঁর পরনে ধূসর বর্ণের বসন। শ্মশ্রু গুম্ফ দুটিতেই তামাটে ভাব। কিছু কিছু পক্ব কেশও আছে। ইনি বিরলকেশ।

ইনি যদি বিরলকেশ হন তো জটিল একেবারেই কেশহীন। মাথায় একটি সুগোল ইন্দ্রলুপ্ত। সেটির অস্তিত্ব ইনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। সর্বদাই হাত বোলান। অল্প শ্মশ্রু ও গুম্ফ পরিষ্কার ছাঁটা। ইনি কিছুটা স্থূল এবং শিথিলকায়। গৌরবর্ণ শরীরটি যে ভোগীর, তা দেখলেই বোঝা যায়। এঁর পরনের বস্ত্রে গোরোচনার চিত্র করা। উত্তরীয়টি হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত।

পূণ্যক মানুষটি অতিশয় দীর্ঘকায় এবং শীর্ণ। সুগৌর, প্রায় যুবক এই শ্রেষ্ঠী পিতার উত্তরাধিকারকে অতি অল্প বয়সেই শতগুণ বাড়িয়েছেন শোনা যায়। ইনিই শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। লোকে বলে, সম্পদগুলি ইনি স্বর্ণপিণ্ডে পরিবর্তিত করে ভিন্ন ভিন্ন গুপ্ত স্থানে পেটিকায় তাম্রকলসে রেখে দেন। অতি ব্যয়ের ভয়ে ভালো করে খান না। পরিজনদের তো দেনই না। ব্যয়ের ভয়েই এঁর গৃহে একটি মাত্র পত্নী। এঁর পুত্ররা নাকি খেলার ছলে শ্রেষ্ঠীর উদ্যানে গুপ্তধনের কলসগুলি সন্ধান করে বেড়ায়। সখাদের কাছে বলে, একটি কলস বা পেটিকার সন্ধান পেলেই চম্পট দেবে। পিতৃগৃহের খাদ্য বা বলা যায় অখাদ্য তাদের নাকি আর সহ্য হচ্ছে না। একটি মাত্রই কন্যা, তার বিবাহ দিয়েছেন অহিপারকের এক পুত্রের সঙ্গে। এই কন্যা মাধবিকা। আজ সাত বছর শ্বশুর গৃহে এসেছে, পিতার গৃহে একেবারেই যেতে চায় না। বলে, 'পিতা কৃপণ, কন্যা জামাতা গেলে ব্যয়ের ভয়ে তাঁর বুক ফেটে যাবে। ভাইগুলি দুঃশীল, গেলেই বলবে— কয়েক কহাপন দিয়ে যাও জেট্‌ঠা বড় প্রয়োজন আছে।' একমাত্র মাতাকে দেখতে এবং তাঁর জন্য উপহার নিয়ে যেতেই মাধবিকা পিতৃগৃহে মধ্যে মধ্যে যায়। তার নিয়ে যাওয়া কাসিক দুকূল দেখে শ্রেষ্ঠী পূণ্যক শিহরিত হন— কী করেছ কন্যা, এত ব্যয় করেছ ? অহিপারক আমার চেয়ে অনেক ধনী তা জানি, তাই বলে তার ধন এভাবে ক্ষয় করতে তোমার বাধে না !

মাধবিকা মনে মনে হেসে বলে, 'এ ধন সেট্‌ঠির নয়, পিতা, তাঁর পুত্রের।'

—জামাতাকে এ ভাবে ধনহীন করে দিচ্ছো ? তুমি তো দেখছি পূণ্যকের অপবাদের কারণ হবে।

মাধবিকা এবার বিরক্ত হয়ে বলে, 'অপবাদ হয় আমার হবে। আপনার কী ? আপনার জামাতা বারাণসী থেকে এই বস্ত্র মায়ের জন্য বিশেষ করে এনেছেন।'

এইবার পূণ্যকের মুখ দিয়ে সত্য কথা বেরোয়, 'এ প্রকার বস্ত্র দিতে থাকলে, তোমার মা তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কাছ থেকেও এরূপ দাবি করবেন, পুত্রগুলিও প্রভাবিত হবে। এর পর পুত্রগুলির বিবাহ দিতে হবে, তখন তাদের বধূরা..., তিনি আর বলতে পারেন না। তাঁর হৃৎকম্প হচ্ছে।

পুণ্যকের পত্নী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে সাশ্রু নয়নে কন্যাকে বলেন, 'সারা জীবনই তো রুক্ষ বসন পরে কাটলো, মাধবী তুই এ বসন নিয়ে যা, আমার চাই না।'

মাধবিকা তখন বড় রাগ করে। সে পিতাকে বলে, 'আমি মাতাকে নিয়ে বারাণসী চলে যাবো, তখন আপনার গৃহে দাসীবৃত্তি কে করে, আমি দেখব।'

পুণ্যক গতিক ভালো নয় দেখে স্থানত্যাগ করেন।

শ্রেষ্ঠী অহিপারক এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন। অধিক কথা বলেন না। যখন বলেন, একটি মর্যাদাবোধ তাঁকে ঘিরে থাকে। রাজসভায় তাঁর নিত্য যাতায়াত। মহারাজ, অন্যান্য রাজপুরুষ ও রাজকুমারদের সঙ্গে নিত্য ওঠাবসা। তাঁর মার্জিত আচরণ ও স্বভাবের জন্যই তিনি রাজশ্রেষ্ঠীর পদ পেয়েছেন, না রাজশ্রেষ্ঠী বলেই এমন পরিমার্জিত হয়ে উঠেছেন, বলা কঠিন।

অহিপারককে হঠাৎ দেখলে অক্ষত্রিয় মনে হয় না। যদিও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের মধ্যে তেমন কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। তবে ক্ষত্রিয় পুরুষরা ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষায় অনেক সময় ব্যয় করেন বলে তাঁদের আকৃতিতে একটি সুগঠিত সুঠাম পৌরুষের ব্যঞ্জনা থাকে। শ্রেষ্ঠী অহিপারক, মহারাজ বিম্বিসারের সমবয়সী হবেন। তিনি নিয়মিত শস্ত্রচর্চা করেন, ব্যায়াম করেন। তাঁর গৃহে একটি মল্লভূমি আছে। পুত্র পরিজনদেরও তিনি বলশালী, শাস্ত্রনিপুণ ও সুদেহী হতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। যদিও তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মাধবিকার স্বামী উদয় কিছুটা কৃশকায়।

অহিপারক সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন জ্যেষ্ঠ যোতীয়কে।

—আসুন আসুন সেট্‌ঠি। আপনার জন্যই আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি। সংবাদ সব ভালো তো ?

সতর্ক চোখে চারিদিকে তাকিয়ে যোতীয় বললেন, 'ভালো মনে করলেই ভালো। কী বলো কাকবলীয় ?'

অহিপারকের ইঙ্গিতে বসু চলে গেল। অহিপারক দ্বারটি বন্ধ করতে করতে মুখ বাড়িয়ে বসুকে যথাসময়ে সুরা ও খাদ্য পরিবেশন করার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

যোতীয় বললেন, 'আজ এত সাবধানতা ? অহিপারক, আজ কি আমরা পুন্নকের সুবন্নকলসগুলির সংখ্যা জানতে পারছি, না কি ?'

অহিপারকের মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। কাকবলীয় বললেন, 'পুন্নকের স্বর্ণকলস ? কী যে বলেন, সেট্‌ঠি জেট্‌ঠক। পুন্নকের ঘরে কয়েকটি মাটির কলস ভিন্ন আর কিছুই নেই। তার ভিতরে আবার ভস্ম ভরা।'

সকলের পরিমিত হাসির মধ্যে পুন্নকের ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গেল, 'ধনীরা সর্বদাই অল্পধন সেট্‌ঠিকে নিয়ে যথেচ্ছ কৌতুক করে থাকেন, কী আর বলবো ! এ অপমান আমার সহ্যই হয়ে গেছে।'

যোতীয় নিজেকে সংবরণ করে নিলেন। ভালোভাবে বসে, মেরুদণ্ড সোজা করে, তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে দেওয়া উপাধানটি জটিলের দিকে সরিয়ে দিলেন। বললেন, 'যোতীয় তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় হতে পারে বিলাসের অভ্যাসে বড় নয়। দৈহিক ক্ষমতায়ও ছোট নয়।'

অহিপারক বললেন, 'মহা সেট্‌ঠি। গোট্‌ঠিগুলির সংবাদ কী ?'

'সেটাই তো কথা', যোতীয় গলার স্বর মৃদু করে বললেন, 'গোট্‌ঠীগুলি বলছে, মগধের মধ্যে বাণিজ্যের কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু কোসলে বড় পথদস্যু জলদস্যু। কোসল ও লিচ্ছবি রাজ্যে যথেচ্ছ শুল্ক দাবি করে রাজপুরুষেরা। কোসল ছাড়িয়ে বংস রাজ্যে অবন্তী, কুরু-পাঞ্চালে গেলে তো কথাই নেই ! শুল্ক দিতে দিতে সার্থবাহরা উত্ত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং মুদ্রার কোনও মান না থাকায় তারা বিনিময়ে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময়েই তাদের মনে হচ্ছে, তারা প্রবঞ্চিত হচ্ছে, ক্রেতারাও বহু ক্ষেত্রে তাদের প্রবঞ্চক বলছে। একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তারা এর সমাধান চায়। স্বভাবত এবং ন্যায়ত আমাদেরই কাছ থেকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকবলীয় বললেন, 'এরা তো তবু মগধের মধ্যে নিরাপদ। আমাদের তরুণ বয়সের কথা মনে করুন ভদ্দ! কীভাবে, কত বিপদ, বন্য জন্তু, বন্য মানুষ, নরখাদক, দস্যু, চোর, ভিন্ন ভিন্ন দেশের চোর, রাজপুরুষ এদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করে করে, তবে আজ ধনশালী হয়েছি। সংগ্রাম সবাই করে। ক্ষত্রিয় যোদ্ধা একভাবে, আমরা বণিকরা আরেকভাবে।'

জটিল বললেন, 'নিশ্চয়। আমরা যখন সার্থবাহ ছিলাম, সঙ্গে বীরপুরুষ স্থলনিয়ামক নিয়েছি, আরও যোদ্ধা নিয়েছি। কিন্তু শুল্ক ও রাজপুরুষদের অন্যায় লোভ তো আর নিবারণ করতে পারিনি। এরা আমাদের কাছ থেকে কী আশা করে?'

পুণ্যক করুণ মুখে বললেন, 'এইসব কারণেই তো আমি আর বৈদেশিক বাণিজ্যে ধন নিয়োগ করি না। কুসীদিন বলে অপমান করে লোকে, কিন্তু শুল্ক দিয়ে দিয়ে আর চোর দস্যুর হাতে নিজের ধন তুলে দিয়ে নিঃস্ব হবার কোনও সাধ নেই আমার।'

অহিপারক ধৈর্য ধরে সবার কথা শুনছিলেন। এবার ধীরে ধীরে বললেন, 'মহাসেট্‌ঠি যোতীয়, জেট্‌ঠ জটিল, ভদ্দ কাকবলীয়, ভাই পুন্নক— আমরা কি ভাবিনি মগধ রাজ্য আরও বিস্তৃত হবে? মহারাজ বিম্বিসার যখন অঙ্গদেশ জয় করলেন তখন আমাদের ধনক্ষয় অল্প হয়নি। পরাজয়ের বিভীষিকাও যে সামনে ছিল না তা নয়, কিন্তু আমরা মহারাজের রাজ্য বিস্তারে উৎসাহিত হয়েছিলাম। হইনি কি?'

যোতীয় কুটিল চোখে চেয়ে বললেন, 'অবশ্যই। আমরা ভেবেছিলাম, আজ অঙ্গ-মগধ এক রাজ্য হল। এর পর অঙ্গ-মগধ-কোসল-বেসালী এক রাজ্য হবে। এই বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া মহারাজ বিম্বিসারের পক্ষে এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু হল না। কোসল, বেসালী উভয়ের সঙ্গেই মৈত্রী স্থাপন করলেন তিনি। এ কি তোমাদের অভিপ্রেত ছিল?'

জটিল বললেন, 'মৈত্রীই তো ভালো মহাসেট্‌ঠি। যুদ্ধ হলেই সব কিছু অস্থির হয়ে যায়। জীবনটা তো ভোগের জন্যই। তা দীর্ঘদিন যুদ্ধবিগ্রহ চললে কি আর নিশ্চিন্তে আনন্দ করা যায়?'

পুন্নক বললেন, 'ঠিক। একেবারে ঠিক। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে। বৃহৎ সংসার সব। আয়-ব্যয়ে সমতা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

যোতীয় বললেন, 'মহারাজ বিম্বিসার যখন অঙ্গদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তখন তোমার কত বয়স পুন্নক? তখন তোমার পিতা মহাসেট্‌ঠি অনঙ্গ তোমাকে বাণিজ্যযাত্রায় উত্তরে পাঠিয়েছিলেন। সে সময়ে তুমি অনেক উপার্জন করেছ। বলি তোমার কোনও বাধা-বিপত্তি হয়েছে? তোমার পিতার বৃহৎ সংসার চালিয়েও এত সঞ্চয় হয়েছিল যে তুমি মাত্র কয়েক বছর বাণিজ্যযাত্রা করেই বসে গেলে। তখন মগধ এত সংহত ছিল না। খুদ্দ খুদ্দ রাজ্যপাট। এখন মগধের শৃঙ্খলা শাসন ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। রাজগহের ভেতরে তোমার কিসের অসুবিধা? এসব অর্থহীন শঙ্কাকে প্রশ্রয় দিও না। অহিপারক, মহারাজ বীরপুরুষ, কূটবুদ্ধিও ধরেন। লিচ্ছবি দেশে তাঁর সম্পর্ক ছেটক রাজার সঙ্গে, অন্য গণরাজাগুলি তো আর তাঁর শ্বশুর নয়। গঙ্গার উত্তরে রাজ্য বাড়াতে তাঁকে কে বাধা দিচ্ছে? ওদিকে রয়েছে সাক্করা, মল্লরা, এগুলি তো পুরোপুরিই প্রায় কৃষিকার্য নিয়ে থাকে। এগুলিকে নিজ রাজ্যভুক্ত করতে বাধা কি?'

অহিপারক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সাক্কদের আক্রমণ করার তো প্রশ্নই উঠছে না। ভগবান বুদ্ধ সাক্কজাতীয় না? ওঁদের বিরুদ্ধে মহারাজ কখনই অস্ত্র তুলবেন না।'

'এই এক মহাসমস্যা হয়েছে', যোতীয় বলে উঠলেন, 'রাজা যুদ্ধ করবে, আচার্য শিক্ষা দেবে, সেট্‌ঠি ধন উপার্জন করবে, কস্‌সক শস্য ফলাবে, নারী পুত্রোৎপাদন করবে, দাস সেবা করবে— সমাজ এভাবেই গঠিত হয়েছে, এভাবেই স্থিতি পেয়েছে, এই নিয়মশৃঙ্খলা অনুসরণ করেই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে সমাজের। এই নিয়মকে হঠাৎ লণ্ডভণ্ড করে দেবার কি প্রয়োজন পড়ল? করুক না রাজা তপস্যা। সন্ধান করুক অতীন্দ্রিয় আনন্দ, তার একটা সময় আছে। মহারাজ যদি রক্তপাতে বিতৃষ্ণা বোধ করেন, বিবাদে অসুখী হন তো...'

'তো কী?' অহিপারক জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে শ্রেষ্ঠী যোতীয় বললেন, 'অহিপারক, তুমি তো শুধু শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগরসেট্‌ঠি হওনি বাপা। বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ মানুষ বলে অনেক কথা, অনেক মত অনেক সংশয়ের কথা বলে ফেলি। বলবার অধিকার আছে বলেও মনে করি। পদাধিকার। মগধের যতেক বণিকসেট্‌ঠি তাদের সুখ-দুঃখের অভাব-অভিযোগের কথাগুলি আমাকেই শোনায়, আমার থেকেই তাদের প্রতিকার আশা করে কি না।'

অহিপারক হেসে বললেন, 'সত্য কথা। অবশ্যই বলবেন।'

—কিন্তু তুমি তো আর শুধু শুধু নগরসেট্‌ঠি হও নাই।

—ও। আপনি বলছেন আমি এ সব কথা রাজার কর্ণগোচর করব?

—আমি কিছুই বলছি না। বলছ তুমি।

—শুনুন মহাসেট্‌ঠি রাজবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে আমি যেমন এ সমস্যার একদিক জানি, আপনিও আপনার পদাধিকারবলে সেই সমস্যার অন্য দিক জানেন। আলোচনা প্রয়োজন বলেই আপনাদের সাদরে ডেকে পাঠিয়েছি। আমাদের সেট্‌ঠিদের স্বার্থ এক। সেই সেট্‌ঠি সংঘ ভেদ করবার উদ্দেশ্য থাকলে...'

কাকবলীয় তাঁর গুম্ফের কেশগুলি টানতে টানতে বললেন, 'আহা হা হা, এ তো স্বাভাবিক সতর্কতা ভদ্র অহিপারক। মহাসেট্‌ঠি আপনিই বা এত সন্দেহাকুল হচ্ছেন কেন?'

এই সময়ে দ্বারে মৃদু করাঘাত হল।

অহিপারক শ্রেষ্ঠীদের সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে অবশেষে যোতীয়র ওপর তাঁর দৃষ্টি স্থির করলেন, বললেন, 'আমার আজকের আর এক অতিথিকে এই সভায় উপস্থিত করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি মহাসেট্‌ঠি।'

যোতীয় একটু ক্ষুব্ধ হয়েই যেন বলে উঠলেন, 'গৃহ তোমার, আয়ুষ্মান অহিপারক, তুমি যে-কোনও অতিথিকে যে-কোনও সভায় উপস্থিত করতে পারো। অনুমতির প্রয়োজন হবে কেন? তবে আমাদের সভার কাজ আর হবে না।'

অহিপারক বললেন, 'ক্ষুব্ধ হবেন না মহাসেট্‌ঠি। এই অতিথির কথা শুনলেই স্থির করতে পারবেন সভার কাজ এগোবে না স্থগিত থাকবে।'

তিনি দ্বার খুললেন। যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখে উপস্থিত সবাই চমকে উঠলেন। পুরুষটি অহিপারকের কাছাকাছি বয়সের হবেন। তাম্রাভ গৌরবর্ণ। মুখশ্রীর মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই যাতে তাঁর সম্পর্কে কারও কোনও ধারণা হতে পারে। নাসা, চক্ষু, ওষ্ঠাধর সবই অতিশয় সাধারণ। রাজগৃহের পথে ঘুরলে এই ধরনের আকৃতি অনেক দেখা যেতে পারে। মাথায় এঁর যথেষ্ট কৃষ্ণ কেশ, কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্ত্র ও উত্তরীয় পরনে। তিনি এসেই কটি থেকে সমস্ত শরীর সামনে নত করে সবাইকে নমস্কার করলেন। তারপর গৃহস্বামীর অনুমতি নিয়ে বসলেন।

অহিপারক বললেন, 'রাজসচিব বস্‌সকারের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিই।'

পুণ্যক হঠাৎ বলে উঠলেন, 'সেট্‌ঠি আমি কি একটু ভেতরে যেতে পারি? প্রয়োজন পড়েছে।' পুণ্যক অবশ্য অহিপারকের অনুমতির অপেক্ষা করলেন না, বস্‌সকারের পেছন দিয়ে দ্বারপথে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জটিল তাঁর সুগোল ইন্দ্রলুপ্তের ওপর থেকে হাতটা নামিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমাদের আর নূতন করে পরিচয় করাবার প্রয়োজন কী? ওঁকে আমরা সবাই চিনি।'

দ্বারে আবার শব্দ হল। অহিপারক উঠে দ্বার খুললেন। সবাই ভেবেছিলেন পুণ্যক। কিন্তু পুণ্যক নয়। দাসীরা সুদৃশ্য ভৃঙ্গার বয়ে আনছে দেখা গেল। তক্ষিত দারুফলকের ওপর খাদ্যসম্ভার নিয়ে প্রবেশ করছে দাসেরা। সব কিছু রাখা হলে, অহিপারকের ইঙ্গিতে দাস-দাসীরা চলে গেল। অহিপারক বসুকে নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'পুণ্যকভদ্র কোথায় গেলেন?'

বসু ঈষৎ হেসে বলল, 'তিনি একেবারে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন, আমায় বলে গেলেন বৈবাহিক যেন আমাকে আর সভায় না ডাকেন, আমার অসুখ বোধ হচ্ছে।'

অহিপারক ঘরে ঢুকে বললেন, 'আপনারা আলাপ করুন। আমি একটু আসছি। বসু তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খজ্জুগুলি পরিবেশন করে যাও।'

প্রথমে তাঁর এ পরিকল্পনা ছিল না। বসু যদিও তাঁর নিজের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। কিন্তু মহাসেট্‌ঠি যোতীয়র সদা-সন্দিগ্ধ চরিত্রের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। অন্যেরাও গোপনতা চাইবেন। তাই তিনি বসুকে যথাসাধ্য দূরে রাখতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতিতে আপ্যায়নের ভার গৃহস্বামীর পক্ষ থেকে কাউকে তো নিতেই হয়!

পুণ্যকের সন্ধানে অন্তঃপুরের ভেতরে অবশ্য তাঁকে যেতে হল না। দুই পুরের মধ্যবর্তী কাননে আম্রবৃক্ষের তলায় পাষাণবেদীতেই পুণ্যকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল।

পুণ্যক শ্রেষ্ঠী বেদীর ওপর বসে একটি চরণ দোলাতে দোলাতে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে গাছের মধ্যে কী নিরীক্ষণ করছিলেন তিনিই জানেন। অহিপারক ব্যস্ত হয়ে সেখানে এসে বললেন, 'কী হল পুণ্যকভদ্র সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন যে!'

পুণ্যক গম্ভীরভাবে বললেন, 'বিরক্ত করবেন না সেট্‌ঠি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি এখন।'

—কী কাজ? কী এমন গুরুত্ব তার যে সভা উপেক্ষা করছেন।

অহিপারক শুধু বিস্মিতই নন, বিরক্তও বটে। তাঁর এই কুটুম্বটি তাঁকে মাঝে মাঝে এমন বিপদে ফেলেন! তাঁর মর্যাদা রক্ষা হয় না।

—আপনার এই অম্ববৃক্ষটির পাতা গুনছি। এই কাজ— পুণ্যক একইভাবে বললেন।

—তার অর্থ? সেট্‌ঠি পুন্নক, আপনি একজন ধনবান নাগরিক, সেট্‌ঠিকুলের স্তম্ভ, তার ওপরে আমার বৈবাহিক...

—হ্যাঁ, আর সেই জন্যই আপনি আমাকে ধ্বংস করবার ব্যবস্থা করেছেন। বাঃ। সাধু সাধু সেট্‌ঠি অহিপারক।

—অর্থ কী এসব কথার?

—আপনার আচরণের অর্থটাই আমাকে আগে বুঝিয়ে দিন! সামান্য কুসীদজীবী বণিক আমি। মহাসেট্‌ঠি স্নেহ করেন বলে আপনারা নিজেদের সমিতিতে স্থান দিয়েছেন। নিজের সামান্য অবস্থা নিয়েই তো আমি সন্তুষ্ট আছি। কই কারও গৃহে তো চৌর্যবৃত্তি করতে যাইনি! বড় বড় পদ, মর্যাদা, এসবের ওপরেও তো কোনও লোভ করিনি।

শ্রেষ্ঠী অহিপারক হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

পুণ্যক বললেন, 'ওই রাজসচিব বস্‌সকারকে ডেকে এনে আমার মতো সামান্য লোকের কথা, নাম, ধাম তাঁর কর্ণগোচর করবার জন্য আপনি ব্যস্ত কেন? রাজরোষে পড়ে, কিংবা রাজভৃত্যদের লোভের লক্ষ্য হয়ে সামান্য যেটুকু শান্তি বা ধন সঞ্চয় করেছি, সেটুকু হারাই এই চান? এই কি জ্ঞাতকের ব্যবহার!'

পুণ্যক মহা উত্তেজিত হয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। এতক্ষণে অহিপারক ব্যাপারটা কিছুটা বুঝতে পারলেন। তিনি হাসি গোপন করে বললেন, 'এই কথা? রাজসচিব বস্‌সকার আমাদের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করতে এসেছেন। অনেক গভীর নীতি সম্পর্কে তিনি আজ আমাদের সঙ্গে একমত। সেই জন্যই তাঁর প্রার্থনাতেই আমাদের সভায় তাঁকে ডেকেছি। আপনার ভয় বা সংশয়ের কোনও কারণই নেই।'

পুণ্যক বললেন, 'রাজপরিষদের লোকদের সঙ্গে সখ্য করবার আমার বিন্দুমাত্র সাধ নেই, সেট্‌ঠি, আর রাজনীতিরই বা আমি কী বুঝি? বুঝতে চাইও না। আপনি দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।'

—কিন্তু ওঁদের কী বলব? যথেষ্ট উৎকৃষ্ট সুরা ও খজ্জের আয়োজন হয়েছে। সবাই একত্রে ভোজন করব....

—আমার অংশটি না হয় অন্তঃপুরের ভোজনশালার পাঠিয়ে দিন। আপনার পত্নী সমাদর করে খাওয়াবেন এখন। আর ওঁদের বলুন, আমার সহসা অসুখ...ঠিক আছে বলে দিন উদরাময় হয়েছে....উদরে শূল বেদনাও অনুভব করছি....না না, এতটা বলবেন না। এঁদের আবার যেমন স্নেহের আধিক্য হয়ত দেখতে এসে পড়বেন...যা হয় বলুন, আপনার মাথায় কি আর বুদ্ধির অভাব আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আপনি কি সত্যিই যাবেন না ?

—না না। পুন্নক এক কথা দ্বিতীয়বার বলে না।

অহিপারক বিরক্ত মুখে ফিরে আসতে লাগলেন। তাঁর কপালে ভ্রূকুটি। এই পুণ্যকের পিতা মহাসেট্‌ঠি অনঙ্গ ছিলেন যোতীয়র আগে গোষ্ঠীজ্যেষ্ঠক। তখনও অবশ্য মগধ রাজ্যরূপে এভাবে সংহত হয়নি। কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চল ছিল স্বাধীন, সার্বভৌম। গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে বিম্বিসার পিতা ক্ষেত্রৌজা ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। তাঁর মধ্যে বৃহৎ রাজ্য গঠনের স্বপ্ন ছিল। অনঙ্গ সে সময়ে কত দুঃসাহসিক অভিযানই না করেছেন। বাণিজ্যপথের সর্বপ্রকার খুঁটিনাটি তিনি জানতেন। তাঁর অতুল ধনসম্পদ পেয়েছে পুণ্যক। কিন্তু এমন নিরুদ্যম, কৃপণ, এমন অকারণে ভীত মানুষ তিনি আর দেখেননি। মহাসেট্‌ঠি অনঙ্গর যে এ প্রকার পুত্র হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অথচ প্রথম যৌবনে এই পুণ্যকই ছিল একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের।

নিজের মন্ত্রণাগৃহে আসতে আসতে অবশ্য তাঁর কপাল মসৃণ হয়ে এলো। প্রকৃত অবস্থা এবং তাঁর মনোভাব এঁদের কাছে প্রকাশ করা যাবে না। তাঁর সম্মানহানি হবে। বস্‌সকারেরও।

তিনি ঘরে প্রবেশ করে পেছনে কপাট দুটি বন্ধ করে দিলেন। জটিলের মুখে মাংসখণ্ড। তিনি শুধু চোখ তুলে চাইলেন। কাকবলীয় বললেন, 'কী হল ?'

—আরে আমার বৈবাহিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। উদরাময়। অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি। একটু সুস্থ বোধ করলেই আসবেন।

যোতীয় মৃদু হেসে বললেন, 'ভোজনের আগেই ?'

বর্ষকার ভেতরের কথা, পুণ্যকের চরিত্র কিছুই জানেন না। তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'অত্যন্ত দুঃখের কথা। আমারই দুর্ভাগ্য। যাক, কিছু ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করেছেন তো ?'

—নিশ্চয়ই। অহিপারক বসতে বসতে বললেন।

একটু পরে হাত মুখ প্রক্ষালন করে, সবাই পানপত্র তুলে নিলে, অহিপারক বললেন, 'মহামান্য বস্‌সকার, আপনার কী যেন বলবার ছিল...'

চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বর্ষকার বললেন, 'আমার বলবার কথা নির্ভর করবে, আপনাদের বক্তব্যের ওপরে।'

জটিল পানীয়ে চুমুক দিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'বক্তব্য ? আমাদের ? আপনার কাছে ? কিছু তো নাই! কী মহাসেট্‌ঠি। মান্যবর রাজসচিবের কাছে আমাদের কী-ই বা বক্তব্য থাকতে পারে ?'

যোতীয় বললেন, 'আমাদের বণিক গোষ্ঠীর লাভালাভ, অভাব-অভিযোগের ব্যাপার আমরা নিজেরাই সমাধান করি। নেহাত না পেরে উঠলে মহারাজ আছেন। তা এখনও সেরূপ অবস্থা হয়নি।'

অহিপারক বললেন, 'মহাসেট্‌ঠির অনুমতি নিয়ে দু-চারটি কথা নিবেদন করছি। আপনি জানতে চাইছেন বলে। দেশ থেকে দেশান্তরে যাতায়াতকালে শুল্ক এবং মুদ্রা নিয়ে বণিকদের বড়ই সমস্যা হচ্ছে। এ কথা আমরা রাজ সন্নিধানে পরবর্তী সভাতেই জানাবো।'

ভাবলেশহীন মুখে বর্ষকার বললেন, 'আপনাদের কোনও সমস্যারই সমাধান হবে না। মুদ্রার জন্য যে বিপুল পরিমাণ ধাতু প্রয়োজন তা আমাদের নেই। মগধ রাজ একটি অচলাবস্থায় এসে পৌঁছেছে মহামান্য সেট্‌ঠিগণ। বজ্জিরা সাম্রাজ্যলোভী, অবন্তীও তাই। কোসল একটি বৃহৎ শূন্যগর্ভ কলসের মতো। মগধ সামান্য একটু তৎপর হলেই বিশাল বিশাল রাজপথ আপনাদের সামনে খুলে যাবে, মগধাধিপ ছাড়া আর কারুকে শুল্ক দিতে হবে না। রাজনীতি সেদিকেই চলেছিল, কিন্তু...'

'কিন্তু কী ?' কাকবলীয় কখন নিজের অজান্তেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

—কিন্তু নীতির পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, আমরা রাজার মন্ত্রণাদাতা। রাজ্যের পক্ষে যা ভালো তাই পরামর্শ দিয়ে থাকি। সেট্‌ঠিদের অসুবিধাগুলি দূর করতে না পারলে, কী ভাবে রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্ভব ?

—নীতির পরিবর্তন ঘটছে কেন ? যোতীয় সাবধানে প্রশ্ন করলেন।

বস্‌সকার আবার একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলেন, বললেন, 'অবশ্যই গৌতম বুদ্ধ নামক শ্রমণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য। আমাদের রাজা, শুধু আমাদের কেন সাধারণভাবে সৎ রাজামাত্রেই শ্রমণদের ওপর, সন্ন্যাসীদের ওপর শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু রাজার কর্তব্যাকর্তব্যে এঁরা কেউই হস্তক্ষেপ করেন না। এই শ্রমণ করছেন। অনেকেই এ ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছেন না।'

—যেমন ?

—যেমন রাজপরিবারের অনেকে, বহু অমাত্য, প্রজারা, এবং আপনারা— শেষের দিকে বর্ষকারের মুখ সহাস্য হয়ে উঠল !

—আমরা ? জটিল হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ সেট্‌ঠিবর, এই শ্রমণ রাজস্বার্থবিরোধী। বণিকস্বার্থবিরোধী। এমন কি প্রজাস্বার্থবিরোধীও বটে। অনঙ্গ নামে ওই বিদ্রোহী চণ্ডালের কথা কি শুনেছেন ?

—কিছু কিছু কানে এসেছে বটে— যোতীয় তাঁর অবিচলিত গরিমায় বললেন।

—অনঙ্গের নেতৃত্বে প্রথম দিকে রাজগৃহের ঘরে ঘরে মলভাণ্ড বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তাদের দাবি ছিল শিশুচোর যক্ষ-যাক্ষিণীকে শাস্তি দিতে হবে। মহারাজ তা দিতে উদ্যতও হয়েছিলেন। তাঁর কাজে বাধা দিলেন শ্রমণ গৌতম। চণ্ডাল পুক্কুসদের কী বোঝালেন তিনিই জানেন, তারা শান্ত হয়ে কাজে যোগ দিল। শুধু অনঙ্গ এখনও দু চোখে আগুন ছড়িয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে। সে বিদ্রোহী। রাজদ্রোহীও বলতে পারেন। নগরের পথে পথে সে শ্রমণদের, রাজামাত্যদের, রাজনীতিকে গালি দিতে দিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকটি প্রায় উন্মাদ। কিন্তু পুরোপুরি নয়। এখন উচিত কাজ হল তাকে কারাদণ্ড দেওয়া, কিন্তু মহারাজ তো সে আদেশও দিচ্ছেন না। তাঁর বোধ হয় আশা শ্রমণরাই তাকে শান্ত করবেন !

কিছুক্ষণ পর যোতীয় বললেন, 'দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু এর মধ্যে আমাদের জ্ঞাতব্যই বা কী ? কর্তব্যই বা কী ?' তাঁর চোখ দুটি এখন আবার ধূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি যে নিজেদের পক্ষের কথা সম্পূর্ণ গুপ্ত রেখে, ধীরে ধীরে বর্ষকারের মনের কথা জেনে নিচ্ছেন এই আত্মপ্রসাদে তাঁর প্রাচীন মুখে এখন যথেষ্ট দীপ্তি।

বর্ষকার বললেন, 'আপনারা ওই শ্রমণকে সংযত করুন এই প্রার্থনা। সোজা হয়ে বসলেন চার শ্রেষ্ঠী, কী ভাবে ?'

—আপনাদের আনুগত্য, পূজা, উপহার দিয়ে। এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যাতে আপনাদের প্রার্থনা, আপনাদের ব্যবহারিক প্রজ্ঞা অমান্য করতে উনি না পারেন। শ্রাবস্তীতে তো শুনছি উনি সেট্‌ঠি সুদত্তর একেবারে বশীভূত হয়ে গেছেন। মান্যবর অহিপারক বলতে পারবেন।

অহিপারক বললেন, 'সুদত্ত আমার জ্ঞাতক। সে জেতকুমারের কাছ থেকে শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠ কাননটি ক্রয় করেছে। সেখানে প্রাসাদোপম আরাম নির্মাণ করছে ভিক্ষুদের জন্য। তার প্রধান দ্বারই এত বৃহৎ, এমন কারুকার্যমণ্ডিত যে বহু ধনী পণ্ডিত যাঁরা গৌতমের সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছুক, তাঁরা ভয়ে সম্ভ্রমে ফিরে যাচ্ছেন। তা শ্রমণরা তো চিরকাল গুহায়, বৃক্ষতলে, বড় জোর পর্ণকুটিরে বাস করে এসেছেন। আশ্রয়ের নামে এই বিলাসগৃহ যখনই গৌতম গ্রহণ করেছেন তখনই তিনি সেট্‌ঠিকুলের আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছেন, জানবেন। আমাদের এ বিষয়ে একটু তৎপর হতে হবে।'

বর্ষকার সকলকে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আপনারা বুদ্ধিমান, দলে দলে দাস-দাসী, রোগী, দণ্ডিত বা দণ্ডযোগ্য ব্যক্তি সাক্ক পুত্তীয় সমনসংঘে প্রবেশ করছে, যাচ্ছে সাধারণ গৃহস্থ, নারীকুল— মনেও করবেন না সবাই নির্বাণ চায়। আর... এটি প্রথম পদক্ষেপ, মগধকে শক্তিশালী করবার আরও কাজ পড়ে রয়েছে। তবে দক্ষ স্থপতি আগে গৃহনির্মাণের জন্য নির্বাচিত স্থানটি সমান করে নেয়। কণ্টক গুল্মগুলি তুলে ফেলে... তাই না ?'

বর্ষকার পেছন ফিরলেন, অহিপারক তাঁকে সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে গেলেন। কাকবলীয় সাবধানে দ্বার বন্ধ করে বললেন, 'কী বুঝলেন মহাসেট্‌ঠি ? ভদ্র জটিল কী মত আপনার ?'

যোতীয় বললেন, 'সমন গোতম সম্পর্কে যা বলে গেল ভালো কথা, যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ... অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় পদক্ষেপও আছে এঁর উর্বর মস্তিষ্কে। সাবধান জটিল, কাকবলীয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবনা-চিন্তা করে আমাদের পা ফেলতে হবে। এই বসস্‌কার আমাদের মনের গোপন অভিপ্রায়গুলিই যেন ব্যক্ত করে গেল। কিন্তু...'

এই সময়ে অহিপারক ঢুকলে সবাই নীরব হয়ে গেলেন।

অহিপারক একবার সবার দিকে তাকালেন। মৃদু হাসি তাঁর মুখে। কোনও পরিস্থিতিতেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন না। তিনি বললেন, 'এই রাজসচিব বস্‌সকার... বুঝতেই পারছেন রাজস্বার্থের সঙ্গে বণিকস্বার্থের মিলন ঘটাতে চান।'

'ইনি আমাদের ব্যবহার করতে চান, আর কিছু না, এবং স্বার্থটা ওঁর নিজের... ব্যক্তিগত স্বার্থ', কাকবলীয় ঈষৎ উত্তপ্ত হয়ে বললেন, 'প্রথম পদক্ষেপ... দ্বিতীয় পদক্ষেপ— এ সব বলতে উনি কী বোঝাচ্ছেন ? প্রথমে কণ্টক তুলবেন, সমন গোতমকে উচ্ছেদ করবেন। তারপর ? তারপর কী মহারাজকেই...'

'আহা হা হা', যোতীয় তাঁর প্রাচীন হাত তুলে বাধা দিলেন, 'যা অবক্তব্য তা কখনও বলবে না। এই রাজসচিব যদি আমাদের ব্যবহার করতে চান আমরাও ওঁকে ব্যবহার করতে পারি। এটা কোনও সমস্যা নয়। তা ছাড়া উনি আপাতত একটি কূটনীতিক সমাধানের কথা বলেছেন— সমন গোতমকে বশ করে নিজেদের সুবিধামতো তাঁকে কিছুটা চালনা করার প্রস্তাব তো মন্দ কিছু নয়। অহিপারক, বস্‌সকারকে এনে তুমি ভালোই করেছ।'

জটিল চতুর হাসি হেসে বললেন, 'ধন দিয়ে, বিলাসের উপকরণ দিয়ে শ্রমণদের বশীভূত করা কিছুই নয়। এই তো পুরন কাস্‌সপের শিষ্যরা। সেবার ওই মহাত্মা ক মাসের জন্য রাজগহে এলেন। তো কদিন এঁর দেশনা শুনলাম— ইনি পাপ-পুণ্য মানেন না, ঠকানো, হত্যা, মিথ্যাচার, পরস্ত্রী গমন কিছুই এঁর মতে পাপ নয়, আবার সত্য কথন, দান, দয়া, সংযম এসবের দ্বারাও পুণ্যলাভ হয় না। অর্থাৎ কি না কর্মের কোনও ফল নেই। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— হত্যা, চুরি, ব্যভিচার— এগুলি আপনার মতে পাপ না হতে পারে, কিন্তু এগুলির প্রত্যক্ষ ফল তো রাজদণ্ড। উনি বললেন— অবশ্যই। কিন্তু পরলোকে গিয়ে এসব তথাকথিত পাপের জন্য কাউকে কণ্টকবনের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, কাউকে জ্বলন্ত কটাহে নিক্ষেপ করা হয়— এ ধারণা সর্বৈব ভুল। যে কদিন রাজগহে ছিলেন, আমি প্রায়ই এঁর দেশনা শুনতে যেতাম এবং প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য নিয়ে যেতাম, মহাত্মা পুরন কাস্‌সপের শিষ্যদের কাছ থেকে যে পরিমাণ আশীর্বাদ পেয়েছি তাতেই মনে হয় আমার এ জীবনটা চলে যাবে। আমার ধারণা এই তীর্থঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায় এর পর এখানে এলে আমার কোনও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবেন না।'

কাকবলীয় বললেন, 'ওই চার্বাকদের মতো আর কি ! পরলোক মানে না, ইহলোকে সর্বপ্রকার সুখ সম্ভোগ করতে চায়। এঁদের বশ করা আর এমন শক্ত কাজ কি !'

যোতীয় গর্ব ও প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'সমন গোতমকে বশ করাও শক্ত কাজ হবে না। নিশ্চিন্তে থাকো।'

৩০

অতি প্রত্যূষে গৃধ্রকূট থেকে সূর্যোদয় দেখবার জন্য চণক, জিতসোমা এবং তিষ্য তিনটি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ে। তখন নগরীর পথঘাট ঘন কুয়াশায় ঢাকা। চলাচল করে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা গৃহমল পরিষ্কার করবার জন্য। আর দেখা যায় শ্রমণদের। কেউ শ্বেত বস্ত্রধারী, কেউ গৈরিক, কেউ অর্ধনগ্ন, কেউ-বা একেবারেই নগ্ন। প্রত্যূষ ভ্রমণে অভ্যস্ত কিছু নাগরিকও বেরোয়। কয়েকজন বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন, একটি গো-শকটে করে নিত্য পাটুলি গ্রামে গিয়ে গঙ্গাস্নান করেন, ফিরতে ফিরতে অপরাহ্ণ হয়ে যায়। আবার রাত কাটিয়ে পর-প্রত্যূষে গো-শকট চলে পাটুলি অভিমুখে। অর্থাৎ এঁদের সারা দিনটাই ব্যয় হয়ে যায় যাতায়াতে। জিজ্ঞেস করলে এঁরা বলেন, বহতা জল নইলে এঁরা স্নান করে পবিত্রতা ফল অনুভব করেন না। তার ওপর গঙ্গাস্নান। যা কিছু পাপ সারা জীবন জ্ঞাতে অজ্ঞাতে হয়ে যাচ্ছে সবই প্রতিদিনের গঙ্গাস্নানে ধুয়ে যাচ্ছে। অনেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঁদের চেনে, উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণ বলে এঁদের খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে।

পরস্পরকে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না এমনই কুয়াশা। জিতসোমা অশ্বারোহিণী হবার সময়ে অধোবাস পুরুষদের মতো করে পরে নেয়। তার উর্ণার স্তনপট্ট দৃঢ়ভাবে বাঁধা। তার ওপর একটি স্থূল উর্ণার উত্তরীয় সে সুকৌশলে পিঠ এবং বুক ও পেট ঢেকে নীবিবন্ধে বেঁধে নিয়েছে। চণক ও জিতসোমা উভয়েরই শীত অভ্যাস আছে। শীতে দুজনেই উল্লসিত হয়। কিন্তু তিষ্যকুমার তক্ষশিলায় বহু বছর কাটালেও, শীতে খানিকটা পর্যুদস্ত হয়। বিশেষ করে অশ্বের ওপর। অশ্ব চলায় বেগ দিলেই দু'পাশ দিয়ে হু-হু করে হিমেল বাতাস বইতে থাকে। তিষ্য তার ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে বলে, 'তাম্রক, তাম্রক, ধীরে, ধীরে, আমরা রণক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছি না। তাড়া নেই।'

চণক তার ঘোড়ার পেটে মৃদু আঘাত করে বলে, 'চিত্তক, চিত্তক, জোরে, আরও জোরে, সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে উপস্থিত হওয়া চাই।'

জিতসোমা কুয়াশার অন্তরালে হাসতে থাকে, তার মুখের সামনে হিম বাতাসে বাষ্প নির্মিত হয়। সে এক হাতে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে আরেক হাত বাষ্প খণ্ডগুলিকে ধরতে যায়। ধরতে না পেরে আবারও হাসতে থাকে।

এইভাবে কখনও দ্রুত, কখনও ধীর লয়ে তিনজনে গৃধ্রকূটে পৌঁছে যায়। যেতে যেতে প্রথমেই নগরীর উত্তর দ্বার দিয়ে বেরোতে উদ্যত গো-শকটটির সঙ্গে তাদের দেখা হয়। বয়স্থ ব্রাহ্মণ তিনটি শীতে জড়সড় হয়ে কোলের ওপর পুঁটলি নিয়ে বু-বু করে কাঁপতে কাঁপতে কী সব মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। তিষ্যকুমার হেঁকে বলে 'কে যায় ?'

—তিন ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নানে যায় বাপা— কুয়াশার মধ্যে ব্রাহ্মণত্রয় নিশ্চয় তাদের ভেবেছে তোরণরক্ষী কী সৈনিক। নইলে এত বিনীত উত্তর পাওয়া যেত না।

তিষ্য দ্বিগুণ হেঁকে বলে, 'দূরান্তের গঙ্গায় কেন ? রাজগৃহে কি পুষ্করণী নেই !'

—পাপগুলি ধুতে বাপা, পুষ্করণীতে কি আর পাপ-স্খালন হয় ?

—কী পাপ ? তিষ্য গলা বিকৃত করে। ভীষণ শোনায় তার স্বর। ব্রাহ্মণগুলি আরও বু-বু করে কাঁপতে থাকে।

—পাপগুলি অবিলম্বে জানাও। বোহারিকের কাছে চলো। নরহত্যা না অলংকার চুরি ?

একজন ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি বলে, 'ও সব কিছু নয় বাপা, তিন সত্য করছি। প্রাণিমাত্রেই অজ্ঞাতে পাপ করে ফেলে, সেইসব অনির্দিষ্ট পাপের কথা বলছি।'

তিষ্য তখন চাপা গলায় বলে, 'যাও, গঙ্গার জলে ডুবে মরো গে যাও।'

জিতসোমা তার কাণ্ড দেখে মৃদুস্বরে হাসে। চণকের ওষ্ঠাধরও দুদিকে ছড়িয়ে যায়।

কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণ তিনটি বলে, 'কী হল ? যাবো তো বাপা ? পথে আবার আটকাবে না তো ? ও কি, নারীকণ্ঠের হাসি শুনলাম যেন !'

আরেক জন বলে, 'দু পা গেলেই শ্মশান। নারীকণ্ঠের হাসি শোনা যাবে, এ আর বিচিত্র কী ? তাড়াতাড়ি চলো ! তাড়াতাড়ি চলো ! ওহে শকটচালক, থামছ কেন ?'

কিছুদূর চলে এসে চণক হাসিতে ফেটে পড়ে, 'সোমা, সঙ্গীতচর্চা করছ কতদিন ! হা সোমা ! তোমার হাসি প্রেতিনীর হাসি বলে ভুল হয় ?'

সোমা হাসতে হাসতে বলে, 'ওই ব্রাহ্মণগুলির পরিবর্তে আমারই এখন গঙ্গায় ডুবে মরা উচিত, কী বলুন তিষ্যভদ্র ?'

—আমাদেরও ওরা এতক্ষণে প্রেতই ভাবছে। দেখুন, আজ গৃহে ফিরে কোনও প্রেতনাশক ক্রিয়া-কর্মের আয়োজন করে কি না !'

সূর্য ওঠার লগ্ন থেকেই কুজ্ঝটিকা গলতে থাকে। ধীরে ধীরে তরল রক্তিমাভ আলোর স্রোত বইতে থাকে। তিষ্য ঈষৎ বিষণ্ণ গলায় বলে, 'চণকভদ্র আমার শ্রাবস্তী যাবার দিন ঘনিয়ে এলো।'

—তুমি তো নিজেই বেছে নিলে এই ভাগ্য তিষ্য। তবে হয়ত এই-ই ভালো হল।

তিষ্য বলল, 'মহারাজের সন্দেশ বয়ে নিয়ে যেতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হচ্ছি না ভদ্র। বরং আমি অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত যে এরূপ বিশিষ্ট কার্যের ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতপক্ষে চণকভদ্র, রাজগৃহে আসার আগে আমি নাবালক ছিলাম।'

—এখন সাবালক হয়েছেন? জিতসোমা মৃদু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল। বালার্কের রক্তাভা এখন তার গৌরবর্ণ মুখশ্রীর ওপর একটি অসামান্য সৌন্দর্যের মুহূর্ত রচনা করেছে। সে মাথাটিও উত্তরীয় প্রান্ত দিয়ে ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়েছে। কপালের ওপরে সামান্য কিছু কেশ দেখা যায়। সে নারী না অতি কিশোর বয়স্ক পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না।

তিষ্য সোজাসুজি জিতসোমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পায়। কেমন একটা জড়তা, সঙ্কোচ। সে জানে না কেন! সে মুখ নিচু করে দুঃখিত স্বরে বলল, 'তা-ও বলতে পারি না ভদ্রা। মহারাজের অভিনব কার্য আমাকে সাবালকত্ব দেবে আশা করছি।'

চণক বলল, 'তিষ্য, বিনয় ভালো। কিন্তু অতি বিনয়ে কাজ কি? বিশেষত সখাদের কাছে! তুমিই এই কাজের উপযুক্ততম পাত্র। তুমি শিক্ষিত, উদার, অভিজাত, সুন্দর বাক্য ব্যবহার করতে জানো। একটিই মাত্র প্রশ্ন আছে আমার।'

—কী প্রশ্ন?

—মহারাজা যে উপায়ে রাজসংঘ করে জম্বুদ্বীপকে একত্র করতে চাইছেন, তোমার নিজের তাতে সম্মতি এবং বিশ্বাস আছে তো?

তিষ্য বলল, 'আমার সম্মতির প্রশ্ন উঠছে কেন আর্য চণক?'

—এই জন্য উঠছে যে তুমি রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিলে। বিস্তার না বলে বলা ভালো রাজ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলে। অর্থাৎ সার্বভৌমত্বই তোমার প্রিয় তত্ত্ব, প্রিয় কল্পনা। কিন্তু মহারাজের প্রতিনিধিত্ব করতে যে তত্ত্ব তুমি অবলম্বন করতে যাচ্ছ, তা তোমার পূর্বের কল্পনার বিরোধী, ওই কল্পনা যদি তোমার স্বভাবানুগ হয়, তা হলে বলতে হয় রাজপ্রদত্ত এই কর্ম তোমার প্রকৃতিরও বিরোধী।

—আর্য চণক, আমি দক্ষিণে যেতে চেয়েছিলাম। দক্ষিণ তো সহসা কেউ ভেদ করতে পারবে না! অন্তত উত্তরের প্রতিযোগিতা ও আগ্রাসী লোভ থেকে আমার রাজ্য সুরক্ষিত থাকবে এবং সেই শান্তির সুযোগে আমি আদর্শ রাজ্য, আদর্শ রাজা-প্রজা সম্পর্ক, বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের ফলে পণ্য বিতরণের সুষম নীতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারব, আমি এইভাবে ভেবেছিলাম। সার্বভৌমত্বের জন্যই সার্বভৌমত্বে আমার কোনও লোভ ছিল না আর্য। সার্বভৌমত্ব যে শান্তি ও শৃঙ্খলা, সুসভ্য, সুমিত জীবনধারণের সুযোগ দেয়, তারই জন্য সার্বভৌমত্ব আমার কাম্য ছিল। মহারাজ বিম্বিসার দেখিয়ে দিলেন অন্যভাবেও তা সম্ভব। রাজশক্তি যদি পরস্পরের আনুকূল্য করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন রাজ্য হওয়ার জন্য প্রজাদের অসুবিধাগুলি মিলিতভাবে দূর করবার চেষ্টা করে, তা হলে আমার কল্পনার রাজ্য তো আমি পেলাম। পেলাম না!

চণক সাবধানে বলল, 'আমি জানতাম না তিষ্য, তুমি ক্ষত্রিয়, অথচ ক্ষত্রিয়ের যা স্বধর্ম সেই যুদ্ধবাসনা, বা রাজ্যবাসনা তোমার নেই। তুমি চিরকাল কারও না-কারও নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত আমি এ কথা বুঝতে পারিনি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জিতসোমা বলল, 'আর্য চণক, আমি বুঝতে পারছি না আপনি তিষ্যভদ্রকে তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংবরণের জন্য তিরস্কার করছেন, না তাঁর মহানুভবতার জন্য প্রশংসা করছেন।'

তিষ্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চণকের দিকে। তার চোখ দুটি দীর্ঘ। ঘনপক্ষ্ম। তার তরঙ্গায়িত ওষ্ঠাধর এবং নাতিউচ্চ নাসাগ্রে এখন রোদ ঝলমল করছে। সে ডান হাতের পাতা দিয়ে মাঝে মাঝে রোদ আড়াল করছে। আর যাই থাক, এই মধ্যদেশীয় যুবকের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ধূর্ততা নেই।

সে বলল, 'তিষ্য, আমি তোমাকে তিরস্কারও করছি না, প্রশংসাও করছি না। শুধু তোমাকে ভালো করে ভেবে নিতে বলছি। তোমার বয়সে হঠাৎ কারও ব্যক্তিমায়ায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর আদিষ্ট কর্ম করতে গিয়ে সহসা যদি আবিষ্কার করো তা তোমার প্রকৃতিবিরোধী, তখন না পারবে এগোতে, না পারবে পেছোতে। তুমি যেরূপ বিবেকী, শুধু অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষতই হবে। তা ছাড়া যথার্থ প্রত্যয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না থাকলে কাউকে তুমি স্বমতে, অথাৎ বিম্বিসার মতে আনতেও পারবে না। ওই তত্ত্বে তোমার প্রত্যয় চাই।'

তিষ্য অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রইল, তারপর বলল, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। মহারাজের তত্ত্বের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে... কিন্তু...।'

—কিন্তু কী ?

—এটি একটি নূতন তত্ত্ব স্বীকার করেন তো ? কুরু-পাঞ্চালের ভয়ানক যুদ্ধের কথা স্মরণ করুন। শুনেছি জম্বুদ্বীপে সামান্য কয়জন ছাড়া আর যুবা বা প্রৌঢ় অবশিষ্ট ছিল না। শুধু শিশু আর নারী, বিধবা নারী। সমগ্র জম্বুদ্বীপ এই যুদ্ধে কোনও-না-কোনও পক্ষে যোগ দিয়েছিল। সেই আদর্শ থেকে আমরা কি এখনও সরে এসেছি ? ওই যুদ্ধ থেকে কোনও শিক্ষাই কি লাভ করেছি ? এখনও ক্ষত্রিয় মানে যোদ্ধা, ধনুর্গ্রহ, গদাচক্রধারী। সুতরাং এটি, এই মৈত্রীর তত্ত্বটি এখনও তো পরীক্ষার স্তরেই আছে। তাই নয় কি আর্য চণক ?

—সত্য বলেছ। কিন্তু কোনও তত্ত্ব যিনি উদ্ভাবনা বা প্রচার করেন তিনি বা তাঁরা অন্তত তত্ত্বটি, যথার্থতায়, প্রয়োগ-যোগ্যতায় বিশ্বাস রাখেন। যেমন ধরো, শ্রমণ গৌতম অনাত্মবাদ, ক্ষণিকবাদ প্রচার করছেন, আমি এখুনি তর্ক করে ওঁর যুক্তিজাল শতচ্ছিদ্র করে দিতে পারি। কিন্তু ওঁর প্রত্যয় তাতে টলবে না। উনি আমাকে বলবেন অবিশ্বাসী, অনধিকারী, পৃথগ্জন। ওঁর মুখের বিমল আভা দেখে, প্রত্যয়ী উক্তি শুনে বহু লোকে ওঁর অনুগামী হবে। হতেই থাকবে। সে রূপ প্রত্যয় কি তোমার আছে তিষ্য এই মৈত্রী তত্ত্বে ?

'না, চণকভদ্র, নেই,' দুঃখিত গলায় তিষ্য বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি স্বয়ং মহারাজ বিম্বিসারেরও সেরূপ অবিচল প্রত্যয় নেই। তবে শ্রদ্ধা আছে, তাঁরও আমারও। শুধু শ্রদ্ধা দিয়ে কাউকে স্বমতে আনতে পারবো না, বলছেন ?'

জিতসোমা এই সময়ে বলল, 'আর্য চণক, তিষ্যভদ্রকে নিরুৎসাহ করবেন না। যে কাজ মহৎ, যে চেষ্টা মৌলিক তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকাই যথেষ্ট। আপনি যাকে প্রত্যয় বলছেন তা একমাত্র ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা থেকেই আসে। যেমন সংহিতার ঋষিদের এসেছিল।

অহমেব বাত ইব প্র বামি
আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা—
এতাবতী মহিনা সং বভূব ॥

ঋষি বাক্-এর এই যে বুকের মধ্যে বিশ্বভুবন ধারণ করার অনুভব, আবার আকাশ ছাড়িয়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে বিপুল মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকার অনুভব, এ তো ঐশী প্রেরণার দান। যে শ্রমণ গৌতমের উদাহরণ আপনি দিলেন তিনি নাকি বলে থাকেন : অগ্গোহম অস্মি লোকস্স। —সমস্ত পৃথিবীতে আমিই শ্রেষ্ঠ, এইসব প্রত্যয় উপলব্ধিজাত। বুদ্ধি দিয়ে যা ভালো বলে বুঝি তাকে শ্রদ্ধা করে মানাও তো অনেক। গৌতমের বা ঋষি বাক্-এর প্রত্যয় মহারাজ বিম্বিসারই বা কোথায় পাবেন, তিষ্যভদ্রই বা কেমন করে পাবেন ?'

সূর্য লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এখন তার মিশ্রিত রক্তাভার মধ্যে হরিদ্রার বর্ণই প্রধান হয়ে উঠছে। সূর্যের তাপ কোমল কম্বলের মতো জড়িয়ে ধরছে শীতার্ত বৃক্ষ ও গুল্মগুলিকে। এবং উপবিষ্ট তিনটি মানুষের শরীর। ঈষৎ তপ্ত হয়ে উঠেছে বাতাস, বইছে উত্তর থেকে, ভারি মধুর, উষ্ণ। তিষ্যর মনে হল বাতাস নয়, ভদ্রা জিতসোমাই এভাবে বইছেন। তাঁর গভীর সহমর্মিতার উষ্ণতায় আবৃত করে দিচ্ছেন চরাচর। তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন পৃথিবী, আকাশ সব ছাড়িয়ে, উন্নতগ্রীব বিশাল মহিমায়। স্বে মহিম্নি।

চণক একটু পরে বলল, 'না। আমি তিষ্যকে কখনওই নিরুৎসাহ নিরুদ্যম করছি না সোমা। শুধু ওকে চিন্তা করে নিতে বলছি। এইসব কর্মের ক্ষেত্রে কয়েকটি মানসিক বিপন্নতার সম্ভাবনা থাকে ; ওকে সতর্ক করে দিচ্ছি তাই।'

তিষ্য বলল, 'সে কথা আমি বুঝতে পেরেছি ভদ্র। আপনি যেন আমারই ভেতরের সত্তার একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিক। দুটি দিকের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলছে।'

কথাগুলো সে মৃদুস্বরে বলল। কেননা সে চায় না তার চারপাশে যে শান্তির, আনন্দের আবহ প্রস্তুত হয়েছে, তার হৃদয়ের মধ্যে এখন যে আবেশ তা ক্ষুণ্ণ হোক। ব্যক্তি-মায়া কী ? কুণ্ডলকেশী সেই শ্রমণার অদ্ভুত কথাবার্তায় সে আবিষ্ট হয়েছিল, শ্রমণ গৌতম, বিশেষ করে মহা মৌদ্‌গল্যায়ন যেভাবে যক্ষ-যক্ষী দুটিকে এবং পরে উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করলেন তখনও সে মুগ্ধ হয়েছিল। চণকের প্রতি সে আকৈশোর মুগ্ধ, মহারাজ বিম্বিসারকে তাঁর স্বরূপ দেখামাত্র তাঁর অদ্ভুত পৌরুষব্যঞ্জক হাবভাব ও স্নেহকৌতুক মিশ্রিত কথা, দেখা ও শোনামাত্র তাঁর চরিত্রের গভীরতা উপলব্ধি করা মাত্র সে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। এই-ই কি ব্যক্তিমায়া ? আর এই যে ভদ্রা জিতসোমা অধিক কিছু বলেন না। কিন্তু যখন বলেন তখন দ্যুলোক ভূলোক ভরিয়ে বলেন, এতে যে মুগ্ধতার আবেশ সৃষ্টি হয়, মনে হয় আর কেউ কোনও কথা না বলুক, পৃথিবী ঠিক এই মুহূর্তে থমকে থাকুক, এ-ও কি ব্যক্তি-মায়া ? তিষ্য কি তা হলে একটার পর একটা ব্যক্তি-মায়ায় বদ্ধ হয়ে চলেছে ? তার নিজের কোনও ব্যক্তি-মায়া নেই ? যাতে অন্য কেউ আবিষ্ট হতে পারে ? আবদ্ধ হতে পারে ?

শেষোক্ত চিন্তা মনে আসতেই তিষ্যর এতক্ষণের আবেশ, স্থিরতা, ধৈর্য, আনন্দ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। তার মনে পড়ে গেল সরযূ নদীতীর। সুনীল বর্ণের বসনে সজ্জিত এক অপরূপা কিশোরী। তিট্‌ঠ, তিট্‌ঠ, তিস্‌স্‌। তার আবেশের, মুগ্ধতার কুন্দমালাটি যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে সে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। চার দিকে ছড়িয়ে যায় তার অধৈর্য, অশান্তি, যন্ত্রণা, জিতসোমা অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকায়। দণ্ডায়মান তিষ্যর রক্তাভ, ভ্রূকুটি কুটিল মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চণক বলে, 'কী ব্যাপার তিষ্য, আজ কি এরই মধ্যে ফিরতে চাইছ ?'

বহু কষ্টে আত্মসংবৃত হয়ে তিষ্য বলে, 'কী লাভ ? আর্য চণক ? ক'দিন পরেই চলে যাবো শ্রাবস্তী। সেখানকার কাজ সমাপ্ত হলেই বৈশালী, তারপর যাত্রা করতে হবে উজ্জয়িনী-কৌশাম্বীর উদ্দেশে। কোথায় থাকবেন আপনারা ? কোথায় বা হতভাগ্য তিষ্য।'

চণক উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করে বলল, 'তিষ্য নিজেকে হতভাগ্য বলছ কেন সখা ! তুমি যেমন দূরে যাবে, আমিও তেমন যাবো, আরও দুর্গম স্থানে যেখানে স্ব-সমাজের মানুষই হয়তো পাবো না। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, দুঃখে অবসন্ন হলে, ক্ষিপ্ত হলে কি তোমার চলবে ?'

তিষ্য আরক্ত মুখে বলল, 'আমি ক্ষত্রিয় নই আর্য চণক। আমি মানুষ। কোনও বিশেষ বর্ণের আচরণের চিহ্ন আমার গায়ে লেগে নেই। লেগে থাকবে না। কেন বারবার শুনতে হবে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়, এমন কি আপনার থেকেও ? কত যুগ ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ক্ষত্রিয়-সংস্কার, ব্রাহ্মণ-সংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছেন আমাদের রক্তে ? ভদ্র চণক, ওই বিদ্রোহী চণ্ডাল অনঙ্গ যেমন দাসত্বের, শূদ্রত্বের পূর্ব-সংস্কার ভেদ করে উঠে দাঁড়িয়ে সক্রোধ প্রশ্নে জানিয়ে দেয় সে শুধু সেবক নয়, সে মানুষ, তিষ্যও তেমন ক্ষত্রিয়-সংস্কার ভেদ করতে চায়। প্রশ্ন করতে চায় কোনটা সুবিচার কোনটা অবিচার ?'

হঠাৎই সে থেমে গেল। এ কী বলছে সে ? কেন বলছে ? কাকেই বা বলছে ?

চণক নীরবে তার দিকে তাকিয়ে। চোখে উৎকণ্ঠা। জিতসোমা মুখ নত করে একটি ক্ষুদ্র উপলখণ্ড দেখতে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। চণক ধীরে ধীরে বলল, 'কী তোমার সে মহাদুঃখ তিষ্য, যার জন্য নিজেকে দুর্ভাগা বলো— জানি না। কী সে গূঢ় যন্ত্রণা যা এইভাবে হঠাৎ বিস্ফোরিত হল তা-ও জানি না। কিন্তু তিষ্য, তুমি কখনও বন্ধুহীন নও। কোনও দিন নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা হলে স্বচ্ছন্দে করবে। আর বিদ্রোহের কথা যদি বলো— চণক তোমায় বিদ্রোহীর ভূমিকায় দেখতে আনন্দিতই হবে। চলো, এবার নামি। সোমা, এসো...।'

ক্ষমা প্রার্থনার একটি বাক্যও তিষ্য উচ্চারণ করতে পারল না। চণকভদ্র ওইভাবে তার ক্রোধের কারণ নির্ণয় করবার পর সে মুখ খুলতেও সাহস পাচ্ছে না। কে জানত তার বুকে এত হাহাকার জমে ছিল ? শ্রাবস্তী যাবার প্রস্তাবে এইভাবে পুরনো ক্ষত থেকে রক্তপাত হয়ে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেবে তা কি সে ভেবেছিল ? আচ্ছা, কেন শ্রাবস্তীই ? তাকে তো প্রথমেই কৌশাম্বী বা উজ্জয়িনী পাঠাতে পারতেন মহারাজ। সে বলেও ছিল। কিন্তু মহারাজের দৃঢ় ধারণা সহজ কাজ থেকে কঠিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজের দিকে অগ্রসর হতে হয়। তাই বৈশালী পেরিয়ে তাকে শ্রাবস্তীতেই যেতে হবে। চণক এবং জিতসোমার মতো সহমর্মী ছেড়ে, মহারাজ বিম্বিসারের মতো পক্ষপুটবিস্তারী মহামহিম রাজসঙ্গ ছেড়ে শ্রাবস্তী, যা এখন নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের বাসভূমি।

প্রকৃত ব্যাপার নারী! এই নারীই যত অনর্থের মূল! জননী হয়ে দুরূহ কর্তব্যের পথ থেকে টেনে ধরে রাখে পেছনে, জায়া হয়ে পথ ভোলায়, নিত্যনৈমিত্তিকের পথে বাঁধা গরুর মতো ঘোরায়, প্রিয়া রূপে উদ্‌ভ্রান্ত করে, পৌরুষের মধ্যে এনে দেয় নারীসুলভ কম্রতা, শেষ পর্যন্ত এই নারী কী দেয়? যন্ত্রণা ও আত্মধিক্কার ছাড়া? নারীদের যে অধম মনে করা হয়, পুরুষকে বিপথগামী করবার যন্ত্র মনে করা হয়, ঠিকই! ঠিকই! যে কোনও সম্পর্কের নারী, যে কোনও বয়সের পুরুষকে হাত ধরে নিরয়লোকে নিয়ে যেতে পারে। তার গুরুপত্নী অলভা! হতে পারে তিনি খুবই অল্প বয়স্কা। কিন্তু বিবাহিতা তো! আচার্য সংকৃতির পঞ্চম পত্নী তিনি। আচার্য সংকৃতি যিনি সারা জম্বুদ্বীপে তাঁর জ্ঞান, তাঁর মুক্ত দৃষ্টির জন্য সুবিদিত। তাঁর পত্নী। গুরুপত্নী সে যে বয়সেরই হোন না কেন জননীর মতো তো! অথচ অলভা তাকে প্রলোভিত করাবার জন্য কী না করতেন! উড়ুম্বর বৃক্ষের ডালে বসে পা দোলাতেন, তাঁর শুভ্র কোমল চরণপত্র তো বটেই, তার ঊর্ধ্বের অংশও অনাবৃত হত। যখন কোনও আদেশ করতেন তখন গ্রীবা বাঁকিয়ে কটাক্ষে তাকাতেন তার দিকে, নীলাভ চোখের মণিতে একই সঙ্গে তিরস্কার ও প্রশ্রয় ফুটে থাকত। দাঁত দিয়ে অধর কামড়ে থাকার একটা মধুর ভঙ্গি ছিল অলভার। একদিন, একদিনই মাত্র বলেছিলেন, ভুজঙ্গিনীর মতো যেন ফণা তুলে— তিষ্যকুমার আমি তোমার থেকে তিন চার বছরের বেশি বড় হবো না। কক্ষনো আমাকে মাতৃসম্বোধন করবে না। কেন করো? কেন? কেন? আমি কারও মা নই, হইনি এখনও, হবোও না। আমি কারও পত্নীও নই। আমি অলভা, অলভা, অলভা... বলতে বলতে দূর বনচ্ছায়ে হারিয়ে গেলেন ছুটতে ছুটতে।

ধাবমানা, বনচ্ছায়ে হারিয়ে যেতে থাকা অলভার আকৃতিটি তিষ্যর বুকের মধ্যে ফুটে উঠল যেন একটি চলমান প্রতিকৃতি। সর্পিণী! সর্পিণী! এরা সকলেই সর্পিণী! তার পর সহসাই তার বুকের মধ্যে আরও প্রতিকৃতি ফুটে উঠল। আচার্য সংকৃতির। শ্বেত শ্মশ্রু, শ্বেত কেশ, শান্ত স্বরে ঋষি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির দ্যাবা-পৃথিবী সূক্ত ব্যাখ্যা করছেন :

সংগচ্ছমানে যুবতী সমন্তে
স্বসারা জামী পিত্রোর্ উপস্থে।
অভিজিঘ্রন্তী ভুবনস্য নাভিং
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাত্...
"তরুণবয়সী দুটি মেশামেশি সীমানা পরস্পর
মিলেছ আপন দুটি ভাইবোন কোলটিতে মা-বাবার
ভুবনের নাভি আদরেতে ঘ্রাণ করো—
হে দ্যাবা পৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো..."

তিষ্যর যে কী হয়ে গেল হঠাৎ, সে জানে না। অলভার ছুটন্ত আকৃতি যেন একটি যন্ত্রণার তীরের মতো তার বুকে বিঁধে গেল। ঘৃণা নয়, যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার অর্থ সে জানে না। সংগচ্ছমানে যুবতী সমন্তে...। সংগচ্ছমানে... তিষ্যর চোখ সেই বিদ্ধ তীরের যাতনায় সজল হয়ে উঠছে। তরুণবয়সী দুটি মেশামেশি... অলভা একটি খড়ের কন্দুক প্রস্তুত করেছেন। একেবারে নিটোল, অতি নিপুণভাবে প্রস্তুত। প্রেঙ্খায় দুলছেন, দুলতে দুলতে মহাবেগে উঠে যাচ্ছেন ঊর্ধ্বে। শিংশপার উচ্চ শাখাগুলি বুঝি ছুঁয়ে ফেললেন, সেই ঊর্ধ্ব থেকে কন্দুকটি ছুঁড়ে দিচ্ছেন, পায়ের আঘাতে, ধরো তিষ্যকুমার ধরো, দেখি তো তুমি কেমন কুশলী!

অহমেব বাত ইব প্র বামি... বায়ুর মতো বয়ে যাচ্ছে বিশ্বভুবনে এক সুগভীর যন্ত্রণার তরঙ্গ। সব সময়ে বোঝা যায় না। হয়ত এইভাবে বয়ে যাচ্ছে আনন্দধারাও, একইভাবে বইছে আত্মোপলব্ধির তরঙ্গধারাও। কে কখন কোন ধারাটিকে ছুঁয়ে ফেলে, তার বিশ্বভুবন মুহূর্তে পাল্টে যায়, পাল্টে যায় জীবনের অর্থ, তিষ্যকুমার এখন আনন্দধারার ঊর্ধ্বে সেই বেদনাপ্রবাহকে ছুঁয়ে ফেলেছে, সেও এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাবমান, চূড়ান্ত বেগে, হারিয়ে যাচ্ছে কোন অন্ধকার অরণ্যছায়ায়, পালাচ্ছে স্বস্তি, সংকল্প এবং কেতুকাম্যতার দিক থেকে ব্যথাজর্জর কোনও উপলব্ধির ব্যাখ্যাতীত গাঢ়তায়। যেতে যেতে বলে যাচ্ছে অনম্য ফণা তুলে— ক্ষত্রিয় নই। কারো কেউ নই। আমি তিষ্য... তিষ্য... তিষ্য...

৩১

বর্ষার পরে শীতের প্রারম্ভকালই যাত্রার জন্য প্রশস্ত। সে যুদ্ধযাত্রাই হোক আর তীর্থযাত্রাই হোক। কে কোথায় যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হল বা হল না, জানা যাচ্ছে না। ছোটখাটো সংঘর্ষ তো লেগেই আগে। প্রদ্যোৎ মহাসেনের গান্ধারপিপাসা সম্ভবত এখনও মেটেনি। তবে তার তীব্রতা আর তেমন নেই। উত্তর বাণিজ্যপথে যাতায়াতরত সার্থগুলির থেকে এই জাতীয় আভাসই যেন পাওয়া যায়। সমস্ত কিছুর মধ্যে মহারাজ পুষ্করসারীর বিপন্ন মুখটির থেকে থেকেই মনে পড়ে। ভেতরে একটা অপারগতার কাঁটা ফোটে। তাই চণক সার্থদের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদে হৃষ্ট হয়। মহারাজ বিম্বিসার ঠিকই বলেছিলেন। চণ্ড মহাসেনের চণ্ডতা আপনা থেকেই চলে যাবে। যাই হোক তেমন কোনও রণ বা মহারণযাত্রার কথা শোনা না গেলেও আরেক ধরনের যাত্রা চলেছে। তাকে তীর্থযাত্রাও ঠিক বলা যায় না। বিভিন্ন পন্থের পরিব্রাজকেরা বিশেষত সাক্য পুত্তীয় সমনরা ছড়িয়ে পড়ছেন দূর থেকে দূরান্তরে। এঁদের কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। কাজেই তীর্থযাত্রা নয়। অথচ যাত্রা। নিঃসন্দেহে যাওয়া। দেশ থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করাই এঁদের কাজ। বিশেষত এই সময়ে। গৃহ নেই, ক্লান্তি নেই, চিন্তা নেই, অভিযোগ নেই। শুধু চলা। ক্ষণেক বিশ্রাম। আবার চলা। পথে পথে পথিকদের, গৃহীদের পরামর্শ দেন, সেবা দেন, উপদেশ দেন, সামান্য ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। আবার চলেন। নভোমণ্ডলে মেঘে মেঘে কাশ ফুটে আছে। শুভ্রপক্ষ হংস হংসী উড়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে। দেখতে দেখতে পা দুটি চঞ্চল হয়ে ওঠে দৈবরাত চণকের। যাবার সময় হল। এখনও যদি না বেরোতে পারে তা হলে পুরো এক বছর বিলম্ব হয়ে যাবে। সোমার সঙ্গে পরিষ্কার কোনও আলোচনা না হলেও যেন একটা অনুক্ত চুক্তি হয়ে যাচ্ছে। সে রাজগৃহে দাস-দাসী নিয়ে বসবাস করবে। চণক কয়েক মাস পরিব্রজনের পর আবার আসবে। যাওয়া-আসা চলবে। কিন্তু চণকের ভেতরটা স্বস্তিতে নেই। কাজটা কি সে ঠিক করছে? সোমা মূক হয়ে রয়েছে। চণক যা করবে সে তা মেনে নেবে। কিন্তু চণকের দায়িত্ববোধ? অবশ্যই সোমার সুরক্ষার ভার নেবেন স্বয়ং মহারাজ। কিন্তু...। মহারাজের কূটকক্ষে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে চণক। সোমা প্রশান্ত মুখে তার কটিবন্ধ এগিয়ে দিল। প্রশান্ত, কিন্তু প্রসন্ন কী? প্রসন্ন হওয়ার কথা নয়। প্রসন্ন যে নয় তা প্রাণপণে লুকোবার জন্যই এই প্রশান্তি। ভ্রূ কাঁপে না, চোখ দুটি তাদের আয়ত নীলিমায় মগ্ন। ওষ্ঠাধর যেন পটে আঁকা। শুধু নাসারন্ধ্র একটু একটু স্ফুরিত হচ্ছে।

চণক হেসে বলল—'সোমা, আমার কি হাতের সংখ্যা অল্প? কটিবন্ধটি কি নিজে নিতে পারি না? তুমি কেন এতো কষ্ট করো?

—এই সামান্য কটিবন্ধ তুলতে আমার কষ্ট হবে? আর্য, আপনার যদি ভালো না লাগে আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।

চলে যেতে উদ্যত সোমাকে ক্ষিপ্র হাতে থামায় চণক।

—'সোমা!'

—বলুন!

—আমার কথার কি এই অর্থই হয়?

—আর কোনও অর্থের কথা তো আমার মনে আসছে না।

বাইরে থেকে এই সময়ে তাম্রকের হ্রেষা ধ্বনি ভেসে আসে। তিষ্যকুমার এসে গেছে। উভয়ে রাজসকাশে যাবে।

সোমা বলে—যান আর্য, আপনার সখা এসে গেছেন।

কদিন আগে গৃধ্রকূটে সহসা নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবার পর থেকে তিষ্য চণকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহের ভেতরে আর আসছে না। আর একদিনও সে সোমার মুখোমুখি হয়নি। চণক বুঝতে পারে, এ তার লজ্জা, সংকোচ। সে তিষ্যকে সময় দিতে চায়। কিন্তু সোমা বোঝে না। চণকের কাছে যদি তার সংকোচ না থাকে, তা হলে সোমার কাছেই বা তার এতো সংকোচ কেন? ভেতরে ভেতরে সে গূঢ় অভিমানে স্তিমিত থাকে। চণকের সঙ্গে তর্ক করে। চণক বলে সোমা বোঝো না কেন, নারীর কাছে পুরুষের একটা সংকোচ স্বাভাবিক কারণেই আসে। সোমা বোঝে না।

সোমা তার জীবনে, তার প্রতিবেশে নারীর কাছে পুরুষের সঙ্কোচ দেখেনি যে। সে বরং দেখেছে বণিক, রাজপুরুষ, সাধারণ গৃহী, সর্বজাতীয় পুরুষ তার কাছে অকপট। মুক্ত। শারীরিক, জৈবিক, মানসিক সব অর্থে। দর্ভসেনের মতো বর্ষীয়ান পুরুষেরা নিজেদের শিথিল, বয়ঃকুঞ্চিত শরীর প্রকাশ করতে লজ্জা পেতেন না। রাজসভার যাবতীয় গুপ্ত কথা তারই সঙ্গে অসঙ্কোচে আলোচনা করতেন। গৃহীরা সংসারের যাবতীয় অসন্তোষ খোলাখুলি বলে যেত, বণিকরা বলত তাদের লাভালাভের কথা। কবিরা, পণ্ডিতরা তার সঙ্গে, তার জননীর সঙ্গে কাব্য এমন কি শাস্ত্রালোচনা করে যে সুখ পেতেন আর কারো সঙ্গে ততটা পেতেন না, এ কথা তাঁরা নিজেরাই বলেছেন। তা হলে কেন গূঢ় আলোচনার জন্য তিষ্যকুমার ও চণককে মহারাজের কূটকক্ষে যেতে হবে? কেন আর্য চণক সব কথা তাকে বললেও কিছু যেন আবার না বলা রেখে দ্যান? তিষ্যকুমার কেন তার মনের গোপন ব্যথাগুলি তার কাছে ব্যক্ত করে না! নারী কি পুরুষের বন্ধু হতে পারে না? আর্য চণকের কাছে সে তার সংকোচ জয় করল, অথচ জিতসোমা তার সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে থাকলেও তিষ্যকুমার কেন সে হাত ধরে না? কেন এড়িয়ে যায়?

এবং তিনজনের এই নতুন মন্ত্রণার ঘটনাটি ঘটবার পর থেকে সোমা থেকে যাচ্ছে বৃত্তের বাইরে। অন্তর্বৃত্তে শুধু ওরা তিনজন। মহারাজ এর আগে প্রায়ই আসতেন। চারজনে কত কথা হত! মনে হত মহারাজের মনে সোমার প্রতি আস্থা জন্মাচ্ছে। কিন্তু কূটকক্ষে যখন ডাকলেন শুধু দুটি পুরুষকেই ডাকলেন। যদিও সোমার অভিজ্ঞতা এবং সেই সুযোগে রাজনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান এক অর্থে চণকের থেকেও অধিক। আর্য চণক তত্ত্ব জানেন, তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। কিন্তু সোমা তার জীবনে শিশুকাল থেকে অনেক তত্ত্বের প্রয়োগ দেখেছে, শুনেছে, কোথায় কোথায় কীভাবে তত্ত্ব নিষ্ক্রিয়, নিষ্ফল হয়ে যায় তাও দেখেছে। এ গৃহে সেই চিত্তপ্রসন্নকর আলোচনাচক্রগুলি আর বসছে না। মহারাজ আসেন মাঝে মাঝে। শুধু তারল্যে যেন ভেতরকার কোনও উদ্বেগ গলিয়ে নিতে চান। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় না। তিষ্যকুমার তো কদিন ধরে আসছেই না। অথচ এই যুবার অনভিজ্ঞ গম্ভীরতা, আবার অতি তারুণ্যের মোহান্ধতা, তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এ সব অত্যন্ত ভালো লাগে জিতসোমার। সে যেন মুক্ত বাতাসের মতো চণক আর সোমার মাঝখান দিয়ে বয়ে যায়।

সোমার দিকে একবার দ্বিধাগ্রস্ত চোখে তাকায় চণক। চোখে চোখ মেলে না কিন্তু। কেন না সোমা নতচক্ষু।

—যাই সোমা, নম্র গলায় বলে চণক বেরিয়ে পড়ে।

রাজপুরীর অন্তঃপ্রাচীর পার হবার পর ঘোড়া থেকে নেমে দুজনে পদব্রজে পুরীর দিকে যেতে থাকে, তাম্রক ও চিত্তকের পাশে পাশে। অন্তঃপ্রাচীরের তোরণ থেকে কূটকক্ষ পর্যন্ত পথটি দুজনে সম্পূর্ণ নীরবে চলে। একদিকে রাজসভা, রাজার ব্যায়ামাগার, রাজকোষ, মন্ত্রণাগৃহ ইত্যাদি মিলিয়ে একটি প্রাসাদ! রাজার বাসভূমি তার বিপরীত দিকে।

পথে মাঝে মাঝেই প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান তোরণে একবার মাত্র পরিচয়মুদ্রা দেখাতে হয়, তারপর প্রাসাদের তোরণে পৌঁছতেই রাজসচিব বর্ষকার কিম্বা সুনীত তাঁদের রাজসকাশে নিয়ে যান। মন্ত্রণাগৃহটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। কূটকক্ষ একেবারে ভেতরে। মহারাজ সেখানে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন না। বস্তুত তিনি মন্ত্রণাগৃহের একেক অংশে একেক দিন বসেন। আজ বর্ষকারকে দেখতে পাওয়া গেল।

এঁকে দেখলে তিষ্য বিরক্ত হয়। তার ধারণা ইনি ক্রূর, কুটিল। চণক জানে রাজ-সন্নিধানে এ প্রকার বহু কুটিল, ক্রূর মানুষ থাকে। থাকাটাই স্বাভাবিক।

বর্ষকার বললেন—আসুন, আসুন মহামান্য চণক। আসুন কুমার তিষ্য। মহারাজ অনেকক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

থেকেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

চণক বলল—হ্যাঁ, মহারাজ কখনও উত্তরদেশে যাননি তো, তাঁর জিজ্ঞাসা অনেক। কৌতূহলে আপাদমস্তক পূর্ণ থাকেন।

বর্ষকার কটাক্ষে একবার তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—মহারাজ কি সাকেতেও যাননি কখনও ?

তিষ্য যে সাকেতক তা রাজসচিব বর্ষকারের জানার কথা নয়। সে যে মধ্যদেশীয় এ টুকু তিনি কেন অনেকেই অনুমান করে নিতে পারে। কিন্তু সাকেতক ? মহারাজ কি বলেছেন ? বলবার কথা নয়। রাজ-অমাত্যরা সবাই জানে চণক মহারাজের আচার্যপুত্র। সে এখনও কোনও অমাত্য-পদ পায়নি, বা নেয়নি এ তারা স্বচক্ষেই দেখছে। সে যে গৃহ-কানন দাস-দাসী, মাসিক-বৃত্তি ইত্যাদি রাজ-অনুগ্রহও পাচ্ছে এ-ও তারা জানছে। পরিবর্তে চণক মহারাজকে কী দিচ্ছে। কী দিতে পারে এ নিয়ে প্রথম দিকে কিছুটা চঞ্চল কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছিল। এখন তা শান্ত হয়ে এসেছে। তিষ্য চণকের সখা বলেই রাজসখা, তার অন্য কোনও গুরুত্ব বা ভূমিকা নেই—এমনটাই মহারাজ জানাতে চান। অথচ আজ বর্ষকার বললেন—সাকেতক তিষ্য! ভালো, এঁরা স্বভাবে চতুর, রহস্য ভালোবাসেন না। রহস্য ভেদ করতে থাকুন। চণক এঁদের সাহায্য করবে না। সে মৃদু হেসে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তিষ্য হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখ-চোখের ভাব কঠিন। অথচ ওষ্ঠাধরে হাসি। সে বলল—'শুনুন মহামান্য বর্ষকার, সাকেতকরা আবার কোশলের প্রজাও তো! তা কোশলরাজ্য তো মহারাজের শ্বশুর-গৃহ। কতদিন যান না। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। সম্মত করাতে পারছি না। দেখুন না একটু বলে কয়ে...'

সে এক পলক বর্ষকারের মুখের দিকে তাকাল। মেঘাচ্ছন্ন সে মুখ। ক্ষণপূর্বের হাসি প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। চণক খানিকটা এগিয়ে গেছেন। তিষ্য দ্রুতপদে গিয়ে তাকে ধরল। চণক তিষ্যর দিকে তাকাল না, অতি মৃদু স্বরে বলল—'তিষ্য, কাউকে উত্তেজিত করে দিয়ে তার ভেতরের সংবাদ বার করে নেওয়াই কূটনীতিকের একটা কাজ। উত্তেজক উক্তির উত্তর দেবে নির্বোধের হাসি দিয়ে। আগুন নিয়ে খেলা না করাই ভালো।'

মন্ত্রণাগৃহের দ্বারে প্রহরী বিনত নমস্কার করে সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকে তিষ্য বলল—কেন জানি না, চণকভদ্র, আত্মসংবরণ করা আমার পক্ষে ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদি আপনার মতো এমন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতাম নিজেকে!'—তার কণ্ঠে হতাশার সুর।

চণক বলল—আত্মসংবরণ করতে পারছো না—এটা সত্য বলেছ তিষ্য কুমার। কিন্তু কেন জানো না, এটা সত্য বলল না। জানো, নিশ্চয় জানো। তিষ্য তুমিই তো বলেছিলে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে কর্মকে, আদর্শকে স্থান দাও তুমি, বলোনি ?

মৃদু কোমল কিন্তু দৃঢ় স্বরে কথাগুলি বলল চণক। কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলনা। আর একটি দ্বার এসে গেছে, এটি পার হলেই মহারাজের সঙ্গে দেখা হবে।

এসো, এসো বয়স্য। এসো তিষ্যকুমার। মহারাজের সহাস্য আহ্বান ভেসে এলো। তিনি তাঁর উচ্ছ্বাস ও অভ্যর্থনা ইচ্ছে করেই একটু সশব্দ করেন। যাতে দ্বারে দণ্ডায়মান প্রহরীদের কানে যায়। তাদের কান থেকে হয়ত কৌতূহলী অমাত্যদেরও কানে পৌঁছতে পারে এমন কোনও অনুমানে। দ্বার বন্ধ হয়ে গেলে কক্ষে যখন তিনজনই মাত্র, তখন সহসা মহারাজের মুখ থেকে হাসি অন্তর্হিত হয়। আরম্ভ হয় আলোচনা। প্রধানত মহারাজ ও তিষ্যর মধ্যে। চণক শুধু শ্রোতা। মাঝে মাঝে রাজা বা তিষ্য তার মতামত জানতে চাইলে, বা তার কিছু মনে হলে সে মুখ খোলে। নয়ত সে মস্তিষ্কের একটি অংশ দিয়ে শোনে, আর একটি অংশ দিয়ে রাজশাস্ত্রের কোনও অধ্যায় মনে মনে লেখে, এবং আরও একটি অংশ দিয়ে ভাবে, সোমার সমস্যার কথা। কী সমাধান ? জিতসোমার জীবনের জটিল গ্রন্থি সে কী ভাবে মোচন করবে ?

প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনা মহারাজ এবং তিষ্যরই। এখানে চণকের বিশেষ ভূমিকা থাকার কথা নয়, নেইও। তাকে আসতে হয় তিষ্যকে আড়াল করতে। তিষ্যকুমার যে মহারাজের কোনও গুরুত্বপূর্ণ, গোপন কাজের ভার নিয়ে কোথাও যাচ্ছে, এটা মহারাজ কাউকে জানাতে চান না। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে না রাজভাণ্ডার থেকে কোনও ধন বা অশ্বাদি কোনও যানবাহন, দাস-রক্ষী ইত্যাদি নিয়ে। মহারাজ তাঁর নিজস্ব সঞ্চয়ের যে ভিন্ন কোষ আছে তার থেকেই তিষ্যর ব্যয়-ভার বহন করবেন। মহারাজের প্রতিনিধিত্ব প্রমাণ করবার জন্য তার কাছে কী কী থাকবে সেই নিয়েই এখন আলোচনা হচ্ছে প্রধানত।

চণক সহসা বলল—'আচ্ছা মহারাজ, এতো গোপনতার পক্ষপাতী কেন আপনি?' জিজ্ঞাসা করছে বটে, কিন্তু চণক এখন একটু অন্যমনস্ক।

বিম্বিসার গম্ভীরভাবে বললেন—'চণক, যুদ্ধের সপক্ষেই এখানে জনমত অধিক। আমার অমাত্যরা, যুবরাজ এমন কি অন্তঃপুরিকারাও বিশাল মগধরাজ্যের স্বপ্ন দেখে।'

চণক দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল—'আমিও দেখেছিলাম।'

তিনজনেই বহুক্ষণ নীরব রইলেন। কারণ চণকের এই উক্তি তিনজনের চিত্তে তিনপ্রকার চিন্তা ও দিবাস্বপ্ন জাগিয়ে দিয়েছে। চণক দেখছে এক মহাসমুদ্রের মতো চতুরঙ্গ সৈন্যদল, তার ওপরে জেগে আছে মগধের মুদ্রা অঙ্কিত পতাকাগুলি। এই সৈন্যদলের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শ্বেতকায়, তাম্রকায়, কৃষ্ণকায় বহু প্রকার সৈনিক এবং সেনাধ্যক্ষ। বাইরের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের সবার চিত্ত এক। প্রত্যেকে ভাবছে আমি জম্বুদ্বীপবাসী। মহারাজ বিম্বিসার, সর্বগুণান্বিত, মহাবীর, লোকপাল বিম্বিসার আমাদের সর্বসম্মত রাজা এবং নেতা। এই মহাসমুদ্রের ও দিকে আছে আরও এক সমুদ্র। উপরিশ্যেন পর্বতের ওপার থেকে আসা বিদেশীরা। তাদের নেতা মহাবীর কুরুস। দুই সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। কিন্তু ক্রমশ কুরুস সমুদ্র পেছিয়ে যাচ্ছে পেছিয়ে যাচ্ছে। তার তরঙ্গগুলি ক্রমশই সংখ্যায় অল্প হয়ে যাচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে। জম্বু জলধি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবধি বিস্তৃত হয়ে গেছে। সেই ভীষণ, ভয়ঙ্কর, সগর্জন আকৃতি আর নেই, এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভরঙ্গভঙ্গে লীলা চপল সে জলধি। শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ...

তিষ্য দেখছিল দুটি রুক্ষ শিলাসন। কৃষ্ণশিলা পাথরের অস্ত্র দিয়ে কেটে কেটে প্রস্তুত হয়েছে এই রাজাসন দুটি। ঘন অরণ্যের মধ্যে গুহাকৃতি একটি স্থান পরিষ্কৃত হয়েছে। পেশল বক্ষ, বিপুলকায় কালো মানুষেরা অরণ্যের বিভিন্ন অঞ্চল বৃক্ষ কেটে পরিষ্কার করে ফেলছে। সমান করে ফেলছে ভূমি। 'মহারাজ ওইখানে কী হবে?'

—'বস্ত্রবয়নশালা প্রজাগণ, তোমরা আর কতকাল নগ্ন, অর্ধনগ্ন থাকবে?

'—'ওখানে কী হবে মহারাজ?'

—'রথ নির্মাণের জন্য কর্মান্ত। দূর দূর অঞ্চলে যেতে হবে, রথ, রথচক্র এবং রথ্যা নির্মাণ না করতে পারলে এই মহা পৃথিবী যে তোমাদের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যাবে!'

'আর ওখানে? ওখানে কী নির্মাণ করব মহারাজ?'

—অস্ত্র ও যন্ত্র নির্মাণ করবে, পাথরের এই ভল্ল এই ছুরিকায় কিছুই হবে না, এই বল্লমের মতো যন্ত্র দিয়েই বা তোমরা কতটুকু ভূমি কর্ষণ করতে পারবে?'

'ওই বিশাল স্থানটি কী মহারাজ?'

—ওখানে গণ পাকশালা প্রস্তুত হবে। তোমরা অগ্নিপক্ব করে কী ভাবে মাংস মৎস্য খেতে হয় শিখবে। তোমাদের নারীদের ওখানে যেতে হবে, মহারানী এই বিভাগের ভার নিয়েছেন। তিনি তোমাদের রমণীদের শেখাবেন কী ভাবে কর্ষিত ভূমি থেকে উৎপন্ন শস্য সিদ্ধ করতে হয়, কী ভাবে তা চূর্ণ করতে হয়। আর কতকাল তোমরা বন্যফলের মুখাপেক্ষী, মৃগয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে প্রজাগণ? আর কতকালই বা অপক্ব মাংস খাবে পশুর মতো?... মহারানি...'

পাশে বসা নারীমূর্তিটি মুখ ফেরাল। তিষ্যর অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল। নারীবেশধারী একটি শূন্যতা বসে রয়েছে তার পাশে। কোনও অবয়ব নেই, মুখমণ্ডলের স্থানে ঘোর অন্ধকার। শূন্য, শূন্য, শূন্য সব...।'

বিম্বিসার দেখছিলেন এক অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ যুবক উপবিষ্ট রয়েছে সামনে এক জ্যোতিঃপুঞ্জের মতো আকৃতির ব্রাহ্মণ। বর্ষীয়ান, কিন্তু উন্নতদেহ। উন্নতশির, বাইরেটা যেন প্রজ্জ্বলন্ত উল্কা। ভেতরটা স্নিগ্ধ যেন চন্দনতরু। পাঠ শেষে তরুণ প্রণাম করছে, ঋষিপ্রতিম আচার্য উঠে দাঁড়াচ্ছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে প্রসারিত করে দিয়েছেন হাত, করতল দিয়ে স্পর্শ করছেন তরুণের শির—তুমি রাজ চক্রবর্তী হবে বিম্বিসার।'

—'সত্য ? সত্য বলছেন আচার্য ?' তরুণের পিতা ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করছেন। —'সত্য ? না আশীর্বাদ ?'

—দেবরাতের আশীর্বাদে আর সত্যে কোনও পার্থক্য থাকে না ভদ্র শ্রেত্রোজা।

বিম্বিসারের সামনে এ দৃশ্যের পাত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল। সামনে এক স্নিগ্ধ চন্দনতরু, ভেতরে প্রজ্বলন্ত উল্কাই বুঝি। করুণার সমুদ্র নয়ন দুটি। কিন্তু স্বর জলদগম্ভীর।

—জন্ম থেকে শত শত বন্ধনে বন্দী মানুষ। শত নিষেধাজ্ঞা পদে পদে। একমাত্র প্রব্রজ্যায় নিষেধ নেই। প্রব্রজ্যার পথ বন্ধ করে দেওয়া অমানবিক নিষ্ঠুরতা।

বিম্বিসার নিজেকে বলতে শুনলেন কিন্তু তা হলে এই জগৎসংসার, এই রাজ্য, এই জনযাত্রা চলবে কী করে দেব ? কী ভাবে চালাব ? একদিনেই তো সমগ্র পৃথিবী ভবচক্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে না ? প্রব্রজিত ভিক্ষুদের পিণ্ডদানের জন্যও তো সমাজ চাই ? কে ধারণ করবে সেই সমাজ ?—এতো কথা তিনি বলেননি। তথাগতর ভাষাও সামান্য ভিন্ন ছিল। কিন্তু তবু এ সবই তাঁরা উভয়েই বলেছিলেন, একে অপরের ভাষ্য পরিপূর্ণ বুঝতে পেরেছিলেন। নীরব সব। নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ। তারপর সেই ব্রহ্মঘোষ :

...তাই হবে। সৈনিকদের থেকে প্রব্রজ্যার অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

তথাগতর কণ্ঠে এখন জল। অতল ওই চোখদুটিতেও কি বাষ্প ? বিম্বিসার তথাগতকে দুঃখ দিয়েছেন। রাজার কাজই হল দুঃখ দেওয়া। দুঃখ দেওয়া, দুঃখ পাওয়া, দুঃখ পাওয়া...

দুঃখ-শূন্যতা-বিজয়ের গরিমা ও শান্তি, শূন্যতা-শান্তি-দুঃখ, শান্তি-দুঃখ-শূন্যতা তিনটি চক্রের মতো ঘুরে যাচ্ছে তীব্র বেগে। একে অপরকে স্পর্শ করছে আবার সরে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ বিম্বিসারের মনে পড়ল কিছু। তিনি বললেন—সখা চণক, কোথাও কি কিছু হারিয়েছ ?

—কই না তো মহারাজ!

—ভেবে বলো!

—ভেবে পাচ্ছি না তো!

বিম্বিসার তাঁর পাশে রাখা স্থবিকাটি খুলে, ধীরভাবে একটি বস্তু বার করে আনলেন, ডান হাত দিয়ে খানিকটা তুলে ধরে বললেন—চিনতে পারো ?

একটি সুবর্ণমণ্ডিত কঙ্কতিকা, মধ্যে মধ্যে রক্তাভ মুক্তা। কালো দাঁতগুলি কঙ্কতিকার। সব মিলিয়ে ঝকঝক করে উঠল কক্ষ। কঙ্কতিকার মধ্যে লিখিত কাত্যায়ন চণক।

চণকের দূরযাত্রী চিত্ত যেন এক লম্ফে বিশ যোজন পেরিয়ে এলো। দুই চোখে ব্যগ্র বিস্ময়।

—এ কঙ্কতিকা কোথায় পেলেন মহারাজ ? কোথায় ?

মৃদু মৃদু হাসছেন বিম্বিসার—'তবে যে বলছিলে হারাওনি কিছু! দৈবরাত চণক যে স্বর্ণ-মুক্তার কাঙাল নয়, তা সবাই জানে। এই কঙ্কতিকা কোন প্রিয় উপহার ? কোন সুপ্রিয় অভিজ্ঞান ? বলবে না আমায় সখা চণক ?

—বলছি। কোথায় পেয়েছেন, কী ভাবে পেলেন শীঘ্র বলুন মহারাজ।

—একটি চোরের কাছ থেকে। শুধু চোর নয়, একটি চোরও নয়। দুটি চোর। চৌর এবং চৌরী। চৌরীটি তার কেশে পরেছিল এই কঙ্কতিকা। রাজভটদের সন্দেহ হয়, বন্য যক্ষীর মাথায় সুবর্ণ কঙ্কতিকা ? ধরে স্থানীয় বোহারিকের কাছে নিয়ে যায়।

চণক উঠে দাঁড়িয়েছে—তারপর ? মহারাজ তারপর ?

—তারপর আর কী ? কঙ্কতিকায় কাত্যায়ন চণকের নাম দেখে বোহারিক একেবারে আমার কাছে সোজা পাঠিয়ে দিলেন দ্রব্যটি।

—'আর সেই যক্ষ-যক্ষী ?'

'চোরের শাস্তি পেয়েছে। আবার কী ? চোরটির হয়ত দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করবার আদেশ হয়েছে। চৌরীটির...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যা-মুক্ত শরের মতো দৈবরাত চণক ছুটে বেরিয়ে গেল।

মহারাজ হতবুদ্ধি হয়ে বললেন—'কোথায় যাও ?'

তিষ্যকুমার হতবুদ্ধি হয়ে বলল—'কী হল ? কী হল ?'

তোরণের পর তোরণ পার হচ্ছে, শিথিলভঙ্গি দ্বারীরা ছুটন্ত পুরুষমূর্তি দেখে বিস্মিত সতর্ক হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে...এ ওকে বলছে—রাজমিত্র মহামান্য চণক না ?

—উনি তো মহারাজের আচারিয় পুত্ত, এই তো কিছুক্ষণ আগে...

নিজের অশ্বও ছেড়ে, কোনদিকে না তাকিয়ে উন্মত্তের মতো ছুটে যাচ্ছিল চণক। চিত্তক তীব্র স্বরে হ্রেষা করে উঠল। চণক দৌড়ে গিয়ে এক লাফে উঠল তার পিঠে। —'চল চিত্তক, চল—উত্তর তোরণ। আমক শ্মশান'—যেন চিত্তক তার ভাষা বুঝবে। উল্কাবেগে ছুটে চলেছে চণক। রাজপথে পদযাত্রীরা ছুটে সরে যাচ্ছে। রথগুলি কোনওমতো পাশ দিচ্ছে। পথকুক্কুরগুলি চিৎকার করে দৌড়চ্ছে। একটি মার্জার বোধহয় চিত্তকের পায়ের এক আঘাতে দূর ছিটকে পড়ল। পিষ্ট হয়ে গেল একটি কুক্কুরশাবক।

—আরও জোরে চিত্তক আরো জোরে...চণক সামনে ঝুঁকে পড়েছে।

হতবুদ্ধি মহারাজ বললেন—গুরুতর কিছু হয়েছে, তিষ্যকুমার শীঘ্র চলো। দ্বারী ! আমার অশ্ব প্রস্তুত করতে বলো। যতো তাড়াতাড়ি পারো।

দিবসের তৃতীয় যামেই যেন অমানিশার ঘোর তমিস্রা নেমেছে। চণক পথ দেখতে পাচ্ছে না। শুধু দিক। উত্তর। উত্তর প্রান্ত। দু পাশ দিয়ে ছুটে পেছনে সরে যাচ্ছে বৈপুল্ল, বৈভার। গিরিগুলিও বুঝি দৌড়চ্ছে। তাদের এতদিনের স্বভাব, স্থাবরতা ত্যাগ করে কোন মহা উদ্বেগে মহা আশঙ্কায় দৌড়চ্ছে। দৌড়চ্ছে বৃক্ষগুলি। জনবহুল রাজমার্গ ? তা-ও দৌড়চ্ছে।

অবশেষে আমক-শ্মশান। ঘন বৃক্ষ দিয়ে ঘেরা রাজগৃহের বধ্যভূমি। এখানে অপরাধীদের হস্ত পদ ছেদন করা হয়। পাশবিক চিৎকার করতে করতে শূলদণ্ডে বিদ্ধ হয় মানুষ। যূপবদ্ধ মস্তকের ওপর নেমে আসে ভয়ানক খড়্গ। রক্ত ছিটকে যায়, মুণ্ড ছিটকে যায়। ছুটে আসে রক্ত পিপাসু তরক্ষু, শৃগাল। ওপর থেকে ঝুপ ঝুপ করে নামে গৃধ্রদল। গলা অবধি প্রোথিত জীবিত মুণ্ডের দিকে ধেয়ে যায় দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার মতো পশুপাখিগুলি। কেউ চোখ খুবলে নেয়, কেউ এ কান, কেউ ও কান। জীবিত মুণ্ড শুধু মরণান্তিক আতঙ্কে, যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে। তরক্ষুর হাসির শব্দে ডুবে যায় তার ত্রাসস্তিমিত স্বর। তারপর পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অর্ধজীবিত দেহটিকে বার করে পশুরা। একটি মনুষ্যশরীর চেতনার শেষবিন্দু পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হতে থাকে। চোর, দস্যু, ভ্রূণঘাতক, হত্যাকারী, ব্যভিচারিণী, বৈদেশিক চর, রাজদ্রোহী—সবারই অল্পাধিক এই জাতীয় দণ্ড। তবে অপরাধী সহজে মেলে না। সবাই জানে অপরাধের এই ভয়াবহ পরিণাম। নগরীতে এই আমক শ্মশান প্রত্যক্ষ। নগরবাসীর অস্তিত্বের মধ্যে বিদ্ধ এক আতঙ্কবিন্দু। কিন্তু, নগরী থেকে যতই দূরে যাওয়া যাবে ততই এ স্মৃতি ক্ষীণ, ক্ষীণতর। জানা আছে কিন্তু সে এক অপ্রত্যক্ষ নৈর্ব্যক্তিক তথ্য। আছে। রাজগৃহের উত্তর তোরণের বাইরে একটি আমক শ্মশান আছে। এই পর্যন্ত। তাই নগরীর বাইরে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে চলাচলের সুদীর্ঘ পথগুলিতে, নদীগুলিতে চৌর্য আছে, দস্যুবৃত্তি আছে, ব্যভিচারও আছে। ঘাতকের দিনগুলি সবই বিফল যায় না।

চিত্তক তার আরোহীসমেত শরের মতো নিক্ষিপ্ত হল এই বধ্যভূমিতে। তখন একটি কৃষ্ণাঙ্গ তরুণের দ্বিতীয় হস্তটিও ছিটকে পড়ছে রক্তে ভেজা মাটির ওপর। পার্বত্য ঝর্ণার মতো গরম রক্ত উঠছে। রক্তকরবীর মালা পরা প্রকাণ্ড মূর্তিটি পিশাচের মতো হাসছে। —'শাস্তি দিয়েছি, রাক্ষসকে শাস্তি দিয়েছি। রাক্ষসীকে শাস্তি দিয়েছি। এক জোড়াকে পারিনি। আরেক জোড়াকে পেরেছি। চণক লাফিয়ে নেমে খড়্গসমেত সেই ভীষণ হাত ধরল।

—থামো ঘাতক, থামো।

—থেমেছি তো। যে পর্যন্ত শাস্তি আদেশ ছিল, দিয়েছি। তারপর থেমেছি।

—উদ্দক। উদ্দক ! চণক ডাকল

—দুই কাঁধ থেকে স্রোতের মতো রক্তপাত হচ্ছে। কৃষ্ণাঙ্গ তরুণটি লুটিয়ে পড়েছে। তার চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোলা, কিন্তু তাতে কোনও দৃষ্টি নেই।

চণক নিজের উত্তরীয় ছিঁড়ে প্রাণপণে স্রোতের মুখ বাঁধতে বাঁধতে বলল—ঘাতক বৈদ্য ডাকো, বৈদ্য আনো। শীঘ্র, বিলম্ব করো না। একটি বালিকা ছিল, বালিকা...তাকে কোথায় রেখেছো?

ঘাতক রক্ত চক্ষে চেয়ে বলল—সে-ই তো প্রকৃত অপরাধিনী। তার নাক-কান কেটে ফেলে দিয়েছি।

—বলছো কী? চণক বাতাসের অভ্যন্তর চিরে আর্তনাদ করে উঠল। কোথায় সে? কোথায়?

আঙুল দিয়ে দেখালো ঘাতক—ওই তো, ওই দিকে দেখতে পাচ্ছেন না?

দু-তিনটি শবদেহের ওপর থেকে কৃষ্ণবর্ণ একটি হাত এলিয়ে পড়ে আছে।

বিম্বিসার যখন তিষ্যকুমার এবং আরও রক্ষীদের নিয়ে বধ্যভূমিতে পৌঁছলেন তখন কৃষ্ণকায় সেই তরুণীর কর্ণ-নাসিকাহীন শির কোলে নিয়ে চণক উন্মাদের মতো হাহাকার করছে—রগ্‌গা, রগ্‌গা, রগ্‌গা...।

বিম্বিসার পেছন ফিরে রক্ষীদের আদেশ করলেন—জীবক বৈদ্য এবং বৈদ্য সম্প্রতিকে নিয়ে এসো। অবিলম্বে। বলবে রাজাদেশ। মুহূর্তকালও যেন বিলম্ব না হয়।

আরও কয়েকজন রক্ষীর দিকে ফিরে বললেন—শীতল জল আনো, পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড। শীঘ্র যাও।

চণকের পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়েছেন বিম্বিসার। ভুলে গেছেন তিনি রাজা। চতুর্দিকে তাঁর ভৃতিভোগী রক্ষী, প্রহরী, ঘাতক দল। তাদের সামনে তিনি এক মাত্র বুদ্ধ তথাগত ছাড়া আর কারো কাছে নত হন না। এমনকি যখন অজিত বা নির্গ্রন্থ নাতপুত্র কিম্বা সঞ্জয়ের কাছেও যান সমবেত শিষ্যমণ্ডলী, শ্রোতামণ্ডলী উঠে দাঁড়ায়। উচ্চাসনে বসে থাকেন সঞ্জয় বা নাতপুত্র, কিম্বা অজিত তাঁরাও তাঁকে আশীর্বাদের ছলে উঠে দাঁড়ান। তিনি উপবিষ্ট হলে, তবে সবাই আবার বসেন। একমাত্র ব্যতিক্রম বুদ্ধ তথাগত। আর ব্যতিক্রম ঘটল আজ। আত্মবিস্মৃত রাজা নিজের দণ্ডমুকুটধারী ভাবমূর্তির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে মাটিতে জানু ঠেকিয়ে বসে বললেন—চণক, চণক, কী হয়েছে বন্ধু? কী হল?

নিজের হাত দিয়ে তরুণীর রক্তাক্ত নাসাস্থল আবৃত করে চণক বলল— অপরাধী নয়, নয়, এই বন্য তরুণ-তরুণী, রাজা এরা দিনের পর দিন আমায় আতিথ্য দিয়েছে সখ্য দিয়েছে, রক্ষা দিয়েছে, উজ্জীবন দিয়েছে, আর আমি এই সামান্য কঙ্কতিকা উপহারের ছলে আজ তাদের এই দিলাম। এই দিলাম মহারাজ এই দিলাম। ধিক সভ্যতা, ধিক আর্যতা, ধিক রাজশাস্ত্র। ধিক, ধিক, ধিক...

সমগ্র বধ্যভূমি, রাজভূমি, ভারতভূমি সাগরমেখলা আকাশমৌলি ধরাভূমি সেই ধিক্কারে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

৩২

বোহারিক বললেন—অনঙ্গ চণ্ডাল ধরে এনেছিল। মাথার চুলে সুবর্ণ কঙ্কতিকা দিয়ে সাজ-সজ্জা করে ওই বন্যতরুণী তরুণের হাত ধরে রাজগহ নগর দেখতে এসেছিল।

বিম্বিসার বললেন—আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করেননি, সে কোথায় এ কঙ্কতিকা পেল?

—জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললে এক যতি দিয়েছে। এরা সর্বশ্রেণীর সন্ন্যাসীকে যতি, জটি এই সব বলে, জানেন তো?

—ভালো কথা, সে তো আত্মপক্ষে কিছু বলেছিল। মানলেন না কেন?

মহারাজের মুখ দেখে বোহারিকের তালু শুকিয়ে গেল। তিনি বললেন—কঙ্কতিকায় মহামান্য কাত্যায়ন চণকের নাম তঙ্কিত রয়েছে দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম চণককে চেনে কি না। বলল—না, চেনে না। এখন দেখুন মহারাজ, একে বন্য, তারপর সুবর্ণের দ্রব্য, এ দিকে বলছে যতি দিয়েছে। কী অসম্ভব কথা! সন্ন্যাসী কখনও কাউকে কিছু দেয় উপদেশ ছাড়া? যদি বা দেয় সুবর্ণ দেবে? তারপর মহামান্য চণকের নামাঙ্কিত দ্রব্য। চণককে তারা চেনে না। আমি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আপনার একবারও মনে হল না তরুণ-তরুণী দুটির চুরির দ্রব্য অমন সর্বজনের দেখার জন্য প্রকাশ্যে পরে ঘুরে বেড়ানো অস্বাভাবিক। চোর তো চোরাই দ্রব্য গোপনই করে।

—না। উপহার অথচ উপহর্তাকে চেনে না...

—এ-ও তো আপনার মনে হতে পারতো যে কন্ঠতিকাটি হয়তো হারিয়ে গিয়ে থাকবে, সত্যই কোনও সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীবেশধারী কুড়িয়ে পেয়ে তরুণীটিকে উপহার দিয়েছেন সেটি।

—মহারাজ, অপরাধ মার্জনা করবেন, প্রণয়ীরা তরুণীদের কন্ঠতিকা উপহার দিতে পারে, সন্ন্যাসীরা নয়। বন্যদের কথাবার্তা আচরণ এতোই অসঙ্গতিপূর্ণ যে...

সে কথাই বলছি বোহারিক মহোদয়, এতোই অসঙ্গতি যখন ছিল ঘটনাটিতে এবং কাত্যায়ন চণকের নামাঙ্কিত ছিল যখন দ্রব্যটি, তখন আপনি চণকভদ্রকে ডাকলেই তো পারতেন। তিনি কী উত্তর দেন, জানা আপনার প্রয়োজন ছিল না?

—মহারাজ ক্ষমা করবেন, অনঙ্গ তার দলবল নিয়ে বন্য দুটিকে বেঁধে এনেছিল। ভীষণ স্বরে বলছিল, যক্ষরা শিশুহত্যা করেছে। যক্ষরা চুরি করেছে, তাদের দণ্ড দিন। দণ্ড দাবি করছি বোহারিক। দণ্ড না দিলে এ বার গোটা রাজগহ আমক-শ্মশান করে দিয়ে চলে যাবো। কোনও শব আর দাহ হবে না।

—ও, তাহলে অনঙ্গ চণ্ডালই বোহারিক ছিল। আপনি ছিলেন না!

—না, অর্থাৎ, সময় দিতে চাইছিল না, ঘিরে রেখেছিল বিনিশ্চয়াগার...

—ও তাহলে আপনি চণ্ডালদের ভয়ে অন্যায় হচ্ছে জেনেশুনেও অমন দণ্ড দিলেন...

—না, মহারাজ, আমার প্রত্যয় হয়েছিল বন্যরা মিথ্যা বলছে...

—আপনি বোহারিক পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। আসন ত্যাগ করুন। আর কোনওদিন মগধের সীমানার মধ্যে বোহারিকের কাজ করবেন না। চলে যান, এই মুহূর্তে।

—কে অনঙ্গ চণ্ডাল? কে?

রক্তকরবীর মালা পরা রক্তবসনধারী বিশালকায় অনঙ্গকে কারা পেছন থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিল। —এ, মহারাজ, এই অনঙ্গ চণ্ডাল।

—তুমি দলবল নিয়ে বোহারিকের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিলে?

—দলবল ছিল। বাধা তো কিছু দিইনি। উদ্ধত উত্তর।

—বন্যরা চুরি করেছিল কি না তা তো স্পষ্ট প্রমাণ হয়নি অনঙ্গ? তার আগেই তুমি দণ্ড দাবি করোনি?

—স্পষ্ট প্রমাণ হলেও তো এ রাজ্যে অপরাধীর দণ্ড হয় না মহারাজা। আমাদের বচ্চগুলিকে খেয়ে যক্ষিণী তো দিব্যি রয়েছে। সুগন্ধি যাউ খাচ্ছে নাকি আজকাল।

—তাই তুমি অন্য এক যক্ষিণীর ওপর প্রতিশোধ নিলে?

অনঙ্গ আগুন-ঝরা চোখে চেয়ে চিৎকার করে বলল—হত্যাকারীর দণ্ড যে বন্ধ করেছে সেই সমন বুদ্ধকে আগে দণ্ড দাও রাজা, এই বচ্চহারা দলিদ্দদের বঞ্চনা করে সগ্‌গলাভের কথা শুনিয়েছে যে, সেই সমন মোগগল্লানকে আগে দণ্ড দাও রাজা, দণ্ড দাও, দণ্ড দাও।

সে তার দু হাতের শৃঙ্খল বিনিশ্চয়াগারের পাথরের স্তম্ভে ঠুকতে লাগল।

পেছনে অন্য চণ্ডালগুলি। হাত জোড় করে বলল—অনঙ্গ উন্মাদ হয়ে গেছে, মহারাজ, বচ্চ হারিয়ে একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। মাজ্জনা চাইছি। মাজ্জনা করুন।

—উন্মাদের স্থান লোকালয়ে নয়। প্রহরী এই উন্মাদকে কারারুদ্ধ করো।

বিনিশ্চয়াগার থেকে ক্লান্ত পদে, ক্লান্ত মনে বেরিয়ে এলেন বিম্বিসার। রথে উঠলেন। রথ ছুটল। অবসন্ন রাজা অঙ্গ শিথিল করে, চোখ বুজলেন। বড় ক্লান্তি, মহা ক্লান্তি, এত ক্লান্তি কেন?

—রক্তপাত নয়। এই বন্যরা রক্তপাতে কাদু হয় না। এদের শরীর অতি কঠিন ধাতু দিয়ে নির্মিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তা হলে ? তাহলে তরুণটিকে বাঁচানো গেল না কেন আয়ুষ্মান জীবক ? তুমি কী মনে করো ?

—মান্যবর সন্নতি, আমার ধারণা তরুণটির চিত্তে একটা দারুণ আঘাত লেগেছিল। তার থেকেই হৃৎপিণ্ড বিকল হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত একটা আঘাত।

—চিত্তে আঘাত ? শরীরের আঘাতের চেয়েও বড় ?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

বৈদ্য সন্নতির বয়স হয়েছে। কেশে ভালোই পাক ধরেছে। চিকিৎসা করে করে তাঁর হাত মন-মস্তিষ্ক সবই যেন যন্ত্রের মতো সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। এখন এসেছে এই তরুণ যুবা জীবক! তাঁর মুখে বক্র হাসি খেলে গেল। চিত্ত! হুঃ! চিত্ত! রক্তপাতটা কিছু না। কিছুই না।

দেখুন মহামান্য সন্নতি মনে কিছু করবেন না, চোরেদের হস্তচ্ছেদ তো হয়েই থাকে। কেউ মারা গিয়েছে বলে শুনেছেন কী ? জীবকের মুখ গম্ভীর। চোখে সামান্য কৌতুকের ঝিলিক। সে বৈদ্য সন্নতির বাঁকা হাসি লক্ষ করেছে।

সন্নতি বললেন—কিন্তু আয়ুষ্মান জীবক, সাধারণত চোরেদের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করা হয়, তা-ও কনুই থেকে। এ ব্যক্তির দুই হাতই কেটে ফেলা হয়েছে, একে বারে বাহুমূল থেকে। ক্ষত আরও ভয়াবহ। রক্তপাতও পরিমাণে অনেক।

—কিন্তু মহারাজের আচার্যপুত্র চণক তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে রক্তপাত বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন! রোগী তো ঔষধপ্রয়োগের সময় দিল না। একটি বন্য যুবার শরীরের শক্তি, সহন ক্ষমতা এ গুলি তো সভ্য মানুষের থেকেও অধিক হবার কথা মহামান্য সন্নতি! এ তো হস্তচ্ছেদ নয়, যেন শিরশ্ছেদ। ওর প্রাণ কি ওই হস্তদ্বয়েই ছিল ?

—পরিহাস করছো জীবক ? মহামান্য সন্নতির মুখ গম্ভীর।

জীবক বলল—কী বলছেন আপনি মান্যবর ? পরিহাস করবো ? আয়ুর্বেদের নূতন দিক উন্মোচিত হতে যাচ্ছে আর আপনি বলছেন পরিহাস ?

—কী বলতে চাইছো, পরিষ্কার করে বলো। আমি কিছুদিন হল কানে ভালো শুনি না।

জীবক মনে মনে বলল—একটু চিৎকার করে বললেই আপনার কানে কথাগুলি ঠিকই পৌঁছে যাবে। কিন্তু মনে পৌঁছবে কী ? মনকে যে দ্বাররুদ্ধ কক্ষের মতো করে রেখে দিয়েছেন!

মুখে বলল—প্রাণ কোথায় থাকে কেউ জানে না, মহাবেজ্জ। ত্রিদোষ বিকারের ফলে দেহস্থ প্রধান প্রধান যন্ত্রের একটি যখন বিকল হয়ে যায়, তখন প্রাণ বেরিয়ে যায়। প্রধান প্রধান অঙ্গ ছেদন করলেও যায়। কিন্তু অন্যথায় যাবার কথা নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে—আকস্মিক আঘাত—শুধু শরীরে নয়, মনে, হৃদয়ে, মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই যে বন্য যুবা তার প্রণয়িণীকে নিয়ে নগর দেখতে এসেছিল, তাদের হৃদয় ছিল আনন্দে পরিপূর্ণ। শঙ্কার লেশমাত্র তাতে ছিল না। কঙ্কতিকাটি তারা এমন কারও কাছ থেকে পেয়েছিল যাকে উভয়েই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। ওই কঙ্কতিকার জন্য যে তাদের শাস্তি পেতে হতে পারে, তা তারা কল্পনাও করেনি। এই আকস্মিক মানসিক আঘাত এদের মৃত্যুর প্রধান কারণ।

সন্নতি বললেন—এদের মৃত্যুর ? উভয়ের কথা বলছো নাকি ?

জীবক ভাবিত স্বরে বলল—বললাম, বলে ফেললাম।

সন্নতি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন— চলো আয়ুষ্মান, বালিকাটিকে আরেকবার দেখে আসি।

জম্বুবনের মধ্যস্থিত গান্ধারভবন নামে কাঠের অনুপম প্রাসাদটিতে শোকময় স্তব্ধতা। প্রধান শয্যাগৃহ এখানে চারটি। জিতসোমা ও চণকের ছাড়াও দুটি স্বতন্ত্র শয্যাগৃহ আছে। জিতসোমার কক্ষটি অন্তঃপুর ঘেঁষে। বাকি তিনটি আসনশালার কাছেই। জিতসোমা সেদিন আপনকক্ষে ব্যস্ত ছিল লিখতে। তক্ষশিলার অনেক আচার্য ও ছাত্ররা মনন-প্রয়োগে অত্যন্ত কুশলী হয়। একই সঙ্গে তিন চার পাঁচ প্রকার ভাবনা চিন্তা করা তাদের কাছে কিছুই না। এইভাবে শতাবধান ব্যক্তি অর্থাৎ একই সঙ্গে একশ দিকে মন প্রয়োগ করতে পারেন এমন পণ্ডিতও সেখানে বিরল নয়। কিন্তু জিতসোমার একটিই মন, তার প্রয়োগও এক কালে দুই প্রকার হয় না। সে অনন্যমনে লিখছিল। সে শুধু অনুলিপিকার নয়। প্রকৃতপক্ষে জিতসোমা রাজশাস্ত্র পড়তে পড়তে এমনই মগ্ন হয়ে গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, তার নিজের চিন্তা, নিজের ধারণাও এই তথাকথিত অনুলিপির মধ্যে প্রবেশ করছে। সে এ কথা এখনও চণককে বলেনি। বলবে কিনা ভাবছে। চণক হয়ত তার ভাবনাগুলিকে যথাযথ মূল্যই দেবেন। কিন্তু স্বতন্ত্র করে লিখতে বলবেন, যা জিতসোমার মনোমত নয়। এই সময়ে অশ্বক্ষুরের শব্দ। যেন বহুজন একসঙ্গে তার গৃহের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মানুষের মুখের শব্দ নেই। খালি রথের ঘর্ঘর, অশ্বের মৃদু হ্রেষা, কিন্তু এত অশ্ব রথ ও মানুষ যে, গৃহটি যেন কাঁপছে। জিতসোমা ছুটে বেরিয়ে এলো। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে সে, দীর্ঘ কেশ লুটোচ্ছে, উত্তরীয়টি যেমন তেমনভাবে গায়ে জড়ানো। সে দেখল রাজরথ আসছে। দুদিক থেকে দুটি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল তিষ্যকুমার ও জীবকভদ্র। জীবকভদ্রকে সে রাজান্তঃপুরে কয়েকবারই দেখেছে। চিনতে পারল। রথ থেকে সাবধানে নেমে এলেন আর্য চণক। তাঁর প্রসারিত দু হাতের ওপর একটি নিস্পন্দ কৃষ্ণাঙ্গ নারীশরীর। একপ্রকার নগ্নই বলতে গেলে। কটিবস্ত্রটি ছিন্নভিন্ন। প্রথমেই সোমা দেখল দুটি সুবর্তুল কৃষ্ণোজ্জ্বল স্তন, কঠিন শিলানির্মিত মনে হয়। আকাশের দিকে তাদের বৃন্ত উঁচিয়ে রয়েছে। তারপর চোখ পড়ল মুখের ওপর। রক্তের দাগ, নানাভাবে পট্টিকা লাগানো। চণক তরুণীটিকে বয়ে আনছেন অতি সাবধানে, তাঁর চোখ মুখের ভাব কেমন অদ্ভুত। যেন তিনি কাউকে চিনতে পারছেন না। যেন তিনি এ জগতে নেই।

তাঁকে পথ করে দেবার জন্য জিতসোমা চকিতে সরে গেল, চণক প্রবেশ করলেন তাঁর আপন শয্যাগৃহে। পেছন-পেছন আসছেন মহারাজ বিম্বিসার, বৈদ্য সন্নতি। রাজরক্ষীরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। চণক নিজের মৃগচর্ম আচ্ছাদিত শয্যায় শুইয়ে দিলেন তরুণীটিকে। একটু সরে দাঁড়ালেন, জীবকভদ্রর দিকে চাইলেন, জীবকভদ্র ও বৈদ্য সন্নতি দুদিক থেকে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। চণক মাথার কাছে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। একেবারে স্তব্ধ।

জিতসোমা কিছুই বুঝতে পারছিল না। এ কে? একে তাদের গৃহেই বা আনা হল কেন? চণকের এরূপ অবস্থাই বা কেন? তরুণীটি কি তাঁর প্রণয়িনী? কে একে এভাবে আঘাত করলে? এমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ব্যাপারটিকে যে স্বয়ং মহারাজ বিম্বিসার এসেছেন!

এই সময়ে জীবক বলে উঠলেন— জল, গরম জল।

সোমা তাড়াতাড়ি ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ানো এক দাসীকে গিয়ে নির্দেশ দিল। সন্নতি এতক্ষণ তরুণীটির নাড়ি ধরেছিলেন। এবার তিনি ডান হাতটি ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন। জীবকের দিকে চেয়ে বললেন— নাড়ি ক্ষীণা, তবে ভয়ের কিছু নেই।

জীবক বললেন— পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড চাই। দুটি কম্বল। রোগিণীর দেহ বড়ই শীতল।

সোমা আবার দ্বারের কাছে গেল।

জীবক বললেন— ভদ্রে আপনি কি রোগিণীকে গরম জল দিয়ে পরিষ্কৃত করে দিতে পারবেন। আমি আর আর্য সন্নতি থাকবো। নির্দেশ দেবো।

সোমা বলল—না।

চণক মুখ তুলে তাকালেন। তিষ্যকুমার কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। মহারাজ বিম্বিসার বললেন কল্যাণি, তোমার দাসীদের নির্দেশ দাও।

জিতসোমা এবার দ্বারের কাছে গিয়ে দুটি দাসীকে ডেকে দিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সে দেখেছে তরুণীটির নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন করা হয়েছে। সেখানে পট্টিকা লাগানো, কিন্তু সে দেখেছে। ব্যভিচারিণীর শাস্তি। এই কৃষ্ণাঙ্গিনী কে? দেখে মনে হয় অতি নিম্নবর্ণের। গান্ধার মদ্র এসব দেশে এই প্রকার কৃষ্ণাঙ্গ বড় একটা দেখা যায় না। বসনটি তক্ষশিলার মুনিদের মতো। বৃক্ষবল্কল। কার স্ত্রী হতে পারে এই রমণী! কার সঙ্গেই বা ব্যভিচার? আর্য চণক এরূপ বিষণ্ণ কেন? তরুণীটি কি তাঁর পত্নী? এই রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করতে সোমার কেমন ঘৃণা হচ্ছে। আরও কী হচ্ছে সে প্রকাশ করতে পারছে না। সে নিজের কক্ষে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে দিল। শয্যায় বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পর জিতসোমা দেখল তার দুই চোখ জ্বালা করে অশ্রু ঝরছে। অশ্রু ঝরছে।

রোগিণীকে পরিষ্কৃত করে দাসীরা একটি নূতন বস্ত্র পরিয়ে দিয়েছে। উত্তরীয় দিয়ে ঢেকে দিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊর্ধ্বাঙ্গ। দুটি কম্বল দিয়ে তার কণ্ঠ পর্যন্ত ঢাকা। শুধু তার সুপ্রচুর কেশ এখনও পর্যন্ত কিছু করা যায়নি। ঝাঁকুনি লাগলে আবার রক্তক্ষরণ হতে পারে। ভৈষজ দিয়ে ভালভাবে বাঁধা হয়েছে ক্ষতস্থান। সারা মুখটিই পট্টিকা দিয়ে আবৃতপ্রায়।

সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হলে জীবক বললেন— মহামান্য সন্নতি। কত দিনে ক্ষতস্থান শুকোবে বলে আপনার মনে হয়!

সন্নতি বললেন— সম্পূর্ণ শুকোতে পক্ষকাল তো অন্তত সময় নেবেই!

আমারও তাই অনুমান। তারপর একে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখব। তারপর মহারাজ এবং চণকভদ্রর যদি অনুমতি হয়, আমি এর কৃত্রিম কর্ণ ও নাসিকা প্রস্তুত করে দেবো।

জীবক উঠে দাঁড়ালেন।

সন্নতি বললেন, কৃত্রিম কর্ণ-নাসিকা ? জীবক তুমি কি পাগল হলে ? শুনেছি বটে তুমি সুবন্ন সেট্‌ঠির করোটি ভেদ করে কৃমিকীট বার করে এনেছো।

জীবক বললেন— জটিল সেট্‌ঠির এক পত্নীর উদরেও শল্যচিকিৎসা করেছি মহামান্য সন্নতি। ওঁর অন্ত্রগুলি পাকিয়ে গিয়েছিল। সেগুলি বাইরে এনে গ্রন্থিমোচন করে আবার কুক্ষিতে সংস্থাপন করেছি। মহারাজের ভগন্দর তো অস্ত্র করে বাদ দিয়েছিই। এবার...

—একি জাদু না কি ? জাদুবিদ্যা ? বিরক্ত এবং আশ্চর্য হয়ে সন্নতি বললেন।

জীবক হাতের একটা ভঙ্গি করে বললেন— আপনি নিজে একজন ভিষক হয়ে, যদি এ প্রকারের কথা বলেন, তবে আর কী করতে পারি ? চিকিৎসা-বিদ্যায় জাদুর স্থান নেই মহারাজ। আপনি যদি অনুমতি দেন এই তরুণীটিকে তার পূর্বের রূপ ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারি।

বিস্মিত বিম্বিসার বললেন— কী ভাবে জীবক ? আমায় বোঝাবে ? অসুস্থ প্রত্যঙ্গ বাদ দেওয়া এক বস্তু। কিন্তু নূতন প্রত্যঙ্গ সংযোজন করা...

জীবক বললেন— মহারাজ, আপনাদের যতটা সহজভাবে বোঝানো যায়, সেভাবে বলছি। আমার পরিকল্পনা হল দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রশস্ত অশ্বত্থপত্র দিয়ে কাটা নাকের মতো একটি কৃত্রিম নাক প্রস্তুত করব, তারপর তার সমান করে গণ্ড কিংবা গ্রীবা থেকে চর্ম কেটে নেবো। তাই দিয়ে নাক গড়ে মুখে নাকের কাটা অংশের উপরে বসিয়ে পশুরোম দিয়ে সেলাই করে দিলে ধীরে ধীরে জুড়ে যাবে। নূতন নাকের ভিতরে দুটি নল প্রবেশ করিয়ে দিলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও সুবিধা হবে। নাকটি দৃঢ়ও হবে। কান দুটি হয়ত দেখতে অত ভালো হবে না। না-ই হল। কিন্তু কৃত্রিম বলে কিছুতেই বোঝা যাবে না। অনুমতিটা দিয়ে ফেলুন মহারাজ।

AMARBOI.COM

বিম্বিসার বললেন— বৈদ্যর আবার অনুমতির প্রয়োজন কী ? প্রাণ সংশয়ের প্রশ্ন আছে না কি ?— তিনি চণকের দিকে তাকালেন।

জীবক বললেন— কিছুমাত্র না। তারপর তিনি চণকের দিকে তাকিয়ে বললেন— রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দিবারাত্র কারুর না কারুর থাকা প্রয়োজন।

চণক মৃদুস্বরে বলল— আমি থাকবো।

সন্নতি বললেন— একটি দাসীকে নিযুক্ত করবেন। রোগী রমণী যখন... তখন নানারূপ প্রয়োজন...

চণক বলল— সেবকের কোনও লিঙ্গ নেই।

পক্ষকাল কেটে গেছে। ক্ষতস্থানও শুকিয়ে এসেছে। যদিও দুই বৈদ্যর অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করে এখনও সম্পূর্ণ শুকোয়নি। দুদিন অন্তর অন্তর পট্টিকা পাল্টানো এবং নূতন করে ভৈষজ লেপন করা জীবক নিজেই নিষ্ঠাভাবে করে চলেছেন। কিন্তু তরুণীটি যেন এখনও আচ্ছন্ন, ভালভাবে জ্ঞান ফিরে আসছে না। জ্বর নেই। অথচ প্রলাপের প্রবণতা আছে। নিজেদের ভাষায় সে কী সব যেন বলে। চোখ মেলে। কিন্তু বোঝা যায় তার চৈতন্য নেই।

সন্নতি এর কোনও কারণ নির্ণয় করতে পারছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবকের নিজস্ব একটি মত আছে এ বিষয়ে, কিন্তু সে তা প্রকাশ করছে না। সে এখন অধীর হয়ে আছে নবনাসিকা ও কর্ণ প্রস্তুতের পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্য। এখন রোগিণী অচৈতন্য-প্রায় হয়ে আছে, গ্রীবা থেকে কলা কেটে নেওয়ার কাজটা এখনই নির্বিঘ্নে হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সে বুঝতে পারছে রোগিণী এখনও বিপদমুক্ত নয়। বাইরের ক্ষত শুষ্কপ্রায়, কিন্তু সেই আকস্মিকতার আঘাত, তাকে এখনও বিকল করে রেখে দিয়েছে। তার বিদ্যা প্রয়োগ করলে যদি রোগিণীর মৃত্যু হয় তো চণকভদ্র তাকে ছেড়ে দেবেন না। মৃত্যু হলে হবে অন্য কারণে, কিন্তু সম্ভবত চণকভদ্র তা বুঝবেন না। জীবক তীক্ষ্ণধী মানুষ। সে অনুভব করছে দৈবরাত চণক ঠিক সরল মানুষ নয়। অধিক কথা বলেন না। এখন একেবারেই বলছেন না। এখন তিনি শান্ত। বিবিক্ত। সবার কাছ থেকে যেন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, চিত্তের কোন গহনে তিনি যেন গুহাহিত। কিন্তু সে চণককে শ্মশানে ঝঞ্ঝাবাততাড়িত বনস্পতির মতো আক্ষেপ করতে দেখেছে। এর ভেতরে কোনও গূঢ় ব্যাপার আছে। যত সহজে জটিল সেট্ঠির তৃতীয়া পত্নীর উদর দেশ চিরে অন্ত্রগুলি সে গিঁট খুলে আবার ভেতরে সংস্থাপিত করতে পেরেছিল, এই বন্য তরুণীর চিকিৎসা তত সহজ হবে না। রোগী এবং বৈদ্য উভয়ের মধ্যে শুধু রোগ থাকলে সমস্যা সহজ হয়। কিন্তু যদি থাকে অজানা আবেগ, যদি থাকে রোগীর পরিপার্শ্বে বহুমাত্রিক সব বেদনার আঘাত সংঘাত... কঠিন প্রস্তরের মতো মুখ চণকভদ্র, অপরাধীর মতো নিমীলচক্ষু রাজা, বিস্রস্তকেশা সুন্দরী গান্ধারীর চোখে কৃষ্ণবিদ্যুৎ, তাহলে ? তাহলে তরুণ জীবকের কাজটা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে যায়।

উনিশ দিনের দিন জীবক এসেছে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে। পরিষ্কারও হয়ে গেছে। শুধু সামান্য নরম আঘাতের স্থানগুলি। তরুণীটি চোখ মেলে চাইল। চোখ দুটি স্বাভাবিক। স্বচ্ছদৃষ্টিতে সে চারদিকে চেয়ে দেখল। চোখে বিস্ময়। জীবক চোখের ইঙ্গিতে চণককে ডাকল। হাঁটু গেড়ে বসে চণক সতর্ক স্নেহের সুরে ডাকল— রগ্‌গা, রগ্‌গা...

বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল তরুণী, তার ঠোঁট নড়ছে। মৃদুস্বরে সে বলছে— অজ্জ আমায় ছেড়ে দে। অজ্জ তোদের পায়ে পড়ি আমাদের ছেড়ে দে।

চণক বলল —রগ্‌গা, কোনও ভয় নেই, তুমি ঘুমোও। তোমাকে সুপক্ব শূকরমাংসের সূপ খাওয়াবো। কত মধু, পায়স, উত্তম অন্ন, মোদক তোমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এবার তরুণীর চোখে ত্রাস ঘনিয়ে এলো, বলল— আমি অজ্জদের দাসী হবো না। তোদের পায়ে পড়ি, আমি খুড়ার কাছে যাবো। উদ্দক কোথায় ? উদ্দক ?

চণক শান্ত গলায় বলল— রগ্‌গা, আমরা তোমার বন্ধু। একটু ইতস্তত করে আবারও বলল— আমায় চিনতে পারছো না ?

তরুণী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। জীবক দেখল সহসা চণকভদ্র যেন কী মনে পড়েছে এমন মুখভাব করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। ঘরের কোণে একটি পেটিকা থেকে কী সব বার করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি যখন এদিকে ফিরলেন তখন জীবক দেখল, চণক ভদ্রর মাথায় জটা, দীর্ঘ দাড়ি এবং গোঁফ, কপালে বলি আঁকা। অমন সুন্দর উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ ভস্মাচ্ছাদিত। তরুণী চোখ বুজিয়ে ছিল। সে যে এখনও অত্যন্ত অবসন্ন, তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়, পরীক্ষা করবার প্রয়োজন হয় না। এখনও তাকে কঠিন খাদ্য খাওয়াবার সময় আসেনি। প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় একটু একটু করে দুধ মধু ও সহপানগুলি খাওয়ানো হয়েছে মাত্র। চণকভদ্র ওই প্রকার সাজসজ্জা করে তরুণীটির শয্যার পাশে এসে বসলেন, মৃদু কোমল স্বরে ডাকলেন— রগ্‌গা, রগ্‌গা... এখন দেখো তো আমায় চিনতে পারো কি না !

কয়েকবার ডাকবার পর তার চোখ দুটি খুলে গেল। তারপর যা ঘটল তার জন্য জীবক প্রস্তুত ছিলেন না। রোগিণীর চোখ-মুখ একবার বিবর্ণ তারপরই অগ্নিবর্ণ হয়ে গেল, সে বলে উঠল 'শঠ যতি ! শঠ ! শঠ ! শঠ !'... শয্যা থেকে সে অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে পড়ল চণকের ঘাড় লক্ষ্য করে। দু'হাত দিয়ে চণকের গলা টিপে ধরল। চোখদুটি বন্য মার্জারের চোখের মতো জ্বলছে।

জীবক তার হাত দুটি ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন— ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং চিৎকারে বাড়ির ভেতর থেকে কয়েকটি দাস-দাসী ছুটে এলো। জিতসোমাকে দ্বারের কাছে দেখা গেল। সে ক্ষিপ্র পায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে এসে রোগিণীর মণিবন্ধের কাছে সামান্য আঘাত করল, হাত দুটি ছেড়ে গেল। মুক্ত হাত দিয়ে এবার রোগিণী প্রাণপণে চণকের বক্ষে আঘাত করতে লাগল— নিয়ে যা, নিয়ে যা কাঁকই। চাই না, চাই না তোদের কিচ্ছু। সব নিয়ে যা—সন্ন, দীপ, তেল, অন্ন সব নিয়ে যা.... বলতে বলতে রোগিণী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। জীবক এবং জিতসোমা তাকে তুলে শয্যায় শুইয়ে দিলেন, ক্ষতস্থানের পট্টিকাগুলি রক্তে সামান্য ভিজে উঠেছে। উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে অর্ধশুষ্ক ক্ষতমুখ আবার খুলে গেছে।

জীবক ভর্ৎসনার সুরে বলল— এটা কী করলেন আর্য চণক?

চণক শূন্যচোখে চেয়ে বলল— এভাবেই ও আমাকে চিনত। বিশ্বাস করতো। সেবা করতো।

—করুক। আপনি বুঝতে পারেননি ও আপনাকে দেখে উত্তেজিত হবে!

—না। আমি ভেবেছিলাম ওকে আশ্বাস দেবো। সান্ত্বনা দেবো। ভেবেছিলাম ওকে অভয় দেওয়া যাবে... এ ভাবেই।

ছদ্ম জটাজুটে, ভস্মলেপনে এখন কেমন হাস্যকর অথচ করুণ দেখাচ্ছে চণককে। তার গলায় বন্য তরুণীটির হাতের চিহ্ন। রক্তাভ একটি মালার মতো। তরুণীটি যখন গলা টিপে ধরেছিল তিনি বাধা দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। এখন জিতসোমার ইঙ্গিতে দাসীরা গরম জল ও মার্জনী বস্ত্র নিয়ে এলো। সে জটাজুট, আধখোলা কৃত্রিম গোঁফ, দাড়িগুলি সব খুলে নিল। চণক দুহাত দিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো মুখ ধুলেন। শীতল জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজিয়ে ভিজিয়ে সোমা তাঁর কণ্ঠের চারপাশ ধুয়ে ধুয়ে দিচ্ছিল। বলল— জীবক ভদ্র, কোনও ভৈষজ অবলেপ্য দেবেন না?

—প্রয়োজন হবে না, ভদ্রে

—দেখছেন না কেমন ফুলে উঠেছে! ওই তরুণীর গায়ে কী অসম্ভব শক্তি।

জীবক রোগিণীকে একটি ভৈষজ খাওয়াবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। খাওয়াতে পারছেন না। তিনি একখণ্ড তূল ভৈষজে ভিজিয়ে নিলেন, বললেন ভদ্রে, আপনি একটু এর ওষ্ঠাধরদুটি ফাঁক করে ধরবেন?

সোমা প্রাণপণ চেষ্টায় শুধু ওষ্ঠাধর নয়, দাঁতের পাটিদুটিও সামান্য ফাঁক করতে পারলো। জীবক ভৈষজ পান করালো বিন্দু বিন্দু করে। কিন্তু তরুণীর জ্ঞান ফিরল না। সেদিন গভীর রাতে তার হৃৎ-স্পন্দন থেমে গেল।

সন্নতি বললেন— রক্তপাত। রক্তপাত!

জীবক আবারও বলল— আকস্মিক মানসিক আঘাত।

সন্নতি বললেন— মন অর্থাৎ চিত্ত? এ রোগিণী বন্য মনে রেখো।

জীবক বলল— মহামান্য সন্নতি, আঘাত পাবার মতো চিত্ত এই বন্যদেরও আছে, এটিই প্রমাণ হল। এরা বন্য হতে পারে, কিন্তু পশু নয়। আপনি বৈদ্য আপনার কাছে সভ্য মানুষে বন্য মানুষে প্রভেদ কী?

সহসা বৃদ্ধ সন্নতির বদ্ধ মনের দ্বার খুলে গেল। আলো প্রবেশ করছে। অনেক অনেক আলো। তিনি সকৃতজ্ঞ, সহর্ষ দৃষ্টিতে জীবকের দিকে তাকালেন। আয়ুষ্কালের শেষ পর্বে কে আর নূতন জ্ঞানের আশা করে! তিনিও করেননি। কিন্তু জ্ঞান এলো। আয়ুষ্মান জীবকের হাত দিয়ে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার হাত দিয়ে। তিনি মুখ নিচু করে আপন মনেই বলতে লাগলেন—জীবতু, জীবতু।

জীবক কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ ছিল। তার নবনাসিকা-কর্ণ নির্মাণের একটি সুযোগ এমন বৃথা গেল! আর কি সে এমন রোগী পাবে? কর্ণ-নাসিকাচ্ছেদন ব্যভিচারিণীর শাস্তি। চোর সন্দেহে কাউকে এই শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না। এই হতভাগিনী তরুণীর ওপর অপপ্রয়োগ হয়েছিল বোহারিকের ক্ষমতার। দ্বিতীয়ত এ তরুণী রাজসখা চণকের স্নেহভাগিনী, সুতরাং মহারাজেরও পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল এর ব্যাপারে। বৈদ্য সন্নতির আশীর্বাণী কানে যেতে সে মুখ তুলে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলল— আর জীবতু, রোগিণীটি তো মারাই গেল।

সন্নতি বললেন— 'মহাবেজ্জ জীবক তো এর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেই ছিলেন। করেননি? কদিন আগে আর কদিন পরে!'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাবেজ্জ ? জীবক অবাক হয়ে সম্প্রতির দিকে ভালো করে তাকাল। রাজগহের মহাবেজ্‌জ সম্প্রতি স্বয়ং। তিনি কি পরিহাস করছেন ?

বৃদ্ধর চোখ দুটি বোজা। মুখে স্মিত হাসি। যেন ধ্যানে ইষ্ট দর্শন হয়েছে।

৩৩

'শ্রীমতি! শ্রীমতি!' দ্বারে ক্রমাগত করাঘাত করে যাচ্ছে চণক। সে লক্ষ করছে না, কাষ্ঠনির্মিত, তক্ষিত দ্বারের কপাট দুটিতে কেমন ধুলো লেগে আছে। গৃহটির আকৃতিতে অবহেলার, অমার্জনার চিহ্ন। সবে গোধূলি-লগ্ন উত্তীর্ণ হয়েছে। আকাশ এবং নগরীতে নক্ষত্রবিন্দু-দীপবিন্দু-সজ্জিত লঘু ধূম্রবর্ণের উত্তরীয়টি গায়ে জড়াতে জড়াতে সন্ধ্যা নেমে আসছে। এ সময়ে এ দ্বার তো বন্ধ থাকবার কথা নয়। কবি বোধিকুমার, নট চারুবাক, সঙ্গীতনৃত্যপ্রিয় বপ্পভদ্র এঁরা তো নিত্যদিনের আগন্তুক। শ্রীমতীর বিশেষ গুণগ্রাহী। এঁরা ছাড়া আরও অনেকে থাকেন। রাজগৃহের বহু যুবা-প্রৌঢ় শ্রীমতীর গান, নৃত্য, সুনক্ষত্রর মৃদঙ্গ-বাদন ভালোবাসেন।

বহুক্ষণ করাঘাতের পর দ্বার খুলল। একটি দাস মুখ বাড়াল।

—কে ?

—কাত্যায়ন চণক।

—কী চান ?

—কী চাই ? —চণক যেন দাসটিকে ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করলেন। বাঁয়ে ফিরলেন। বিস্মিত দাসটি তাঁর পেছন পেছন আসছে।

প্রশস্ত অঙ্গন। শূন্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভগুলিতে মাল্য জড়ানো নেই। দীপ জ্বলছে না। প্রশস্ত সুন্দর সভাচ্ছদ পাতা নেই। অন্তঃপুরের প্রবেশপথে পিত্তলের পিঞ্জরটি শূন্য। শীতের পাতা ঝরে পড়ছে চারদিকে।

শ্রীমতী কোথায় ? রুক্ষ স্বরে পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করল চণক। দাসটি ভয়ে ভয়ে বলল—জানি না।

—জানো না ? চন্দা। চন্দা কই ? সুনক্ষত্র ?

—জানি না। দেবীর সঙ্গে দেশান্তরে গেছেন সম্ভবত।

—কোথায় ?

—আমি জানি না অজ্জ। আমি আর আমার পত্নী এ গৃহ রক্ষা করছি।

—একে কি রক্ষা করা বলে ?—চণকের মুখ দেখে দাসটি ভয় পেল। বলল—যথাসাধ্য করি অজ্জ। কিন্তু এই মুক্ত আঙন, চার দিকে গাছ—ঝরা পাতায় ক্রমাগতই ভরে যেতে থাকে।

চণক ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। সে কেন এখানে এসেছিলে, তার কাছে স্পষ্ট নয়। তার মনে হয়েছিল, সে শ্রান্ত। বিশ্রাম চাই। লোকজন, আলো, আলাপ-আলোচনা, সঙ্গীত-নৃত্য এ সবের কিছুই তার ভালো লাগছে না। কিন্তু এই সমস্তই অনেক সময়ে একটি অন্তরাল সৃষ্টি করে, একটি প্রকৃত অন্তঃপুর, যেখানে থাকে সন্তপ্ত হৃদয়ের জন্য একটি নিভৃত ক্রোড়। নিভৃত আশ্রয়। উদ্যত তর্জনীগুলির থেকে নিষ্কৃতিস্বরূপ দুঃস্বপ্নহীন নিদ্রার অবকাশ।

—চণক ভদ্র। এদিকে কোথায় ?

চণক পদব্রজে চলেছিল। মুখ নিচু। ডাক শুনে পাশ ফিরে দেখল বপ্পকুমার।

—অনেক দিন আপনাকে দেখিনি। এদিকে... কোথায় এসেছিলেন ?

চণক শুধু নির্বাক চেয়ে রইল। কী অর্থ হয় এই প্রশ্নের ? পেছনে পথের বাঁক ফিরলেই তো দেখা যাবে শ্রীতীর গৃহদ্বার।

বপ্পকুমার বলল—আপনি অনেক দিন পর এলেন, না ?

চণক উত্তর দিল না।

—শ্রীমতী কোথায় গেছে আমরা জানি না, বপ্পকুমার বলল, ভদ্র আমরা একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখি পিঞ্জর শূন্য। শ্রীমতী পক্ষী উড়ে গেছে। আমরা আজকাল নন্দার কাছে যাই। অত ভালো গায় না। কিন্তু চমৎকার সব গীত রচনা করে, সুর দেয়। অতিশয় চঞ্চল। একটি খঞ্জনের মতো যেন। চলুন না। নিয়ে যাই।

চণক বলল—না।

বপ্পকুমার তার পাশে পাশে চলতে লাগল। বলল—চণকভদ্র মনে যদি কিছু না করেন তো বলি, বারস্ত্রীর ওপর আসক্তি ভালো নয়। মোটে ভালো নয়। এরা কুট্টনীর কাছ থেকে নানা প্রকার সম্মোহক বিদ্যা আয়ত্ত করে, প্রধানত ধনী, সুদর্শন, কুমার পুরুষদের ওপর এদের বিদ্যা খাটায়। যাতে সারা জীবন একটু একটু করে শোষণ করতে পারে। তারপর যখন দেহে-মনে-ভাণ্ডারে নিঃস্ব হয়ে যাবে সে পুরুষ তাকে নিষ্ঠুরভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তা ছাড়া বারস্ত্রী তো একটি নয় ভদ্র, নন্দা আছে, সুপূর্ণা আছে, আছেন স্বয়ং সালবতী। তিনি অবশ্য অত্যুচ্চ বৃন্তের লোক, তবে আপনার অগম্যা নন কখনও। বয়সে হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয় আপনার আমার থেকে অনেক বড়। কিন্তু গেলে, দেখবেন, যেন বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীটি। স্থিরযৌবনা। এঁরা অপ্সরা-বিদ্যা জানেন তো!

তখনও চণক কিছু বলছেন না দেখে বপ্প বলল—আমি জানি আপনি অতি লাজুক, আমিই না হয় আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই...

তার কথা শেষ হল না, চণক বলল—আমার বড় তাড়া আছে। চলি বাপ্পাকুমার...সে অতি দ্রুত পথ পার হতে লাগল। যেন বপ্প তাকে কোনমতেই ধরতে না পারে।

বপ্পকুমার অবাক হয়ে গেল। চণক নামে গান্ধার দেশের এই যুবা গোড়ার থেকেই অতি উন্নাসিক। উদীচীর লোকেরা এমনটাই হয়ে থাকে, সে শুনেছে। মাগধদের তারা অনেকেই মানুষের মধ্যে ধরে না। আবার তক্ষশিলার স্নাতক, আবার গান্ধারের রাজপুরুষ আবার এখন মগধের রাজমিত্ত। তাই-ই কি অহংকার আরও বেড়ে গেল চণকভদ্রের! বপ্পও অতি ধনবান সেট্‌ঠির পুত্ত। তার নামটা পর্যন্ত চণক ঠিকঠাক বলতে পারলেন না। অহংকার, না আত্মবিস্মরণ! শ্রীমতীর বিরহেই ওই প্রকার কৃশ, অন্যমনা নাকি! তা এতকাল কোথায় ছিলেন? শ্রীমতীর সভায় তারা তো নিয়মিতই যেত। চণকভদ্রকে দেখেনি তো! অথচ অনেক সময়েই দেখেছে গিজ্‌ঝকূট থেকে ফিরতে। কিংবা কোনও পানগৃহে আর একটি সুদর্শন তরুণের সঙ্গে কথা বলতে। সহসা যেন চণকভদ্র তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তারা দুঃখিত হয়েছিল। বিশেষত কবি বোধিকুমার। বোধিকুমারের সঙ্গে বোধহয় চণকভদ্রর সখ্যটি যথেষ্ট নিবিড় হয়েছিল। প্রথম প্রথম যখন চণক আসা বন্ধ করলেন, বোধিকুমার অত্যন্ত উতলা হয়েছিল। বলত, অমন কাব্যভাবক আর হয়ত পাবো না। কবিরা ততটা মান যশের প্রার্থী নয়, যতটা প্রকৃত সহমর্মী বোদ্ধার প্রত্যাশী।

বপ্পই বুঝিয়েছিল বোধিকুমারকে, রাজমিত্ত তো আর শুধু শুধু হয় না, নিশ্চয়ই কোনও রাজকার্যে জড়িয়ে পড়েছেন।

—সে ক্ষেত্রে একটি চমৎকার, উচ্চস্তরের সাহিত্যরসিককে আমরা হারালাম। কে জানে হয়ত কবিকেও!

—কবিকে হারাবার প্রশ্ন উঠছে কেন?—বোধিকুমারকে জিজ্ঞাসা করেছিল। বোধিকুমার তাতে বলে—আমার ধারণা চণকভদ্র নিজেও একজন কবি। নিজে কবি না হলে কবিতার অন্তরে ওইভাবে প্রবেশ করার সাধ্য থাকে না। তা ছাড়া বপ্পভদ্র, যথার্থ বোদ্ধা ব্যতীত কবির অস্তিত্ব কতদিন? একটি পিক আর কতদিন শূন্য প্রান্তরে, নির্জন বৃক্ষশাখায় বসে কুহু-কুহু করে, বলো?

—কেন, আমরা? আমরা মাগধরা কি এতই অরসিক? বপ্পকুমার আহত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

না, না, তা নয়—বোধিকুমার যেন একটু লজ্জিত—তারপর বলেছিল, আপনারাও কাব্য শোনেন, গ্রহণ করেন, কিন্তু কিছু মনে করবেন না বপ্পভদ্র, আপনাদের কাছে সাহিত্যরস বারস্ত্রী সঙ্গের তুল্য। প্রমোদের জন্য, বিলাসের জন্য আপনারা কাব্যের কাছে আসেন। চণকের মতো রসিক আসেন প্রণয়ীর মতো, মর্মে প্রবেশ করেন।

—কেন, ভদ্র চারুবাকও তো আপনার কাব্যের অলঙ্কারাদি ব্যাখ্যা করে থাকেন, দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করেন। তাতেও আপনার মন ওঠে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকই। ভদ্র চারুবাক কাব্যের বহিরঙ্গ বোঝেন। সে সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় আমি বহুবার উপকৃত হয়েছি বপ্পভদ্র। সত্য। কিন্তু প্রকৃত কাব্যভাবক কাকে বলে তা আমি চণকভদ্রর সঙ্গে আলোচনার পূর্বে জানতামই না। সমগ্র কাব্য, তার ভাষা, শব্দযূথ, ধ্বনি ব্যবহার, ছন্দ, অর্থ, খণ্ড খণ্ডভাবে নয়, সামগ্রিক দৃষ্টিতে কাব্যের যে অধরা ব্যঞ্জনা, একই সঙ্গে বহু ব্যঙ্গার্থ বহন করবার ক্ষমতা—এ একমাত্র চণকভদ্রই রাজগৃহে বুঝেছিলেন।

ওই আরেক ব্যক্তি যে না কি শ্রীমতীর বিরহে ক্লিষ্ট। বপ্পকুমার নন্দার গৃহের দিকে পা চালাল। যদি ওখানে বোধিকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আজকের এই চণক-সংবাদ তাকে সত্বর জানাবে।

চণক কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিল। বোধিকুমারের গৃহ কোথায় সে জানে। কিন্তু কখনও যায়নি। সাধারণত একটি আম্রকুঞ্জে বসে তাদের কথা হত। এখন আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া পড়ে গেছে চতুর্দিকে। কুঞ্জ-কাননগুলিতে সেই ছায়া গাঢ়তর। নাঃ, আম্রকুঞ্জে বোধিকুমারের যাওয়ার সম্ভাবনা অল্প। সে অগত্যা বোধিকুমারের গৃহের দিকেই চলল।

পশ্চিম পল্লীতে ক্ষুদ্র গৃহটি কবির। সমগ্র রাজগৃহে কাননহীন গৃহ একটিও নেই। অন্ত্যজ ছাড়া আর কেউ দরিদ্রও নয়। গৃহগুলি যাতে সময়মতো সংস্কার হয়, কাননগুলি যাতে যথাযথ রক্ষা হয় তার জন্য অনমনীয় নির্দেশ আছে রাজার। বোধিকুমারের গৃহটি ক্ষুদ্র এবং মাটির। মাটির প্রাচীরের গায়ে খোদিত বহু প্রকার অলঙ্কার দেখতে পেল চণক। কাননটিও ক্ষুদ্র। কিন্তু অপরিসীম যত্নে কেউ তাকে রক্ষা করছে। এই শীতেও প্রত্যেকটি গাছ সবুজ। পাতাগুলি ঝকঝক করছে। একটি আম্র ও একটি হরীতকী ছাড়া বৃক্ষ বলতে তেমন কিছু নেই। সবই ছোট ছোট গুল্ম। দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে সে ইতস্তত করছে এমন সময়ে দ্বার খুলে গেল। গায়ে মাথায় ঊর্ণার উত্তরীয় জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন এক রমণী। তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না চণক। কাননের দিকে চলে যাচ্ছিলেন তিনি, সহসা চণকের উপস্থিতি অনুভব করে ফিরে দাঁড়ালেন—কে ?

চণক সামনে এসে দাঁড়াল, বলল—বোধিকুমারকে প্রয়োজন ছিল। আমি কাত্যায়ন চণক।

গৃহের ভিতরে দীপ জ্বলছে, দ্বারপথে সেই দীপের আলো। রমণী ফিরে দাঁড়ালেন, ত্বরিতে ভেতরে ঢুকে গেলেন। তাঁর চলার ভঙ্গির দিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকিয়ে রইল চণক। ইনি কি নৃত্যকুশলা ? একটু পরেই বেরিয়ে এলো বোধিকুমার।

—আসুন আসুন চণক ভদ্র—সে অভ্যর্থনা করল, চণকের মনে হল তার মধ্যে যেন পূর্বের আগ্রহের অভাব।

সে বলল—ভেতরে যাবো না কবি, আপনার এই কাননে...

চলুন, তাই চলুন—বোধিকুমার তার উত্তরীয়টি ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে, কাননে একটি বকুলমূলে মৃৎ-বেদীর ওপর বসল। মৃৎ-বেদীর ধারগুলিও অনুপম কারুকার্যে ভরা। পরপর অনেকগুলি হাতি শুঁড় তুলে রয়েছে, বেদীর প্রান্ত যেন সেই শুঁড়গুলির ওপর ন্যস্ত। একটি প্রিয় অলংকরণ মগধবাসীদের। মঙ্গলচিহ্নও বটে। হাতি।

সন্তর্পণে বেদীতে বসতে বসতে বিনা ভূমিকায় চণক জিজ্ঞেস করল—শ্রীমতী কোথায় ? জানেন ?

অনেকক্ষণ নীরবতার পর বোধিকুমার ঈষৎ কর্কশ স্বরে বলল, —শ্রীমতীকে কি আপনার আবার প্রয়োজন পড়েছে ?

চণক তার দীর্ঘ চোখ দুটি তুলে বোধিকুমারের দিকে তাকাল, বলল—তিরস্কার ?

—আপনাকে তিরস্কার করার স্পর্ধা আমার নেই হে উদীচ্য ব্রাহ্মণ। কিন্তু আপনি একদিন সহমর্মী চক্ষু দিয়ে ওই নগরবধূকে দেখেছিলেন বলে শুনতে পাই।

—সত্য, আমি বহুদিন ব্যস্ত ছিলাম। শ্রীমতীর সংবাদ রাখিনি। একথা সত্য—চণক দূরের দিকে তাকিয়ে বলল।

—হ্যাঁ আপনি ব্যস্ত ছিলেন আপনার নূতন প্রণয়িনীকে নিয়ে।

—কে বললে ? চণক আশ্চর্য হয়ে মুখ ফেরাল।

—সবাই জানে। শ্রীমতী জানে। বারবধূর তার ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা কিছু থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে নেই। তবু...

চণক বলল—আমি কোনদিন শ্রীমতীকে ক্রয় করিনি, সে-ও নিজেকে আমার কাছে বিক্রয় করেনি।

—এই রূপই যেন শুনেছিলাম ? অবিক্রীত দেহসম্ভোগের নাম প্রণয়। প্রণয় লাভ করলে বারস্ত্রীও বড় অভিমানিনী হয়ে ওঠে চণকভদ্র। আপনি জানেন না, শ্রীমতী কেন অদর্শন হয়েছে ? জানেন না, কোন পরিস্থিতিতে বারাঙ্গনা অদর্শন হয় ?

চণক অবাক হয়ে বলল—না। জানি না তো!

বোধিকুমার ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠে দাঁড়াল। শ্রীমতীর গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করছেন তাহলে ? তা তো করবেনই। এই প্রকারই তো হয়ে থাকে পাষণ্ড গণিকাভোগীরা। আপনাকে অন্যপ্রকার ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম...

—ক্ষান্ত হও পুত্ত—অদূরে সেই রমণী এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর হাতে দারুফলকে পানীয়—অতিথির সেবা করো।

চণক আর কিছু শুনতে পেল না। কারণ, তখন সে তক্ষশিলার সন্নিহিত অরণ্যে আচার্য দেবরাতের কুটির-প্রাঙ্গণে একটি সুকুমার শিশুকে কন্দুক হাতে খেলা করে বেড়াতে দেখছিল। পিতার কোলে বসে সেই শিশু কিছুই না বুঝে ঋক্‌সংহিতা কণ্ঠস্থ করত। ক্লান্ত হলে পিতার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত। কোন এক সময়ে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কিংবা পিতার কোনও শিষ্য তাকে তুলতে এলে, পিতা বলতেন থাক্ থাক্, আহা থাক!

—কিন্তু, এতক্ষণ ওকে কোলে নিয়ে বসে আছেন, আপনার কষ্ট হবে যে! পা ধরে যাবে।

—থাক। দেখছ না কন্দুকটি হাতের মুঠোয় নিয়ে কেমন ঝুলিয়ে রয়েছে। আহা, মাতৃহীন শিশু, থাক। তিনি সস্নেহে তার চুলগুলি যথাস্থানে বিন্যস্ত করে দিতেন। শিশু মাঝে মাঝেই আধো-ঘুমের মধ্যে পিতার স্নেহবাক্যগুলি শুনত।

চণকের প্রথম সন্তান ? আচার্য দেবরাতের প্রথম পৌত্র ?

সচেতন হবার পর সে শুনল—বোধিকুমার বলছে—মা তুমি জানো, তোমার কাছে শপথ করেছিলাম নিষ্ক্রয় দিয়ে শ্রীমতীকে মুক্ত করবো। এঁর জন্য তা হল না। না হোক, ভেবেছিলাম আমি না পারি, ইনিই তা পারবেন এবং করবেন।

বোধিকুমারের মা একটু এগিয়ে এসে বললেন—বচ্ছ চণক, পানীয় গ্রহণ করো, আমার পুত্তের কথায় উত্তেজিত হয়ো না।

চণক ধীর স্বরে বলল—জননী, শ্রীমতী কোথায় আপনি জানেন ?

—না বচ্ছ, জানি না, তবে যদি কখনও সন্ধান পাওয়া যায়, আমার পুত্ত তাকে জানিয়ে দেবে কাত্যায়ন চণক তাকে খুঁজেছিল।

বোধিকুমার কাঁদছে। অশ্রু গদগদ স্বরে কী বলছে। সহসা চণকের সমস্ত দৃশ্যটি, বিশেষত বোধিকুমারকে অসহ্য মনে হল। কাঁদছে ? এই মাগধ পুরুষরা কাঁদেও না কি ? চিরকালই তবে বালক থাকে বোধহয়! সে বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। আর একটিও কথা না বলে সে উঠে দাঁড়াল; দ্রুত কাননদ্বারের দিকে চলল।

পেছন থেকে দৃঢ় নারীকণ্ঠ শুনল—বচ্ছ চণক, জননীকে অপমান করে যাচ্ছো ? চণক যেন একটা আঘাত খেল। সে পেছন ফিরে মায়ের মুখোমুখি হল।

কোমলকণ্ঠে তিনি বললেন—বসো চণক।

চণক বসবার পর তিনি পানীয়র পাত্র এগিয়ে ধরলেন। বললেন—অতিশয় মৃদু এ পানীয়। যদিও মধু থেকেই প্রস্তুত, তবু উত্তেজক কিছু প্রায় নেই বললেই চলে। আমি নিজে করি। নাও। এই খজ্জও অন্তত একটি নাও। মিষ্ট নয় এগুলি। খেয়ে দেখো, ভালো লাগবে। তোমাদের মায়েরই করা। পুত্ত তুমিও নাও। বৃথা অশ্রুপাত করছো কেন ? পরিস্থিতি বুঝে যা ভালো মনে হয়, বিচার করে, তাই করবে। এর মধ্যে অশ্রুর কোনও স্থান নেই। জীবন কি তোমার পরিকল্পনা মতো চলবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চণক একটি বর্তুলাকার খজ্জ মুখে তুলে নিয়ে কামড় দিল। ইনি ঠিকই বলেছেন। ভালো লাগছে। সুগন্ধ, মুড়মুড়ে। মুখের ভেতরটা যেন সুস্বাদে ভরে গেল।

—আরও একটি নাও বচ্চ, যদি ভালো লাগে। তার মনের কথা বুঝেই যেন বললেন বোধিকুমারের মা। দ্বিতীয় খজ্জটি তুলে মুখে দেবার পর চণকের সহসা এক প্রবল আত্মধিক্কারের বোধ এলো।

শ্রীমতী কোথায় কোন নির্বাসনে গেছে। হয়ত কষ্ট পাচ্ছে। মানসিক তো বটেই। সেই সঙ্গে দৈহিকও হয়ত। তার অর্থাগমের পথও রুদ্ধ। অথচ সে এখানে বোধিকুমারের জননীর কাছে বসে তাঁর রাঁধা খজ্জ খেয়ে চলেছে মনের সুখে। যেখানে যাই ঘটুক পৃথিবী যেমন নির্বিকার, তার দিন-রাত্রি, বর্ষা-শীতের নিয়মে যেমন কোনও ব্যত্যয় হয় না, মানুষও তেমনি। তার ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষুধার্ত। প্রিয়তম ব্যক্তির মৃত্যু বা অপঘাত বা অন্য কোনও দুর্দশা ঘটলেও কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ, শৈত্য বা গরম বোধ, নিদ্রার প্রয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষ অস্বীকার করতে পারবে ? পৃথিবীর পক্ষে এই প্রকার ব্যবহারের ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নেই, কেন না যতই ঋষিরা ভূমিসূক্তে, পৃথিবীসূক্তে তাকে জননী বলে স্তুতি করুন, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী জড়। কিন্তু মানুষের চিত্ত আছে। মস্তিষ্ক আছে। আবার সব মানুষই কি এক প্রকার ? এই তো বোধিকুমার, চোখ দুটি এখনও অরুণাভ। মায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও খজ্জের দিকে হাত বাড়ায়নি। এমন কি সে চণক, চণকও তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা ভুলে ছিল যতদিন অরণ্যকুমারী রগ্গার সেবা করেছে। রগ্গা, চণকের বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ লৌহমুখ তীর বিঁধতে লাগল। মুখ থেকে খজ্জ ফেলে দেওয়া অত্যন্ত অভদ্রতা হবে বুঝে সে প্রাণপণে সেগুলি গিলতে লাগল। বিষম খেলো। কাশির ধমকে তার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বোধিকুমারের জননী কাছে এসে তার ঘাড়ে মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগলেন। অন্য হাতে পানপাত্র মুখের কাছে ধরে বলছেন, একটু পান করো, পান করো বচ্চ। না হলে ঠিক হবে কী করে ?

সামান্য পান করবার পর কাশি প্রশমিত হলে তিনি বললেন—যখন যা করবে, চিত্ত তাতেই সমর্পণ করবে। জীবন তো বহু কর্মের, বহু চিন্তার, বহু দায়ের সমাহার হবেই। শতাবধান হবার সাধনা করে থাকো তো অন্য কথা, নইলে চিত্তকে সংযত একাগ্র করতে হবে, বচ্চ।

এই কথা বললেন বোধিকুমারের মা, একজন সামান্য মগধিনী, চণককে, কাত্যায়ন দৈবরাত চণককে, যে চণক শতাবধান না হোক, অন্তত দশাবধান তো বটেই, যে চণক তক্ষশিলার মুকুটমণি পিতার মুকুটমণি পুত্র, যার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির যশ এমনই যে, গান্ধার রাজসভা ও তক্ষশিলার আচার্যকুল উভয়ের মধ্যে তাকে নিয়ে রীতিমতো টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। উপরন্তু, যে চণক এখন মগধরাজের মিত্র, রাজশাস্ত্রের রচক, যে চণক মগধরাজকে নতুন দিশা দেখাচ্ছে, যে চণক...। তখন চণক বুঝতে পারল ইনি সামান্য এক মগধিনী কখনও নন। সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল—এই বেদী, গৃহের মৃৎ প্রাচীরের এই সব অপূর্ব লতায়িত হংসমিথুন, শঙ্খহাতে নারী না অপ্সরী, বংশীবাদক, এই সমস্ত সৌকর্যায়িক, এসব কে করেছেন ?

—তোমার এই জননীই করেছে বচ্চ।...একটু পরে নিজের হাত দুটি কোলের ওপর মেলে ধরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন—প্রকৃত কথা, থাকতে পারি না, হাত দুটি যেন সর্বক্ষণ কেমন করতে থাকে।

চণক অদূরে সেই মৃৎ-গৃহের দিকে অপলক চেয়ে রইল। গাছের ডালে বাঁধা একটি উল্কা জ্বলছে। তার আলোয় গৃহের অলঙ্করণ কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে সেই দিকে অভিভূতের মতো চেয়ে রইল।

জননী বললেন—চণক, বচ্চ, আমি স্থপতি মহাগোবিন্দের কন্যা সুমেধা।

—'মা' বোধিকুমার যেন ভর্ৎসনা করে উঠল।

জননী বললেন—আমাকে বলতে দাও পুত্ত, বলতে দাও। তুমি না বলেছিলে এই ক্যাত্যায়ন চণক তোমার বর্ষা কাব্যের মর্মোদ্ধার করেছেন ! বচ্চ চণক, আমি পাঞ্চালীও বটে। আমার মা এক পাঞ্চালী বারমুখ্যা। আমার জন্মের সম্ভাবনার কথা শুনে পিতা মহাগোবিন্দ দেশান্তরে যাবার সময়ে মাকে একটি মহামূল্য রত্ন-অঙ্গদ দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন পুত্র হলে ওই রত্ন অঙ্গদসহ তাঁর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠিয়ে দিতে, পিতৃবংশের সিল্প শিক্ষা করবে সে পিতার তত্ত্বাবধানে, আর কন্যা হলে ওই অঙ্গদ বিক্রয় করে কন্যার ভরণপোষণ করতে। বচ্চ, আমার জননীর এবং আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি কন্যাই হলাম। আমার এই পুত্ত আমাকে মুক্ত করেছে। যখন মাত্র দশ বছরের বালক, তখন আমরা পাঞ্চাল-রাজধানী কাম্পিল্ল ছেড়ে পালিয়ে আসি। কাম্পিল্লে থাকলে গণিকার বিট হওয়া ছাড়া আমার পুত্তের আর কোনও ভবিষ্যৎ থাকত না। আমরা বারাণসীতে গিয়ে বাস করি। পুত্তের শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর রাজগহে ভাগ্যের সন্ধানে আসি। সামান্য অর্থ ও অলঙ্কার আনতে পেরেছিলাম, গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায়। শিক্ষার ব্যয় তো লাগেনি ! আচার্য গঙ্গাধর আমার পুত্তকে পুণ্যশিষ্য তো করে নেনেই। উপরন্তু তার কবিপ্রতিভা দেখে তাকে কতভাবে সাহায্য করেছেন, বলে শেষ করা যায় না। এখন বচ্চ চণক, আশা আছে কোন না কোনদিন মগধের রাজসভা কবির প্রয়োজন বুঝবে। তখন..

বোধিকুমার মুখ তুলে বলল—ইতিমধ্যে আমার জননী পরিচয় গোপন করে ধনীদের গেহে সৈরিন্ধ্রীর কাজ করেন। রমণীদের সিপ্প শিক্ষা দেন, এমন কি উৎসব গৃহে মহানসীর কাজ পর্যন্ত নিয়ে থাকেন...।

মনে হল বোধিকুমার চণকের প্রতি তার ক্ষণপূর্বের ক্ষোভ ভুলে গেছে। সম্ভবত তার ব্যক্তিগত সঙ্কটের প্রসঙ্গে।

সে হঠাৎ বলল—আচ্ছা চণকভদ্র, এই যে সিপ্পসমূহকে বিদ্যার জগতে অন্ত্যজ করে রাখা হয়েছে, একি আপনি ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন ? কম্মার সিপ্প, কুম্ভকার সিপ্প এগুলির কথা বলছি না। কিন্তু ধরুন স্থাপত্য বিদ্যা, ভাস্কর্য অথবা চিত্রকলা ? কাব্য উচ্চকোটির বলে স্বীকৃত। কিন্তু এই সমস্ত বিদ্যার মধ্যেও যে সৌন্দর্যের সঙ্গে দক্ষতা, প্রয়োজনের সঙ্গে সৌষম্যবোধের সমন্বয়সাধন হয়, তা কি উচ্চকোটির সিপ্প নয় ?

চণক বলল— আমি এ নিয়ে এখনও চিন্তা করিনি কবি। আপনি কি এগুলিও জানেন না কি ?

জননী বললেন—আমার পুত্ত অপূর্ব সব চিত্ত লিখতে পারে। পুতুল গড়তে পারে। স্থাপত্য বিষয়ে আমরা উভয়েই বহু চিন্তা ও পরিকল্পনা আলোচনা করে থাকি। আমাদের এই গৃহ হিমঋতুতে উষ্ণ থাকে, দীর্ঘ গ্রীষ্মের সময়ে থাকে সুশীতল। বর্ষার সময়ে ঢালু ছাদের যাবতীয় জল গিয়ে পড়ে একটি কূপে। গৃহের কোনও কক্ষে বা অলিন্দে জল ঢুকতে পায় না।

বোধিকুমার বলল—এখন আমরা চিন্তা করছি, সমুদয় আবর্জনা যা নালিকাপথে কাননে একত্রিত করি, তা কী করে আবার মাটির তলায় চালিত করা যায়। এইভাবে গৃহও হবে আবর্জনামুক্ত, মাটিও হবে উর্বরতর, অথচ ব্যয় এমন কিছু নয়। তবে এ ধরনের গৃহ সর্বদা সুসংস্কৃত রাখতে হয়। সংস্কারের কাজ গৃহের পুরুষরাই রমণীদের সাহায্য নিয়ে করতে পারেন। বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না।

এবার সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে চণককে তাদের কানন, গৃহাভ্যন্তর দেখাতে লাগল। কক্ষে কক্ষে অর্ধসমাপ্ত ভিত্তিচিত্র। এখনও কাঁচা রয়েছে কিছু কিছু।

—বর্ণ কী ব্যবহার করেন ? চণক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—শুভ্রবর্ণ নিই চুনম থেকে, গৈরিক মাটি থেকে, কৃষ্ণবর্ণ কজ্জল থেকে পেয়ে যাই। লাক্ষা থেকে রক্তবর্ণ, রক্তচন্দনও ব্যবহার করি। কিন্তু হরিৎ, নীল ও অন্যান্য বর্ণের জন্য রত্ন গুঁড়োলে ভালো হয়। ভেষজবর্ণে ঠিক হয় না। আমার তো সে সাধ্য নেই। তাই দেখছেন না কতকগুলি নির্দিষ্ট বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছি।

শ্রীমতীর চিত্র দেখল চণক একাধিকবার। সঙ্গীত-নৃত্য-সভা, কখনও শ্রীমতী গাইছে, কখনও নাচছে, সুনক্ষত্র বাজাচ্ছে। বহু চেনা-অচেনা মুখের মধ্যে দর্ভসেনের মুখটি সে পরিষ্কার চিনতে পারল।

—এই নৃত্যসভা তো শুধু প্রতিচ্ছবি নয় ! —চণক দেখতে দেখতে বলল।

শিল্পী বলল—তা তো নয়ই। এই যে অতিগৌর, নাতিগৌর, হেমবর্ণ, চম্পকবর্ণ, তাম্রাভ, কৃষ্ণবর্ণ, সর্বপ্রকার বর্ণের মানুষ দিয়ে এই সভাটি লিখেছি তাতে বোঝানো হল না কি, সঙ্গীত আস্বাদনের ব্যাপারে বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষের চিত্তই সমান উৎসুক ! এখানে এই যে নৃত্যপর নারী বা বাদকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখছেন, দেখুন এরা কিন্তু বস্তুপৃথিবীর নিয়ম মেনে লিখিত হয়নি। হাত, পা, চোখ সকলই কেমন লীলায়িত, যেন দেহে অস্থি বলে কিছু নেই। এ হল ভাব, নৃত্যের ভাবরসের একেবারে ভেতরকার কথা। বাদকের চারপাশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনিন্দ্যসুন্দর বালকগুলি নাচছে এগুলি প্রকৃতপক্ষে ধ্বনি, বিচিত্র ধ্বনি। তাই এদের শুধু গৈরিক দিয়ে লিখেছি। মুখ-চোখের মধ্যে দেখুন কেমন তদ্‌গত ভাব! এরা এ পৃথিবীর নয়। বিশুদ্ধ ধ্বনি সব। গন্ধর্বলোক থেকে এসেছে।

সাধু, বোধিকুমার, সাধু—মৃদুস্বরে বলল চণক,—আর আমাকে এগুলি না দেখিয়েই বিদায় করে দিচ্ছিলেন ?

বোধিকুমার লজ্জা পেয়ে বলল—আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। মার্জনা করুন।

—করবো। যদি একটি সত্য কথা বলেন।

—বলুন।

—আপনি কি শ্রীমতীর প্রণয়প্রার্থী ?

একটু ইতস্তত করে বোধিকুমার বলল—ছিলাম চণকভদ্র। কিন্তু আপনি আসার পর সব যে অন্যরূপ হয়ে গেল। আপনি শ্রীমতীর সন্তানের পিতৃত্ব যখন স্বীকার করেছেন তখন বাকিটুকুও নিশ্চয়ই করবেন ?

—অর্থাৎ ?

—আমি রাজভাণ্ডারে নিষ্ক্রয় দিয়ে শ্রীমতীকে মুক্ত করবার জন্য ধনসঞ্চয় করছিলাম। সে কাজটা, সে যদি রাজগৃহে ফেরে, তো আপনাকেই করতে হবে।

একটু পরে চণক বলল—ধরুন তখন যদি আমি রাজগৃহে না থাকি! ধরুন কেন, সত্য সত্যই থাকবো না। আমার ভবিষ্যৎ আমায় কোন দেশে কোন অবস্থায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে, আমি জানি না।...কবি...মৃদুস্বরে চণক ডাকল...আপনি কি আমার সেই অনাগত সন্তানের ভার নেবেন ?

একটি রত্ন অঙ্গদ দিয়ে যান তাহলে ; পুত্র হলে অঙ্গদসমেত... বোধিকুমারের কণ্ঠে বিদ্রূপের সঙ্গে ব্যথা মিশে আছে। তার কথা শেষ হল না। চণক বলল—না, অঙ্গদ নয়। কাত্যায়ন দৈবরাত এই গোত্র নাম আছে শুধু, তাই দেবো, কিন্তু...গৃহী হবার অবসর চণকের জীবনে হয়ত আসবে না। এই কথাটি শ্রীমতীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

বোধিকুমারের মুখের দীপ্তি ধীরে ধীরে নিবে গেল।

—আমি নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করে যাবো, চণক বলল।

—নিষ্ক্রয় দিয়ে মুক্তি কিনতে পারি ভদ্র চণক, প্রণয় কিনতে তো পারি না।

—প্রণয় কিনবে কেন কবি, চণক ধীরে ধীরে বলল, প্রণয় লাভ করতেও তো পারো!

চিন্তামগ্ন দৈবরাত সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর ধীরে ধীরে গান্ধার- ভবনে প্রবেশ করল। ঘরে ঘরে দীপ জ্বলছে। শান্ত সুন্দর। আসনশালায় তিষ্য বসে আছে। বসে আছে জিতসোমাও। তিষ্য কিছু বলছে, জিতসোমা শুনছে। এই দৃশ্যটি যেন বহু দূরের। চণকের সঙ্গে কোনও প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। সে প্রবেশ করতেই দুজনে নীরব হয়ে গেল। সোমার মুখে শোনার ঔৎসুক্য ছিল, অন্তর্হিত হল। সোমার এই ভাবান্তর চণক কি লক্ষ করল ? দীর্ঘদিন ধরে সে অন্যমনস্ক। প্রায় সারারাত ধরে সে লেখে। ভোর হলে চিত্তকের পিঠে বেরিয়ে যায়। মধ্যাহ্নভোজনের সময়েও অনেক দিনই ফেরে না। আজ বোধিজননীর সংস্পর্শে, বোধিকুমারের শিল্পচর্চার প্রসঙ্গে চণক যেন সামান্য উজ্জীবিত। যদিও গান্ধার-ভবনে প্রবেশ করা মাত্র একটি কৃষ্ণাঙ্গী তরুণীর কর্ণ-নাসিকাহীন শব তার প্রাণশক্তি কেড়ে নেয়, তবু।

সে বলল—তিষ্য, আসছি, চলে যেও না। আজ নৈশভোজে একসঙ্গে বসবো। চণক ভেতরে যেতে তিষ্য উৎফুল্ল মুখে বলল—বলেছিলাম না ভদ্রে, একটু সময় দিন, চণকভদ্র আবার আগের মতো হয়ে উঠবেন।

সোমা কিছু বলল না। বিষণ্ণ মুখে যেমন বসে ছিল বসে রইল।

তিষ্য বলল—আপনার মুখে হাসি দেখছি না কেন ভদ্রে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমা মৃদু অশ্রুচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল—বন্য কুমারীর সেবা করতে চাইনি সে কি আমার দোষ ?

তিষ্য প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর বুঝে বলল—আপনি হয়ত ঠিকই বুঝেছেন, চণকভদ্র বোধহয় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

সোমা বলল—আমি কখনও করিনি। নিষাদদের দেখিনি কখনও। ওরূপ বীভৎস দৃশ্যও কখনও দেখিনি।

সে যেন কোনও বোহারিক কি বিনিশ্চয়ামাত্যর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছে। তিষ্য কী বলবে ? কিছুক্ষণ পর সে বলল—এতে কোনও অপরাধ হয়নি, আর হলেও...

জিতসোমা হঠাৎ উঠে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল। করুণ কোমল মূর্তি। তিষ্যর হৃদয় যেন ভদ্রা জিতসোমার জন্য দ্রব হয়ে যেতে থাকে। কী রহস্য এঁর হৃদয়ে ! ইনি কী প্রকার বিদুষী, কত শিল্প জানেন—এ সবই প্রতিদিন তিষ্য দেখতে পাচ্ছে। বন্য কুমারী হতভাগিনী রগ্‌গা গান্ধার-ভবনে কী যে অনভিপ্রেত জটিলতার সৃষ্টি করে গেল ! দাসী তাকে পানীয় এনে দেয়। তিষ্য বুঝতে পারে জিতসোমা সংবৃত হতে অন্তঃপুরে গেছেন কিন্তু ভোলেননি তিষ্যকুমার অতিথি, একা বসে আছে। সে ধীরে ধীরে পানীয়ে চুমুক দিতে থাকে। যেতে হবে। তাকে এবার শ্রাবস্তী যেতে হবে। শ্রাবস্তীর সঙ্গেই মগধের সম্পর্ক সবচেয়ে দৃঢ়। মহারাজ পসেনদি যদি সম্মত হন তো...তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায় দ্বারের ওপর মৃদু করাঘাতের শব্দে। দাস-দাসীরা আসার আগেই সে দ্বার খুলে দেয়। রাত হচ্ছে, এখন কে আসবে ? বাইরে ঘন অন্ধকার ও শীত। সমগ্র জম্বুবন জুড়ে সহস্র সহস্র জ্যোতিরিঙ্গণ জ্বলছে নিবছে। ঘোর কৃষ্ণ বসন-পরা মানুষটি প্রবেশ করলেন। লোকপাল। তিষ্য নত হয়ে প্রণাম করল। মহারাজ, এই সময়ে ?

মৃদুকণ্ঠে লোকপালবেশী বিম্বিসার বললেন—আশু প্রয়োজন। চণক কোথায় ? শীঘ্র ডাকো। সোমা ? সোমাই বা কোথায় ? তার সঙ্গেও প্রয়োজন আছে।

তাঁর মুখ দেখে সহসাই তিষ্য উপলব্ধি করল ব্যাপার যা-ই হোক, তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সে ভেতরের দ্বারের কাছে গিয়ে একটি দাসীকে বলল—'ভদ্র লোকপাল এসেছেন, সংবাদ দাও...।'

সে যথেষ্ট উচ্চগ্রামে কথাগুলি বলেছিল। এবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিতসোমাকে দেখা গেল। একটু পরেই চণক তার নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো।

বিম্বিসার বললেন, আসনশালার দ্বার বন্ধ করো।

চণকের উদাসীন মুখ এখন সতর্ক হয়ে উঠেছে, সে বলল—কী সংবাদ মহারাজ ? আপনার কোনও বিপদ...?

আমার নয় চণক, তোমার। তোমার এবং সোমার, অসহিষ্ণু স্বরে বিম্বিসার বললেন।

আমার ? সোমার ? চণকের কণ্ঠে বিস্ময়। তিষ্য এবং জিতসোমা উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে আছে।

বিম্বিসার বললেন—আজ সকালে চম্পা থেকে দূত এসেছে। অগ্রদূত। কুমার কুনিয় আসছে। সে বলে পাঠিয়েছে তার প্রাসাদ যেন প্রস্তুত থাকে। আরও বলেছে, গতবারে যে গান্ধারদেশীয় রমণী তার প্রাসাদ সজ্জা করেছিল, সে যেন থাকে। বিশেষভাবে তার নৃত্য-গীত উপভোগ করতেই সে এবার রাজগৃহে আসছে।

জিতসোমার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। চণক ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলল—তা যে হয় না সে কথা কুমারকে বলে দিলেই তো হয় !

বিম্বিসার পদচারণা করতে করতে মুক্ত বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর পিঠ কক্ষে উপস্থিত উৎকণ্ঠিত মানুষগুলির দিকে। তিনি কি তাঁর মুখভাব গোপন করতে চাইছেন ?

—কাজটা সহজ নয় চণক, তিনি বললেন, কুমার অত্যন্ত আত্মপর, ক্রোধী।... আমার সন্দেহ হয় এ অন্তঃপুরিকাদের ষড়যন্ত্র। কেউ তার কাছে জিতসোমার কথাটা তুলে দিয়েছে। হয়ত আমাকে বিব্রত করবার জন্যই।

তিনি ধীরে ধীরে চণকের মুখোমুখি হলেন, বললেন—আচার্যপুত্র, তুমি তাকে জানো না, তাই বলছো। কিন্তু তুমিই বা বিলম্ব করছো কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আর বিলম্ব হবে না মহারাজ। কালই বেরিয়ে পড়ব।

—না না, আমি তোমার যাত্রার কথা বলিনি আচার্যপুত্র, বলছি সোমাকে বিবাহ করতে বিলম্ব করছো কেন ? আমি তো অনেক দিন আগেই তোমার হাতে সমর্পণ করেছি তাকে। সখা চণক, মন স্থির করতে তুমি বড় সময় নাও।

—আর সময় নেবো না মহারাজ।

—আমি তাহলে এখুনি বিবাহের আয়োজন করি।

—তা হয় না মহারাজ, সোমা যে আমার ভগ্নী !

তিষ্য চমকে উঠে দেখল তার কুসুমবর্ণ উত্তরীয়ে মুখ ঢেকে গেছে সোমার।

—সোমা তোমার...অর্থাৎ আচার্য দেবরাতের...

—মহারাজ, সোমা তক্ষশিলার প্রখ্যাত রাজনটী দেবদত্তার কন্যা, আচার্য দেবরাতের ঔরসে।

আসনশালা নিস্তব্ধ। একটিমাত্র পতঙ্গ উড়ছে। তার শব্দও যেন কানকে আঘাত করছে। চণক পতঙ্গটির দিকে তাকিয়ে বলল—আমার জননী আমার জন্মের পরেই মারা যান। পিতার হাতেই বড় হয়েছি। সমাবর্তনের পর পিতা আমাকে ডেকে বললেন—দেবী দেবদত্তার কন্যাকে বেদবিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে। আমি আর সতীর্থ অনঘ দুজনে এই কাজের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। প্রথম দিন যাত্রার পূর্বে পিতা আমাকে বললেন—বৎস যেখানে যাচ্ছো, শিল্পচারুতা ও সৌন্দর্যের খনি সেই গৃহ। বড় বিভ্রান্তিকর। কন্যাটি কিশোরী। অত্যন্ত মেধাবী এবং অত্যন্ত সুন্দরী। কিন্তু সে তোমার বৈমাতৃক ভগ্নী, মনে রেখো।

সোমার মুখ অশ্রুপ্লাবিত। অস্ফুটে আত্মবিস্মৃতের মতো সে বলল— মহারাজ, হতভাগিনী সোমাকে সে কথা বলতে কেউ মনে রাখেনি। আচার্য দেবরাতের মর্যাদা রাখতে গিয়ে সোমার কথা কেউ ভাবল না। অবশেষে যখন আর্য অনঘর প্রণয় অস্বীকার করলাম, তখন জননী বললেন—কার আশায় এ কাজ করলে সোমা ? চণক ? সে যে তোমার জেষ্ঠ ! আচার্য দেবরাত তোমার পিতা, তিনিই তোমায় পিতৃধন বেদবিদ্যা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

চণক নীরক্ত মুখে সোমার দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার না জানার কথা আমি কখনও জানতাম না সোমা, ক্ষমা করো।

কক্ষ নিস্তব্ধ। সেই পতঙ্গটিই শুধু উড়ছে। উড়ে উড়ে দীপবর্তিকার কাছে চলে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে।

চণক বলল—মহারাজ আমার সব আয়োজনই প্রস্তুত, ভাবছিলাম দু- এক দিনের মধ্যেই যাত্রা করব। সোমার এই আশু বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে এ ও ভাবছিলাম এইমাত্র, যা হয় হোক সোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। আমাদের দুজনের কারওই উপস্থিতবুদ্ধি অল্প নয়। যেতে যেতে যেমন বুঝবো, তেমনই ব্যবস্থা করবো। কিন্তু এখন আর তা হয় না। আমি চলে যাচ্ছি। আপনি রাজা, আপনি মিত্র, যেমন করে হোক আমার ভগ্নীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। কুমার কুনিয়র লালসার আহুতি সে হবে না। হলে আমি প্রতিশোধ নেবো। মহারাজ, কুমারের আসার পর আমি উপস্থিত থাকলে অনর্থক বিবাদ, রক্তপাত, বন্ধুত্বনাশ হবে...আমি উঠলাম।

সে অন্তঃপুরের দিকে ফিরল।

জিতসোমা তীক্ষ্ণ আর্তস্বরে বলে উঠল—জেষ্ঠ চণক, আমায় ফেলে রেখে যাবেন না। আমায় সঙ্গে নিয়ে যান। আমি শরণাগত। শরণাগত...বলতে বলতে চণকের প্রতিক্রিয়াহীন মুখের দিকে তাকিয়ে সে স্তব্ধ, বিবর্ণ, প্রস্তর-কঠিন হয়ে যেতে থাকল।

চণক বিষণ্ণ স্বরে বলল—ভেবে দেখো, আর তা হয় না সোমা। মহারাজ, দেবরাতপুত্রীর আরক্ষার ভার আপনার...আর...আর... তিষ্যকুমারের, যদি সে দায় স্বীকার করতে সে কুণ্ঠিত না হয়।

বলতে বলতে সে আসনশালার দ্বার খুলে ফেলল, বলল—মহারাজ, পশ্চিমপল্লীতে বোধিকুমার নামে এক গুণী ব্যক্তি আছেন রাজ-অনুগ্রহের অপেক্ষায়। সে থামল, কী যেন বলবে বলে তিষ্যর দিকে তাকাল। চোখে চোখ মিলল। তাকাল একবার পাষাণ-মূর্তি নতমুখী জিতসোমার দিকে। তার চোখের তারা যেন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে যাচ্ছে। ধীরে অন্তঃপুরের দ্বার খুলে সে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। সামান্য পরে উদ্যান পথে চিত্তকের মৃদু হ্রেষা শোনা গেল। তার প্রভু পেছনের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। শিশির-সিক্ত কাননভূমির ওপর দিয়ে চিত্তকের ক্ষুরের ধ্বনি দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে বিম্বিসার বললেন—তিষ্যকুমার আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার মনে হয়, তুমি আর সোমা গান্ধর্ব বিবাহ করো। এখনই! তারপর দ্রুতগামী অশ্বে শ্রাবস্তী চলে যাও। আমার মুদ্রা তো তোমার কাছে আছেই। এই দুটি স্থবিকায় আমি পর্যাপ্ত সুবর্ণ কার্ষাপণ নিয়ে এসেছি। তিষ্য তোমার অস্ত্র-শস্ত্র, সোমা তোমার বস্ত্রালঙ্কার, পুঁথিপত্র যত শীঘ্র সম্ভব সংগ্রহ করে নাও। কী তিষ্য ? সোমা ?

নীরব দুটি মূর্তির দিকে চেয়ে অসহিষ্ণু বিম্বিসার বলে উঠলেন।

তিষ্য আচ্ছন্ন স্বরে বলল—আমায় একটু ভাবতে সময় দিন মহারাজ।

—বলছো কী ? —বিম্বিসার দ্রুত পদচারণা করতে লাগলেন—কুনিয় যাত্রা করে গেছে। হয়ত সে কাল প্রত্যুষেই এসে উপস্থিত হবে। তিষ্য, কুনিয় যখন তার মাতার গর্ভে ছিল, তার মাতা কোসলদেবীর বড় বিচিত্র দোহদ হয়। তিনি আমার কাঁধের ওপর দাঁত বসিয়ে দিতেন। লক্ষণপাঠক পণ্ডিতরা বললেন—এই জাতক পিতৃরক্তপিপাসু হবে। কোসলদেবী গর্ভ নষ্ট করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমি বাধা দিই। সোমা, এই আমার বংশের প্রথম পুত্র। পুত্রমুখ দেখে অপত্যস্নেহ কাকে বলে জানলাম। অবিমিশ্র আদর, স্নেহ দিয়েছি, দিয়েছি পিতার মতো। লক্ষণপাঠকদের কথা আমি বিশ্বাস করি না। ভগবান তথাগত এ সব বিশ্বাস করতে নিষেধ করেন। কিন্তু কুমার বড় দুর্বিনীত। তাকে উপরাজা করে দিয়েছি। কিন্তু আচার-আচরণ দেখলে মনে হবে, সে রাজাই। বড় অহঙ্কারী। যদি মনে করে কিছু চাই, না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না কিছুতেই।

জিতসোমা এতক্ষণ নতমুখে বসেছিল। তার দেহে কোনও প্রাণের লক্ষণও যেন ছিল না। সে এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল—তিষ্যভদ্রকে তার গোপনীয় রাজকর্মে যেতে দিন মহারাজ। তাকে ভারাক্রান্ত করবেন না।

—আর তুমি ? বিম্বিসার উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন

—সোমার ভাগ্যফল সোমাকেই বুঝে নিতে দিন।

—কী করবে তুমি ? সোমা হঠকারিতা করো না।

তিষ্য বলল—ভদ্রে, আপনি আমার সঙ্গে শ্রাবস্তী চলুন। সেখানে গিয়ে...

সোমা বলল—আমি গান্ধারী। ভবিতব্যকে ভয় পাই না ভদ্র। আমার নিরাপত্তার জন্য এত জন উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন দেখে আমার আত্মধিক্কার জন্মে যাচ্ছে।

সে নত হয়ে মহারাজকে অভিবাদন করে ভেতরে চলে গেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

'আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তব ঘরে।
জানো না কি রাত্রি এসে ঘিরিতেছে আরো-এক দীর্ঘতর বৃত্তে রোজ
মানুষের জীবনকে।
যে-সব সৌন্দর্য র'চে গিয়েছিলো একদিন মেধাবীরা
আজ এই রজনীর অবরোধে মনে হয়
তাহাদের জ্যোতি যেন বিস্ফোরক বাষ্প হয়ে জ্বলে
সহসা আকাশ পথে দিক্‌হস্তিদের মতো,—'

জীবনানন্দ দাশ

শ্রেষ্ঠী সুদত্তর নির্মিত শ্রাবস্তী-রাজগৃহ বা রাজগৃহ-শ্রাবস্তী মহাপথটি কিন্তু কোনও নতুন পথ নয়। গতায়াতরত পথিকরা সবাই জানে এই-ই হল সেই সুপ্রাচীন উত্তর-পথ। কত যুগ ধরে এ পথ রয়েছে, কত শত জনযাত্রা, যুদ্ধযাত্রা, শিক্ষাযাত্রা, বাণিজ্যযাত্রার ধূলি মিশে রয়েছে এই উত্তর-পথে। শ্রাবস্তীতে পৌঁছেই কি এ পথ থেমেছে? থামেনি। চলে গেছে কৌশাম্বী, মথুরা অতিক্রম করে, মরুপ্রান্তর পেরিয়ে তক্ষশিলা অভিমুখে। অঙ্গ মগধের বড় বড় সার্থ এখন এই পথ ধরে সিন্ধু বিতস্তার মধ্যবর্তী সুদূর সৌবীর দেশের রাজধানী রৌরুক এবং আরও বহু পট্টনে যাত্রা করে। ভৃগুকচ্ছর পট্টন তার সংলগ্ন নীল লবণাম্বুরাশি কেতুকামী গরবী বণিকের চোখে স্বপ্নের ঘোর লাগায়। অনতিবিস্মৃত অতীতে কুরুদেশ থেকে দুই কুরুবীরকে নিয়ে যদুবংশীয় কৃষ্ণ এই পথ ধরেই জরাসন্ধ দমনের জন্য ছদ্মবেশে রাজগৃহের দিকে গিয়েছিলেন। সে-সব কাহিনী সূতরা এখন ছোট বড় যজ্ঞে, সমাজোৎসবে বলে থাকেন। মহাবীর ভীমসেন নাকি দিগ্বিজয়ে বার হয়ে বিদেহ-দশার্ণ হয়ে কোশল রাজ্যে প্রবেশের জন্য এই পথই ধরেছিলেন। শ্রেষ্ঠী সুদত্ত ভগবান তথাগতর কথা চিন্তা করেই এই বহু পুরাতন মহাপথের শ্রাবস্তী-রাজগৃহ অংশটি সংস্কার করেছেন। পুরোটাই স্থলপথ। বৈশালীর কাছে একবার মাত্র গঙ্গা-হিরণ্যবাহ সঙ্গম পার হয়ে ওপারে কিছুটা দক্ষিণপূর্বে পাটুলিগ্রামে পৌঁছতে হয়। গ্রাম হলেও যাত্রীদের কাছে তো বটেই, বণিকদের কাছেও এই পাটুলিগ্রামের আবস্থানিক গুরুত্ব যথেষ্ট। পাটলি বা পাটুলিকে তাঁরা 'পুটভেদন' বলে থাকেন। অর্থাৎ এখানে এসে পণ্য-বস্তুর পুট বা আচ্ছাদন ভাঙা হয়। সবসুদ্ধ বারোটি বিশ্রামস্থল আছে এই পথে। সুন্দরতমটি বৈশালীর ওপ্রান্তে। চমৎকার গন্ধকুসুমের কুঞ্জ সেখানে। তার মাঝখানে পাথরের বিশ্রামগৃহ। সাত-আটটি বৃহৎ কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষ পরিচ্ছন্ন, বিশ্রামের ব্যবস্থাদিও অতি সুষ্ঠু। শুধু বহু পন্থের শ্রমণ, তীর্থিক, সাধুজনই নয়, যে কোনও পথিক, পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হলে এখানে পাবেন আতিথ্য। পানীয় জল, একটু শুয়ে নেবার জন্য কিলিঞ্জক, ভালো গুড় এবং চিঁড়ে পাওয়া যাবে বিনামূল্যে, সামান্য মূল্য দিলে অন্ন প্রভৃতিও পাওয়া যায়। অদূরেই মহাবন নামে বিস্তীর্ণ শালবন। তার মধ্যে কূটাগারশালা যা বুদ্ধকে দান করেছেন মহামান্য গোশৃঙ্গি।

সেবার ভয়ানক মহামারী লাগল বৈশালীতে। বৈশালীর যত বড় বড় বিদ্যাবিশারদ সবাই যে-যার মতো করে মহামারী থামাবার উপায় করতে লাগলেন। এক দিকে তখন যজ্ঞধূম উঠছে আকাশে, তার সঙ্গে মন্ত্র মিশে যাচ্ছে, আরেক দিকে বৈশালীর সবচেয়ে প্রতাপশালী শ্রমণপন্থ নির্গ্রন্থরা বলছেন, এতে কিছু হবে না, চতুর্যাম সংবরের উপদেশ শোনো, পালন করো। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই হল চারটি যাম, এইগুলিই তোমাদের পাপমুক্ত করবে। নিরুপায় নাগরিকরা যে যা বলছেন শুনছেন, কিন্তু মহামারীর উপশম নেই। সাধারণ নাগরিকরা তো মরছেই, মরছে ধনীরাও, শেষে তীর্থিক, নির্গ্রন্থরাও দলে দলে মরতে লাগলেন। তখন গণমুখ্যরা সকলে মিলে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র মহাবীরের নিষেধ অগ্রাহ্য করে গৌতম বুদ্ধকে আহ্বান করেছিলেন। মুখে মুখে এখন রটনা হয়ে গেছে গৌতম নাকি ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে বৈশালী এসেছিলেন, এবং তিনি এসে দাঁড়াবামাত্র মহামারী পাংশুবসনে পাংশুমুখে নগরীর পশ্চিম দ্বার দিয়ে পালিয়ে যায়। লোকে এ ভাবেই বলতে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে ভালোবাসে। কিন্তু প্রকৃত কথা, আহ্বানপত্র নিয়ে দূত এলে গৌতম প্রথমেই লিচ্ছবি গণমুখ্যদের জানান— তিনি বেসালির অসামান্য নগর-সৌন্দর্য দেখতে বড় ভালোবাসেন। নগর পরিষ্কৃত, সুস্নাত, সুরভিত হলে, তবেই তিনি গিয়ে উপস্থিত হবেন। মাত্র তিন দিনে সেবার সমগ্র বেসালি পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আবর্জনা, মৃত ব্যক্তিদের ব্যবহৃত, পরিত্যক্ত বস্তুসমূহ হয় নগরদ্বারের বাইরে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়, নয় তো পুড়িয়ে ফেলা হয়। পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কৃত হয়, লক্ষ লক্ষ থলি উগ্র সুগন্ধি চতুষ্পথে চতুষ্পথে পোড়ানো হতে থাকে। সেই গন্ধে এবং সিক্ত খড়ের ধূমে নগরীর গৃহকোণগুলি থেকে দলে দলে মশক, মক্ষিকা, মূষিক এবং নানা শ্রেণীর কীট ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে আসে, তীর্থিকদের মতো মুখে বসন বেঁধে মূষিক ও কীট বধে সেবার বেরিয়ে পড়ে নগরীর আপামর সাধারণ। বহু তোরণ নির্মিত হয় গৌতমকে অভ্যর্থনার জন্য। তোরণগুলি কুসুম সাজে নিপুণভাবে সজ্জিত। চতুর্থ দিন গভীর রাতে গৌতম গঙ্গা পার হলেন, বৈশালীর তৃতীয় প্রাচীর পেরিয়ে প্রধান তোরণদ্বারের নিচে যখন কয়েকটি ভিক্ষু নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন ঊষালগ্ন। দ্বার খুলতেই দেখা গিয়েছিল যেন সাক্ষাৎ আদিত্যই আকাশ থেকে নেমে এসেছেন।

কূটাগারশালায় সেবার অবস্থান করলেন তিনি। মহাবনে বিশাল জনসভা। কিন্তু গৌতম সদ্ধম্মের কথা তো কিছু বললেন না। শুধু বললেন— নীরোগ শরীরই হচ্ছে ধম্মসম্মত জীবনযাত্রার প্রথম শর্ত। বেসালিবাসী তাদের নগরকে যে ভালোবাসা দেখিয়েছে আপৎকালে, অন্য সময়েও যেন তেমনই ভালোবাসা দেখায়। সম্পদগর্বে ভুলে গিয়ে নগরীর শ্রীরক্ষায় যেন তারা শৈথিল্য না করে।

তীর্থিকরা প্রশ্ন তুলেছিলেন— নগরী পরিষ্কৃত করতে যে এত মক্ষী, মশা, কীটাদি হত্যা করা হল এতে গৌতমমতে— নিরয়গামী হতে হবে না ?

গৌতম দৃঢ়কণ্ঠে জানান— তথাগত মজ্‌ঝিম পন্থায় বিশ্বাসী।

নির্গ্রন্থরা জিজ্ঞাসা করেন— আপৎকালে কি তিনি অহিংসা ত্যাগ করতে বলেন ? গৌতম তাতে উত্তর দেন— আয়ুষ্মন, রোহিণী নদীর জল নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ হলে তারা যখন পরস্পরকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তথাগত তখন তাদের প্রথম প্রশ্ন করেন— কিসের মূল্য অধিক, জল না ভূমি, তারা বলে ভূমি, তথাগত তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন— কিসের মূল্য অধিক, ভূমি না ক্ষত্রিয়। তারা বলে ক্ষত্রিয়। তখন তথাগত তাঁদের তৃতীয় প্রশ্ন করেন—তবে তারা অল্পমূল্য জলের জন্য অমূল্য ক্ষত্রিয়ের প্রাণ নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে কেন ? আয়ুষ্মন এতে শাক্য ও কোলিয়রা নিরস্ত হয়।

তখন গণমুখ্য ছেটক চতুর হেসে জিজ্ঞেস করেন— কিন্তু ভন্তে, যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে, সন্ধির প্রস্তাব না মানে ? তখন কি অক্রোধ দিয়ে ক্রোধ জয় করতে গিয়ে, সাধুতা দিয়ে অসাধুতা জয় করতে গিয়ে আমরা সমূলে বিনষ্ট হবো ? এবং যুদ্ধকালে সচ্চবাদিতাই কি সর্বদা টিকিয়ে রাখা যায় ?

গৌতম উত্তর দেন— যথাসাধ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গর অনুসরণ করা উপাসকের কর্তব্য। যথাসাধ্য। আপৎকালেও অক্রোধের অনুষ্ঠান করা একমাত্র পব্‌বজিতর পক্ষেই সম্ভব। সেইজন্যই পব্‌বজিতের স্থান উপাসকের ঊর্ধ্বে।

সেই থেকে লিচ্ছবিরা গৌতম বুদ্ধর গুণমুগ্ধ। কোনও ব্যাপারেই চরম, অটল, জগদ্দল কোনও নিয়ম বেঁধে দেন না গৌতম, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেন। কতকগুলি মৌলিক সততার নীতি মেনে চলো, তারপর সমস্যার সমাধান চাও, গৌতমকে সঙ্গে পাবে। আর হবে না কেন, উনি তো সাক্ককুলের, অর্থাৎ আরেকটি গণরাজ্যেরই কুমার। বজ্জিদের উনি বোঝেন, বজ্জিরাও ওঁকে বোঝে। বৈশালীর লিচ্ছবি-বজ্জিকুল মনে মনে তাদের শাসনতন্ত্র-জনিত কারণে গর্বিত। কোনও রাজার ইচ্ছাধীন নয় তারা, পদানতও নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের সংস্থাগারে শলাকা ব্যবহার করে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তাদের গণমুখ্যদেরও রাজাই বলে। কিন্তু রাজার সর্বময় কর্তৃক তাদের নেই। মহল্লক বা জ্যেষ্ঠদের পরামর্শ তো তাদের শুনে চলতে হয়ই। গৌতমের বড় মনোমত এই রাজ্যশাসন পদ্ধতি। সংঘেও তিনি শলাকা দিয়ে নির্বাচনের পথ গ্রহণ করেছেন।

আজ বৈশালীর বিশ্রামাগারে দুই দল তীর্থিক এসে উঠেছেন। এক দল আসছেন শ্রাবস্তী থেকে, অন্য দল রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী যাচ্ছেন। দুটি দলের কেউই কাউকে চেনেন না। সারা মধ্যদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুড়ে আশি হাজার তীর্থিকের যাতায়াত, বসবাস। কে কাকে চিনছে ? যদিও উভয় দলই মানে তীর্থঙ্কর পূরণ কাশ্যপকে।

রাজগৃহ-তীর্থিকরা শ্রাবস্তী যাচ্ছেন শুনে ম্লান মুখে শ্রাবস্তী-তীর্থিকদের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বললেন— সাবত্থিতে গিয়ে আর কিই বা করবে আবুস।

রাজগৃহ-তীর্থিকরা অবাক হয়ে বললেন— সে কি ? এখন আচারিয় কাস্‌সপ সাবত্থিতে রয়েছেন… আমরা তাঁকে দেখবার জন্যই আরও… আমাদের মধ্যে অনেকে তো দেখেনইনি।

বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রাবস্তী-তীর্থিক সখেদে বললেন— আচারিয় কাস্‌সপ তো আর নেই।

—সে কি ?

—হ্যাঁ। উনি অচিরবতীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তা বৎসরখানেক তো হলই।

—অহো। আমরাও যদি সেইসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিতে পাত্তাম ? —আরেকজন বললেন।

—কেন, এরূপ বলছেন কেন ? কী ঘটেছিল, বলুন তো। —রাজগৃহ-তীর্থিকরা জিজ্ঞাসা করলেন— আমরা গিয়েছিলাম চম্পায়। অঙ্গদেশের বহু স্থানে তীর্থিক মত প্রচার করছি গত কয়েক বৎসর। এখন রাজগহতে মাত্র একদিন বিশ্রাম করেই সাবত্থি যাচ্ছিলাম। বিশেষত আচারিয়র সাক্ষাতে আমাদের প্রচার-কর্মের কথা জানাবো বলে। এ সকল কথা তো শুনিনি। আচারিয়র দেহত্যাগ ? সে কী !

শ্রাবস্তী তীর্থিক বললেন— দেখো আবুস, আমরা তো তীর্থঙ্কর কাস্‌সপকেই বুদ্ধ বলে জানতাম। সমন গোতম নামে ওই ব্যক্তি সাবত্থিতে এসে অবধি, লোকে তার কাছে ছুটছে। কয়েক বৎসর ধরে ক্রমেই তার প্রতিপত্তি বাড়ছে। মহারাজ পসেনদি পজ্জন্ত ইদানীং মহাত্মা কাস্‌সপকে বুদ্ধ বলতে দ্বিধা করছেন। সাবত্থির সবচেয়ে সুন্দর কানন জেতবন গৌতমের হয়ে গেল। এইরূপে সকলই হাতছাড়া হয় দেখে আমরাও আচারিয়র আদেশে মহারাজের কাছে আবেদন কল্লাম, জেতবনের সন্নিকটে আমাদেরও বিহার চাই। প্রথমটা তো মহারাজ কিছুতেই ঘাড় নোয়াচ্ছিলেন না। তারপর লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ দিয়ে তাঁকে বশ করা হল।

—মহারাজকে উৎকোচ ? —একজন রাজগৃহ-তীর্থিক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—উৎকোচ বলে কি আর দিয়েছি রে ভাই, রাজার রাজত্বে নির্ভয়ে বাস করি, চমৎকার ভিক্ষাদি পাওয়া যায়,— কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ লক্ষ মুদ্রা উপহার দেওয়া হল যেন।

—নিঃস্ব পব্‌বজিতর কাছ থেকে উপহার ? —রাজগৃহ-তীর্থিকদের বিস্ময় আর কাটতেই চায় না।

—আহা, আমাদের কোসলরাজ ধনসম্পদ বড় ভালোবাসেন যে। এই তো সেদিন কৃপণ সেট্‌ঠি গুণাঢ্য অপুত্তক মারা গেল। অশীতি লক্ষ মূল্যের সম্পত্তি রাজকোষে জমা পড়ল। আনন্দে মহারাজ রানি কোসলমল্লিকাকে দিয়ে নতুন আরাম প্রতিষ্ঠা করে ফেল্লেন। রাজারা এরূপই হন।

—আমাদের মহারাজ বিম্বিসার এরূপ নন।

—আরে উনি তো সেদিনের রাজা। এখন কিছুকাল রাজবংশ সংযত থাকবে, তারপর দেখো না…

রাজগৃহ-তীর্থিকরা বিরক্ত হয়ে বললেন— আচ্ছা আচ্ছা বলুন তো দেখি কী হয়েছিল।

—আমরাও বিহার নির্মাণ কত্তে আরম্ভ কল্লাম। কদিন পরেই সাক্যপুত্তীয়রা মহারাজের কানে কী মন্ত্র দিল জানি না, রাজাদেশে নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আচারিয় তো ক্রোধে কাঁপছেন তখন। মহা গোল। অবশেষে পসেনদির আদেশ হল— মুক্ত প্রান্তরে সমন গোতম আর আচারিয় কাস্‌সপ পরীক্ষা দিন কে কত বড় ইদ্ধিমান। আমাদের আচারিয় ইদ্ধি দেখাতে গেলেন, কী বলব আবুস, হাত নাড়তে পজ্জন্ত পাল্লেন না। মুখ বন্ধ। যেমন জোড়াসনে বসেছিলেন বসে রইলেন।

—সে কি ? এ প্রকার অবস্থা কি করে হল ?

—কি করে আবার ? সমন গোতম ইদ্ধিবলে আচারিয়কে বেঁধে রেখে দিলেন। প্রমাণ হয়ে গেল তিনিই বড়। আচারিয় কাস্‌সপ অপমান সইতে পাল্লেন না। যেই না মুক্ত হওয়া বিভল চোখে চারদিকে চাইলেন তারপর দেখ না দেখ নদীর জলে প্রবেশ কল্লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কেউ বাধা দিল না !

—বাধা দেবে কি ? সবাই হতবুদ্ধি। চারদিকে সমন গোতমের নামে এমন জয়ধ্বনি উঠছে যে কিছু শোনাও যাচ্ছে না। আমরা ভেবেছি আচারিয় বুঝি চান করতে নামছেন।

রাজগৃহ-তীর্থিকরা ম্রিয়মাণ দুঃখিত স্বরে বললেন— আশ্চর্য ! তারপরে ?

—তারপরে আর কি ? আমাদের দল ভেঙে তীর্থিকরা সব গোতমের সংঘে যোগ দিতে লাগল। আমরা পুরাতনরা আরও নানা উপায়ে গোতমের যশোহানি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু শেষে আমাদেরই লজ্জিত হতে হল। এখন তাই সাবত্থি ছেড়ে চলে এসেছি।

—বিতাড়িত হয়েছি, সেটাই বলুন না। সতীর্থদের কাছে লুকিয়ে আর কি হবে ? একজন শ্রাবস্তী-তীর্থিক সক্ষোভে বললেন।

রাজগৃহ-তীর্থিকরা উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে একজন, দুজন, শেষে সবাই ওঁদের পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করলেন। কীভাবে তাঁরা সমন গোতমের যশোহানি করতে চেয়েছিলেন, কেনই বা বিতাড়িত হলেন, বলতে হবে।

অবশেষে একজন শ্রাবস্তী তীর্থিক বললেন— ওই চিঞ্চা !

—চিঞ্চা ? সে কে ?

—তীর্থিকদের উপাসিকা। ভক্তি মান্যি করে। অতিশয় রূপসী। তাকে আমরা সমন গোতমের কাছে নিত্য পাঠাতে লাগলাম।··· একটু রাত করে··· জেতবন স্থানটি কুঞ্জে কুঞ্জে বৃক্ষে বৃক্ষে অতি মনোহর তো !

—তাতে কি ?

শ্রাবস্তী-তীর্থিক ঢোঁক গিলে বললেন— কী আর··· ! রূপসী রমণী ···মনোহর স্থান··· সময় রাত্রি···কী হতে পারে আবুস— গর্ভ হল।

—কার ? চিঞ্চার ?

—আবার কার ? সমন গোতমের যেমন কাণ্ড !

—বলেন কি ? তা তাঁরই তো বিতাড়িত হবার কথা !

—কি করে হবে ? সভাস্থলে, সর্বসমক্ষে চিঞ্চা যখন উঠে দাঁড়িয়ে সমন গোতমকে দোষারোপ করছে, হঠাৎ চিঞ্চার গর্ভটি খসে গেল।

—গর্ভ খসে গেল ? সর্বনাশ ! —রাজগৃহ-তীর্থিকরা আর্তনাদ করে উঠলেন।

—তাতেও তো সমন গোতমের বহিষ্কার হওয়া উচিত।

—কী করে হবে ? গর্ভটি যে একখণ্ড কাঠে পরিণত হল, দুম করে চিঞ্চার পায়ে পড়ে দাহিন পায়ের আঙুল কটি ছেঁচে গেল একেবারে। সে কী লাঞ্ছনা ! কী ধিক্কার ! সাক্যপুত্তীয়রা তো তেড়ে মারতে আসে। সাবত্থির লোকেরাও আমাদের দুষতে লাগল। পসেনদি রেগে আমাদেরই বহিষ্কারের আদেশ দিলেন।

রাজগৃহ-তীর্থিকরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। বললেন—অদ্ভুত ইদ্ধি তো ! তা কেউ বুঝি বিশ্বাস করল না গর্ভ কাঠ হয়ে গেছে !

—কি করে বিশ্বাস করবে ? চিঞ্চাই তো যাতনায়, ধিক্কারে অস্থির হয়ে বলতে লাগল তীর্থিকরাই তাকে এরূপ অভিনয় করতে বলেছে, উদরে কাষ্ঠপিণ্ড বাঁধতে বলেছে, আরও কত কী !

তখন একজন যুবক রাজগৃহ-তীর্থিক মৃদু হেসে বলল— অহো ! এমনই ইদ্ধি যে স্বয়ং চিঞ্চাই বুঝতে পারেনি তার উদরে ভ্রূণ আছে না কাষ্ঠপিণ্ড আছে ! অতি চমৎকার !

সে বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল—দেখুন আজ আমি একটা স্পষ্ট কথা বলছি। নিতান্ত নবীন বয়সে পিতা মারা গেলেন, পিতার বন্ধু সব প্রতারণা করে নিয়ে নিলেন। মাতা বাণিজ্য, পণ্য, গচ্ছিতকরণ, কুসীদ কিছুই বুঝতেন না। ভগ্ন মনে তিনিও মারা গেলেন। এরূপ অবস্থায় আচারিয় কাস্‌সপ আমাদের উদিত-গামে এসেছিলেন, তাঁর দেশনা শুনে অবাক হয়ে যাই। কিছুতেই নাকি পাপ-পুণ্য হয় না। ভ্রূণ হত্যায়, আত্মীয় বন্ধুকে প্রবঞ্চনা করায়, হত্যা করায় পাপ নেই, আবার দানে, যজ্ঞে, মানুষের উপকারেও পুণ্য নেই। আমার আশা ছিল— পিতামাতা অন্তত পুণ্যবলে স্বর্গে গি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখী হয়েছেন, এবং ওই প্রবঞ্চক পিতৃবন্ধু নির্ঘাৎ মৃত্যুর পর অবীচি নরকে গিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করবে। আচারিয় কাস্‌সপের কথা শুনে প্রবল হতাশা এলো, তারই ফলে অক্রিয়বাদী হয়েছি। এবার অঙ্গদেশের ভদ্রঙ্করে এক গান্ধার যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। তিনি আমাদের তীর্থিক মত শুনে বললেন— 'আপনাদের মতবাদে বিন্দুমাত্র সত্যতা থাকলে এই পৃথিবী এবং মনুষ্যসমাজকে টিকে থাকতে হত না। সকলেই ইচ্ছামতো পাপ-কর্মে লিপ্ত হত। কিন্তু তা হয় না, মানুষের মনের মধ্যে সহজাত পাপবোধ আছে। অনার্য জনদের মধ্যে অরণ্যে গিয়ে দেখুন, সহজ নীতিজ্ঞান আছে তাদেরও। তা হলে ? যে বস্তুর প্রয়োজন নেই তা সৃষ্টি হল ? এবং তারই ফলে সংসার সুষ্ঠুভাবে চলছে ? প্রকৃত কথা আপনারা নৈতিক বিশৃঙ্খলার মত প্রচার করছেন। তা ছাড়াও আপনাদের অক্রিয়বাদ আর মস্‌করী গোশালের ভবিতব্যবাদে কোনও পার্থক্য নেই। আপনারা নিজেরা অনৈতিক জীবন যাপন করবেন করুন। কিন্তু গৃহবাসী, সমাজসেবী মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবেন না। আমি রাজা হলে আপনাদের তীর্থিক-মত নিষিদ্ধ করে দিতাম।'

এখন তীর্থঙ্কর কাস্‌সপের পরিণাম শুনে, এবং তার চেয়েও বড়, এই সাবত্থি-তীর্থিকদের লোভ, ক্রূরতা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির কথা শুনে বুঝতে পারছি এই পঞ্চদশ বৎসর ঘোর পাপীদের অনুগমন করেছি। তীর্থিক জেট্‌ঠগণ— সংসার যেমন আছে, তেমনি পাপ-পুণ্যও আছে। মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকাদি আছে কি না জানি না। তবে মৃত্যুর পূর্বে যে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী স্বর্গফল, নরকফল লাভ হয় এ তো দেখতেই পাচ্ছি— বলে তীর্থিক যুবক ক্রুদ্ধ কটাক্ষে শ্রাবস্তী-তীর্থিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। সে দাঁতে দাঁত ঘষছে।

শ্রাবস্তী-তীর্থিকরা বললেন— অহে, এরা আমাদের প্রহার করবে নাকি ? নাসারন্ধ্র কী প্রকার ফুলছে দেখো ! স্থান-ত্যাগ করাই মঙ্গল মনে হচ্ছে !

রাজগৃহ-তীর্থিকরা বললেন— হ্যাঁ, প্রহার করলে যখন পাপ নেই তখন এই নরাধমগুলিকে প্রহার করলে তো ভালোই হয়।

শ্রাবস্তী-তীর্থিকরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন— প্রহারের প্রয়োজন কী ! আমরা তো চলেই যাচ্ছি।

আর দ্বিরুক্তি না করে তাঁরা সবাই আরাম ত্যাগ করলেন।

লোকগুলি দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাওয়ার পর যুবক তীর্থিক যশ বলল— রাজপুরুষে উৎকোচ নেয়, এবং ধরা পড়লে শূলে চড়ে শুনেছি। কিন্তু দেশের রাজা ভিক্ষুদের কাছ থেকে উৎকোচ নেয় এমন কথা আমি কোথাও কখনও শুনিনি। ওই পাপ-রাজার দেশে আমি যাবো না। যেতে হয় আপনারা যান।

বয়োজ্যেষ্ঠ তীর্থিক বললেন— কিন্তু যশ, সেখানে সমন গোতম রয়েছেন। তাঁকে দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা জাগছে যে।

—জানি না। তিনি হতে পারেন পূরণ কাস্‌সপের চেয়ে বড় সাধু, কিংবা বড় প্রতারক। আমি আর এ সবে বিশ্বাস করি না। আমি রাজগৃহে ফিরে যাচ্ছি। দেখি কোন প্রকারে জীবিকার উপায় করতে পারি কি না। গান্ধার যুবা বলেছিল— দেহবল, মনোবল, বুদ্ধিবল পূর্ণভাবে প্রয়োগ করে সমাজের দায়গুলি স্বীকার করে নিয়ে বাঁচাই জীবনের সঠিক ব্যবহার। মৃত্যুর পরে কী হবে না হবে, পুণর্জন্ম হবে কি না, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি অজানা কতকগুলি রহস্য নিয়ে চিন্তা করে এ ভাবে কাল কাটানোর কোনও অর্থ হয় না। প্রকৃত কথা, আমরা কেউই জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারিনি। হতাশ হয়ে, নিরুপায় হয়ে এই তীর্থিক-পথ গ্রহণ করেছি, কেমন কি না ?

বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটি বললেন— না, তোমার কথা সর্বাংশে সত্য নয় আবুস। আমি তো অন্তত সত্যসত্যই জীবনের কার্য-কারণ জানতে আগ্রহী। আমি ভাবছি সমন গোতমের সঙ্গে দেখা করব। তারপর যা হয় কিছু একটা স্থির করা যাবে।

অধিকাংশই তাঁকে সমর্থন করলেন। আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, ভালো চিঁড়ে সুমিষ্ট গুড় ইত্যাদি দিয়ে জলযোগ সেরে তাঁরা সবাই বেরিয়ে পড়লেন। এগারো জনের মধ্যে ন' জনই শ্রাবস্তীর পথ ধরলেন। অবশিষ্ট দুজন, যশ এবং নন্দিয় স্থির করল রাজগৃহে ফিরে যাবে। এরা দুজনেই এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলে সর্বকনিষ্ঠ। যশের বয়ক্রম পঁচিশ হবে। নন্দিয় আরও একটু ছোট।

তখনও দুজনে বৈশালী-আরামের দ্বার পার হয়নি, যশ বলল—নন্দিয় তুমি কেন আমার অনুগামী হলে ?

নন্দিয়র মুখের ওপর একটি পাতা ভরা লতা এসে পড়েছে। সে লতাটিকে সন্তর্পণে সরাতে সরাতে বলল— ভাই যশ, তোমার কথাগুলি আমার বড় মনের মতো হয়েছে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য— অন্ন আর আশ্রয় বিনা ক্লেশে জুটবে বলেই আমি তীর্থিকদের শরণ নিই। অতি দরিদ্র ছিলাম। তোমার মতোই অনাথ, ধরো। কারও গৃহে ভৃতক হওয়া ছাড়া গতি ছিল না তাই। এখন, তুমি যদি দেহবল, মনোবল, বুদ্ধিবলের ওপর নির্ভর করে জীবন আরম্ভ করতে পারো আমিই বা পারি না কেন ?

যশ হাসিমুখে বলল— ভালোই হল। একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। তবে নন্দিয়, তোমার যখনই ইচ্ছা হবে, তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারো।

নন্দিয় বলল— ভাই যশ, তুমি যতটা নির্ভীক হয়ে গেছ আমি এখনও অতটা হতে পারিনি। একটা কোনও উপায় না হওয়া পর্যন্ত আমাকে সহ্য করো ভাই।

আহা, তোমাকে ত্যাগ করার কোনও বাসনা আমার নেই নন্দিয়। তবে সত্যিই আমি কেমন ভয়হীন হয়ে গেছি। আর দেখো, সহসা এই কুঞ্জ, লতাবিতান, সম্মুখে প্রসারিত ওই পরিষ্কৃত রক্ত মৃত্তিকার পথটি সবই আমার অপূর্ব সুন্দর লাগছে, নূতন লাগছে। বেসালি আগে কখনও দেখিনি। শুনেছি অতি সুন্দর। নন্দিয় বেসালি দেখবে ?

নন্দিয় সাগ্রহে সম্মতি দিলে দুজনে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বৈশালীর পথে পথে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগল। দুজনেই ক্ষুৎপিপাসাকাতর। অথচ দুজনেরই উৎসাহের অন্ত নেই। বৈশালীতে নগরের তিনটি প্রাকার, প্রতি প্রাকারের মাঝে এক যোজন ব্যবধান। আছে অট্টালক, কূটাগার। কিন্তু নগরের শুষ্ক চরিত্রকে এরা একেবারে পরিবর্তিত করে ফেলেছে, স্থানে স্থানে বনকে সযত্নে রেখে দিয়ে। সমগ্র জম্বুদ্বীপই বনময়। তাকে বলে মহাবন। সেই মহাবনের অংশবিশেষ তার প্রায় মৌলিক চরিত্র সমেত টিকে আছে মধ্যদেশের নানা স্থানে। বৈশালীর মহাবন সেই মহাবন। বা তার অংশ। তার পাশ দিয়েই চলে গেছে মৃত্তিকাময় পথ সব। প্রাসাদগুলি আত্যুচ্চ নয়। সবগুলিই কাননে ঘেরা।

যশের আজকে যেন মুখে কথার জোয়ার এসেছে। সে বলল— কাস্‌সপই বলো, পকুধ কচ্চায়নই বলো, আর বেলট্‌ঠিপুত্তই বলো, কী নতুন কথা বলছেন ? একই কথার এপিঠ আর ওপিঠ। আর শুধু ব্রহ্মচর্য পালন করো, নির্বস্ত্র হও, কেশ-দাড়ি মুণ্ডন করো আর কৃচ্ছ্র করো, কৃচ্ছ্র করো, কৃচ্ছ্র করো।

নন্দিয় উত্তেজিত হয়ে বলল— এই যে ধরো এই নগরেই, যারা দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করছে, এদিকে বেশ আঢ্য ব্যক্তিও বটে আবার বিদ্যা-সিদ্যাও শিখেছে তারা তো দিব্য রয়েছে ! জীবনটি বেশ সরস, মাংস-ভক্তুর (মাংসের ঝোল) মতো চুকচুক করে খাচ্ছে আর সারা শরীর দিয়ে যেন ঘৃত গড়িয়ে পড়ছে, মুখগুলি প্রসন্ন, হাস্যময়। মৃত্যুর পরে কী জানা যাচ্ছে না, কিন্তু পূর্বে তো জীবন ! এক অর্ধ অন্তত এরা ভালোই উপভোগ করল। আর আমরা ? পরেও শূন্য, আগেও শূন্য। কিসের আশায় ?

যশের কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল, সে সরোষে বলল— কিচ্ছু না ! এই নৈরাশ্যের পথ আমরা কেন এতদিন অনুসরণ করেছি ভাবলে আমার আক্ষেপ হচ্ছে। ক্রোধ হচ্ছে। তুমি আর বলো না। বরং চলো ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় দেখি। এখনও অঙ্গে তীর্থিকের ভেক রয়েছে, ভিক্ষা পাবো নিশ্চয়ই।

নন্দিয় বলল— ভেকটির জন্যে আমার লজ্জা হচ্ছে ভাই।

—হোক। প্রতি পদে অত ভালো-মন্দ বিচার করে আর চলব না।

দুজনে হনহন করে চলতে লাগল। কোন গৃহে ভিক্ষা নেবে এ বিষয়ে দুজনের সামান্য মতভেদ দেখা দিল। নন্দিয় পূর্ব অভ্যাসমতো যে গৃহ সামনে পড়ে সেখানেই ভিক্ষা নেওয়ার পক্ষপাতী। যশ কিন্তু একটির পর একটি গৃহ পার হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে একটি সুবৃহৎ প্রাসাদের সুন্দর শিখর কাননের গাছগুলির মধ্য থেকে মাথা তুলছে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল। কাননটি ক্ষুদ্র, কিন্তু এত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর সজ্জিত যে চোখ যেন শান্তি পায়। শুভ্র প্রসাদটি। বৃহৎ দ্বারকোষ্ঠক। মানুষ-জন যাতায়াত করছে।

যশ বলল— দেখছ না এটি ব্যাপার-বাড়ি। ভালো ভালো ব্যঞ্জন রান্না হচ্ছে। আমার এখন উদর-ভরা ঘৃতৌদন ও পক্ষীমাংস খেতে ইচ্ছে করছে। এরা যদি গোটাকতক হাঁস মেরে থাকে তো ভালো হয়।

পেছন থেকে কে বলল— আসুন আসুন, তীর্থিক মহোদয়গণ। আজ হংস, কুক্কুটাদি যথেষ্ট মারা হয়েছে। ঘৃতৌদনও পর্যাপ্ত। সীহর গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।

দুই যুবক পেছন ফিরে দেখল একজন বলিষ্ঠ সুপুরুষ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সম্ভবত এইমাত্র অশ্বটি অশ্বরক্ষকের হাতে দিয়ে গৃহের দিকে আসছেন।

নন্দিয় মুখ ভারী করে বলল— নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করছি গহপতি। অতিশয় ক্ষুধার্ত আমরা। কিন্তু জানবেন, তীর্থিক আমরা নই।

আপাদমস্তক তাদের দেখে নিয়ে সীহ বললেন— নন ?... তা হলে ?...

যশ বলল— কিছুক্ষণ আগেও ছিলাম। এখন নই। মোহভঙ্গ হয়েছে। আপনি যদি খাদ্যের সঙ্গে বস্ত্রও দান করেন, বড় সুখী হই।

সীহ মৃদু মৃদু হেসে বললেন— আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।

গৃহের ভেতরে ঢুকতেই তিন-চারটি দাস ছুটে এলো, সীহ দুজনকে বললেন— এই দুটি যুবককে উত্তমরূপে স্নান করিয়ে, নূতন বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য দিয়ে সুসজ্জিত করে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেবার উপযুক্ত করে নিয়ে এসো।

কয়েকটি দীর্ঘ পদক্ষেপে তিনি গৃহের ভেতরে চলে গেলেন।

যশ মৃদুস্বরে নন্দিয়কে বলল— দেখলে তো, সুনির্বাচিত গৃহে ভিক্ষার্থ আসবার সুফল।

নন্দিয় চতুর্দিকে তাকিয়ে খোদিত কাঠের স্তম্ভ, অলঙ্কৃত তক্ষণে সুন্দর দ্বার ও গবাক্ষের কপাটগুলি, ভিত্তিচিত্র ইত্যাদি দেখতে দেখতে বলল— বাঁচতে হয় তো এমনি। পুরুষের মতো বাঁচা। মানুষের মতো বাঁচা আমরা এতদিন কী করেছি যশ! আমাদের চোখের সামনে কেউ যেন একটি মলিন বস্ত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিল। কেন বলো তো?

যশ মৃদুস্বরে বলল— দেখো নন্দিয়, আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে— সবটাই ইচ্ছাকৃত। এই ভাবে, দলে দলে মানুষের চোখের সামনে জীবনকে একটি মলিন বস্ত্রখণ্ডের মতো ঝুলিয়ে রাখা... এর পেছনে উদ্দেশ্য আছে।

—উদ্দেশ্য ! কাদের ?

—ধরো পৃথিবীর ভূমি তো পরিমিত, ধনসম্পদও অসীম অনন্ত নয়। সবাই যদি এই গহপতি সীহর মতো সাড়ম্বরে জীবন ভোগ করতে চায় তো তা হলে ? যাতে না চায় তাই-ই অতি-চতুর ব্যক্তিরা ওই তীর্থঙ্করদের মতো ব্যক্তিদের নিযুক্ত করে এই সব মত প্রচার করতে। আর আমরা অনাথ, নিঃস্ব এবং মূর্খের দল তাইতে ভুলে নিরুদ্যম হয়ে জীবনকে জয় করবার বাসনা ত্যাগ করে মৃত্যুর সাধনা করি।

এই সময়ে দাস দুটি বিরক্ত হয়ে তাড়া দিয়ে উঠল—চলুন, চলুন, এখনও বলে কত কাজ। সে সব ফেলে ভিক্ষুকদের চান করাও, বস্তর পরাও, হুঃ। প্রভুর যেমন সাধ!

যশ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল— অ হে দাস, আমাদের ভিক্ষুক বলবে না। তীর্থিক বলে যদি পরিচয় দিতাম, অবজ্ঞা করতে পারতে ? তীর্থিক পথ ত্যাগ করেছি এ কথা অকপটভাবে বলেছি বলেই না তোমার প্রভু জানতে পেরেছেন। দুজন একদা তীর্থিককে অন্ন-বস্ত্র দান করার পুণ্য অর্জন করছেন তোমার প্রভু। অধিক বাক্যব্যয় করো না। ডুণ্ডুভ নির্বিষ হলেও সর্প বটে, কামড়াতে পারে।

দাস দুটি পরস্পরের দিকে সন্ত্রস্ত হয়ে তাকাল। তারপর নীরবে দুই প্রাক-তীর্থিককে স্নান করিয়ে, নূতন শুক্ল বসন ও উত্তরীয় পরিয়ে, গন্ধ মাল্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত করে দিল।

—অহো যশ তোমাকে তো দেখছি সেট্‌ঠি পুত্তর মতো দেখাচ্ছে, যদিও বড় কৃশ— নন্দিয় চমৎকৃত হয়ে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যশ বলল— ও কৃশতাটুকু পক্ষী মাংস খেতে খেতেই চলে যাবে। নন্দিয় তোমাকে দেখাচ্ছে একটি সদ্য-স্নাতক ব্রাহ্মণকুমারের মতো।

তাদের এই মত-বিনিময়ে দাস দুটি দাঁত বার করে হাসতে লাগল। তারা সে সব গ্রাহ্যও করল না। আদেশের ভঙ্গিতে আঙুল তুলে বলল— 'কই, তোমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে যাবে না ?'

দাস দুটি স্মিতমুখে বলল— আগে বিশ্রাম কক্ষে আপনাদের সুরা পরিবেশন করি। এ গৃহের অতিথি-আপ্যায়নের নিয়ম-নীতি পুরো পালতে হবে তো !

নন্দিয় বলল— দাঁড়াও দাঁড়াও, সুরা আমরা পান করি না। কি বলো যশ ?

যশ গম্ভীরভাবে বলল— সুরা পান করিয়ে আমাদের মত্ত করবার চেষ্টা করছ না কি ? সে সব হবে না। অন্য কোনও পানীয়, যেমন দুগ্ধ দিতে পারো। আর দেখো হে, অধিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের চেষ্টা করো না, আপাতত আমরা নিঃস্ব হতে পারি, কিন্তু কারও দাস আমরা এখনও নই।

দাস দুটি ভ্রূকুটি করে বলাবলি করল— কী প্রকার কটুভাষী দেখেছিস ? তীর্থিকরা আকারেও রুক্ষ; প্রকারেও রুক্ষ।

ভোজনাগারে বসে গহপতি সীহ জিজ্ঞাসা করলেন— তীর্থিক মত সহসা পরিত্যাগ করলেন কেন ? কী যেন একটা কারণ বলছিলেন…'

যশ তখন একটি চমৎকার হাঁসের বুকের মাংস চুষছিল। সেটি নামিয়ে রেখে বলল— তার আগে আপনি বলুন, আপনি কে ?

—কেন, গৃহে কারও কাছ থেকে শোনেননি আমার পরিচয় ?

—না, জিজ্ঞাসা করিনি। আপনার দাসরা বড় দুর্বিনীত। দাসেরা ওরূপ হয়ে থাকে শাসনের অভাবে। শাসনের অভাব তখনই হয় যখন গৃহের স্বামী-স্বামিনী অতিশয় কর্মব্যস্ত হন বা অতিশয় বিলাসপ্রিয় হন। আপনি এই দুটির একটি অথবা দুটিই, এমন অনুমান করতে পারি।

সীহর মুখ সামান্য রক্তবর্ণ হল, তার পরেই তিনি কৌতুকের স্বরে বললেন— বিলাসপ্রিয় ব্যক্তি ধনসম্পদ ব্যয় করতে পরাঙ্মুখ হয় না। আর হয় না বলেই বহু ভিক্ষাজীবী ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে। সহসা কোনও প্রাক তীর্থিকের হংসমাংস খেতে ইচ্ছে হলে সে যে অবিলম্বে তার বাসনা পূরণ করতে পারে, সে তো সীহর এই প্রকৃতির জন্যই !

যশ নির্বিকার মুখে বলল— দেখুন গহপতি, তীর্থিক-পন্থ ত্যাগ করেছি বটে কিন্তু পঞ্চদশ বছর মস্তিষ্ক চালনার যে অভ্যাসটি করেছি তা তো ত্যাগ করার কোনও কারণ দেখি না। সত্য নিরপেক্ষ। কারও নিন্দা বা শংসা করা সত্যাসত্য বিচারকের কাজ নয়। আপনি যে বিরক্ত হলেন তাতে বুঝতে পারছি আপনার বহু চাটুকার আছে, কিন্তু আত্মসংবরণ করে নিলেন দ্রুত। তাতে মনে হচ্ছে আপনি উচ্চপদে রয়েছেন। প্রকৃত শিক্ষিত। স্বভাবজ দুর্বলতাগুলির ঊর্ধ্বে ওঠবার বাসনা ও মনোবল দুটিই আপনার আছে, আপনি শ্রীমান রয়েইছেন। ভবিষ্যতে আপনার বিপুল শ্রীবৃদ্ধি হবে।

যশ হংসমাংসে মন দিল।

নন্দিয় বলল— কিছু যদি মনে না করেন গহপতি আমি সতীর্থ যশের বিচারের ওপর আমার নিজের বিচারের কথা একটু বলতে চাই।

সীহ কৌতুকস্মিত মুখে বললেন— সুস্বাগত। বলুন আয়ুষ্মান।

নন্দিয় বলল— যেভাবে আপনি ভিক্ষাজীবীদের ক্ষুন্নিবৃত্তির কথা বললেন, আমার সতীর্থর হংসমাংসলোলুপতার প্রতি কটাক্ষ করলেন, তাতে এ-ও মনে হচ্ছে আপনি স্বভাবে দাম্ভিক। দান করতে এবং দানের প্রকৃত ফল পেতে হলে যে বিনয়ের, দীনতার প্রয়োজন তা আপনার নেই গহপতি। আপনার এই আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন এ শুধু লোক-দেখানোর জন্যে। এই সব হংসমাংস কুক্কুটমাংস, ময়ূরমাংস এ সকলই সমৃদ্ধির বিজ্ঞাপন। আপনি যদি রাজা হতেন এরূপ বাহুল্য মানিয়ে যেত, তা না হলে এই বিজ্ঞাপন লোকসাধারণের চোখে পড়বে, বহু লোকে আপনাকে ঈর্ষা করবে, অনর্থক শত্রু সৃষ্টি হবে তাতে।

সীহর মুখে নানা প্রকার ভাব খেলা করছিল। কখনও ক্রোধ, কখনও বিস্ময়, কখনও কৌতুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন্দিয়র কথা শেষ হলে তিনি বললেন— আমি রাজা নই। কিন্তু সেনাপতি। বেসালির সেনাপতি সীহর নাম রাজগহ সাবত্থির লোকেরাও জানে। সে যাই হোক, আপনারা অল্পবয়স্ক হলেও বুদ্ধিচর্চা, বহু ভ্রমণ ও সৎ-সংসর্গের ফলে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন। যেভাবে সীহর চরিত্র-বিশ্লেষণ করলেন তাতে সীহ ক্ষুব্ধ হলেও উপকৃত হয়েছে। কিন্তু এই প্রকার সত্য-কথন যদি করতে থাকেন, তা হলে বেসালির লোকে আপনাদের লগুড় হাতে তাড়া করবে। বিশেষত এখন আপনারা সাধারণ কর্মহীন যুবা ব্যতীত কিছুই নন তো! বেসালিবাসীদের মর্যাদাজ্ঞান প্রখর··· ভালো কথা, তীর্থিক পথ ত্যাগ করলেন কেন, বললেন না তো!

—ও আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার সেনাপতি সীহ। আপনার এত আগ্রহের কারণ দেখছি না।

সীহ প্রাচীরগাত্রের দিকে চেয়ে বললেন— প্রকৃতপক্ষে কেন কেউ কোনও পথ ত্যাগ করে অন্য পথ নেয় জানতে আমার বড় আগ্রহ হয়। কেন, কেন নেয় বলুন তো?

নন্দিয় বলল— আপনি সমন গোতমের নাম শুনেছেন?

চমকে উঠলেন সীহ। বললেন— শুনেছি।

—তাঁরই চক্রান্তে আমাদের তীর্থঙ্কর পূরণ কাস্‌সপ আত্মঘাতী হয়েছেন। তাই···

সীহ বললেন— বাঃ এ তো নূতন আরোপ দেখছি। বহু জনে বহু প্রকার দোষ আরোপ করছে তাঁর ওপর। কিন্তু তাঁকে দেখে থাকলে সেসকল বিশ্বাস করা সম্ভব হয় না। আপনারা কি তাঁকে দেখেছেন?

— না। তিনি নাকি সাবত্থিতে রয়েছেন। তীর্থিকরা সব তাঁর সঙ্ঘে প্রবেশ করছেন এমন শুনেছি। আমরা সাবত্থিতে যাচ্ছিলাম। এ সকল ঘটনা শুনে ফিরে, যাচ্ছিলাম। তীর্থিকদের আচরণও আমাদের ভালো লাগে না।

সীহ এখন আর ভোজন করছিলেন না। তাঁর দক্ষিণ হাত পাত্রের ওপর থেমে ছিল। তিনি যেন চিন্তামগ্ন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন— সাবত্থি থেকে ঘুরেই আসুন না। একবার তাঁকে দেখে আসা ভালো। হয়ত তাঁর পথ আপনারা নিতেও পারেন।

যশ বলে উঠল—কার পথ আমরা নেবো তা তো ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছি।

—সত্য না কি? কি স্থির করলেন?

—বেসালির সেনাপতি সীহর পথ।

—সীহর পথ?··· সীহ অবাক হয়ে বললেন।

নন্দিয় চতুর হাসি হেসে বলল— কোনও তীর্থঙ্করের কথাতেই আর আমরা ভুলছি না। ধন উপার্জন করব, শুক্লবসন পরব। হংসমাংস খাবো।

সীহ হেসে বললেন— ভালো, ভালো। কিন্তু বেসালিতে উগ্‌গ, ভোগ, কৌরব, ঈক্ষ্বাক, বজ্জি, জ্ঞাতৃক, লিচ্ছবি এই সকল কুলে না জন্মালে তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না। বরং সাবত্থিতে যান। অত বড় দেশের রাজধানী। কত লোক, কত বৃত্তি··· আপনাদের কোনও না কোনও উপায় হয়ে যাবেই।

যশ একটু ভেবে নিয়ে বলল— পরামর্শটি তো ভালোই। তা হলে আজ রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে কাল প্রত্যূষেই সাবত্থি-যাত্রা করব। কি বলো নন্দিয়?

নন্দিয় মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে সীহ গাত্রোত্থান করলেন। বললেন— সীহকে ভুলবেন না যেন। সমন গোতম সম্পর্কে যদি কিছু জানতে পারেন, সীহকে জানাবেন। এই ধরুন, গোতম গোপনে নারীসঙ্গ করেন কি না, মুখে অহিংসার কথা বলে দিব্য মাংসাহার করেন কি না, জাদুবিদ্যা জানেন কি না··· সত্য সত্য তাঁর চরিত্র কেমন···

যশ বলল— তা না হয় জানলাম। আপনাকে জানাবো কী করে?

সীহ বললেন— আপনাদের যাত্রার পূর্বে দুই প্রস্থ বসন এবং দুই স্থবিকা কহাপন দেবো। যতদিন উপার্জনের ব্যবস্থা করতে না পারেন, চলে যাবে। সংবাদ সংগ্রহ হলে দুজনের একজন চলে আসবেন। সীহর দ্বার মুক্ত থাকবে।

নন্দিয় ঈষৎ কঠিন গলায় বলল— আমরা পূর্বে কখনও চরকর্ম করিনি। এই কাজ করতে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘৃণাবোধ হচ্ছে।

সীহ একটু ইতস্তত করে বললেন— আয়ুষ্মান, আমি রাজপুরুষ হলেও কোনও রাষ্ট্রীয় কাজে আপনাদের এই অনুসন্ধান করতে বলছি না। প্রকৃত কথা, গৌতম বুদ্ধ যাঁকে আপনারা সমন গোতম বলছেন তাঁকে দেখবার পর, তাঁর দেশনা শোনবার পর আমি তাঁর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হয়েছি। এদিকে আবার আমি নিগ্‌গণ্ঠ নাতপুত্তের উপাসক। ভগবান নাতপুত্ত মহাবীর, জিন, কিন্তু গৌতমের ওপর অতিশয় বিরূপ। তিনি বলেন— গৌতম জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে মানুষকে বশ করেন। তিনি নাকি উদ্দিস্‌সকত, অর্থাৎ কি না তাঁরই জন্য হত্যা করা পশুমাংস আহার করেন, অথচ প্রকাশ্যে বলে থাকেন জীবহিংসা করো না। এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি। আপনারা দীর্ঘদিন তীর্থিকদের মধ্যে থাকায় এই সব সমন সঙ্ঘের গোপন কথাগুলি সহজেই বুঝতে পারবেন। আপনাদের বুদ্ধিও অত্যন্ত স্বচ্ছ। আমি নিশ্চিত হতে চাই যে আমার চিত্ত অযোগ্য পাত্রের দিকে ধাবিত হয়নি।

সীহর কথাগুলির মধ্যে একটা ব্যাকুলতা লক্ষ করে যশ ও নন্দিয় দৃষ্টিবিনিময় করল।

অবশেষে যশ বলল— আমাদের এই কাজের জন্য কোনও মূল্য দেবেন না সেনাপতি সীহ। তা হলে আমাদের মনে গ্লানি থাকবে না।

সীহ বললেন— কিন্তু আপনারা উপার্জনের, সংসার-যাত্রার কিছুই জানেন না···

নন্দিয় হাত দিয়ে যেন তাঁর কথাগুলি উড়িয়ে দিল, বলল—জেনে নেবো। আপনি ভাববেন না সেনাপতি।

দুই যুবাকে পাথেয় বলে কিছু নিতে সম্মত করিয়ে, অতিথিগৃহে তাদের পাঠাবার পর সেনাপতি সীহ অন্তঃপুরে গেলেন না। নিজের অস্ত্রাগারে প্রবেশ করলেন। বড় প্রিয় স্থানটি তাঁর। নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে উন্মনা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সীহ একটি তীর তুলে নিলেন, সেটিতে আঙুল রেখে তার ধার পরীক্ষা করতে করতে আপন মনেই বললেন—

—কে উদ্দিস্‌সকত (উদ্দেশ্যকৃত) মাংস আহার করে, কে করে না তাতে সীহর কীই বা এসে গেল। প্রকৃত কথা কেউ প্রতারণা করছে কি না। যখন ভগবান জিনের মাংস খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল তিনি কেন উপাসক সীহকে বললেন—সীহ সীহ, মেণ্ঢিক গামের উপাসিকা রেবতীর কাছে যাও। সে আমার জন্য নাকি দুটি কপোত সিদ্ধ করে রেখেছে। তা নিও না, কাল তার গৃহে যে কুক্কুটটি বিলার মেরে ফেলেছে, সেই কুক্কুটের মাংস রেঁধে আমাকে দিতে বলো। — এইভাবে তিনি সীহকে কি বোঝাতে চাইলেন ? তিনি মাংস খেলেও উদ্দিস্‌সকও মাংস খান না—এই তো ?

আবার ভগবান জিন নিগ্‌গণ্ঠদের বলে থাকেন— বহু- অট্‌ঠিমাংস (বহু অস্থি মাংস), বহু কণ্টক মচ্ছ, বিল্ল, উচ্ছুখণ্ড (ইক্ষু খণ্ড), সিংবলি (শাল্মলী) ইত্যাদি ফল যাতে খজ্জের ভাগ অল্প, বর্জ্য পদার্থ অধিক সেরূপ ভিক্ষা বর্জন করবে। যাঁরা জিন হতে চান তাঁদের আবার গ্রহণ বর্জন কি ?

নিগ্‌গণ্ঠরা বলেন জীব ছয় শ্রেণীর— পৃথ্বীকায়, অপকায়, অগ্নিকায়, বায়ুকায়, বনস্পতিকায় ও এসকায়। কোনও কায়কেই হিংসা করবেন না বলে নিগ্‌গণ্ঠ সমন দীপ জ্বালান না, শীতল জল পান করেন না, মুখে বস্ত্রখণ্ড বেঁধে রাখেন। অথচ নিগ্‌গণ্ঠ উপাসক সকল প্রকার জীবকেই হত্যা করেন, কারণ ভূমি কস্‌সন করবার সময়ে সর্ব কায়ই ধ্বংস হয়ে থাকে। সেই উপাসকের পক্ক অন্ন কি নিগ্‌গণ্ঠ সমন নির্দ্বিধায় ভিক্ষা নেন না ? তবে ?

আমি বিভ্রান্ত। বড় বিভ্রান্ত। নিগ্‌গণ্ঠ উপদেশের মধ্যে আমি কোনও সমঞ্জসতা পাচ্ছি না। ভগবান তথাগত বুদ্ধকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করব কি করবো না তাতে মহাত্মা মহাবীরের কী ? তাঁর উপাসক হয়েছি বলে কি ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিবেকবুদ্ধি মহাত্মার কাছে গচ্ছিত রেখেছি না কি ? ভগবান তথাগত, ভগবান তথাগত, এই বুদ্ধি-চকচক বাক্য-বকবক সত্যসন্ধ শুক দুটিকে আকাশে উড়িয়ে দিলাম। শুকমুখে শুভ সংবাদ পাঠাবেন। সীহ বড় অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবস্তী একটি চঞ্চলা বালিকার মতো। কোনও উত্তেজনার ঘটনা ঘটলেই সে দু পাক নেচে নিয়ে দুই হাতে তালি দেয়। লাফ দিয়ে দিয়ে চলে যেন নৃত্যই করছে সব সময়। সমৃদ্ধি এখন এমন স্তরে পৌঁছেছে যে শ্রাবস্তীবাসীরা সদা-সর্বদাই যেন নিশ্চিন্ত। কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ এ সবই তাদের উত্তাল করে তোলে। জীবন ধারণের ভাবনা নেই। দেখো দেখো রাজপথে কী ভিড়? বহু জনসমাবেশ। সর্বশ্রেণীর। কী চায় ওরা? সার বেঁধে সব দাঁড়াচ্ছে যে! শুধু সামান্য জনই তো নয়! অভিজাতরাও জ্ঞাতিবর্গ নিয়ে সব স্বতন্ত্র চন্দ্রাতপের তলায় জড়ো হচ্ছেন। আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়।

—কী ব্যাপার? ব্যাপারখানা কী? —শ্রাবস্তীতে নব-আগন্তুক দুই বন্ধু যশ ও নন্দিয় কাউকেই জিজ্ঞাসা করে কোনও উত্তর পায় না। সব নিজেদের মধ্যে এমন কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলছে যার বিন্দু-বিসর্গ তারা জানে না।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে 'মিগারমাতা' আর 'মত্ত হত্থি' কথা দুটি উদ্ধার করতে পারল ওরা।

—মিগার কে? মিগারমাতা কে? একে-ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগল ওরা। শেষে একজন বিরক্ত হয়ে বলল— তোমরা কে হে বাপা, মিগারমাতা বিসাখাকে চেনো না! বিদেশি নাকি?

—হ্যাঁ ভাই। ঠিকই ধরেছ। তা এই উৎসবটা কিসের একটু বুঝিয়ে বলবে?

—ওরে বাপা, উৎসব এ নয়, উৎসব নয়! এ যে কী তা আমরা জানি নে। মিগার সেট্‌ঠির পুত্তবধূ বিসাখা, শ্বশুরের এত প্রিয় যে শ্বশুর তাকে মিগারমাতা বলেন, তা তার যত রূপ, ততই গুণ। সেই বিসাখা নাকি মত্ত হত্থি বশ করতে পারে। এই জনশ্রুতি কানে গেছে আমাদের খ্যাপা রাজার। অমনি নিদ্দেস হয়ে গেল বিসাখাকে প্রকাশ্য রাজপথে হত্থি বশ করে দেখাতে হবে।

—ওই শ্বেতছত্রের তলায়, ওখানে বুঝি রাজা?

—হ্যাঁ। এ আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি! —পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে নন্দিয় ও যশ উৎকোচগ্রাহী পসেনদি রাজাকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

—উনি কি সেট্‌ঠি কিংবা তাঁর সুহ্নার ওপর ক্রুদ্ধ? —নন্দিয় জিজ্ঞেস করল।

—ন্যা না। ক্রুদ্ধ হবেন কেন? মিগারমাতা বিশাখাকে উনি যথেষ্ট ভালোবাসেন।

—তা হলে? উনি যদি হাতি বশ করতে না পারেন? মত্ত পশু তো ওঁকে পিষে ফেলবে!

বলতে বলতেই রাজপথের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে তুমুল জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। একটি স্বর্ণদণ্ডী শিবিকা থেকে একটি আশ্চর্য যুবতীকে নেমে আসতে দেখল দুই বন্ধু। তার পরনে পুরুষদের মতো কচ্ছ দিয়ে পরা কাঞ্চন বর্ণের বসন, স্নিগ্ধ হরিৎ উত্তরীয়, গাঢ় নীল স্তনপট্ট শক্ত করে বাঁধা। কপালে চন্দনের পত্রলেখা। মাথার কেশগুলি সব চূড়া করা। কানে মুক্তার কর্ণভূষা, কণ্ঠে কুসুমমালা'। যশ বলল—নন্দিয় ইনি কে ভাই! আমার যে এঁর পদচুম্বন করতে ইচ্ছা হচ্ছে···

নন্দিয় বলল—পেছনে দেখো, পেছনে দেখো।

যুবতীর পেছনে নামলেন আরো একজন রমণী। ঘৃত বর্ণের শাটকে ও কুঙ্কুমলেখায় তাঁকে দেখাচ্ছে যেন সাক্ষাৎ গঙ্গা নদী। গঙ্গা আর হিরণ্যবাহর প্রয়াগ বুঝি তবে এখানেই।

'জয় মিগারমাতা বিসাখার জয়, জয় মিগারমাতা বিসাখার জয়' —রব উঠল। যশ পাশের লোকটিকে বলল—কোনটি দেবী বিশাখা? ঘৃতবসনাটি? না কাঞ্চনবসনাটি?

লোকটি বলল— কোনটি আবার? কাঞ্চন হরিদ্বসনা সদ্যযুবতী রূপসী বিসাখাকে দেখতে পাচ্ছো না? পেছনে উটি বোধ হয় বিসাখাজননী দেবী সুমনা। সাকেত থেকে এসেছেন শুনছি। আহা এমন জননী না হলে কি আর অমন কন্যা হয়?

দেবী সুমনা পথের পাশে চন্দ্রাতপ দেওয়া একটি স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুজন প্রৌঢ় আসছেন দেখা গেল। তাঁরা গিয়ে দাঁড়ালেন দেবী সুমনার দু পাশে।

—ওই তো মিগার সেট্‌ঠি— লোকটি বলে উঠল— ওহে বিদেশি দেখো দেখো ওই পক্ককেশটি মিগার। চুলগুলি হতভাগ্যের সবই পেকে গেল। হবে না? কৃপণের কত কহাপণ যে সুহ্নার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যয় হয়ে যাচ্ছে ! দাহিন পাশে দেখো উনিই নিশ্চয় ধনঞ্জয় । একটু স্থূল বটে । কিন্তু স্থূলোদর নয় । দেখ দেখ...

লোকগুলির কথা শেষ হল না । প্রসেনজিতের ইঙ্গিতে গজচালক কালো মেঘের মতো একটি হাতিকে ছেড়ে দিল । হাতি ধেয়ে আসছে । সে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না । রক্তবর্ণ চোখের পাশ দিয়ে মদবারি ঝরছে । দর্শকরা ভয়ে সরে দাঁড়াতে লাগল । হঠাৎ শুঁড় তুলে কান-ফাটানো বৃংহণ করল হাতিটি । যশ ও নন্দিয় দেখল বিসাখা মিগারমাতা নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটি বীর বালকের মতো, এবং অতিশয় মধুর অদ্ভুত একটি শিস্-ধ্বনি ভেসে আসছে কোথা থেকে । হাতিটি আরও বেগে ধেয়ে আসছে । বিশাখা কী যেন ইঙ্গিত করছে । ও মা, হাতিটি তো থেমে গেল ! কী করবে ভেবে পাচ্ছে না ! বিশাখা তার শুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে যেন কালো মেঘের বুকে বিদ্যুল্লতা, কিংবা হাতিটির মুখের কাছে একটি শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াতরু । বিশাখার দক্ষিণ হাত উঠছে এবার । সে হাতিটির শুঁড় স্পর্শ করল, অমনি কী আশ্চর্য ! হাতি নতজানু হয়ে বসে পড়ল । তখন বিশাখার আঙুল হাতির শুঁড়ের ওপর, কপালের ওপর যেন পত্রলেখা আঁকছে, অত বড় হাতিটা শিশুর মতো আদর খাচ্ছে ।

—জাদুবিদ্যা বটে ! অদিট্‌ঠপুরব— মন্তব্য করল একটি লোক ।

ভেরী বাজছে । অর্থাৎ সমবেত জনতা তোমরা চলে যাও এবার । জনতা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে । যে যার নিজের গৃহে, নিজের কাজে যাবে এবার । যশ ও নন্দিয়ও যাচ্ছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ।

—বিশাখা তো কড়ে আঙুল দিয়েই হত্থিটাকে শুইয়ে দিলে !

—একটি কড়ে আঙুলে যদি অত শক্তি ধরে, তা হলে পুরো শরীরটাতে কত বুঝে দেখ ।

—একটি যুবতী বধূরও যে ইদ্ধি আছে, তীর্থঙ্কর পূরণ কাস্সপ সেটুকুও দেখাতে পারলেন না ! ধিক !

দুই বন্ধু উৎকর্ণ হয়ে শুনছে ।

—কী অভিপ্রায়ে জেতবনের সন্নিকটে মঠ তুলছিলেন বল তো ।

—কী আবার ? গোল করবে ! তথাগত হট্টরোল সইতে পারেন না বলেই তো সেট্‌ঠি সুদত্ত নগরো পান্তে জেতবন কিনলেন ।

—তা ছাড়া তথাগত নিসর্গসৌন্দর্য ভালোবাসেন । উরুবেলা গামের যে জায়গাটিতে উনি বোধিলাভ করেছিলেন সেটি তো স্বর্গোদ্যানের মতো ! নিরঞ্জনা নদী বইছে । পদ্মসরোবরে শতাধিক পদ্ম ফুটে আছে, এককেটি এক এক বন্নের, চম্পনগন্ধে চান্দিক মো মো । অপ্সরারা ঘুরে বেড়াচ্ছে । মাঝে মধ্যেই নেচে নিচ্ছে । ব্রহ্মা স্বয়ং আকাশ থেকে নৃত্য দেখছেন । ওপর দিকে সাহস করে তাকালেই ব্রহ্মার চোখ দুটি দেখা যায় । অশথ্ গাছের তলায় গৌতম বোধি পেলেন । অমনি সুজাতা নামে এক অপ্সরা তাঁকে পায়স দিয়ে গেল । খেয়ে গায়ে বল পেলেন গৌতম । তাপরে ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে আবার ধ্যানস্থ হলেন । পাখির কাকলি, গাভীদের মা-মা রব, হরিণগুলি শিং দিয়ে তথাগতের পিঠ চুলকে দিচ্ছে, বাঘগুলি পাহারা দিচ্ছে পাছে মার তার দলবল নিয়ে ঢুকে পড়ে...

নন্দিয় বলল— আপনি কি উরুবেলায় গিয়েছিলেন ?

লোকটি একবার ভালো করে তাকে দেখে নিল । কিন্তু গ্রাহ্য করল না, বলে যেতে লাগল—ঝড় এলো, সঙ্গে দারুণ বৃষ্টি, অমনি সরোবর ফুঁড়ে উঠল এক ফণা তোলা মহাসপ্প । সড়সড় করে এসে তথাগতের মাথায় ফণা ধরে দাঁড়ালো । বজ্রের হুংকার, গাছ উপড়ে পড়ছে, পশুপাখি ছুটে পালাচ্ছে— তথাগতর চেতনা নেই । বুঝলেন ?

নন্দিয় স্মিতমুখে বলল—বুঝলাম ।

—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, না ?

—না না, অবিশ্বাস করব কেন ? তবে অপ্সরার নৃত্য, ব্রহ্মার চোখ, মহাসপ্পর ফণা ধরে বৃষ্টি আটকানো, এক সরোবরে বহু বর্ণর পদ্ম সব মিলিয়ে এমনটি আমরা ভাবিনি ।

—আমার কথায় বিশ্বাস না হয় চলুন দীঘিতির কাছে । দীঘিতিকে জানেন তো ? সেট্‌ঠি সুদত্তর লেখক । সে কখনও মিছা বলে না ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন্দিয় যশের দিকে চেয়ে বলল—কী ভাই যশ, নৈরঞ্জনা নদীতীরের যে স্থানটির কথা এঁরা বলছেন, মনে পড়ছে ? সরোবরে পদ্ম কী বর্ণের দেখেছিলে ?

যশ হেসে বলল—শ্বেতপদ্মই তো, গোড়ার দিকটা রক্তাভ !

—ও আপনারা ওখানে গেছেন ? —লোকটি দমে গিয়ে বলল।

যশ নন্দিয়র দিকে তাকিয়ে কী বলছিল, ফিরে আর লোকটিকে দেখতে পেল না। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে।

যশ হেসে বলল—বড় নগরের এই-ই চরিত্র, নন্দিয়। সদাই যেন উৎসব হচ্ছে এমন গোল, বহু জন-সমাবেশ, তিলপ্রমাণ সচ্চকে কল্পনার সাহায্যে তাল করে পরিবেশন করা··· এ তো সামান্য—আরও কত প্রতারক-প্রবঞ্চক চারদিকে ঘুরছে··· সুন্দরী রমণীদের এখানে প্রকাশ্য রাজপথে রথচালনা করতে দেখবে, রাজা রাজপুরুষরা পথে নেমে সভা করেন। কত প্রকারের শব্দ দেখো ! রথের ঘর্ঘর, অশ্বের খট্ট খট্ট, গো-যানের গাভীগুলির গলায় ঘণ্টার টুঙ্ক টঙ্ক টুঙ্ক টঙ্ক, ওদিকে ভেরী বাজছে ভোঁ ভোঁ, পটহ বাজছে দমদম। এই যে রমণীটি অদ্ভুত কাণ্ড করল এরূপ অদ্ভুত চমৎকার, এ-ও তুমি বৃহৎ নগরেই দেখতে পাবে। বারাণসীতে আমি অহিতুণ্ডিকা দেখেছি। কেমন স্বচ্ছন্দে সর্প নিয়ে খেলা করে, ঈক্ষনিকা দেখেছি —তোমায় ভালো করে দেখে তোমার ভাগ্য বলে দেবে···। তবে বারাণসীর তুলনায় সাবত্থি সুন্দরতর, যেন আরও ঐশ্বর্যশালী, আড়ম্বর ও মহোল্লাসে পূর্ণ। চলো নন্দিয় এই জনতার সঙ্গে ভেসে যাই। যেখানে ঠেকব সেখানে উঠব।

ওদিকে পাঞ্চাল তিষ্য একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। বন্ধুল চমকে ফিরে তাকিয়ে বললেন— কী ব্যাপার তিষ্য ? তুমি কি এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে ছিলে ? তিষ্য গম্ভীর মুখে নীরব রইল।

মহারাজ প্রসেনজিৎ আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বললেন—আমিও তো নিশ্বাস বন্ধ করেই ছিলাম বন্ধুল। তুমি বুঝি ভীত হওনি ! যদি বিশাখা অকৃতকার্য হত !

বন্ধুল বললেন— সে ক্ষেত্রে তিষ্যকুমার ছিল, দীঘকারায়ণ ছিল, আমি ছিলাম— তিনি হাতের বর্শাটি আস্ফালন করলেন।

—তুমি কি এই বর্শা ছুঁড়তে নাকি ?

—অব্যর্থ লক্ষ্যে মহারাজ। —বুক ভরে শ্বাস নিয়ে বন্ধুল বললেন।

—অর্থাৎ তুমি আমার মঙ্গলহস্তীটিকে মারবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলে ? কী স্পর্ধা ?

—তা মহারাজ আপনি যদি জেদের বশে একটি নাগরিকার প্রাণ নিয়ে খেলা করতে যান, প্রিয় হস্তীটির প্রাণও আপনাকে বন্ধক রাখতে হয় অগত্যা।

প্রসেনজিৎ অকস্মাৎ নিবে গেলেন। বললেন— অন্যায় করেছি, না ?

—এ সব ভাবার আর সময় নেই মহারাজ, ওই বিশাখা সপরিজন আসছে। পুরস্কৃত করুন তাকে।

হাতিটির পাশে দুজন গজচালক এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশাখা ফিরে গিয়েছিল চন্দ্রাতপের তলায় যেখানে তার জনক, জননী, শ্বশুর, সখীরা সকলে সমবেত হয়েছে।

সে সুমনার বুকে মাথা রেখে মৃদুস্বরে বলল— মা তুমি শিস দিলে কেন ? আমার শিক্ষার ওপর নির্ভর করতে পারনি ?

তার মাথায় হাত বুলিয়ে, মুখে চুমো খেয়ে সুমনা বললেন— তোমার শিসের সঙ্গে আমার শিস-ধ্বনি মিশে গিয়েছিল মা, কেউ বুঝতে পারেনি।

—সে তো আরও অন্যায় মা। প্রতারণা করা হল না ?

সুমনা দৃঢ় স্বরে বললেন— না। ধরো তোমার যশের ভাগ নিতে আমারও ইচ্ছা হয়েছিল।

ধনঞ্জয়ের কপালে ভ্রূকুটি, বললেন— মহারাজের দূত এসেছে, চলো।

সুমনা বললেন—চলো ! তাঁরও মুখভাব ইতিমধ্যেই কঠিন হয়ে গেছে। মাঝখানে বিশাখাকে নিয়ে প্রথম পঙক্তিতে ধনঞ্জয়, সুমনা ও মিগার, দ্বিতীয় পঙক্তিতে বিশাখার ঘনিষ্ঠ সখীরা এবং তৃতীয় সারিতে তার অনুগত দাস-দাসীরা চলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসেনজিৎকে নমস্কার করে দাঁড়াতেই তিনি কণ্ঠ থেকে মণিহার খুলে বিশাখার কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। হেসে বললেন—সাধু বিশাখা সাধু।

সুমনা ও ধনঞ্জয় নত হয়ে মহারাজকে অভিবাদন করলেন। ধনঞ্জয় বললেন —আমার কন্যাটিকে সাবত্থির রাজপথে জাদুর খেলা দেখাতে হবে এ কথা তো আমাকে পূর্বে বলেননি মহারাজ! তা হলে আমি সাবত্থিতে তার বিবাহ দেওয়া ছেড়ে সাকেতেই আসব কি না ভেবে দেখতাম!

হাসতে হাসতেই বলছেন ধনঞ্জয়, কিন্তু তাঁর ক্রোধ অপ্রকাশ নেই। প্রসেনজিৎ অপ্রতিভতা ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে বললেন— আপনি কী করে ভাবলেন বিশাখার প্রাণসংশয় হতে পারে— এই দেখুন না বন্ধুল, আমার প্রধান সেনাপতি, রাজগৃহের রাজপ্রতিনিধি মহামান্য পাঞ্চাল তিষ্য সবাই প্রস্তুত ছিলেন বর্শা, ভল্ল ইত্যাদি নিয়ে।

বন্ধুল বিশাল শরীর মেলে দাঁড়ালেন।

—বন্ধুলের লক্ষ্য অব্যর্থ, তা জানেন? —প্রসেনজিৎ লঘুস্বরে বললেন

—কই পাঞ্চাল তিষ্য কই? তিনিও তো সাকেতক!

সুমনা সাগ্রহে বললেন— তিষ্য কুমার? রাজা উগ্‌গসেনের পুত্র নাকি? কই?

তিষ্যকুমার কখন চলে গেছেন কেউ জানে না।

—মা বিশাখা! আজ পট্ট মহাদেবী মল্লিকার গৃহে তোমাদের সবার নিমন্ত্রণ, প্রসেনজিৎ বললেন।

—বিশাখা যদি হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে যেত কে এই নিমন্ত্রণ পেত মহারাজ? ধনঞ্জয়ের ক্ষোভ কিছুতেই যেতে চাইছে না।

বন্ধুল বললেন— মহাসেট্‌ঠি, বিশাখার বিপদের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। আপনি শান্ত হোন।

মিগার রাজপুরুষদের এড়িয়ে চলেন। আজ কিন্তু থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন— আপনারা তো নিশ্চল ছিলেন। হত্থিটি যখন ধেয়ে আসছিল তখনই তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো! উদ্যোগ নিতে তো কাউকে দেখিনি!

বন্ধুল হেসে বললেন— বাতাসে একটি মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছিল শুনেছিলেন সেট্‌ঠিবর! সেটি শোনবার পর বুঝলাম আমাদের উদ্যোগের আর প্রয়োজন হবে না। বিশাখা সত্যই ইন্দ্রজাল জানে। বিশাখা যদি সম্মত থাকে, তা হেল আমি তাকে নেত্রী করে একটি নারীসেনা গড়তে পারি।

মিগার অপ্রসন্ন স্বরে বললেন— না, না। আমার সুহ্নার কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। সে যুদ্ধবিগ্রহ করবে না।

এই ঘটনার পর অনেকেরই বিশ্বাস হল বিশাখার বিশেষ ঋদ্ধি আছে। অনেকে আবার বলল— বিশাখা বুদ্ধ ধম্ম ও সংঘর উপাসিকা। স্বয়ং তথাগত তাকে সবসময়ে রক্ষা করে চলেছেন। শুধু সেদিন পট্টমহাদেবী মল্লিকার গৃহে ভোজনশালায় বন্ধুল-পত্নী মল্লিকা সুমনাকে বললেন—দেবি, আমার স্বামী বলছিলেন আপনি এবং কন্যা বিশাখা উভয়েই কোনও গুপ্ত হস্তিবিদ্যা জানেন। পূর্বজদের অনেক গোপন বিদ্যাই আজকাল চর্চার অভাবে লুপ্ত হতে বসেছে তো!

সুমনা হেসে বললেন— আপনার স্বামী ঠিকই বলেছেন আয়ুষ্মতি। এই বিদ্যা আটবিকদের। আমি অল্প বয়সে আমার আচার্যা কুশাবতী মল্লর কাছ থেকে শিখেছিলাম। তাঁর কথা হয়ত আপনি স্বামীর কাছ থেকে শুনে থাকবেন। তিনি শিখেছিলেন তাঁর বন্য আচার্যর কাছ থেকে। এই জম্বুদ্বীপের মহাবনে একসময়ে আটবিকরা হস্তীর পিঠে দুর্দম, দুর্নিবার ছিল। বিশাখার পিতা উদ্বিগ্ন হলেও আমি তাই নিশ্চিন্তই ছিলাম। তবে এ কথা মানতেই হবে মহারাজের এরূপ ইচ্ছা হওয়াটা বিপজ্জনক।

বন্ধুল-পত্নী শান্ত গর্বের সঙ্গে বললেন— আমার স্বামী যতদিন আছেন, ভয়ের কারণ নেই। তবে সত্যিই, মহারাজের স্বভাবের শংসা করা যায় না।

প্রকৃত কথা, মহারাজ পসেনদি অতিশয় কৌতূহলী স্বভাবের মানুষ। শ্রমণ গৌতম যখন প্রথম শ্রাবস্তীতে আসেন, শ্রেষ্ঠীদের কাছ থেকে তাঁর বৃত্তান্ত শুনে মহারাজ পসেনদিও ছুটে গিয়েছিলেন। জেতবনের সভায় প্রবেশ করেই তাঁর প্রথম কাজ হল হন্তদন্ত হয়ে শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন করা—ভন্তে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি নাকি বুদ্ধ !

গৌতম নীরবে ছিলেন।

—আপনার বোধিজ্ঞান লাভ হয়ে গেছে ?

—বোধিজ্ঞান যাঁর আয়ত্ত হয়েছে তাঁকেই তো বুদ্ধ বলে মহারাজ !

—আপনার শরীর থেকে অবশ্য প্রভা বেরোচ্ছে। কিন্তু তা আপনার তপ্তকাঞ্চন দেহবর্ণের জন্যও মনে হতে পারে। আপনার আকৃতিও সম্ভ্রম উৎপাদক। কিন্তু সাক্যরা স্বভাবতই হেমবর্ণ ও সুগঠন। আপনি সম্ভ্রান্ত সাক্যবংশীয়, রূপগরিমা থাকা কিছু অসম্ভব নয়।

গৌতম কিছুই বললেন না। প্রসেনজিৎ তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

—আচ্ছা ভন্তে, বড় বড় ব্রাহ্মণরা তো আপনাকে ব্যঙ্গ করেন। সমন গোতম বলেন মাত্র, বুদ্ধ বলেন না।

—গোতম মগ্‌গ স্বীকৃত হলে যাগযজ্ঞ হবে না, তাঁদের জীবিকার ক্ষতি হবে মহারাজ !

—তবে তীর্থিকরা ! তাঁরা তো যাগযজ্ঞ মানেন না। কিন্তু তীর্থিক-নির্গ্রন্থরাও তো আপনাকে মানতে চাইছেন না।

—বুদ্ধ মগ্‌গ স্বীকৃত হলে, তাঁদেরও ভিক্ষাহানি, শিষ্যহানি, প্রভুত্বহানি হবে মহারাজ।

এতেও নিরস্ত হননি প্রসেনজিৎ। বলেন—কিন্তু আপনি তো তেমন বয়স্থ নন ? কত পক্ককেশ, জ্ঞানবৃদ্ধ তীর্থঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছি বোধিলাভ হয়েছে কি না, কাউকে তো বলতে শুনিনি—হ্যাঁ। অথচ আপনি অবলীলায় বলে দিলেন হয়েছে ?

—মহারাজ, বিষধর সপ্প খুদ্দ হলেই কি তাকে হেলা করেন ?

—না ভন্তে।

—কিংবা অগ্‌গি !

—না না, ক্ষুদ্রকায় অগ্নি যে কখন মহাকায় হয়ে সব গ্রাস করবে কিছু বলা যায় না।

—আর রাজপুত্ত ? শিশু হলেই কি তাকে সাধারণ শিশুর মতো দেখা সঙ্গত !

—কখনই না ভন্তে। রাজশিশুকে রাজমর্যাদাই দিতে হয়। নইলে ভবিষ্যতে বিপদ।

—বুদ্ধও সেইরূপ মহারাজ। বয়স দিয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

কোনও জনশ্রুতি প্রসেনজিতের কানে গেলেই হল। তিনি অমনি তার পরীক্ষা করে দেখতে ছুটবেন। অলৌকিক, ইন্দ্রজাল এসব বলে কেউ তাঁর কাছ থেকে পার পাবে না।

একদিন নিয়মিত দেশনার পর তথাগত তাঁর গন্ধকুটিতে বিশ্রাম করছেন। প্রসেনজিৎ উপস্থিত হলেন। রক্ষী অনুচর এদের তিনি এমনিই গ্রাহ্য করেন না। এখন তথাগতর কাছে আসছেন, আরোই একা। তিনি এসেছেন সংবাদ পেয়ে গৌতমকে দ্বার মুক্ত করতে হল। গন্ধকুটিটি উৎকৃষ্ট চন্দনকাঠে নির্মিত। মৃদু চন্দনের সুরভিতে মন-প্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে যায় একটু বসলে। ভগবান তথাগত সুগন্ধ ভালোবাসেন বলে শ্রেষ্ঠী সুদত্ত এভাবেই তাঁর বিশ্রামকুটি প্রস্তুত করেছেন।

মুখোমুখি বসে আছেন দুজনে। এই কক্ষের মধ্যে, আসন্ন রাত্রির স্তব্ধতায়, প্রদীপের মৃদু আলোয় সহসা মুখে কথা আসে না। কিন্তু প্রসেনজিৎ কয়েক মুহূর্ত পরেই কথা বললেন—ভন্তে আপনি যদি বুদ্ধ হন তা হলে আপনি নিশ্চয়ই ইদ্ধিমান !

গৌতম স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

—ভন্তে, কিছুক্ষণ পর প্রসেনজিৎ আবার বললেন— জনশ্রুতি শুনেছি বুদ্ধরা ইচ্ছা করলেই নানাপ্রকার অদ্ভুত প্রদর্শন করতে পারেন।

বুদ্ধ ধীর কণ্ঠে বললেন—অদ্ভুত প্রদর্শন করা জাদুকরের কাজ মহারাজ।

—বুদ্ধরা তো জাদুর রাজা হয়ে থাকেন।

গৌতম বললেন— আপনি অতীতে কজন বুদ্ধ দেখেছেন, মহারাজ ?

—একজনও না ভন্তে !

—বর্তমানে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'একজন দেখেছি'— এ কথা বলবেন কিনা ইতস্তত করছেন প্রসেনজিৎ, সহসা সামনে তাকিয়ে দেখলেন বেদী শূন্য। গৌতম নেই। প্রদীপের শিখাটি নিষ্কম্প জ্বলছে।

—এ কী ! ধ্যানাসনে বসে ছিলেন ভগবান, কোথায় গেলেন ? প্রসেনজিৎ ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন মূল বেদীর বাঁ পাশে শূন্যে বসে আছেন বুদ্ধ, তেমনি জোড়াসন, তেমনি নিমীলনেত্র, স্তিমিতভঙ্গি। ওকি ! দক্ষিণ দিকেও তো বুদ্ধ ! প্রসেনজিৎ গন্ধকুটির যেদিকেই চান বুদ্ধ তথাগতকে দেখতে পান।

—ভগবন, আপনি কি সহস্রধা হয়েছেন ? ভগবন, ভগবন। আপনি কোথায় ? কোনটি সত্য সত্য আপনি ? —প্রসেনজিৎ যেন জ্বরের ঘোরে শিশুর মতো বলতে লাগলেন। বলতে বলতে এক সময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি।

এই অবস্থাতেই তাঁকে আবিষ্কার করলেন শ্রমণ আনন্দ। আনন্দর মৃদু পদশব্দে চকিত হয়ে তাকালেন প্রসেনজিৎ। বললেন—আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম শ্রমণ আনন্দ ! ভগবন, আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম ?

বুদ্ধ বেদীতে বসে আছেন। উত্তর দিলেন না।

—কী স্বপ্ন দেখেছেন মহারাজ !—আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন।

—ভগবান তথাগত বুদ্ধকে···

—স্বপ্ন দেখবেন কেন ? তথাগত তো আপনার সামনেই উপবিষ্ট ?

প্রসেনজিৎ বললেন— না। দেখলাম চতুর্দিকে ভগবান। দাহিনে, বামে, এই গন্ধকুটির সমস্ত প্রাচীর-প্রকোষ্ঠে, ছাদে, শূন্যে সর্বত্র রাশি রাশি ভগবান। বুঝেছি, বুঝেছি···পসেনদির জন্য ভগবান সহস্র হলেন···বলতে বলতে রাজা উঠে দাঁড়ালেন। বিমূঢ় চিন্তামগ্ন অবস্থায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন। তথাগতকে অভিনন্দন জানাতে পর্যন্ত মনে রইল না।

আনন্দ বললেন—ভন্তে, আপনি কি সত্য সত্যই মহারাজ পসেনদিকে সহস্রবুদ্ধ দেখালেন ? সত্য ?

—কী সচ্চ আনন্দ ? একমাত্র সচ্চ দুক্খচ্চ। আপনার কর্মস্থানটি চিন্তা করো। প্রথমে পূর্বনিবাসজ্ঞান, —পূর্বজন্মের চিত্রসকল তখন দর্পণের ছায়ার মতো দেখতে পাবে। তারপর চ্যুতোৎপত্তি—জন্ম-মৃত্যুর সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। তারপর আশ্রবক্ষয়—সর্বপ্রকার তণ্হা থেকে মুক্তি পাবে। তখন, একমাত্র তখনই বোঝা সম্ভব সচ্চ কী।

আনন্দ প্রণত হয়ে বললেন—শুনেছি আপনি স্থবির নন্দকে অপ্সরী দেখিয়েছিলেন। অগ্রশ্রাবিকা ক্ষেমাকে অপ্সরীতুল্য রমণীর তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়তা, জরা, মৃত্যু, এ সকল দেখিয়েছিলেন। আজ কি পসেনদিকে সহস্রবুদ্ধ দেখালেন ? হে ভন্তে, আপনি আনন্দর সঙ্গে রহস্য করবেন না। একবার বলুন···

বুদ্ধ বললেন— আনন্দ ! অপ্সরীই কি তবে তোমার কর্মস্থান ? তুমি কি সুন্দরী রমণী দেখবার জন্যই তথাগতর কাছে ঘুরঘুর করছ ? তথাগতর শ্রাবিকা ও উপাসিকাদের মধ্যেও বহু সুন্দরী আছেন···

আনন্দ বললেন— আনন্দ এ তিরস্কারের যোগ্য নয় এ কথা তথাগত জানেন। আনন্দ ইদ্ধির কথা জানতে চায়। তথাগত মহারাজ পসেনদিকে ইদ্ধি দেখালেন সহস্রধা হয়ে, অথচ ভিক্ষুণী কিসা গোতমী যখন মৃত পুত্র কোলে নিয়ে তথাগতর কাছে পুত্রর প্রাণভিক্ষা করে কাঁদছিলেন তখন তিনি সেই জননীকে অশোক সর্ষপমুষ্টির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরালেন। —কেন ? আনন্দ বোঝে না। কোনটি পক্ষপাত তা-ও আনন্দ জানে না।

বুদ্ধ বললেন— আনন্দ আমি কি তোমাকে কপিলবস্তুতে বলেছিলাম— আনন্দ আনন্দ, আমি তোমাকে নানাপ্রকার ইদ্ধি দেখাবো, অন্যদের যা যা দেখিয়েছি এবং যা যা দেখাবো সে সকলও তোমাকে বলবো, এসো আমার হাত থেকে পিণ্ডপাত্র, চীবর নাও, বলেছিলাম এরূপ ?

ম্রিয়মাণ আনন্দ বললেন— না, তা অবশ্য বলেননি ভন্তে।

তখন বুদ্ধ স্নেহনিষিক্ত কণ্ঠে বললেন— সহস্র ইদ্ধি দেখলেও পসেনদি পমুখের বোধিচিত্ত জাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। হৃদয়ের ভেতরে যা অভিপ্রায় বাইরেও তাকেই প্রতিফলিত দেখে। অথচ আনন্দপমুখ ইদ্ধি নয়, ইষ্ট নয়, শুধুমাত্র ভিক্ষুবেশী তথাগতকে দর্শন করেই সোতাপন্ন হয়। ইদ্ধির দ্বারা কোনও ফল লাভ হয় না আনন্দ। করুণা ও মৈত্রীভাবনার দ্বারাই পৃথিবীর মনুষ্যবাহিত দুক্‌খগুলির নিরসন করা সম্ভব।

৩

যশ ও নন্দিয় ভাসতে ভাসতে যেখানে এসে ঠেকল সেটি অমাত্য শ্রীভদ্রর অতিথিশালা। কোশলরাজ্যের অমাত্যরা কাল, জুহ্ন উগ্র, মৃগধর—এঁরা সকলেই অতিশয় ধনী ও ক্ষমতাশালী। পথে ভ্রমণ করতে করতেই এঁদের কারও কারও নাম শুনেছিল তারা। এ-ও শুনতে পাচ্ছিল, রাজা পসেনদি এঁদের কথায় ওঠেন, বসেন।

একটি কাননের মধ্যে একতলা চূনমের প্রলেপ দেওয়া গৃহটি দেখে ওরা দাঁড়াল।

—মহামাচ্চ সিরিভদ্দর অতিথিশাল—দ্বারিক হেঁকে বলল। লোকটির মাথায় মিশমিশে কালো চুল। পরনে পাংশু বর্ণের বসন। নগ্ন গা। পেশীগুলি ফুলে ফুলে রয়েছে।

—কত দিন থাকতে দেবে এখানে ?

—তিন দিবস স্বচ্ছন্দে। সাত দিবস পর্যন্ত চলতে পারে— দ্বারিক অহংকারী কণ্ঠে বলল।

—তারপর ?

—অর্ধচন্দ্র। দ্বারিক হাতের ইঙ্গিতে দেখায়।

—কেন হে বাপা! যদি ততদিনেও কোনও কর্মসংস্থান না হয়, কুলপুত্ত যাবে কোথায় ?

—কর্মসংস্থান ? সাবত্থিতে ? দ্বারিকের চোখে ব্যঙ্গ— কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—বেসালি।

—কোথায় বেসালি আর কোথায় সাবত্থি ? লোকটি ওষ্ঠাধরের একটি অদ্ভুত ভঙ্গি করল।

অর্থাৎ বেসালির লোকেরা সাবত্থিকে অবজ্ঞা করে। সাবত্থির লোকেরা বেসালিকে। নিজের নিজের নগর নিয়ে দম্ভের শেষ নেই।

এই সময়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল আরেকটি লোক। এর বক্ষে উপবীত, স্নান করা চুলগুলি কানের দু পাশে লটপট করছে। উত্তরীয় দু পাট করে কাঁধের ওপর ফেলা। বয়স হয়েছে। লোকটি বলল— আহা গর্গ, অতিথিকে ভেতরে আসতেই দাও না। সব ওই সুদত্তর ওখানে চলে যাক তাই চাও নাকি ?

দুই বন্ধু হৃষ্ট হয়ে ভেতরে ঢুকল, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে চলল, নিজের থেকেই বলল— আমিই এই অতিথিশালার অধ্যক্ষ। তা তোমাদের কী কাজ জানা আছে ? মন্ত্র পড়া, মালা গড়া, বিক্রিবাটা, মুল্ল স্থির করা, বাদ্য বাজানো, পেশী দেখানো, জ্যোতিষ-বিদ্যা, সম্মোহন, উল্লম্ফন, তরোয়াল চেনা ... কোনটা ? ধনুর্গ্রহ যে নয় সে তো দেখেই বুঝতে পারছি।

—ধরুন যদি কোনটাই না জানা থাকে ?

—তা হলে তো জেতবনে সাক্কপুত্তীয় সমনদের সঙ্গে গিয়ে জুটতে হয়— লোকটির কণ্ঠস্বরে যেন ক্রোধ।

—সেখানে বুঝি গেলেই কম্ম হয় ?

—হয় বলেই তো শুনেছি!

—কম্মটা কী ?

—কম্ম আর কী, দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভুক্তাবশেষ ভিক্ষা করা, পরিত্যক্ত ছিন্ন বসন সিলিয়ে পরা, আর লোক পেলেই বলা যাগ-যজ্ঞ কিছু না, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সব ভণ্ড। পশুবলি পাপকম্ম।

—তা এ কথা তো তীর্থিকরাও বলে থাকেন! সাক্কপুত্তীয়রা তো একা বলছেন না!

—আহা, তীর্থিকরা নিজেদের মধ্যে আছে। অত খেয়ো না, করো না, বলে বলে বিহার করে না। আর এঁরা এলেন সব সেট্‌ঠি ভাঙাতে, বড় বড় সেট্‌ঠিরাই যদি সব বুদ্ধ বুদ্ধ করে পাগল হয়ে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো যাগ-যজ্ঞের ব্যয় দেবে কে ? সেট্‌ঠি সুদত্ত, সেট্‌ঠি মিগার সব তো ওই বুদ্ধের পক্ষে।

—আপনি কী পুরোহিত ? আপনার এত ক্রোধ কেন ?

—এ সকল কি ভালো ? শিষ্টরা যা যা আচার পালন করেন, আমরাও সেরূপ করলে স্বর্গলাভ করবো, পূর্বোপেতরা জল পাবেন। তা না এ সব কী ? মহামাচ্চ সিরিভদ্দ সর্বচতুষ্ক যাগটির ব্যবস্থা করে এনেছিলেন, তা সে সব তো ইনি পণ্ড করে দিলেন।

—কী ব্যাপার ? বিশদ বলুন তো।

মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে অধ্যক্ষের উৎসাহ বেড়ে গেল। সে যশ ও নন্দিয়কে একটি কক্ষ খুলে দিয়ে বসতে আজ্ঞা দিল। তারপর নিজেও কিলিঞ্জকের প্রান্তে বসে বলল— মহারাজ পসেনদি তো কুস্বপন দেখলেন! ভীষণ সব শব্দ। একেবারে প্রেতলোক থেকে আসছে। আমার প্রভু বড় বড় জ্যোতিষী দিয়ে গণনা করিয়ে বললেন— মহা বিপদ, শীঘ্র সর্বচতুষ্ক যজ্ঞের আয়োজন করতে হবে। সব কিছু চারটি চারটি করে বলি পড়বে। চারটি ছাগ, চারটি গাভী, চারটি অশ্ব, চারটি কপোত, চারটি ময়ূর—এই ভাবে সবই চারটি চারটি। এত পশু-পাখি সংগ্রহ হয়েছিল যে কী বলব! রাজপ্রাসাদের কাননটি তো অরণ্য বলে মনে হচ্ছিল! নগর মধ্যে বিশাল যজ্ঞস্থল নির্মিত হচ্ছিল, কী সমারোহ! চারদিক থেকে বড় বড় বেদবিৎ পণ্ডিতেরা আসছেন, নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন মহা মহা লোক সব। এমন সময়ে কে কানে মন্ত্র দিল কে জানে, মহারাজ ছুটলেন জেতবন। বুদ্ধ অমনি স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে দিলেন। গুরুভোজনের ফলে মহারাজের উদরদেশ গরম হয়ে গেছে। যজ্ঞের নাকি প্রয়োজন নেই। বলি পাপ। পশুগুলিকে সব মুক্ত করে দেওয়া হল।

যশ ও নন্দিয় হাঁ করে শুনছিল।

অধ্যক্ষ বললেন—নগরে ইতরজন সারা বৎসর এই যজ্ঞগুলির দিকে চেয়ে বসে থাকে। কত প্রকারের কাজ, কত ভোজ্য, মাংস নিয়ে তো নয় ছয়। মাংস খেয়ে বাঁচি সব। তা এই দুম্মুখ সব বন্ধ করে দিলে। আচ্ছা আমি চললাম। স্নানাদি করে নিয়ে ভোজনাগারে গেলেই অন্ন পাবে ... লোকটি চলে গেল।

ঘরটির এক প্রান্তে একটি মৃৎকলস, তার ওপর জলপাত্র। যে কিলিঞ্জকটিতে ওরা বসে রয়েছে সেটি বড় জীর্ণ। বাতায়ন অনেক উঁচুতে।

দুই বন্ধু সর্বাগ্রে জল পান করল। যশ হাসতে হাসতে বলল সর্বচতুষ্ক যজ্ঞটি ঘটলে, এতক্ষণে আমরাও তার সুফল কিছু কিছু পাচ্ছি, বলো ? এরা অতিথশালায় কি আর মাংস-ভক্ত দেবে ?

নন্দিয় বলল— তোমার মতো মাংসলোলুপ তীর্থিক আমি পূর্বে আর দেখিনি যশ।

যশ বলল— সাবধান, আমরা আর তীর্থিক নই।

—কিন্তু যশ আমরা তবে কী ? কীভাবে আমাদের পরিচয় স্থির হবে ?

—কী বৃত্তি পাওয়া যায় দেখা যাক, তারই ওপর নির্ভর করবে সেটা।

—কিন্তু দেখো যশ, হীনজাতি ছাড়া আর সবার একটি করে উপবীত থাকে। আমাদের কি তা আছে ?

যশ বলল— আমার তো একটি উপনয়ন হয়েছিল। উদিত-গামে বণিক গেহে জন্মেছি। পিতার তখন অসুখ। মাতা গুরুগৃহে পাঠাতে চাইছিলেন না। গামে একজন পণ্ডিত-ব্যক্তি ছিলেন। যাগ-যজ্ঞ তিনিই সব করতেন। কয়েকটি ব্রহ্মচারী ছিল, আমিও তাদের দলে প্রবেশ করলাম। তারপর তো পিতা মারা গেলেন, মাতা মারা গেলেন। মহাত্মা কাস্সপের সঙ্গে দেখা হল। উপবীত ফেলে দিয়েছি কবে। তুমি ?

নন্দিয় বলল— ভাই যশ! দীর্ঘদিন তীর্থিক ছিলে, তোমার উচ্চ-নীচ সংস্কার গেছে আশা করি, কী! তাই তো!

যশ বলল— হ্যাঁ হ্যাঁ, ও-সকল কত অসার পনেরো বৎসর ভ্রমণ করতে করতে বুঝেছি। কী বলবে, বলো।

নন্দিয় মৃদুস্বরে বলল— রাজগহের নিকটবর্তী নালন্দা গামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারে দাস ছিলেন আমার পিতা। সে গেহের অতি বিদ্বান পুত্ত গৃহত্যাগ করতে গৃহিণী মহা বিলাপ করতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বক্ষণ আমার পিতাকেই দোষ দিতেন। পিতাই ওই পুত্তকে মানুষ করেছিলেন তো ? শেষে পিতা একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন— নন্দিয় এই তো অবস্থা, তুইও যা, পালিয়ে যা। কয়েকজন তীর্থিক এসে রয়েছেন। ওই ওঁদের কাছে চলে যা, আমি তখন বালক, কত উৎসাহ নতুন নতুন দেশ দেখব বলে চলে গেলাম। —একটু থেমে নন্দিয় বলল— অর্থাৎ ভাই যশ, আমার উপবীত নাই, জাতি নাই, পরিচয় বলে কিছু নাই। তবু যদি কোনও পরিচয় চাও বলতে হয় আমি দাসপুত্ত। শূদ্রই হবো !

যশ বলল—ভালোই হল, আমরা নিজেরাই ইচ্ছেমতো জাতি স্থির করে নেবো।

নন্দিয় বলল— কিন্তু উপবীত তো চাই ! ধারণ করতে মন্ত্র-তন্ত্র ?

যশ হা-হা করে হেসে উঠল— মন্ত্র ? মন্ত্র-তন্ত্র যে সব মিছে, শুনতে সুন্দর, কিন্তু প্রবঞ্চনার কৌশল এ কথা কি তীর্থিকদের কাছে শেখোনি ? শোনো। আমরা হট্টে যাবো, দু গোছা উপবীত কিনব, তারপর এই কক্ষের নিভৃতে বসে নন্দিয়ায় নমঃ যশসে নমঃ বলে পরে ফেলব।

নন্দিয় বলল—তা হলে স্নানে যাবার পূর্বেই কাজটা করতে হয়। চলো। আচ্ছা যশ, আমাদের গোত্র কী হবে ?

—পনেরো বৎসর পূর্বে কী গোত্র ছিল আমার ? —যশ ভাবতে লাগল—ক্ষণেক দাঁড়াও চিন্তা করে নেই। ভরদ্বাজ, বোধ হয় ভরদ্বাজ, না কি বসিষ্ঠ ? এহে একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেছে ভাই।

নন্দিয় বলল— এক কাজ করলে হয় না—সেই যে গান্ধার যুবক যার সঙ্গে ভদ্রঙ্করে দেখা হয়েছিল সে নিজেকে কী যেন বলত ! দৈব ... শৈব ... দৈব না শৈব

যশ বলল—না না, কাত্যায়ন বলত বোধ হয়।

—তা হলে কাত্যায়ন নন্দিয়, কাত্যায়ন নন্দিয়। কেমন শোনাচ্ছে যশ ?

যশ বলল—চমৎকার ! ঠিক যেন সত্যি। কিন্তু ভারদ্বাজ যশ বা বাসিষ্ঠ যশ এগুলি অর্ধসত্য হলেও কেমন মিথ্যে-মিথ্যে শোনাচ্ছে। কী করি বলো তো ?

নন্দিয় উৎসাহের সঙ্গে বলল— তুমিও কাত্যায়ন হয়ে যাও না ভাই !

কাত্যায়ন যশ—দিব্য শোনাচ্ছে। ... কিন্তু যশ এটা প্রতারণা নয় তো !

যশ একটু চিন্তা করে বলল— এই যে গৌতম, ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কশ্যপ ইত্যাদি ঋষিদের নামে আমরা বংশপরিচয় দিই, কত কত কাল পূর্বে এঁরা জীবিত ছিলেন বলো তো ? এঁদের বংশধারা এতকাল অবিমিশ্র বয়ে এসেছে এ ধারণা করা কি ঠিক ? এঁদের যজমানরাও তো এঁদের নাম নিতেন। তাঁদের বংশই কি সব অমিশ্র ? আমার তো মনে হয় না। দেখো নন্দিয়, তুমি বল তুমি শূদ্র, তুমি দাস অথচ তোমার আকৃতিতে কোনও দাস-লক্ষণই নেই। তুমি অনজ্জদের মতো নতনাসিক নও। বর্ণটিও দিব্য উজ্জ্বল। অথচ আমি দেখো বণিক পুত্ত, এক সময়ে উপনয়নও হয়েছিল, কিন্তু আমি কেমন সিংহভ্রূ, এদিকে তাম্রবর্ণ। আজ আমরা কাত্যায়ন গোত্র অবলম্বন করলে বহু পূর্বে মৃত ওই ঋষির কোনও ক্ষতি হবে না। আর যদি মনে করো এতে ইতিবৃত্তর ক্ষতি হল, তা হলে সে ক্ষতি আমাদের আগেই কারও না কারও দ্বারা সাধিত হয়েছে।

নন্দিয় বলল, কিন্তু আমরা তো স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরূপ করছি !

—স্বার্থসিদ্ধি কেন বলবে ? কার্যসিদ্ধি বলো—যশ আপত্তি করে উঠল, তা-ও দেখো কোনও নির্দিষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য আমরা এরূপ করছি না। জীবনটিতে সৌষ্ঠব আনবার জন্য, এই সমাজের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম পালন করবার সদিচ্ছা নিয়েই আমরা এরূপ করছি। না করলে সমাজের বাইরে হয় হীনকর্ম করা, নয় দস্যু চোর এইসব হয়ে থাকতে হয়। তাই নয় !

নন্দিয় মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

যশ বলল—যখন তুমি চরকর্মহীন এবং তা করবে না বলে সেনাপতি সীহর কাছে ঘৃণাপ্রকাশ করেছিলে, তখনই আমার মনে হয় তুমি অতিমাত্রায় বিবেকী। শোনো নন্দিয়, এ ভাবে বিচার করে করে জীবনধারণ করা যায় না। বড় বড় ব্যাপারে সত্যাশ্রয়ী হলেই হল, এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষণ করো না। আচ্ছা, এ ভাবেও তো ভাবতে পারো, সেই গৌরবর্ণ মহিমময় আকৃতির গান্ধার পণ্ডিত যার গোত্র-নাম কাত্যায়ন সে-ই আমাদের আচার্য। বস্তুত সেই-ই তো আমাদের এই নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনযাপনের পাঠ দিয়েছে, সুতরাং তার নাম আমরা নিতেই পারি।

এতক্ষণে নন্দিয়র মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল—অবশ্যই। অবশ্যই। আমরা কাত্যায়ন যশ ও কাত্যায়ন নন্দিয়।

শ্রীভদ্রর অতিথিশালায় তৃতীয় দিন সকালের দিকে দুই বন্ধু একটু বিপদে পড়ে গেল। মহামাচ্চ স্বয়ং অতিথিশালা পরিদর্শন করতে এলেন। অতিশয় তীক্ষ্ণাবয়ব এক বয়স্থ ব্রাহ্মণ এই শ্রীভদ্র বা সিরিভদ্দ। মুখটি দীর্ঘ। তাতে যেন খোদিত রয়েছে দীর্ঘ নাসিকা। কোটরাগত দীপ্ত দীর্ঘ চক্ষু, কপালে তিনটি ভ্রূকুটি রেখা। বাহুর চর্ম কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে, তাতে সোনার অঙ্গদ। গুচ্ছবদ্ধ শ্বেত উপবীত।

কক্ষগুলি ঘুরে দেখতে দেখতে তিনি অধ্যক্ষকে ভর্ৎসনা করছিলেন। এ কক্ষটি পরিষ্কৃত হয়নি কেন? ও কক্ষে কিলিঞ্জক অত জীর্ণ কেন? মৃৎ কলসটি ফেটে কোথায় যেন জল পড়ছে। পাকশালায় অত ধূম। ভোজনশালায় উচ্ছিষ্ট। কুক্কুরাদি পাকশালার পেছনে মহা গোল জুড়েছে।

চকিতে পেছনে ফিরে অধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—এরূপ করলে তো অতিথিরা সব সুদত্তর ওখানে গিয়ে উঠবে!

ক্রুদ্ধ মূর্তি, চোখ ঝলসে উঠছে, অথচ আকৃতি কেমন সৌম্য। দেখে যশ ও নন্দিয় সহসা শিহরিত হল। তারা নিজেদের কক্ষে ছিল। প্রত্যূষে স্নান হয়ে গেছে, একবার কাছাকাছি ঘুরেও এসেছে। এখন, ভোজনের পূর্বে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তাদের কক্ষের সামনেই একটি চত্বাল। সেখানে দাঁড়িয়েই মহামাচ্চ সিরিভদ্দ তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করছিলেন।

সহসা তাদের দিকে তর্জনী তুলে সিরিভদ্দ বলে উঠলেন—এই অতিথিরা তো দেখছি ব্রাহ্মণ! কী, ব্রাহ্মণ তো!

যশ তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে দিল। প্রকৃত কথা, ভয়ে তার তালু শুকিয়ে গিয়েছিল। সে বহু দেশ ঘুরেছে, বহু মানুষ দেখেছে, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের, ধনী গৃহপতি, মহা মহা পণ্ডিত—এঁদের সঙ্গে মুখোমুখি কথাবার্তা না বললেও অত্যন্ত কাছ থেকে এঁদের দেখেছে। এই তো কিছুকাল আগেই বেসালির সেনাপতি সীহর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে এসেছে। ভয় পায়নি। কিন্তু এই অমাত্যর মধ্যে এমন একটা ভয়াল ব্যক্তিত্ব যার সামনে পড়ে তার মনে হচ্ছিল এক ব্যাঘ্রের সামনে সে যেন শশক।

নন্দিয় কিন্তু নিজেকে স্থির রেখেছিল। সে বলল—কেন, ব্রাহ্মণ হলে কি কর্মের কিছু সুবিধা হতে পারে?

শ্রীভদ্র ক্রূর চোখে তার দিকে তাকালেন, বললেন—কত দূর থেকে আসা হচ্ছে!

—সম্প্রতি বেসালি...

—তার পূর্বে?

—রাজগহ, উরুবেলা, চম্পা...

—বহু ভ্রমণে বহু অভিজ্ঞতা হয়, অনেক প্রকার চাতুর্যও আয়ত্ত হয়। আমার কর্মকর হবে?

—কী করতে হবে আর্য?

—বিশেষ কিছু না। যখন যেমন বলব। এই নগরীতে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে। উত্তম লোকে যা বলে শুনবে, অধমে যা বলে তা-ও শুনবে। তার নির্যাস আমার কাছে নিবেদন করবে। ধরো এই সাত দিবস পর পর। পরিবর্তে প্রতিবার একপ্রস্থ পরিধেয়, দশটি কহাপন পাবে। আমার বাসগৃহের সংলগ্ন সমাশালয় আছে, সেখানেই হোক, এখানেই হোক দ্বিপ্রহরে, সাংয়কালে ভোজন করবে। যাউ, অন্ন, মচ্ছ, মাংস, শাক, অম্বিল, দধি। এখানেই কক্ষ নিযুক্ত করে দিচ্ছি। উত্তম শয্যায় শয়ন করবে, এই অধ্যক্ষকে বলে দিচ্ছি সেবার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

যশ বলল—সম্মত।

—নাম পরিচয় দাও।

নন্দিয় বলল—আমি কাত্যায়ন নন্দিয়, আর উনি কাত্যায়ন যশ।

শ্রীভদ্রর চোখে একটি কুটিল ভাব দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন—এক গোত্র, সহোদর নাকি ?

—তা নয় আর্য, কাত্যায়ন আমাদের আচার্য।

—ভালো ভালো, পিতৃনাম আর ইদানীং কেউ গ্রাহ্য করছে না। আচার্যই সব, জন্মদাতা কেউ নয়...ভালো...বলতে বলতে শ্রীভদ্র চলে গেলেন। নন্দিয় মহাদুঃখিত হয়ে বলল—যশ, যশ সবাই আমাদের চরকর্ম দিতে চায় কেন ? আমরা কি পাপকর্মা, নীচাশয়ের মতো দেখতে ?

যশও চিন্তিত। কিন্তু সে নন্দিয়কে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—না নন্দিয়, এটা তুমি সঠিক বোঝনি। চরকর্ম করতে হলে পাপকর্মার মতো দেখতে হলে চলে না। কারও চোখে পড়বে না এমন সাধারণ আকৃতির হলেই বোধ হয় সুবিধা হয়।

নন্দিয় ভাবিত চিত্তে বলল—তুমি হয়ত ঠিকই অনুমান করেছ যশ। প্রভুগৃহ ত্যাগ করবার পর এত নগরে গামে ঘুরেছি কেউ তো কোনওদিন বলেনি—নন্দিয় তুই এখানে ? তোকে নালন্দায় দেখেছি না !...যশ আমরা এই শ্রীবিশালা সাবত্থি নগরে ঘুরব ফিরব, কিন্তু কেউ আমাদের দিকে চেয়েও দেখবে না। দেখলেও পরক্ষণে ভুলে যাবে। যশ, যশ, নাম আমরা সমারোহ করে নিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা আমরা নামহীন, গোত্রহীন, আকৃতিহীন, অবয়বহীন ইতর-জন যারা শত প্রকার কাজ করে কিন্তু কোনও বিশেষ কাজ করে না। যারা মহানগরীর পথের ধূলিতে ধূলিকণা হয়ে বিরাজ করে, কেউ কোনওদিন তাদের মনে রাখে না।

দুজনেই কিছুক্ষণ বিষাদে অভিভূত হয়ে বসে রইল। তারপর যশ নিশ্বাস ফেলে বলল—নন্দিয় ওঠো, এ ভাবে বসে থেকে কোনও লাভ নেই। আমরা মহামাচ্চ সিরিভদ্দর কর্ম গ্রহণ করেছি। যেটুকু দায়িত্ব পেয়েছি, সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করব, আর আর...আমাদের আচার্যের কথা স্মরণ করব।

—আমাদের আচার্য ? কে তিনি ?

—ভুলে গেলে ? যাঁর নাম আমরা নিয়েছি ! কাত্যায়ন গান্ধারপুত্র ! মনে আছে ভদ্রঙ্করের সেই সন্ধ্যায় তিনি কী বলেছিলেন ! কোনও একজন মানুষের সামর্থ্যে এই সংসার এই সমাজ গড়ে ওঠেনি, লক্ষ লক্ষ নামহীন পরিচয়হীন মানুষ মিলে এই সমাজদেহ। প্রত্যেকের কর্মের মূল্য অসামান্য। এই অর্থে যে সামান্য সে-ও অসামান্য। তিনি আরও বলেছিলেন জন্ম যেমন ভবিতব্য, মৃত্যুও তেমনই ভবিতব্য। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টুকু আমাদের নিজস্ব। তারও মধ্যে অর্ধেক পরিবার ও সমাজের জন্য প্রদত্ত। কিন্তু বাকি অর্ধেকটুকু দিয়ে আমরা যা ইচ্ছা করতে পারি। কোনও বিশেষ কর্ম সম্পাদন করা, বিশেষ মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অবিরত চেষ্টা করে যাওয়া এ-ও জীবন, একেই তিনি উৎকৃষ্ট জীবন বলেছিলেন।

—এই উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য আমরা সর্বদা উন্মুখ থাকব, কী বলো যশ ? নন্দিয় গম্ভীর আগ্রহ ও সঙ্কল্পের সুরে বলল।

উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য উৎকৃষ্ট কর্মের সন্ধানে নন্দিয় ও যশ শ্রাবস্তীর নগরে ঘুরে বেড়ায়, উত্তম-অধম ব্যক্তিদের কথা শোনে। গোধূম নামে একটি নতুন শস্য উঠেছে। যবের চেয়েও ভালো খেতে, পুরোডাশ হয় নরম, বিশাখা মিগারমাতা তার কর্মান্তে গুড়যন্ত্র স্থাপিত করেছে, মগধ থেকে আগত সার্থবাহরা বলছে মগধ, বিশেষত রাজধানী রাজগহ ও সংলগ্ন স্থানগুলির ব্যবস্থা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল সংবাদ মহামাচ্চ সিরিভদ্দর কর্ণগোচর করায় তিনি আহ্লাদিত হয়েছেন। উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের নাকি সঠিক সংবাদটি শোনবার কান আছে।

ভালো, অচিরেই ধনসঞ্চয় হবে কিছু দুই বন্ধুর। কিন্তু দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়—এ কি উৎকৃষ্ট কর্ম ? উৎকৃষ্ট জীবনের কি কোনও সন্ধান পাওয়া যাবে এর দ্বারা ? কয়েক দিন শ্রাবস্তীর বিভিন্ন অঞ্চল দেখাশোনার পর তারা সেনাপতি সীহর কথা স্মরণ করে জেতবনে প্রবেশ করল।

তখন বেলা পড়ে আসছে। জেতবন বিহারের সম্ভ্রম- উৎপাদক দ্বারাকোষ্ঠক পেরিয়ে ওরা যাচ্ছে দেশনা-স্থলের দিকে। দেখল সামনে দুজন বয়স্থ পুরুষ যাচ্ছেন, প্রচুর সাজসজ্জা করা। অবলেপ্য ও সুগন্ধি যা মেখেছেন গন্ধটি মিশ্রিত এবং উগ্র লাগছে। দুজনেরই পায়ে কৃষ্ণসার-চর্মের পাদুকা। পুরুষ দুটি অভিজাত সন্দেহ নেই। তাদের মতো ইতরসাধারণ হয় নগ্নপদে থাকে। নয় কাষ্ঠপাদুকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে। চর্মপাদুকা পরার বিলাসিতা তো ধনশালী ও বিলাসী ব্যক্তি ছাড়া করা সম্ভব নয়।

একজন পুরুষ আরেক জনকে বললেন—সিরিভদ্দ এবং তার প্রশ্রয়ে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বেড়ে উঠছে, কোসল রাজ্যটা যেন তাদেরই, সাবত্থি নগরটি যেন তাদের গৃহপ্রাঙ্গণ।

অন্য জন বললেন—সর্বচতুষ্ক যজ্ঞের জন্য নরবলির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল এ জনশ্রুতি শুনেছেন সেট্‌ঠি!

—সত্য নাকি? আগে কাউকে বলতে শুনিনি তো!

—আমি সম্প্রতি চরমুখে সংবাদ পেলাম। গোপন সংবাদ। চারটির মধ্যে তিনটিই দরিদ্র বণিককুমার। আর একটি হীনজাতি। কী চায় বলুন তো এরা? ভয় প্রদর্শন করছে, না কী?

—হতে পারে। তবে প্রতদ্দন, ওদের তো রাজানুগ্রহের ধন। রাজা দিলেন তাই পোক্‌খরসাদি, তারুক্‌খ এরা বিশাল ধনবান গহপতি হয়ে গেল। মনসাকট এবং নিকটবর্তী গামকটির কস্‌সনের এক দশমাংশ এখন তারাই সংগ্রহ করছে। অনেক সময়ে বিবাহ বা যজ্ঞ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত করও চাপাচ্ছে। কন্যার বিয়েতে প্রজাদের কোনও মণ্ডলকে ঘৃত-ভার, কাউকে পশু-ভার, কাউকে কাষ্ঠ-ভার বহন করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বুঝলেন তো? আবার শ্রম-ভারও আছে!

প্রথম পুরুষ বললেন—সেট্‌ঠি প্রতদ্দন, এরা যে এইভাবে রাজার ক্ষমতা খর্ব করে দিচ্ছে তা কি মহারাজ বোঝেন না?

—বুঝবেন না কেন সেট্‌ঠিবর, আপনার মনে নেই, মগধ থেকে সেট্‌ঠি ধনঞ্জয়কে এনে কোসলে বসত করালেন। সে কেন? ক্ষমতার সৌষম্য স্থির রাখতেই তো? সেই ধনঞ্জয়ের কন্যা বিসাখা এখন মিগারের পুত্তবধূ হয়ে শুধু সাবত্থির শ্রীই বাড়িয়েছে তাই-ই নয়, ধনসম্পদও প্রচুর বাড়িয়েছে। বিসাখার সম্ভবত নিজের কর্মান্ত হয়েছে। মিগার বলতে চায় না কিছু। কিন্তু ধনঞ্জয় সেট্‌ঠির উপার্জিত ধন অনেকটাই বিসাখার মাধ্যমে সাবত্থিতে আসছে। এখন বুঝুন না গহপতি সুনক্ষত্ত, আমাদের ধন উপার্জনের ধন। প্রথম যৌবনে নিজ হাতে বিক্রিবাটা করে উপার্জন করেছি। কত দূরদূরান্ত ভ্রমণ করেছি। এখন মাথার চুল পাকতে সার্থ পাঠাই। আমাদের ধন তো এমনি এমনি আসে না। আমাদের শ্রী কারও দানের ওপর নির্ভর করে নেই। সে কথা এই ব্রাহ্মণেরা বুঝতে চায় না। ঈর্ষায় ওদের গা জ্বলে যায়।

—কিন্তু সেট্‌ঠি প্রতদ্দন রাজা তো সম্মানে ওদের তালে তাল দিয়ে যাচ্ছেন।

সেট্‌ঠি সুনক্ষত্ত আমাদের পসেনদিকে যতটা নির্বোধ ভাবেন, তিনি আদৌ তা নন। ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা তো মহারাজ মহাকোসলেরও আগে থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। আজ পসেনদি তাদের ক্ষমতাচ্যুত করেন কোন সাহসে! সব তেড়ে উঠবে না? সুকৌশলে উনি সেট্‌ঠিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চাইছেন, পুরোপুরি সফল হতে পারছেন না। এখন এই তথাগত বুদ্ধ ব্রাহ্মণবিরোধী। তীর্থিক, নিগ্‌গণ্ঠরাও তাই, কিন্তু ইনি যেন মৌচাকে লোষ্ট্রাঘাত করেছেন। এঁর লোকপ্রিয়তা, সম্মোহনক্ষমতা এ সব অলৌকিক। পসেনদি কী রূপ কৌশলে এই বুদ্ধকে দিয়ে পূরণ কাস্‌সপকে সরালেন, দেখলে না? শুনছি বহু ব্রাহ্মণ এঁর খ্যাতি শুনে বিতর্ক করতে এসেছেন। এঁদের নায়ক নাকি আশ্বলায়ন বলে এক মহাপণ্ডিত তরুণ। দেখা যাক আজ কী হয়। আমি বলছি, আমরা যদি রাজার উদ্দেশ্য বুঝে কাজ করি, আমাদের বৃদ্ধি ছাড়া ক্ষতি নেই।

শ্রেষ্ঠী দুজন মন্থর পদে চলছিলেন, মাঝে মাঝে উত্তেজনায় একটু থেমে গিয়ে কথা বলছিলেন। নন্দিয়, যশ ছাড়াও বহু লোক পাশ দিয়ে চলে গেল। তাঁরা শুধু স্বরটি মৃদু করা ছাড়া আর কিছুই করলেন না।

প্রতর্দন সুনক্ষত্রকে বললেন—এই তথাগত বুদ্ধ আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। ইনি কুশল কর্ম অকুশল কর্ম ব্যাখা করেন। যাগ-যজ্ঞাদি অকুশল কর্ম বলে পরিত্যাজ্য বলে দিয়েছেন। এখন আমাদের ধন-উপার্জনের উপায়গুলিকে কুশল কর্ম বলে চিহ্নিত করলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই। সুদত্ত কী ভাবে দান বাড়িয়ে দিয়েছে দেখেন না? মিগার যে মিগার সেই কৃপণও হাত খুলেছে। চলো দেখি পণ্ডিত আশ্বলায়ন কী বলেন!

তাঁরা দ্রুত চলে গেলেন। নন্দিয়দের লক্ষই করলেন না। দেশনা-স্থলে পৌঁছে তারা এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেষ্ঠীদ্বয়ের পেছনে স্থান করে বসল।

প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছে। যেন নিস্তরঙ্গ জলধি। মৃদু, অতিশয় মৃদু একটি গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সম্মুখের দিকে অশ্বত্থবৃক্ষে বুদ্ধের আসনটিকে মাঝখানে রেখে এক দিকে শ্রমণরা বসেছেন, আর এক দিকে শ্রমণারা এবং গৃহস্থ রমণীরা।

কেউ জিজ্ঞেস করল—তথাগত সাবত্থিতে রয়েছেন কতদিন ?

—আজ রয়েছেন, কালই হয়ত চলে যাবেন। এ তো আর বস্‌সাবাস নয়। প্রত্যুষে হয়ত ভিক্ষার জন্য বেরোলেন আর ফিরলেন না।

দ্যাখ দ্যাখ ওই যে অগ্‌গসাবিকা খেমা আসছেন। রাজা বিম্বিসারের মহিষী ছিলেন।

যশ ও নন্দিয় উৎকর্ণ হয়ে উঠল। লোকগুলির তর্জনী অনুসরণ করে দেখল একজন দীর্ঘকায়া গৌরাঙ্গী শ্রমণা ধীর পদক্ষেপে আসছেন। বুদ্ধাসনের ডান দিকে গিয়ে ইনি বসলেন।

নন্দিয় বলল—দ্যাখো যশ, পুরুষ কি নারী বোঝা যায় না, কী সৌম্য সুন্দরী ইনি। অনেকটা আমাদের সেই কাত্যায়ন গান্ধারের মতো যেন গঠনসৌষ্ঠব।

পাশে একটি লোক বলল—শ্রমণাদের সুন্দরী সুন্দরী এরূপ বলে লোভ প্রকাশ করতে হয় না। এঁরা সবাইকার কু-দৃষ্টির অতীত। সংসার ত্যাগিনী!

নন্দিয় বলল—বাঃ, কু-দৃষ্টির কী দেখলেন আপনি! ধিক। সৌন্দর্য দেখলে প্রশংসা করব না! আপনারা সাবত্থিবাসীরা বুঝি নারীদের কু দৃষ্টি ছাড়া দ্যাখেন না!

লোকটি উত্তেজিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, তারও পাশে বসা লোকটি বলে উঠল—অ হে শঙ্খ, ইনি কে ? পেছনে আসছেন ?

—আরে উনিই তো ভদ্দা কুণ্ডলকেশা, কেশগুলি দেখে বুঝছ না, কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে! ইনি তো প্রথমে নিগ্‌গণ্ঠ ছিলেন। স্থবির সারিপুত্তর কাছে তর্কে পরাজিত হয়ে বুদ্ধসংঘে যোগ দিয়েছেন। স্থবির সারিপুত্তর কাছেই উপসম্পদা পেয়েছেন।

নন্দিয় ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলল, সারিপুত্ত! সারিপুত্ত! যশ, এই সারিপুত্তই তো আমার প্রভুপুত্ত। এঁরই মায়ের নাম রূপসারি। যিনি আমার পিতাকে তিরস্কার করতেন। আচ্ছা ভাই, ও ভাই বলুন না আর্য সারিপুত্ত কোথায় ?

—ধৈর্য ধরুন। দেখতে পাবেন। উনি তো আছেন শুনছি। আর্য সারিপুত্ত এরূপ বলবেন না, বলুন স্থবির সারিপুত্ত।

ভেতর থেকে কয়েকজন শ্রমণ ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগলেন। লোকটি বলল—ওই দেখুন সুমুখে একজন উনিও ভগবান তথাগতর এক অগ্‌গসাবক মোগ্‌গল্লান—পেছনে আসছেন স্থবির সারিপুত্ত।

নন্দিয় ভালো করে দেখে নিরাশ হয়ে বলল—কত শিশুকালে দেখেছি। একেবারেই চিনতে পারছি না যশ।

পাশের লোকটি বিজ্ঞের মতো বলল—উনি তো সংঘে গিয়ে নবজন্ম নিয়েছেন। এখন কি আর পুরাতন চিহ্ন কিছু অবশিষ্ট আছে যে তাই দিয়ে চিনবেন ?

—তা ঠিক—নন্দিয় নীরব হয়ে গেল। সেই সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই বিশাল সভা। হঠাৎ।

নন্দিয় দেখল তপ্তকাঞ্চনবর্ণ এক পুরুষসিংহ ডান দিক থেকে প্রবেশ করছেন। অঙ্গের কাষায় বসন তাঁকে অগ্নিশিখার মতো ঘিরে আছে। শুধু মুণ্ডিত মস্তকটি এবং বাহু দুটি দেখা যাচ্ছে। তাঁর পেছনে আরও একজন শ্রমণ। এঁর থেকে যেন অল্পবয়সী।

যশ মৃদুস্বরে বলল—দেখো নন্দিয়, ইনি একই সঙ্গে কেমন দৃপ্ত এবং নম্র!

নন্দিয় হাঁ করে দেখছিল, বলল শুধু, দৃপ্ত ও নম্র নয়, কী সুন্দর যশ। কী জ্যোতিষ্মান! যশ যশ আমার মনে হচ্ছে ইনি জন্মে জন্মে আমার পিতা ছিলেন। সেই নালন্দা গামের দাস পিতা নয়, অদাস, চিরমুক্ত, চির প্রেমময়। যশ, কী অলৌকিক জ্যোতিঃসমুদ্র! দেখতে পাচ্ছো না ? এইখানেই তো সেই উৎকৃষ্ট জীবন যার সন্ধানে এতদিন ঘুরছিলাম।

যশ যতই তাকে থামাতে চেষ্টা করে নন্দিয় ততই আরও উত্তেজিত, অভিভূত হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে—হে তথাগত, পিতঃ, ভগবন্ শরণাগতকে গ্রহণ করো প্রভু...

পাশে বসা লোকগুলি যশের দিকে চেয়ে বলল—আপনি ভাববেন না ভদ্র, তথাগতকে প্রথম দেখলে অনেকেরই মধ্যে এ প্রকার ভাবসঞ্চার হয়। পূর্বজন্মের সুকৃতি আর কি। একে বলে সোতাপন্ন হওয়া, অর্থাৎ কি না সদ্ধম্মের প্রবাহের মধ্যে পড়া। আপনার ভাই একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবেন।

অতঃপর বুদ্ধ উপবিষ্ট হলেন। যশ দেখল অত দূর থেকেও উনি তাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন। সে পাশের লোকটিকে বলল—উনি তো এদিকেই দেখছেন। আমার এই সখার অবস্থার কথা ওঁকে নিবেদন করব না কি ?

লোকটি হেসে বলল—এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে সবারই মনে হচ্ছে উনি তারই দিকে চেয়ে রয়েছেন। তথাগতর ইদ্ধি এ প্রকারই। তবে উনি ইদ্ধির কথা স্বীকার করতে চান না। বলেন তোমাদের ভেতরের অভিপ্পায়কেই বাইরে দেখো। আপনাদের কথা এখন নিবেদন করার প্রয়োজন নেই। সভার শেষে সময় পাবেন।

—সব্বে জীবা সুখিত্তা হন্তু—দক্ষিণ পাণি মেলে ধরে আশীর্বাদ করলেন তথাগত। বৃক্ষে ঘেরা মনোরম স্থানটি। শীতল বাতাস বইছে। যশ উত্তরীয়টি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসল। বাসন্তী বাতাস, শরীর শিউরে উঠছে। নন্দিয় যশের কাঁধে মাথা রেখে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তথাগত বুদ্ধর দিকে।

সম্মুখের দিকে একটু সামান্য কোলাহল, একটু যেন ঠেলাঠেলি, তারপর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—হে গৌতম, আজ আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে শতাধিক ব্রাহ্মণ সমবেত হয়েছি। আমাদের আপনাকে কিছু বলবার আছে। আমাদের মুখপাত্র আয়ুষ্মান আশ্বলায়নই তা বলবে। সম্মত আছেন তো ?

বুদ্ধ মৌন রইলেন।

একটি যুবক উঠে দাঁড়াল। বলল—হে শ্রমণ, আমি সম্প্রতি বেদে পারদর্শী হয়েছি, পরিব্রাজক ধর্মও অধ্যয়ন করেছি, তৎসত্ত্বেও জানি আপনি ধার্মিক ব্যক্তি, আপনার সঙ্গে বিচার করা দুরূহ কর্ম। তবু এঁদের আগ্রহে আজ সেই দুরূহ কর্মই করতে এসেছি। এখন বলুন ব্রাহ্মণদের যে ধারণা তাঁরা শুক্ল, অন্যরা কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভ করেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদেবের মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তারাই তাঁর উত্তরাধিকারী অন্যরা নয়—এ কি সত্য নয় ? যদি না হয়, কেন নয় ?

যশের অদূরে উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠিদ্বয় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে উৎসাহভরে কী যেন বললেন। যশ শুনতে পেল না। তারপর বুদ্ধর গম্ভীর মধুর কণ্ঠস্বরে সভাস্থল পরিপূরিত হল।

—হে আশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণকন্যারা যে তাঁদের গর্ভে সন্তান ধারণ করেন, তাদের প্রসব করেন, তৎপরে স্তন্যদান করে বড় করেন—এ কথা কি সত্য ?

—সত্যই তো ! মিথ্যা হবে কেন, শ্রমণ !

—ওই ব্রাহ্মণ সন্তানের পিতা তো ব্রাহ্মণ কন্যার স্বামী কোনও ব্যক্তি !

—নিশ্চয়ই।

—তবে তো ব্রাহ্মণ অন্যান্য বর্ণের মতোই পিতৃ ঔরসে, মাতৃগর্ভে জন্ম লাভ করে, প্রসৃত হয়, লালিতপালিত হয়। সে ব্রহ্মদেবের সন্তানই বা হয় কী করে ? আর অন্যান্য বর্ণের থেকে ভিন্নই বা হয় কী ভাবে ?

—আপনি যাই বলুন না কেন ব্রাহ্মণ সদাই মুক্ত এবং ব্রহ্মদেবের উত্তরাধিকারী এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস ব্রাহ্মণদের আছে। তারাই পূর্ণ আর্য।

বুদ্ধ ঈষৎ হেসে বললেন— আয়ুষ্মন তুমি কি যোন, কাম্বোজ প্রভৃতি সীমান্ত দেশের কথা কিছু জানো ? সেখানে আর্য ও দাস দুটি বর্ণ বাস করে, কখনও আর্য দাস হয়, কখনও দাস আর্য হয়, এখানে তো কোনও বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হল না। হল কী ?

—সে আপনি যাই বলুন শ্রমণ, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ।

—আচ্ছা আয়ুষ্মন, তোমার কি মনে হয় ব্রাহ্মণ চৌর্য, ব্যভিচার, প্রতারণা, দ্বেষ ইত্যাদি করলে তার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপ হয় না ?

—না শ্রমণ, এ রূপ করলে ব্রাহ্মণেরও পাপ হবে।

—আচ্ছা তবে অন্য বর্ণের লোক যদি সদাচার, দান, ধ্যান, মৈত্রীভাবনায় জীবন কাটায়, তার কি পুণ্য হবে না ?

—তা কেন শ্রমণ, নিশ্চয়ই পুণ্য হবে।

—তবে ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র কিসে ? অন্য বর্ণের মতোই জন্মায়, অন্য বর্ণের মতোই পাপ বা পুণ্য সঞ্চয় করে। অন্য বর্ণের মতোই মৃত্যুমুখে পতিতও হয়, তাই নয় ?

—ব্রাহ্মণরা কিন্তু নিজেদের শ্রেষ্ঠ এবং অন্যদের হীন মনে করে।

বুদ্ধ বললেন— তবে আশ্বলায়ন তোমার কি মনে হয় ব্রাহ্মণরা চন্দনাদি কাষ্ঠ দিয়ে অগ্নি জ্বালালে এবং অন্যান্য বর্ণেরা এরণ্ড কাষ্ঠ দিয়ে অগ্নি জ্বালালে, ব্রাহ্মণদের অগ্নি অধিক উজ্জ্বল হবে ?

—না, তা-ও না।

—তবে, ক্ষত্রিয় পুত্র যদি ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করে বা ব্রাহ্মণ যদি অন্য বর্ণের কন্যা বিবাহ করে তাদের সন্তান পিতামাতার মতো না হয়ে একটি কিম্ভূতকিমাকার জীববিশেষ হয় কী ?

—না, তা-ও না শ্রমণ।

—কিন্তু একটি অশ্ব ও একটি গর্দভ মিলিত হলে একটি নূতন প্রকার প্রাণী জন্ম নেয়, তাই তো ?

—হ্যাঁ, তা অশ্বও নয়, গর্দভও নয়, অশ্বতর।

অর্থাৎ জন্তুর ক্ষেত্রে নূতন প্রাণী হচ্ছে, মাতা-পিতা ভিন্ন জাতি বলে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে একই প্রকার প্রাণী জন্মাচ্ছে, মাতা-পিতা একই প্রকার বলে। —ঠিক কি না ?

আশ্বলায়ন নীরব রইলেন।

বুদ্ধ বললেন— হে আশ্বলায়ন এবার বলো দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতার মধ্যে যদি একজন পণ্ডিত হয় অপরজন মূর্খ, লোকে কাকে সমাজকার্যে আমন্ত্রণ জানাবে ?

—অবশ্যই পণ্ডিতকে।

—আচ্ছা, যদি একজন বিদ্বান কিন্তু দুঃশীল ও অপরজন বিদ্বান নয় কিন্তু সুশীল, তা হলে তোমার বিচারে কাকে নিমন্ত্রণ জানাবে ?

—হে গৌতম, যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র তাকেই...

—হে আশ্বলায়ন, তুমি প্রথমে জাতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলে, তার পরে বেদাভ্যাসকে, এখন গুরুত্ব দিচ্ছ সচ্চরিত্রকে। অর্থাৎ আমি চাতুর্বর্ণ্যে যে সংস্কার করতে চাই, চরিত্র ও শীলের ওপর গুরুত্ব দিতে চাই, তুমি তা মেনে নিয়েছ। আয়ুষ্মন, তুমি যে প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছ সেই একই প্রশ্ন তারুক্খ ও পোকখর সাদির শিষ্যগণও আমার কাছে করেছিল, ব্রাহ্মণ এসুকারিও করেছিল, ভবিষ্যতে আরও অনেকে করবে। সবার প্রতি আমার একই উত্তর। জন্মের কারণে কেউ শ্রেষ্ঠ হয় না, যে শ্রদ্ধা, শীল, বিদ্যা, ত্যাগ ও প্রজ্ঞার অনুশীলন করে, যে কুলেই জন্মাক না সে মানুষের মধ্যে উচ্চতম বর্ণ দাবি করতে পারে।

> যস্‌স কায়েন বাচায়
> মনসা নত্থি দুক্কতম।
> সম্বুতং তীহি থানেহি
> তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণম্‌ ॥

আশ্বলায়ন নামে যুবাটি বহুক্ষণ মাথা নত করে নীরবে বসে রইল। তার পরে উঠে গিয়ে বুদ্ধের চরণতলে মাথা রাখল। এমনভাবে যেন সে আর কখনও উঠবে না।

নন্দিয়কে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে যশ বলল— কী আশ্চর্য। কী আশ্চর্য !

নন্দিয় বলল— সত্যই আজকের অভিজ্ঞতা আশ্চর্য, অবিস্মরণীয়।

যশ বলল— আজকের অভিজ্ঞতা অতি সুন্দর, কিন্তু আমি আশ্চর্য বলছি অন্য একটি ব্যাপারকে।

—কী ব্যাপার যশ ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তোমার কি মনে নেই নন্দিয়, কাত্যায়ন গান্ধার আমাদের এই সকল কথাই কিন্তু বলেছিলেন। কায়, মন ও বাক্যে দুষ্কৃত না করার অভ্যাস করা প্রয়োজন। তিনি অবশ্য আরও বলেন কায় ও বাক্যে সংযত হওয়া সর্বপ্রথম কাজ। কিন্তু দুষ্কৃতীদের সম্মুখীন হলে যদি কায় ও বাক্যের প্রহার করতে হয়, নিজে অনুত্তেজিত হয়ে তা করবে। এ বিষয়ে তথাগত কিছু বললেন না তো!

—মুখে না বললেও কাজে দেখান। পূরণ কাসস্‌পকে জনসমক্ষে অপ্রতিভ করা কি একপ্রকার প্রহার নয়? আর চিঞ্চা তো শুনেছি নারী বলে পার পায়নি, শ্রমণরা তীর্থিকদের তো বটেই তাকেও কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছিলেন— নন্দিয় বলল।

—উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য কোনও সঙ্ঘে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই নন্দিয়। আমার মনে হয়, আমরা উৎকৃষ্ট জীবনের সন্ধান পেয়ে গেছি। অনেক আগেই। যশ যেন বহু দূরের দিকে চেয়ে বলল।

৪

বিশাখা, তোমার এই নবীন বয়স, সুকুমার শরীর...তুমি নিত্য জেতবনে কিসের সন্ধানে যাচ্ছ আদরিণী কন্যা আমার!

কেন পিতা, জেতবনে যাত্রীদের মধ্যে তো নবীন-প্রবীণের প্রশ্ন নেই। সুদত্ত-কন্যা চুল্লসুভদ্দা, প্রতর্দন-সুহৃা সুপ্‌পিয়া, সাবত্থির শ্রেষ্ঠসুন্দরী উপ্‌পলবন্না—এঁরাও তো যান। আপনি ভদ্দা কুন্ডলকেশাকে দেখেছেন? রাজগহের সেই সাহসিকা সুন্দরী যিনি দস্যু স্বামীকে গিজ্‌ঝকূট থেকে ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন! তিনি তো এখন ভিক্ষুণী ভদ্দা। মুখমণ্ডলের দীপ্তি দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

ধনঞ্জয়ের মুখের ওপর একটি ছায়া, তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন— তুমিও কি প্রব্রজিত হতে চাও বিশাখা! তাঁর স্বর ভালো করে ফুটছে না, এত ভয়।

বিশাখা হেসে বলল—কিন্তু এখন বড় বড় শ্রেষ্ঠিকুলে অনেকেই মনে করছেন কন্যাদের পব্বজ্জা নেওয়া ভাল। কুল উজ্জ্বল হয়। মহারাজ পসেনদির কনিষ্ঠা ভগ্নী দেবী সুমনা ও মহারানি দেবী মল্লিকাও তো...

—দেবী মল্লিকা কি মগধ মহিষী খেমার মতো...

—না পিতা, দেবী মল্লিকা মহারাজ পসেনদির অত্যন্ত প্রিয়া মহিষী, তিনি পব্বজ্জা নেবেন না। তবে আমি দেখেছি তিনি অত্যন্ত ভক্তিমতী। তথাগত বুদ্ধ ছাড়া আর কিছু যেন জানেন না। আর কোশল সেনাপতি বন্ধুলের পত্নী মল্লিকার সঙ্গে সেদিন আলাপিত হলেন তো!

সুমনা বললেন—এই প্রথম, এমন একটি সখী পেলাম বিশাখা, যাকে মনের কথা বলতে পারি।

ধনঞ্জয় হেসে বললেন— কেন প্রিয়ে, মনের কথা কি ইদানীং আমাকে বলতে পারছ না?

—তুমি কি সখী? সুমনা কৌতুক ভ্রূভঙ্গি করে বললেন।

বিশাখা বলল—মা, বন্ধুল পত্নী মল্লিকার নির্বন্ধেই হয়ত রাজ্ঞী মল্লিকা পব্বজ্জা নিচ্ছেন না, একেক সময় মহারাজের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে উনি নাকি স্থিরই করে ফেলেন যে সংসার-ত্যাগ করবেন।

—মহারাজ দেবী মল্লিকার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেন?

—হ্যাঁ পিতা, উনি মালাকারের কন্যা বলে মহারাজ যখন-তখনই বলেন রাজ্ঞীপদ পেয়ে দেবী মল্লিকার মাথা ঘুরে গেছে। দেবীর অপরাধ—তিনি মহারাজের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণ করতে যান, সুপরামর্শ দিতে যান। তবে, রানির প্রতি এইপ্রকার ব্যবহারের জন্য মহারাজ তথাগত বুদ্ধের কাছে তিরস্কৃত হয়েছেন।

—ও তথাগত বুঝি গৃহ-বিবাদ, দাম্পত্য-কলহ এসব ব্যাপারেও উপদেশ দেন!

—হ্যাঁ মা, সেটাই তো ওঁর বিশেষত্ব। কত লোককে যে উনি সৎপরামর্শ দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন! উপাসকরা ওঁকে পিতা-মাতার চেয়েও বেশি মানে এই কারণে। আর শুধু তথাগত নয় মা, শ্রমণদের অনেকেই নানা সাংসারিক ব্যাপারে গৃহীদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনঞ্জয় বললেন— হ্যাঁ, শ্রমণ আনন্দ নাকি সেট্‌ঠি সুদত্তর বাড়ির চোর ধরে দিয়েছেন।

—চোর নয়, চুরির দ্রব্য—বিশাখা মৃদু কণ্ঠে বলল।

সুমনা বললেন—আমি শুনিনি। সেটা কী ব্যাপার ?

ধনঞ্জয় বললেন—বহুমূল্য রত্নহার চুরি গিয়েছিল, শ্রমণ আনন্দ সেদিন সেট্‌ঠির গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। বিশৃঙ্খলা, উৎকণ্ঠা, হট্টগোল শুনে জিজ্ঞেস করেন এবং জানতে পারেন। বলেন—আপনারা দ্রব্যটি চান, না চোরকে চান। সুদত্ত-পত্নী বলেছিলেন— চোরটিকেও চাই, কেননা এত বড়, এত জটিল শাখাপ্রশাখাময় পরিবারে কার কোথায় স্বভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জানা প্রয়োজন। আনন্দ বলেন—রত্নহার তিনি উদ্ধার করে দিতে পারবেন, কিন্তু চোর ধরার দায়িত্ব নিতে পারবেন না। সেট্‌ঠি সম্মত হলে তিনি একটি বৃহৎ মৃৎভাণ্ড কর্দমে পরিপূর্ণ করে তার পাশ দিয়ে একটি স্থূল আবরণী টাঙিয়ে দিতে বলেন। সারাদিন ধরে পরিবারের যে যেখানে আছে দাস থেকে আরম্ভ করে অতিথি-অভ্যাগত, শ্রমণরা, স্বয়ং গহপতি, তাঁর পত্নীরা সবাইকে ওই আবরণীর ওপাশ দিয়ে ঘুরে আসতে হবে, নইলে কেউ গৃহ থেকে বেরোতে পারবেন না।

—পাওয়া গেল রত্নহার ? সুমনা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—অবশ্যই! সেই মৃৎ-ভাণ্ডের কর্দমেব মধ্যে।

সুমনা সখেদে বললেন—সেট্‌ঠি, এই আনন্দপমুখ সমনরা আমাকে বড় ভাবাচ্ছেন। এঁরা এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য কোথা থেকে পেলেন ?

ধনঞ্জয় বললেন—প্রিয়ে তুমি ভুলে যাচ্ছ, এঁরা শাক্যকুলের রাজপুত্র। শাসনপদ্ধতির নানা শাখার বিষয়ে এঁদের সহজাত প্রতিভা আছে।

—তাই-ই তো বলছি, কত কাজে লাগতে পারতেন এঁরা স্বকুলের মানুষের, সবাই মিলে পব্বজ্জা নিয়ে শাক্যদের তো ভাসিয়ে দিলেনই, সাধারণভাবে মনুষ্যসমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। এঁদের মতো পিতা হলেই তো বীর, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ সন্তান হবে। তা না সব সংসার-ত্যাগ করলেন। দুক্‌খ, দুক্‌খ, দুক্‌খ! এ যেন সেই কবে ব্যাধি হবে বলে আগে থেকেই রোগশয্যায় শুয়ে থাকা!

বিশাখা বলল—কিন্তু মা, শুধু আর্যসত্যগুলিই তো নয়! তথাগত যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ দেন সাধারণ মানুষকে, সেইটুকু সারাজীবন ধরে পালন করে গেলেই তো একটি পাপহীন, নির্দোষ, চমৎকার সমাজ, দেশ গড়ে উঠতে পারে। সেটা কি মস্ত বড় কথা নয় ? শরীরকে কষ্ট দিতে হবে না, যে যেমনভাবে যেখানে অবস্থিত সেখানে থেকেই জীবনধারণ করবে, শুধু জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিটি পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

সুমনা বললেন—তুই কি মনে করিস অষ্টশীল অতি সহজ ব্যাপার ? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, এমনকি সম্যক আজীব কি সহজ ?

—না মা সহজ নয়। কিন্তু গৃহস্থদের জন্য তথাগত আরও সহজ নির্দেশিকা দিয়েছেন—পঞ্চশীল। প্রাণিবধ না করা, পরদ্রব্য না হরণ করা, ব্যভিচার না করা, মিথ্যা না বলা, সুরাপান না করা— এ-ও কি অতিশয় কঠিন ?

ধনঞ্জয় বললেন—প্রাণিবধ না করলে তো আমাদের অশন বন্ধ হয়ে যায় মা। নির্গ্রন্থরা যে বলেন চারিদিকে অণুপ্রমাণ প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে, জলে, স্থলে, বৃক্ষে সর্বত্র— তারা তো অবিরাম বধ হচ্ছেই!

বিশাখা বলল—পিতা, তথাগতর সব ব্যাপারেই মঝ্‌ঝিম পন্থা। উনি অনর্থক প্রাণীবধ অর্থাৎ মৃগয়া, যাগ-যজ্ঞাদিতে বলি এইগুলিই বারণ করেন। প্রয়োজনে মৎস্য মাংসাদি তো উনি নিজেও খান। শ্রমণদেরও খেতে বারণ করেন না। তবে ওঁকে নিমন্ত্রণ করে পশুহত্যা করা ওঁর মনোমত নয়।

—সুরাপান না করলেই বা চলবে কিভাবে বিসাখা! অতিরিক্ত পান করলে কুফল হতে পারে কিন্তু এই এতো মানুষ, শারীরিক পরিশ্রম করে বাঁচে। উত্তেজক, বলকারক সুরা না হলে তারা কাজ করতে পারবে না, উচ্চশ্রেণীর নরনারীরও এটি একটি নিত্যব্যবহার্য পানীয়।

—পিতা আপনি অতিরিক্ত পান করেন না বলেই সুরার সপক্ষে কথা বলতে পারছেন। সাবত্থিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুকাল থেকে দেখুন, বুঝতে পারবেন সুরায় নিষেধ কেন। আর ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচরণ এগুলি যে সমাজদেহে ঘৃণ্য রোগের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এগুলিকে যে নির্মূল করা প্রয়োজন এ বিষয়ে কি আপনার সন্দেহ আছে ?

—না তা নেই, ধনঞ্জয় বললেন, তবে কি জানো মা, ব্যভিচার প্রবঞ্চনা মিথ্যাচরণ সভ্যতার উষাকাল থেকেই বোধহয় চলছে। যতই দূর করবার চেষ্টা করা হোক, ঠিক কোনখান দিয়ে বেরিয়ে এসে এরা আবার সাড়ম্বরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে।

—কিন্তু পিতা, পরিপূর্ণ সভ্য সমাজের দিকেই তো আমাদের গতি হওয়া উচিত। এবং সেই সভ্য সমাজ তো ওই সকল পাপ-অভ্যাস দূর করার চেষ্টা থেকেই জন্মাবে। ধীরে ধীরে, একদিনে নয়।

ধনঞ্জয় বললেন—সে কথা ঠিক। মহত্তম সত্যগুলি বোধহয় জীবনের সরলতম সত্য বিসাখা। বুঝতে অসুবিধা হয় না। শুধু কার্যে পরিণত করার পক্ষে এত প্রলোভন, এত বাধা! কিন্তু বিসাখা, তুমি তো বুদ্ধবাণী ভালোই হৃদয়ঙ্গম করেছ, প্রচারকার্যও দিব্য করছ এবং তা তোমার নীল দুকূল এবং মহালতাপসাদন পরেই সম্ভব হচ্ছে। তবে কেন...

বিশাখা মৃদু-মৃদু হেসে বলল—পিতা, আমি কি একবারও বলেছি পব্বজ্জা নেব ?

—কিন্তু কন্যা, সংসারই বা করছ কই! জামাতা শুনছি বহু দেশ বাণিজ্য-যাত্রা করে ফিরে আবার কর্মান্তে চলে গেছে। মা, আমাদের বিবাহের পর আমরা দুজনে কত আনন্দ করেছি, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও। তোমার জীবনে সেরূপ আনন্দ...ধনঞ্জয় অপ্রতিভ মুখে থেমে গেলেন।

সুমনা কন্যার পাশেই বসেছিলেন। বিশাখার দ্বিতল গৃহের উপরিতলে সুদৃশ্য কাষ্ঠকুট্টিম। তার ওপর চিত্রবিচিত্র আচ্ছাদন দিয়ে প্রস্তুত একটি অনতিকোমল শয্যা, উপাধান ইতস্তত ছড়ানো আছে। মৃৎ-আধারে মৃদু সুগন্ধি পুড়ছে। সময়টা সকাল। সুমনা কন্যার মাথাটি নিজের বুকের ওপর টেনে নিলেন, বললেন— আমাকে বলবে না মা!

বিশাখা অনেকক্ষণ নীরবে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে রইল। তারপর মুখটি ঈষৎ তুলে বলল—মা, তুমি তো জানো শ্বশুরগৃহে সকলে আমায় ভালোবাসেন, মান্য করেন, আমি এই গৃহ-পরিচালনার সমস্ত কাজ আমার শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে একত্রে করে থাকি। শ্বশুর আমাকে এত স্নেহ করেন যে, আমি বিব্রত হয়ে পড়ি। যা চাই তা-ই দিতে তিনি প্রস্তুত। মা, তুমি এ-ও জানো যৌবনকাল কর্মের সময়, সেট্‌ঠি-পুত্ত দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বণিকের উপযুক্ত কর্ম করছেন, মা তুমি আমার মুখ দেখো—আমি আনন্দে আছি।

সুমনা অনুভব করলেন, বলতে বলতে বিশাখার সারা শরীর যেন রোমাঞ্চিত হল, মুখে অদ্ভুত বিভল হাসি। কন্যাকে এমন মুগ্ধা অবস্থায় তিনি কখনও দেখেননি। একটা সময় ছিল যখন তিনি বিশাখার একমাত্র সখী ছিলেন। তার অন্তরের কথা তিনি ছাড়া তেমন কেউ জানত না। সযত্নে নির্মাণ করেছেন তিনি বিশাখা-প্রতিমা। তার বিবাহের পর দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট পেয়েছেন তাঁর স্নেহপুত্তলি বুঝি অপাত্রে পড়ল, বিশাখার গুণগুলি বুঝি সব দোষ হয়ে দেখা দিল। এই ভয়ের সমর্থন পেয়েছিলেন যখন বিশাখার বিচারের জন্য সাকেত থেকে গহপতিরা গেলেন। সুমনা প্রস্তুত ছিলেন কন্যার মোক্ষক্রিয়ার জন্য। ভয় পেয়েছিলেন, এরপর কন্যা কী করবে ? তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। যদি বলে আর বিবাহ করব না! যদি বলে প্রব্রজ্যা নেব, তো সেসব সঙ্কল্প থেকে তাকে টলানো কঠিন। কিন্তু বিশাখা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাবত্থিতে, শ্বশুরকুলে, সে দিব্য ধনুর্বাণ বা মল্লবিদ্যার অনুশীলনও করছে পূর্বের মতো। মুখটি এতো সুখী। শুধু এই সুখের মধ্যে পুণ্যবর্ধন কতটা আছে, এমন কি আছে কিনা, তা বুঝতেই পারছেন না সুমনা।

মাকে নীরব দেখে বিশাখা বলল—মা, সকলের সুখই কি একপ্রকার হবে ? হয় না মা, তা হয় না।

ধনঞ্জয় বললেন—বুঝতে পারছি বিশাখা, তোমার আনন্দ সৎ-কর্মের, সৎ-সঙ্কল্পের আনন্দ। তা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে জেতবনে। কিন্তু একজন গৃহী নারীর যাবতীয় আনন্দ সন্ন্যাসী-বিহারে— এ বড় ভয়ের কথা বিশাখা। তাছাড়া আর অধিকদিন সন্তান না হলে যদি পুণ্যবর্ধন পুনর্বার বিবাহ করতে চায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুমনা দেখলেন বিশাখার মুখে সহসা যেন আলো জ্বলে উঠল। কেন তিনি বুঝতে পারলেন না।

বিশাখা ধীরে ধীরে বলল— মিগার-পুত্ত দ্বিতীয় বিবাহই করুন, তৃতীয় বিবাহই করুন, মিগার মাতা বিসাখাই থাকবে।

বিশাখা গৃহকর্মে চলে গেলে ধনঞ্জয় বললেন— প্রিয়ে, আমরা একটি বালিকাকে সাবত্থি পাঠিয়েছিলাম। সে বুদ্ধিমতী হলেও সরলা ছিল। এই পরিশীলনদুষ্ট নগরী তাকে কি সম্পূর্ণ জীর্ণ করে ফেলল ? মিগার কেমন লোক ? সে কি আমার কন্যার কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রাচুর্য দেখে তাকে নিজ বাণিজ্যকর্মে, গৃহপরিচালনা কর্মে পুরোপুরি যুক্ত করে দিয়েছে ? বিশাখা কি এই কর্ম ও ক্ষমতার মোহে জীবনের সরল সুখশান্তিগুলি আর চিনতে পারছে না ? সুমনা, মিগারের মধ্যে কোনও জটিল চরিত্র-বিকার নেই তো ?

সুমনা শিউরে উঠে বললেন— বন্ধ কর এ প্রসঙ্গ, বন্ধ কর সেট্‌ঠি। আমার বুকের মধ্যেটা কেমন শূন্য লাগছে। কিছু নেই কোথাও, সেট্‌ঠি, আমি কোনও অবলম্বন পাচ্ছি না। আমার কন্যা কোথায় ? সেট্‌ঠি, আমি জানতাম না আমার ধর্ম-কর্ম, প্রাণ-মন সব কিছুই আমি কন্যাকে সমর্পণ করে বসেছিলাম। সে যদি আমার বোধের অতীত হয়ে যায়, তবে সুমনার জীবনের কেন্দ্রটি শূন্য হয়ে যাবে।

সুমনার মুখচোখের অবর্ণনীয় বিষাদের দিকে তাকিয়ে ধনঞ্জয় আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তিনি সুমনাকে আলিঙ্গন করে গাঢ় কণ্ঠে বললেন—প্রিয়ে, আর কিছু আর কেউ কি নেই তোমার জীবনে ? আর কোথাও নিজেকে ন্যস্ত করতে পারছ না ? আর এত নিরাশই বা হচ্ছ কেন ? ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো প্রিয়ে।

সুমনা উঠে গিয়ে গবাক্ষের সামনে দাঁড়ালেন, দুজনেই গবাক্ষপথে দেখছেন বিশাখার কাননের সৌন্দর্য। অদূরে বৃক্ষগুলির মাঝে মাঝে শ্রাবস্তীর পথরেখা দেখা যায়। সামান্য কিছু লোক চলাচল হচ্ছে। সুমনা বললেন—সেট্‌ঠি, আমি যতদূর বুঝি—আমার জীবনে বিসাখা শুধু কন্যা নয়, সে একটি তত্ত্ব।

ধনঞ্জয় পরিবেশ লঘু করবার জন্য পত্নীর মুখ চুম্বন করলেন, তারপর হেসে বললেন, কন্যার পরিবর্তে পাতিকে নিয়ে পরীক্ষা করলে পারতে প্রিয়ে। তোমার তত্ত্ব তোমারই থাকত।

দুঃখের হাসি হেসে সুমনা বললেন—জীবনে যা কিছু সবলে ধরতে গেছি, অনেক চিন্তায় ভালোবাসায় রূপ দিতে গেছি তা সবই আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তোমায় নিয়ে তেমন কিছু করতে গেলে তুমিও হয়ত তাই যেতে সেট্‌ঠি!

ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর প্রিয়া পত্নীর দিকে তাকালেন। ইদানীং তাঁর মনে হয়, তিনি এই ক্ষুরধারবুদ্ধিশালিনী ব্যক্তিত্বময়ী ক্ষত্রিয়কন্যার যোগ্য নন। যৌবনে যখন দুঃসাহসিক বাণিজ্যযাত্রায় যেতেন সে-সব দিনগুলিতে নিজের পৌরুষ যেন দেহের কোষে কোষে অনুভব করতেন। তখন সুমনার পাশে দাঁড়াতে তাঁর দ্বিধা হত না। কিন্তু এখন ? ধনসম্পদ যেন তাঁর সেই পৌরুষকে কেমন শিথিল করে দিয়েছে। অথচ ধন এমন ক্ষমতা দান করে যে, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ সবার ওপরে কর্তৃত্ব করবার যোগ্যতা জন্মায়। তাঁর পিতা মেণ্ডক বলেন, এমন দিন আসছে যখন বণিকই হবে শ্রেষ্ঠ বর্ণ। ধনঞ্জয়ের মতে অবশ্য ক্ষত্রিয়রা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ বর্ণ। বাহুবলে পৃথিবী জয় করে, রাজ্যশাসন করে, অপরাধীর শাস্তিবিধান করে, এদিকে শাণিত বুদ্ধি, বিদ্যার গরিমা কী! সেনিয়কে দেখলে এক সময়ে তাঁর ঈর্ষা হত, আর ইদানীং আর এক দম্পতিকে দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেছেন। বন্ধুল মল্ল ও তাঁর পত্নী মল্লিকা। বন্ধুল বীরপুরুষ বটে। শার্দূলগতি ওই ক্ষত্রিয় তাঁরই বয়সী হবেন। সুমনার পতি হওয়া উচিত ছিল ওই বন্ধুলের মতো কারুর। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ধনঞ্জয়। আর বিশাখা ?

সুমনা মুখ তুলে তাকালেন। ধনঞ্জয়কে তিনি কখনও এত বিমর্ষ দেখেননি। হৃদয়ের ভেতরটা বেদনায় কেমন যেন করে উঠল। তিনি চেষ্টা করে হেসে বললেন— চলো সেট্‌ঠি, আমরা সাকেতে ফিরে যাই। এখানে ভালো লাগছে না।

—কেন মা, কোথায় যাবে ? —বিশাখা কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাঁরা বুঝতে পারেননি। —মা! বিশাখা সুমনার অত্যন্ত সন্নিকটে এসে চোখ দুটি তাঁর দিকে তুলে ধরল। নীল চোখের তারা, নীলাভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকি অংশটুকুও।

সুমনার গাঢ় কৃষ্ণ অক্ষিতারা দুটি সেই সুনীল নয়নের ওপর স্থির হয়ে রইল। সুমনা যেন সেই চোখ দুটির ভেতরে অশ্রু দেখতে পেলেন। গভীর উৎকণ্ঠায় বললেন—কী হয়েছে বিসাখা ?

—কিছু তো হয়নি মা! মিগারপুত্ত কর্মান্ত থেকে ফিরেছেন। এইমাত্র এসে পৌঁছলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিগারগৃহ আনন্দিত কলস্বরে ভরে উঠল। পুরস্ত্রী-পরিজনরা সবাই ধাবিত হচ্ছে, মিগার-গৃহিণী কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিশাখাকে বারবার ডাকছেন। মিগার তাঁর কর্মকক্ষ থেকে কাষ্ঠপাদুকার শব্দ করতে করতে বহির্বাটির অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। গণক, লেখক ও অন্যান্য কর্মকররা, ভৃতকরা ছোটাছুটি করছে। দাস ও দাসীরা হাত-পা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে এলো। সাত ঘোড়ার রথ থেকে স্বর্ণসূত্রী উত্তরীয় দুলিয়ে মৃগচর্মের উপানৎ পায়ে পুণ্যবর্ধন নেমে এলো। আগের থেকে যেন আরও একটু পুষ্ট, খানিকটা দৃঢ়পেশী হয়েছে সে। গাত্রবর্ণ তাম্রাভ। সন্দেহ নেই সার্থর সঙ্গে ভ্রমণ করে করে রোদে পুড়তে হয়েছে তাকে অনেক। তার চলাফেরার মধ্যে একটা কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভাব, কর্ম করলে যে ধরনের আত্মপ্রত্যয় আসে আচরণে, সেইরূপ। সে নেমে এসে পিতার এবং ধনঞ্জয়ের পদবন্দনা করল। গৃহাভ্যন্তরে এসে আগেই সুমনার পরে তার মায়ের চরণে প্রণত হল। তার মা তার শির চুম্বন করলেন। পুণ্যবর্ধন সমস্ত পুরস্ত্রী-পরিজনের কুশল সংবাদ নিল। শুধু বিশাখাকে কোথাও দেখা গেল না। তার পরিবর্তে তার পায়ে প্রক্ষালনের জল দিল ময়ূরী। মার্জনী বস্ত্র দিল কহ্না। শীতল পানীয় এনে দিল ধনপালী।

প্রত্যাবৃত্ত পুণ্যবর্ধনকে নিয়ে যখন সবাই কাহিনী শুনতে, আহ্লাদ প্রকাশ করতে মত্ত, তখন সুমনা সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। মিগার-গৃহের ভেতরের কাননটি পেরিয়ে এলেন বিশাখার গৃহে। কোথাও কেউ নেই। সোপানশ্রেণী পার হয়ে দ্বিতলে উঠলেন। সুপ্রশস্ত শয্যাগৃহ বিশাখার, সেখানে সে নেই। তারপরে অলিন্দ, তাঁদের জন্য একটি সুন্দর কক্ষ। তারপর বিশাখার প্রসাধনকক্ষ। সেইখানে গবাক্ষলগ্নশির বিশাখা বসে রয়েছে। সুমনার হাতের স্পর্শে সে মুখ তুলল না, সে শুধু মায়ের হাতটিকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল।

অনেকক্ষণ পরে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলল—মা, আমি চেষ্টা করব। ধীরে ধীরে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজল সুমনার হাত ভিজিয়ে দিতে লাগল।

সুমনা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন—এই জন্যই কি তুমি এতদিন আনন্দে ছিলে ? বিসাখা! মা!

বিসাখা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তারপর বলল— মা, ভয় করো না, বিসাখা পরাজয় স্বীকার করবে না। বিসাখা চিরদিন আনন্দে থাকবে। শুধু, তথাগত আমাকে করুণা করুন। সুমনার বুকে মাথা রেখে সে ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে বলল—মা, এমন দিনরাত গেছে যখন সাকেতের জন্য, পিতামাতার জন্য শোকে, হাহাকারে বিসাখার চিত্ত ভরে গেছে। তখন আর্তস্বরে তোমাকে ডেকেছি মা, পিতাকে ডেকেছি। পিতাকে বলো মা, সেই ডাক তথাগত শুনতে পেয়েছেন। ওই জেতবন তাই আমার হৃৎকমল। বিসাখা পব্বজ্জা নিলেও জেতবনের, না নিলেও জেতবনের, সঙ্ঘে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি মা।

সুমনা উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন—এখন ? এখন তবে কী করবে, বিশাখা।

—এই সমস্ত কঠিন পরীক্ষা যদি উত্তীর্ণ হতে পারি তবেই নিজেকে দেবী সুমনার কন্যা বলে পরিচয় দিতে পারব মা। চিন্তা করো না। আমি কৃতসঙ্কল্প। এই নির্জনে শুধু শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছিলাম।

রাত্রি ক্রমেই গভীর হচ্ছে। শ্রাবস্তী নগরীর বিচিত্র কোলাহল ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো। আলোগুলি নিভে যাচ্ছে। শুধু চলছে সুরভিত মনোরম কক্ষে শয়নপ্রদীপ।

পুণ্যবর্ধন পদচারণা করছে। তার পদক্ষেপগুলি এখন দৃঢ়, প্রত্যয়ব্যঞ্জক। কিন্তু নিজের বক্ষের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। তিন বছর পরে সে গৃহে ফিরল। যথেষ্ট ধনোপার্জন করেছে। কুরুদেশ থেকে সে গোধূমের বীজ এনে নিজেদের কর্মান্তে রোপণ করেছিল। স্বর্ণবর্ণের শস্য হয়েছে। ভৃগুকচ্ছের পট্টন থেকে সে এনেছে যাবনিক স্বর্ণমুদ্রা। কোণবিশিষ্ট নয় সুগোল। কয়েকটি এনেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার হারে গেঁথে বিশাখার জন্য। কিন্তু বিশাখা কোথায় ? ভোজনের সময়ে মা এবং শ্বশ্রূমাতা উপস্থিত ছিলেন। বিশাখা নাকি সঙ্ঘে গিয়েছিল। মিগার এবং তাঁর গৃহিণী, সবিস্তারে শোনালেন তথাগত বুদ্ধের কাছে তাঁদের উপাসকত্ব নেওয়ার কাহিনী। সঙ্ঘের প্রসঙ্গ নিতান্ত আনমনে শুনেছে পুণ্যবর্ধন। কোনও গুরুত্ব দেয়নি। একপক্ষে এসব ভালোই। পুরস্ত্রীদের মনোযোগ সৎপ্রসঙ্গে আকৃষ্ট করে রাখে। বিক্ষিপ্ত হয়ে দেয় না। মা বিশাখার প্রশংসা করছিলেন সারাক্ষণ। সে যে কত পুণ্যবতী, কর্মিষ্ঠা সে সবের বিবরণও তাকে শুনতে হল। এ সকলই তার প্রজ্জ্বলন্ত বাসনায় ইন্ধনস্বরূপ। না। পুণ্যবর্ধন আর ভুল করবে না। সে প্রতীচ্যের ধীমান পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে এসেছে। তেমনি আচরণ করবে। কিন্তু বিশাখা কোথায় ?

নিশা প্রায় মধ্যযাম। পুণ্যবর্ধনের কক্ষের প্রদীপ সহসা বাতাসের ফুৎকারে নিবে গেল। দ্বার বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। পুণ্যবর্ধন ডাকল—বিসাখা।

—বলুন প্রভু।

আশ্চর্য হয়ে আবার দীপ জ্বালল পুণ্যবধন, কাকে সাড়া দিচ্ছে তার পত্নী ? বিশাখা শয্যাপ্রান্তে বসে আছে। বদ্ধাঞ্জলি। চোখ দুটি আধবোজা।

—বিসাখা, কাকে নমস্কার করছ প্রিয়ে, আমি কি তোমার নমস্কারের যোগ্য ?

—যিনি যোগ্য তিনি গ্রহণ করুন।

—বিসাখা, এই কয় বৎসর যা চাও আমি তাই করেছি। বলতে বলতে পুণ্যবর্ধন বিশাখার গলায় হারটি পরিয়ে দেয়।

—সুখী হলাম। আপনার কল্যাণ হোক।

—প্রশ্ন করলে না তো কী কী করেছি ?

—বলুন শুনছি।

—ধন উপার্জন করেছি। প্রভূত। বাণিজ্যকর্ম শিখেছি ভাল করে। বহু দেশ দেখলাম—গান্ধার, কাশ্মীর অবধি। আর...আর বিসাখা গণিকাগৃহে যাইনি একবারও।

—ভাল করেছেন। তথাগতর পঞ্চ নিষেধের অন্যতম হল ব্যভিচার।

—কে এই তথাগত ? পঞ্চনিষেধ কী ?

—তথাগত কে ধীরে ধীরে জানতে পারবেন। তিনি মহামানব, আপনার আমার মতো সাধারণ গৃহীকে সুন্দর জীবনযাপন করবার জন্য পঞ্চশীল পালন করতে বলেন — ব্যভিচার নয়, পরদ্রব্য হরণ নয়, মিথ্যাভাষণ নয়, জীবহিংসা নয় ও সুরাপান নয়।

পুণ্যবর্ধন বলল—মূল্য না দিয়ে কোনও বস্তুই গ্রহণ করিনি বিশাখা। মিথ্যাভাষণও করিনি, কিন্তু সুরা থেকে সবসময়ে বিরত থাকতে পারিনি। আর মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণকে যদি জীবহিংসা বলো, তা করেছি।

—ধীরে ধীরে হবে। একেবারেই কি প্রকৃষ্ট শীল পালন সম্ভব ; আপনি তো অনেকটাই করেছেন।

এই স্নেহবচনের কোমলতায় আর্দ্র হয়ে, প্রণয়ে বাসনায় বিহ্বল হয়ে পুণ্যবর্ধন পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করল। তার উত্তরীয়ের বাতাসে প্রদীপ নিবে গেল।

—করুণা কর, করুণা কর হে তথাগত, এ তনুমনপ্রাণ সেই তাঁকে সমর্পণ করেছি প্রভু। এই চিদাকাশে তিনি স্বর্ণপলাশের মতো জ্বলছেন। সেই পলাশের ছায়ায় সারাজীবন বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বসে থাকব, কিছু চাইব না, শুধু সেই প্রভা আমাকে ঘিরে থাকবে, তাহলেই সব পারব। যত কঠিনই হোক, যত উৎকট হোক সব সইতে পারব। সব।

অন্ধকারে কোথাও যেন আলো জ্বলল। প্রদীপের শিখা নয়। উল্কার দাউ দাউ আগুন নয়। কোথাও কোনও দুর্লক্ষ্য দীপবর্তিকা। শুধু যার চিত্ত দেখতে চায় সে দেখতে পায়। সেই আলোর রেখা ধরে এগিয়ে আসতে লাগলেন রক্তকাষায়মণ্ডিত এক কাঞ্চনদেহ শ্রমণ। চোখে স্নিগ্ধ প্রেমের দ্যুতি। তিনি শূন্যপথে কক্ষের ঊর্ধ্ব থেকে নিচে নামলেন যেন সামান্য পাহাড়ের ঢাল অতিক্রম করছেন। কাষ্ঠকুট্টিমে তাঁর নগ্ন দুই সুন্দর চরণের শব্দ বাজছে না। আসছেন, আসছেন তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছেন। তার ওষ্ঠ পীড়ন করছে মিগারপুত্ত তিন বছরের সঞ্চিত কামনায়, স্তনবৃন্ত বুঝি ছিঁড়ে গেল তার নিষ্ঠুর পিপাসায়। নীবিবন্ধ খুলে যায়। উদ্ধারিণি মন্থনে অধো-অরণিতে আগুন জ্বলে, বিশাখা অলৌকিক আনন্দে কাঝায় বাহুতে মাথা রাখে, আবিষ্ট চোখে শুধু আলোকসম্ভব এক দৃষ্টিপাত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসে। রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চে, বর্ণনার অতীত হর্ষের সমুদ্রে সে আশিরবক্ষযোনি স্নান করে ডুবে যায়, শুধু চৈতন্যটুকু ভাসতে থাকে।

এইভাবেই বিশাখার পর পর যমজ এবং একক সন্তান হয়— হর্ষ এবং মিত্র, তারপর সিরিমা ও সুমেধা, তারপর লৌহিত্য, পিঙ্গলা, তারপর রোহণ ও সবিতর, তারপর অনোমা, বিশ্বন্তর। কিন্তু দশটি সন্তানের জন্ম দেবার পরও বিশাখার কুক্ষিদেশ শিথিল হয় না, শ্রোণি অতি বিস্তৃত হয় না, কটি থাকে নির্মেদ, মুখশ্রী প্রফুল্ল, সরল কিশোরশ্রীমণ্ডিত। এবং মিগার গৃহিণীসহ গৃহের যতেক পুরস্ত্রী গৌরব করতে থাকেন। —সে কি, তোমরা জানতে না আমাদের সুহ্না যে বয়ঃ কল্যাণী। আমৃত্যু বিশাখা এইপ্রকারই থাকবে। পুন্ন বদ্‌ধন ধরে বসেছিল যে পঞ্চকল্যাণী কন্যা না হলে বিবাহ করবে না। তাই তো সন্ধান করে করে আসমুদ্র হিমাচল জম্বুদ্বীপ ছেনে ছেনে এমন রত্ন আনা হয়েছে।

—আসমুদ্র হিমাচল ? সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলিতেও যাওয়া হয়েছিল নাকি ?

—না তা হয়নি অবশ্য।

—তবে হিমাচল ?

—তাও হয়নি। কেন যেতে হবে ? এই সাকেতেই পাওয়া গেল কি না !

তবে এসব অনেক পরের কথা।

৫

আজ অতি প্রত্যুষে স্নান সেরেছেন সুমনা। তাঁর হৃদয়ে আজ অভ্যন্ত প্রশান্তি। কয়েকদিন আগেকার তমিস্রা যেন মন্ত্রবলে কোথায় অপসৃত হয়েছে। কহ্না তাঁর মাথায় উপর স্নিগ্ধ জল ঢালছে। হাত পা সব ভালো করে মেজে দিচ্ছে ধনপালী। সুমনা হাসিমুখে তাড়না করছেন ধনপালীকে— হয়েছে, হয়েছে আর কত মাজবি ? পা দুটি যে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

ধনপালী বলে—আর একটু দেবী, আর একটু ধৈর্য ধরুন। বসন্ত সমাগমে পুরাতন ত্বকগুলি জীর্ণ হয়ে নূতন ত্বক জন্মাচ্ছে, সেই নূতন ত্বককে পথ করে দিতে হবে তো ! আর ওই নূতন ত্বকের বর্ণ হল পদ্মের কোরকের মতো। আমি মেজে মেজে আপনার ত্বক রক্তবর্ণ করিনি দেবী !

—ভালো ভালো পালি, প্রসাধনাচার্যা পালি, বিসাখার কাছে যে শুনলাম লিপি অভ্যাস করছিস, কী হল ?

কহ্না উত্তর দিল—তা যদি বলেন দেবি, ও সবে পারদর্শী হয়ে উঠছে ময়ূরী। আমরা দুজনে ওই যে বললেন প্রসাধনাচার্যা...

সুমনা হেসে বললেন—আচার্যা হলে কী কী শেখাবি কহ্না !

ধনপালী বলল— ও কী জানে ! আমি কী শেখাবো শুনুন। প্রসাধনে প্রথম স্থান সংবাহনের। এতে দেহে রক্তগুলি অবাধে চলাচল করতে পায়, ফলে ত্বকে আসে দীপ্তি, সংবাহনের পর প্রাণশক্তি কর্মশক্তি দ্বিগুণিত হয়ে যায়। সংবাহনের প্রক্রিয়া আছে, সঠিক না জেনে করলে লাভের চেয়ে হানিই অধিক।

—এই বিদ্যাটি কি তুই কুক্ষিগত করে রেখে দিবি ঠিক করেছিস ?

ধনপালী বলল—তা নয়, কিন্তু যথার্থ শিষ্যা না পেলে শেখাবোও না।

কহ্না বলল—না দেবি সংবাহনই সব নয়। দুগ্ধস্নান করলে ত্বকের কোমলতা, মসৃণতা বাড়ে, আর গৌরবর্ণা হতে হলে হিঙ্গুলচূর্ণ ব্যবহার করতে হয়। চর্মার হিঙ্গুল ব্যবহার করলে শঙ্খশ্বেত বর্ণ হবে, হরিদ্রাভ বর্ণ যদি চান তো শুকতুণ্ডক হিঙ্গুল চাই, আর পদ্মকোরকের মতো বর্ণ পেতে হলে হংসপাদ হিঙ্গুলই প্রশস্ত। তবে দীর্ঘদিন হিঙ্গুল ব্যবহার করা ভালো নয়, পারদ আছে তো ! ত্বকে যাতে কোনপ্রকার ব্যাধি না-হয় সেইজন্যই হরিদ্রা কাঁচা অবস্থায় পেষণ করে প্রলেপ লাগানো উচিত।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনপালী ও সুমনা হাসছেন দেখে কহ্না অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেল।

সুমনা বললেন—আমাদের সাকেতের গৃহে যে নিষাদ-দাসী রন্তিকা রয়েছে ওর গাত্রবর্ণ শ্বেতকাঞ্চন করতে পারিস ?

কহ্না বলল—আপনি পরিহাস করছেন দেবী, কিন্তু নিয়মিত এগুলি ব্যবহার করলে রন্তিকারও গাত্রবর্ণের উন্নতি হবে, তবে প্রয়োজনই বা কী। দেবী উপ্‌পলবননাকে দেখেছেন ? নীল পদ্মের অভ্যন্তরের মতো গাত্রবর্ণ। কী অপরূপ সুন্দরী ! বিসাখা ভদ্দার রূপ যদি বসন্তের সকাল হয়, যখন চতুর্দিকে গাছে গাছে পত্রোদ্গম হচ্ছে, সূর্যরশ্মি বক্রভাবে পড়ছে নির্মল তড়াগের জলে, তা হলে উপ্‌পলবন্‌না যেন শীতরাত্রির আকাশ। নক্ষত্রময়, কৃষ্ণদীপ্তি। স্তব্ধ, বোধের অতীত, অনুপাখ্য।

—কে বলে কহ্না তুই প্রসাধনচর্যা ছাড়া আর কিছু শিখিসনি—সুমনা বললেন, তাঁর মুখে কৌতুকের সঙ্গে প্রশংসার, অভিব্যক্তি মিশে আছে।

কহ্না লজ্জা পেয়ে নীরব হয়ে গেল। কিন্তু ধনপালী উৎসাহিত হয়ে বলল—কহ্না আজকাল অনেক সূক্ত রচনা করে দেবী, ওকে বলতে বলুন। ওর কিন্তু সত্যই নতুন নতুন ক্ষমতা জন্মাচ্ছে। একমাত্র বিসাখা ভদ্দা ছাড়া আর কারও সাক্ষাতে বলে না।

কিছুক্ষণ সাধ্য-সাধনার পর কহ্না সুমনার স্নান শেষ করিয়ে তাঁর গায়ে একটি স্থূল পট্টবসন জড়িয়ে দিল। তারপর নতমুখে ধীরে ধীরে বলতে লাগল—

নখের প্রভায় মূর্ছা যায় লোকে
এতো রূপ !
দু হাতে বর্ষণ করেও ফুরোয় না
এতো ধন।
জয়ধ্বনি ওঠে দিকে দিকে
এতো যশ !
শুধু দর্পণে বিম্বিত দেখি দাসী।

বিস্মিত চোখে কহ্নার দিকে চেয়ে সুমনা বললেন— কহ্না, পালী, বিসাখা তোদের মুক্তি দিয়েছে না !

ধনপালী বলল—হ্যাঁ দেবী, আমরা যেদিন ইচ্ছা চলে যেতে পারি। কিন্তু যেতে ইচ্ছা হয় না।

কহ্না ধীরে ধীরে বলল—কোথায়ই বা যাবো দেবী ?

—বিসাখা তোদের বিবাহের ব্যবস্থা করছে না ?

—বিবাহ করলেও তো দাসীই থাকব !

সুমনা চমকে উঠলেন, কহ্না বলল—কারও না কারও ইচ্ছাধীন তো থাকতেই হবে।

—স্বেচ্ছাচারী হতে চাস !

—স্বেচ্ছাচারেই বা সুখ কই ! সেও তো স্বভাবের দাসীত্ব দেবি !

—তা হলে তোর বিচারে মুক্ত কে ? আমাকে মুক্ত মনে করিস !

—না দেবি ! গহপতি আপনাকে বাঁধেন না, আপনার অনেক ধন, অনেক রূপ, কিন্তু কই মুক্ত আপনি ! কার ইচ্ছায় কদিন ধরে আপনার মুখ আঁধার ছিল ? আহারে রুচি ছিল না। প্রসাধনে মন ছিল না, দুঃখিনী অনাথার মতো ভূমিশয্যা অবলম্বন করেছিলেন ?

আবার কার ইচ্ছায় এমন করে হেসে উঠেছেন ? কহ্নার সঙ্গে পালীর সঙ্গে রসালাপ করছেন ?

—কোথা থেকে এরূপ কথা বলতে শিখলি কহ্না ?

—কী জানি ? কহ্না তার কালো চোখ দুটি সুমনার দিকে পরিপূর্ণ মেলে বলল।

—তুই কি ভিক্ষুণী হবি, কহ্না ?

—স্থির করতে পারি না দেবী, ভিক্ষুণীদের কুটিরে যাই, সেখানেও শান্তি দেখি না।

—সে কী ? কী দেখিস তবে ?

—ছব্বগ্গীয় (ষড়বর্গীয় ছ জনের দল) ভিক্ষুরা আছে, তারা ভিক্ষুণীদের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়, অশ্লীল বাক্য বলে, পথে ঘাটে দাঁড়িয়ে কৌতুক করে। কিন্তু তথাগত নিয়ম করেছেন ভিক্ষুণীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনও ভিক্ষুদের বিচার করতে পারবে না। নিন্দা করতে পারবে না। তাই নীরবে সব সইতে হয়।

—বলিস কী ? শুনেছিলাম অবশ্য অট্‌ঠগুরুধম্ম আজীবন পালন করার শর্তে মহাপ্রজাবতী ভিক্ষুণীসঙ্ঘ স্থাপন করতে পেরেছিলাম। কিন্তু তাই বলে ভিক্ষুণীদের অপমান হবে, তাঁরা কিছু বলতে পারবেন না ?

কহ্না বলল—জানেন তো দেবী, কয়েকজন ভিক্ষুণী আছেন কেউ কেউ পূর্বজীবনে দাসী ছিলেন। কিংবা দরিদ্রঘরের গৃহিণী ছিলেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন—কী শ্রম ! কী শ্রম। পব্বজ্যা নিয়ে অন্তত তিন প্রকার বক্র পদার্থ থেকে তো মুক্তি পেয়েছি—উদূখল, মুষল ও কুব্জস্বামী। আবার কয়েকজন আছেন, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে যে-গৃহে ভালো ভিক্ষা পাওয়া যায় সেখানে যান, অন্যদের যেতে দেন না সাবধানে গন্তব্য লুকিয়ে রাখেন। ...এখন এই যদি সংসারবিমুক্তাদের অবস্থা হয় তো সেখানে গিয়ে মুক্তি সন্ধান করে কী লাভ ?

সুমনা অবাক হয়েছিলেন। ময়ূরী তাঁর বেশবাস নিয়ে আসতে তিনি যেন বহু দূর থেকে ফিরে এলেন।

ময়ূরী বলল—দেবী এত কী চিন্তা করছেন ?

ধনপালী বলল—দ্যাখ না, কহ্না একরাশি কথা বলে দেবীকে উৎকণ্ঠিত করল।

কহ্না হাত জোড় করে মার্জনা চাইতে যাচ্ছিল, সুমনা তার হাত দুটি ধরে তাকে নিবৃত্ত করলেন, তারপর বললেন—না না পালি, ও কথা বলিস না, আচ্ছা কহ্না ভিক্ষুণী সঙ্ঘের মধ্যে আর কেমন নারী দেখিস ?

—সকলে তো আর এক স্থানে থাকেন না দেবি, যেমন যেমন পান তেমন তেমন থাকেন, ভিক্ষুদের জন্য ওইরূপ রাজকীয় বিহার, ভিক্ষুণীদের জন্য কিছুই নেই। সন্তানশোকে অধীর হয়ে যাঁরা পব্বজ্জা নিয়েছেন যেমন ভিক্ষুণী গোতমী, ভিক্ষুণী পটাচারা এঁরা তো সদাই ধ্যানে মগ্ন থাকেন, স্বপ্নচালিতের মতো দৈনন্দিন কর্ম করে যান, শুনছি এঁরাই শীঘ্রই অর্হত্ত্ব লাভ করবেন ; কয়েকজন আছেন যেমন ভদ্দা কুণ্ডলকেশা...জানেন তো ইনি হত্যা করেছিলেন...

—হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, দুর্বৃত্ত স্বামী ভদ্দাকে হত্যা করার অপচেষ্টা করায় ভদ্দা তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়...

—শুনেছি দেবি ; ইনি অত্যন্ত তেজস্বিনী, আমার কেমন ভয়-ভয় করে। আর অগ্‌গসাবিকা খেমা তো রূপে-বৈদগ্ধ্যে অতুলনীয়া, দূর থেকে দেখি যেমন করে মধ্যদিনের সূর্যকে দেখে মানুষে, ভুলতে পারি না তিনি রাজ্ঞী ছিলেন, রাজকন্যা ছিলেন। ভিক্ষুধম্ম গ্রহণ করলেও এইসব সংস্কার, পার্থক্য থেকেই যায় দেবি।

—আর দেবী মহাপ্রজাবতী ? দেবী যশোধরা ?

—ওঁরা তো বৈশালীতে। বৈশালীতেই সবচেয়ে বড় ভিক্ষুণী উপসয় (উপাশ্রয়) তো !

সুমনা বেশবাস শেষ করে নিলেন। অনেকদিন পরে তাঁর হৃদয়ের মধ্যে আবার সেই প্রথম যৌবনের স্মৃতি। কুশাবতী মল্ল...কুশাবতী মল্ল। সমস্ত হৃদয় দিয়ে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করে থাকেন, তিনি হলেন কুশাবতীমল্ল। স্বরূপমল্ল ও কুশাবতীমল্ল। তাঁকে কত শিখিয়েছিলেন এঁরা। ধনুর্বাণচালনা, অসিচালনা, অশ্বারোহণ, মল্লবিদ্যা, হস্তি-বিদ্যা, শিখিয়েছিলেন দৌত্যকর্ম, রাষ্ট্রশাসনের মূল নীতিগুলি। কী উৎসাহ তখন ! কী তেজ ! প্রতিটি দিন মনে হত এই জীবন আমার, এই পৃথিবী আমার, এই আকাশ-বাতাস সবই বড় অনুকূল। স্বরূপমল্ল বলতেন— আকাশে সূর্যের মতো বাঁচতে হয়। বিমল শক্তি ও বোধির নম্র বিভায় ধীরে ধীরে মনুষ্যকুল আলোকিত করে, তারপর তেজে সব ক্ষুদ্র, অশুভ বস্তু পুড়িয়ে দিয়। স্বরূপের মত ছিল, নারী পুরুষ সবাইকে অস্ত্র ধরতে জানতে হবে। এখনও সুমনা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন স্বরূপের কণ্ঠস্বর : মল্লদের একসময়ে ছিল গোষ্ঠীজীবন। পশুপালন, মৃগয়া, রন্ধনাদি গৃহকর্ম, শিশুপালন সবই নারী-পুরুষ একত্রে করত। তারপর ভূমি শ্যামস্বর্ণ উপহার দিল, তখনও পাশাপাশি কস্‌সন করেছে নারী-পুরুষ, বীজবপন ও শস্য কাটার কাজ নারী, ভূমি প্রস্তুত, ভূমিতে লাঙল দেওয়া পুরুষ। শিশু যতদিন না একটু বড় হত মা গৃহে থাকত, শস্য বাছা, মণ্ড প্রস্তুত করা, চক্র ঘুরিয়ে মৃৎপাত্র নির্মাণ করা—এই সকল করত। তারপর বিদ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলো। বালক-বালিকা তখনও একত্রে বিদ্যা শুনেছে। সঞ্চিত সম্পদ বাড়ল, গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার, সম্পদ আগে গোষ্ঠী পেত, এখন বিবাদ আরম্ভ হল, গোষ্ঠী পিতা গোষ্ঠীমাতা হয়ত অন্যায্য কর্ম করেছিলেন কোনও সময়ে, তাঁদের কথা কেউ মানল না, সব পিতারা একত্র হয়ে স্থির করল, তাদের সন্তানরা তাদের সম্পদ পাবে, নারীরাও অন্য কারো সন্তান যাতে ধারণ করতে না পারে, তাই তাদের স্বচ্ছন্দতা বন্ধ হতে থাকল, বন্ধ হল যুদ্ধ, বন্ধ হল বিদ্যা। এখন সেই মল্লরা কোথায় ? জম্বুদ্বীপের ভূমিতে মল্ল-চিহ্ন না থাকারই মতো। কুশাবতী সেই বীর মল্লনারীদের শেষ চিহ্ন। কুশাবতীর বংশ বাঁচিয়ে রেখেছিল অস্ত্রবিদ্যার চর্চা। সেই কুশাবতীর ভাই বন্ধুল ও তার পত্নী মল্লিকার সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হল। ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন সুমনা। সেই বন্ধুল যিনি ছিলেন মল্লকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অসিচালক, ধনুর্গ্রহ, তক্ষশিলায় পসেনদির সতীর্থ। ষড়যন্ত্র করে মল্লরা এই বীরপুরুষকে এমন ক্ষুব্ধ করল যে তিনি চলে গেলেন কোসল রাজ্যে। নিজের স্বাধীনতা চিরদিনের মতো বিসর্জন দিয়ে। মল্লিকার কাছে শুনছিলেন কীভাবে তার প্রথম সন্তান হবার সময়ে দোহদ পূর্ণ করতে বন্ধুল তাকে বৈশালীর অভিষেক হ্রদে স্নান করিয়ে এনেছিলেন। ওই হ্রদে শুধুমাত্র সংস্থানায়কদের অভিষেকস্নান হয়, সারাক্ষণ প্রহরা থাকে। মল্লিকাকে নিয়ে বন্ধুলের রথ যখন শ্রাবস্তীর দিকে ছুটে চলেছে প্রহরারত সৈনিকেরা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে। একটি সংকীর্ণ পথে যখন তারা দীর্ঘ একটি পঙ্‌ক্তিতে আসছিল, তখন বন্ধুল একটিমাত্র তীরে তাদের সবাইকে বিদ্ধ করেছিলেন।

কুশাবতীর কণ্ঠ শুনতে পান তিনি, তখন তাঁর চোদ্দ বছর বয়স, সবে রজোদর্শন করেছেন। কুশাবতী করুণ স্বরে বললেন—প্রকৃতির পাশে বাঁধা পড়ে গেলে সুমনা। এখন থেকে প্রতিটি পুরুষকে ভয় করে চলতে হবে পাছে সে তোমার গর্ভে অবৈধ সন্তান উৎপন্ন করে।

সুমনা বলেন—কেন আচার্যা, ছুরিকা রাখব সঙ্গে, তাছাড়া মল্ল কৌশলগুলি তো আছেই!

—তা সত্য। কিন্তু এগুলি প্রয়োগ করতে হবে, এটাই কি চরম দুঃখের কথা নয় ? যার সঙ্গে একদিন পাশাপাশি কাজ করেছি, বিদ্যাভ্যাস করেছি, যুদ্ধ করেছি, যার প্রণয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তার বিরুদ্ধে আজ অস্ত্রধারণ করতে হচ্ছে এর চেয়ে সর্বনাশ আর কিছু আছে ?

—কেন আচার্যা, পূর্বে কি পুরুষরা নারীদের প্রতি বলপ্রয়োগ করত না ?

—কখনোই না। কোনও নারীর প্রতি আকর্ষণ জন্মালে, অনুরাগ জন্মালে তাকে প্রণয়-সম্ভাষণ করত মল্লপুরুষ, নারীর যদি তাতে অনুরাগ জন্মাতো তখনই তারা মিলিত হত।

—কিন্তু এই যে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিবাদ, কৌমে কৌমে যুদ্ধ। তখন তো শুনেছি, বিজিত নারীদের যথেচ্ছ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হত, অত্যাচার করা হত।

—তখন নারী অস্ত্র ফেলে দিয়েছে সুমনা।

—সেই সময়ের থেকে অন্তত আমরা ভালো আছি। তাই নয় আর্যে!

—তা ঠিক। কিন্তু নারীর গর্ভধারণ ও প্রজাবৃদ্ধির ওপর এত গুরুত্ব দেওয়ায় নারীর সর্বনাশ তো হচ্ছেই, সমাজেরও সর্বনাশ হচ্ছে।

—কী ভাবে ? —সুমনা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, প্রজাবৃদ্ধির অর্থ তো শক্তিবৃদ্ধি ?

—সুমনা, প্রিয় শিষ্যা আমার, যত প্রজাবৃদ্ধি হবে এই ভূমির জন্য, সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা, বিবাদ ততই তীব্র হবে। ততই উদ্‌বৃত্ত হয়ে যাবে মানুষ। দেখো না, আমাদের গৃহে গৃহে কত দাস-দাসী! একটি পুরুষ অন্তত তিনটি কি চারটি স্ত্রী রাখছে। প্রতিটি স্ত্রীর যদি দশটি সন্তান হয়, তাহলে এক পরিবারে এক প্রজন্মে চল্লিশজন প্রজা বেড়ে যাচ্ছে। ভূমিতে আর কুলোচ্ছে না। নূতন ভূমি প্রয়োজন হচ্ছে। নূতন ভূমি না পাওয়া গেলে কয়েকটি মানুষ উদ্‌বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে আমি চোখের সামনে দেখতে পাই সমগ্র পৃথিবী প্রজায় ভরে গেছে, তাদের ভরণ করবার মতো ক্ষেত্রভূমি, বনভূমি, চারণভূমি নেই। পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে লাঙলের আঘাতে, আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে মুক্ত ভূমি। পুষ্করিণী, নদী সব নানারূপ মলে পরিপূর্ণ। বাতাস কলুষিত হয়ে যাচ্ছে এবং দাসেদের আর্তনাদে পরিপূরিত হচ্ছে এই জম্বুদ্বীপ। কয়েকজন মাত্র প্রভু, আর সবাই দাস। নারীরা তো দাসী বটেই। গৃহদাসী, গর্ভদাসী, রূপদাসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃশাবতীর মতো চিন্তা করতে কাউকে আজ অবধি দেখেননি সুমনা। আজ কহ্লার কাছ থেকে শুনলেন গৃহশ্রমের বিপুল ভার থেকে মুক্তি পেতে প্রব্রজ্যা নিচ্ছেন নারীরা, অবাঞ্ছিত স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেতে নিচ্ছেন। সন্তানহারা জননী, প্রেমবঞ্চিতা রমণী যে প্রব্রজ্যা নেন তা তিনি আগেই জানেন। এ নিয়ে হয়ত এত চিন্তা করতেন না, যদি না তাঁর নিজের কন্যাকে নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিত। বিশাখা, যাকে তিনি সর্বপ্রকার বিদ্যা, স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তির অধিকার দিয়ে বড় করে তুলেছেন, যে বিশাখা রূপে গুণে, সেবায়, কর্মে, মহত্ত্বে নারীরত্ন, মনুষ্যরত্ন সেই বিশাখাকে কিনা বিবাহ করতে হল কৃপণ, নীচমনা মিগারের কুলে, তার নীচমনা, রমণীর মতো দেখতে পুত্র পুণ্যবর্ধনকে ! হ্যাঁ, তাঁর কোনই সন্দেহ নেই পুণ্যবর্ধন একটি অতি সাধারণ পুরুষ, বিশাখার স্বামী হবার কোনও যোগ্যতাই তার নেই। তাঁর নিজের এই-ই ধারণা। ধনপালী তাঁকে সামান্যই ইঙ্গিত দিয়েছে, খুলে বলেনি কিছু, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ কাউকে দোষ দিতে পারেন না। ঘটনাচক্র, ভবিতব্য এ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশাখার অতিরিক্ত বুদ্ধভক্তির মূল কারণ যে তার এই বিপুল অশান্তি ও হতাশা, প্রেমহীন জীবনের ঊষরতা সামনে দেখে তাঁর কন্যা যে তথাগতর শরণ নিয়েছে এতে তাঁর সন্দেহমাত্র নেই। তাঁরও না, ধনঞ্জয়েরও না। উপাসক তো তাঁরাও। বিশাখার মতো দুবেলা সঙ্ঘে যাবার প্রয়োজন তো তাঁদের হয় না ! এতো অল্প বয়সে এই কর্মভার ! এ-ও তাঁরা বুঝতে পারেন না। তার জীবনের সর্বব্যাপী অতৃপ্তিকে তাঁর বুদ্ধিমতী সৌম্যস্বভাবা কন্যা কর্মে, সেবায়, আরাধনায় ভুলতে চাইছে। কন্যার চোখের সেই অশ্রুকণা, সেই করুণ ঘোষণা—আমি পরাজয় স্বীকার করবো না মা ! ভাবতে সুমনার হৃৎকম্প হচ্ছে। অথচ এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী ! একবার মোক্ষক্রিয়া করাবার সুযোগ এসেছিল। হল না। মর্যাদাজ্ঞানের গতি অতি সূক্ষ্ম। তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বিশাখা তো প্রস্তুত ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেই অবাঞ্ছিত পতিসঙ্গ যা মনে করতেও তার মুখ শুষ্ক হয়ে যায় সেই ভবিতব্যই মেনে নিল কন্যা। তাঁর তো সাকেত ফেরবার সময় এসে গেল। বিশাখার মুখে কদিন গভীর আনন্দের বিভা দেখেছেন। সুমনা চিন্তাশীল—যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ বিশাখার আচরণে কেন ? এ রহস্য তাঁকে ভাবায়। কিন্তু স্বভাবে তিনি আনন্দময়ী। কন্যার সুখ তা যে ভাবেই আসুক, তাঁকে সুখী করেছে। তিনি অনুভব করছেন বিশাখা তাঁর গর্ভ থেকে ছিন্ন হচ্ছে। কোন্ পৃথিবীতে সে প্রশ্বাস নেবে, কোন্ ভূমির অন্ন গ্রহণ করবে, কোন্ নদীর জল সে পান করবে এখন সে নিজে স্থির করে নিচ্ছে। সুমনার ভূমিকা সেখানে নেই।

তিনি সস্নেহে কহ্লাকে বললেন—আমার সঙ্গে সাকেতে যাবি ?

কহ্লা বলল—যাবো, যাবো দেবী। নিশ্চয় যাবো।

অপরাহ্নে আজ শেষবারের মতো জেতবনে গিয়ে সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হলেন সুমনা। উৎপলবর্ণা, সেই নীলোৎপলের মতো বর্ণ, নীলোৎপলের মতো চোখ, নীল জ্যোৎস্না রাত্রির মতো কেশ, উৎপলবর্ণা প্রব্রজ্যা নিয়েছে। সঙ্ঘে একটা চাপা উত্তেজনা, শ্রমণাদের মধ্যে দমিত উল্লাস, সমবেত শ্রাবকদের মধ্যে সম্ভ্রমমিশ্রিত বিষাদ লক্ষ্য করলেন সুমনা। উৎপলবর্ণা বহু যুবকের বাঞ্ছিত ছিল। সে অধিক কথা বলত না। বিশাখার মতো হাস্য-পরিহাসে পটু ছিল না। বিশাখা মৃদুস্বরে বলল—মা, আমি জানতাম এইরূপই হবে।

—কেন ? সুমনা জিজ্ঞাসা করলেন, —উৎপলবর্ণা কি একথা বলেছিল ?

—না মা, উপ্‌পলবন্‌নার কথা বড় দুঃখের।

—মুখভাব দেখে যেন সেইরূপই মনে হত। কিন্তু কেন ?

—ওর পিতা সেট্‌ঠি হলেও সুদত্তপমুখের মতো ধনী নন। ও বড় হতে না হতেই যোগ্য-অযোগ্য নানা প্রকার আঢ্য যুবক, প্রৌঢ়, ধনী রাজ-অমাত্য, তাঁদের পুত্রেরা সব ওর পাণিপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি জানি উপ্‌পলবন্‌না তার এক মাতুলপুত্রের অনুরাগিণী ছিল। এত সব ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ওকে বিবাহ করতে চাইছিলেন যে ওর পিতা অত্যন্ত বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। একজনের সঙ্গে বিবাহ দিলে অন্যান্যরা ক্রুদ্ধ হবেন। আর মা, সাবত্থিতে অমাত্যদের রাগিয়ে কেউ থাকতে পারে না। আমার অনুমান, নিরুপায় হয়ে উপ্‌পলবন্‌নার পিতা তাকে সঙ্ঘপ্রবেশ করতে পরামর্শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন।

সুমনা অন্যমনা হয়ে বললেন—দর্পণে বিম্বিত দেখি দাসী...

—কী বললে মা! —বিশাখা জিজ্ঞেস করল।

—কিছু না বিসাখা, ভাবছিলাম অম্বপালীর কথা। বহু ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল বলে সে গণিকা হল। আর এই উপ্পলবন্না হল শ্রমণা, একই কারণে।

—মা, উপ্পলবন্নার ভাগ্য দেবী অম্বপালীর থেকে ভালো নয়? —বিশাখা মায়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

সুমনা বলেন— মূলত দুজনের ভাগ্যই এক, একেবারে এক। ভেবে দেখো বিসাখা, নিরুপায় রমণী। এত রূপ-গুণ, কিন্তু পুরুষের ইচ্ছার অধীন। সমাজের নিয়ম-নীতিগুলি তো পুরুষরাই গড়ে।

—মা, পুরুষরা না-গড়ে যদি নারীরা গড়ত, তাহলে সমাজ কেমন হত?

সুমনা সহসা উত্তর দিতে পারলেন না।

—অন্ততপক্ষে ভিক্ষুণী বা স্বৈরিণী হওয়া তার ইচ্ছাধীন থাকত। —একটু ভেবে তিনি বললেন।

—আচ্ছা মা। নারী কি পুরুষকে এভাবে অধীন রাখতে পারতো? পুরুষের বাহুবল তো অধিক।

—বিসাখা, নারী ইচ্ছা করলে অনুশীলন করলে, বলে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে তুমি তো জানো।

—তাহলে কি এখন পুরুষ অধিকাংশই যেমন স্বেচ্ছাচারী, ব্যভিচারী, নারী, তেমন হত?

সুমনা চিন্তা করে বললেন— হয়ত। কিন্তু নারীকে গর্ভে সন্তানধারণ করতে হয় বলে সে পুরুষের মতো ব্যভিচারী হতে পারে না বিশাখা। প্রকৃতি তাকে বাধা দেয়। কিন্তু তুমি নারীর গড়া সমাজের কথাই বা ভাবছো কেন? এমন সমাজও তো হতে পারে যেখানে উভয়ে মিলে নিয়মগুলি গড়ে। কারুরই অধিকতর প্রাধান্য নেই!

—কিন্তু মা বাহুবলের যেমন সাম্য হয় না, বুদ্ধিবল, অর্থবল, এগুলিরও তো কোনও সাম্য দেখি না। আর যারই ক্ষমতা একটু অধিক, সে অল্প ক্ষমতার মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করে। আমাদের সেট্‌ঠিদের অর্থবল অধিক বলে কত মানুষকে আমরা কিনে রেখেছি। আমাদের বুদ্ধিবল, বিদ্যাবল অধিক বলে, এসব বল যাদের অল্প তারা আমাদের সম্ভ্রম করে। আর দণ্ডনীতি রাজা ও রাজপুরুষদের হাতে বলে তাঁরা সবাইকার ওপর কর্তৃত্ব করেন। নারীই গড়ুক, পুরুষই গড়ুক এই ক্ষমতাভেদ থাকবেই।

সুমনা চিন্তিত হয়ে বললেন— তুমি তো ঠিকই বলেছো বিসাখা, তুমি এই ক্ষমতাভেদের বিষয়টি কী করে চিন্তা করলে?

—মা, আমি মহিষী মল্লিকাদেবীর কাছে যাই, সেনাধ্যক্ষ বন্ধুল ভদ্র ও তাঁর পত্নী দেবী মল্লিকার কাছে যাই, গহপতি প্রতদ্দন ও সুনক্ষত্তর গৃহেও যাই। অমাত্য আর্য মৃগধর, আর্য সিরিভদ্দ এঁদের গৃহেও আমার যাতায়াত আছে। মা, সাকেতে আমি নিজ গৃহসীমা, পরিবারসীমার মধ্যে থাকতাম, অত দেখিনি। এখানে কত দেখি, তা ছাড়াও এখানে মহাত্মাদের কথা শুনি ধম্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্ত, স্থবির মহামোগ্‌গল্লান, ভিক্ষুণীদের কথাও শুনি। শুনে শুনে দেখে দেখে এইটুকু বুঝেছি।

—মহামোগ্‌গল্লান বা থের সারিপুত্ত কোনও বিকল্পর কথা বলেন না?

—বলেন মা, তথাগত যা বলেছেন তা-ই বলেন, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা।

—এইগুলি তো ব্রহ্মবিহার? ধ্যানের বিষয় বিশাখা!

—হ্যাঁ, মা তাই। কিন্তু আমি ভাবি শুধু ধ্যান কেন, এগুলি তো আমাদের দৈনন্দিন কর্মেরও বিষয় হতে পারে। সর্বপ্রকার জীবের প্রতি শুধু মৈত্রীভাবনা নয়, মৈত্রী পূর্ণ ব্যবহারের অভ্যাস যদি আমরা করি, যদি করুণার অনুবর্তী হয়ে সবার দুঃখমোচনের চেষ্টা করি, সুখী ব্যক্তির সুখ স্থায়ী হোক এভাবে চিন্তা করি, যদি ভাবি সকল জীবই সমান, কেউ কারো থেকে অধিক প্রীতি বা অধিক ঘৃণার পাত্র নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবল-দুর্বল, ধনী-দরিদ্র, বৃদ্ধ-যুবা, সুন্দর-অসুন্দর সকলে সমান, তাহলে ?

—কন্যা, তুমি নিজেই তো বললে ক্ষমতাভেদ জীবজগতের নিয়ম। তাকে মানুষ কী করে অতিক্রম করবে ?

—ক্ষমতায় সমান হওয়া সম্ভব নয় মা, এবং তা হলে জগৎ-সংসার সুষ্ঠুভাবে চলাও দুষ্কর। কিন্তু মৈত্রী ও করুণার পূর্ণ ব্যবহার করতে তো কোনও অসুবিধা নেই ! ক্ষমতাভেদ, কর্তব্যভেদ, কৃতিভেদ থাকলো। কিন্তু বিচারভেদ, দৃষ্টিভেদ রইলো না। ভিক্ষুরা নির্জনে বসে এই চতুর্ভাবনা এবং আরও একটি ভাবনা 'অশুভ' অর্থাৎ আমাদের দেহ ঘৃণিত বস্তু, জীবন জন্মমৃত্যুর অধীন—এই ভাবনা অভ্যাস করেন। কিন্তু আমরা গৃহীরা সদাই নানাপ্রকার কর্মে নিরত, যদি মৈত্রী-তত্ত্বকে কেন্দ্র করে আমাদের ব্যবহারিক জীবন চালিত করতে পারতাম ! তবে, একমাত্র তবেই সেই বিকল্প সমাজ গড়ে উঠতে পারত।

সুমনা হেসে বললেন— বিশাখা, ধরো তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুকুলের প্রচারগুণে, প্রভাবগুণে মানুষ তোমার এই মৈত্রীভাবনায় প্রতিষ্ঠ হল। এক আদর্শ সমাজ, আদর্শ লোকব্যবহার, আদর্শ জীবনযাত্রা আমরা সবাই পেলাম। তখন তোমার তথাগত বুদ্ধর নির্বাণের কী হবে ? দুঃখ-দুর্দশার অংশটুকু বাদ গেলে তো এ জীবন পরম সুখময়। নির্বাণামৃতের জন্য তখন কে-ই বা সংসার-ত্যাগ করবে ?

—বিশাখা বলল— মা, তথাগত বুদ্ধ তাঁর ধম্মকে নদীপারাপারের ভেলা বলেছেন, নদী পার হয়ে গেলে যেমন ভেলা ত্যাগ করা যায়, সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে গেলে আমরা তেমনি তথাগতোক্ত ধম্ম ছেড়ে দিতে পারি। কেউ নিষেধ করছে না তো ? তা ছাড়া মৈত্রীসাধনায় মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় কমবে। কিন্তু সেই আধিদৈবিক অশুভগুলি ব্যাধি-জরা-মৃত্যু—এসব কি যাবে ? নির্বাণপদের জন্য আকূতিও মানুষের থাকবেই।

দেশনা-স্থলের যেখানে মাতা-পুত্রীতে এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল, সেখানে তাঁদের ঘিরে ছিল বিশাখার তিন সখী এবং অদূরে হাঁ করে সে-সব কথা শুনছিল যশ ও নন্দিয়। ওঁরা আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে, বসন্তসন্ধ্যার বাতাস মৃদুমন্দ বইতে লাগল, চিক্কণ আম্রপল্লবগুলি দুলতে থাকল, স্থবির সারিপুত্ত বুদ্ধাসনের একটু পাশে এসে আসন নিলেন। তিনিই আজকে শাস্তা।

নন্দিয় বলল— যশ, কুরুদেশে শুনেছি গামের বালিকারাও তত্ত্বালোচনা করে, পণ্ডিতদের ব্যাকরণের ভুল ধরে, শুনেছো ?

—শুনেছি বই কি। যত বড় বড় পণ্ডিত যেমন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য সব তো কুরুদেশেরই সন্তান।

—দেখো, আমাদের এই মধ্যদেশকে ওরা যতই অবজ্ঞা করুন, একজন ধনীগৃহের বধূ তার মাতার সঙ্গে মৈত্রী ও সাম্য-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছে—এ ব্যাপারে বোধহয় ওরাও আমাদের হারাতে পারবে না।

যশ বলল— তা ছাড়া ওরা করে চর্বিত-চর্বণ'। কতকগুলি সূত্র শিখেছে, সেগুলির প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করেছে। বুদ্ধিও ক্ষুরধার। কিন্তু ইনি, এই দেবী বিশাখা ইনি তো তথাগত বুদ্ধর প্রচারিত একটি তত্ত্বকে কেমন নিজস্ব ব্যাখ্যা দিলেন। যা ধ্যানের বিষয় তাকে কর্মের বিষয় করে নেবার কথা বললেন।

—ওঁর সঙ্গে যে সখীগুলি ছিল লক্ষ্য করেছিলে ? নন্দিয় বলল— বুদ্ধিতে ভক্তিতে যেন রসপাত্রর মতো পূর্ণ।

—ও তুমি তা-ও লক্ষ্য করেছো ? যশ তির্যক কটাক্ষ হানল—তোমার তীর্থিক সংস্কারগুলি অতি দ্রুতই ত্যাগ করছো নন্দিয়।

নন্দিয় অপ্রতিভ হয়ে বলল— হানি হয়েছে কিছু ? তাতে ?

যশ হেসে বলল— না, হানি ঠিক হয়নি। কিন্তু ভাবছি, সেনাপতি সীহর কাছে তথাগতসংবাদ নিয়ে তাহলে তুমি যাবে কী ? তোমার যে রূপ মতিগতি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তুমিই না হয় গেলে ভাই যশ। আবার এদিকে মহামাচ্চ সিরিভদ্দর কম্মটিও তো আছে। আমি না হয়...

"হে ইন্দ্র, হে বরুণ, হে সোম হে অগ্নি এইরূপ প্রার্থনায় কোনও ফল নাই। তোমাদেরই সাধানাগুণে অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধ এইভাবে উত্তরোত্তর দেবত্ব-পদ প্রাপ্ত হতে হবে। তথাগত এই কথাই বলেন, —তিনি বলে থাকেন ; তোমাদের নিজেদের মধ্যে সব আছে। বিপদের সময়ে ঊর্ধ্ব থেকে কোনও দেবতা শক্তি দেন না। তোমাদের চিত্তই সে শক্তি দেয়। এই আত্মশক্তিকে চিনে নাও। ঈশ আছেন কি নাই, আত্মা আছে কি নাই—এমত আলোচনায় কোনও লাভ হয় না। কার উদ্দেশে যজ্ঞ করবে ? যজ্ঞ যদি করতে চাও দান করো। পূজা যদি করতে চাও মাতা পিতাকে করো"...স্থবির সারিপুত্ত তাঁর দেশনা আরম্ভ করলেন।

৬

ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা যেদিন তাঁর নির্জন সাধনকুটিতে ধর্ষিত হলেন, সেদিন জেতবনের দেশনাস্থলী পূর্ণ ছিল। আষাঢ়ি পূর্ণিমার উপোসথের অন্তে তথাগত আবার জেতবনে অবস্থান করছেন। নানা দিক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন অন্যান্য দহর ভিক্ষুরাও। বর্ষাবাসের সময়টি বাদ দিয়ে স্থবির সারিপুত্ত, স্থবির কাশ্যপ, মহা মোগ্‌গল্লান, কৌণ্ডিন্য এঁরা প্রায় সকই বহুজনের হিতের কথা স্মরণে রেখে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়েন। বর্ষা আরম্ভ হলে কোনও বিহারে ফিরে আসেন।

তথাগত যখন সদ্য-সদ্য বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, অমৃত হিল্লোলে হৃদয়ের তট থেকে থেকেই প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে সেই সময়েই তিনি নিজেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবার প্রেষণা অনুভব করেন। তাঁর অন্তরটি যেন বাইরের শরীরকে বহু বহু গুণ ছাড়িয়ে গেছে আকারে, আয়তনে। তা যেন তরল, কিংবা বায়বীয়, যতই ছড়ানো যাবে, ততই পূর্ণ হয়ে উঠবে হৃদয়। কিন্তু...কিন্তু বড় কঠিন যে! মনকে সংবৃত, সংযুত করা বড় কঠিন। এই ধ্যানমার্গ, এই শীল পালন যেমন সহজ, তেমনই কঠিন। এ কি সাধারণজন নিতে পারবে? তথাগত তাঁর নিজস্ব প্রাপ্তির তন্ময়তায় ফিরেই যাচ্ছিলেন। সেই সময় অতি সাধারণ একটি দৃশ্য দেখলেন। সরোবরে পদ্ম ফুটেছে। কোনটি আধফোটা, কোনটি তখনও কোরক, কোনটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত। এমন দৃশ্য তো মানুষ দেখেই থাকে। কিন্তু তথাগত তখন প্রত্যেকটি দৃশ্যকে অলৌকিক প্রভায় বিভাসিত, অর্থময় ঘটনা বলে দেখছেন। তাই দেখলেন—মনুষ্যকুলও অমনি। কারুর বোধিচিত্ত উন্মুখ হয়ে রয়েছে, কেউ এখনও আধো-ঘুমে, সামান্য স্পর্শেই অন্তর জেগে উঠবে। কেউ বা মুদিত কমলকলি। বহু চেষ্টায় তার দলগুলি খোলে কি না খোলে। সকলে নিতে পারবে না বলে যারা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, যারা স্পর্শমাত্রের অপেক্ষায় রয়েছে তাদেরও কি বঞ্চিত করবেন ? তথাগত সেই দিনই মনস্থির করে ফেলেছিলেন।

পরে ইসিপতন থেকে বারাণসী, বারাণসী থেকে রাজগৃহ যেতে যেতে তাঁর শিষ্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল। এদের সবার প্রতিই তাঁর নির্দেশ, সবার মধ্যে বিতরণ করো মৈত্রীতত্ত্ব। করুণা, প্রেম, সহনশীলতা, হার্দিক সহযোগ এইগুলি প্রকৃত মানবলক্ষণ। কর্মময় জীবনের প্রতি মুহূর্তে চর্চা করো সংবেদী হৃদয়ধর্মের, পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করো পঞ্চশীল পালন করে। তার পর অষ্টশীল, তারও পর দশশীল। হৃদয়টি যখন পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে তখন আরম্ভ করবে অমৃত পদের জন্য নিভৃত সাধনা।

এই নিভৃত সাধনাই তো করতে গিয়েছিলেন উৎপলবর্ণা। শ্রাবস্তীর উপান্তে একটি ছোট কুটির বেঁধে দিয়েছিলেন পিতা। আভরণহীন, সামান্য মাটির কুটির। মাটিতে শোওয়া, মাটিতে বসা, কোনদিন ভিক্ষায় বেরোনো, কোনদিন উপান্তবাসীরা কিছু দিয়ে গেলে তাই। আর সমস্ত সময়টা শুধু ধ্যান। উৎপলবর্ণা চিরদিনই শান্তচিত্ত, বাধ্য, বিনীত, ভক্তিমতী। তাকে ঘিরে চতুর্দিকে যে এত মুগ্ধতার ঢেউ, তা উৎপলবর্ণাকে স্পর্শ করে না কোনদিনই। কোন শিশুকাল থেকে মাতুলপুত্র রোহিতনন্দর সঙ্গে তার বন্ধুতা। রোহিতই তার প্রথম, তার একমাত্র। যখন দলে দলে প্রভাবশালী পাণিপ্রার্থী এসে তার পিতাকে অস্থির করে দিতে লাগল, রোহিত বলেছিল তারা দুজনে গোপনে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবস্তী ত্যাগ করে যাবে, চলে যাবে বারাণসী। সেখানে রোহিতের আচার্য গঙ্গাধর আছেন। আরও কিছু সতীর্থ আছে। বারাণসীতেই বাস করবে তারা। কিন্তু অমাত্য সিরিভদ্দর পুত্র দীর্ঘায়ু যেদিন পিতাকে শাসিয়ে গেল কন্যাকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করলে তিনি ধনে-প্রাণে বিপন্ন হবেন, সেই দিনই উৎপলবর্ণা স্থির করে ফেলল বারাণসী যাওয়া হবে না। রোহিত অনেক বুঝিয়েও তাকে সম্মত করতে পারেনি।

সেই রোহিতই রাত্রির তৃতীয় যামে তার উপান্তকুটিরের শিথিলদুয়ার খুলে প্রবেশ করল।

—উপ্‌পলা, উপ্‌পলা...অস্পষ্ট স্বর।

কুটিরের মাটিতে তার কাষায় খবনপাবুরণ বিছিয়ে নিদ্রিত উৎপলবর্ণা। রোহিতের ডাকে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

রোহিত বলল—চলো উপ্‌পলা। দ্রুতগামী অশ্ব সংগ্রহ করে এনেছি। পুরুষের অধোবাস আর উত্তরীয় এনেছি। বেশ পরিবর্তন করে নাও।

রোহিতের একটুও সংশয় ছিল না। কিন্তু উপ্‌পলা তার মাথায় বজ্রপাত করে বলল—সেট্‌ঠি সিরিভদ্দ, সেট্‌ঠি মিগধরের প্রভাব যে সমগ্র কোসলরাজ্যে ছড়িয়ে আছে। বারাণসী নামেই মগধ, ওখানে গিয়েও রক্ষা পাবে না রোহিত, এ কল্পনা ত্যাগ করো।

—বারাণসীও যাবো না তা হলে। কোসল রাজ্যের সমীপে কোথাও যাবো না। রাজগৃহে যাবো।

—রাজগৃহে পৌঁছবার বহু পূর্বেই অমাত্যদের অশ্ব তোমাকে ধরে ফেলবে। কিংবা যদি যেতেই পারো, আরও কত উগ্‌গ কত দীঘ্‌ঘায়ু, কত মিগধর প্রতিদিন তোমার জীবন বিপন্ন করবে, রোহিত তার চেয়ে এই ভালো।—উৎপলবর্ণার কণ্ঠ শান্ত।

—সে ক্ষেত্রে একসঙ্গে মরবো উপ্‌পলা। তুমি ছাড়া আমার জীবন যে অর্থহীন...বলতে বলতে রোহিত উপ্‌পলাকে উন্মাদের মতো চুম্বন করতে লাগল।

—রোহিত, রোহিত, আমি দশশীল পালনের শপথ নিয়েছি, আমি ভিক্ষুণী, আমাকে চুম্বন করতে নেই।

—উপ্‌পলা তুমি ভিক্ষুণী নও, তুমি আমার বধূ। আমার প্রিয়া।

—রোহিত দেখো, আমার মস্তক মুণ্ডিত।

—তোমার অতুলনীয় নীলোজ্জ্বল কেশদাম আবার জন্মাবে উপ্‌পলা।

—রোহিত আমি কাষায় ধারণ করেছি, এই বসনকে কাম দিয়ে অশুদ্ধ করতে নেই।

—তুমি কাষায় বর্ণেও নীলাম্বরের মতোই বাঞ্ছিতা, রোহিতের প্রণয় তোমাকে আরও শুদ্ধ করবে।

—আমি অপ্রাপণীয়া। রোহিত তুমি আমার আশা ত্যাগ করো। অমি ত্রিরত্নের উপাসিকা।

—তোমার ত্রিররত্ন আমি চূর্ণ করে দেবো উপ্‌পলা। রোহিত এবার উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, বুদ্ধ, বুদ্ধ। সবাইকে উদ্ধার করবেন! সকল সমস্যার উত্তর বুদ্ধ!

—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—উৎপলবর্ণা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল।

রোহিত আর সহ্য করতে পারল না।

—দেখি তুমি কী ভাবে বুদ্ধের শরণ নাও—উৎপলবর্ণার কোনও অনুনয়, কোনও নিষেধই সে শুনল না। মানল না।

তার উদ্দাম কামনা শান্ত হলে রোহিত অর্ধস্ফুট উষার আলোয় উৎপলবর্ণার মুখ দেখল। সভয়ে বলল—তুমি কে? তুমি তো আমার উপ্‌পলা নও!

—আমি ভিক্ষুণী উপ্‌পলবন্‌না, তথাগত বুদ্ধের শরণাগত।

রোহিত উদ্‌ভ্রান্তের মতো কুটির থেকে বেরিয়ে গেল। উপান্তবাসীদের অনেকেই ছুটে এলো।

—কে? কে আপনি? পব্বাজিকার কুটিরে কী অভিপ্রায়ে গিয়েছিলেন?

—আমি রোহিত নন্দ। ভিক্ষুণীর ধর্মনাশ করেছি।

উপান্তবাসীরা রোহিতকে ছাড়েনি। কুলপুত্ত হলে হবে কী? সন্ন্যাসিনীর ধম্মনাশ করেছে না! তারা রোহিতকে প্রহার করে। তারপর ছেড়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক শ্রমণেরই আজকের প্রশ্ন—ভিক্ষুণী উপপ্‌লার ধর্ম নষ্ট হয়েছে। তিনি অশুদ্ধ, তিনি কী করে সংঘভুক্ত হতে পারেন ?

গৌতম জিজ্ঞাসা করলেন, ধম্ম ঠিক কোথায় থাকে ? সমনগণ ?

ভিক্ষুদের নিরুত্তর দেখে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় ? হস্তপদে ? না বক্ষে ? না উদরে ? না উপস্থে ? না জানুতে ? কোথায় ?

ভিক্ষুরা চিন্তা করে বললেন—বক্ষেই হবে।

উত্তরাসঙ্গে ঢাকা আছে তোমাদের বক্ষস্থল, ঠিক কোন স্থানে ধম্ম রয়েছে দেখে তথাগতকে দেখাও সমন।

—বক্ষের চর্মে বা মাংসে বা অস্থিতে তো নেই, ভন্তে!

—তবে কি বক্ষটি চিরলে ধম্মকে দেখতে পাওয়া যাবে ?

—না, ভন্তে, ধম্ম হৃদয়ে থাকে হৃদয় বক্ষের মধ্যে হলেও তার অবস্থান নির্দেশ করা যায় না।

—শরীরের মধ্যে যার অবস্থান নির্দিষ্ট করা যায় না, শরীর আক্রান্ত হলে তা নষ্ট হয় কী করে ?

—কিন্তু ভন্তে, মনটি, হৃদয়টি ? তাও কি সংক্রমিত হয়নি ?

—যে ভিক্ষুণীর হৃদয়ে ত্রিরত্নের বসবাস, মার তাঁকে সংক্রমণ করতে পারে না সমন। উপ্‌পলা সকৃদাগামি মার্গে প্রবেশ করেছেন। তিনি শীঘ্রই অনাগামি ফল লাভ করবেন। অর্হৎ হতে তাঁর আর বিলম্ব নেই।

এই সময়ে নিগারমাতা বিশাখা উঠে দাঁড়াল। সে প্রায়ই দেশনা-স্থলে নিজের প্রশ্নগুল অকপটে উপস্থিত করে।

—ভন্তে, একটা কথা। অট্‌ঠগুরু ধম্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুণী সংঘ ভিক্ষুসংঘের ওপর নির্ভরশীল হয়েছে, সংঘ কিন্তু তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করেনি। আজ প্রব্রাজিকা উপ্‌পলবন্নার দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। সংঘে প্রবেশ করেও নারীরা কত অসহায়! সংঘ তার শরণাগত নারীকে রক্ষা করে না।

সামনের পঙ্‌ক্তিতে একজন বয়স্ক শ্রোতা বলে উঠলেন—নারীদের সংঘে প্রবেশ করাই তো অনুচিত। ধর্মাচরণ করতে ইচ্ছা হলে গৃহেই তা করা যায়। নারীরা গৃহেই শোভা পায়।

—ভন্তে, আমি এই শ্রাবকের কথার উত্তর দিতে পারি ? বিশাখা বলে উঠল।

তথাগত স্মিতমুখে মৌন রইলেন। মৌনই তাঁর সম্মতি।

বিশাখা বলল—ভদ্র, নারীরা কি শুধু শোভা পাবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ?

—না, নারীরা সৃষ্টি হয়েছে প্রজাবৃদ্ধির জন্য।

—আচ্ছা। তবে নারীরা একাই প্রজাবৃদ্ধি করতে যথেষ্ট ? পুরুষের প্রয়োজন নেই ?

—না, এ কথা সত্য নয়।

—আর ভদ্র, যে সকল নারী প্রজাবৃদ্ধি করে না, কিন্তু শোভাবৃদ্ধি করে অর্থাৎ গণিকা ও প্রব্রাজিকা—তারা তা হলে নারী নয়।

—না, এ কথাও সত্য নয়, ভদ্রে।

—ধর্মাচরণে সম্পূর্ণ মন চলে গেলে যদি অন্ন সুসিদ্ধ করতে ভুল হয়ে যায়, কিংবা খাদ্য পুড়ে যায় তবে কি গৃহের পুরুষ নারীকে ক্ষমা করবে ?

—না, গৃহিণীর সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অসিদ্ধ অন্ন পোড়া যাউই বা কীভাবে খাওয়া যায়!

—তাহলে গৃহে থেকে ধর্মাচরণ নির্বিঘ্নে করা কী ভাবে সম্ভব ভদ্র ?

শ্রাবক রুষ্ট মুখে নীরব রইলেন। তিনি বিশাখার কৌশলের কাছে পরাজিত হয়েছেন। বিশাখার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

তখন ভিক্ষুণী ভদ্রা বললেন—আচ্ছা, তথাগতই কি প্রথম নারীদের প্রব্রজ্যা দিলেন ?

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলেন—তা কেন ? নিগ্‌গণ্ঠদের মধ্যে তো পব্বাজিকা রয়েছেন। সন্ন্যাসিনীরাও আছেন। অরণ্যে, অরণ্যপ্রান্তে বাস করেন।

—অর্থাৎ, নারীদের সংঘভুক্ত করে তথাগত কোনও অশাস্ত্রীয় কাজও করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণে শাস্তা দশবল কথা বললেন—আয়ুষ্মতী বিসাখা ঠিকই বলেছে। ভিক্ষুণীদের আরক্ষার জন্য বিহার গড়তে অনুমতি দিন মহারাজ।

—অবশ্য, অবশ্যই—মহারাজ পসেনদি উৎসাহ ভরে বললেন।

—বিসাখা, আগামী কাল থেকেই সাবত্থির ভিক্ষুণী বিহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হবে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। উৎপলবর্ণা তাঁর কুটিরে মৃদুস্বরে কথা বলছেন ভদ্রার সঙ্গে, এমন সময়ে ভিক্ষুণী মিত্রা ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ করলেন। উপাধ্যায়া খেমার আদেশে ভদ্রা আজ উৎপলবর্ণার সঙ্গে থাকবেন, আর কারো এ স্থানে আসার কথা নয়। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী ব্যাপার ? শ্রমণা ?

মিত্রা বললেন—তোমরা শোননি ? বাইরে কত কোলাহল ! ওরা বলাবলি করছে সব...

—কী ? ভদ্রা প্রশ্ন করলেন।

—রোহিত নামে সেই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছে।

কেউ কোনও কথা বলল না।

মিত্রাই বললেন—লোকটির তো প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত ছিল, তা নিজেই নিজেকে সে দণ্ড দিল। ভালো। অতি উত্তম হয়েছে। ভিক্ষুণীর ধর্মনাশ করা ? পাপাত্মা ! নীচাশয় !...ক্রমশই উত্তেজিত হচ্ছেন মিত্রা।

ভদ্রা বললেন—এ প্রসঙ্গ থাক, শ্রমণা। বৃথা মৌনও যেমন ভালো নয়, বৃথা বাক্যব্যয়ও তেমনই মন্দ।

মিত্রা বললেন—উপ্‌পলে, আমিও আজ থাকি তোমার সঙ্গে ?

উৎপলাবর্ণা বললেন—না।

রাত্রি গভীর হলে ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা তাঁর মৃত্তিকাশয্যা থেকে উঠে পড়লেন। ভদ্রা জাগ্রত ছিলেন। তিনি শুধু চেয়ে দেখলেন। প্রণয়, তুমি দাও, তুমি বহু বলি নাও। এমনই তোমার স্বভাব। আমি জেনেছি, উপ্‌পলা জানল। আরো কত নারী জানবে। কুটির দুয়ার খুলে উপ্‌পলা বাইরে বেরিয়ে এলেন। চন্দ্রালোকিত শুক্লপক্ষের অরণ্য। অপরূপ, রহস্যময় শোভা ধারণ করেছে। সেই চন্দ্রালোক ধৌত করে দিচ্ছে উৎপলবর্ণাকে। তিনি ভাবলেন রোহিত আর নেই। শিশু রোহিত, বালক রোহিত, কিশোর রোহিত, পূর্ণ যুবক রোহিত উৎপলবর্ণার সমগ্র জীবনের পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। কেন সে আত্মঘাতী হল ? এ যে পাপ ? সুগতি হবে না রোহিতের। সে কি তা জানত না ? নাকি তার লজ্জা তার দুঃখ এত গভীর যে সে আর কিছুই ভাবতে পারেনি ! রোহিত যখন তাঁকে আলিঙ্গন করেছিল, তিনি প্রথমে বিবশ হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সদ্যগৃহীত প্রতিজ্ঞাগুলি তাঁর অন্তরকে, দেহকে সুকঠিন করে দিল। তিনি প্রস্তর প্রতিমার মতো হয়ে গেলেন। বা বলা যায় শবের মতো। প্রথম ঊষার আলোয় সেই শবমূর্তি দেখে রোহিত চমকে উঠেছিল।

কেন ? কেন তিনি পিতার কথায় সম্মত হলেন ? কেন রোহিতের প্রস্তাব মতো কোসল ছেড়ে মগধে বা অন্য কোথাও পালিয়ে গেলেন না ! কী হত ? মৃত্যু হত। রোহিতকে কেউ হত্যা করলে তিনিও প্রত্যাঘাত করবার চেষ্টা করতে পারতেন। আবার মৃত্যু বা বিপদ না-ও হতে পারতো ! হয়তো রোহিতের কথা শুনলে কোনও দূর বিদেশে তাঁরা সুখেশান্তিতে গৃহ-জীবন কাটাতে পারতেন। প্রণয়গম্ভীর, হাস্যচঞ্চলতামুখর গৃহ-জীবন। রোহিত তো এইটুকুই চেয়েছিল, এর জন্য মূল্য দিতেও প্রস্তুত ছিল। জ্যোৎস্নাবিধৌত চরাচরের দিকে চেয়ে উৎপলবর্ণা অনুভব করলেন রোহিত আত্মঘাতী নয়। তিনি—তিনিই তার প্রাণঘাতিনী। প্রণয়পাত্র রোহিতকে তিনি নিজ হাতে হত্যা করেছেন। কামে কলুষিত হননি তিনি। হয়েছেন হত্যার অপরাধে। বিবাহ করেও অষ্টশীল পালন করা তাঁর পক্ষে কোনও কঠিন ব্যাপারই ছিল না। কেন না তিনি স্বভাবেই ধর্মশীলা। অবৈধ কাম থেকেই নিরস্ত হতে বলে ধম্ম। তিনি কি হতে পারতেন না বিশাখার মতো উপাসিকা ! পিতা দুর্বল। তাঁর প্রতি করুণা করে তিনি প্রব্রজ্যা নেবার প্রস্তাব মেনে নিলেন। হতভাগ্য রোহিতের কথা তিনি একবারও ভাবলেন না। তীক্ষ্ণ সূচের মতো যন্ত্রণাসকল বিদ্ধ করতে লাগল তাঁকে। ধীরে ধীরে সূচগুলি শলাকা হয়ে গেল। উৎপলবর্ণা কোনদিনই নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব ব্যথা নিজের মধ্যে পরিপাক করে নেওয়ারই অভ্যাস তাঁর। আজ যে ব্যথা অনুভব করছেন তা তাঁর নিজের জন্য নয়, রোহিতের জন্য। দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুত বিবাহের সম্ভাবনা ধুলোয় লুটিয়ে উপ্‌পলা যখন কেশ মুণ্ডন করে চীবর-পাত্র ধারণ করল কী সে প্রাণান্তকর কষ্ট যা রোহিতকে দু পায়ে দলেছিল! তারপর সাধনকুটিরে মধ্যযামে যখন সে উপ্‌পলার দ্বারা প্রত্যাখাত হল! তার সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিল উপ্‌পলা। তারপর সে যখন উপ্‌পলাকে শেষ পর্যন্ত দৈহিক মিলনের বাঁধনে বাঁধতে চাইল! তখন, তখনই বোধ হয় সবচেয়ে বড় আঘাত এলো। তখনই আপাদমস্তক নিরুদ্ধ উপ্‌পলাকে অনুভব করে সে বুঝতে পারে উপ্‌পলা আছে, অথচ নেই। তার আবাল্য-প্রণয়ীর স্নেহের, আকাঙ্ক্ষার কোনও মূল্য নেই উপ্‌পলার কাছে। উৎপলবর্ণা স্পষ্ট দেখতে পেলেন রোহিত উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে—তুমি কে ? তুমি তো আমার উপ্‌পলা নও ?—সে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, সে উপলব্ধি করেছে একজন ভিক্ষুণীর প্রতি সে বলাৎকার করেছে মাত্র। তাই উপান্তবাসীরা যখন তাকে প্রহার করে সে তা মাথা পেতে নিয়েছিল, একটুও বাধা দেয়নি। জ্যোৎস্নার মধ্যে বিদেহী রোহিত আত্মবিস্মৃতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে তিনি দেখতে পেলেন। তার এই অবস্থার জন্য দায়ী উপ্‌পলা। যে তাকে সবচেয়ে ভালোবাসত। উৎপলবর্ণা নিম্ববৃক্ষমূলে সেই অপূর্ব জ্যোৎস্নায় অননুভূতপূর্ব যন্ত্রণায় জ্ঞান হারালেন, অথচ হারালেন না। যেন কোনও গূঢ় মর্মের মধ্যে জেগে রইলেন।

জীবনমৃত্যুর অতীত, সময়ের অতীত সেই ছায়ালোকে ছায়াশরীর উৎপলবর্ণারা ছায়াশরীর রোহিতদের প্রণয়সম্ভাষণ করে ফিরতে লাগল। আবার অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ রোহিতরা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ উপ্‌পলাদের চুম্বন করতে লাগল। অমৃত উত্থিত হতে লাগল, এই অমৃত আকাশপ্রমাণ ঊর্ধ্বধারায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে আবার দ্বিগুণ বেগে ঝরে পড়তে লাগল, বহু রোহিত বহু উপ্‌পলা সেই অমৃতধারা পান করবার জন্য ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আছে। জিহ্বায় পড়বামাত্র জিহ্বা জ্বলে গেল। ধীরে ধীরে শরীর জ্বলে গেল, অসহ্য যাতনা, তারপর বিবশ, অচেতন।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে—বহু জন্ম বহু মৃত্যুর মাঝখানে দ্যুলোক না ভূলোক মহাবেগে ঘুরছে। মেঘরাজি ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রবল গতিতে ভেসে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্কগুলি জ্বলছে, নিবছে কোনটি ক্ষীণ হতে হতে একেবারেই নিবে গেল। কোনটি জ্বলতে জ্বলতে উল্কার মতো একদিক দিয়ে উধাও হয়ে গেল। আবার লক্ষ জ্যোতিষ্ক জন্মাল। কী বিশাল, বিরাট অন্তরিক্ষ। বহু মনুষ্যশরীর ওইভাবে দৃষ্ট হচ্ছে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, ওর মধ্যে উপ্‌পলাই বা কোথায় ? রোহিতই বা কোথায় ? কে যেন শিরে হাত রাখল। ওষ্ঠে মধু সিঞ্চন করল, কে যেন উপ্‌পলার শিরটি নিজের ক্রোড়ে তুলে নিল।

বালার্কের প্রথম উদ্ভাস তাঁর মুখের ওপর পড়েছে।

উপ্‌পলা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন—ভগবন! তাঁর দু চোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রুপাত হচ্ছে।

তথাগত শুধু তাঁর হাতটি শিরে রাখলেন। একটু পরে পত্রপুট থেকে আরও একটু মধু ঢেলে দিলেন, উপ্‌পলা বললেন—প্রভু, আমাকে কি অমৃত পান করাচ্ছেন!

—না উপ্‌পলে—অমৃত তো পান করার বস্তুত নয়। অমৃত একটি ভাব। যথার্থ সাধনার পর সেই ভাবটি তোমার মধ্যে যাবে, আসবে, যাবে, আসবে, তারপর স্থিত হবে। তা ছাড়া অমৃত কেউ কাউকে দিতে পারে না উপ্‌পলা। নিজেকে অর্জন করতে হয়, আত্মচেষ্টার দ্বারা।

—ভগবন, তবে আপনার ভূমিকা কী ?

—তথাগত অমৃতপদ লাভ করেছেন। তাঁকে দেখলে, তাঁর বচন শুনলে অমৃত পাওয়া সম্ভব, এই প্রত্যয় জন্মাবে।

—কিন্তু এই যে আমার হৃদয়, তনু, মন, সব শান্ত, ধীর, আনন্দাপ্লুত হয়ে যাচ্ছে, সে কি তথাগতর করুণায় নয় ?

গৌতম নীরব রইলেন।

উপ্‌পলা আবার বললেন—ভগবন, আমি যে বহু জ্যোতিষ্ক, বহু মানুষের বহু উপ্‌পলা বহু রোহিতের ছায়াসংগ্রাম দেখলাম, উৎপত্তি এবং লয় দেখলাম—সে কী ? কেন ?

—তোমার মধ্যে পূর্বনিবাসজ্ঞানের অভ্যুদয় হচ্ছে উপ্‌পলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমি যে অমৃতধারাকে বিষনির্ঝরে পরিণত হতে দেখলাম ভগবন !

—অধিকার করার বাসনা নিয়ে অমৃত পান করতে গেলে তা হলাহল হয়ে যায় উপ্‌পলে, তুমি তাই দেখেছো।

—আর বাসনারহিত হলে ?

—হলাহলও অমৃত হয়ে যায়।

—কিন্তু বাসনারহিত হলে অমৃতের জন্য আর্তিও তো থাকে না প্রভু ! বাসনারহিত মানুষ আর শবের মধ্যে পার্থক্য কী ?

—বাসনারহিত হৃদয় মৈত্রী ও করুণার চিরপ্রস্ফুরমান উৎস হয়ে থাকে উপ্‌পলে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ বাসনারহিত হচ্ছো সেই অবস্থা বুঝতে পারবে না। তবে বুঝতে তোমার অধিক বিলম্বও নেই।

—ভগবন, রোহিত কি অধিকার করার বাসনা নিয়ে এসেছিল বলে তার অমৃত হলাহল হয়ে গেল ?

—তাই উপ্‌পলে, এবং উপ্‌পলা তাকে স্নেহ করত বলে সে-ও হলাহলের তীব্র স্বাদ পেয়েছে।

—প্রভু, রোহিত আত্মঘাতী হয়েছে, লোকে বলছে সে ভিক্ষুণীকে বলাৎকার ও আত্মঘাত এই দুই কারণেই মহাপাপী। তার কি উদ্ধার নেই ?

—কে এ কথা বলে উপ্‌পলে ? যে বলে সে জানে না। রোহিত বাসনার বিষ পরিপূর্ণ পান করেছে বলেই বিতৃষ্ণ হয়েছে, মৃত্যুর সময়ে সে বিগততৃষ্ণ, বীতশোক ছিল। তার এই কর্ম থেকে যে প্রাণের দীপটি জ্বলবে তার শিখাটি থাকবে অমৃতলোকের দিকে স্থির।

উপ্‌পলা উঠে বসলেন। পূর্ণ দৃষ্টিতে তথাগতর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তথাগত উঠে দাঁড়িয়েছেন, মুখমণ্ডল প্রসন্ন, বিভাময়। তাঁর দৃষ্টি উপ্‌পলার চোখের ওপর নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন—দীপ জ্বলছে। রোহিতের প্রাণের দীপ। শিখাটি আকাশের দিকে মুখ করে নিষ্কম্প। এই হবে তোমার কর্মস্থান উপ্‌পলে। আজ থেকে তুমি আমার অগ্‌গসাবিকা। ভিক্ষুণী খেমা থাকেন ডান দিকে, তুমি থাকবে বাম দিকে। সব্বে জীবা সুখিত্তা হোন্তু। গুনগুন করে বলতে বলতে তথাগত ধীরে ধীরে বনপথ পার হয়ে লোকপথের দিকে চলে গেলেন।

বনভূমির অপর দিকেই শ্মশান। রোহিতের শব বয়ে নিয়ে তার ভাইয়েরা, বন্ধুরা শবদাহ করল। মাতা-পিতা, ভগ্নীরা সবাই আর্তস্বরে রোদন করতে করতে চিতায় অগ্নিসংযোগ করল। চিতা নির্বাপিত হলে, ভস্মাধার অচিরবতীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বনভূমির পাশ দিয়ে তারা বিলাপ করতে করতে চলে গেল। রোহিতের মাতা, উপ্‌পলার মাতুলানী—বনভূমির দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে অভিসম্পাত দিয়ে গেলেন। হয়ত তিনি ভেতরে প্রবেশ করতেন। অভিসম্পাতগুলি আরও শাণিত করে উপ্‌পলার প্রতি নিক্ষেপ করবেন বলে। কিন্তু দু' হাতে বৃক্ষগুলির শাখা-প্রশাখা সরাতে সরাতে এক দীপ্তবর্ণা দীপ্তচক্ষু কুণ্ডলকেশী শ্রমণা এসে দাঁড়ালেন, শবযাত্রীর দল সভয়ে স্থানত্যাগ করল।

উপ্‌পলা সেই নিম্ববৃক্ষমূলে একইভাবে বসে। চোখ দুটি মুদিত। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। কোনও শব্দ কানে গেল না, চিতা-ধূম তাঁর নাসিকায় পৌঁছল না। তিনি শুধু দেখছেন রোহিত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে, হতে হতে সে একটি দীপ হয়ে গেল। দীপগাছটি পুরোই মৃদু আলো দিয়ে গড়া। তার শিখা কে অন্য একটি শিখা থেকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। জ্বলছে, রোহিত আলোময় দীপ হয়ে জ্বলছে, ধীরে ধীরে পুরো দীপগাছটিই শিখা হয়ে গেল। মৃদু, নীলাভ অচঞ্চল একটি শিখা। সারাদিন জ্বলছে, সারারাত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। উৎপলবর্ণা সেই দীপশিখার সঙ্গে আপন শিখা মেশাতে লাগলেন। গাঢ়, গভীর, অনিঃশেষ এক উর্ধ্বশিখ মিলনরজনী। শুধু ভদ্রা দিনের পর দিন পাশে থেকে মধু, জল ও পায়স দিয়ে তাঁর শরীর রক্ষা করতে লাগলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

একসালা গ্রামের সম্পন্ন কর্ষকের গৃহ। প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে কুটির কটি। অঙ্গনে ধান ঝাড়াই হচ্ছে। কর্ষক স্বয়ং এবং তার তিন পুত্র এই কাজে নিযুক্ত। কর্ষকের পত্নী তার দুই পুত্রবধূকে নিয়ে গোষ্ঠের কাজগুলি সারছে। গরুগুলিকে গোচরে নিয়ে গেছে কর্ষকের চতুর্থ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ পৌত্র। দুই কন্যা পাকশালে কুল্মাষ প্রস্তুত করছে। কাঞ্জিক তো আছেই, মাটির পাত্রে পাত্রে সেগুলি ভাগ করে রেখেছে তারা। মুদগ এবং যব একত্র সিদ্ধ করে তার মধ্যে খুদ দিয়ে মেখে কুল্মাষ পিণ্ড প্রস্তুত করতে হয়। কনিষ্ঠা কন্যা লোলা বলল—জেঠ্ঠা, অতিথের জন্যে কি আজও যাউ পাক করবো ?

জ্যেষ্ঠা কন্যা পদুমা বলল—অতিথি কত উঁচু কুলের, আকারখানা দেখিস না ? গোরা কেমন। দোর ছাড়িয়ে কত উঁচু ! যাউ পাক করবি না তো কী !

মধ্যমা সুতনা হাঁড়ির মধ্যেটা দেখে নিয়ে বলল—পুরনো শালিধানের তণ্ডুল দেখছি অল্পই আছে। গোহালে মায়ের কাছে গিয়ে শুধিয়ে আয় না।

লোলা পাকশালা থেকে বেরিয়ে দেখল মাটির সংকীর্ণ পথটি যেখানে দূরে বনপথের সঙ্গে মিশে গেছে সেইখানে অতিথিকে দেখা যাচ্ছে। অতি প্রত্যুষে তিনি গ্রাম ছাড়িয়ে বন, নদীর তট এই সমস্ত স্থানে চলে যান, যখন ফেরেন, কর্ষক পরিবারের পুরুষদের তখন প্রাতরাশ হয়ে যায়। আজ অতিথি অনেক আগেই ফিরছেন। কনিষ্ঠা লোলা এখনও বালিকাই। এই অতিথি সম্পর্কে তার অতিশয় কৌতূহল জন্মাচ্ছে। তাদের গৃহে অতিথি অনেক আসেন। সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক এলে গৃহের ভেতরে ঢোকেন না। বাইরের প্রাঙ্গণে অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় বসে থাকেন। আহারের জন্য আমন্ত্রণ জানালে তবেই গ্রহণ করেন, নইলে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পাশ গ্রামে। কর্ষণ, বপন বা শস্য কাটার কাজ যখন সকলকে ব্যস্ত রাখে, তখন অতিথিদের ভোজনের পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার অসুবিধা হয়। কিন্তু শস্য কেটে ঘরে তোলার পর, কাজের ভার কিছুটা অল্প হয়ে যায়, সে সময়ে গৃহে অন্নও থাকে প্রচুর, অতিথিসেবার সুযোগ পাওয়া যায়। সবে তিন দিন হল শস্য কাটার কাজ শেষ হয়েছে। অতিথিও এসেছেন দিন তিনেক। কোনও অতিথিই সাধারণত তিন দিনের অধিক থাকেন না। গৃহস্থের অন্নও গ্রহণ করেন না। রুগ্ণ হয়ে পড়লে স্বতন্ত্র কথা। এই অতিথিও কবে চলে যাবেন, লোলা ভয়ে ভয়ে আছে। বস্তুত দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে এই অতিথিরাই আসেন ছন্দ পরিবর্তন করতে। বিশেষত এই মানুষটি অতি মনোহর, কৌতূহলকর। শুধু চেয়ে থাকতেই লোলার এত ভালো লাগে !

গৃহের সংলগ্ন তাদের শাক ও পর্ণের ক্ষেত। দুটি সৌভঞ্জন গাছে চমৎকার ফুল এসেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে শুভ্র ফুলগুলি ঝুলছে। মৌমাছির ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। গৃহের পেছনে একটি সিন্ধুবার গাছে বিরাট একটি মৌচাক হয়েছে। লোলা ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র কুলুক্ক স্থির করেছে গোপনে ওই মৌচাকটি পাড়বে। পিতা, ভ্রাতাদের দেখে দেখে তারা ভালোই শিখে গেছে এ সব।

কয়েকটি প্রজাপতি লোলার মুখের সামনে দিয়ে উড়ে গেল, একটু লম্ফঝম্প করে সে একটিকে ধরে ফেলল। তার মুঠির ভেতরটা সুলসুল করছে। লোলার বিষম হাসি পাচ্ছে তাই। সে হাসতে হাসতে প্রাঙ্গণময় ছুটে বেড়াতে লাগল। চমৎকার নীল ও সোনালি বর্ণের প্রজাপতিটি। সে প্রজাপতিটি পুষবে।

এইভাবেই তার সোজাসুজি সংঘর্ষ হয়ে গেল অতিথির সঙ্গে।

অতিথি বললেন—অহো লোলা, তুমি কি সহসাই একটি প্রজাপতি হয়ে গেছো ?

লোলার মুঠি খুলে গেল। প্রজাপতিটি ফুরুৎ করে উড়ে গেল। যাঃ।

লোলা বলল—আপনার বাঁ কাঁধে ও কী ?

—বলো তো কী ? প্রজাপতি নিশ্চয়ই নয় !

অত বিশাল বস্তুটিকে প্রজাপতি কল্পনা করার সম্ভাবনামাত্রেই লোলা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, তারপর বলল—আপনি তো অমন সুন্দর নীল সোনালি প্রজাপতিটি উড়িয়ে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—উড়তে উড়তে প্রজাপতিটি লোলার মধ্যেই অন্তর্হিত হয়েছে মনে হচ্ছে—অতিথি মৃদু হেসে বললেন।

কথা বলতে বলতে উভয়ে ভেতরের অঙ্গনে প্রবেশ করল। অতিথি পাকশালের দাওয়ায় কাঁধের ভারটি নামিয়ে রাখলেন। একটি অল্প বয়স্ক বন্য শূকর। প্রচুর কদলীপত্র দিয়ে সেটিকে ঢেকেছেন, তারপরে লতা দিয়ে বেঁধেছেন অতিথি।

গৃহকর্ত্তা এবং তার পুত্ররা সবাই উৎসাহে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলো।

জ্যেষ্ঠ সাম বলল—আপনি কি এটিকে মারলেন অজ্জ ?

অতিথি পিঠ থেকে তূণ এবং ধনুক নামাতে নামাতে বললেন—মহাবনের দিকে গেলে আমি সর্বদাই সশস্ত্র হয়ে যাই। চমৎকার শূকরটি চোখে পড়ল, মৃগয়া করে আনলাম। গৃহিণী জবালা পুত্রবধূদের নিয়ে গোহাল থেকে ফিরে এসে শূকরটি দেখে আনন্দ করতে লাগলেন। সকলেই হাত মুখ ধুয়ে প্রাতরাশে বসল। এদের কোনও ভক্তগৃহ (খাবার ঘর) নেই। পাকশালার দাওয়ায় বসেই ভোজন সারা হয়।

জবালা পরিবেশন করতে গিয়ে বললেন—এ কি অতিথের যাউ কই ?—তখন লোলা এবং অন্য দুই কন্যারও মনে পড়ল—যাউ তো পাক করা হয়নি ? গৃহিণীর তর্জন শুনে, অতিথি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটি জানতে পারলেন। বললেন—আমার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় আমি কখনওই সম্মত নই। আপনাদের যা পাক হয়েছে আমিও তাই-ই ভোজন করবো।

গৃহকর্তা তক্কারি বললেন—তা-ও কি হয় কাত্যায়ন, আপনি কত বড় কুলের মানুষ। বিদ্বান পণ্ডিত, গান্ধারের পণ্ডিত আবার। ওরে বাপা। আপনাকে কি কাঁজি-মাজ্জি খাওয়াতে পারি ?

অতিথি বললেন—সমগ্র জাম্বু দ্বীপ ভ্রমণ করার বাসনা আমার। আপনি এবং আমি কতটা ভিন্ন কতটা অভিন্ন দেখব বলে বেরিয়েছি। কাঞ্জিক যদি আমাকে না দেওয়া হয়, তা হলে আপনি আর নিজের কতটুকু আমায় দিলেন ?

—আপনাকে আমি বুঝতে পারি না, কাত্যায়ন—সরল চোখ দুটি তুলে কর্ষক তক্কারি বললেন—আপনি আর আমি কতটা ভিন্ন কতটা অভিন্ন ? সবটাই তো ভিন্ন ? আপনি তক্ষশিলার স্নাতক, মহাপণ্ডিত, কুলপুত্ত তো বটেই, অতি উচ্চ কুলে জন্ম আপনার। ব্রাহ্মণ তার ওপরে। আপনি রুপোর পাহাড়ের মতো শোভা পান। আর আমি...

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন অতিথি—তুলনার সূত্রগুলি আপনার সবই ভ্রান্ত। যাই হোক এক পাত্র কাঞ্জিক হবে কী ?—বলে অতিথি কাত্যায়ন তাঁর পাত্রটি গৃহিণীর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

গৃহিণী সহাস্যে অতিথির পাতে কাঞ্জিক ঢেলে দিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যাটি কদলীপত্রে কুল্মাষপিণ্ড রেখে গেল।

তক্কারি বললেন—এ বৎসর বস্‌সন ভালো হয়েছে তাই। ভূমি তো নয় যেন ক্ষীরপাত্র। ধান হয়েছে চমৎকার। যব আশাতীত। শাকও বহু প্রকারের ফলেছে। ওদিকে গোচরটি ঘাসে থই থই করছে। গাভীগুলি ভালো করে ঘাস খেতে পেলে দুধের পাত্র উপচে দেবে, বলদ আমার বারোটি বুঝলেন অজ্জ। গত বছর যাগের জন্য দুটি বলদ একপ্রকার কেড়ে নিয়ে গেল, পরিবর্তে ক'টি কাংস্যপাত্তর দিয়েছে। তা কাংস্যপাত্র কি ধুয়ে জল খাবো ? আমাদের কসস্কের ঘরে মৃৎপাত্রই তো যথেষ্ট। তা সে যাই হোক বারো বলদের হাল আমরা। বলদগুলি পেট পুরে খেতে পেলে গভীর করে লাঙল টানবে...এই সৌভাগ্যের বছরে আপনার মতো পণ্ডিতের পায়ের ধুলো পড়ল গৃহে আপনাকে শালিধানের যাউ পরিবেশন করতে পারছি না আমার কত ভাগ্য।

অতিথি বললেন—বর্ষণ ভালো না হলে কী করেন ?

—চম্পা নদীর খাল একটি আছে। কিন্তু একটুও বস্‌সণ না হলে শস্য হবে না কাত্যায়ন। নদীখাল থেকে জল এনে সেচ করা অতিশয় শ্রমসাপেক্ষ। ক্ষেত্রে একটি কূপ আছে, কিন্তু বৃষ্টি না হলে সেটিও শুকিয়ে যায়। এ সব সময়ে সঞ্চিত ধান, লবণ আর এই কাননে যা পর্ণ-সর্ণ হয় তাই দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয় এরূপ সময়েই তো গ্রামবাসীরা বনে ফলমূল আহরণ করতে গিয়ে বনেচরদের হাতে মরে, কিংবা নগরে গিয়ে ধনীগৃহে দাস হয়। বীজগুলি খেয়ে ফেললে পরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৎসরেও বিপদে পড়তে হয়।

লোলা এতক্ষণ গণ্ডে হাত রেখে পিতা ও অতিথির কথা শুনছিল। সে বলে উঠল—তক্ষশিলা কোথায় ?

গৃহিণী বললেন—লোলা, গোচরে কুল্মাষ দিয়ে আয়।

লোলা মাথা নেড়ে বলল—সুতনাকে পাঠাও, আমি এখন তক্ষশিলার কাহিনী শুনব। অজ্জ, বলুন না তক্ষশিলা কোথায় !

লোলার পিতা বললেন—উত্তর কুরু দেশের ওদিকে হবে। যেমন দূর, তেমন দুর্গম।

কন্যাকে তক্ষশিলার অবস্থান বিষয়ে অবহিত করতে পেরেই বোধহয় কর্ষক তক্কারি পরম সন্তোষের সঙ্গে অবশিষ্ট কাঞ্জিকটুকু খেয়ে ফেললেন।

—একেকজন আচারিয়র কী ক্ষমতা ! সেবায় তুষ্ট করতে পারলে মাথায় একটি হাত রাখবেন আর তাবৎ বিদ্যা মাথার মধ্যে এসে যাবে —খেয়ে-দেয়ে তিনি বললেন।

লোলা বলল—সত্যি ? আমি তক্ষশিলায় যাবো। যদি আচারিয়কে তুষ্ট করতে পারি, বিদ্যা পাবো ? বলুন না অজ্জ। আচ্ছা আচারিয় কী প্রকার ? বৃক্ষদেবতার মতো ?

—তক্ষশিলার আচারিয়রা আমি যতদূর জানি ইন্দ্রমায়ায় অদৃশ্য থাকেন। বহু-যজ্ঞ করলে তবে আবির্ভূত হন। —লোলার পিতা বললেন।

অতিথি সহাস্যে বললেন—এরূপ কাহিনী আপনি কোথা থেকে শুনেছেন ?

কস্‌সেক ভেবে-চিন্তে বললেন—শুনে আসছি। পিতার কাছ থেকে শুনেছি সম্ভবত। অতিথিরা এলে তাঁদের কাছ থেকে পথের বিবরণ শোনা আমার পিতার অভ্যাস ছিল। আচ্ছা কাত্যায়ন, আপনি তো এখন সারাদিন ধরে কী যেন লিখবেন। কী ও ? লিপি ?

অতিথি বললেন—না, লিপি ঠিক নয়, ও বোধ হয় আমার ভাবনা-চিন্তা।

—ভাবনা-চিন্তা ? সে তো মাথায় থাকে ?

—লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজন বোধ করি, ভদ্র।

এতক্ষণ কর্ষকের পুত্ররা অনেক কষ্টে কৌতূহল সংবরণ করে ছিল। এবার দ্বিতীয় পুত্র রাম বলল—কোন ভাবনা লিপিবদ্ধ করেন ভদ্র ?

—এই যেমন রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক...

—রাজার সঙ্গে প্রজার আবার সম্পর্ক কী ?—জ্যেষ্ঠ সাম বলল।

তক্কারি বললেন—মহাবন কেটে ক্ষেত প্রস্তুত করেছি। সে যে কী কষ্ট কাত্যায়ন ! তখন গামনী ছিলেন না। তারপর তাতে হাল চালিয়ে, বীজ বুনে, ব্রহ্মার কৃপায় যথেষ্ট বৃষ্টিতে ধানগুলি লালন করেছি। কেটে ঘরে তুলছি বছরের পর বছর, বৃক্ষদেবতার অর্চনা করি গন্ধমাল্য দিয়ে, বৃষ্টি তেমন না হলে ইন্দ্রমূর্তি আছে, ব্রত করে নারীরা, দূর নিগম গাম থেকে গামভোজক আসেন বছরে একবার। গণনা করে যা নেবার নিয়ে যান। মহারাজ ব্রহ্মদত্তর কাছে কোনও অপরাধ তো করিনি।

—কোনও অপরাধের প্রশ্ন নেই কর্ষক। কিন্তু আপনি ব্রহ্মদত্তর নাম করলেন কেন ? ব্রহ্মদত্ত তো বহুদিন গত হয়েছেন ! এখন রাজা তো মগধাধিপ বিম্বিসার।

ওই হল—তক্কারি বললেন—রাজায় রাজায় ভিন্নতাই বা কী। এঁরা সব দেবতা। আমরা হলাম গিয়ে অধম মানুষ। ওঁরা সব ইন্দ্রমায়া জানেন।

রাজাকে, আচার্য্যকে, পণ্ডিতকে—সকলকেই তা হলে আপনারা মায়াবি দেবতাসদৃশ বলে মনে করেন, কর্ষক ? এ ধারণা তো ঠিক নয় !

লোলার হতে কুল্মাষ পিণ্ড। সে এক হাতে সেটি ধরে অন্য হাত দিয়ে অল্প অল্প খাচ্ছিল, তার খাওয়া থেমে গেল। সে বলল—অজ্জ, রাজারও কি আমাদের মতো দুটো হাত থাকে ?

—রাজার, আচার্যর সবারই দুটোই হাত, দুটোই পা, অবয়বগুলি সব একই প্রকার। কোনও মায়াই কারো জানা নেই।

—কেন রাজা কি দেখেছেন যে বলছেন ?—তক্কারি একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন।

—মহারাজ বিম্বিসারকে তো অতি নিকট থেকে দেখেছি। তিনি আপনার আমার মতোই মানুষ।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব সময় অলঙ্কার বা পঞ্চ রাজচিহ্ন ধারণ করতেও ভালোবাসেন না। ছদ্মবেশে প্রজাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান।

—ছদ্মবেশ! সর্বনাশ!—সাম বলল—সে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ আপনিও তো ছদ্মবেশী রাজা হতে পারেন।

রাম সসম্ভ্রমে বলল—আপনাকে দেখেই অন্য প্রকার মনে হয়। আমি প্রথমেই আমার পত্নীকে বলেছিলাম...

অতিথি বললেন—আমি রাজা নই। কিন্তু রাজা এরূপ ছদ্মবেশ নিতেই পারেন। আপনারা জানেন তো বাহুবলে মহারাজ বিম্বিসার এই মগধরাজ্য একত্র করেছেন, অঙ্গরাজ্যে জয় করেছেন...

—আমরা এ সব কিছুই জানি না—তক্কারি সবিস্ময়ে বললেন, তা ছাড়া রাজার রাজায় তো কতই যুদ্ধ হয়।

—অঙ্গ মগধের যুদ্ধ হলে আপনারা কোন পক্ষে ছিলেন ? অবশ্য যুদ্ধের কথাই জানেন না যখন এ প্রশ্ন করা বৃথা। তবু জিজ্ঞাসা করি। ধরুন এখন যদি মগধের সঙ্গে অবন্তীর যুদ্ধ হয় কার পক্ষ নেবেন ?

—অবন্তী কোথায় তা জানি না। কিন্তু অবন্তীরাজ যদি জয়লাভ করেন তো তাঁরই পক্ষ নিতে হবে।

অতিথির মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি বললেন—যে রাজাকে এখন কর দিচ্ছেন তিনি মহারাজ বিম্বিসার। বাহুবল যেমন আছে তেমন হৃদয়ও আছে। করভার বাড়ান না। গ্রামণীদের ডেকে সভা করেন। প্রত্যেকের কাছ থেকে গ্রাম-সংবাদ নেন। তিনি যদি আক্রান্ত হন, তার অর্থ আপনারাও আক্রান্ত হলেন। সৎ, মহানুভব রাজা। ইন্দ্রমায়া জানেন না। কিন্তু তিনি পিতার মতো।

সাম আবার সসম্ভ্রমে বলল—আপনার মতো যদি হন তিনি, তা হলে আমরা অবশ্যই তাঁর পক্ষে। কিন্তু যুদ্ধকালে আমরা কস্‌সকরা কিভাবে তাঁর পক্ষ নেবো সেটা দেখতে পারি।

—যুদ্ধকালে যদি আপনাদের সবারই কিছু অস্ত্রশিক্ষা থাকে তো গ্রামরক্ষার কাজে লাগবে তা। আপনারা কি কিছুই জানেন না ? দস্যুর উপদ্রব হলে কী করেন ?

—গ্রামের উপান্তে চণ্ডালপল্লী আছে। তারা ভালো বংশধাবন করতে পারে অজ্জ, উৎসবে যেমন খেলা দেখায়, দস্যু-টস্যু এলেও তেমনি বংশধাবন ভালোই কাজে লাগবে।

—এ প্রকার বিদ্যা আপনাদেরও জানা উচিত।

—আমাদের কনিষ্ঠ ভাই ভালো বাঁশ চালাতে জানে। সহজ ক্ষমতা আছে।

—এ গ্রামে আপনাদের একটি অস্ত্রশিক্ষাগার থাকলে ভালো। কারণ বিদেশি সৈন্য তো প্রথমে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিই আক্রমণ করবে...।

—আপনার কথা শুনে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে...তক্কারি বললেন, অবন্তী কি মগধ আক্রমণ করছে ?

—করেনি। আমাদের এই জম্বুদ্বীপের রাজারা হয়ত পরস্পরকে আক্রমণ আর করবেন না। কিন্তু জম্বুদ্বীপের বাইরেও তো পৃথিবী আছে, সেখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতি জম্বুদ্বীপের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে, সে রূপ দুঃসময়ে আপনাদেরও মগধরাজ বিম্বিসারের পশ্চাতে থাকতে হবে। তাঁর প্রতি আনুগত্য নিয়ে। নিজেদের গ্রাম রক্ষার কিছু ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিছু শস্য সঞ্চয় করে যেতে হবে অসময়ের জন্য।

—জম্বুদ্বীপের বাইরে কোন দিক থেকে শত্রু রাজা আসতে পারে ?

—সভয়ে জিজ্ঞাসা করল রাম।

—উত্তর-পশ্চিম থেকে আসবার সম্ভাবনা আছে।

পুরুষেরা কাজে যোগ দিতে চলে গেলে, লোলা অতিথির কাছে এসে বসল বলল—মহারাজ বিম্বিসার কেমন, অজ্জ ?

—অতিশয় মহানুভব। তোমাদের সবার কথা চিন্তা করেন।

—লোলার কথাও ?

অতিথি একটু হাসলেন—হ্যাঁ, লোলার কথাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—দেখতে কেমন ?

অতিথি বললেন—একটি পোড়া কাঠের খণ্ড নিয়ে এসো তো !

লোলা অবিলম্বে পাকশাল থেকে কাঠের টুকরো নিয়ে এলো।

অতিথি দাওয়ার ওপর সযত্নে একটি চিত্র লিখলেন। তারপর বললেন—ভালো করে দেখো লোলা। এই হলেন ব্যক্তি বিম্বিসার। এইবার মাথায় কিরীট দিলাম, কানে কুণ্ডল দিচ্ছি, বাহুতে অঙ্গদ—কণ্ঠে মণিহার। ইনি হয়ে গেলেন এক অভিজাত রাজপুরুষ। এইবার বক্ষে বর্ম দিলাম, কটিতে তরবারি, কাঁধে ধনুর্বাণ—ইনি উপরন্তু একজন মহারথ যোদ্ধা হলেন। হলেন তো ? সবশেষে আমি এঁর চক্ষু লিখছি। এই চক্ষুর দৃষ্টি দেখলেই বুঝতে পারবে ইনি তোমাদের কথা ভাবছেন। অতিথি প্রতিকৃতির মুখের মধ্যে সযত্নে চোখ দুটো আঁকলেন, বললেন—এই হলেন মহারাজ বিম্বিসার।

লোলা অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল প্রতিকৃতিটির দিকে, তারপর অতিথির দিকে অপাঙ্গে চাইল, বলল—বুঝেছি।

—কী বুঝেছো বালিকা ?

—বুঝেছি—বলে লোলা মুখ টিপে হাসল।

অতিথিকে একটি কুটির দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ একটি কক্ষ আর তার সম্মুখের দাওয়া। রাত্রে গৃহের একমাত্র পৌত্রটি ও কনিষ্ঠ পুত্রটি এখানে শোয়। সারাদিন রাজশাস্ত্র লেখার কাজ করলেন অতিথি। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে গিয়ে পুষ্করিণীতে স্নান করলেন। মধ্যাহ্নে পাকশালার দাওয়ায় বসে দেখলেন তাঁর থেকে একটু দূরত্বে গৃহের পুরুষদের পাতাগুলি রাখা। তাঁকে দেওয়া হয়েছে রক্তবর্ণ কম্বলের আসন, সামনে কাংস্যপাত্রে ভোজ্য। উত্তম শালিধান্যের চালের অন্ন, ঘৃতের গন্ধে অঙ্গনটি ভরে গেছে। তিন চার প্রকার ব্যঞ্জন। অম্ল, দধি—এবং অবশ্যই শূকর মাংস।

প্রতিবাদের মধ্যে যেতে ইচ্ছে হল না। তিনি শুধু বললেন—লোলা কই ? লোলা আমাদের সঙ্গে ভোজনে বসুক।

পাকশালের দুয়ারে দাঁড়ানো গৃহিণী জবালা আর দাওয়ায় বসা গৃহকর্তা তক্কারির মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হল। তক্কারি বললেন,—লোলাকে কাত্যায়ন স্নেহ করেন, লোলা বসুক।

লোলা বসুক, লোলা বসুক—একটা রব উঠল। এরই মধ্যে তার পাত্রটি ডান হাতে ধরে লোলা অতিথির অবিদূরে এসে বসল। অতিথি তাঁর পাত্র থেকে কিছু কিছু ভোজ্য লোলার পাত্রে তুলে দিলেন। সকলেই সসম্ভ্রমে নীরব রইল।

ভোজনের সময়ে কেউই বিশেষ কথা বলছে না। অতিথি বললেন,—বন্য বরাহটি তো অতি সুস্বাদু পাক হয়েছে।

জবালা মৃদুস্বরে বললেন—প্রচুর মাংস অজ্জ, আমরা প্রতিবেশী গৃহেও কিছু পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনার অনুমতি নেওয়া হয়নি।

অতিথি হেসে বললেন—গৃহের খাদ্য কী রূপ ভাগ হবে তার জন্য অতিথির অনুমতির প্রয়োজন কী ? অতিথি মৃগয়া করতে ভালোবাস। এরপর আপনাদের শীঘ্রই মৃগমাংস খাওয়াবো।

লোলা বলল—কালই তো একটি গোবৎস মারা হবে। শূলপক্ব হবে। এখন মৃগয়া করবেন না।

অতিথি মুখ তুলে তক্কারির দিকে চাইলেন—সে কী ? আপনি হঠাৎ গোবৎসটি মারবার ব্যবস্থা করছেন কেন ?

তক্কারি বললেন—মাননীয় অতিথির জন্য আমরা তো কিছুই করিনি। ঘরের খুদ-মুগের পিণ্ড পর্যন্ত খাইয়েছি। একদিন...

—সে ক্ষেত্রে আমি আজ এই ভোজনের পরেই যাত্রা করছি। গৃহস্থের ঘরে তিন রাতের অধিক থাকাই উচিত না।

লোলা বলল—না, না, আপনি যাবেন না অজ্জ।

রাম ও সাম দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বসল। তক্কারি বললেন, —আপনি যা বলবেন তাই হবে কাত্যায়ন, আমি গো-বৎসটি মারবো না, আপনি অনুগ্রহ করে কিছুদিন থাকুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিথি মুখের হাসি গোপন করে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। ভোজন সমাপ্ত হল। কিন্তু রাত্রে গৃহের কনিষ্ঠ পুত্র ও পৌত্রটি অতিথির কক্ষে শুতে এলো না।

রাত্রে দীপ জ্বালিয়ে এদের তৈল ব্যয় করতে তাঁর সঙ্কোচ হয়। তেলের মূল্য দিতে আরো সঙ্কোচ হয়। সুতরাং রাত্রে লেখার কাজ বন্ধ থাকে। যতক্ষণ চাঁদ বা তারার আলোয় পথ একটুও দেখা যায়, তিনি চংক্রমণ করেন, তারপর নিজকক্ষে এসে গবাক্ষের পাশে একটি ছোট বেত্রপীঠ নিয়ে বসে থাকেন। ভাবেন। অনেক ভাবনা চেষ্টা করে মন থেকে সরিয়ে দেন। নগরের স্মৃতিজটিলতা থেকে তিনি এখন কত দূরে! এই প্রত্যন্ত গ্রাম যা এক কোণে সকল পথের আয়ত্তের বাইরে আশ্রয় পেয়েছে, এখানে রাত্রির অন্ধকারে বসে বসে রাজগৃহের দীপদণ্ডালোকিত পথগুলি কল্পনা করা যায় না। কল্পনা করা যায় না সেই সব পণ্যঋদ্ধ আপণশ্রেণী, প্রাসাদগুলি, রাজপুরুষ, শ্রেষ্ঠীদের সেই বৈভব। নৃত্য, গীত, শিল্প, বিদ্যা, শ্রমণদের সেই ভিক্ষাবিলাস, বেণুবনে দেশনা। তিনি রাজগৃহ থেকে এই গ্রামভূমির দিকেই ক্রমশ এগিয়েছেন। অঙ্গ মগধের সীমায় চম্পা নদী। চম্পা পার হয়ে যা পূর্বে অঙ্গদেশ ছিল, এখন মগধের অন্তর্ভুক্ত, সেই রাজ্যের বহু গ্রামে গেছেন, চম্পা নগরীতে অধিক দিন থাকেননি, কিন্তু দেখেছেন তা-ও। বড় সুন্দর এই জীবনধারা। শান্ত, শিষ্ট। কিন্তু বড় অজ্ঞ। বিদ্যার কথা তিনি ভাবছেন না। কিন্তু নিজের দেশের রাজা কে, রাজা কীরূপ, কবে যুদ্ধ হল, রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন এলো, কাকে কর দেয়, কার প্রতি অনুগত থাকতে হবে, উত্তরকুরু, গান্ধার, অবন্তী এইসব দেশগুলি অন্তত পক্ষে কোন দিকে এটুকুও না জানা বড় নৈরাশ্যজনক। বংশের পর বংশ এদের জীবনযাত্রা দু-চারটি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বৈবাহিক সম্পর্কের জন্যও এরা বেশি দূরে যাবে না। বংশের পর বংশ শুধু কয়েক যোজনের ভূমিকে পৃথিবী বলে জানবে। ওই সোলা নামে বালিকাটি বুদ্ধিমতী, কৌতূহলী—তার জীবন শেষ হবে এই প্রকার একটি কুটিরে খাদ্য পরিবেশন করতে করতে। এই সরলতা কাম্য, কিন্তু অজ্ঞতা যাক। রাজশক্তির সঙ্গে আরো একটু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হোক, না হলে দূরের স্বপ্নলোকের কোনও মায়াবি রাজপুরুষের প্রতি আনুগত্য, ভক্তি, ভালোবাসাই বা প্রত্যাশা করা যায় কী ভাবে?—আবার দূরত্বও চাই। সম্ভ্রম না থাকলে আস্থাও তো থাকে না।

অতি প্রত্যূষে উঠে স্নানসেরে নিয়ে তিনি পুঁথি খুলে বসলেন। রাজার সঙ্গে প্রজার এই নাতিনিকট, নাতিদূর সম্পর্কের নীতির কথা এখুনিই লিখে ফেলা প্রয়োজন। একটা নতুন কথা তাঁর মনে হচ্ছে, রাজার মাঝে মাঝে নিজ রাজ্য পরিভ্রমণ করা উচিত। আসুন তিনি লোকজন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে, কিন্তু কোনও সুবিধাজনক স্থানে স্কন্ধাবার রেখে ছদ্মবেশে নিকটবর্তী ও দূর দূর কোণের এই সকল গ্রামভূমি পরিক্রমা করলে তিনি বুঝতে পারবেন তাদের সঠিক অবস্থা, প্রয়োজন। কারণ রাজধানী থেকে যতই দূর যাওয়া যাবে, ততই তাদের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়। বছরে একবার অন্তত রাজা রাজধানী থেকে বেরিয়ে যাবেন গোপনে, বিশ্বস্ত উপরাজ অর্থধর্মানুশাসক ও বিনিশ্চয়ামাত্যর ওপর রাজ্যভার দিয়ে। এক এক বৎসর যাবেন একেক দিকে।

পরবর্তী দু-একদিনের মধ্যে অতিথি বুঝতে পারলেন সমগ্র একসালা গ্রামের লোক ভেবেছে তিনিই ছদ্মবেশী বিম্বিসার। তাদের আচার-আচরণ আগের থেকেও সম্ভ্রমপূর্ণ। মাঝে মাঝে তক্কারিগৃহে নানা প্রকার উপহার আসছে। যেদিন তিনি একটি বিরাট মৃহ ও বন্য বরাহ মৃগয়া করে গ্রামকেন্দ্রে ভোজের ব্যবস্থা করলেন, নিজেই মাংসগুলি শূলপক্ক করছিলেন, একটু দূরত্ব রেখে গ্রামবাসীরা চেষ্টা করছিল তাঁর হাত থেকে শূলগুলি নিয়ে নিতে। শেষে যখন পরিবেশন আরম্ভ হল, ফিসফিস শব্দ শুনে তিনি কান খাড়া করলেন। ওরা বলছে—রাজার প্রসাদ, রাজার প্রসাদ। স্বয়ং রাজার হাতের মারা হরিণ বরা, তাঁরই হাতে ঝলসানো—কোনও গামে, কেউ কোথাও কখনো খেয়েছে?...এমন রাজা হলে তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারি আমরা হাসতে হাসতে।

এই শেষ কথাগুলি শুনতে শুনতে অতিথির হৃদয়ের ভেতরে এক মহোল্লাসের ভাব জন্ম নিল। এরা যদি তাঁকেই মহারাজ বিম্বিসার ভাবে তো ক্ষতি কী? এক অর্থে তিনি তো বিম্বিসারই। তাঁরই প্রসারিত সত্তা। চক্রবর্তী রাজার আগে আগে নাকি তাঁর চক্র যায়। এখন তিনি বুঝতে পারছেন এই চক্র কোনও অস্ত্র নয়, বিম্বিসারের চক্র তিনিই হতে পারেন, হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দিন প্রত্যুষে তিনি একসালা গ্রাম ছেড়ে যাবার জন্য পুঁথিপত্র বেঁধে ফেললেন। কাউকে স্বভাবতই জানাননি। তক্কারি-গৃহ অনেকটা ছাড়িয়ে এসেছেন, পেছনে থেকে—রাজা, রাজা ডাক শুনে দাঁড়ালেন। লোলা ছুটতে ছুটতে আসছে।

—কাউকে না বলে চলে এসেছেন ? আমাকেও বলেননি ? ওরা যে বলে লোলা রাজার পিয়।

—ভুল হয়ে গেছে লোলা। তুমি অবশ্যই আমার প্রিয়পাত্রী, তোমাকে একটি উপহার দেবার ইচ্ছা ছিল আমার কিন্তু একবার এক বালিকাকে উপহার দিয়ে তাকে প্রাণান্তিক বিপদে ফেলে দিয়েছিলাম তাই কোনও উপহার, কোনও স্মৃতিচিহ্ন দেবো না, লোলা। বস্তু ব্যতীত এই অতিথিকে যদি মনে রাখতে পারো তবেই বুঝবো তুমি সত্যসত্যই তাকে ভক্তি করো।

লোলা সজল চোখে বলল—আমি আপনাকে চিরকাল মনে রাখবো রাজা, যখন বৃদ্ধা অতিবৃদ্ধা আরও বৃদ্ধা পিতামহী প্রপিতামহী হয়ে যাবো, তখনও...তখনও—কিন্তু আপনি অনেক দূর যাবেন। মা আপনার জন্য খজ্জ পাঠিয়ে দিয়েছে। এই পেটিকায় আছে। উপহারের দ্রব্যগুলি তো সবই ফেলে এলেন—এই পেটিকাটিতে খজ্জ এনেছি।

—কী এনেছ বালিকা—অতিথি হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন।

—শুকনো মাংস আছে, মৃগমাংস, দু-তিনদিন থাকবে, চিঁড়ে আছে, মণ্ড আছে, আর দেখুন—সে পেটিকাটি খুলে দেখালো শালপাতার দীর্ঘাকার পাত্রে—দেখুন এগুলি লোলার অতিপ্রিয় খজ্জ—অতিথি দেখলেন পত্রপুটে রয়েছে কিছু ভাজা চণক।

লোলা বলল—মা বলছিলেন এগুলি ঘোড়ার বা গাধার খজ্জ, এগুলি কেউ কাউকে দেয় না। আমি লুকিয়ে এনেছি। আপনি রাগ করবেন না তো ?

অতিথি অন্যমনস্কের মতো বালিকাটির শিরে হাত রাখলেন, বললেন—তুমি, তোমার অন্তরাত্মাই একমাত্র সঠিক কথাটি বুঝেছে। অনেক সরস, সুরসজ্জা, মূল্যবান খাদ্য আছে, মাংস, মৎস্য, পায়স,...কিন্তু সবসময়ের জন্য, সব সরলমতি মানুষ-মানুষীর কাছে প্রিয় এই চণক। আমার মনে থাকবে...

অশ্রুমুখী বালিকাটিকে পথহীন গ্রামের সেই বিন্দুতে দাঁড় করিয়ে রেখে চণক চলে গেলেন।

পরে যখন মহারাজ বিম্বিসার রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে পড়ে নিহত হলেন, তখন মগধের প্রজারা অনেকেই জানতেই পারেনি। যারা জেনেছিল তারাও ওসব রাজাদের ব্যাপার বলে যে যার কাজে মনোনিবেশ করেছিল। শুধু একসালা গ্রামের তরুণী বধূ লোলা গ্রামপ্রান্ত থেকে ক্রমবিলীয়মান সেই উন্নত দেহ, রজতবর্ণ অতিথির কথা মনে করে বড় কান্না কেঁদেছিল। বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল অঙ্গরাজ্যের প্রান্তিক কয়েকটি গ্রাম যেখানে যেখানে চণক একদা বাস করেছিলেন।

৮

ছায়া পূর্ব দিগন্তে ক্রমপ্রসরমান। সকাল থেকে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল। একইভাবে যাওয়া আসা করে। গান্ধার-ভবনের দাস-দাসীগুলি দিনের পর দিন এই বৈচিত্র্যহীনতায় ক্ষুব্ধ। এই গান্ধাররমণী জিতসোমাকে তারা কতভাবেই না দেখল ! ইনি যখন সদ্য সদ্য গান্ধার থেকে এলেন, মগধের রাজ-অন্তঃপুর চমকে উঠেছিল। শঙ্খশ্বেত গাত্রবর্ণ। শ্বেতমর্মরের মূর্তি বলে ভুল হয়। আকর্ণবিস্তৃত ভ্রূ। দীর্ঘ নয়ন। চোখের মণি দুটি যেন মৃদু নীলাভ জলে ভাসছে। চোখের পাতাগুলি দীর্ঘ এবং বক্র। নাসা কান যেন স্ফটিক দিয়ে কেউ সযত্নে নির্মাণ করেছে। দ্যুতিময় দীর্ঘ কেশ। দীর্ঘ একটি মণিময় দীপদণ্ড বুঝি। একমাত্র দেবী ক্ষেমার মধ্যে এই জাতীয় রূপগরিমা দেখা ছিল। ইনি যেন আরও অলৌকিক। চিত্রের মতো, বা স্বর্গীয়। ছেল্লনা দেবীর আদেশে যেদিন নৃত্য-গীত করলেন— সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এসেছিলেন দেবী কোশলকুমারী, দেবী ক্ষেমা, দেবী উপচেলা। অন্তঃপুরিকারা সবাই ছিলেন।

প্রমোদগৃহের মুক্ত দ্বারপথে সমস্ত শরীরে অদ্ভুত কয়েকটি চক্রাকার পাক দিতে দিতে প্রবেশ করলেন নটী জিতসোমা। সোনার কাজ করা সূর্যাস্ত বর্ণের মসৃণ দুকূলবসন সঙ্গে সঙ্গে পাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাচ্ছিল। তারপর মণিকুট্টিমের বিভিন্ন জায়গায় নটী পুরো শরীর দিয়ে রক্তকমল ফোটাতে লাগলেন। একে একে বারোটি কমল ফুটল। তখন কক্ষের মাঝখানে জানু ভেঙে বসে তিনি প্রস্ফুটিত কমলিনীর সংগীত গাইলেন। বীণা ছিল না। ছিল শুধু মৃদঙ্গ। অন্তরাল থেকে বাজছিল। গান্ধার-ভবনের দাসীরা এখনও সেই সব নৃত্য ও গীতের কথা গল্প করে। দেবী ছেল্লনা বলেছিলেন— একে রাজগৃহ-নটীর পদ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলে তো সালবতীর নৃত্য-গীত বানরীর লম্ফ-ঝম্প মনে হবে, তাই না জেটঠা!

কোশলকুমারী বলেন— তা নয়। সালবতী যথেষ্ট কুশলী। কিন্তু জিতসোমার সৌন্দর্যের ধরনটি আমাদের অচেনা। তার নৃত্য-গীতের ধরনও তাই। আমরা এরূপ দেখিনি, নটী এই যে গীত গাইলে— এ সুর, এ ভাষা কোথাকার?

—পারস্যের, দেবী। পারসিক বণিকরা গান্ধার ও কাশ্মীরে প্রায়ই যাতায়াত করেন, তাঁদের সঙ্গে পারসিক নটীও আসেন কিছু কিছু। আমার মা শিখেছিলেন তাঁদের থেকেই।

—পরবর্তী সমাজোৎসবে রাজগৃহের প্রধান নৃত্যগৃহে তোমার নৃত্য-গীতের আয়োজন করি? এমন রত্ন পাঠিয়েছেন গান্ধার-রাজ, সবাই দেখুক!

দেবী উপচেলা বললেন— রাজগহে তো কোলাহল পড়ে যাবে জেটঠা এমন নটী দেখলে। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসতে থাকবে।

কোশলকুমারী হেসে বলেছিলেন— অম্বপালীর খ্যাতিও কি ম্লান হয়ে যাবে, ভগিনী উপচেলা? তা হলে বৈশালীর কী হবে?

বৈশালী দেবী ছেল্লনা ও দেবী উপচেলার পিতৃভূমি। দুজনেই বৈশালী সম্পর্কে অত্যন্ত দাম্ভিক ও স্পর্শকাতর। ছেল্লনা বললেন— বৈশালীর সমৃদ্ধি-প্রতিপত্তি কি একমাত্র অম্বপালীর ওপরই নির্ভর করে আছে নাকি?

কোশলকুমারী মৃদু হেসে সম্ভবত তাঁর দুই সপত্নীর গায়ে জ্বালা ধরিয়ে বললেন— সেনাপতি সীহ, অভয় এঁদের বাহুবল, পিতৃব্য ছেটক ইত্যাদির শাসনদক্ষতা, জিন মহাবীরের তপস্যার পুণ্য ইত্যাদির কথা বলছ তো? লোকে কিন্তু বলে থাকে— বৈশালীর প্রতিপত্তির অর্ধেক যদি এঁদের জন্য তো বাকি অর্ধেকের জন্য শংসা প্রাপ্য একা অম্বপালীর।

সমাজোৎসবে বেরোবার নামেই কিন্তু নটী জিতসোমা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর তো কুমারের প্রাসাদে এবং পরে গান্ধার-ভবনে তাঁকে পাঠানো হল। দাস-দাসীদের আশা ছিল— এই গান্ধার-ভবন রাজগৃহের শ্রেষ্ঠ প্রমোদভবন হয়ে উঠবে। ধনী, জ্ঞানী, গুণী, শক্তিমান— নানা ধরনের ব্যক্তি আসবেন। প্রতিদিন নিত্যনতুন সমারোহ হবে। কিন্তু জিতসোমা আর সেভাবে নাচলেন না, গাইলেন না। কখনও কখনও আপনমনে গীত গান, দাসীরা উৎকর্ণ হয়ে থাকে, কিন্তু দু'চার কলি গাইবার পর দেবী নীরব হয়ে যান। তাঁর চলায়, বলায় অবশ্যই একটি অপূর্ব ছন্দ আছে। কিন্তু জিতসোমা দাসীদের সঙ্গে সহজ সখিত্বের ভঙ্গিতে কথা বলতেও পারেন না। তিনি এখনও গান্ধার রমণী, বিদেশিনী। মগধের দাস-দাসীরা তাঁর আদেশ পালন করে কিন্তু মনের তল পায় না। ইনি দূরত্ব রেখে চলেন। তা-ও যতদিন আচার্যপুত্ত ছিলেন, তিস্‌সকুমার ছিলেন, একটা আনন্দের বাতাবরণ ছিল। মহারাজ বিম্বিসার আসতেন, তিনজনে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা জমে উঠত, ভালো ভালো খাদ্য পানীয়র ব্যবস্থা হত। গৃহসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন জিতসোমা। কিন্তু অজ্জ চণক ও তিস্‌সকুমার চলে যাবার পরে এই গান্ধাররমণীর মধ্যে কেমন একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে। প্রতিদিন প্রসাধন ও সাজসজ্জার সেই সমারোহ আর নেই। ভোজ্য তালিকা কী হবে তা নিয়ে দেবী মাথা ঘামান না। গান্ধার-ভবনের সাজসজ্জার সেই পারিপাট্য? তা-ও যেন আগের মতো আর নেই। অথচ তারা বুঝতে পারে এই ভবন এবং এই রমণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মহারাজ বিম্বিসার আসেন, কুমার কুনিয় আসেন, আসেন মহাবেজ্জ জীবকও। এত কি লেখে এই রমণী? এত কী-ই বা বলে? এইসব রাজা-রাজকুমার জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা কী-ই বা এতো আলোচনা করেন এর সঙ্গে?

দ্বিপ্রহর পার হয়ে যাবার পর তারা ভোজনের জন্য তাড়া দিতে গিয়েছিল। কর্ত্রী লেখায় মগ্ন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার মুখ তুললেন, যেন তাদের এই প্রথম দেখছেন।

—ভোজন ? কেন ? কোথায় ?

—সে কি ? আপনি মধ্যাহ্নে খাবেন না।

অনেকক্ষণ বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থেকে কর্ত্রী সহজ হলেন। বললেন— অহো, কী অন্যায়, আমি খাইনি বুঝি ? তোমরা সবাই খেয়ে নাও ধীরা। আমাকে বরং একটু দুগ্ধ দিয়ে যাও।

দুগ্ধ, ফল, মিষ্টান্ন, মধু... দিনের বেলায় এর অধিক কিছু প্রায়ই খাওয়া হয় না। পশ্চিমের বাতায়নের কাছে লেখার ফলকটি টেনে নিয়ে গেছেন কর্ত্রী। রক্তাভ মৃদু আলো এসে পড়ছে পুঁথির ওপর। শ্বেতবসন। শ্বেত উত্তরীয়টি অবগুণ্ঠন দিয়ে মাথা থেকে কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছেন। বিরাট বৈদূর্যের অঙ্গুরীয়টি আঙুলে করে ঘোরাচ্ছেন মাঝে মাঝে, এমনই মুদ্রাদোষ এই গান্ধারীর। অঙ্গুরীয়টি বোধ হয় একটু শিথিলও হয়ে গেছে। কানের হীরাগুলি ঝলকাচ্ছে। ডান হাতের মণিবন্ধের স্বর্ণাভরণ পাশে খুলে রেখেছেন। চাপ পড়লে পুঁথির ভূর্জপত্রগুলির ক্ষতি হতে পারে।

দাসীরা বলাবলি করে দেবী কৃশ হয়ে যাচ্ছেন। বলয় হাতে ঢলঢল করছে। প্রসাধন করেন না, ওষ্ঠাধর দুটি কেমন বিবর্ণ দেখায় নারীদের কী রূপ বিষয়ে এত উদাসীন হতে হয়! কুমার কুনিয়কে তুষ্ট করতে পারলে দেবীর জীবনে বিলাস, শ্রী ও ক্ষমতার নতুন উৎসই খুলে যাবে, সেই সঙ্গে যাবে তাঁর দাসদাসীদেরও। কিন্তু এই রমণীর কোনও বিষয়েই যেন কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

জিতসোমা এখন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এক নীতির কথা লিখছে। সে একেবারে তন্ময়। লিখছে : রাজাদের তিন ভয়। বহিঃশত্রু ভয়, অন্তঃশত্রু ভয় ও আত্ম ভয়। বৈভব এবং ক্ষমতার স্বাদ রাজাকে ভোগী, আত্মপর, শক্তির ব্যবহারে স্বৈরাচারী করে তুলতে পারে। এই হল আত্মভয়। যে রাজা বা রাজশক্তি বোঝে না তার ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা কোনওটাই নিজস্ব নয়, সে রাজশক্তিকে ঘৃণা করে না এমন ব্যক্তি নেই। তার পতনও আসন্ন। রাজভৃতকদের সাহায্যে প্রজাদের ওপর অত্যাচার। প্রজাদত্ত রাজস্বের ব্যক্তিগত ব্যবহার যা পরস্বাপহরণেরই নামান্তর, নিজস্বার্থে যখন-তখন যাকে-তাকে শাস্তি দেওয়া, এই লক্ষণগুলি প্রকাশ হলেই বুঝতে হবে রাজ্য বিপন্ন। রাজা নিজেই নিজের শত্রু।

'অন্তঃশত্রুভয়' অংশে সে লিখল : বহুপত্নীক রাজা মনোযোগ সমবণ্টন করতে না পারলে পত্নীদের মধ্যেই শত্রু সৃষ্টি হবে। ভোজনকালে মার্জারকে বা পাচককে না খাইয়ে তিনি খাদ্যগ্রহণ করবেন না। রাজনীতিক কারণে ভিন্ন রাজ্যের কন্যা বিবাহ করতে বাধ্য হলে সেই কন্যাকে বৈদেশিক রাজার মতোই সম্মাননীয় মনে করবেন। যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে পত্নী বা উপপত্নী গ্রহণ করবেন না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করার আগে জেনে নেবেন তা নিরাপদ কিনা। পত্নীর চেয়েও কঠিন পুত্র পালন করা। উভয় সম্পর্ক থেকেই উপাংশু-হত্যার ভয় আছে। শিশুকাল থেকেই পরিপার্শ্বের কারণে রাজপুত্রের মনে দম্ভ, ভোগেচ্ছা ও রাজ্যলিপ্সা জন্মায়। তাই রাজপুত্র বড় হবেন গৃহ থেকে দূরে আচার্যের কাছে, অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে এক ভাবে, এক নিয়মে। উপযুক্ত আচার্যের কাছে অতিরিক্ত শস্ত্র শিক্ষা ও রাজনীতি শিক্ষার পরও তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হলে তাঁর সঙ্গে উভয়বিধ আচার্য বসবাস করবেন। সুনির্বাচিত যুবাদের পরিকল্পিতভাবে রাজপুত্রের অনুচর করে দিতে হবে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন থাকবেন রাজারও ঘনিষ্ঠ। রাজপুত্র অবিনীত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলে কয়েকজন গূঢ়পুরুষ রক্ষী ও সখার মতো তাঁকে সর্বদা ঘিরে থাকবেন। তাতেও যদি সংযত না হন তো, সেই কুমারকে নির্বাসন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কৌশলে! ঔপরাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে প্রত্যন্ত প্রদেশে পাঠানো হোক। দস্যু ও বহিঃশত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকুন তিনি। এইভাবে যদি সেই দুর্বিনীত রাজকুমারের মৃত্যুও হয়, হোক।

স্পষ্ট মুক্তামালার মতো অক্ষরে এই পর্যন্ত তার ভাবনা-চিন্তা শ্লোকনিবদ্ধ করল জিতসোমা, রক্তাভ রোদে অক্ষরগুলি দেখতে দেখতে চোখ জ্বালা করে জল আসছে। বাতায়নের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল সে। সূর্যাস্তের প্রভায় বৈকাল-স্নান করছে জম্বুবন। আজ এই যে নীতি লেখা হল সেগুলি জম্বুবনের ছায়ায় ছায়ায় অস্তসূর্যের আলো মেখে দূর ভবিষ্যতের দিকে চলে যাচ্ছে— এমনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হল তার। বিম্বিসার, তাঁর পুত্র অজাতশত্রু, তার পুত্র, তার পুত্র। একইভাবে মহারাজ পসেনদি, তাঁর পুত্র বিরূঢ়ব, তার পুত্র, তার পুত্র। মহারাজ পুষ্করসারী তাঁর বংশধারা সমগ্র পৃথিবী, দূরতম সময়ের যে রাজপুরুষরা... তাঁদের ক্ষেত্রেও এই নীতির ব্যত্যয় হবে না। রাজারা যদি একপত্নীক হন, তাঁদের পরিজনভয় কিছু কমবে, কিন্তু রাজাসনে বসলেই যে চরিত্র দুষ্ট হয়ে যাওয়া এই ভয় চিরকাল থাকবে। আচ্ছা, সেই দূর-ভবিষ্যতে সোমার 'রাজশাস্ত্র' পড়ে কি সে সময়ের রাজারা সতর্ক হবেন ? আত্মজিজ্ঞাসু, সংযত হবেন ?

সোমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, দাসী ধীরা এসে সসম্ভ্রমে জানাল কুমার কুনিয় আসছেন। সোমা পুঁথিটি বাঁধল। তার আঙুলগুলি এখন সামান্য কাঁপছে। এই কুমার কক্ষে প্রবেশ করলেই একটা রূঢ় পৌরুষের গন্ধ পায় সে। তার গান্ধারের অভিজ্ঞতাগুলি মনে পড়ে যায়। কিন্তু ভেতরের অস্বস্তি সে গোপন রাখে।

এখন যেমন বুঝতে পারছে, কুমার ঘরে ঢুকেছে। সেই উগ্র গন্ধ, প্রচুর শক্তি, বাসনা, দেহের সঙ্গে মনের অভিন্নতা, আগ্রাসী ব্যক্তিত্ব অথচ কোথায় একটা হীনতা বোধ। এইসব বিকিরণ করতে করতে এই কুমার আসে। একে উপেক্ষা করা কঠিন।

কুনিয়র সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় সে যেমন দাম্ভিক, দুর্দম, নিষ্ঠুর ছিল, এখন ততটা নেই। কিন্তু জিতসোমা এখনও জানে না একে সে জয় করতে পেরেছে কি না। সে বুঝে নেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে কুমারের এই আপাত-সংযম তার কোনও কূটনীতি কি না। সে মুখ তুলে বলল— বসুন কুমার। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য নত হয়ে অভিবাদনও করল।

কুমারের পায়ের কাছে গজদন্তের বহুমূল্য আসন, কুমারেরই উপহার, সেদিকে একবার তাকাল কুনিয়। কিন্তু বসল না। কপাটবক্ষ মেলে যেমন দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়েই রইল। কুনিয়র আকারে বিম্বিসারের মতো সৌষ্ঠব নেই। কিন্তু সে বিপুলদেহী। দেহটি যেন লৌহবর্ম। পেশীতে তরঙ্গ খেলছে। উজ্জ্বল মাজা তামার মতো ত্বক, রোমশ। বাঁ-হাতের বাহুসন্ধি থেকে বাকি হাতটি বক্র। সবসময়ে করতল সমেত উত্তান হয়ে থাকে। মুখটি দেহের তুলনায় ছোট। গম্ভীর, ভ্রূকুটি কুটিল, দাম্ভিক কিন্তু কোথাও যেন একটা বালসুলভ সরলতাও আছে। সে সযত্নে শ্মশ্রু এবং গুম্ফ রাখে। কিন্তু কেশ অধিক দীর্ঘ হতে দেয় না। মাথার চারপাশে কুঞ্চিত কেশগুলি একটি বৃত্তের মতো দেখায়।

AMARBOI.COM

কুনিয় ঘুরে ঘুরে ঘরের মধ্যে রাখা তার উপহারগুলি দেখতে লাগল। মণি-ফলক, রত্নখচিত গজদন্তের ফলক, জিতসোমা লিখতে ভালোবাসে বলে। সূক্ষ্ম দুকূল সব, নানা বর্ণের। কালো মুক্তার অলঙ্কার। দুষ্প্রাপ্য সুগন্ধি। সবই যেমন সে দিয়েছে তেমনি পড়ে রয়েছে।

দাসী এই সময়ে পানীয় নিয়ে এলো। স্ফটিকের পাত্রটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল কুমার। তারপর পানীয় একনিশ্বাসে পান করে ফলকের ওপর রেখে দিল। পীঠিকার ওপর বসল। কর্কশ কণ্ঠে বলল— তুমি কি প্রব্রজ্যা নেবে ?

—না তো!

—তবে ? তর্কসভা ডাকবো না কি ?

—কোনও প্রয়োজন তো দেখি না!

—তা হলে ?

—তা হলে কী ?

—তা হলে শরীর পাত করে এই বিদ্যা-চর্চা কেন ?

সোমা কোনও উত্তর দিল না।

কুনিয় স্বরে ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলল— গণিকার কন্যা গণিকা। এই পরিচয় বুঝি। এই পরিচয় স্বাভাবিক। যা স্বাভাবিক নয় তা ছল বলে সন্দেহ হয়।

—বেদবিৎ বিদ্বানের কন্যা বিদ্যাচর্চা করবে এ-ও তো স্বাভাবিক, নয় কী ?

—গোপনে গণিকাসংসর্গ করে, সে পণ্ডিতের আবার বেদবিদ্যা! কুনিয় বিদ্রূপ করে উঠল।

—চরিত্রের মর্যাদা যদি দিতে না-ও চান, বিদ্যার মর্যাদা তো দিতেই হয়, শান্ত স্বরে সোমা বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—চরিত্র ছাড়া বিদ্যার কী মূল্য ?

—চরিত্র ছাড়া শক্তিরই বা কী মূল্য ?

—শক্তির মূল্য এই যে শক্তি দিয়ে দাস-দাসী কেনা যায়।

জিতসোমার মুখে রক্তাভা দেখা দিল, সে ধীরে ধীরে বলল— দাসী হলে হয়ত কেনা যায়, নইলে যায় না।

—যে অধিক শক্তিমান সে কিনে রাখলে অন্যের পক্ষে কেনা দুষ্কর বটে।

—আপনাকে বলে বলে আমি ক্লান্ত কুমার যে মহারাজ আমাকে বহুদিন মুক্তি দিয়েছেন। আপনি কি কখনও তাঁকে জিজ্ঞাসা করেননি ? উত্তর পাননি ? এই অপমানকর অবিশ্বাসের কারণ কী ?

কুমার বলল— মুক্তি দিয়েছেন ? তা হলে তিনি নিত্য এই গৃহে আসেন কিসের জন্য ?

—সখ্য থাকতে পারে, দায়িত্ব থাকতে পারে, স্নেহও অসম্ভব নয়।

—সখ্য ! হাসালে নটী ! কিন্তু তুমি যদি মুক্তই হবে তবে কোন সম্পর্কে মহারাজের অনুগ্রহ ভোগ করছ ? কোন পরিচয়ে ?

—আপনি তো স্নেহ, সখ্য এসবের কোনটিই বোঝেন না। মানেনও না।

—আমি বুঝি না-বুঝি, তুমি কেন কিছু না দিয়ে ভিক্ষাজীবীর মতো রাজানুগ্রহ ভোগ করছ ? আবার বলছ তুমি মুক্ত ?

কুমার উঠে পড়ল, কক্ষের মধ্যে পদচারণা করতে লাগল— মহান রাজা ! মহারাজ ! সবাই মহান ! মহানুভব। মহর্ষি দেবরাত, মহারাজ বিম্বিসার, মহাশ্রমণ বুদ্ধ, মহাবৈদ্য জীবক। শুধু কুনিয়ই তুচ্ছ। ক্ষুদ্র। তাকে রাজধানী থেকে দূরে একটি উপরাজ্য দেওয়া হয়েছে, ক্ষমতা কিছু নেই। সমস্ত ভোগসামগ্রী, খ্যাতি, যশ পুঞ্জিত হচ্ছে রাজগৃহে। এই রাজগৃহে। যেদিকেই চাও মহারাজ সেনিয় পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

জিতসোমা ধীরে ধীরে বলল— মহানকে মহান বলে স্বীকার করতেও চরিত্রের প্রয়োজন হয়। যাঁর পুত্র হওয়ার সুযোগে নিজেকে রাজকুমার বলতে পারছেন তাঁকে ঈর্ষা করে...

নিজের মুঠিতে মুষ্ট্যাঘাত করল কুমার কুনিয়। হুংকার দিয়ে বলল— পুত্র হওয়ার সুযোগ ? রাজকুমার ? পুত্র হওয়ার সুযোগ কারা পাচ্ছে ? এই রাজগৃহে অতুল ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা ভোগ করে কারা ? কুনিয় ? না মহামহিম অভয়, বিমল কৌণ্ডিন্য, জীবক মহাবৈদ্য ? পথ-কুক্কুরের দল সব ! বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুকে সুদূর চম্পায় নির্বাসিত রেখে মগধের সিংহাসন এইসব প্রিয় পুত্রদের কাউকে দিয়ে যাবার গোপন আয়োজন হচ্ছে কিনা কে বলতে পারে ? আবার বৈশালীর ভাগিনেয় দুটিও তো আছে ! লোভী, নির্বোধ ! যাক, তোমাকেই বা এ সব কথা বলছি কেন নটী ! তুমি তো অবশ্যই মগধরাজের চর। তবে আমি গ্রাহ্য করি না কিছুই। শ্রমণ বুদ্ধের চেয়েও অনেক ঋদ্ধিমান শক্তিধরের আশ্রয় আমি পেয়েছি। আর কাউকে গ্রাহ্য করি না। এখন তুমি বলো নটী, আমার সঙ্গে চম্পায় যাবে কি না, সত্যই যদি মুক্ত হও, কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারে না।

—বারবার আমাকে নটী বলে কোনও লাভ নেই কুমার, নৃত্য-গীত আমি বহু দিন ত্যাগ করেছি। আপনার বা অন্য কারো মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য-গীত করব না, সুতরাং চম্পায় আমায় নিয়ে গিয়ে আপনার লাভ ?

—তোমাকে স্বতন্ত্র প্রাসাদ দেব, বিদ্যাচর্চা করতে চাও স্বচ্ছন্দে করতে পারবে। আমি তোমার সাহায্য চাই জিতসোমা। তুমি বহুদর্শী, বুদ্ধি ধরো, নিজে অনুত্তেজিত থেকে অন্যকে প্ররোচিত করে তার গোপন ভয়গুলি ভালোই জেনে নিতে পারো, যেমন আজ আমার নিলে। চম্পায় চলো, আমার কথা রাখো।— মৃদু অনুনয়ের সুর কি কুমারের কণ্ঠে ?

—যাবো। কিন্তু কোন পরিচয়ে কুমার ? জিতসোমা সহসা কী মনে করে বলল।

এত সহজে সম্মতি পেয়ে কুনিয় অবাক হয়ে গেল। বলল —কেন ! আমার অন্তঃপুরিকা হয়ে ? তোমাকে গান্ধর্ব-বিবাহ করব। অবশ্য অগ্রমহিষী করা যাবে না। কিন্তু তোমার যে-রূপ প্রজ্ঞা তাতে কার্যত তুমিই অন্তঃপুরের কর্ত্রী হবে সোমা। কী ? সম্মত ?

—জিতসোমা ধীরে ধীরে বলল— চম্পায় যাবো। কিন্তু মহিষী হয়ে নয়। অন্তঃপুরের কর্তৃত্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার প্রয়োজন নেই কুমার। আপনার মুখ্য সচিবের পদ দিতে পারেন ? উপযুক্ত ভৃতি দেবেন। প্রাসাদ, রথ, অশ্ব, দাস-দাসী সবই রাজনৈতিক পরামর্শের বিনিময়ে অর্জন করে নেবো।

—নারী সচিব ? —কুমার কুনিয় সবিস্ময়ে বলল, —কেউ কোথাও কখনও শুনেছে ?

—কেন, বারাণসীরাজ এসুকারির বুদ্ধিমতী মহিষী কি রাজার অবর্তমানে রাজ্য পরিচালনা করেননি ? স্বামী বা পুত্রের অকালমৃত্যুতে রাজ্যভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন এমন রানি বা রাজকুমারীরও তো অভাব নেই। কুশকুমার তাঁর অনুপস্থিতিতে জননী শীলাবতীকে রাজ্যভার দিয়ে যাননি ?

—দেশে কোনও রাজা না থাকলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ভৃতিভোগী সচিব হবে নারী ? হয় প্রব্রাজিকা, নয় কুলস্ত্রী। বড় জোর উপাধ্যায়া ! এ ছাড়া আর্য নারীর আর কোনও পরিচয় তো হয় না ! কোনও শাস্ত্রে নারী সচিবের কথা বলে না।

—নারী সচিব হতে পারে না এমন কথাই কি কোনও শাস্ত্রে বলেছে ?

কুমার অধৈর্য হয়ে বলল— বৃথা বাক্যব্যয় করছ সোমা। এসব আমাকে অগ্রাহ্য করার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। যাবে তো চলো, নইলে বলপ্রয়োগ করবো।

—করুন। সোমারও নানাপ্রকার বলের কথা জানা আছে। একটু পরে সোমা বলল— প্রস্তাবটি ভেবে দেখবেন।

কুমার কুনিয় চলে যাবার পর আজ অনেক দিন পর জিতসোমা দাস-দাসীদের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে কথা বলল, সংবাদ নিল অশ্ব ও গাভীগুলির। বেশবাস প্রসাধন করল। এবং দুটি দাসকে নিয়ে রথ ছুটিয়ে দিল বৈভার পর্বতের দিকে। তার মুখ্য উদ্দেশ্য বাইরের বাতাসে শ্বাস নেওয়া। গৌণ উদ্দেশ্য অজিত কেশকম্বলীর কাছে যাওয়া। এই আজীবিক তাকে অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত করেছেন। 'রাজশাস্ত্র'র প্রতিলিপি তো সে আর করছে না। সে নিজেই লিখছে এবং লিখতে লিখতে প্রতিদিন অনুভব করছে এক কঠিন, নির্মোহ, প্রবল বাস্তববোধসম্পন্ন জীবনদর্শনের প্রয়োজন। রাজা যিনি হবেন তিনি মানুষ হলেও মানুষ নন। তিনি প্রতিনিধি। এক অর্থে পুতুল। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কেউই ঠিক সাধারণ মানুষের জ্ঞাতিজনের মতো নয়। প্রত্যেকের থেকে তাঁকে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। শুধু উপাংশু-হত্যাই নয়। অবাঞ্ছিত প্রভাব আছে, অতিস্নেহজনিত দুর্বলতার প্রশ্ন আছে। কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটলে তার কারণ যদি কোনও উচ্চপদস্থ, প্রিয় রাজপুরুষও হন রাজা তাঁকে কঠিন শাস্তি দিতে বাধ্য। তিনি সামগ্রিকভাবে প্রজাদের মঙ্গল দেখেন। কোনও ব্যক্তিবিশেষের শুভসাধনে তিনি দায়বদ্ধ নন। একজনের মঙ্গল তো আরেক জনের পক্ষে মঙ্গল না-ও হতে পারে। রাজা সামগ্রিক মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে ব্যক্তিবিশেষের অপ্রিয় হতে পারেন। রাজশক্তির মানবিকতা ও যান্ত্রিকতা এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়-সাধন অতি কঠিন কর্ম।

আচার্য দেবরাত সম্ভবত এইসব সমস্যার কথা ভাববার সময় পাননি। এবং আচার্যপুত্র রাজনীতির সম্পূর্ণ অন্য একটি দিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সবটাই আদর্শের ব্যাপার এবং আশু ফললাভের অনুকূল নয়। সোমা অতি নিকট থেকে রাজযন্ত্রকে দেখছে। দেখছে বিশদভাবে। তাই তীর্থঙ্কর অজিতের কথাগুলি তার শ্রবণযোগ্য মনে হয়। আজ কুমার কুনিয় তাকে নিজের অজ্ঞাতেই পথের সন্ধান দিয়ে গেছে।

তার মনে পড়ে যখন সে মুক্তি পেয়েই আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, অভিভূত হয়ে গিয়েছিল দৈবরাতের সংসর্গে আসতে পেরে, তখন দৈবরাত তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কতকটা সেই চিন্তারই পুনরাবৃত্তি আজ করে গেল কুনিয়। প্রব্রাজিকা, কুলস্ত্রী, নটী, দাসী এইগুলিই নারীর পরিচয়। এর বাইরে কিছু নেই। কেন নেই ? মহারাজ বিম্বিসারের কাছ থেকে সে সাকেতের দেবী সুমনার কথা শুনেছে। অন্তঃপুরে কোনও গভীর সংকট হলে তিনি তাঁর বাল্যসখী সুমনার পরামর্শ নেন। রাজার অন্তঃপুর তো সাধারণ মানুষের অন্তঃপুর নয় ! সেখানে অসন্তোষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষার বীজ থেকে রাজদ্রোহ জন্ম নেয়। তা নারী যদি এই দ্রোহ শান্ত করতে পারে, নারী যদি 'রাজশাস্ত্র'ও লিখতে পারে তা হলে দায়িত্বপূর্ণ পদলাভে তার বাধা কোথায় ? সোমার জীবন ছিল দিকদিশাহীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও লক্ষ্য ছিল না সামনে। সত্যই তো, সে ভিক্ষাজীবীর অধিক কী ? কুমার ঠিকই বলেছেন। এই রাজপ্রসাদের পরিবর্তে সে তো কিছু দেয় না। কী অধিকারে গান্ধার-ভবনে থাকে সে। আচার্যপুত্রের প্রাসাদ-পরিচালনার ভার নিয়ে এসেছিল, মহারাজের গোপন ইচ্ছা ছিল আচার্যপুত্রের সঙ্গে তার... জিতসোমা সারথির হাত থেকে রাশ কেড়ে নেয়। — দ্রুত চালাও, দ্রুত চালাও সূত...। না। সে স্বাধীন। নিজের যোগ্যতায় নিজেই উপার্জন করবে।

বসে আছেন মহামান্য শ্রেষ্ঠীরা। জটিল শ্রেষ্ঠীকে সামনের পঙক্তিতেই দেখা গেল। রাজসচিব বর্ষকারও আসছেন। কোনও নারী নেই। সামান্য অস্বস্তি। বিন্দু বিন্দু স্বেদ জিতসোমার কপালে। অনেকেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। জিতসোমা প্রাণপণে সমস্ত অস্বস্তি জয় করে একপাশে বসল। অন্য শ্রাবকরা সসম্ভ্রমে দূরে সরে গেল। আর ঠিক তখনই জিতসোমা দেখতে পেল কুমার কুনিয় বসে আছেন জটিল শ্রেষ্ঠীর পাশেই। এবং তার পেছনে ভিড়ের মধ্যে মিশে— লোকপাল। একটি সিন্ধুবারের শাখায় বিরাট একটি উল্কা জ্বালানো হল। সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে। বস্তুত জিতসোমা কিছুই শুনছে না। কুমার বলছিল বটে শ্রমণ বুদ্ধর চেয়েও ঋদ্ধিমান কারো আশ্রয় পেয়েছে সে। এই তীর্থঙ্কর অজিতই কি সেই ব্যক্তি নাকি ? কিন্তু লোকপাল এখানে কেন ? অবশ্যই মহারাজ রাজগৃহের সমস্ত সন্ন্যাসী, শ্রমণ, তীর্থঙ্করদেরই সম্মান দেন, দানও করেন, কিন্তু দেশনা শুনতে যান কি ? আর, লোকপাল বেশেই বা কেন ? তিনি কি নিজেই কুমার কুনিয়র ওপর দৃষ্টি রাখছেন ? চর নিয়োগ করলে ভালো হত না ?

হঠাৎ সোমার শরীর শিউরে উঠল। এ-ও তো হতে পারে মহারাজ তারই ওপর দৃষ্টি রাখছেন। কুমার ঘন ঘন গান্ধার-ভবনে যায়। সে সম্পর্কে মহারাজের সঙ্গে কোনও কথা হয় না। তিনিও প্রশ্ন করেন না, সোমাও বলে না। কিন্তু এই ছদ্মবেশে ? সোমা তো এ বেশ চেনে। সোমার চেনা ছদ্মবেশে তিনি সোমারই ওপর দৃষ্টি রাখবেন ? নাঃ।

দেশনা শেষ হতে না-হতেই সোমা উঠে পড়ল। কুমার তাকে দেখতে না পায়। লোকপালকে কোথাও দেখতে পেল না সে। মনে নানাপ্রকার প্রশ্ন উঠতে থাকলেও একটা কথা সোমার মনে হল—মহারাজ বিম্বিসার নিঃসন্দেহে উত্থানযুক্ত রাজা। উদ্যমী রাজার এইভাবেই চরিত্র নির্দেশ করে সে। সবসময়ই সতর্ক ও উদ্যোগী যিনি তিনিই উত্থানযুক্ত। রাজা যদি উদ্যমী হন, তো অমাত্যরাও উদ্যমী হবে।

আরও রাত্রে আহারাদি শেষ করে, সোমা আবার লেখা নিয়ে বসবে ভেবে পাকশালা থেকে ছোট একটি উল্কা নিয়ে চণকের বাসকক্ষে প্রবেশ করল। ছায়া-ছায়া একটি মূর্তি তার কক্ষের গজদন্তপীঠে যেন বসে আছে।

—কে ? —সে উল্কাটি উঁচু করে ধরল।

আগন্তুক বললেন— দীপ জ্বালো সোমা।

—মহারাজ !

—অভিবাদন করতে হবে না সোমা, বলো কী বুঝলে ?

—কী বিষয়ে কী বুঝবো মহারাজ !

লোকপাল পেটিকার ওপর থেকে পুঁথিটি তুলে নিলেন, বললেন— প্রতিলিপি করছ এই পুঁথির ?

—ধরুন তাই।

—যদি করে থাকো, তা হলে বলো কুমার কুনিয়, অমাত্য বর্ষকার, আজীবিক অজিত এবং দেবরাতপুত্রী একত্র হলে তার কী অর্থ করা যায় !

—আরও একজনকে দেখতে পাননি মহারাজ, তাঁকে বাদ দিয়ে তো অর্থ হতে পারে না।

—আর কে ? লোকপাল ভ্রূকুটি করলেন।

প্রদীপ জ্বেলে, ভস্মাধারে উল্কা নিবিয়ে দিল সোমা। তার পরে বলল— কেন ? স্বয়ং মহারাজও ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে আপনি দেখতে পাননি ?

—সোমা এই রাজগৃহের পর্বতে পর্বতে অতি সূক্ষ্মভাবে বুদ্ধবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে কেউ। কে বা কারা বোঝবার জন্য আমাকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—চর নিয়োগ করতে পারেন না ?

—কোনও কোনও বিষয় আছে, যাতে চরের ওপর নির্ভর করতে পারি না। তুমি যদি এই রাজশাস্ত্রের শেষ প্রকরণটির প্রতিলিপি করে থাকো তো তোমার জানা উচিত রাজা প্রকৃতপক্ষে নির্বান্ধব। ভৃত্যদের ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য আরও ভৃত্য, তাদের ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য আবার আরও ভৃত্য... এই প্রকার সংশয়চক্র স্থাপনে আমার বড় বিরাগ।

—মহারাজ, শ্রমণ বুদ্ধ কি আপনাকে তাঁর দায়িত্ব দিয়েছেন ?

—তা নয় সোমা।

—তিনি আত্মরক্ষা করতে জানেন, আপনার ওপর নির্ভর করে তিনি ধম্ম প্রচার করতে আসেননি। আপনি নিজেকে রক্ষা করুন।

—অমাত্য বর্ষকার এবং কুনিয়র যোগাযোগের কথা বলছ কি ?

—বলছি, কিন্তু এঁরা কেউ ছদ্মবেশে ছিলেন না। গোপন করতে যাননি যে অজিত কেশকম্বলীর দেশনা শুনতে গিয়েছেন। সে অধিকার তো সবারই আছে।

—ঠিকই। আছে। তবু এই দৃশ্য আমার স্বাভাবিক লাগেনি।

—কেন লাগেনি ভাবুন মহারাজ। আর যদি ভাবতে বিরাগ বোধ করেন তো সোমাকে ভাবতে দিন।

—সোমা কি একা একাই এ সব কথা ভাবতে পারবে ? সোমার চক্ষু কোথায় ? কর্ণ কোথায় ?

—তবে চক্ষু এবং কর্ণ দিন সোমাকে। সোমা তার অধীত শাস্ত্র প্রয়োগ করুক।

লোকপাল ভাবতে লাগলেন। কিছু পরে বললেন— সোমা তা হলে তোমায় আবারও নটী হতে হয়।

সোমার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, সে বলল— আরও একটি পথ তো আছে মহারাজ, ভাবতে পারেন না কেন ?

—কী পথ ?

—সোমাকে তো অমাত্য-পদও দিতে পারেন ?

—অমাত্য ? লোকপাল বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সোমা বলল— না, না, সোমা অমাত্য কেন হবে, মহারাজ ? নারী যে ! যত গুরুত্বপূর্ণ কর্মই করুক, রাজাকে ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করা, রাজপুত্রকে সুপথে পরিচালনা করা, রাজ্যশাসনের নীতিগুলিতে সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বাস্তব পরিবর্তন করা, যা-ই হোক না কেন, তাকে তা করতে হবে হয় অবরোধের মধ্য থেকে, আর তা নয়ত শত পুরুষের বিকৃত মনোরঞ্জনের কুৎসিত দায় নিয়ে জীবন শেষ করতে করতে। আশ্চর্য এই, আপনার মতো শক্তিমান হৃদয়বান পুরুষেরও এ কথা বলতে লজ্জা হয় না মহারাজ, কারো তো হয়ই না, আপনারও হয় না, এমন কি আপনারও হয় না !

—কী বলছ সোমা ? তুমি কাঁদছ নাকি ?

সোমার বুক ফুলে ফুলে উঠছে, সমস্ত দেহের বর্ণে রক্তিমা। সে বলল— কান্না পরাধীন নারীর অস্ত্র। অজ্ঞ, অসহায়, দুর্বল রমণীর মোহন অস্ত্র মহারাজ। যে নারী 'রাজশাস্ত্র' লেখে সে কাঁদে না।

লোকপাল সোমাকে শান্ত করতে তার শির স্পর্শ করতে গিয়েছিলেন। কী ভেবে পেছিয়ে এলেন। বললেন— সোমা, তুমি যা বলছ তা আমি কখনও শুনিনি। কিন্তু তুমি রাজশাস্ত্র লেখার কথা কী বললে ? দেখলাম পুঁথিতে যতটা লেখা হয়েছে তার শেষে লিখেছ ইতি সোমচণককৃত রাজভয়নাম সপ্তদশ প্রকরণ। তুমি কি নিজেও প্রণেতা...

সোমা তখনও শান্ত হয়নি। লোকপাল বললেন, —সোমা, বিম্বিসার তোমাকে অমাত্য পদ দিতে পারে। তোমার সে যোগ্যতা আছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই সমাজ নারীপুরুষের কর্মবিভেদ-রেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে ভিক্ষুণী ক্ষেমা শুনেছি অভিজ্ঞাসম্পদে সবার শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছেন। তিনি তথাগতর অগ্রশ্রাবিকা। তাঁকে আজকাল বাগ্মিতার জন্য পট্‌ঠা, ভাণিকা ইত্যাদি বলা হচ্ছে। কিন্তু থের সারিপুত্ত বা মোগগল্লানের মতো তথাগতর প্রতিনিধিত্ব করতে তো তাঁকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজও দেখিনি! হয়ত আমি তোমাকে অমাত্য পদ দেবো, কিন্তু... তুমি ঠিকই ধরেছ সোমা পত্নী ব্যতীত অন্য নারীর কাছে কাম-উপভোগের জন্য গেলে কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু পরামর্শের জন্য গেলে, গম্ভীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য গেলে সবাই ভ্রুকুটি করবে। অথচ নারীর কাছ থেকে যে পরামর্শ নেওয়া হয় না, তা-ও সত্য নয়। সোমা... একটু... আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।

৯

অঙ্গরাজ্যের পূর্বপ্রান্তে যে গ্রামটিতে পৌঁছলেন চণক তার কোনও নাম নেই। ভূমিতে এত ঘাস, গুল্ম, যে মনে হয় না মানুষ বাস করে। পূর্বে-দক্ষিণে জঙ্গল। কয়েকটি কুটির এখানে-সেখানে। এতদিন যা দেখেছেন যত দরিদ্রই হোক খানিকটা গোচর, একটি সভাপ্রাঙ্গণ, পরপর শস্যক্ষেত, শস্য ঝাড়াই করবার অঙ্গন, এগুলি অন্তত গ্রামে থাকতই। কেমন পরিত্যক্ত আকৃতি এ গ্রামটির। আয়তনেও ছোট। চণকের তীব্র পিপাসা পেয়েছিল, তিনি কোনও কূপ বা পুষ্করিণী চোখের সামনে দেখতে পেলেন না। তাই একটি কুটিরের দ্বারে গিয়ে আঘাত করলেন। অনেকবার আঘাত করবার পর ভেতর থেকে ছিন্ন-মলিন বসন পরা একটি পুরুষ বেরিয়ে এলো।

—আমি অতিথি, একটু জল পাবো?

লোকটি কিছু না বলে অন্তর্হিত হল। কিছুক্ষণ পর একটি কাংস্যপাত্রে জল নিয়ে এলো, পাত্রটি সুন্দর, সুগঠন। কিন্তু তেমন পরিষ্কার নয়। চণকের ঘৃণা হচ্ছিল কিন্তু তিনি জল পান করলেন।

—কী নাম এ গ্রামের?

—নাম নাই। এ কোনও গেরস্ত গাম নয়। আশেপাশে দেখুন। রুক্ষ গলা লোকটির।

চণক সামান্য অবাক হলেন। সারা অঙ্গ-মগধের যতগুলি গ্রামে তিনি গেছেন কোথাও আতিথ্যের অভাব হয়নি। সকলে হয়ত সমান সমাদর করেনি, করবার ক্ষমতাও সবার ছিল না। কিন্তু এরূপ ব্যবহার তিনি কোথাও পাননি।

কিছুদূর এগিয়ে আরেকটি কুটিরের দরজায় তিনি আঘাত করলেন। একটি বৃদ্ধ বেরিয়ে এলো। আপাদমস্তক তাঁকে দেখে নিয়ে বলল— কোথা হতে আসছেন?

—রাজগৃহ। লোকটি চমকে উঠল।

—কোথায় যাবেন?

—আপাতত এই গ্রাম।

—কিন্তু এখানে তো অতিথ্ সেবার কোনও ব্যবস্থাই নেই! বৃদ্ধা ছাড়া ইস্থি নেই... চণক কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। বললেন— এখন তো আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। কিছুটা বিশ্রাম নিতে হবেই। আমার সেবার জন্য ভাবতে হবে না। এই প্রাঙ্গণে আজ রাতটা হয়ত থাকবো। কালই আবার চলে যাবো। তিনি ধূলিধূসর প্রাঙ্গণে নিজের পেটিকা থেকে আসন বার করে বিছিয়ে বসলেন।

অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধটি বেরিয়ে এসে বলল— পেছনে কুয়ো আছে। আমার তো জল তোলার শক্তি-মক্তি নেই...

—না, না, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু দেখিয়ে দিন।

বৃদ্ধের পেছন পেছন গিয়ে চণক কুটিরের পেছনে কূপ দেখতে পেলেন। হাত-পা-মুখ ধুচ্ছেন, বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করল— আপনি কি রাজপুরুষ?

—ধরুন তাই।

—এদিকে এসেছেন...

—রাজ্যের সংবাদাদি নিতে তো রাজপুরুষ আসতেই পারেন। পারেন না?

—ঘোড়া নেই, সাজ নেই, তরোয়াল নেই...

—এইসব ছোট ছোট গ্রাম, সংকীর্ণ পথ—ঘোড়া কি এখানে চলবে? আর সাজ? সাজের প্রয়োজন কী?

—অস্তর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অস্ত্র আছে। রাজমুদ্রাও আছে। দেখবেন ?

—না, না। বলছেন যখন, নিশ্চয়ই আছে।

কুয়োর জলে চিঁড়ে ভিজিয়ে, মধু মিশিয়ে ভোজন সারলেন তিনি। সবই সঙ্গে ছিল। শুধু পাত্র চেয়ে নিতে হল। সেই অপরিষ্কার কাংস্যপাত্র। কূপের পাশ থেকে মাটি তুলে নিজেই পাত্রটিকে ভালো করে মেজে নিলেন তিনি। ভোজনের আগে বৃদ্ধকে বললেন— আপনি একটু খান।

—না, না, —বৃদ্ধ বলল— আমার খাওয়া হয়ে গেছে। তারপর বলল— বেলা দু পহর হল অতিথিকে কিছু খেতে দিতে পারলাম না... রাজভট আমাদের ক্ষমা করবেন। তবে একটু দুধ দিতে পারি, নেবেন কী ! দুঃপ্রকাশ করলেও বৃদ্ধের মুখভাবে দুঃখের কোনও লক্ষণ নেই।

কোথা থেকে এক পাত্র দুধ গরম করে এনে দিল বৃদ্ধ কে জানে ! চণকের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ হতে পারে মনে করে তিনি একটু পান করলেন। স্বাদ ভালো নয়। অর্ধেকটা পান করে তিনি পাত্রগুলি ধোবার ছল করে কূপের কাছে গিয়ে দুধটি ফেলে দিলেন। ফিরে বৃদ্ধটিকে আর দেখতে পেলেন না। প্রাঙ্গণে একটি নিমগাছ। তেমন ছায়া নেই। তবু তার তলাটা একটু পরিষ্কার করে, বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়ে চণক বসে রইলেন। পেটিকা দুটি তাঁর জানুর তলায়। পাদুকা খুলে, পরিষ্কার করে আবার পরে নিয়েছেন। বসে থাকতে থাকতে তাঁর তন্দ্রা মতো এলো। তাঁর কেমন মনে হল, বৃদ্ধ একা নয়। এই কুটিরে আরও লোক আছে। শুধু এই কুটিরে নয়, সব কুটিরেই। এই বৃদ্ধটি বা অন্য কুটিরের শীর্ণ লোকটি যেন নিদ্রা যাচ্ছিল। ভাবতে ভাবতে চণক ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন— লোকজনে পূর্ণ এক সমৃদ্ধ নগর। তিনি হট্টে এসেছেন। নানাপ্রকার পণ্য। বহু লোকে ক্রয়-বিক্রয় করছে। কিন্তু সবাই মূক। ইঙ্গিতে কাজ সারছে। প্রত্যেকে যাবার সময়ে ইঙ্গিতে চণককে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে— ঘোড়া কোথায় ? সাজ কোথায় ? অস্তর কোথায় ? তারপর স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। যখন ঘুম ভাঙল অমানিশির ঘন অন্ধকার দেখে চণক বুঝলেন তিনি এত ঘুম সম্ভবত জীবনে কখনও ঘুমোননি। উঠে বসতে, হাত-পা নাড়বার চেষ্টা করতে দেখলেন সেগুলি এখনও ভারী হয়ে আছে। অনেক চেষ্টায় বৃক্ষকাণ্ড ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে তিনি বুঝলেন তাঁকে কোনও তীব্র নিদ্রাকর্ষক ভেষজ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর পাদুকা নেই। ওই পাঁচ তলিকা চর্ম ও কাষ্ঠের পাদুকা বিশেষভাবে প্রস্তুত। ওর মধ্যে তাঁর পাথেয় থাকে। তবে জানুর তলা থেকে চর্মের পেটিকাটি ওরা নিতে পারেনি। বেত্রপেটিকাটি একপাশে পড়ে রয়েছে। তাতেও হাত দেয়নি। চর্মপেটিকার মধ্যে তার বেশবাস ছাড়াও আছে তীর ও ছুরিকা। ধনু তিনি নিজেই কাজ চালাবার মতো নির্মাণ করে নেন। চণক অরণি কাষ্ঠগুলি বার করলেন, অনেক চেষ্টায় আগুন জ্বেলে পেটিকার মধ্যে রাখা একটি ক্ষুদ্র উল্কা জ্বালালেন, ছুরিকাটি হাতে নিলেন তারপরে কুটিরের খোলা দ্বার দিয়ে ঢুকলেন। দুটি মাত্র ভাগ ঘরটির। তুষ ও খড় বিছানো। ইঁদুরে প্রচুর মাটি তুলেছে। ঘরের হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে চণক বুঝতে পারলেন— এখানে রাত্রে অনেকেই ছিল। অন্য কুটিরগুলিতেও তিনি সন্ধান করে দেখলেন— একই অবস্থা মনে হল। সব কুটিরগুলিরই পেছন দিকে একটি বড় গহ্বর। মহামারী হলে লোকে এরূপ গর্ত করে গৃহ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ক্রমে অন্ধকার তরল হলে পরিত্যক্ত গ্রামটির আকৃতি তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট হল। জীবকের দেওয়া একটি ভেষজ খেয়ে তিনি খানিকটা সুস্থ বোধ করলেন। তারপর একটি বড় গাছ দেখে তার ওপর চড়ে চারদিক দেখতে লাগলেন। লোকগুলি পালিয়ে গেছে, তাঁর পাদুকা নিয়ে গেছে, অর্থাৎ চোর। দিনের বেলায় সবাই ঘুমোচ্ছিল, এরা তা হলে রাত্রে দস্যুবৃত্তি করে। আর কী ? দস্যুবৃত্তি করে অথচ অশ্ব গাধা, কোনও পশুই নেই। নেই কী ? একটি অন্তত গাভী নিশ্চয় আছে না হলে দুধ দিল কী করে ? চারিদিকে বহু দূর দৃশ্যমান, অতগুলি লোক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, রুগ্‌ণ এরাও আছে, দস্যু যখন কিছু অপহৃত দ্রব্যাদি নিশ্চয় আছে। এত সব নিয়ে এরই মধ্যে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল !

তাঁর কী মনে হল তিনি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন— ভো দস্যুগণ, এই রাজপুরুষ তোমাদের শাস্তি দিতে আসেননি। — মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসার প্রত্যন্ত দেশে প্রজাদের দুর্দশা দূর করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। এখনও যদি আত্মসমর্পণ না করো, অন্য গ্রামবাসীরা যা পাচ্ছে সে সুযোগ তোমরা আর পাবে না। পূর্বের জঙ্গলে, দক্ষিণের জঙ্গলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকক্ষণ ধরে এইভাবে ঘোষণা করার পর চণক গ্রামটিতে ফিরে এলেন। কূপের জলে স্নান করে, বেশ পরিবর্তন করে, কিছু শুকনো মণ্ড খেলেন, জলপান করলেন। তারপর সেই নিমগাছের তলায় বসে বসে রাজশাস্ত্র রচনা করতে লাগলেন।

মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন লেখায়। সামনে একটি ছায়া পড়ল। চকিতে পেছনে ফিরলেন চণক। সেই বৃদ্ধ। তার হাতে তাঁর পাদুকা দুটি।

সে দুটি তাঁর পায়ের কাছে রেখে সে একপাশে জড়সড় হয়ে বসল। হাঁটু দুটি উঠে আছে। তাঁর শ্বেত শ্মশ্রু হাঁটুর ওপর পড়েছে। চণক পেটিকা থেকে লোলার দেওয়া, তিলের মণ্ড বার করে তার দিকে এগিয়ে দিলেন। লোকটি নিচ্ছিল না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন— এতে কিন্তু কোনপ্রকার বিষ বা নিদ্রাকর্ষক ভেষজ মেশানো নেই। লোকটি নড়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে মণ্ড নিল। চণক আবার লেখায় মন দিলেন।

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ বলল— আপনি আচারিয় না রাজভট!

—দুই-ই হাতে পারি, চণক পুঁথি থেকে মুখ না তুলে বললেন।

—ও পুঁথি কিসের?— সসম্ভ্রমে লোকটি বলল।

—রাজ্য পরিদর্শন করে যা অভিজ্ঞতা হচ্ছে সব লিখে রাখছি। মহারাজের আদেশ।

—আমাদের ক্ষমা করুন। বড় দলিদ্দ আমরা। লোকটি কাঁদো কাঁদো।

—তোমরা কে?

—আমরা? আমরা হতাভাগার দল!

কী রূপ হত তোমাদের ভাগ্য শুনি!

বৃদ্ধ কিছু সাধ্য-সাধনার পর বলল।

—পোতলি বলে একটি ছোট গামে থাকতাম। কম্মারগাম। নিতান্ত অপ্পোধন (অল্প ধন) বসস্ন হল না, শস্য জ্বলে গেল, কস্সকের ঘরেই অন্ন নেই, আমরা অনাহারে মরতে লাগলাম। শিশুগুলি মরে গেল, অনেক বৃদ্ধ, ইত্থিরাও মরে গেল। তরুণীগুলিকে, সমর্থ রমণীদেরও বিক্রয় করে দিলাম। তার পরিবর্তে কিছু শস্য পাই। কিছুদিন চলে গেল। কিন্তু পরবৎসরও সময়ে বসসন হল না। গামের যুবারা, আর আমরা যে কজন বৃদ্ধ ছিলাম...

চণক বললেন— দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করলে?— বৃদ্ধ মুখ নিচু করে মাথা নাড়ল।

—তারপর?

—আশপাশের গামের লোক জানতে পেরে প্রহার করে আমাদের তাড়িয়ে দিল। ভস্ত্রাগুলি আর কিছু কিছু যন্ত্র নিয়ে অনেক স্থান ঘুরতে ঘুরতে এই স্থানে এসে পড়েছি। দেখছেন তো পরিত্যক্ত গাম। কোনও সময়ে মহামারী হয়েছিল, মনে হয় লোকে কুটিরগুলি ফেলে চলে গেছে আর ফিরে আসেনি। এখানেই সম্প্রতি আশ্রয় নিয়েছি। ভোররাত পর্যন্ত যুবারা যা পায় দস্যুবৃত্তি করে আনে। অনেক সময়েই কিছু পায় না। তেমন অস্তর-শস্তর যান কিছুই তো নাই। অপ্পোবলও (অল্পবলও) বটে। যা আনে অন্নের ব্যবস্থা করতেই শেষ হয়ে যায়। আমার আর এক জনের পত্নী বর্তমান, তারাই কোনক্রমে পাক-সাক করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। বলে বৃদ্ধ চোখ মুছতে লাগল।

—তোমাদের কুঠার আছে?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বলল— কুঠার? কী হবে?

—আছে কি না বলো না। কৃষ্ণায়সের ভালো কুঠার?

—হ্যাঁ, তা আছে। যতগুলি নির্মাণ করেছিলাম, বিকোলো না...

—যুবাদের ডেকে আনো। ভয় নেই।

অনেকক্ষণ পরে দুজন চারজন করে মলিন ছিন্ন বসন পরা শ্মশ্রু-গুম্ফে ঢাকা মুখ যুবাগুলি আসতে লাগল। সবাই একত্র হলে চণক দেখলেন, একুশ বাইশটি যুবক, তিন চারজন বৃদ্ধ, দুটি বৃদ্ধা...

—গাভী কটি আছে।

—তিনটি।

—কুঠার কটি? লোকগুলি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কুঠার কটি ?— চণক আবার প্রশ্ন করলেন।

—আছে। যতগুলি মানুষ ততগুলিই প্রায়।

—শাণিত করো তো প্রায়ই ? এক ঘায়ে মানুষ বা পশুর মুণ্ড কাটতে পারো ?

যুবাগুলি নীরব। একটি বৃদ্ধা কেঁদে উঠল।

চণক বললেন— যদি একঘায়ে নরমুণ্ড কি পশুমুণ্ড কাটতে পেরে থাকো, তো কিছু বৃক্ষও কাটতে পারবে। যতগুলি পরিবার আছ তত কুল্যবাপ ভূমি এই জঙ্গলের মধ্যে মেপে দেবো। তার মধ্যে বৃক্ষগুলি কেটে, গুল্ম পরিষ্কার করে এবং পুড়িয়ে বাপক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। এই গ্রামভূমিতে পরিচ্ছন্ন কুটির বাঁধতে হবে। কম্মার শাল বসাবে। কিন্তু সকলকে একই বৃত্তি নিলে চলবে না।

—কসসন আমরা জানি না অজ্জ।

—কর্ষণে অভিজ্ঞ লোক আমি ভিন্ন গ্রাম থেকে আনাবার ব্যবস্থা করছি। বীজের ব্যবস্থাও করব। লাঙল তোমরা নির্মাণ করে নেবে। রাজা হালের বলদ, বীজ ধান, এবং যতদিন না প্রথম শস্য হয়, খাদ্য সংস্থানের জন্য সহায়তা করবেন। তোমাদের অপহৃত দ্রব্য কী কী আছে দেখি।

প্রথমে কেউই কিছু বলতে চায় না। অবশেষে জানা গেল জঙ্গলে মাটির তলায় পোঁতা আছে প্রচুর কাংস্যপাত্র। কোশলের কোনও সার্থর ওপর দস্যুবৃত্তি করে সেসব সংগ্রহ করেছে এরা। তাম্রপিণ্ড ও কৃষ্ণায়সও আছে যথেষ্ট। খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত ধান, চিঁড়ে, লবণ এবং গুড় যা আছে অন্তত মাসেককাল চলবেই।

এইভাবেই রাজপোতলি গ্রামের পত্তন হল। এবং রাজপোতলিই মগধ রাজ্যে প্রথম গ্রাম যেখানে সর্বপ্রকার বৃত্তির প্রজাই বাস করে। কম্মার, কুম্ভকার, কর্ষক, গো-পালক, গো-বৈদ্য, নহাপিত, সূত্রধার, পর্ণিক, আপণিক... সব। উপরন্তু রাজপোতলিই হল মগধরাজ্যের প্রথম রক্তহীন রাজ্যবিস্তার। জনপদনিবেশ।

এই প্রথম চণক তাঁর 'রাজশাস্ত্রে' আলোচিত একটি নীতি অনুযায়ী কাজ করতে পারলেন। 'জনপদনিবেশ' নামে প্রকরণে তিনি লিখেছিলেন—জনপদ রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দুর্গ বা পুর এবং জনপদ বা গ্রাম স্বতন্ত্র থাকবে। জনপদসম্পদ রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। পরিত্যক্ত, ভূতপূর্বই হোক অভূতপূর্বই হোক জনপদ রাষ্ট্র স্বীয় তত্ত্বাবধানে নতুন করে সৃষ্টি করবে। কমপক্ষে পঞ্চাশটি ও সর্বাধিক পাঁচশ পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা থাকবে এই জনপদে। প্রধানত কর্ষক থাকলেও সকল বৃত্তির প্রজা জনবহুল অঞ্চল থেকে এনে বাস করাতে হবে। রাজসাহায্যে কৃতক্ষেত্র এই সকল ভূমি ঐকপুরুষিক হবে। অর্থাৎ এক পুরুষই মাত্র তার ওপর প্রজার অধিকার থাকবে, কিন্তু পরবর্তী পুরুষ রাজার কাছে আবেদন করে ভূমির অধিকার পেতে পারে। কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণাদি— বীজ, গবাদি পশু, অর্থ সবই পিতৃসম রাজা প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করবেন। তবে প্রজা এগুলি ঋণ বলে গ্রহণ করবেন। ক্ষেত্রবিশেষে উদ্যমী প্রজাকে নিষ্কর ভূমি দেওয়া যেতে পারে।

জঙ্গল পরিষ্কার করার প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হয়ে যাবার পর গ্রামবৃদ্ধটিকে কর্মাধ্যক্ষ রেখে চণক চম্পার দিকে যাত্রা করলেন গঙ্গাপথে। চম্পাতেই তিনি তাঁর অশ্ব, আরও কিছু অস্ত্র, ধন ইত্যাদি রেখেছিলেন। রাজপোতলির জন্য তাঁকে বীজ গোধন ইত্যাদি আনতে হবে।

যে আবসথাগারে তাঁর দ্রব্যাদি অশ্ব গচ্ছিত রেখেছিলেন, সেটির প্রভু শুনেছিলেন মগধের ধনীশ্রেষ্ঠ মেণ্ডক। এবারে চম্পায় গিয়ে তাঁর প্রধান লাভ হল মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়। চণকের কাছে মগধরাজের যে মুদ্রা আছে তারই বলে তিনি মগধরাজ্যের যে কোনও ঔপরাজ্যের কোষ থেকে অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য পেতে পারেন। কিন্তু চম্পার প্রশাসন-ব্যবস্থা কিছু জটিল। শাসন-ভার মগধের, কিন্তু চম্পা-নগরীর রাজস্ব ব্রাহ্মণ সোনদণ্ডকে দান করেছেন বিম্বিসার। নগরীর রাজস্ব এবং অঙ্গ-রাজ্যর বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব, সার্থদের থেকে সংগৃহীত শুল্কাদি, সবই এক রাজকোষে সংগৃহীত হয়। পরে ভাণ্ডাগারিক গণনা ও পরিমাপ করে সেগুলি স্বতন্ত্র করেন। চণক শুনলেন উপরাজ অজাতশত্রু এখন রাজগৃহে। তাঁর অনুপস্থিতিতে কিছু করা যাবে না। ভাণ্ডাগারিক মহোদয়ই তাঁকে পরামর্শ দিলেন—মেণ্ডকশ্রেষ্ঠী এখন চম্পায় অবস্থান করছেন। তাঁর কাছে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যান।

আবসথাগারের সংলগ্ন গৃহটিই মেণ্ডকের। চণকের যেতে কোনও অসুবিধা হল না। মেণ্ডক যে শুধু তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন তাই নয়, চণকের যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়ে দেবারও ব্যবস্থা করলেন।

ছিলেন মেণ্ডক এবং তাঁর পুত্র ধনঞ্জয়। উভয়ের সঙ্গেই পরিচয় হল। প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর মেণ্ডক অনেক অনুরোধ করে তাঁদের গৃহেই চণকের থাকবার ব্যবস্থা করলেন। চণকের জনপদনিবেশের পরিকল্পনা শুনে উভয়েই চমৎকৃত হলেন।

চণক বললেন— কী অদ্ভুত দেখুন, এই যে সামান্যজন, এরা তো নিজের উদ্যোগেই ওই বন পরিষ্কার করে গ্রাম বসাতে পারতো! কিন্তু করেনি। তার পরিবর্তে দস্যুবৃত্তি করল। কর্ষণ জানে না এটা কোনও কারণই নয়। কেননা নিজেদের খাদ্যের উপযোগী কিছু শাক-পর্ণ উদ্বৃত্ত সমেত উৎপন্ন করা এই উর্বর মৃত্তিকায় যে কেউ করতে পারে!

মেণ্ডক বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু একটুও ন্যুব্জ হননি। মাথাটি সোজা করে বললেন,— দেবরাত, এই উদ্যোগ বা ভূমি অধিকার করার সাহস হয়নি বলেই, এরা সামান্যজন।

চণক বললেন— একজনও তো বলতে পারতো— এই অকর্ষিত বনভূমি কারো নয়। আপনি কোথা থেকে কে রাজভৃত্য এলেন, এই বন পরিমাপ করতে?

ধনঞ্জয় বললেন— যে মুহূর্তে মহারাজ বিম্বিসার অঙ্গদেশ জয় করেছেন, সে মুহূর্তেই সম্ভবত স্থির হয়ে গেছে যতদূর পর্যন্ত অন্য কোনও রাজার অধিকারসীমা আরম্ভ হচ্ছে, ততদূর পর্যন্ত মগধরাজেরই।

—কিন্তু এরা মহারাজ বিম্বিসারের নাম জানে না। অস্পষ্টভাবে জানে শুধু রাজগৃহ একটি ক্ষমতা-কেন্দ্র। এরা অঙ্গর প্রজা না মগধের, অঙ্গমগধ এক কি না এসব রাজনৈতিক চেতনা এদের নেই।

মেণ্ডক হেসে বললেন— তা যদি বলো আয়ুষ্মান, এ রাজনৈতিক চেতনা যতদিন না জাগে ততদিনই ভালো। রাজাদের ভালো। রাজার আশ্রয় ও রাজার প্রশ্রয়স্বরূপ যারা সেই শ্রেষ্ঠীকুলেরও ভালো।

—কেন পিতা, আপনি কি মনে করেন এই সামান্যজনেদের অজ্ঞতার ওপরই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা! শ্রেষ্ঠীদের প্রতিষ্ঠা! রাজারা কি বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠীরা কি ধনবলের দ্বারা এদের রক্ষা করেন না?

মেণ্ডক মাথা নেড়ে বললেন— ধনঞ্জয়, এদের চেতনা নেই। কিন্তু রাজারা অন্তত মহারাজ বিম্বিসারের মতো রাজারা জানেন ভূমি প্রকৃতপক্ষে কার। তোমার আমার মতো শ্রেষ্ঠীরা জানি ধন কোথা থেকে কীভাবে আসে। তাই আমরা এদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্যের অঙ্গ বলে জানি। কিন্তু সকল রাজা, সকল শ্রেষ্ঠীর যদি সে চেতনা না থাকে? যদি কালক্রমে এঁরা সবাই ভুলে যান যে ভূমি সবার, বাহুবলে, বুদ্ধিবলে তাকে তাঁরা ভোগ করছেন, লাভ সংগ্রহ করছেন এইমাত্র।

ধনঞ্জয় বললেন এই চেতনার প্রচারই তো করছেন ভগবান বুদ্ধ। তিনি শ্রেষ্ঠীদের দান-যজ্ঞ করতে বলছেন। দান-যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, অন্য যজ্ঞ নয়। এমন কথা তো আমরা আগে কখনও শুনিনি। ইনি সামাজিক বা আর্থিক বিন্যাসের একটি মূল সূত্র ধরতে পেরেছেন।

চণক বললেন— কিন্তু শ্রেষ্ঠীবর, দান কি দারিদ্র্য সমস্যার পূর্ণ সমাধান করতে পারে? দান তো একটি বিরাট দরিদ্র শ্রেণীকে চিরকাল ভিক্ষুক করে রেখে দিচ্ছে। তারপর দেখুন এরা যদি জানে সংসার পালনে বা অন্যভাবে কোনও অভাব উপস্থিত হলেই কোনও দানবীরের কাছ থেকে সে অভাব পূর্ণ হবে তা হলে উদ্যোগ-উদ্যমের কোনও স্থানই কি থাকছে জীবনে?

উপরন্তু এই ভগবান বলছেন সংসার দুঃখময়। জীবনকে, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক সুস্থ প্রকাশগুলিকে দমন করে, প্রত্যাখ্যান করে তবে দুঃখচক্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় এবং তাই-ই নির্বাণ ও আনন্দ। অর্থাৎ জীবনের বিপরীতে আনন্দের অবস্থান। মানুষ যদি লৌকিক জীবনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটাই ধম্ম বলে বোঝে তা হলে এ জীবনকে উন্নত করবার জন্য কোনও উদ্যমই তো তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে না। দেখুন শ্রেষ্ঠী, ইনি একটা বিরাট জনশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছেন কিন্তু।

ধনঞ্জয় মেণ্ডক দুজনেই বললেন— আপনি ভগবান বুদ্ধকে দেখেছেন ? তাঁর কথা শুনেছেন ?

চণক বলল— দেখেছি। সেটাই তো সমস্যা। ইনি অলৌকিক ব্যক্তিমায়ার অধিকারী। এঁর মুখ থেকে এসব কথা শুনলে সেই মুহূর্তে আমার মতো তার্কিক, সংশয়ীরও মনে হয়, ঠিক, ঠিক। একেবারে ঠিক। বড় সুন্দর, শান্ত এই বুদ্ধচ্ছটা, বুদ্ধমণ্ডল, এর মধ্যে প্রবেশ করি।

মেণ্ডক মন দিয়ে শুনতে শুনতে মাথা নাড়ছিলেন। ধনঞ্জয় বললেন— কিন্তু লৌকিক জীবনকে উন্নত করার জন্য ইনি শীল পালনের কথা বলে থাকেন, সেটি শুনেছেন ?

—শুনেছি— চণক বলল— ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের ধারণাই বা মন্দ কিসে ? একটা সুষম নিয়ন্ত্রিত জীবনের আদর্শ চতুর্বর্গ থেকে পাওয়া যায় না কী ? ইনি যে পঞ্চশীলের কথা বলেন— তা তবু বোঝা যায়, কিন্তু অষ্টশীলের কথা চিন্তা করুন। সাধারণ সমাজ জীবনযাপনে রত মানুষের পক্ষে এই অষ্টশীলের অনেকগুলিই কিন্তু দুঃসাধ্য।

ধনঞ্জয় বললেন—ইনি কিন্তু জনকে নিষ্ক্রিয় করার পক্ষে নয়। ইনি কর্মে বিশ্বাস করেন। যেমন কর্ম করবে তেমনই ফললাভ হবে, ইহজীবনে তো বটেই, এমন কি জন্মান্তরেও।

—অথচ ইনি আত্মা মানেন না। কে সে যে কর্মের ফল পায় ?

তথাগত বলেন এই চিন্তাগুলি নিরর্থক। জানবার কোনও প্রয়োজন নেই। কর্মগুলিকে শুদ্ধ করবার দিকেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, ধনঞ্জয় বললেন।

—অথচ, তুষিত স্বর্গের দেবতাদের কথা ইনি বলেন, দেবযোনি পাওয়ার কথা বলেন। শ্রেষ্ঠীবর, তথাগত বুদ্ধর ধম্মে প্রচুর স্ববিরোধ আছে। সুষ্ঠু নৈতিক জীবনযাপনের দিকে যাওয়া ভালো। কিন্তু মতটির একটি যুক্তিগ্রাহ্য কাঠামো তো থাকবে ? —চণক চিন্তিত স্বরে বললেন।

—আপনার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ত এই যুক্তির কথা বলবেন কিন্তু যে-সব সাধারণজনের জন্য এই ধম্ম তাদের মনে কি অত প্রশ্ন জাগে ? তারা ধরবার মতো বোঝবার মতো কোনও পথ পেলেই হল।

চণক বলল—শ্রেষ্ঠীবর কিছু মনে করবেন না। আপনারা তো সাধারণজন নন। রাজারাও সাধারণ নন। কিন্তু আপনারাই তো ধম্মের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। জেতবনবিহার করে দিলেন একজন শ্রেষ্ঠী, বেণুবন দিলেন একজন রাজা, আম্রবন দিলেন একজন প্রতিথযশা, সুপণ্ডিত, বৈদ্য এবং রাজপুরুষ। ধম্ম যদি সাধারণের জন্য হয় যারা ভালো করে সব কিছু না বুঝে একটি স্পষ্ট মত ও পথ পেলে তাকে গ্রহণ করে, তবে আপনারা কেন এ ধম্ম নিচ্ছেন, কী পেলেন আপনারা ?

মেণ্ডক মৃদু-মৃদু হেসে বললেন—ধনঞ্জয় উত্তর দাও দৈবরাতের প্রশ্নের।

ধনঞ্জয় বললেন—ভালো লেগেছে তথাগতর কথা। কিন্তু কেন লেগেছে তা তো জানি না। নিশ্চয় কোনও গূঢ় কারণ আছে, তাই না দৈবরাত ? না কি অভিসন্ধি ?

চণক হাসলেন। ধনঞ্জয় বললেন— আমি ভেবে বলবো।

ভোজনশালায় অনিমেষে চণকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ধনঞ্জয় পত্নী দেবী সুমনা। সুমনা অন্তর্বত্নী। বহুদিন পর। তাঁদের আশা এবার পুত্র হবে, ধনঞ্জয়ের সাম্রাজ্য পরিচালনা করবে সে। সুমনার সাধ হয়েছে তিনি ভ্রমণ করবেন, আপাতত অঙ্গদেশে এসেছেন। ভদ্দিয়তে কিছুকাল কাটিয়ে এসেছেন, এখন চম্পায় গগ্‌গরা দিঘিতে স্নান করবার ইচ্ছা হয়েছে। দেবরাত চণককে সুমনার বড় ভালো লেগেছে। বীরপুত্র লাভ করার জন্য তিনি ষণ্ডমাংস খাচ্ছেন। বিদ্বান পুত্র লাভের জন্যও কিছু নিয়ম পালন করছেন। কেন তিনি জানেন না। ধনঞ্জয় বলেন—বীরপুত্র নিয়ে কী হবে সুমনা। ক্রমশ অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়, বিদ্যাজীবী ব্রাহ্মণ, উপার্জনকারী বৈশ্য এবং সেবাকারী দাস স্বতন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের পুত্র ধনুর্গ্রহ হলে রাজার অনুবর্তী হয়ে যাবে, বিদ্যোৎসুক হলে তক্ষশিলা কি বারাণসীর অনুবর্তী হবে। ধনঞ্জয়ের সাম্রাজ্য দেখবে কে ?

সুমনা বলেন—আমি যে ধারায় শিক্ষিত হয়েছি, পুত্রকেও সেইভাবেই শিক্ষিত করতে চাই, সেট্‌ঠি।

—কন্যাকেও তো তা-ই করেছিলে সুমনা, লাভ কী হল ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী বলছ ? লাভ হয়নি ? বিসাখা যে কর্মান্ত স্থাপন করেছে, তাতে অন্তত একশটি পরিবারের কর্মসংস্থান, অন্নসংস্থান হচ্ছে, সাবত্থির ভিক্ষুণী সংঘের প্রতি যাতে ন্যায় হয়, সুবিচার হয় তা আমার কন্যা দেখছে, মিগার সেট্‌ঠির ধনসম্পদেরও সুব্যবস্থা করছে সে—

ধনঞ্জয় বললেন—হ্যাঁ, জনবহুল রাজপথে হস্তিসম্মোহন-বিদ্যার প্রয়োগও করল। বলতে চাও সে একাধারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। ব্রাহ্মণও কী ?

—হ্যাঁ, ব্রাহ্মণও, সখীগুলিকে অতিশয় শিক্ষিত করে তুলেছে বিসাখা।

—ভালো, তবে ব্রাহ্মণও।

—এবং দাসও সেট্‌ঠি। বিসাখা তার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ এবং তথাগত বুদ্ধর সেবা করে, তা-ও অতি নিপুণভাবে।

—সবই ঠিক, সুমনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার কন্যা যে...

—জানি, সেট্‌ঠি। বলো না, আর বলো না। কৃপণং হ দুহিতা। বড় করুণ এই দুহিতা হওয়া। কিন্তু বিসাখা আত্মবলে ক্রমশই সেই দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করছে এই আমার বিশ্বাস।

—ভালো—ধনঞ্জয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

—এই গান্ধার যুবকের সঙ্গে আমাদের আগে দেখা হয়নি কেন ? —সুমনা অন্যমনে বলেন।

—অতি সহজ কারণ। যুবকটি গান্ধারে থাকত এবং আমরা সাকেতে।

—না সেট্‌ঠি আমি যখন মহাদেবী খেমাকে প্রব্রজ্যা থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য রাজগহে ছিলাম, সে সময়ে দৈবরাত গান্ধারের দূত হয়ে রাজগহেই অবস্থান করছিল। তখনও বিসাখার বিবাহ হয়নি।

ধনঞ্জয় কটাক্ষে তাকালেন পত্নীর দিকে, বললেন— বৃথা কল্পনা করে দুঃখ পেতে নারীরাই পারে। কেন হল না, কেন পেলাম না...

সুমনা বললেন— কল্পনা করে সুখও পেতে পারি।

—কেমন ?

—এই দৈবরাতের মতো যদি আমার পুত্ত হয়।

—গান্ধার যুবক কূটবুদ্ধিশালী। সব কিছুর পেছনে কারণ সন্ধান করে, বণিক ও রাজাদের বুদ্ধভক্তির পেছনে অভিসন্ধির ঘ্রাণ পাচ্ছে।

—সত্যি ?

AMARBOI.COM

হাসিমুখে ধনঞ্জয় বললেন— আয়ুষ্মান, আমার পত্নী আর আমি উভয়ে মিলে আমাদের বুদ্ধভক্তির কারণ একটা বার করেছি।

চম্পার এই গৃহের সম্মুখবর্তী কাননে সুন্দর একটি সরোবর। মণিময় তার ঘাট। সেখানেই তিনজনে বসেছিলেন সন্ধ্যার পূর্বে।

চণক বললেন— আমি কিন্তু আপনাদের বুদ্ধভক্তির প্রতি কটাক্ষ করছি না। ভ্রমেও এমন ভাববেন না। প্রকৃত কথা, আমি সব কিছুর পেছনে দৈব বা ভাগ্য আছে এই মত বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় যা যা ঘটছে, তার মধ্যে কোনও অন্তর্নিহিত কারণ থাকে। কারণটি আবিষ্কার করতে পারলে ইতি-কর্তব্য কী স্থির করা সহজ হয়।

—হ্যাঁ, শাস্ত্রকার বলেই আপনার অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন এ কথা সত্য—ধনঞ্জয় বললেন।

সুমনা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—বলো আয়ুষ্মান, তুমি কী রূপ ব্যাখ্যা করছ বুদ্ধভক্তির।

চণক বললেন—দেবি, প্রথমে আমার কতকগুলি চিন্তা আপনাদের কাছে নিবেদন করি, তারপরে বুদ্ধপ্রসঙ্গে আসবো। এই যে বেদবিরোধী বা বলা ভালো যজ্ঞবিরোধী তীর্থঙ্কররা পূরণ কাশ্যপ, নির্গ্রন্থ নাতপুত্র, সঞ্জয় বৈরট্টিপুত্র, অজিত কেশকম্বলী এবং মস্করী গোশাল—এঁরা সবাই মধ্যদেশে জন্ম নিয়েছেন এঁদের মত এখানেই গড়ে উঠেছে। এখানে প্রচারেও এঁরা সুফল পাচ্ছেন। কেন ? কেন উত্তর-পশ্চিমে নয় ?

সুমনা জিজ্ঞেস করলেন— গান্ধার বা ওইসব পশ্চিম দেশে এ প্রকার কাউকে দেখোনি ?

—না। সন্ন্যাসীরা চিরকাল ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞবিরোধী এই সব তীর্থঙ্কররা মধ্যদেশের সন্তান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন দেবি, আমার মতো আপনারা যদি ক্রমাগত পশ্চিম থেকে পূর্বে আসতেন বৈদিক ধর্মের একটা ক্রমিক অবনমন লক্ষ করতেন। বেদকথিত যজ্ঞবিধি যেন বহু দূরের এক ভিন্ন দেশের রীতি যা মধ্যদেশীয়দের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মধ্যদেশেরও তো একটা নিজস্ব প্রতিভা আছে। বিশেষত সরযূ, মহীগণ্ডক, গঙ্গার মধ্যবর্তী এই যে ভূখণ্ড, কোশল, মগধ—এখানে নতুন একটা জাগরণ ঘটছে।

—সত্যই, সুমনা বললেন, কেউ কি কখনও ভেবেছিল আমাদের সেনিয় মহারাজ বিম্বিসার হবে ?

—এই নতুন দেশে নতুন প্রতিভা জন্ম নেবে এটাই স্বাভাবিক। এই নতুন প্রতিভা যেমন নতুন রাজশক্তির জন্ম দিয়েছে, তেমনই দিয়েছে ধর্মের নতুন পথের দিশারীর, এবং অর্থ-ব্যবস্থারও নতুন প্রতিভাধরদের, অর্থাৎ আপনাদের। আপনাদের মতো বাণিজ্যবলে বলীয়ান শ্রেষ্ঠী ক্রমশই যাঁরা নিজেদের ক্ষমতাবলে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠছেন এরূপ ব্যাপার কিন্তু প্রতীচ্যেও নেই। উদীচ্যেও নেই।

—কেন দৈবরাত, ধনঞ্জয় বললেন, আমরাও তো পশ্চিমের, উত্তরের বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, বণিকের অভাব তো দেখি না !

—আছে শ্রেষ্ঠীবর, কিন্তু কেমন ? —অশ্ববণিকরা আসে কাম্বোজ থেকে, কম্বল নিয়ে আসে কাশ্মীরী বণিকরা, আপনাদের এখান থেকে যত প্রকার পণ্য নিয়ে সার্থ যাতায়াত করে ওদিকে তত নেই। বা থাকলেও অশীতি কোটি সুবর্ণের সম্পদ করেছেন এমন বণিক ওখানে কই ? লোহিতায়স, কৃষ্ণায়স, রৌপ্য, স্বর্ণ, দুকূলবসন, কাষ্ঠ, ও গজদন্তনির্মিত বস্তু, কাংস্যপাত্র, গুড় ইত্যাদি খাদ্যবস্তু কী আপনারা স্বর্ণে পরিণত করেননি ? উপরন্তু, আপনারা নিজেদের প্রয়োজনমত আয়তাকার, চতুষ্কোণ মুদ্রাগুলি প্রস্তুত করছেন। বাহুবল, বিদ্যাবলই সব নয় শ্রেষ্ঠীবর, ধনবল একটা বিরাট শক্তি। সেই শক্তি আপনারা নিজ প্রতিভায় অর্জন করেছেন। উত্তর-পশ্চিমে, বহুদিন 'পণি' বলে বণিকদের হেয় মনে করত। এই বৃত্তির প্রকৃত মর্যাদা আপনারাই প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখন এই নতুন মধ্যদেশীয় প্রতিভাগুলি যা মধ্যদেশের নিজস্ব সেগুলি অর্থাৎ রাজশক্তি, ধনশক্তি এবং ধর্ম-দর্শননীতি এরা একত্র হবে, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এটাই স্বাভাবিক।

সুমনা বললেন— তা হলে এঁরা সবাই উত্তর-পশ্চিমের সংস্কৃতির বিরোধী ? এমনই কি বলছ পুত্ত ?

—কোথাও কোথাও স্পষ্টই বিরোধী। যেমন ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের ব্যাপারে, পশুবলির ব্যাপারে। কিন্তু বিরোধটাই প্রকৃত কথা নয়। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে—ভিন্নতা, নূতনত্ব। মধ্যদেশ তার আত্মপরিচয় এঁদেরই মধ্যে পেয়েছে।

—বিদ্যায় এখনও পশ্চিমকেই আমরা আচার্য বলে মনে করি—ধনঞ্জয় বললেন।

চণক বলল—আমি যদি সঠিক বুঝে থাকি, তা হলে মগধের সাম্রাজ্য ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে জম্বুদ্বীপ ছেয়ে ফেলবে। আমি আজ পিতার আরব্ধ যে 'রাজশাস্ত্র' শেষ করছি—মগধ রাজশক্তির প্রধান নীতিনির্ধারক হবে সেই শাস্ত্র। এবং রাজগৃহের নিকটে কোথাও তক্ষশিলার মতো বিদ্যা-কেন্দ্র গড়ে উঠবে। হয়ত বা তথাগত বুদ্ধের বচনকে কেন্দ্র করেই।

—বুদ্ধের বচন তো অতি সহজ সরল, তাকে কেন্দ্র করে...

ধনঞ্জয়ের কথা শেষ হল না। সুমনা বললেন— আয়ুষ্মান চণক ঠিকই বলেছে সেট্‌ঠি। বুদ্ধের বচন আপাত-সরল। কিন্তু এর ভেতরে অনেক তর্ক-বিতর্কের অবকাশ আছে। সেগুলি যত দিন যাচ্ছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

চণক বললেন— শুধু তাই-ই নয়। আমি থের সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের দেশনা শুনেছি। তাঁরা বুদ্ধকথিত ধম্মের অনেক জটিল দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ধম্ম-চর্চা-কেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু শ্রেষ্ঠীবর, আপনারা বুদ্ধভক্তির যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা তো কই শোনা হল না ?

ধনঞ্জয় সুমনার দিকে চেয়ে হাসলেন একবার। বললেন— ব্রাহ্মণদের থেকে ইনি বণিকদের ওপরে স্থান দেন। হয়ত তাই...

—কিন্তু এ কথা কি ঠিক ? গৌতমের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে সবাই-ই তো ব্রাহ্মণ ! কাশ্যপ ভাইয়েরা, সারিপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন এবং শাক্যকুলের সব রাজকুমার ? তাঁরা তো ক্ষত্রিয় ! চণক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশয়ের সুর কণ্ঠে রেখে থেমে গেলেন।

সুমনা বললেন— তুমি শুনেছ কি না জানি না আয়ুষ্মান, ইনি রাজগহের অন্ত্যজদের মধ্য থেকেও সাবক গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে বর্ণ দিয়ে কোনও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। তবু তারই মধ্যে শ্রেষ্ঠীদের ওপর তাঁর করুণা একটু অধিক। আমরা তো অন্তত তাই অনুভব করি। শ্রেষ্ঠীদের গুরুত্ব ইনি মেনে নিয়েছেন। এমন কি বাণিজ্য যে অতি শ্লাঘ্য জীবিকা এ বিষয়ে ইনি প্রায়ই উপদেশ দেন। উদ্যোগী পুরুষ কীভাবে একটি মরা ইঁদুর থেকেও বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হতে পারে এ নিয়ে উনি গল্প বলেন। আমি নিজে শুনেছি। সাবত্থির অনেক লোকে তাতে উদ্বুদ্ধও হয়েছে।

চণক আশ্চর্য হয়ে বললেন— তাই নাকি?

—সে যাই হোক, সুমনা হেসে বললেন— তুমি শীঘ্রই সাকেতে আসবে। ধনঞ্জয়গৃহে অবস্থান করবে। কেমন?

চণক স্মিতমুখে সম্মতি জানান। সুমনার চিত্তে স্নেহের আনন্দের এক অদ্ভুত পরিপ্লাবন। কেন, কে জানে? মনে মনে তাঁর গর্ভস্থ পুত্রকেই এর কারণ বলে মনে করেন সুমনা। আর সংগোপনে নত হয়ে থাকেন জেতবনবিহারী তথাগত বুদ্ধর কাছে। তাঁর কেমন মনে হয় অধিক বয়সে এই পুত্রলাভ তাঁরই আশীর্বাদ। কেন এ বিশ্বাস? কারণ নেই তেমন। এ হল বিশ্বাস।

ধনঞ্জয় বললেন— শুধু সাকেত কেন, এই তো কাছেই ভদ্দিয়, আমাদের আদি গৃহ। সাবত্থিতে রয়েছে আমার কন্যা বিসাখার গৃহ...সর্বত্রই তোমাকে যেতে হবে আয়ুষ্মান, যদি মধ্যদেশীয় গহপতিদের তুমি যথাযথ জানতে চাও।

সুমনা অনুরোধের কণ্ঠে বললেন— বচ্চ, তুমি মাতৃহীন, তোমাকে স্বহস্তে যত্ন করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। অবশ্যই সাকেতে আসবে...

কিন্তু দেবী সুমনার কোনও ইচ্ছাই পূর্ণ হয়নি। সাকেতে নিজকৃত সেই সুন্দর সপ্তভূমিক প্রাসাদে একটি কন্যার জন্ম দিয়ে ধনঞ্জয়-পত্নী, বিশাখাজননী, বিম্বিসার-সখী যখন মারা যান, দেবরাত চণক তখন বহু দূর। কন্যা বিসাখাও তখন প্রসবগৃহে। তাকে জননীর মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হয়নি।

শোকার্ত ধনঞ্জয় নবজাতিকার মুখদর্শন করেননি। পরিজনরাই শিশুর নিদারুণ জন্মদুঃখ মুছে দিতে করুণহৃদয়ে তার নামকরণ করলেন— সুজাতা।

AMARBOI.COM

১০

প্রসব-গৃহ থেকে হরিদ্রা-স্নান করে বেরোবার পর মিগারমাতা বিশাখা চলেছে জেতবনে। গৃহে অঙ্কধাত্রী, স্তন্যধাত্রী, মণ্ডনধাত্রী রাখা হয়েছে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে। বুদ্ধ-প্রণাম করে আসার অবসর অনেক দিন পরে পাওয়া গেছে। বিশাখার পরনে নববস্ত্র। হলুদে-ছোপানো উত্তরীয় দিয়ে সে আজ মাথা ঢেকে নিয়েছে। প্রসাধনের স্নিগ্ধ সৌরভ তাকে ঘিরে। সঙ্গে বহু দান নিয়ে চলেছে দাস-দাসীরা। ধনপালী ঠিক তার পাশটিতে। তার মুখ বিষণ্ণ। বিশাখার শান্ত, গৌরবমণ্ডিত জননী- শ্রীর পাশে ধনপালীর শুষ্ক, করুণ, আর্ত মুখটি যেন কেমন অসঙ্গত মনে হয়।

শান্ত জেতবনসন্ধ্যা। বসন্তকাল আসতে বিলম্ব নেই। বিহার তাই প্রায় শূন্য। কিন্তু তথাগত আছেন। আর আছেন মাতা মহাপ্রজাবতী। আছেন ভিক্ষু আনন্দ। বহু সাবত্থিবাসী ভগবান তথাগতর এই দুর্লভ অধিষ্ঠানের সুযোগ নিতে দেশনা- স্থলে এসে অপেক্ষা করছেন।

ভিক্ষু আনন্দর প্রতি আদেশ হল দানগুলি গ্রহণ করবার— কার্পাসিক চীবর, কাংস্যের ভিক্ষাপাত্র, ভৈষজ রাখবার মণিময় পাত্র সব, ভোজ্য—যব, গম, মুদগ, তণ্ডুল, বহুপ্রকার ফল, মিষ্টান্ন, পায়স। বিশাখা ভিক্ষু আনন্দর হাতে জল ঢেলে দিল। তিনি দান গ্রহণ করলেন। দেশনা-স্থলে গিয়ে বসল বিশাখা। অল্পক্ষণ দেশনা হল আজ। মহারাজ প্রসেনজিৎ আবারও দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। একই স্বপ্ন। বিকট স্বরে কে বা কারা আর্তনাদ করছে। রাজার পুরোহিতেরা বলেছেন—এরা নরকবাসী। এদের শান্ত করার জন্য যজ্ঞ প্রয়োজন। তথাগত মৃদু হেসে তাঁকে রাত্রে গুরুভোজন করতে নিষেধ করলেন। অতিভোজনেই স্বাস্থ্য মন্দ হয়, অল্পভোজনে নয় মহারাজ। আপনি রাজভোগ ভোজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছেন, কিন্তু সেই পরিমাণে ব্যায়াম করছেন কী ? আপনার মধ্যদেশ তো রীতিমতো স্ফীত হয়ে উঠেছে ! কাঁধে মাংস জমেছে। আপনি বীরপুরুষ, বীরের মতো আকৃতি ও অভ্যাস রাখতে সচেষ্ট হবেন, তবেই দুঃস্বপ্নগুলি দূর হয়ে যাবে।

—কোনও পূজা, ব্রত, দান এ সকলের প্রয়োজন নেই বলছেন ?

—কিছুরই প্রয়োজন নেই মহারাজ। গুরুভোজনের পর শয্যায় যান। শরীর গরম হয়ে থাকে। খাদ্যগুলি আত্তীকৃত হয় না। তাতেই দুঃস্বপ্ন সৃষ্টি হয়।

এবার বিশাখার দিকে চাইলেন তথাগত।

—আজ শুনলাম বিসাখা সংঘকে বহু দান করেছে ? কেন কল্যাণি ?

—আমার দুই নবজাত পুত্র ও সাকেতে আমার জননী ও তাঁর নবজাতিকার শুভকামনায়।

কিছুক্ষণ আশীর্বাদের ভঙ্গিতে স্থির রইলেন তথাগত। তারপর বললেন— বিসাখা, তথাগত জন্মের সাত দিন পরেই মাতৃহীন হয়েছিলেন, জানো ?

—জানি ভন্তে। কিন্তু তিনি মহাপ্রজাবতীকে মাতৃরূপে পেয়েছিলেন।

—মহাপ্রজাবতী তাঁর পুত্র নন্দকে লাভ করার পরও সমান মমতায় ও যত্নে তথাগতকে লালন করেন। জননীর চেয়ে মহীয়সী আর কে বিসাখা ? জন্মদাত্রী জননীর চেয়েও মহীয়সী একমাত্র তিনিই, যিনি অনাথ-অনাথাকেও মাতৃস্নেহে লালন করেন। বিসাখার অনুকম্পা সকল অনাথ-অনাথার প্রতি ধাবিত হোক।

বিশাখা মাথা নত করে তথাগতর আশীর্বাদ গ্রহণ করল।

তথাগত বললেন— জনক-জননীর চেয়ে শ্রদ্ধেয়, আদরণীয়, প্রিয় এ জগতে আর কেউই নেই। কিন্তু পার্থিব নিয়মে জনক-জননী লোকান্তরে যান। তখন সেই শূন্যস্থানে যা থাকে তা সেই কল্যাণময়ী জননীর ভাববলয়। সেই ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারলেই জননীকে অনাদ্যন্ত কালের জন্য নিকটে পাওয়া যায়। লোকান্তরিতার স্থানে উত্থান হয় নতুন জননীর। হে সাবকগণ, তোমরা জানবে সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে স্বার্থহীন, সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় স্নেহ জননীর। হৃদয়ে সেই স্নেহের সমুত্থান ঘটাও, সেই স্নেহ অনুভব কর সর্ব জীবের প্রতি, আশ্রয় দাও অনাথদের। জীবগণকে আশ্বাস দাও। মাতৃস্নেহরসের সুধাধারায় অভিষিঞ্চিত কর সমস্ত মানবের মনোভূমি। সব্বে জীবা সুখিত্তা হোন্তু। সোতাপত্তি ফল লাভ যদি করে থাকো হে সাবক-সাবিকাগণ, তা হলে নিশ্চয় জানো— মৃত্যু, বিচ্ছেদ, বিরহই জীবজগতের নিয়ম। এই জীবচক্রকে অনুভব করলেই অশোক হবে সবাই, নিব্বাণপদের দিকে অগ্রসর হবে। নিব্বাণই পরম সুখ, পরম শান্তি, পরম পদ। বীতশোক হও, পরমপদ লাভ করো।

ধনপালী দেখল তথাগত দেশনাস্থল ত্যাগ করছেন এবং বিসাখা মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। মহাপ্রজাবতী পাশেই বসেছিলেন, তিনি তাঁর কোলে বিশাখার মাথাটি তুলে নিলেন। ধনপালী উশীর জল একটু একটু করে ছিটোচ্ছে বিশাখার মাথায়, মুখে। একটু পরে সে চোখ মেলল। থেরী মহাপ্রজাবতীর স্থির দৃষ্টি তার মুখের ওপর। তিনি ধীরে ধীরে বললেন— বিশাখা, কন্যা, গৃহে যাও এবার। তোমার পুত্ররা অপেক্ষা করে আছে।

দাস-দাসীরা মিলে ধরে ধরে তাকে শিবিকায় নিয়ে গিয়ে তুলল। বিশাখা অনেক কষ্টে ধনপালীকে বলল—পালি, অচিরবতীর তীরে চল, আমি সাকেত যাবো।

—কিন্তু প্রভু, প্রভুপত্নীকে সংবাদ দেওয়া নেই যে...

—সংবাদ দিয়ে দে

—শিশুদের কী হবে ?

—ধাত্রী আছে পালি, ময়ূরীও রয়েছে, পালি আমার দুধ শুকিয়ে গেছে। দ্যাখ !

—কিছুক্ষণ পূর্বেও দুগ্ধধারায় ভিজে যাচ্ছিল বিশাখার স্তনপট্ট। ধনপালী দেখল, এখন সব শুষ্ক। কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণের স্তনবৃন্ত দুটি যেন মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। ক্ষীরহীন ক্ষীরভাণ্ড।

অচিরবতী পার হয়ে, সরযূ পার হয়ে অক্লান্ত শিবিকার পথ চলে যখন ধনঞ্জয় বিমানে পৌঁছলো বিশাখা তখন ধীর-প্রত্যূষ হচ্ছে। অরুণ আভায় রঞ্জিত বিমানটি, বহির্বাটির কানন, অন্তঃপুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানন। অত্যুচ্চ গাছগুলির ওপরের দিকের শাখা ও পত্রাবলীকে ছুঁয়ে নিচের দিকে সহস্রধারায় ঝরে পড়ছে অরুণ আশীর্বাদ। কিন্তু বিশাখা দেখল সবই যেন একটি বিশাল প্রাণহীন স্বর্ণভাণ্ড। প্রাণহীন। পুরস্ত্রীরা ছুটে এলেন। বিশাখা তোমার নবজাতক ?

—রেখে এসেছি।

—কী সর্বনাশ !

বিশাখা বলল— পিতা কোথায় ?

এইবারে পুরস্ত্রীদের শোক আর বাধা মানল না। এত সাবধানে যে বিশাখার কাছ থেকে এই বজ্রপাতসম সংবাদ গোপন রাখা হল, বিশাখা কেমন করে তা জেনে গেল ? বিশাখা কারও কোনও উত্তরের অপেক্ষা করল না। সেই হাহাকারের মধ্য দিয়ে কক্ষের পর কক্ষ ছুটে বেড়াতে লাগল। যেন কোনও একটি কক্ষে বসে আছেন জননী। ঠিকমতো সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে। তার চোখে অশ্রু নেই, মুখে ভাষা নেই। পিতার কক্ষে পিতাকে দেখতে পেল না। পুরস্ত্রীরা বললেন— তিনি গতরাত্রে কর্মকক্ষ থেকে আসেননি।

বহির্বাটিতে ছুটল বিশাখা। কর্মকক্ষর এক প্রান্তে একটি চতুষ্পদিকায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন ধনঞ্জয়। পাশে ভোজনথালী অস্পৃষ্ট পড়ে রয়েছে।

পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ধনঞ্জয় মাথা তুলে বললেন— বিশাখা !

—পিতা ! বিশাখা রুদ্ধকণ্ঠে বলল।

কখনও ধনঞ্জয়ের কোলে বিশাখার মুখ, কখনও বিশাখার কোলে ধনঞ্জয়ের মুখ— শুধু অশ্রুধারায় ভেসে যায় মুখ, বুক ফুলে ফুলে ওঠে। মুখে কোনও শব্দ নেই।

সেই বিলাপগৃহে অর্ধমূর্ছিত পিতা-কন্যাকে ঘিরে ধনপালী ছাড়া আর কেউই ক্রমশ রইল না। সকলেই বলল— এঁদের শোকপ্রকাশের অবকাশ দেওয়া প্রয়োজন। নইলে বুক ফেটে যাবে।

একটি একটি করে ধীরে ধীরে সব শোনা হল। যদিও দেবী সুমনার বয়স হয়েছিল, বৈদ্য এবং ধাত্রী সুপ্রসবই আশা করেছিলেন। কীভাবে দেবী সমস্ত যন্ত্রণা বিনা আর্তনাদে সহ্য করেছিলেন। কীভাবে সন্দংশ দিয়ে শেষ পর্যন্ত শিশুর মাথাটি বলপ্রয়োগ করে টেনে বার করতে হয়, তারপর কীভাবে তাঁর হাত পা শীতল হয়ে যেতে আরম্ভ করে, সর্বাঙ্গে স্বেদবিন্দু ফুটে ওঠে, কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। পুরী আঁধার করে মূর্ছার কোলে ঢলে পড়লেন। শত ভৈষজ প্রয়োগেও সে মূর্ছা আর ভাঙল না।

মা, তোমার সামনে কখনও তো আঁধার ছিল না। তোমার দ্যুতময় অন্তরের আলোকচ্ছটায় কিছুই অস্পষ্ট থাকত না। প্রশান্ত মনীষায় করণীয়গুলি দেখতে পেতে, অনম্য সাহসে বিপদের সামনে দাঁড়াতে, প্রসন্নচিত্তে নিজসংসার ও পরসংসারের দায়গুলি পালন করতে ! তুমি ছিলে বলে এই বিশাল ধনঞ্জয়ভূমি যেন তৈলনিষিক্ত যন্ত্রের মতো চলত। তুমি ছিলে বলে বিশাখা জীবনের সংগ্রামটিকে জিগীষু বীরযোদ্ধার মতো নিয়েছিল। জয়লাভ সে করবেই এ সঙ্কল্পের শক্তি কোথা থেকে এসেছিল ? মা আছেন, মা দেখছেন। হারবার মানুষ মা নন। তাঁর কন্যা কি কখনও হারতে পারে ? এই বোধ থাকত সমস্ত দুঃখের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে দিতে।

বিশাখা বলল— পিতা, আমি এখনও কেমন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না, মা নেই। না পিতা, এ হতে পারে না।

ধনঞ্জয় শূন্য চোখে চেয়ে বললেন— না বিশাখা, সত্যই সে নেই। এই দীর্ঘ মাস ভরে প্রতি সকালে আমি দেহলিতে একটি করে পুষ্প রেখে দিয়েছি, আজ সুমনাহীন প্রথম দিন পৃথিবীর, আজ সুমনাহীন দ্বিতীয় দিন... আজ সুমনাহীন তৃতীয় দিন...। বিশাখা, কন্যা আমি সবসময়ে সর্বত্র অনুভব করার চেষ্টা করি সে আছে। কিন্তু দেখো, আমি যন্ত্রণায় শতধা হয়ে যাচ্ছি, সে তো কই কোনও স্পর্শ পাঠায় না, আমি খাদ্য গ্রহণ করি বা না করি, নিদ্রা যাই বা না যাই, কোনও সময়েই কোথাও বিন্দুমাত্রও তার অস্তিত্ব অনুভব করি না এই বস্তু-পৃথিবীতে। মহাত্মা অজিত, মহাত্মা পূরণ কাশ্যপ যা বলেন তাই-ই ঠিক বিশাখা, চতুর্মহাভূতে মিলিয়ে গেছে সুমনা। পৃথিবীর কোন শুভক্ষণে, ধনঞ্জয়ের কোন্ শুভকর্মের ফলে, বিশাখার ভাগ্যফলে, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, আকাশ থেকে তিল তিল বস্তু আহরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রচে উঠেছিল সুমনা-শরীর, সুমনা-হৃদয়, আবার জড়-পৃথিবীর নিয়মে সে ফিরে গেছে খণ্ড খণ্ড হয়ে। বিশাখা, ব্রাহ্মণরা ভুল বলেন— আত্মা নেই, নির্গ্রন্থরাও ভুল বলেন— আত্মাও নেই, পুদ্গলও নেই, বুদ্ধ তথাগত ভুল বলেন—শুভ কর্মফল থেকে, শরীর থেকে শরীরান্তরে প্রয়াণ হয় এ কথা ভুল। সুমনা আর কখনও জন্ম নেবে না, নিতে পারে না। জড় প্রকৃতিতে ওরূপ শুভ আকস্মিকতা একবারই ঘটে। মাত্র একবার।

বিশাখা পিতার হাত ধরে অন্তঃপুরে নিয়ে গেল, তার নিজকক্ষে নিয়ে গিয়ে পেটিকা খুলল। সে দেবী সুমনার চিত্র লিখেছিল। কাষ্ঠফলকে, বসনে। সেইগুলি বার করে সে সযত্নে পল্যঙ্কের ওপর বিছিয়ে রাখল। বলল পিতা—একদিন মায়ের অনুপস্থিতিতে এই চিত্র পাশে নিয়ে যজ্ঞকাজ করেছিলে। এখন মায়ের অবর্তমানেও এই চিত্র নিয়ে যজ্ঞস্বরূপ জীবন অতিবাহিত করো। পিতা হয়ত তুমি ঠিকই বুঝেছ— মায়ের শরীরের জৈব উপাদানগুলি হয়ত তাদের উৎসে ফিরে গেছে। কিন্তু সুমনা-হৃদয়, তাঁর দীর্ঘদিনের শুভকর্ম, শুভচেতনা লয় পেয়ে যাবে, এ কি কখনও হতে পারে।

পিতা সেই নবজাতিকা কোথায় ? আমার ভগ্নী ?

—জানি না, আমি তাকে দেখিনি বিশাখা। আজও দেখিনি। দেখব না।

—সে কী পিতা!

বিশাখা পিতার হাত ধরে নিয়ে গেল সেই নির্জন, প্রায়ান্ধকার কক্ষে যেখানে ক্ষুদ্র মাথাটির দুধারে দুটি ক্ষুদ্রতর মুঠি রেখে ঘুমিয়ে আছে অবহেলিত শিশুটি। কহ্না শুধু কাছে বসে আছে।

বিশাখা বলল— এ কী ? এমন অন্ধকার কেন এ ঘর! বাতায়ন নেই ভালো। বায়ু চলাচল যেন বন্ধ হয়ে আছে! পালি, কহ্না—শীঘ্র সুবাতাস আলোযুক্ত সুন্দর কক্ষের ব্যবস্থা কর। উশীর ছড়িয়ে দিবি চারদিকে। চন্দনের ক্ষুদ্র একটি পালঙ্ক আছে। আমি নিজে তাতে শুতাম। পালঙ্কটি একটি প্রেঙ্খার মতো, তামার দৃঢ় শেকল দিয়ে ছাদের সঙ্গে যুক্ত থাকত। দ্যাখ— অঙ্কমাদের জিজ্ঞেস কর।

শিশু এই সময়ে কেঁদে উঠল। বিশাখা পরমস্নেহে তাকে কোলে তুলে নিল। অমনি তার শুষ্ক স্তনবৃন্ত থেকে দুগ্ধক্ষরণ হতে লাগল। স্তনপট্ট ভিজে যাচ্ছে মাতৃ-স্নেহ-পীযূষধারায়। ধাবিত হচ্ছে ওই মাতৃহীন, অনাথা শিশুর দিকে। সে বলল—পিতা, অশ্ব, শিবিকাসহ ধনপালীকে পাঠাও সাকেতে। হর্ষ আর মিত্তকে নিয়ে আসবে, সঙ্গে আসবে ওদের ধাত্রীরা। আমি এখন সাকেতেই থাকব।

গভীর রাত্রে সারাদিন পরিশ্রমের পর, তিনটি শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে, ধাত্রীদের কাজের ভার দিয়ে বিশাখা অন্তঃপুরের কাননে বকুলমূলে তার প্রিয় বেদিকার ওপর এসে বসল। বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সে। সে ধ্যান করছে। আজ তার কর্মস্থান (ধ্যানের বিষয়) দেবী সুমনা। মায়ের রূপ চোখের সামনে ভাসিত করতে কই বিন্দুমাত্রও বেগ পেতে হল না! ওই তো মা দাঁড়িয়ে আছেন, গাঢ় নীল রঙের উত্তরীয়, দেহের বর্ণ আরও উজ্জ্বল লাগছে। কেশগুলি বেণীবদ্ধ। বেণীতে কুন্দকুসুম। মায়ের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা, সেই যে বলেছিলেন শ্রাবস্তীর পথে...'ধরো তোমার যশোভাগ আমারও নিতে ইচ্ছা হয়েছিল।' সেই স্নেহ সেই ব্যাকুলতা অথচ গাঢ় আস্থা! কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে মায়ের চোখ দুটি দেখতে পেল না। মায়ের সমস্ত অবয়বই প্রিয়, কিন্তু চোখ দিয়ে যে কথা বলা যায়, কথা শোনা যায়! মা, তোমার সেই অনুপম পলাশাক্ষি, স্নেহে, প্রণয়ে গাঢ়, মননে গভীর, চিত্তের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখার শক্তিতে মর্মভেদী! সেই চোখ দুটি আমি কেন কিছুতেই ধ্যানে আনতে পারছি না। মৃদুহাসিমণ্ডিত, চক্ষুহীন সেই জননীমূর্তি বিশাখার চোখের সামনে একবার আবির্ভূত হচ্ছে, একবার অন্তর্হিত হচ্ছে। অবশেষে চাঁদ যখন অস্তোন্মুখ কাননভূমির অর্ধেক তমসায় আবৃত তখন বিশাখা সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আর্তকণ্ঠে বলল— মা, তুমি আমাকে ত্যাগ করে যেও না। সাকেতের এই ধনঞ্জয়লোক, সাবত্থির মিগারলোক, কত দরিদ্রজন, পীড়িত পশুগণ, কত সংসারত্যাগিনী কিংবা বহু দুঃখে দুঃখিনী নারীরা বিসাখার মুখের প্রতি চেয়ে রয়েছেন। তাঁদের সবার জন্য বিসাখা আছে। কিন্তু বিসাখার তুমি ছাড়া কেউ নেই। বিসাখার হৃদয় যে প্রণয় জেনেছে তা অতি অদ্ভুত, অলৌকিক। হর্ষের, রোমাঞ্চের শতধারা তা। কিন্তু তা উদ্দীপন হলেও আশ্রয় নয় মা। তাছাড়া বিশাখা আজও জানে না, তা স্বপ্ন না মায়া, করুণা না ইদ্ধি। মা আমি এও জানি না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমনের অনুরাগিণী হয়ে আমি তাঁর প্রতি অপরাধিনী কি না, কীভাবে তাঁর ছায়াশরীর বিশাখার কাছে আসে, অথচ তিনি জানতে পারেন না ! আমি তো কোনও মন্ত্র প্রয়োগ করিনি মা ! আমার চিত্তের শ্রদ্ধা, স্নেহ পূজা তাঁকে নিঃশেষে দিয়েছি। পরিবর্তে পেয়েছি দেহমন দীপ্ত করা এক মধুর আগুন। বড় দুঃখ মা, আবার বড় আনন্দও। বিশাখার গতি কি নিরয়লোকেই হবে ? বলো মা, বলো ! এ কথা যে ভগবানকেও জিজ্ঞাসা করতে পারি না ! এ অলৌকিক মিলন, এ অলৌকিক বিরহের ভার বিশাখা আর কতদিন সইতে পারবে ?

সহসা বিশাখার ধ্যানদৃষ্ট জননী প্রতিমার মুখমণ্ডলে চোখ দুটি ফুটে উঠল। ব্যথা না করুণা, ভর্ৎসনা না সান্ত্বনা সে চোখে বিশাখা বুঝতে পারল না। সারারাত্রি কেটে গেলে, মাতৃনয়নের ধ্যানের মধ্য দিয়ে বিশাখা পূর্বনিবাসজ্ঞান লাভ করল। জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতিগুলি সব ছায়াচিত্রের মতো তার মনশ্চক্ষের সামনে উদ্‌ভাসিত আবার লয়প্রাপ্ত হতে লাগল। বিশাখা দেখল জন্মে জন্মে সে এমনি হতভাগিনী নারী ছিল যে সংসার-বৈরাগী উদাসীচিত্ত এক পুরুষকে ভালবেসেছিল, কখনও তাকে পায়নি। কাঁটাগাছের বনের মধ্য দিয়ে, জলাভূমির মধ্য দিয়ে, তপ্ত মরুবালুকার মধ্য দিয়ে বংশ, কুল, সমাজ, মানসম্মান সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে জন্মের পর জন্ম সে ছুটে চলেছে দারুণ তৃষ্ণা নিয়ে, ছিন্ন-ভিন্ন, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বারবার সে মরেছে, বারবার জন্মেছে, তবু তার প্রেমতৃষ্ণা মরেনি, চণ্ডালের জন্য ব্রাহ্মণকুল ছেড়ে সে চণ্ডালী হয়েছে, শবরের জন্য শবরী, নিষাদের জন্য নিষাদী, নিদারুণ দারিদ্র্য, নিষ্করুণ কঠোর জীবন সমস্তই সে সহ্য করেছে সেই প্রণয়ের জন্য। সে যদি সীবলিকুমারী তো, তার দয়িত মহাজনক হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন, সে যদি মাদ্রী তার প্রেমাস্পদ বিশ্বন্তর হয়ে প্রাণের আবেগে তাকে দান করে দিয়েছেন, সে যদি শ্যামা তো তিনি মহাসত্ত্ব হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, আকণ্ঠ প্রেমতৃষ্ণা নিয়ে সে মরেছে। অবশেষে এখন এই বিশাখা-জন্মে সুমনা-গর্ভ তাকে আশ্রয় দিল। সুমনা-গর্ভ দেহহীন মৃত্যুলোকের ওপার থেকেও তাকে ঘিরে ধরছে, তার অপরিপূর্ণ প্রেম তাকে এই জন্মে এক বজ্রসম গঙ্গাস্রোতসম, বর্ষার বারিগর্ভ বিপুলালকার মেঘসম মহাশক্তি দিয়েছে। দিচ্ছে। সে কোনও গৃহের নয় আর। সমাজের। সমাজের নয় জাতির, জাতির নয় সমগ্র দেশের, সমগ্র বিশ্বের হয়ে যাচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের এক আলোকদর্পণ, যাতে মুখ দেখে দূরভবিষ্যতের নারীরা আলোময় হয়ে উঠবে, পুরুষরাও আলোময় হয়ে উঠবে। সে মহোপাসিকা বিশাখা।

ধ্যান ভাঙলে, একাকী রৌদ্রালোকিত কাননভূমি সে দৃঢ় পায়ে পার হল। আচ্ছন্নভাব আর নেই। তার ধ্যানের জগৎ আর বাস্তব ঘটমান জগতের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানটুকুর মধ্যে সেতুবন্ধ হয়ে গেছে। সে বিশাখাই। কিন্তু সে বুঝি সুমনাও। তাঁর সারাজীবনের সাধ ও সাধনা এখন বিশাখার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

অন্তঃপুরদ্বারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে করতে বিশাখা অনুভব করল তার মর্মের মধ্যে জেগে রয়েছে দেবী সুমনার সেই চোখ দুটি। কী যেন উৎসারিত হচ্ছে তার সেই মর্মস্থল থেকে। চারিদিক ঘিরে এক আশ্রয়বলয়, যা কখনওই সরে না, নড়ে না। সে যে পথ দিয়ে গেল সেই সেই পথে সেই আশ্রয়বলয়ের কবোষ্ণ তাপ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাই গৃহের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা, লোকজনের আসা-যাওয়ার স্বল্পতার কারণ সে বুঝতে পারল না।

আরও ভেতরে ঢুকতে ধনপালী এলো, বলল—সখি, চলো স্নান করে নাও।

—আরেকটু পরে পালি, আগে শিশুগুলিকে দেখে আসি।

—শিশুগুলি এখনও ঘুমোচ্ছে, ভদ্রা।

—পিতা ?

—ঘুমোচ্ছেন।

—তা হলে চল্।

স্নান সারা হলে বিশাখা পট্টবস্ত্র পরল, কপালে কুঙ্কুমবিন্দু দিল, গন্ধমাল্য ধারণ করল। ধনপালীর আনা সুমিষ্ট দুধ পান করল। তারপর সংসার-কাজে যাবার সময়ে জিজ্ঞাসা করল— কহ্না কোথায় পালি, কখন উঠবে ? ধনপালী বলল— কহ্না আর কোনওদিনই উঠবে না ভদ্রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী বলছিস ?

—কহ্লা কাল রাতে আত্মঘাতী হয়েছে।

—বলিস কী ? কেন ?

কহ্লার কক্ষের সামনে থেকে পুরস্ত্রীদের সরিয়ে যখন বিশাখা প্রবেশ করল—কহ্লার নীলবর্ণ মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে বৈদ্য ধীরে ধীরে তখন তার হাতটি নামিয়ে রেখে দিচ্ছেন। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলাম না কল্যাণি— বৈদ্য ধীরে ধীরে বিষণ্নমুখে বললেন, তারপর নিজের পেটিকাটি নিয়ে চলে গেলেন।

ধনপালী একটি লিপি দিল বিশাখার হাতে, কহ্লা তার নবলব্ধ অক্ষরজ্ঞান, লিপিজ্ঞান ব্যবহার করেছে— বিশাখাভদ্রা, দাস জনক-জননী প্রথমে জন্ম দিয়েছিলেন, তুমি নতুন জন্ম দিলে। নতুন জ্ঞান দিলে। সেই জ্ঞান দিয়ে দেখলাম জগৎ বড় বিষাদময়। ধন, জন, রূপ, মুক্তি কিছুতেই সেই মহাশূন্যতা ভরে না। অপরিপূরিত দরিদ্রই থেকে যায় জীবন। সংসারে নারীর সুখ নেই, সংসার ত্যাগেই বা সুখ কোথায় ? কোথাও কোনও পথ পেলাম না। তোমার জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। তুমি এসেছ, তোমার আধার কাঞ্চনময়, তাই ধৈর্যে, দুঃখ-সহনে তুমি আরও দীপ্ত হয়ে ওঠো। দেবী সুমনার শিশুটিকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। আর আমার এই মৃৎ-ভাণ্ড ভেঙে দিলাম। যা বায়ুর তা বায়ুতে ফিরে যাক, যা জলের তা জলেতে, যা অগ্নির তা অগ্নিতে, এবং যা শূন্যতার তা সেই মহাশূন্যতায়।

১১

পাঞ্চাল তিষ্য উজ্জয়িনীতে দৌত্য শেষ করে বৎস বা বংস রাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বীর দিকে একাকী যাত্রা করলেন। সাকেতের রাজন্যকুমার তিষ্য, মগধরাজ বিম্বিসার ও দৈবরাত চণকের আদরের তিষ্যকুমার যে ঠিক কবে থেকে পাঞ্চাল তিষ্য বলে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান পেতে আরম্ভ করলেন, বলা কঠিন। সম্ভবত কোশলরাজ পসেনদি তাঁর বংশপরিচয় নিয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করাতে তিষ্যকুমার উল্লেখ করেন যে তাঁর পিতা নিজেকে পাঞ্চাল রাজবংশসম্ভূত বলে মনে করেন।

পসেনদি তখন মহাঔৎসুক্যভরে বলে উঠেছিলেন— ক্রৈব্য, ক্রৈব্য! ঋক্‌সংহিতায় এই পঞ্চালদের উল্লেখ আছে ক্রৈব্য বলে। বহু প্রাচীন জন।

তখন তিষ্যর মনে পড়ে যায় ঋক্-সংহিতায় নয়, শতপথ ব্রাহ্মণের আলোচনার সময়ে এক বিদথে সে শুনেছিল ক্রৈব্যদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এঁরা প্রথমে সিন্ধু ও অসিক্লী নদীবিধৌত অঞ্চলে বাস করতেন। পরে পূর্ব দিকে যমুনার তীরে চলে যান, এবং পঞ্চাল বলে পরিচিত হতে থাকেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরু-পঞ্চাল মিত্রতার পরে পঞ্চাল দেশ এবং পঞ্চাল জাতি ক্রমশই গৌরব অর্জন করতে থাকে। আর এখন তো কুরু-পঞ্চাল দেশ বিদগ্ধতম বলে খ্যাতি পেয়েছে। কথা হচ্ছে, তাদের বংশটি পঞ্চাল রাজবংশের মূল ধারা থেকে চ্যুত হল কবে ? কেনই বা ? এর মধ্যে কোনও অগৌরবের ইতিহাস লুকনো থাকা অসম্ভব নয়। মহারাজ পসেনদি সম্ভবত তাদের কুলের ইতিহাসটি পুঙ্খানুপুঙ্খ উদ্‌ঘাটিত করতে উৎসুক ছিলেন। পসেনদির প্রকৃতিই এইরূপ। ওঁর নিজের বংশে মাতঙ্গচ্যুতি দোষ আছে এখন এই দোষ ঠিক কী প্রকৃতির, তা তিষ্য জানে না। জানতে আগ্রহীও নয়। কিন্তু পসেনদি ব্যাপারটি গোপন করতে এবং অন্যান্য খ্যাতিমান বংশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে এই কুলদোষ খণ্ডাতে বড়ই শক্তিক্ষয় করেন। যেমন ভগবান তথাগতর কুল অর্থাৎ শাক্যকুল থেকে কন্যা এনে বিবাহ করেছিলেন। এখন বলতে থাকলেন— 'ক্রৈব্য, ক্রৈব্য-পঞ্চাল, তিষ্যকুমার তোমার সঙ্গে আমার একটি কন্যার বিবাহ নিশ্চয় দেবো। পঞ্চালবংশের সঙ্গে মিত্রতা হবে আমার।'

তিষ্য কিছু বলতে পারেনি। কেননা রাজাদের মধ্যে মৈত্রী-স্থাপন করবার মানস নিয়েই তো সে বেরিয়েছে! যাতে মৈত্রীর ভিত দৃঢ় হয় তেমন কিছুতে তার আপত্তি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু পসেনদি যদি মহাদেবী মল্লিকার বালিকা কন্যা মল্লিকা, কিংবা মহাদেবী বাসবক্ষত্রিয়ার বালিকা কন্যা বজিরার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে নির্বন্ধ করেন তাহলে অগত্যাই তাকে শ্রাবস্তী ত্যাগ করে এমন স্থানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালাতে হয়, যেখানে পসেনদির হাত পৌঁছবে না। অবশ্য তিষ্য পালিয়ে যায় নি। শ্রাবস্তীতে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুল রয়েছেন। রয়েছেন বন্ধুলপত্নী মল্লিকাদেবীও। এঁরা থাকতে বড় কিছু অঘটন ঘটবে না। প্রধানত বন্ধুলের কারণেই তিষ্য শ্রাবস্তীতে তার একটি কর্মকেন্দ্র স্থান করল।

মহারাজ বিম্বিসারের রাজসংঘ স্থাপনের প্রস্তাবের মধ্যে একটি অংশ সে অতিশয় স্পর্শকাতর বলে বুঝেছে। রাজগণের ভেতর বন্ধুতা ও হৃদ্যতা থাকা এক বস্তু, আর সংঘনায়কত্ব একজনকে অর্পণ করা সম্পূর্ণ আর এক বস্তু। বিশেষত এই দিকটি নিয়েই দীর্ঘদিন মহারাজের সঙ্গে তিষ্যর পরামর্শ হয়েছে, স্থির হয়নি কিছু। কতকগুলি সমাধানের কথা আলোচনা হয়েছে মাত্র। বেশ কিছুকাল কোশলরাজের আতিথ্য ভোগ করবার পর তিষ্যকুমার যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং নিভৃত আলাপের সুযোগ পেল, সে বন্ধুলকে সঙ্গে রেখেছিল। প্রস্তাবটি নিবেদন করবা মাত্র পসেনদি হা-হা করে হেসে উঠলেন।

—শ্যালকের সঙ্গে আবার মিত্রতা কী? শ্যালক হল চির-শত্রু, কী বলো বন্ধুল! নাও নাও সাকেতকুমার মহামান্য মগধদূত তিষ্য, মৈরেয় নাও, পান করো, পান করো হে!

কেউ তাঁর কথার কোনও উত্তর না দেওয়াতে পসেনদি সম্ভবত বুঝলেন ব্যাপারটি গম্ভীর। তিনি হাসি-হাসি মুখে গোপন ষড়যন্ত্রের ভাব ফুটিয়ে বললেন— সেনিয় কি আমার ভগ্নীর সঙ্গে কলহ টলহ করেছে না কী? কলহের কারণ তো সেই কবে থেকেই ঘটছে! সেনিয়- অম্বপালী প্রণয়-পর্বের কথা তো সারা জম্বুদ্বীপেই বিদিত। সেনিয় কি ভাবে তার অন্তঃপুরই মাত্র এ বিষয়ে অন্ধকারে আছে?

তিষ্যর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। পিতার বয়সী এক মহারাজের সঙ্গে প্রণয়-ব্যাপার নিয়ে রসালাপ করার অভিজ্ঞতা তার স্বভাবতই ছিল না।

—সেনিয়র ভগ্নী, অর্থাৎ আমার প্রথমা পত্নী কিন্তু বুদ্ধিমতী। ক্ষমাশীলাও বটে। তিনি কোনকালে পসেনদির সুমতির আশা ত্যাগ করেছেন। দেবী মল্লিকাকে বিবাহ করবার পর একটু অভিমান রোষ ইত্যাদি দেখিয়েছিলেন, শাক্যকন্যা বাসবীকে বিবাহ করার পর সেই যে নিজের প্রাসাদ আশ্রয় করেছেন, আর বার হতে দেখি না। মাঝে মাঝে যখন সংবাদ নিতে যাই, দেখি তিনি ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন।

বন্ধুল বললেন—মহারাজ, নিজের হৃদয়হীনতার কথা আর এই যুবার কাছে প্রকাশ না-ই করলেন।

বন্ধুল-মল্ল ও মহারাজ পসেনদি তক্ষশিলায় সতীর্থ ছিলেন। পসেনদিই বহু অনুরোধ উপরোধ করে বন্ধুলকে কোশলে অমাত্য পদ দিয়ে আনেন। এমনিতেই পসেনদি তরলস্বভাব, বন্ধুলের সঙ্গে একান্তে বসলে তো কথাই নেই! তিনি আবারও হাসিমুখে চোখ দুটি ছোট ছোট করে বললেন— বন্ধুল বড়ই একপত্নীকতার গর্ব করে। আচ্ছা তিষ্য, ওকে জিজ্ঞাসা করো তো আয়ুষ্মতী মল্লিকার যখন সন্তানাদি হচ্ছিল না, তখন ও মল্লিকাকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিয়েছিল কেন।

বন্ধুল রাগ করে বললেন— মহারাজ, তিষ্য আমাদের সন্তানতুল্য। তার সামনে দাম্পত্যকলহ ইত্যাদি ব্যাপারের আলোচনা না করলেই আপনার চলছে না, কেমন!

—আহা হা, তিষ্য সন্তানতুল্য হলেই বা, প্রাপ্তবয়স্ক তো হয়েছে! এখন আর···

—ঠিক আছে প্রাপ্তবয়স্ক ক্ষত্রিয় বীরের সঙ্গে রাজোচিত আলোচনা করুন। যুদ্ধবিগ্রহ, দণ্ডনীতি শাসনকার্য। মূর্খ গ্রাম্যজনের মতো··· বন্ধুল থেমে গেলেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলে যাও, বলে যাও, থামলে কেন? —এবার দেখা গেল পসেনদি রাগ করেছেন,

—সতীর্থ বলে তুমি মানতেই চাও না যে, পসেনদি একজন রাজা।

—শুধু রাজা নয়, মহারাজা। কোশলাধিপতি। বন্ধুল ঈষৎ হাসি মুখে বললেন, ভুলবো কেন? আপনি না ভুললেই হল।

তিষ্য এতক্ষণে বলল—‘মহারাজ, মগধাধিপ আপনার মিত্ররাজ বলেই তো আমাকে তিনি সর্বপ্রথম শ্রাবস্তীতেই পাঠিয়েছেন। শুধু মৌখিক মিত্রতা নয়, মগধরাজ চাইছেন একটি সংঘ স্থাপন করতে। শ্রেষ্ঠীদের সংঘে যেরূপ বাণিজ্য-বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় হয়, নীতি নির্ধারণ হয়, রাজসংঘে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজাদের মধ্যেও তেমন হবে।

—তাতে লাভ ? আমার নীতি আমি নির্ধারণ করবো না তো কি সেনিয় করে দেবে ? না কি করবে সেই বাতুল উদয়ন ?

—মহারাজ, রাজ্যের ভেতরে যেমন নিজস্ব সমস্যা আছে, তেমনই কতকগুলি সমস্যা আছে যা পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকলে উন্নত হয়। সীমান্তপ্রদেশে উভয় রাজ্যেরই শাসন শিথিল, অধিকার নিয়েও বহু ভুল বোঝাবুঝি হয়। বাণিজ্যশুল্ক নিয়ে বণিকদের মধ্যে অসন্তোষ দিন দিন বাড়ছে। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে করের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। এই সব আন্তঃরাজ্য সমস্যা তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বহিঃশত্রু। আপনারা জম্বুদ্বীপের রাজারা যদি নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য একত্র করেন তা হলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো। —বলতে বলতে তিষ্যর কাঁধের কাছের গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ দুলতে লাগল। সেই অভিরাম দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে পসেনদি সামান্য কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বহিঃশত্রু ? তুমি কি গান্ধার মদ্র এঁদের কথা বলছো ? না কুরু-পঞ্চাল ?

—এরাও না মহারাজ। এদেরও রাজসংঘভুক্ত করা প্রয়োজন। এরও বাইরে উত্তরপশ্চিম সীমান্তর ওপার থেকে পার্সরা আসছে। সমুদ্রের ওপার থেকে যবনরা আসতে পারে। পূর্ব প্রান্ত থেকেই আসা অসম্ভব না কি ? ওদিকেও আছে সুবর্ণভূমি, উত্তরে হিমবন্তের ওপারে উত্তরকুরু।

—এ সকল কার কল্পনা তিষ্যকুমার ? সেনিয় আজকাল আলস্যে আর কল্পকথা রচনায় সময় কাটাচ্ছে না কি ?— অর্ধেক স্নেহ অর্ধেক বিদ্রূপভরে তিষ্যর দিকে তাকিয়ে বললেন পসেনদি।

বন্ধুল এই সময়ে বললেন— মহারাজ বিম্বিসার যে দূরদর্শী তাতে সন্দেহ নেই।

—তুমি বলছো, এই সব ভয় কল্পিত নয় ?

—মহারাজ, হয়ত আপনার জীবৎকালে কোনও বৈদেশিক আক্রমণ হল না, কিন্তু আপনার পুত্রের সময়ে তো হতে পারে! সামান্য কোশল প্রত্যন্ত নিয়েই আমরা কিরূপ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি দেখেন না ? সেক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক সেনা নিয়ে যদি পার্সরা গান্ধার আক্রমণ করে, গান্ধারকে পরাস্ত করে, মদ্র, অবন্তী, মৎস্য, বিদেহ, কুরু-পঞ্চাল, কোশল এইভাবেই তো অগ্রসর হবে তারা! খণ্ড খণ্ড রাজ্য। পরস্পরকে সাহায্য না করলে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাবে।

পসেনদি উঠে পড়ে পদচারণা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর থেমে বললেন— ওই চণ্ডটার সঙ্গেও প্রণয় করতে হবে না কি ?

তিষ্য সসম্ভ্রমে বলল— আপনি কি প্রদ্যোৎ মহাসেনের কথা বলছেন ? অবশ্যই! উনিই তো সবচেয়ে অবুঝ, ক্রোধী...,

—আর ওই বাতুলটার সঙ্গে ?

—বৎসরাজ উদয়নের কথা বলছেন কি ?

—আবার কি!

—হ্যাঁ, সবার সঙ্গেই মিত্রতা ও আদান-প্রদান, পরামর্শ ও শক্তিসংযোগের সম্পর্কে আসতে হবে।

বন্ধুল বললেন— কাউকে চণ্ড, কাউকে বাতুল বলে ত্যাগ করলে নিজেরই সর্বনাশ হবে মহারাজ।

পসেনদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গর্বভরে বললেন— প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্য প্রয়োজন। একাধিপত্য। বুঝলে ? চক্রবর্তী। রাজচক্রবর্তী। একটি মাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ। সমগ্র জম্বুদ্বীপ আমার যজ্ঞভূমিতে সমবেত হবে।... কিন্তু ভগবান তথাগত সম্মত হবেন কী ?

বন্ধুল বললেন— ধরুন ভগবান তথাগত সম্মত হলেন। আর না হলেও রাজকৃত্য বলে আপনি যা মনে করবেন তা আপনার করাই উচিত। কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজচক্রবর্তী হওয়া আর সম্ভব কী ?

—পসেনদির ক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ করছো নাকি বন্ধুল ?

বন্ধুল বললেন— পসেনদির ক্ষমতার অংশ তো বন্ধুলও। নিজের শক্তির প্রতিও সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে তাহলে, তাই নয় কি ? মহারাজ, বন্ধুলকে তিরস্কার করতে হলে সোজাসুজি করুন, এভাবে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছল করে রাগ করবেন না। চিন্তা করে দেখুন। কোশল রাজ্যের যেটুকু বিস্তার, জম্বুদ্বীপের আর কোনও রাজ্যেরই সে বিস্তার নেই। কিন্তু সেই কোশলের সীমান্ত রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে কী ? সর্বক্ষণ বিদ্রোহ, সর্বক্ষণ দস্যুতা। সাম্রাজ্যসৃষ্টি করতে পারলেও তা রক্ষা করা যাবে না আর। ঔপরাজ্যে ঔপরাজ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। তারপর সেই ঔপরাজ্য আবার স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হবে। রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এই কেন্দ্রাতিগ শক্তি আপনি আর অস্বীকার করতে পারেন ?

তিষ্য বলল— তা ছাড়া মহারাজ, অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করে পৃথিবীপতি হবার ধারণা প্রাচীন হয়ে গেছে। ও ধারণার আর গুরুত্ব দেয় না কেউ। এখন নতুন ধারণার প্রয়োজন। একাধিপত্য যদি ব্যর্থ হয়ও, যেমন আর্য বন্ধুল বললেন, সখ্য, পারস্পর সাহায্য ও সংঘবদ্ধতা ব্যর্থ হবে না। অন্তত‌পক্ষে তা অনেক কার্যকর।

মহারাজ পসেনদির আস্থা এবং মোটামুটি সম্মতি অর্জন করতেই তিষ্যকুমারের কত কাল কেটে গেল। একবার ভালোভাবে পরিচয় হবার পর আবার রাজাটি তাকে এতোই ভালোবেসে ফেললেন যে, কিছুতেই ছাড়তে চান না। কোশলরাজের সমর্থন না পেলে আর অগ্রসর হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। অগত্যা তিষ্য-কোশলরাজের মৃগয়া, দস্যুদমন, ধর্মচর্চা, উৎসব পালন ইত্যাদির সঙ্গী হয়ে থেকে গেল। তিষ্য সময়টির সদ্ব্যবহার করল বন্ধুলের কাছে শস্ত্র চর্চায়।

বর্ষা শেষ হলে আকাশে যখন শারদমেঘের গতায়াত, তিষ্যকুমার তার প্রাসাদশীর্ষে উঠে একদিন দেখল অচিরবতীর জল নেমে গেছে। জলের বর্ণ মুকুরের মতো। একটি বলাক বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় বুঝি চিত্র। সুনীল আকাশ, গাঢ় শ্যামবর্ণ বৃক্ষগুল্মাদি, দর্পণসম নদীজলধারা এবং তার তীরে ওই শুভ্র বলাক সবই চিত্র। কেউ লিখেছে চিত্রটি। তার হঠাৎ মনে হল সে নিজেও হয়ত চিত্র। ওপর থেকে, কিংবা নিচ থেকে, কিংবা বাম অথবা দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে কেউ, কোনও মহাচিত্রকর তাদের সবাইকে লিখে এখন সাগ্রহে পর্যবেক্ষণ করছেন। বর্ণগুলি সঠিক হয়েছে কিনা, রেখাগুলি কেমন বিন্যস্ত হল দেখছেন। সে নিজের দিকে চাইল। নিম্নাঙ্গে পাটলবর্ণের অধোবাস, উপবীতের একাংশ রক্তেসার চর্মের কটিবন্ধনীর ওপর পড়েছে। তার পাদপল্লব দুটি চন্দনকাঠের উপানতের মতো দেখা যাচ্ছে। —ভালো লিখেছেন। সে মনে মনে বলল। বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গে রোমহর্ষ হল। জীবন কি এইরূপ চিত্র ? চিত্রের ভেতরে চিত্রের ভেতরে··· কে লিখেছেন ? বিরাট আকাশ তার ওপরে। অচিরবতী-তীরের এই চিত্রের ওপরে নত হয়ে পড়েছে। দিগন্ত প্লাবী অপরাহ্ণের আলো। সে নিস্পন্দ হয়ে সেই আলো মেখে রোমহর্ষ গায়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক যেন মহাচিত্রকরের তুলিকার একটি নিপুণ টান তার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তাকে দৃঢ়বদ্ধ করে রেখেছে আপাতত।

তাহলে কি সবই নির্ভর করছে সেই চিত্রকরের ইচ্ছার ওপর ? তিষ্য কি সেই মহাতুলিকার টানে টানেই সাকেত থেকে রাজগৃহ, রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী ছুটছে ? সমস্তই কি পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত নাকি ! সে প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে এই চিন্তার বন্ধন থেকে মুক্ত করল। হঠাৎ তার মনটা হু-হু করতে লাগল। সকলেরই কেউ-না-কেউ আছে যার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়, ক্লান্তি হলে যার সঙ্গে চিন্তাভার, কর্মভার ভুলে থাকা যায় কিছুক্ষণ। সে নিজের কর্মকক্ষে এসে একটি লিপি লিখল—

ভদ্দ লোকপাল,

সাহেট গামের গামভোজকের মতির ওপর সব নির্ভর করছে। আমার বান্ধবই একমাত্র আশা। সাহেট-গামেই ধরুন একটি আপণ আরম্ভ করি। এখানে পণ্য কিছুটা বিকোলে, পরের গাম বেসর। কাছাকাছি গামগুলিতে আপণ না সাজিয়ে দূরান্তরে যাওয়া বিষয়ে আপনি কী বলেন ? এত বিলম্ব দেখে ব্যস্ত না হন তাই। আপনাদের সকলের সংবাদ বিষয়ে উদ্বিগ্ন। আপনার সহচর— সাকেতক।

লিপিটি কাঠের দুটি পাতের মধ্যে রেখে সে সূত্রগুচ্ছ দিয়ে সেটিকে বাঁধল। সে এবার চলল জেতবনে। জেতবনপ্রান্তে ঘোড়া বাঁধতে বাঁধতে সে দেখতে পেল বিশাখার শিবিকা আসছে। তিষ্য বড় বড় কয়েকটি পদক্ষেপে সেখান থেকে সরে গেল। একটি বিরাট অশ্বত্থ গাছ। সে তার কাণ্ডে পিঠ রেখে বসে রইল। শিবিকার অভিমুখ থেকে পেছন ফিরে। বসে বসেই সে বুঝতে পারল শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবিকাই নয়, আরও আসছে গাধার পিঠে, অশ্বতরের পিঠে নানা দ্রব্য। বিশাখা সঙ্ঘকে দান দিচ্ছে। ভালো বিশাখা, দাও। দান করার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছ, সেই চিত্রকর তোমায় দাত্রী করেই এঁকেছেন, অতএব দাও। বর্ষান্ত-চীবর দিচ্ছো বোধহয়! পংসুকুল (ধুলোমাখা ফেলে দেওয়া বস্ত্র) থেকে সাধারণত চীবর প্রস্তুত করেন শ্রমণরা। বর্ষায় তা টেঁকে না। তাই বিশাখা বর্ষার পর নূতন চীবরের জন্য বস্ত্র দান করে। শ্রাবস্তী নগরে মিগারমাতা বিশাখার নাম ছড়িয়ে গেছে। সুন্দরী, করুণাময়ী, দানশীলা, বুদ্ধিমতী ও বীর্যবতী বলে। বিশাখা এমনই এক মণি যার দ্যুতি কখনও কোথাও লুকোনো যাবে না—এ কথা তিষ্য অনেক আগেই বুঝেছিল, সে প্রতিভাময়ী। তিষ্য মিগারমাতাকে কয়েকবার দূর থেকে দেখেছে, কিন্তু মিগারপুত্তকে আজ অবধি এখানে দেখেনি। সম্প্রতি তার কানে এসেছে মিগারপুত্ত পুন্নবর্ধন নাকি বহুদূরে বাণিজ্য করতে গেছেন, এবং এই নিয়ে বণিককুলে হাসাহাসি পড়ে গেছে। কেন না সকলেরই বিশ্বাস সে বাণিজ্যের ছল করে ভিন্ন দেশে সংগীত-বাদ্য এবং গণিকার সন্ধানে গেছে। শুনে তিষ্যর প্রথমটা একটা তিক্ত আত্মপ্রসাদ হয়েছিল। ভালো বিশাখা, ভালো, তিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করে নিজ বর্ণের অচেনা অজানা কুলপুত্রকে বরণ করাও শ্রেয় মনে করেছিলে। তোমার অত যে শক্তিধর পিতা, বুদ্ধিমতী মা, তাঁরাও কোনও সংবাদ নেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না। এখন এক অযোগ্য, বারনারীতে আসক্ত, লোকের হাসির পাত্র ধনী যুবককে বিবাহ করে নিশ্চয় শান্তিতে আছো। কিন্তু পরক্ষণেই তিষ্যর মন এক অবর্ণনীয় বিষাদে ভরে গেল। বালিকা বিশাখার নিষ্পাপ মুখটি তার চোখের সামনে। ভদ্দা বলুন তিস্‌সকুমার, যাদুকরী বিসাখা···। হায় বিসাখা, তুমি কেমন আছো? কেমন আছো তুমি? তোমার ভালোমন্দ দেখবার অধিকার তিষ্যকে দাওনি, কিন্তু ভাববার জন্য অধিকারের প্রয়োজন তো হয় না!

তিষ্য অশ্বত্থতল ছেড়ে জেতবনে প্রবেশ করল। শ্রাবকদের ভিড়ের মধ্যে বসে সে দেখল বিশাখা তার ঘনিষ্ঠ সখীদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ওই বসল, শ্রমণাদের পাশে। এখান থেকে তার পার্শ্বমুখ দেখা যাচ্ছে। ভগবান তথাগত আসছেন সবাই উঠে দাঁড়াল। বিশাখা অনিমেষ লোচনে তথাগতর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভেতরের কুটি থেকে শ্রমণ আনন্দ বেরোচ্ছেন। এঁকে তিষ্যর বড় ভালো লাগে। মনে হয় এঁকে সে জেতবনকুটির ভেতর থেকে শক্তিপ্রয়োগ করে বাইরে নিয়ে আসে। এভাবে বাইরে নিয়ে আসতে ইচ্ছা হয় শ্রমণ সুভদ্র, শ্রমণ অনঘকেও। মনে হয় বলে—নির্বাণ পরে লাভ করবেন কুমার। এখন এই জম্বুদ্বীপটিকে সুসংহত করুন তো! আপনার মতো, আপনাদের মতো কুমারদের এখন বড় প্রয়োজন। একা চণক, একা তিষ্য, একা বিম্বিসারই বা কী করতে পারেন! কুমার আনন্দ, শ্রমণ বেশ ত্যাগ করুন, আসুন, অনুনয় করছি, আসুন। তার চোখ চলে গেল আনন্দর দিকে। শ্রমণ আনন্দর চোখ দুটি সর্বদা যেন প্রীতি স্নেহ করুণায় ভরা। তিনি তাকিয়ে আছেন বিশাখার দিকে: তিষ্য দেখল বিশাখার চোখের পাতাগুলি ধীরে ধীরে বুজে গেল। বিশাখা কি ধ্যান করছে?

সেদিন দেখবার পর সকলে চলে গেলে, বুদ্ধ তখনও আসনে বসে আছেন। মৃদু প্রদীপ জ্বলছে। তিষ্য ধীরে ধীরে বেদীর কাছে গিয়ে বসল। সন্ধ্যার পরিচিত শব্দগুলি ধীরে ধীরে বাড়ছে। পাখিরা সব উড়ে যাচ্ছে, তাদের পাখার শব্দ, ঝিঁঝি ডাকতে আরম্ভ করেছে। নিস্তব্ধ হয়ে আসছে চরাচর। শ্রমণ শ্রমণারা বুদ্ধবেদীর কাছে ঘন হয়ে বসছেন। সাধারণের জন্য দেশনার কাল শেষ। এখন ভগবান শ্রমণ-শ্রমণাদে সঙ্গে তাদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। অন্যদের প্রবেশ যে একেবারে নিষিদ্ধ তা নয়,প্রাতিমোক্ষ বা প্রবারণার সময় তো নয়! সুতরাং তিষ্য বসেই রইল।

বুদ্ধ বললেন—সমন অনঘ!

—বলুন ভন্তে!

—তুমি নাকি উৎকণ্ঠিত হয়েছ? গত কয়েকদিন ধ্যানে মন দিতে পারোনি!

—সত্য ভন্তে।

—কারণ কী?

সোজা হয়ে বসে আছেন ভিক্ষু অনঘ। ইনি এবং এঁর সখা সুভদ্রর পূর্বজীবনের কথা দৈবরাত চণকের কাছে শুনেছে তিষ্য। সে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল। ভিক্ষু অনঘ কথা বলছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কোনও নারী ? বুদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ ভন্তে।

—কিন্তু এই নারী তো জন্ম-জন্মান্তরে তোমার তপস্যা ভঙ্গ করেছে, তোমাকে কুশল কর্ম থেকে নিয়ে গেছে অকুশল কর্মের দিকে। এখনও কি তুমি সতর্ক হবে না ?

—কিন্তু ভন্তে এই নারী সংযমী, পুণ্যশীলা, উনি কুশল কর্মের অনুষ্ঠানই করেন, তথাগতর অতিশয় স্নেহভাগিনী

—কার কথা বলছেন সমন অনঘ !

—মিগারমাতা বিশাখা !

সমবেত ভিক্ষুদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য, ধিক্কার। তিষ্য উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে।

বুদ্ধ বললেন—বিসাখা তো বিবাহিতা ! তাকে কামনা করে তুমি অতি কুৎসিত কর্ম করেছ, তাতে কি আর সন্দেহ আছে সমন !

—ভন্তে, মনের মধ্যে যা ঘটছে তা অকপটে আপনার সামনে, এবং সমনদের সন্নিধানে বলার নির্দেশ পেয়েছি উপসম্পদা নেবার সময়ে। কারও ধিক্কারের ভয় করি না। কিন্তু আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমি ভদ্রা বিশাখাকে কামনা করিনি। তাঁকে দেখতে দেখতে, আমার গান্ধারে ফেলে আসা প্রিয়তমার কথা মনে পড়ে গেছে।

—সেই নারীই তাহলে তোমার পতনের কারণ ভিক্ষু অনঘ।

—না ভগবন, সত্য বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি আমার অভ্যুদয়েরই কারণ, যদি ধম্মের শরণ নেওয়াকে অভ্যুদয় বলেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলেই আমি ঐহিক সব ব্যাপারে বীতরাগ হয়ে পড়ি। ভন্তে, আয়ুষ্মতী বিশাখাকে দেখে আমার সেই পূর্বস্মৃতি এমনভাবে জেগে উঠেছে যে, আমি ধ্যানে মন বসাতে পারছি না। আপনি আমায় সংঘ-ত্যাগ করার অনুমতি দিন।

তিষ্য হতবাক হয়ে শুনছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, কে সেই নারী। কার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন অনঘ।

বুদ্ধ বললেন—যাঁর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলে, সমন, এখন কি তাঁর কাছে আদৃত হবে মনে করো ?

—না, ভগবন, সে আশা নিয়ে সংঘত্যাগ করতে চাই না।

—তবে ?

—ভগবন, আমার বৈরাগ্যের ভিত্তি দৃঢ় ছিল না। আমি তথাগতের অলৌকিক প্রভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম। স্বদেশের প্রতি, আমার পরিচিত-জনের প্রতি আমার কর্তব্যগুলিকে এড়িয়ে এসেছিলাম। সেগুলি করতে চাই। আমি বীরপুরুষ ছিলাম। আবার বীরের পথ গ্রহণ করবো।

—তিষ্য রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

—কিন্তু সংসার-ত্যাগের মতো বীরত্ব আর কিছুতে তো নেই সমন।

—আমি পলায়ন করেছিলাম তথাগত, আমার প্রব্রজ্যায় কোনও বীরত্ব ছিল না। যেদিন কর্মত্যাগ করবার সত্য প্রেরণা পাবো, আবার সংঘের দুয়ারে আসবো।

—তোমাকে সংঘ-ত্যাগ করার অনুমতি দিলাম অনঘ। তথাগত আসন ত্যাগ করলেন। এতো সহজ ? দীর্ঘদিন সংঘজীবন যাপন করে সংসারে ফিরে যেতে চাইছেন একজন চমৎকার ভিক্ষু ? তথাগত অনায়াসে সে অনুমতি দিয়ে দিলেন ? তবে যে লোকে বলে ইনি বড় শিষ্যলোভী ?

সন্ধ্যার অন্ধকারে জেতবনের দ্বার প্রান্তে অপেক্ষা করতে লাগল তিষ্য। সামান্য পরেই দেখল দুই শ্রমণ আসছেন। অনঘ ও সুভদ্র। এঁদের উভয়ের কথাই সে চণকের কাছ থেকে শুনেছে। সমগ্র জেতবন বিহারে এই দুই গান্ধার শ্রমণ সবচেয়ে দীর্ঘাকৃতি। এখন, এত বছর চর্চার অভাবেও দেহ পেশীবলশূন্য হয় নি। চোখ মুখ নাসা সবই দীর্ঘ। শ্রমণ সুভদ্রর মুখে সামান্য মধ্যদেশীয় পেলবতা থাকলেও শ্রমণ অনঘর মধ্যে এমনই একটা পৌরুষ, বীরতা, যার মধ্যে কোমলতার কোনও স্থান নেই। তাই বলে তিনি ক্রূরদর্শন নন !

অনঘ বললেন—সুভদ্র, বিদায় ভাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অনঘ আমার অনুমান··· না অনুমানের কথা এখন বলব না। তবে তুমি শীঘ্রই সংঘে ফিরে আসবে।

—কখনও না সুভদ্র। চণক আমাদের কিছু কর্মভার দিয়েছিল। আমরা তা যথাযথ সম্পন্ন করিনি। তোমার কি মনে পড়ে না সুভদ্র, তক্ষশিলায় আমরা তিন বন্ধু কীভাবে দিনের পর দিন জম্বুদ্বীপ সংহত করার কল্পনা নিয়ে, রাজ-চক্রবর্তী সন্ধানের স্বপ্ন নিয়ে কাটিয়েছি! সেই সব কল্পনা, স্বপ্ন সত্য করার জন্য সেদিন আমরা প্রাণ দিতে পারতাম। কিন্তু সুভদ্র প্রাণ তো তুচ্ছ কথা, যে কোনও শস্ত্রবীর প্রাণ দিতে এবং নিতে সবসময়ে প্রস্তুত থাকে। প্রকৃত কথা মন। মন দিয়ে, সমস্ত চিত্ত দিয়ে, মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত সংবেদন দিয়ে এই জম্বুদ্বীপকে তার অপরূপ, মহিমময় সৌন্দর্য সমেত রক্ষা করা, আরও সুষ্ঠু, সুন্দর করা মনুষ্যপ্রবর্তিত নিয়মগুলি, সংস্কারগুলি। এই মহা গম্ভীর কাজ থেকে আমরা অন্যায়ভাবে সরে এসেছিলাম। সুভদ্র, তোমাকে বোঝাতে পারিনি, কেন তা জানি না, কিন্তু আমি আরব্ধ কাজ আবার কাঁধে তুলে নেবো।

—অনঘ, তুমি আমাকে যা বোঝাবার চেষ্টা করেছ, আমি বুঝেছি। কিন্তু আমার সামনে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এখন একটি, মাত্র একটিই কালবিন্দু বলে প্রতীয়মান হয়। জন্ম-মরণ, ধ্বংস-নির্মাণ সবই একসঙ্গে ঘটছে বলে দেখতে পাই। আমি কেমন করে তোমাকে বোঝাবো, আমরা রাজ-চক্রবর্তী পেলাম কি পেলাম না, তাতে মহাকালের কিছু যায় আসে না। জম্বুদ্বীপ ধ্বংস হলেই বা কী! না হলেই বা কী! এই ধ্বংস হবেই। আবার নতুন জন্ম, অভ্যুত্থান এ-ও ঘটবেই।

—বলো না। আর বলো না সুভদ্র, আমি তোমাকে আর বোঝাবার চেষ্টা করবো না। আমাদের পথ এতদিনে সত্যই স্বতন্ত্র হয়ে গেল।

অনঘ একবারও পেছন না ফিরে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসতে থাকলেন। তিষ্য যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই বৃক্ষটিও পার হয়ে গেলেন, সুভদ্র বিহারের অভিমুখে ফিরে যাচ্ছেন। তিষ্য এগিয়ে গিয়ে অনঘর কাঁধ স্পর্শ করল।

—কে?

—আমি সাকেতক তিষ্য, এখানে সকলে আমাকে পাঞ্চাল বলে জানে। আমি মহারাজ বিম্বিসারের প্রতিনিধি, কাত্যায়ন দৈবরাতের স্নেহভাজন বন্ধু।

বিপুল বিস্ময়ভরে অনঘ থমকে দাঁড়ালেন— আপনি···আপনি চণক— চণককে চেনেন? সে এখন কোথায়?

—আগে বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করুন ভদ্র অনঘ।

—নিশ্চয়! চণকের স্নেহভাজন যে, সে অনঘরও স্নেহভাজন। আপনি আমার বন্ধু। অনঘ তিষ্যকে আলিঙ্গন করলেন। চণক কোথায়?

—সম্ভবত পূর্বদেশে। মাঝে মাঝে সংবাদ দেবার জন্য রাজগৃহে আসারও কথা।

—কী ব্যাপার বলুন তো? কিসের সংবাদ?

তিষ্য বলল, আপনি আমার গৃহে চলুন, সব বলবো।

অর্ধরাত্র পর্যন্ত দুজনের মধ্যে নানা কথা হল। তিষ্য বলল শুধু চণকের সংকল্পের কথা, মহারাজ বিম্বিসারের আদর্শের কথা। অন্য কথাগুলি সাবধানে গোপন রাখল। অনঘ শুনতে শুনতে মাথা নাড়তে লাগলেন। অবশেষে বললেন—আমি আপনার কথামতো রাজগৃহে যাবো, কিন্তু চণকের সঙ্গে যদি দেখা না হয়, ফিরে যাবো গান্ধারে। পাঞ্চাল তিষ্য আপনি কি গান্ধারের সাম্প্রতিক সংবাদ জানেন?

—না। শুনিনি কিছু।

—শ্রেষ্ঠী মিগারের পুত্র সার্থ নিয়ে পশ্চিমে গিয়েছিলেন। তিনি সংবাদ এনেছেন তক্ষশিলার পথে পথে নাকি পার্স বীরপুরুষদের ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। তিষ্যকুমার, এই সংবাদের গুরুত্ব কেউ বোঝে না। আক্রান্ত হলে প্রথম আক্রান্ত হবে গান্ধার, আমার মাতৃভূমি। আপনি যদি পারেন, আপনাদের কল্পনার এই রাজসংঘকে সত্বর কার্যকর করে তুলুন। যাতে জম্বুদ্বীপের রাজগণ গান্ধারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনে একটি দুর্ভেদ্য সৈন্যপ্রাচীর নির্মাণ করতে পারেন। আমি কাল প্রত্যূষেই রাজগৃহ যাত্রা করবো।

তিষ্য তার লিপিটি অনঘকে দিল। দিল আরও একটি পরিচয়পত্র মহারাজ বিম্বিসারের কাছে। মগধরাজ্যের পক্ষ থেকে ভদ্র অনঘকে প্রাথমিক বেশ-বাস, শস্ত্র, যান ইত্যাদিও দিল সে। পরদিন আলো ফোটবার আগেই অনঘ দ্রুতগামী অশ্বে রাজগৃহের দিকে যাত্রা করলেন।

অচিরবতীর তীর থেকে সোজা উত্তরপথের দিকে চলে গেলেন অনঘ। তিষ্য দাঁড়িয়ে রইল। নদীজলে তার অস্পষ্ট ছায়া পড়েছে। তিষ্যর মনে হল, সে-ই একটি বলাক। দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার সংকল্প সিদ্ধ হবে কী, হলে তা কবে? আর কত দিন?

১২

রাজগৃহে ফিরে একটি অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনলেন চণক। তখনও তিনি নগরে প্রবেশ করেননি। সবে পূর্ব তোরণের প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। বহুক্ষণ একটানা ছুটে এসে চিত্তক ক্লান্ত। তিনি তাকে ইতস্তত চরতে দিয়ে তোরণের কাছে যে প্রপাটি ছিল, সেখানে আকণ্ঠ জল পান করলেন। রাজগৃহের নাগর-চরিত্র এখনই স্ফুট হতে আরম্ভ করেছে। বহুবর্ণ বেশবাস পরে কিছু কুলপুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে তোরণের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন। একটি রথ গেল, দু-তিন-জন রমণী হেসে কিছু বলতে বলতে পার হয়ে গেলেন। রথটি মোটেই প্রতিচ্ছন্ন নয়। সূর্য প্রায় মধ্যগগন পার হয়ে গেছে। কিন্তু রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ মাঝে মাঝেই কানে আসছে। দুজন আপণিক প্রপায় জল পান করার জন্য থেমেছে।

প্রথম জন বলল—দ্বিগুণ তৈল দিয়ে গুড়ের মূল্য দিতে চাইলাম, তা কস্‌সক কিছুতেই তা বিকোল না। বলে কহাপন দাও। এক দ্রোণ গুড়ের জন্য সাতাশটি কহাপন চায়। এখন কহাপণ ঠিক সাতাশটিই হবে তার চেয়ে অল্প বা অধিক হবে না তাই বা কে তাকে ঠিক করে দিলে বলো তো?

দ্বিতীয় আপণিক বলল—তা শেষ পর্যন্ত কী হল? দিলে?

— না দিয়ে করি কী বলো? ঘরের জন্যই গুড়ের প্রয়োজন ছিল। তিন চার প্রকার চিহ্ন রয়েছে কহাপনগুলিতে। দেখো তো ভালো করে।

কটিবন্ধের তলা থেকে একটি ছোট স্থবিকা বার করে লোকটি কহাপনগুলি অন্য আপণিকটির হাতে ঢেলে দিল।

চণক তোরণের দিকে যেতে যেতে শুনলেন, আপণিকরা বলাবলি করছে—কহাপনগুলি এমন চতুষ্কোণ করে যে কেন! গোলাকার করলে অনেক ভালো হত ...

একটি প্রহরী অপরদের বলছিল—গতকাল ঋতু-উৎসবে গিয়েছিলে?

—না ভাই। ছুটির দিন। ভালো করে নিদ্রা দিয়ে নিলাম।

—নতুন একজন নটী অভিষিক্ত হলেন।

—তাই নাকি? কেন সালবতী কি বৃদ্ধা হয়ে গেলেন না কি? তাঁর কন্যা শ্রীমতী বুঝি নগর-নটী পদ পেলেন না!

—না ভাই, ব্যাপার-স্যাপার একটু অন্য প্রকার। এই নটী গান্ধারের। বহু দেশের নৃত্য ও সঙ্গীতকলা জানেন নাকি! ঋতু-উৎসবে এঁর নৃত্য যা দেখলাম—ওরূপ পূর্বে কখনও দেখিনি। নৃত্য না মলয় সমীরের দীর্ঘশ্বাস! বুঝলাম না। এমন পাক দিচ্ছিলেন, অঙ্গের শ্বেত বসন ও উত্তরীয়গুলি বাতাসে বিভিন্ন আকার নিচ্ছিল, অতি দ্রুত। মানুষটিকে অলঙ্কারের ঝিকিমিকি, আর গাত্রবর্ণের ঝিলিক ছাড়া ভালো করে দেখাই গেল না। বংশীধ্বনি আর নূপুরের নিক্কণ ছিল সঙ্গে। সে-ও যেন কেমন রহস্যমন্থর, কখনও শোনা যায়, কখনও শোনা যায় না, যেন কতদূর থেকে ভেসে আসছে ... অতি অদ্ভুত। এই দ্যাখো আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।

চণক দ্রুত ঘোড়া ছোটালেন। পরিচিত প্রিয় পথগুলি। মনে হচ্ছে এই পথধূলির প্রতি রেণুতে তাঁর অস্তিত্ব মিশে আছে। দু'ধারে বৈভার ও বৈপুল্ল। বৈভারের অনুদেশে আজীবিক তীর্থিকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিড়। শিবিকা চড়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কয়েকজন ওপরে ওঠার উপক্রম করছেন। সম্ভবত রোগী। তপোদারামগুলিতে যাচ্ছেন। ক্রমেই পথের দুধারে জাম গাছ বেড়ে উঠছে। ঘন ছায়াময় গাছগুলি। গান্ধারভবনের কাননটি দেখা যাচ্ছে। চণকের ভেতরে একটা উচ্ছ্বাস-উল্লাস ফেটে বেরোতে চাইছে। তক্ষশিলার কুটিরের থেকেও এই গান্ধার-ভবন যে কী করে তাঁর জীবনে আরও প্রিয় আরও অন্তরঙ্গ, আপন হয়ে উঠল— চণক জানেন না।

অশ্বরক্ষক ছুটে এসে চিত্তককে ধরল। চণক নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের সব কুশল তো ?

বিনা বাক্যে ঘাড় নাড়ল লোকটি।

দাসী দ্বার খুলে দিল। দাসেরা পা ধোয়ার জল নিয়ে এলো। কারও হাতে উত্তরীয়, কারও হাতে পেটিকাগুলি সমর্পণ করলেন চণক, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—সোমা, সোমা কোথায় ?

উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করল দাসীরা।

—সোমা কোথায় ?

—তিনি এখানে থাকেন না অজ্জ...

—কোথায় থাকেন ?

—সপ্পসণ্ডিক পভারের কাছে নূতন ভবন হয়েছে। পুপ্ফলাবী। সেইখানে।

চণক কটিবন্ধ দাসীর হাত থেকে নিয়ে নিলেন। উত্তরীয় বেঁধে নিলেন আবার। অশ্বরক্ষককে বিস্মিত করে চিত্তকের পিঠে চড়ে বসলেন, তারপর দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন।

সবে রাজসভা ভঙ্গ হয়েছে। বেরিয়ে আসছেন অমাত্যরা, নগর শ্রেষ্ঠী অহিপারক, রাজসচিব বর্ষকার, মহামাত্য সুনীথ ...। চণককে দেখে অবাক হয়ে থেমে গেলেন বর্ষকার—মহামান্য আচারিয়পুত্ত যে ! কবে ফিরলেন !

—আজই, এখনই ভদ্র।

সুনীথকে হাতের ইঙ্গিতে ডাকলেন বর্ষকার—আচারিয়পুত্ত দৈবরাত চণকের সঙ্গে পরিচিত হও সুনীথ। দৈবরাত, এই অমাত্য সুনীথ ক্রমশই ক্ষুদ্রতর পদ থেকে উচ্চতর পদ পাচ্ছেন নিজ প্রতিভাবলে।

চণক নমস্কার জানালেন। তখনও সভাকক্ষ থেকে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছেন কুমার অভয়, বিমল কৌণ্ডিন্য ....

চণককে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বর্ষকার বললেন— আপনি নিশ্চয়ই রাজদর্শন করতে উৎসুক রয়েছেন। কিন্তু মহারাজ এইমাত্র অন্তঃপুরে গেলেন, এখন হয়ত স্নানকক্ষে ঢুকেছেন, দেখা পেতে বিলম্ব হবে। ততক্ষণ আমরা অতিথিশালার ভক্তগৃহে একটু বসি না !

চণক ভেতরে ভেতরে অধীর হয়েছিলেন। তাঁর এখন মনে পড়ল গান্ধারভবনের শূন্য কক্ষগুলি, দাস-দাসী-অশ্বরক্ষক-গোপাল-সূত—সবাই আছে। তাঁর যত্নের অভাব হবে না। নিজের নিভৃত কক্ষে বহুকাল পরে বিলাস শয়নে শুতে পারবেন। হয়ত নিদ্রা আসবে। যেন নিদ্রা একমাত্র নিজগৃহে নিজশয্যাতেই আসে। কিন্তু অঙ্গহীন মনুষ্যদেহের মতো সোমাহীন গান্ধারভবন কেমন কুশ্রী। যে শান্তির আশ্বাস নিয়ে তিনি ওই ভবনে প্রবেশ করছিলেন, তা কি পাবেন ? তাঁর দারুণ ক্রোধ আসছে। মহারাজের ওপর, সোমার ওপর, তিষ্যকুমারের ওপর, সব শেষে নিজের ওপর। এখনই ভেঙে দিতে ইচ্ছে করছে এই বৃহৎ অলিন্দের স্তম্ভগুলি। কাননটি ছিন্নভিন্ন করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু না, তিনি বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করতে লাগলেন। তিক্ত ভৈষজ খাওয়ার মতো গিলে নিলেন ক্রোধ, তবু চোখদুটি ঈষৎ আরক্ত হয়ে রইল। কপালে ভ্রূকুটি। দেহের বর্ণ সামান্য পাণ্ডুর। বর্ষকার বললেন—দৈবরাত কি একটু অসুস্থ ?

চণক প্রথমে উত্তর দিলেন না। একটু পরে বললেন—বহু দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছি। গত পনের যোজনের মধ্যে বিশ্রাম নিইনি।

—ও তাই। আপনি কি সোজা রাজপুরীতেই আসছেন ?

—হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এত তাড়া করছিলেন... কোনও বিশেষ কাজ...

—মহামান্য বর্ষকার, আপনি কি কখনও দূরদেশে গেছেন ? গেলে জানতেন নিজদেশ যতই কাছে এগিয়ে আসে, অধৈর্য ততই বেড়ে যায় !

—ও, কিন্তু দৈবরাত, রাজগৃহ তো আপনার স্বদেশ নয় ? আপনি তো তক্ষশি ...

বর্ষকারের কথা শেষ হল না। চণক বললেন—সমগ্র জম্বুদ্বীপই আমার স্বদেশ, স্বভূমি। তবে রাজগৃহের স্থান স্বতন্ত্র। তক্ষশিলা যদি আমার প্রথম গৃহ হয়, দ্বিতীয় গৃহ তবে এই নগরী। আপনার তাতে আপত্তি আছে, সচিববর ?

বর্ষকার হেসে ফেললেন—না, না, বিন্দুমাত্র না। রাজগৃহকে অনেকেই বিশেষ ভালোবাসে। কিন্তু আপনার তো এখানে তেমন কোনও স্বজন ...

বর্ষকার কথা শেষ করলেন না। এই অমাত্য ভালো করে হাসতে পারেন না। এবং কথা শেষ না করার একটি অস্বস্তিকর মুদ্রাদোষ এঁর। কিন্তু চণক এঁর প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনও চেষ্টাই করলেন না।

ভক্তগৃহে পৌঁছে বর্ষকার সবার হাত মুখ ধোয়ার জল দিতে আদেশ করলেন। রাজ-অতিথি এখন বিশেষ কেউ নেই তাই ভক্তগৃহটি প্রায় শূন্যই ছিল। এঁরা যেতে দাস-দাসীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। বিশেষ করে চণককে এরা অনেকেই চেনে, ভালবাসে, বহুদিন পর তাঁকে দেখে তাদের মুখে ঔৎসুক্য, আনন্দ, আগ্রহ ফুটে উঠতে লাগল। রাজ-অমাত্যদের উপস্থিতির জন্য কেউ তেমন কিছু বলতে পারল না। কিন্তু তাদের হাসি-হাসি চোখগুলি চণককে অনেক কিছু বলতে লাগল যেন। তাঁকে ঘিরে একটি উচ্ছল আনন্দের বলয় প্রস্তুত হয়েছে। ধীরে ধীরে চণকের ভেতরের অস্বস্তি চলে যাচ্ছে। তাঁর কপালে ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন—মহামাত্য সুনীথ কী কাজের ভার পেয়েছেন ?

সুনীথ বললেন—সহসচিব। বৈদেশিক ব্যাপারের উপদেষ্টা।

দাস-দাসীরা ভোজ্যবস্তু সামনে এনে রাখতে লাগল। বর্ষকার বললেন—মহামান্য দৈবরাত, শুধু মহারাজ বিম্বিসার নয়, তাঁর অমাত্যরাও গুণের আদর করতে জানে। আমার মতে, সুনীথ যে পদ পেয়েছেন, সুনীথ কিছু মনে করবেন না, আচারিয়পুত্ত সেই পদ গ্রহণ করলে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারত না। তিনি বহুভ্রমী, বহুদর্শী মানুষ, এই বয়সেই সমগ্র উদীচী-প্রতীচী তাঁর ঘোরা, এখন আবার প্রাচী থেকে ঘুরে এলেন। আমরা এখনও মহারাজকে অনুরোধ করে মহামান্য চণকের জন্য উপযুক্ত অমাত্য-পদের ব্যবস্থা করতে পারি। তিনি যখন রাজগৃহকে নিজভূমি বলে মনে করেন, তখন তিনি আমাদের নিজেদের লোক।

চণকের মনে হল এই অমাত্য তাঁর ভেতর থেকে কথা বার করে নিতে চাইছেন। তিনি এখনও এঁদের কাছে রহস্যবিশেষ। রাজনীতির লোকেরা রহস্য ভালোবাসে না। অন্য সময় হলে তিনি এঁদের সঙ্গে বুদ্ধির খেলা, কথার খেলায় মাততেন, কিংবা সোজাসুজি নিজের সংকল্পের কথা বলতেন। কিছুটা কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবার পর এখন আর অত গোপনতায় কাজ কী : কিন্তু আজ মন বিকল হয়ে রয়েছে।

সুনীথ বললেন—আপনার সম্মানে আজ আমরা অতিথিশালার অন্নগ্রহণ করছি। বিশেষ কিছু খাবেন, বলুন ?

সুরাপাত্র এসে গিয়েছিল। তুলে নিতে নিতে চণক বললেন—না। তাঁর চোখ অন্যমনস্ক। বর্ষকার এবং সুনীথ দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

হঠাৎ বর্ষকার বললেন—শুনেছি আপনি রাজনীতির ওপর একখানি শাস্ত্র লিখছেন।

—হ্যাঁ, আমার পিতা আরম্ভ করে গিয়েছিলেন।

—কিন্তু যে ধর্মসূত্রগুলি প্রচলিত আছে, তার ওপর ...

—হ্যাঁ, মানব, বাশিষ্ঠ ধর্মসূত্র রয়েছে। কিন্তু এগুলি প্রধানত নীতিশাস্ত্র। তাছাড়া মহামাত্র, জগৎ, সমাজ সর্বদাই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। কোনও শাস্ত্রই কি সর্বকালের সমস্যার কথা বলতে পারে ?

—আপনাদের শাস্ত্রও তা পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—পারবে না। কিন্তু মহামাত্র, এতকাল, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র নিয়ে চলেছে। এখন সর্ব বিষয়ে একটা বিপুল পরিবর্তন আসছে। ভাবতে পারেন বেদকথিত আচার-আচরণও পুরনো ও বর্জনীয় হয়ে যাচ্ছে ? এ-কথা কি কিছুকাল আগেও ভাবতে পারা গেছে ? গৌতম বুদ্ধ বা জিন নাতপুত্র এঁদের যে মতবাদ তা কি একেবারেই নতুন, বৈপ্লবিক নয় ?

সুনীথ বললেন—কিসে নতুন ; শুধু যজ্ঞটুকুই মানছেন না। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানছেন না। বা ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্ণয় করছেন গুণকর্ম বিচার করে।

—যজ্ঞ না মানাই তো অনেক, সমাজের ভিত্তিটাই তো পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ধরুন অত যে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সবই তো যজ্ঞ না থাকলে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

—দৈবরাত কি বুদ্ধমার্গ নিয়েছেন না কী ?

—না, চণক বললেন।

—কী জানি! এ কথা সত্য কি না! আমাদের মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেও বলেন— না। কিন্তু কার্যকালে দেখি বুদ্ধনীতি অনুসৃত হচ্ছে।

—যেমন ?—চণক চোখ তুলে বললেন।

—এই কঠোর দণ্ড দিতে মহারাজ ইতস্তত করছেন। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ করলে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। সর্বোপরি ... বর্ষকার থেমে গেলেন।

চণক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। কিন্তু বর্ষকার কথা ঘুরিয়ে ফেললেন। মিষ্টান্নের পাত্র বাঁ হাত দিয়ে সামান্য সরিয়ে রেখে চণক বললেন—অমাত্যবর, কথা যখন আরম্ভ করবেন তখন তা শেষও করবেন, নইলে শ্রোতার মনে হতে পারে, আপনি তাকে সংশয়ের চোখে দেখছেন। নিজেকে কারও অবিশ্বাসের পাত্র মনে করতে কারই বা ভালো লাগে!

বর্ষকার ধূর্ত চোখে তার দিকে চেয়ে হাসলেন, বললেন—রাজনীতিতে সংশয় ক্ষমার্হ। আপনার শাস্ত্র এ বিষয়ে কী বলে ?

—আমি রাজশাস্ত্রের প্রণেতা হতে পারি, কিন্তু তা ছাড়াও আমি চণক নামে একজন যুবা, সাধারণ আলাপেও আগ্রহী। আর আপনি অমাত্য—নিদ্রা শয়নে, স্বপনে জাগরণে সব সময়েই যদি অমাত্য থাকেন, তাহলে আপনাকে করুণা করা ছাড়া উপায় কী ?—বলে চণক ভালো করে ওষ্ঠাধর বিস্তৃত করে হাসলেন যাতে তাঁর কথার রূঢ়তাটুকু তরল হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

পশ্চিম বনশ্রেণীর ওপারে সূর্য অস্তোন্মুখ। বনভূমিতে, পাহাড়গুলির শীর্ষে শীর্ষে আরক্তিম আলো ছড়িয়ে পড়ছে। সেই আলো প্রবেশ করছে নগরনটী জিতসোমার প্রাসাদ 'পুষ্পলাবী'র পশ্চিম গবাক্ষ দিয়েও। এটিই জিতসোমার প্রসাধনকক্ষ। সে ওই গোধূলির আলোর দিকে তাকিয়ে বলল—এই আলোর মতো ত্বকের বর্ণ করে দে আমার শকুলা। অতি শুভ্রতা যেন বোঝা না যায়। শুধু মুখটি বাদ দিবি। নিত্য নতুন নৃত্যের পরিকল্পনা করছে সে। প্রতি নাচের জন্য স্বতন্ত্র সাজও।

দ্বারের কাছে দাসী এসে বলল—মহারাজ এসেছেন।

হাত থেকে মুকুর ভূমিতে রেখে উঠে দাঁড়াল জিতসোমা। নৃত্যগীত সভা আরম্ভ হবার কিছু আগে মহারাজ আসলে বুঝতে হবে কোনও বিশেষ সংবাদ আছে। তার নিজেরও কিছু কথা সঞ্চয় হয়েছে। তার বেশ এখন অসম্পূর্ণ, প্রসাধনও অসমাপ্ত। দেহের ত্বক গোধূলির বর্ণ পেয়েছে। কিন্তু মুখসমেত কণ্ঠটি এখনও কেতকী পুষ্পের মতো শুভ্র। লোধ্ররেণুতে ভ্রূ চোখের পাতা ঢেকে আছে। সেগুলি তুলিকা দিয়ে পরিষ্কার করে নিল সে। পাটল বর্ণের উত্তরীয় দিয়ে গলা কান, মাথা ঢেকে নিল। তারপর সভাকক্ষের পাশে বিশ্রাম কক্ষের দিকে চলে গেল।

ঢুকেই চিত্রার্পিত হয়ে গেল জিতসোমা। মহারাজ বিম্বিসারের পাশে চণক। সে তখুনি বেরিয়ে আসছিল, বিম্বিসার গম্ভীর স্বরে ডাকলেন—যেও না জিতসোমা, দাঁড়াও।

জিতসোমা পেছন ফিরেই বলল—মহারাজ, আপনি চুক্তিভঙ্গ করেছেন। আপনার সঙ্গে আমার কোনও গোপনতার সম্পর্ক থাকবে না এমনই কথা ছিল। আপনি যে আজ একা আসেননি একথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না জানালে চুক্তিভঙ্গ দোষ হয়।

—ঠিক আছে। মেনে নিলাম। এই যুবাকে তুমি শুধু বুঝিয়ে বলো তুমি যা করছো তা প্রকৃত পক্ষে কী ? কেন ? এবং তা তোমার স্বাধীন ইচ্ছার ফল কিনা। নইলে এ যুবক হয়ত আমায় বা হত্যাই করে ?

—মহারাজ কবে থেকে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের বীরত্বকে ভয় পেতে আরম্ভ করলেন ?

এই যুবা শুধু বীর নয়, কুশলীও। তার ওপর আবার সখা। হৃদ্যতাটুকু ফিরিয়ে নেবে ভয় দেখাচ্ছে। মহারাজ ঈষৎ তরল কণ্ঠে বললেন।

—আজ নৃত্য-সভার পর যা বলবার বলবেন। এখন আমি ব্যস্ত আছি। —সোমা একবারও দুই অতিথির মুখোমুখি হল না,—চলে গেল।

বিম্বিসার বললেন—শান্ত হও। শান্ত হও চণক। কোনও নগরনটী কি এইভাবে রাজাজ্ঞা উপেক্ষা করতে পারে ? দেখো, বোঝো, চণক।

—কোনও অমাত্যই কি তা পারে মহারাজ ?

—না তা অবশ্য পারে না। কিন্তু সে অমাত্য যদি হয় রাজার অতি প্রিয় ...

—প্রণয়ভাগিনী ?

—ধিক্—চণক, আমি কনিষ্ঠা ভগ্নী অথবা কন্যার কথা ভাবছিলাম।

জিতসোমা নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। চণক, চণক, জেট্‌ঠ চণক ! কত কাল ধরে সে এই দিনটির, এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছে ! জেট্‌ঠ বহুদিন বোধহয় ক্ষৌরকার্য করেননি। মুখময় অযত্নবর্ধিত শ্মশ্রু, পোশাকও ধূলিমলিন। সে তার কার্যনির্বাহক প্রধান দাস ধ্রুবকে ডেকে বলল—নহাপিত ডাকো। অতিথি কক্ষে মহারাজের সঙ্গে যে ব্যক্তি বসে আছেন তাঁকে স্নানাগারে নিয়ে পরিচ্ছন্ন করে দাও। সোনার কাজ করা একজোড়া বস্ত্র বার করে দিল সে—এইগুলি পরাবে। গন্ধ, মাল্য কিছুর যেন ত্রুটি না হয়।

—কর্ত্রী আপনাকে অন্তঃপুরে ডাকছেন—

মহারাজ বললেন—যাও দৈবরাত, তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়ত এখনই মিলবে। কিন্তু চণকের প্রশ্নের উত্তর তখনই মিলল না। স্নানাগারের সম্মুখে একটি গজদণ্ডের পীঠে বসিয়ে নহাপিত তার ক্ষৌরকর্ম করে দিল। দু'জন দাস তাকে বেত্র-শয্যায় শুইয়ে আপাদ-মস্তক—তৈলসংবাহন করে দিল। চণক আপত্তি করতে তারা শুধু বলল—এ গৃহের এরূপই নিয়ম। স্নানের পর, বহুমূল্য বসন পরতে চণক অতিশয় বিরক্ত হলেন। কিন্তু কোনও ফল হল না। দাসগুলি অম্লানমুখে বলল—এ প্রকার বসন ছাড়া কর্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অসম্ভব !

মাল্য ধারণ করে শ্বেত উত্তরীয়ের প্রান্ত ডান হাতের ওপর গুচ্ছ করে বিন্যস্ত করে দিয়ে সুন্দর সুসজ্জিত সভাস্থলে নিয়ে গেল দাসরা। বলল—এখানেই কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে।

স্নান করে এবং অবলেপ্য মেখে চণকের শরীর স্নিগ্ধ হয়েছিল। তার ওপর বহুক্ষণ পরিশ্রমের পর এমন সেবা পেয়ে তাঁর ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু তিনি সভাগৃহের একপ্রান্তে মহারাজকে বসে থাকতে দেখলেন। পাশেই একটি আসনে চণককে আহ্বান করে বিম্বিসার বললেন—দেখা হল ?

—না।

তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মহারাজ বললেন—ভালো হয়েছে।

চণক তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু মহারাজ অন্য দিকে চেয়ে আছেন। চোখে চোখ মিলল না। একটু পরে তিনি বললেন—দৈবরাত, এই গৃহ কে পরিকল্পনা করেছেন, জানো ?

চণক উত্তর দিলেন না।

—এই অপূর্ব স্থাপত্যের জন্যও আমি তোমার কাছে ঋণী। মহাগোবিন্দ-তনয়া দেবী সুমেধা এই প্রাসাদ পরিকল্পনা করেছেন।

চণকের হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। সে চতুর্দিকে তাকাতে লাগল। পাথরের কক্ষটি। অপূর্ব সজ্জিত। ভিত্তিচিত্রগুলি যেন এইমাত্র কেউ শেষ করে গেছে। বিম্বিসার তাঁর চোখ অনুসরণ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন—এই সব চিত্রের জন্য পশ্চিমদেশীয় সার্থদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে নানা বর্ণের রত্ন কিনেছি। চণক, দেবী সুমেধার পুত্র বোধিকুমার এই সব চিত্র লিখেছে।

চণক আর উদাসীন হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। কী অসাধারণ ভিত্তিচিত্রগুলি। চারদিকে গজ, পদ্ম বা হরিণ দিয়ে পট্টিকা করা। মাঝখানে মৃত্তিকা মিশ্রিত চুনমের লেপন দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে অঙ্কিত হয়েছে চিত্রগুলি। প্রথম চিত্রটিতেই গৌতম বুদ্ধ অশ্বত্থবৃক্ষতলে দেশনায় মগ্ন, সামনে রাজা রাজন্য শ্রেষ্ঠ যুবা বৃদ্ধ শ্রমণ ও শ্রমণারা। তিনি মহারাজের দিকে ফিরে বললেন—শুনেছিলাম গৌতম নিজের মূর্তি বা প্রতিকৃতি করতে অনুমতি দেন না!

বিম্বিসার বললেন—সম্প্রতি বংসরাজ উদয়ন নাকি রক্ত চন্দন কাঠ দিয়ে তাঁর একটি মূর্তি করিয়েছেন। কোসলরাজও গোপনে চন্দনের মূর্তি করিয়েছেন। এ সকল শুনে আমিও তথাগতকে ধরে পড়ি আমাকেও অনুমতি দিতে। অনুমতি দিলেন। কিন্তু চোখ আঁকতে নিষেধ করলেন। বোধিকুমার সে নির্দেশ পালন করেছে। প্রকৃতপক্ষে চণক, তথাগত চান না তাঁর মূর্তি কেউ পূজা করে। তবে ভিত্তিচিত্র তো আর পূজার জন্য নয়!

চণক অন্যমনস্কভাবে বলে উঠলেন—তবু এঁর চিত্র, মূর্তি নির্মিত হবে। পূজা হবে। মহারাজ আমাদের জীবিতকালে দেখে যেতে পারব কি না জানি না, কিন্তু ইন্দ্র মূর্তি যেমন বর্ষায় পূজিত হয়, বুদ্ধও তেমনি পূজিত হবেন। তবে সর্ব ঋতুতে। দেখবেন, শীঘ্রই ইনি দেবত্ব পাবেন।

সহসা সভাকক্ষের মধ্যে সহস্র প্রদীপ জ্বলে উঠল। পাথরের মসৃণ প্রাচীরে ছাদে প্রতিফলিত হয়ে সেই সহস্র প্রদীপ যেন দুই সহস্র হয়ে গেল।

বিম্বিসার বললেন—চলো চণক, বসি। ওই যে নৃত্য-গীতের জন্য পীঠ দেখছ, ওইখানে দাঁড়িয়ে গাইলে এই বিশাল কক্ষের সর্বত্র শোনা যায় গীত। মহাগোবিন্দ কন্যার এমনি কুশলতা।

—বলেন কী? চণক অবাক হয়ে রইলেন।

কক্ষের বারোটি প্রবেশপথ দিয়ে বহু দর্শক-শ্রোতা প্রবেশ করতে লাগলেন। পুষ্পসৌরভে ঘর ভরে গেল। ছাদের ওপর থেকে পুষ্প, সুগন্ধী জলচূর্ণ এসে পড়তে লাগল সমবেত শ্রোতাদের ওপর। চণক ওপর দিকে চেয়ে দেখলেন—ছাদের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মতো গবাক্ষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

গম্ভীর বজ্রনাদের মতো তিনটি ধমকার শোনা গেল মৃদঙ্গে। চণক মুখ ফিরিয়ে দেখলেন নৃত্য-পীঠের ওপর একটি প্রস্ফুটিত কেতকী বসে আছে। তার দীর্ঘ শ্বেত পাপড়িগুলি সম্ভবত শ্বেত দুকূল দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। প্রসারিত দলগুলির মধ্যে মৃদু হরিদ্রাভ বর্ণের কেশর নটীর শরীরটি। তার ওপরে একটি শুভ্র মুখ ফুটে আছে। দূরে দূরে বীণা হাতে বাদিকারা বসে আছে। একত্রে সকলে বাজাতে আরম্ভ করল। তাল-বাদ্য বাজাতে বাজাতে বাদক মাথা নাড়তে লাগল। নিস্পন্দ কেতকী যে গাইছে তা বোঝা গেল যখন একটি একটি করে বীণার ধ্বনি থেমে যেতে লাগল। চারটি বীণার স্বরের মধ্যে পঞ্চম বীণার মতো লুকিয়ে ছিল গায়িকার স্বর। ক্রমশই তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ভাষা নেই, থাকলেও তা এত অল্প শব্দের যে, ভালোভাবে বোঝাই যায় না। শুধু সুর। অপূর্ব মূর্ছনায় তা ওপরে উঠে যায়, তারপর ঝরনার মতো ঝরঝরিয়ে পড়ে। আবার পার্বতী নদীস্রোতের মতো এঁকেবেঁকে চলে। বাষ্পের মতো হতাশ্বাসের ধ্বনিতে আবারও ওপরে উঠে যায়, ধিমিধিমি মৃদঙ্গের সঙ্গে মেঘে পরিণত হয় তারপর মুষলধারার মতো সুরধারায় নেমে আসে। কোন ঊর্ধ্বলোক থেকে যেন এই সুরবারিধারা নেমে আসছে। সমস্ত শ্রোতারা নিস্পন্দ। স্নান করছে। এই সংগীতের মধ্যে কোনও ব্যাকুলতা, আর্তি, প্রার্থনা নেই। অভিযোগ নেই, দ্রোহ নেই, অনঙ্গতাপ নেই। ঝরনার উৎপত্তি, তার জলে ক্ষুদ্র নদীস্রোতের সৃষ্টি, রৌদ্রকর থেকে মহামেঘ এবং সেই মহামেঘ থেকে তাপহরণ বারিধারা, যার ফলে একটি অপরূপ কেতকীর জন্ম হয় শুধু সুর দিয়ে গায়িকা এই প্রাকৃতিক ঘটনার সুররূপ তো দিলেনই, এই ঘটনার অসামান্য সৌন্দর্য, ব্যঞ্জনা, সমারোহময় বিস্ময় এই প্রথম যেন শ্রোতাদের ইন্দ্রিয়গ্রামে অনুভূত হল।

মৃদঙ্গ বাজছে। কেতকী কখন অদৃশ্য হয়েছে। বীণাবাদিকাদের স্থানে আরও মৃদঙ্গবাদক এসে বসেছে। প্রায় বাকশক্তিহীন চণককে বিম্বিসার মৃদুস্বরে বললেন—দৈবরাত! কখনও এমন

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনেছো ?

চরক নীরবে মাথা নাড়ল অল্প—না। সে শোনেনি।

বিম্বিসার বললেন—কুশলতায় এর দ্বিতীয় আমি শুনেছিলাম বহু বৎসর আগে, বৈশালীতে। কিন্তু এ গীত অন্য জাতের।

কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। শ্রেণিবদ্ধ দাসীরা সমবেত শ্রোতাদের স্ফটিক পাত্রে মৃদু সুরা দিয়ে গেল।

কোথায় একজন মৃদুস্বরে বললেন—এ কি দেবসভা!

আর-একজন অনুরূপ স্বরে বললেন—সংসারবিরাগীরা বেণুবনে না গিয়ে এখানে আসতে পারেন। দুঃখ, বিরক্তি, বৈরাগ, হিংসা, দ্বেষ, দুর্ভাবনা সবই তো এখানে দূরে চলে যায় দেখি।

কতক্ষণ এভাবে আবিষ্ট কেটেছে চণক জানে না। হঠাৎ ভেরীঘোষ হল। মৃদঙ্গগুলি একের পর এক জটিল তাল বাজাতে লাগল। তারপর সেই তালে তাল মিলিয়ে অন্তরাল থেকে লম্ফ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এক অদ্ভুত পুরুষ। চুলগুলি চূড়া করে বাঁধা। আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, কাজল দিয়ে, নীল, লোহিত বর্ণ দিয়ে স্বাভাবিক চোখগুলিকে তিনগুণ করা হয়েছে। তুলনায় ক্ষুদ্র, রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর। কপালে তিলক, কণ্ঠে কম্বুচিহ্ন, উদরে ত্রিবলী। গৈরিক উত্তরীয়টি যজ্ঞোপবীতের মতো ডান কাঁধ থেকে বাম-কটিতে এসে গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে। দুটি পা জড়িয়ে রয়েছে রক্তকাষায়। পীঠের মাঝখানে এসে এক পা তুলে তরোয়ালের মতো বাঁকিয়ে অপর পায়ের ওপর স্থাপন করে, দুই হাতে অদ্ভুত মুদ্রা করে দাঁড়ালেন পুরুষ। চোখ দুটি জ্বলছে। জ্বলছে।

মৃদঙ্গগুলি বলতে লাগল :

জ্বলজ্বলদ্ ধ্বকধ্বকদ্ ধমদ্ ধা
রুদ্রায় বসূভ্য বৌষট্ টা
অহং রুদ্রহূহূ রুদ্রো   হং রৌদ্র রৌদ্র
ধ্বংসিত্বা জাগর্মি জাড্যং জাগ্রতু জাগ্রতু জাগ্র জাগর্
কেলিকলাপকুঞ্জঃ নহি স্তা স্তা
তুঙ্গ মৈনাকং তুঙ্গেন বিধ্যতি বিধ্যতু বিধ্যেৎ
    পিনাকেন মৈনাকং
        বিধ্যেৎ বিধ্যেৎ বিধ্যেৎ।

পুরুষ সর্বদিকে, সর্বকোণে, নিজের শরীরটিকে বেঁকিয়ে, ভঙ্গ করে, ত্রিভঙ্গে, দ্বিভঙ্গে, চতুর্ভঙ্গে অদ্ভুত সব হাতের আঙুলের মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধ্যমাকার, কখনও বড় বড় লম্ফ দিয়ে নাচতে লাগলেন। পায়ের তলা থেকে পাটলবর্ণ, রক্তবর্ণ চূর্ণ সব নাচের তালে তালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল।

নৃত্যপীঠের প্রদীপগুলি কাদের ফুৎকারে নিবে গেল, জ্বলতে লাগল দুটি উল্কার লেলিহ আগুন। আর সেই আগুনকে পটে রেখে কৃষ্ণবর্ণ ছায়ামূর্তির অলৌকিক নাচ। স্পষ্ট কৃষ্ণরেখায় ফুটে উঠল মৃদঙ্গবাদকরা তাদের মন্ত্র ও অঙ্গভঙ্গিসমেত। উল্কাগুলি পেছন থেকে সামনে চলে এলো, দর্শক শ্রোতাদের চোখ ঝলসে দিয়ে অন্তর্হিত হল। নৃত্যপীঠ অন্ধকার, শূন্য।

দর্শক-শ্রোতারা বহুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থেকে কখন ধীরে ধীরে চলে গেছেন, সভাগৃহ শূন্য। এখানে ওখানে এক-একটি প্রদীপ জ্বলছে শুধু। চণক বাক্যহীন, স্তব্ধ। পাশে বিম্বিসার। অনেক পরে একজন দাস এসে বিনম্র কণ্ঠে জানাল—কর্ত্রী ডাকছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভন্তে, আমি সমনাদের সবাইকে উদকসাটিকা (স্নান-বস্ত্র) দিতে চাই, ভন্তে। প্রতি বৎসর।
—কেন বিসাখা! সমনাদের সম্পৎ থাকা উচিত নয়।
—ভন্তে, অচিরবতীর জলে সমনারা নগ্ন স্নান করেন, নগরের রূপাজীবারাও তাই করে। তারা সমনাদের বিদ্রূপ করে বলে—কীই বা পার্থক্য আমাদের মধ্যে? তোমরাও নগ্নিকা, আমরাও নগ্নিকা। এসো না আমাদের আলয়ে। ভালো ভালো বসন, অলঙ্কার, ভোজ্য পাবে...ভগবন, সমনারা মুখ নিচু করে এই বিদ্রূপ সহ্য করেন। অল্পবয়স্কারা সইতে পারেন না, কেঁদে ফেলেন। আমার বড় কষ্ট হয়। নারীর জন্য সামান্য অধিক প্রয়োজন হয় প্রভু, দিতে অনুমতি করুন।

—তাই হবে বিসাখা...

—এ ছাড়াও বর্ষার প্রারম্ভে বর্ষা-চীবর, অন্তে বর্ষান্ত-চীবর এবং সারা বছর আবসথ চীবর প্রদান করতে দিন ভগবন।

—তাই হবে বিসাখা।

—সমনাদের জন্য নগর প্রাচীরের কাছে নবকম্ম কুটির নিম্মান করে দেবার অনুমতি দিন ভন্তে।

বুদ্ধ মৃদু হেসে বললেন—তাই হোক বিসাখা।

নতমুখে বিশাখা জেতবনবিহার থেকে ফিরে চলেছে। তথাগত লক্ষ করেছেন অশ্রু-ছলোছল তার চোখ দুটি। একবার মাত্র বিশেষ দানের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারপর বিশাখা যা যা প্রার্থনা করেছে সবেতেই সম্মতি দিয়েছেন।

চলতে চলতে বিশাখার কানে এলো কিছু যুবক শ্রমণ আলোচনা করছেন—উপাসিকা বিসাখার করুণা বড়ই পাত্রনির্ভর। নারীদের তিনি যেরূপ করুণা করেন, সবদিক থেকে রক্ষা করেন, ভিক্ষুদের তো তেমন করেন না!

—কেন, ভিক্ষুদের জন্য ভোজের নিমন্ত্রণ তো আছে! বিসাখার আবার সন্তান জন্মালে আবার চীবর, ভৈষজ, পাত্র সব পাওয়া যাবে। শ্রমণের কণ্ঠে ক্ষুব্ধ বিদ্রূপ।

—ততদিন পংসুকুলই পরিষ্কার করো আর ব্যাধি হলে কষ্ট সহ্য করো। মরবার হলে মরে যাও। আমরা তো আর সমনা নই!

উপাসিকা বিশাখা শুনেছেন, কিন্তু অন্য মনে। চলেছেন। পাশে ধনপালী। ময়ূরী সম্প্রতি এক আপণিককে বিবাহ করেছে। তার ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু তার আপণ ও ধনসম্পদ যত্ন করে দেখাশোনা করার তেমন কেউ নেই। ময়ূরীকেই সে সব করতে হয়। ময়ূরী অত্যন্ত ব্যস্ত। কহ্না, বিসাখার পিয় সহি, শ্লোকরচয়িত্রী কহ্না স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করল। মা নেই। বিসাখার অন্তরের ভেতরটা মাঝে মাঝেই একেবারে শূন্য হয়ে যায়। শিশু-ভগ্নীটির কথা মনে পড়লে তার এমন উৎকণ্ঠা হয় যে মনে হয় এখনি ছুটে সাকেত চলে যায়। সে শিশুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চেয়েছিল কিন্তু ধনঞ্জয় সম্মত হননি। এখন সেই শিশু সুজাতা গুচ্ছ গুচ্ছ চুল দুলিয়ে গাল ভরে অবোধ হাসি হাসে। পিতার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি মুখে পুরে সশব্দে চুষতে চুষতে ঘুমোয়। পিতার দিবারাত্রের একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র আনন্দ, বেঁচে থাকার অর্থ ওই শিশু সুজাতা। তিনি কী করে সম্মত হবেন? অথচ বিসাখাকে শ্রাবস্তীতে ফিরতেই হবে। সে তো চিরকাল সাকেতে থাকতে পারে না! মিগারের ঘর-সংসার আছে, তার নিজস্ব কর্মান্ত আছে, শ্রাবস্তীতে বহু প্রকার লোককল্যাণের সঙ্গে সে জড়িত। আছে সংঘ। পশুগুলি সব উন্মুখ হয়ে তার পথ চেয়ে থাকে। বৃদ্ধ এবং রুগ্‌ণ পশুদের জন্য সে যে পশুচিকিৎসাভবন করেছে সেখানে পর্যন্ত বৃদ্ধ কুকুর, বৃদ্ধা গাভী বা ছাগলগুলি, রুগ্‌ণ অশ্ব সব বিশাখাকে না দেখতে পেলে আহার ত্যাগ করে। দিনের মধ্যে একবার অন্তত তাদের দেখা দিতে হয়। আদর করতে হয়।

প্রবেশদ্বারের কাছে শ্রমণ আনন্দ। তিনি আজকাল তথাগতর উপস্থায়ক হয়েছেন। তথাগতর যাবতীয় পরিচর্যার ভার তাঁরই ওপর। অনেক কাল আগে এক সময়ে গৃধ্রকূটে তিনি কিছুদিন নির্জনবাস ও ধ্যান করার অবসর পেয়েছিলেন। তারপর থেকে আনন্দ সব সময়ে তথাগতর পাশে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশে। তথাগতর প্রতিনিধি হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, উপদেশ দেন, দান নেন। স্নেহকরুণ নয়নে বিশাখার দিকে চাইলেন আনন্দ—

—কল্যাণি, আজ এ দীন বেশ কেন ?

—সর্বত্যাগী ভিক্ষু আপনি। দীন বেশই তো আপনার মনোমত হওয়ার কথা সমন।

দীন বেশ প্রব্রাজকের। কিন্তু উপাসিকা বিসাখার যে ঐশ্বর্যশ্রী! তোমার মহালতা পসাদন কোথায় গেল কল্যাণি! মহালতা ধারণ করলে বিসাখা যে হয়ে যায় আনন্দ-ময়ূরী। এই পার্থিব প্রকৃতির অন্তরের সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎসার শতধারায় উৎক্ষিপ্ত হতে দেখি। শতধারায়...দুই হাতের আঙুল দিয়ে শতধারায় উৎসারিত হবার প্রক্রিয়াটি করে দেখালেন শ্রমণ আনন্দ। তারপর কী যেন ভাবতে ভাবতে ভেতরে চলে গেলেন। সরল, পবিত্র, সহাস্য মুখটি আনন্দর। কোনও ব্যক্তিগত দুঃখ নেই, কিন্তু সবার জন্য করুণা অনুভব করেন। কোমল-হৃদয় বৎসল স্বভাবের শ্রমণ আনন্দ তাই নারীদের প্রিয়। বালকদেরও প্রিয়। আনন্দর অনুরোধেই নারীরা প্রব্রজ্যার অধিকার সংঘের অধিকার পেয়েছে। আনন্দর মধ্যস্থতাতেই ভিক্ষুদের স্থান ও ঋতুবিশেষে দুই তিন তলিকা পর্যন্ত পাদুকা পরার অনুমতি মিলেছে। ভৈষজ বলে মধু, ঘৃত, ইত্যাদি ব্যবহার করবার অনুমতি মিলেছে। আনন্দ তদ্গত চিত্তে তথাগতর সেবা করেন, নিজের অর্হত্ত্বর কথা চিন্তাও করেন না।

মধ্যাহ্নের খর রোদে তপ্ত নগরীর পথ। কিন্তু বিশাখা ধীর পদক্ষেপে চলেছে। ধনপালী শুধু একবার তাকাল, কিছু বলল না। সে-ও চলেছে। শিবিকা পেছন পেছন আসছে। নগরোপান্তে ভিক্ষুণী উপসয়। এখন প্রায় সকলেই ভিক্ষার্থে নগরে। শূন্য ভিক্ষুণী উপসয়ে বিশাখা কেন চলেছে ধনপালী জানে না।

উৎপলবর্ণার ঘটনা ঘটবার পর বিশাখার অনুরোধে গৌতম বুদ্ধর সম্মতিক্রমে এই উপাশ্রয় নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন মহারাজ প্রসেনজিৎ। জেতবনের প্রকাণ্ড দ্বারকোষ্ঠক দেখলে যেমন প্রথমেই ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যায় চিত্ত, এই উপাশ্রয়ের অনাড়ম্বর অতি সাধারণ আকৃতি দেখে তেমনি একটা হেলাফেলার ভাব আসে। এখন এখানেই অবস্থান করছেন দেবী রাহুলমাতা। কয়েকদিন রক্তাতিসারে ভোগবার পর এখনও তিনি অসুস্থ। বিশাখা জানে তিনি ভিক্ষার্থে বার হবেন না।

মৃৎবেদীতে মৃৎ-উপাধানে সংঘাটি বিছিয়ে শোন এঁরা। রাহুলমাতা বা মহাপ্রজাবতীদের মতো থেরীদের একেক সময় একেক জন সাধিবিহারিকা বা অন্তেবাসিনী থাকে। তারা থেরীর দন্তকাষ্ঠ, মুখ ধোবার জল এনে দেওয়া থেকে ভিক্ষান্ন আনা, প্রয়োজনমতো চীবর পরিষ্কার করা ইত্যাদি সবই করে। আজ রাহুলমাতার সঙ্গিনী ভিক্ষার্থে বেরিয়েছে।

নিজের বেদীতে ধ্যানাসনে বসেছিলেন রাহুলমাতা। বিশাখা ধনপালীর সঙ্গে তাঁর সামনে গিয়ে বসতে চোখ মেললেন।

দেবি, আপনার পথ্য এনেছি।—বিশাখা তার উত্তরীয়ের আড়াল থেকে পাত্র বার করল।—গ্রহণ করুন।

—পুরাতন শালিধানের অন্ন আর রসভক্ত (মাংসের ঝোল)। সেইসঙ্গে বিশাখা ভৈষজও বার করল।

রাহুলমাতা মৃদুস্বরে বললেন—কল্যাণি, তুমি কোথা থেকে জানলে...

—শ্রমণ আনন্দর কাছ থেকে। গতকাল তিনি আমার গৃহ থেকে আপনার জন্য রসভক্ত নিয়ে এসেছিলেন। একেক দিন একেক জনের গৃহে যান। আমি নিষেধ করলাম। আমিই আসব নিত্য।

ধনপালী তাঁকে মুখ প্রক্ষালনের জল দিল। একটি বড় ঘর আছে, যেখানে সমবেত হয়ে ভিক্ষুণীরা নিজেদের সংগৃহীত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন। অনেক কষ্টে সেই ঘরে গিয়ে বিশাখার আনা পথ্য ও ভৈষজ গ্রহণ করলেন দেবী। তারপর আবার তাদের সাহায্যেই ধীরে ধীরে এসে নিজের বেদীতে শুয়ে পড়লেন।

বিশাখা ধীরে ধীরে তাঁর চরণ সংবাহন করতে লাগল। ধনপালী মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রাহুলমাতা দুর্বল কণ্ঠে বললেন—বিসাখা, ক্ষান্ত হও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাখা বলল—দেবি, রক্তাতিসারে সারা শরীরে বড় যন্ত্রণা হয়। আমি জানি। ভগবান তো কৃচ্ছ্র করতে বলেন না কাউকে।

রাহুলমাতা একটু হাসলেন, বললেন—যখন দীর্ঘ সাত বছর কী শীত, কী গ্রীষ্ম মৃত্তিকায় শয়ন করতাম, কেশ বাঁধতাম না, ছিন্ন চীর ব্যতীত অন্য বস্ত্র পরতাম না, দিনে একবার সামান্য আহার করতাম, তখন তা কি কৃচ্ছ্র ছিল না ? কেউ কি নিষেধ করেছিল ?

বিশাখা নীরব রইল।

—কল্যাণি, কপিলবস্তু থেকে মল্লভূমি পার হয়ে বজ্জিভূমি বৈশালীতে যখন পৌঁছলাম তখন চরণ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। জটাবদ্ধ কেশ নিজ হাতে কেটে ফেলেছিলাম। অনভ্যস্ত পথ হাঁটায় সমস্ত শরীরে যেন স্ফোটকের যন্ত্রণা, সংঘে প্রবেশ করবার অনুমতি পাবার আগে তিন দিন মুক্ত আকাশের তলায় পড়েছিলাম, কেউ কি নিষেধ করেছিল ?

বিশাখা সসম্ভ্রমে বলল—দেবি, শুনেছি সাক্করা, কোলিয়রা আপনাকে তখন বহু উপহার দেয়। সাক্করা নিজেদের রাজ্ঞী বলে স্বীকার করে নেয়, আপনি বৈশালী যাবেন বলে সজ্জিত রথ নিয়ে আসে, আপনি কিছুই গ্রহণ করেননি।

—আমার কৃচ্ছ্র স্বেচ্ছাবৃত এই কথাই বলছ তো বিসাখা ?

—তাই। আপনি কেন ?...

প্রথমে কোনও উত্তর দিলেন না, অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন—কল্যাণি, আমার নাম জানো ?

—জানি। দেবী যশোধরা।

—সমনরা কখনও সে নাম ব্যবহার করেন না। রাহুলমাতাও বলেন অতি সাবধানে, পাছে ভগবানের সঙ্গে অতীত-সম্পর্কের স্মৃতি কোথাও থেকে যায়। যেখানে উনি থাকেন, সেখানে আমার থাকার অনুমতি মেলে না। আমি তো বৈশালীতেই অধিক থাকি।...

অনেকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন—কৃচ্ছ্র করবো না তো কী !

দেবী যশোধরা পাশ ফিরে শুলেন। ধনপালী ও বিশাখা পরস্পরের দিকে তাকাল। দেবী কি ঘুমিয়ে পড়লেন ?... পা দুটি, মাথাটি কি সামান্য তপ্ত ?

...আমি জানতাম উনি প্রজ্ঞার সন্ধানে যাবেন। আমি জানতাম। মাতা মহাপ্রজাবতী জানতেন। পিতা শুদ্ধোদন জানতেন।...কতদিন দুজনে এ বিষয়ে কত কথা বলাবলি করেছি... রোহিণী নদীর জল নিয়ে কথায় কথায় সাক্ক ও কোলিয়দের মধ্যে রক্তপাত ! আমাদের ভালো লাগত না। এক্কেকটি গৃহের অন্তঃপুর বহু দাস, বহু নটীতে পূর্ণ, অতিরিক্ত ভোগ, অতি বিলাসের জীবনযাপন—কত অনর্থক...জীবন মহৎ কোনও কাজের জন্য নির্দিষ্ট আছে...জীবন কী ? কেন ?... এই পৃথিবীই বা কেন ? সবই ভাবতাম যুগ্মভাবে...সিদ্ধার্থ কেন একা গেলেন ? এখনও কেন তিনি একা যাচ্ছেন ? সুভগে বিসাখা— যশোধরা তো এখন ভিক্ষুণী, থেরী, যৌবন অতিক্রান্ত, থের সারিপুত্ত সঙ্গে যান, থের মোগ্‌গল্লান সঙ্গে যান, ভগু, কিম্বিল এরা সঙ্গে থাকে, আনন্দ সর্বত্র সঙ্গে যায়—শুধু ভিক্ষুণী যশোধরার থেকে এত দূরত্ব রাখবেন কেন মুক্তপুরুষ ?

বিশাখা দেখল দেবী যশোধরার শরীর ক্রমশই তপ্ত হয়ে উঠছে। জ্বর আসছে। সে ধনপালীকে বৈদ্য ডাকতে পাঠাল। ক্রমশই জ্ঞান হারাচ্ছেন দেবী। শরীরের বর্ণ হয়েছে রক্তিম।—রাহুল, রাহুল তুমি সঙ্গে যাও। হ্যাঁ পিতার সঙ্গে। না বচ্চ, মা যায় না। মাকে যেতে নেই। মা-ই পালন করে, পত্নী-ই বহন করে কিন্তু পত্নীই সর্বাপেক্ষা বর্জনীয়া। সর্বাপেক্ষা...। অস্ফুট স্বরে কথাগুলি বলছেন, বিশাখা অতি নিকটে বসে আছে বলে শুনতে পাচ্ছে। বৈদ্য বললেন—এই ভৈষজ্জ খাইয়ে দাও কল্যাণি, জ্বর নেমে যাবে। বিকারের অবস্থা কেটে যাবে।

আনন্দ আসছেন ক্ষিপ্র পায়ে।—জল, জল পান করান দেবীকে, বৈদ্যবর, ভগবান বলছেন—প্রচুর জল, একটু একটু করে মিষ্ট জল খাওয়াতে হবে। জলই প্রাণ।

বিশাখা ধীরে ধীরে উঠে এলো। কোন প্রাণ ? কোন প্রাণকে জল দিয়ে বাঁচাতে হবে ?

সত্যকে পেতে হলে কত ত্যাগ করতে হয় ভগবন ! ধনে-জনে-প্রণয়ে পরিপূর্ণ জীবনের মাঝখানে আপনাকে বিষাদে পেলো কেন ? যদি মনে হয়েছিল সে জীবন সংকীর্ণ, আত্মসুখী, বৃহৎ সংসার হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমুখ-বিযুক্ত তাহলে হলেন না কেন দৈবজ্ঞের গণনাফল সফল করে মহারাজাধিরাজ। সমগ্র জম্বুদ্বীপে এমন একজনও নেই যে আপনার নায়কত্ব অস্বীকার করত। তখন ওই প্রজ্ঞাবতী উদারহৃদয় ভার্যার সঙ্গে আলোচনা করে সমগ্র দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে, সামাজিক নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে আনতে পারতেন অভাবিতপূর্ব পরিবর্তনসকল। আজ রাজশক্তিকে প্রভাবিত করে যেটুকু পারছেন তখন প্রত্যক্ষভাবে পারতেন তার শত গুণ। আজ ধনী শ্রেষ্ঠীদের আশ্রয় করেছেন। তখন তারাই আপনার আশ্রয় নিত। রাজাকে তো আমরা ভক্তি, সম্মান, বিশ্বাস করতেই চাই, চাই আজ্ঞাপালন করতে। কোথায় তেমন প্রজানিষ্ঠ, নির্লোভ, বুদ্ধিমান, বীর্যবান রাজা? হে ভগবন তথাগত, আপনার অলোকসামান্য শক্তি দিয়ে শুধু ভিক্ষাজীবী সৃষ্টি করে গেলেন। যা পূর্ণ ছিল তা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। যা শূন্য আছে তা হচ্ছে শূন্যতর। বিপুল এক বিনাশ—এই-ই কি সত্য?

—ভন্তে, বিসাখাকে আমরণ সংঘে অষ্টবিধ দান দেবার অনুমতি দিন।

—সে কি বিসাখা, এই তো ক দিন আগেই ভিক্ষুণীদের জন্য কত কী দানের ব্যবস্থা করে গেলে! আবার কী? কী কী অষ্টবিধ দান শুনি?

—আমরণ পঞ্চশত ভিক্ষুর আহার দেবে বিসাখা। দেবে পীড়িত ভিক্ষুদের ঔষধ, শুশ্রূষাকারীদের পোষণ করবে, সে যে খাদ্য দেবে ভগবান তথাগত তার অংশ গ্রহণ করবেন, প্রতি বৎসর পঞ্চশত ভিক্ষুকে বর্ষাকালীন বস্ত্র ও কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন বস্ত্র দান করবে, সংঘে যা যা ঔষধ লাগে সবই দেবে উপরন্তু।

—বিসাখা, সংঘের সেবা সবাই করতে চান, সে ক্ষেত্রে যদি একা কাউকে এত ভার দেওয়া হয় তাহলে অন্যদের মনে ব্যথা লাগতে পারে। এত দান করতে কেন চাও বিসাখা। যশস্বিনী হবে?

—ইহলোকে যশের প্রত্যাশী নই প্রভু, পরলোকে সুখস্থিতির জন্যও উদ্বিগ্ন নই।

—তবে?

—ভগবন, বিসাখা প্রব্রজ্যা নিতে পারেনি, প্রব্রজিতের সেবা করে প্রব্রজ্যার আনন্দের অংশ পেতে চায়।

—আর?

—ভগবন, নির্বাণপদ লাভ করবার জন্য কত দেশ, কত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন বয়সের মানুষ সংঘে আশ্রয় নিচ্ছেন। সারাদিন যদি আহারের জন্য উদ্বেগে কাটে তাঁরা ধ্যান করবেন কখন? সদালোচনা করবার সময়ে, উপদেশ শোনবার সময়ে পিণ্ডপাত্রে মন পড়ে থাকবে। শ্রাবস্তীতে থাকা-কালীন তাঁদের কষ্ট এইটুকু লাঘব করতে চাই।

গৌতম হাসলেন, বললেন— তথাগত এক দিক থেকে তাদের গৃহসীমার থেকে বাইরে বার করছেন, মিগারমাতা কি আরেক দিক থেকে তাদের অন্যতর গৃহে প্রবিষ্ট করাবেন?

—ভগবন মায়ের কাজই তো তাই। তা ছাড়া আপনিই তো কৃচ্ছ্র নিষেধ করেন। দূর দেশ থেকে কত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সাবত্থিতে আসবেন। কিছু জানেন না, চেনেনও না। বিসাখার গৃহে তাঁদের জন্য নিশ্চিন্ত অন্ন থাকবে, থাকবে নিশ্চিন্ত ঔষধ।

—আর?

—ভন্তে দূরদেশে কোনও ভিক্ষু মারা গেছেন সংবাদ পেলে তথাগত তাঁর প্রসঙ্গে সকৃদাগামি ফল, অনাগামি ফল ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন। তখন বিসাখা জিজ্ঞাসা করবে ওই ভিক্ষু কখনও সাবত্থিতে এসেছিলেন কি না। যদি শোনে এসেছিলেন, তাহলে সে বুঝবে তার দেওয়া বসন তিনি পরেছিলেন, তার অন্ন তিনি গ্রহণ করেছিলেন—জানতে পারলে বিসাখার ভালো লাগবে। বড় ভালো লাগবে।

তথাগত স্মিত মুখে বললেন— তবে তাই হোক।

বৈশাখী পূর্ণিমা। বিশাখার জন্মদিন। সে চন্দন জলে স্নান করে চন্দন বর্ণের বসন পরল। তারপর পরল মহালতাপসাদন। এই অলঙ্কার আজকাল বিশাখা সব সময়ে পরে না। পরে বিশেষ কোনও উৎসব থাকলে বা রাজপ্রাসাদে গেলে। তার সব সময়ে ব্যবহারের জন্য মিগার অন্য একটি অলংকার করিয়ে দিয়েছেন। ঘনমট্ঠক। সেটিই পরে সে। আজ মহালতা পরবামাত্র তার সর্বাঙ্গ ঝলমলিয়ে উঠল। ধনপালী মাথার ওপর ময়ূরমুখটি ভালো করে বসিয়ে দিয়ে বলল- অনেকদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে তোমাকে বিসাখাভদ্রা বলে চেনা যাচ্ছে। প্রসাধনকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে হর্ষ ও মিত্র ছুটে এলো। তারা ময়ূরের পালকগুলি টানাটানি করছে। বিশাখা ভূষণ বাঁচিয়ে দুই কোলে দুজনকে তুলে নিল।

ধনপালী হাত বাড়িয়ে বলল— মা সংঘে যাচ্ছেন। তোমরাও বুঝি যাবে ?

তৎক্ষণাৎ কোল ছেড়ে নেমে এলো দুজনে— না, না, আমরা খেলা করবো।

—ভালো, ছোট্ট ভগ্নীটিকেও খেলতে নিও।

হর্ষ বলল— ও খেলা জানে না।

মিত্র বলল— শুধু কাঁদে।

—হাসে না ? —বিশাখা জিজ্ঞেস করলো।

—ও আমাদের কন্দুক, পুত্তুল সব নিয়ে নিতে চায় মা, না দিলে কাঁদে।

মিত্র বলল— প্রহারও করে। মা, ও আমার হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল।

—কই দেখি ? ধনপালী মিত্রর হাত পরীক্ষা করে বলল— জানো তো বচ্চ, শিশুতে হাত কামড়ালে হাত শক্ত হয় !

—তাহলে মা ওই তীর-ধনুক ছুঁড়তে পারবো ?

মিত্রর ছোট্ট আঙুল অনুসরণ করে বিশাখা দেখতে পেলো প্রাচীরের নাগদন্ত থেকে ঝুলছে তার সেই বিবাহের উপহার সোনার তীর-ধনুক। অনেক দিন থেকে এর ওপর লোভ বালক দুটির। সে হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল। নাগদন্ত থেকে তীর-ধনুকটি তুলে নিয়ে বলল— বচ্চ, এই তীর-ধনু নিলে কিন্তু বীর হতে হয়।

—হবো মা, আমরা বীর হবো।

—ন্যায়নিষ্ঠ হতে হয়।

—হবো, আমরা ন্যয়নিট্‌ঠ হবো।

—তাহলে নাও— সে তীর-ধনুকটি মিত্রর হাতে দিয়ে বলল— দুজনেই অভ্যাস করবে।

বিশাখা সংঘে চলে গেল। দেশনা-স্থলে ঢোকার আগে সে সযত্নে মহালতাটি খুলে রাখল। প্রশস্ত আলিন্দ আছে বিহারে, অনেকেই সেখানে অস্ত্র, উপানৎ, ভূষণ, বর্ম খুলে রেখে যান।

দেশনা-অন্তে সে দ্রুত অলিন্দ পার হয়ে শিবিকায় উঠল। ধনপালী একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী বলতে গেল, বিশাখা তার হাত দুটি চেপে ধরল শক্ত করে। কিছুক্ষণ পর পেছন থেকে একটি অল্পবয়স্ক সার্ধবিহারিক ছুটতে ছুটতে আসছে দেখা গেল।

—শিবিকা থামান, শিবিকা থামান।

শিবিকা থামলে বালকটি বলল— ভদ্রে, আপনার অলঙ্কার ফেলে এসেছেন যে। মহামূল্য বস্তু তাই আমার আচারিয় সমন আনন্দ তুলে রেখেছিলেন।

বিশাখা মুখ বাড়িয়ে বলল— বচ্চ, সমনকে বলো, তিনি একবার যা গ্রহণ করেছেন বিশাখা কি আর তা ফিরিয়ে নিতে পারে ?

বালকটি বিপন্ন মুখে বলল— না আপনি চলুন ভদ্রে, আমি তিরস্কৃত হবো। সমনরা বলবেন— এ একেবারে শিশু, কোনও কাজই সম্পন্ন করতে পারে না।

বিশাখা হেসে বলল— বচ্চ তুমি তো শিশুই। তুমি বুঝি ভেবেছো এখনই একেবারে স্থবির হয়ে গেছো ? ফিরে যাও, বলবে আগামীকাল বিশাখা এসে সব সমাধান করে দেবে।

বালকটি ছুটতে ছুটতে ফিরে গেল।

দেশনা-স্থলের মাঝখানে মহালতাটি রাখা। বুদ্ধ বসে আছেন তাঁর বেদীতে। পাশে অপরাধীর মতো মুখ করে শ্রমণ আনন্দ। বিশাখা দেখল বিহারের সব শ্রমণই প্রায় সমবেত হয়েছেন প্রাঙ্গণে।

সে বুদ্ধ তথাগতকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন— বিসাখা, সমন আনন্দকে বিপন্ন করছো কেন কল্যাণি, তোমার অলঙ্কার ফিরিয়ে নাও।

বিশাখা সকৌতুকে বলল— সামান্য অলংকারের জন্য শুধু সমন আনন্দ কেন, স্বয়ং তথাগতও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো বিপন্ন হয়ে পড়েছেন দেখছি। কিন্তু প্রব্রজিত ভিক্ষুর স্পর্শ পড়েছে যাতে সেই অলংকার গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে আমার যে দত্তাপহরণের অপরাধ হয়!

আনন্দ বললেন— কিন্তু আমি তো ও অলংকার গ্রহণ করিনি কল্যাণি।

—আপনারা কি দান স্পর্শ করেই গ্রহণের সম্মতি জানান না?

—এ তো দান নয়?

বুদ্ধ বললেন— স্বর্ণ-রৌপ্য এ সব গ্রহণ করার অনুমতিও নেই কোনও সমনের।

—সমন না নেন, সংঘ নিন।

—সংঘই বা নেবে কেন?

—তাহলে অনুমতি করুন ওই অলংকার আমি বিক্রয় করি। যা অর্থ পাওয়া যাবে তাই দিয়ে একটি বিহার হবে।

—সাবত্থিতে জেতবনই তো যথেষ্ট প্রশস্ত বিহার।

—ভন্তে, বিশাখা নম্রস্বরে বলল— ভিক্ষুণীদের জন্য তো তেমন কোনও বিহার নেই... আপনি যে নিয়ম করেছেন ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুসংঘের আশ্রয়ে থাকবেন অথচ একত্র থাকবেন না, তেমনই ব্যবস্থা থাকবে নতুন বিহারে। থেরীরা থাকবেন তাঁদের সার্ধবিহারিকাদের নিয়ে। থেরী খেমা, থেরী মহাপ্রজাবতী, সমনা উপ্‌পলবন্‌না, সমনা ভদ্দা, সমনা মিত্তা থেরী যশোধরা... আর...

...ভন্তে যেমন জেতবনে অবস্থান করে অজজ সুদত্তকে ধন্য করেছেন তেমন মিগার মাতার বিহারে অবস্থান করেও...

—সম্মতি দিন ভগবন— সারিপুত্ত মৃদুকণ্ঠে বললেন, না হলে এই চতুরা কন্যা আপনাকে ছাড়বে না।

তথাগত প্রশান্ত নয়নে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন বিশাখার দিকে। কিন্তু বিশাখা চোখ নিচু করে আছে। তখন তিনি চোখ নিমীলিত করে বললেন— তবে তাই হোক।

মহালতা ক্রয় করবার মানুষ পাওয়া গেল না সমগ্র শ্রাবস্তীতে। যাঁরা বিপুল মূল্য দিয়ে কিনতে পারতেন তাঁরাও কেউ কন্যা বিশাখার অলঙ্কার নিতে চাইলেন না। তখন বিশাখা নিজেই নবতি কোটি সুবর্ণ দিয়ে সেই অলঙ্কার ক্রয় করে নিল। শ্রাবস্তী নগরীর পূর্ব দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ডের ওপর অনুপম বিহার উঠতে লাগল। সমগ্র অঙ্গ-মগধ-কোশল থেকে শিল্পীরা আসতে লাগল দলে দলে। বিশাখার সখী সুপ্রিয়া, অনোপমা, সুভদ্রা— এঁরা প্রার্থনা করলেন কেউ সোপান দেবেন, কেউ অলিন্দ দেবেন, কেউ গন্ধকুটির সম্মুখস্থ চত্বালের প্রস্তর দেবেন। বিশাখা সব স্বীকার করে নিলেন। কারণ আত্মযশবিস্তার তো ওই বিহার নির্মাণের কারণ ছিল না!

এইভাবেই গড়ে উঠল অনুপম প্রাসাদোপম পূর্বারাম মহাবিহার, যাকে শ্রমণ-শ্রমণারা আদর করে বলতেন মিগার মাতু প্রাসাদ, সন্তানের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সময়ে মায়ের যেমন কিছুই দৃষ্টি এড়ায় না, এই প্রাসাদের পরিকল্পনাতেও তেমনি। তাই পূর্বারাম মাতার প্রাসাদ। মাতার প্রসাদ।

১৪

দাস জন্তু এসে জানাল - দুজন মান্য অতিথি এসেছেন। তিষ্য লিখতে ব্যস্ত ছিল। সে তার অভিজ্ঞতাগুলি লিখে রাখে। স্থান কালের উল্লেখ করে না, পাত্রও ছদ্মবেশে থাকে। সে লেখে কতকটা প্রবচনের আকারে। মহারাজ পসেনদির সান্নিধ্যে এসে তার বহু শিক্ষা হল। এই রাজা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত, জন্মসূত্রে পেয়েছেন এক বিরাট রাজ্য। স্বভাবে সন্ধিৎসু। কিন্তু এঁর চিত্তে কেমন একটা বিভ্রান্তি। ইনি নিজেও তার সংবাদ জানেন না। রাজার চেতনার দুটি দিক থাকা উচিত : অধিকার ও কর্তব্য। এঁর যে সে চেতনা নেই তা নয় কিন্তু দুটিতে কেমন স্থানবদল হয়ে যায়। অধিকার গুলিকে ইনি অনেক সময়ে কর্তব্য মনে করেন এবং কর্তব্যগুলিকে অধিকার। সন্ততি নামে এক সৈনিক না ছোট অমাত্য দস্যুদমন করে এসেছে, ইনি রাজদণ্ডটি সাতদিনের জন্য তার হাতে তুলে দিলেন। এই নাকি তার পুরস্কার, এটাই রাজার কর্তব্য। কেউ কখনও এমন কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনেছেন ? সে কী অবস্থা ! অমাত্যরা সব ফুঁসছেন। রাজ্যে অরাজক অবস্থা। মহারাজ পসেনদি অদর্শন। গোপনে কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না। ওদিকে আবার তাঁর এমন অদ্ভুত লোভ যে সুন্দরী নারী, সুন্দর বস্তু, ধন ইত্যাদি, সে রাজ্যের যেখানেই থাকুক যারই থাকুক, যদি মনে করেন চাই, অমনি রাজার অধিকার প্রয়োগ করে নেবেনই তা। এক বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠী মারা গেলেন। তাঁর পুত্র সমুদ্র বাণিজ্যে গেছে। পাঁচ বৎসর হল তার কোনও সংবাদ নেই। পসেনদি সেই শ্রেষ্ঠীর সব ধনই রাজকোষে পুরলেন। শ্রেষ্ঠীর যুবতী পুত্রবধূটিকেও। মহারানী মল্লিকার সঙ্গে প্রচণ্ড কলহ হল। শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূকে দেবী মল্লিকা পট্টমহিষী মগধকুমারীর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ষষ্ঠ বৎসরে শ্রেষ্ঠীপুত্র এসে উপস্থিত। পসেনদি কিছুতেই তার পিতৃধন দেবেন না। অবশেষে গৌতম বুদ্ধের মধ্যস্থতায় শ্রেষ্ঠীপুত্র তার ধন এবং বধূ পেলো।

রাজার অধিকার ও কর্তব্য বিষয়েই সে কতকগুলি প্রবচন লিখে রাখছে এখন। তক্ষশিলা বা বারাণসীর শিক্ষাই স-ব নয়। অথচ একসময়ে সে ভেবে ছিল এই শিক্ষা এক সামগ্রিক শিক্ষা। তার নিজের ক্ষেত্রে যে এই শিক্ষা কত কাজে লেগেছে! কিন্তু পসেনদির ে ক্ষত্রে তো তা কই লোভ অসংযমের বীজটি নির্মূল করতে পারেনি !

হঠাৎ তার দুই কানে শঙ্খের ধ্বনি হল। তিষ্য চমকে একেবারে লাফিয়ে উঠেছিল। সামনে দুটি বালিকা হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বজ্জিরা ও মল্লিকা। বা বজ্জি ও মল্লি।

তিষ্যকুমার চোখ পাকিয়ে বলল- রাজকুমারীদের এ কী ব্যবহার ? বজ্জির বয়স বছর আটেক হবে মল্লি একটু বড়।

দুজনে তিষ্যর কোলের কাছে এলো। মল্লি বলল - রাজকুমারীদের বুঝি কেউ চোখ পাকিয়ে ভয় দেখায় !

— শিক্ষা দেবার জন্য প্রয়োজন হয় !

বজ্জি বলল —আমাকে কাঁধে তুলে, তোমার গেহের ছাদে নিয়ে চলো না পাঞ্চাল। আমি নদী দেখব।

— ওই তো গবাক্ষ আছে। যাও গিয়ে দেখো।

— ওখান থেকে নয়, অনেক উচ্চ স্থান থেকে দেখব।

— তাহলে তো বৃক্ষশাখায় উঠতে হয় বজ্জি। বাঃ বেশ ভালোই লাগবে দৃশ্যটি।

— কেন ? এ কথা বললে কেন ?

তিষ্য বলল— চেয়ে দেখো অদূরে ওই বটবৃক্ষটির দিকে।

বটগাছটির শাখায় কতকগুলি বানর নিশ্চিন্তমনে বসেছিল। শ্রাবস্তী, সাকেত, অযোধ্যা, সমগ্র কোশলদেশই বানর ও হনুমানের জন্য বিখ্যাত।

বানরগুলির দিকে চেয়েই মল্লি বলল— ও আমাদের বানরী বললে ? দেখাচ্ছি তোমাকে দাঁড়াও।

দুই ভগ্নী দুদিক থেকে তিষ্যর ওপর নানা প্রকারের প্রহার বর্ষণ করতে লাগল। তিষ্য হাসিমুখে প্রহারগুলি সহ্য করতে লাগল।

একটু পরে থেমে গিয়ে মল্লি বলল— এই নাকি তুমি বীরপুরুষ ! এই নাকি তুমি মল্লবিদ্যা জানো·। কিচ্ছু জানো না।

— কী করে বুঝলে ?

— আমরা এতো প্রহার করলাম কিছু করতে পারলে ?

— নাঃ। অতি বীর যোদ্ধা যোদ্ধ্রীদের কাছে তিষ্য আগে থেকেই পরাজয় স্বীকার করে নেয়।

তখন দুজনেই রণে নিরুসাহ হয়ে পড়ল। তবে তাদের সঙ্গে নিয়ে তিষ্যকে প্রাসাদচূড়ায় উঠতেই হল।

— পাঞ্চাল, —বজ্জি বলল —তুমি নাকি বেসালি যাবে ?

— যাবো।

— আমাকে নিয়ে যাবে ?

— কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— আমি মাতুলগেহে যাবো। কপিলবথু। মল্লি যখন মাতুলগেহে যায়, ওর অজ্জা-মা, অজ্জ-পিতা, মাতুল সব কত আদর করেন। আমি কপিলবথু যাবো....

— সে যে অনেক দূর বজ্জি!

বেসালি তো আরও দূর। তুমি যাবার পথে কপিলবথুর তোরণে দাঁড়িয়ে বলবে— অজ্জ মহানামা, অজ্জ মহানামা— আপনার দৌহিত্রী এসেছে দেখে যান। তখন সাক্করা সবাই গিয়ে সংবাদ দেবে অজ্জপিতা ছুটতে ছুটতে আসবেন। মল্লির মাতামহর মতো দুহাত বাড়িয়ে।

তিনি আমাকে কোলে নিলেই তুমি তাঁকে অভিবাদন করে বেসালি চলে যাবে।

মল্লি বলল— বা, তুই বুঝি পাঞ্চালকে একটা দিনের জন্যও কপিলবথুর মাতুলগেহে থাকতে বলবি না। তোর মাতামহ বুঝি বলবেন না! কপিলবথু থেকে বেসালি কত দূর জানিস' পাঞ্চালের দেহ ধূলিধূসর হয়ে যাবে, ঘোড়াগুলোর মুখ দিয়ে ফেনা উঠবে, তাদের বুঝি বিশ্রামের প্রয়োজন নেই? শুধু নিজের কথাই ভাবছিস?

ছোট্ট বজ্জি লজ্জা পেয়ে বলল— না তা বলিনি। মাতামহ তো পাঞ্চালকে আতিথ্য নিতে বলবেনই। কত শঙ্খ বাজবে। মাতুলানীরা সব আসবেন, কিন্তু তখন কি আর পাঞ্চালের দাঁড়াবার সময় আছে? তাই ভাবছি।

মল্লি বলল— ওই দ্যাখ, দ্যাখ— বীরিয় যাচ্ছে। পাঞ্চাল, বীরিয়কে ডাকো না।

তিষ্য দেখল কিশোর রাজকুমার বীরিয় অচিরবতীর তীরে দাঁড়িয়ে আরও দুতিন জন কিশোরের সঙ্গে কথা বলছে। এদের মধ্যে মহামাত্র উগ্রর পৌত্র সুষেণকে সে চিনতে পারল। অন্যগুলি অচেনা। ভারি চমৎকার এই বীরিয় কুমারটি। শীল কাকে বলে একে দেখে শিখতে হয়। আকৃতিও শাক্যদের মতো। কাঞ্চনগৌর, সুমসৃণ ত্বক। অতি সামান্য গুম্ফরেখা দেখা দিয়েছে। মনে হয় বীরিয় শ্রমণ আনন্দর মতো সুন্দর পুরুষ হবে। তবে নিয়মিত ব্যায়ামে, অস্ত্র চালনায় তার দেহ ব্যায়ামপুষ্ট, গৌতম বুদ্ধর মতো সে সিংহকটি। পিতা পসেনদির সঙ্গে তার কোনও সাদৃশ্যই নেই। বীরিয় সবে তক্ষশিলা থেকে এসেছে। এখনও তিষ্যর সঙ্গে ভালো পরিচয় হয় নি। কিন্তু দূর থেকে বীরিয়কে দেখে শুনে তিষ্য আকৃষ্ট হয়েছে। মল্লি ইতিমধ্যে একটি শঙ্খ এনে বাজাতে আরম্ভ করেছে।

শঙ্খধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে বীরিয় এবং তার সঙ্গীরা মুখ তুলতেই দুই বালিকা ভগ্নী তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল। তিষ্য তৎক্ষণাৎ নিচে নেমে গেল, রাজকুমারকে তো শুধু আসতে বললেই হয় না। তাকে প্রত্যুদ্‌গমন করে নিয়ে আসতে হয়। বীরিয় তার সঙ্গীদের কী যেন বলে তিষ্যর গৃহের দিকে ফিরল, দেখল তিষ্য স্বয়ং দাঁড়িয়ে রয়েছে, পেছনে তার দ্বাররক্ষী।

— আপনি পাঞ্চাল তিষ্য, নয়? রাজকুমারের কণ্ঠস্বরটি ঈষৎ ভাঙা ভাঙা। চোখদুটি অনাবিল।

তিষ্য হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল।

— বানরীদুটি এখানে কী করছে?

পেছন থেকে কলকল ধ্বনি উঠল। তুমিও, তুমিও তাহলে বানর বীরিয়, তারা বীরিয়কে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিল, বীরিয়ও আস্ফালন করছিল। কিন্তু তিষ্য মধ্যস্থতা করে থামিয়ে দিল।

— একদিনে একজন বীরপুরুষকে পরাস্ত করাই যথেষ্ট বজ্জি।

বজ্জি বলল— তোমার ওইসব চতুর সুহৃৎদের সঙ্গে কী এতো কথা বলছিলে বীরিয়?

তিষ্য বলল কুমারকে ভেতরে আসতে দাও আগে।

আসনশালায় বসে বীরিয় বলল— পাঞ্চাল, আমি মনস্থ করেছি কপিলবস্তু যাবো। পিতা শীঘ্রই আমাকে নানারূপ দায়িত্ব দেবেন। শস্ত্রশিক্ষাও পূর্ণ হয়নি। তার আগে কপিলবস্তু ঘুরে আসব। আর্য বন্ধুল বলছিলেন অসিচালনায় আপনার কাছে শিক্ষা নিতে। আপনি আজকাল নিয়মিত মল্লভূমিতে যান না?

— কিছুদিন ব্যস্ত আছি। আমাকে বিশেষ কাজে বৈশালী যেতে হবে কুমার। তারই আয়োজনে একটু ব্যস্ত আছি।

— বৈশালী যাবেন? তাহলে তো যাত্রাপথ একই। হে পাঞ্চাল, আমরা দুজনে একত্রেই যাত্রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারি। আপনি আরও পূর্বে এগিয়ে যাবেন, আমি শাক্য ভূমিতে প্রবেশ করবো।

বজ্জিরা উৎসাহে লাফাতে লাফাতে বলল— আমি যাবো, আমি যাবো বীরিয়।

— দাঁড়াও আগে থেকেই লাফালাফি করো না। পিতা মাতা এঁরা কী বলেন, পুরোহিতরা কী বলেন দেখতে হবে না! কিন্তু পাঞ্চাল আমি কয়েকদিন আপনার সঙ্গে অসিক্রীড়া করব অনুমতি দিন। আর্য দীঘকারায়ণের সঙ্গে মুষল যুদ্ধ আছে আমার কাল, দেখবেন না কি?

— নিশ্চয়। কিন্তু কুমার, মাতুলালয়ে যাবার সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক কী?

বীরিয় ঈষৎ লজ্জিত, ঈষৎ গর্বিত মুখে বলল— শাক্যরা বীরপুরুষ। শুনেছি গৌতম তথাগতকেও কয়েকবার শস্ত্রপরীক্ষা দিতে হয়েছে। ভাগিনেয়র জন্যও যদি শাক্যরা অনুরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহলে তাঁদের এবং কোশলের গৌরব রক্ষা করতে হবে তো।

অতএব কয়েকমাস ধরে পাঞ্চালের কাছে কুমারের শিক্ষা ও অনুশীলন পর্ব চলে। তার পর পাঞ্চাল তিষ্য বৈশালী যায়। যায় কোশলকুমার বিরূঢ়কের সুনির্বাচিত, সুসজ্জিত সেনাদলের সঙ্গে। সে নিজে একাই যাচ্ছে। সমরসাজ নেই। মর্যাদাসাজ নেই। একমাত্র সঙ্গী বর্মের সঙ্গে লগ্ন মহারাজ বিম্বিসারের রাজনিদর্শন, মহারাজ পসেনদির রাজনিদর্শন, এবং মহারাজার কাছেও পত্র। সাকেতকুমার তিষ্য যেমন, মহানামা শাক্যও তেমন কোশলের প্রজা, কিন্তু কোশলপতি শাক্যদের রাজমর্যাদাই দ্যান। এইসব প্রায়-স্বাধীন জনপদাধিপতির নিষ্ঠ সমর্থন না থাকলে মহারাজ বিম্বিসারের স্বপ্ন সফল হবে কী? দৈবাত চণকের মতো তিষ্যও বিশ্বাস করে মুষ্টিমেয় রাজার প্রচেষ্টায় জম্বুদ্বীপে কোনও সংঘশক্তির উত্থান হতে পারে না। তাই পাঞ্চাল তিষ্য কপিলবস্তু যাচ্ছে।

শাক্যভূমিতে পা রেখে ঘোড়াগুলির পিপাসা পায়। অশ্বারোহীদের বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করে। বীরিয় এসে বলে— পাঞ্চাল, আমি কোন ধূসর হয়ে গেছি দেখুন! কী ধূলি। আচ্ছা, এখনই কি বেশ পরিবর্তন করে নেবো? আচ্ছা পাঞ্চাল, শাক্য কন্যারাও তো শুনেছি অতি সুন্দরী।

তিষ্য হেসে বলে— আমি দেবী যশোধরাকে দেখি নি। তবে বীরিয়, শ্রমণ আনন্দ, থের নন্দ এঁদের দেখলে মনে হয় বটে এঁদের কুলের কন্যারাও অনুরূপ। গৌতম বুদ্ধর কথা না হয় মহাপুরুষ বলে ছেড়েই দিলাম। তা তুমি কি শাক্যকন্যা লাভের গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই কপিলবস্তু যাচ্ছো?

বীরিয় লজ্জা পেয়ে যায়, বলে, কী যে বলেন পাঞ্চাল! মাতুলগৃহে যাচ্ছি, অপরিচিত নারীকুল। তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তো! তা ছাড়া আমি তো ভাগিনেয় আমার কি শাক্যকন্যা লাভের উপায় আছে?

তিষ্য বলল— নেই কেন? গৌতম নিজেই তো বিবাহ করেছিলেন তাঁর মাতুল কন্যাকে। অন্তর্বিবাহ তো শাক্য লিচ্ছবি এঁদের মধ্যে যথেষ্ট চলে। তা ছাড়া শাক্যকন্যারা সকলেই নিশ্চয় তোমার মাতুলকন্যা নয়।

— তাহলে মা কেন আসার সময়ে আমাকে বারবার সতর্ক করে দিলেন? বীরিয় অন্যমনা হয়ে বলে।

— কী বলেছেন দেবী? —তিষ্য সন্তর্পণে অধিক কৌতূহল প্রকাশ না করে বলে।

— মা তো আমাকে আসতে দিতেই চাইছিলেন না বজ্জিকে তো একেবারেই অনুমতি দিলেন না ভগবান তথাগতর আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলাম, মা বললেন ভন্তে বীরিয়কে একটু বলুন তো ও যেন আবার ওর পিতার মতো শাক্যকন্যা বিবাহ করবার জন্য পীড়াপীড়ি না করে। ভগবান স্মিতমুখে নীরবে ছিলেন। মা আবার বললেন

— তুমি রাজকুমার, ভবিষ্যতে শাক্যদেরও অধিপতি হবে, শাক্যকন্যাদের দিকে দৃষ্টি দিলে, ভবিষ্যৎ- রাজার সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ভালো হবে না বীরিয়। মা এমন করে বললেন আমি যেন একটি নারী লোলুপ মর্কট।!

বীরিয়র মুখ অভিমানে থমথম করছে।

কপিলবস্তুর প্রান্তীয় গ্রামটিতে যখন শিবির সংস্থাপন করা হল তখন আকাশে সূর্যের অস্তশ্রী। যোজনের পর যোজন চোখের সামনে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। ধান্যের ক্ষেতগুলি শস্যভারে নুয়ে পড়েছে। শ্যামবর্ণ শিষগুলিতে কাঁচা সোনার বর্ণ লাগতে আরম্ভ করেছে। একদল চিত্রল হরিণকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ষকরা তাড়া দিয়ে ক্ষে ত থেকে বার করছে। হরিণগুলি বাছুরের ভঙ্গিতে ক্ষেতের আলগুলি ডিঙিয়ে উঁচু ভূমিতে উঠল, তারপর তীব্র বেগে ধুলো উড়িয়ে কোশলকুমারের শিবিরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পলায়নরত শেষ হরিণদুটিকে তীরবিদ্ধ করল বিরূঢ়কের সঙ্গী সেনারা।

কর্ষকগুলি শিবির, লোকজন দেখে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসছে।

— সার্থ না কি ?

— না, সাবথির কুমার যান।

— কোথায় যান ভাই ? যুদ্ধযাত্রা মনে হয় ! দস্যু দমন না কী ?

— না হে। কুমার মাতুলগেহে যান। কপিলবস্তুতে। কেন এদিকে দস্যুর উপদ্রব হচ্ছে না কি ?

— আপাতত দস্যু এই হরিণের দল। ক্ষেত্রের মধ্যে মঞ্চ বেঁধে সারা রাত পাহারা দিই তাতেও কখন যে দল বেঁধে ঢুকে পড়ে চোরের দল ! মার মার... লাঠি হাতে গ্রামজনেরা আবার তাড়া করে যায়। একটি হরিণ কোথায় লুকিয়ে ছিল, মুখ ভর্তি ধানের শিষ— পালিয়ে যাচ্ছে নিঃ সাড়ে।

কুমারের সঙ্গী সেনাদের শিবির সংস্থাপন হয়ে গেছে। তিনটি শিবির মোট।

একটিতে দুই কুমার থাকবেন। আর দুটিতে সঙ্গীসাথীরা সব। পাক-সাক হবে খোলা আকাশের তলায়। পাথরের টুকরো সন্ধান করছে কেউ কেউ উনান হবে। হরিণ দুটিকে পরিষ্কার করছে কয়েকজনে। ঝলসানো হবে। অগ্নিকুণ্ডর জন্য কাঠ সংগ্রহ হচ্ছে।

— শাক্যদের ভাগিনেয় কোনটি ভাই ?

— ওই যে কৃষ্ণায়সের বর্ম পরা, কটিতে হাত রেখে শিবিরের দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ?

— ও যে কাকপক্ষধর কিশোর গো। দুধের দাগ মুখ থেকে মোছে নি।

— যেমন তেমন নাকি ? তক্ষশিলা থেকে ফিরেছেন। পেটে বিদ্যে গজগজ করছে। লক্ষ্যভেদে নিপুণ একেবারে।

— আমরা ভেবেছিলাম ওই দীর্ঘ আকৃতির মানুষটিই রাজকুমার। তো উনি কে ?

— উনিও রাজার কুমার তবে সামথির নয় সাকেতের। পাঞ্চাল তিষ্য। তোমাদের এখানে যদি কোনও কিছুর উপদ্রব থাকে তো ওঁকে ওঁদের বলতে পারো। ঈষৎ গর্বভরে বলল সৈনিক।

লোকগুলি পরস্পরের সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বলল— বলব ?

— বলো না ! উনি অতি সদাশয় লোক।

— কিন্তু কেমন গম্ভীর। সম্ভ্রম হয়। যদি রাগ করেন !

— বলেই দেখো না।

— সৈনিক গ্রামজনেদের নিয়ে যায়। তিষ্য তখন দূরবিসর্পী ধান্যে ধান্যে টই টম্বুর শ্যামল ক্ষেত্রের ধারে দাঁড়িয়ে অস্তশ্রী দেখছিল।

— হে মহামান্য পাঞ্চাল —

— কে ? ও চিত্র ? কী ব্যাপার ?

— এই গ্রামজনেদের আপনার কাছে কিছু নিবেদন আছে।

— নিবেদন ? বলো, তিষ্য তার দিবাস্বপ্ন ভেঙে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে।

— আমাদের এখন ধান পাকবার সময়। বন্য পশুরা বড়ই ক্ষতি করে ক্ষেতেরর। হরিণ গুলিকে আমরা তাড়াই সারা রাত পাহারা দিয়ে। কিন্তু কিছু বরাহ আছে। দাঁতাল— হাতি আছে। এদের বড় ভয় করি।

— হাতির দল নেমেছে নাকি ?

— না, এখনও নামে নি । অতি চতুর। ধান আরও পাকলে নামবে।

— আর বরাহ ?

— বরা দুটো প্রত্যহই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, রক্তচক্ষু একখানি দাঁত, কিছু করতে পারি না কুমার।

তিষ্য এখন ধানক্ষেত এবং সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের তলায় ভূমি সামান্য উন্নত। তার বক্ষে চর্মের বর্ম। পায়ে উৎকৃষ্ট অজচর্মের উপানত। কটি থেকে লম্বমান কোষবদ্ধ তরোয়াল। সামনে নগ্নগাত্র লোকগুলি। মুখভাবে অনাবিল সরলতা ও সম্ভ্রম। সেইসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্তি।

তার মনের মধ্যে বিচিত্র একটি ভাব হল। যেন সে-ই রাজার কুমার। উপরাজ আপাততঃ। রাজ্য-পরিদর্শনে বেরিয়েছে। প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনছে।

চিত্র নামে এই সৈনিক জানে—কুমার বিরূঢ়ক, সে নয়। তাদের নেতৃত্ব কোশলকুমারের, পাঞ্চাল তিষ্যর নয়। কিন্তু প্রথম প্রয়োজনেই তারা তিষ্যর কাছে এসেছে। লোকগুলির চোখে স্পষ্ট প্রশংসার দৃষ্টি। তার মনে হল কে ওই কোশলকুমার ? কেনই বা ও কোশলের মতো বৃহৎ রাজ্যের রাজা হতে চলেছে ? ওর প্রজারা তো ওর মধ্যে তাদের স্বাভাবিক আশ্রয় দেখতে পায় না ? তাহলে ? উত্তরাধিকার ? একটি চতুর নির্বোধ, অসংযমী কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজার উত্তরাধিকার ? যদি কোশলরাজের স্থানে থাকত সে, তিষ্যকুমার, যাকে আজকাল সবাই পাঞ্চাল তিষ্য বলছে, তাহলে কোশল হত না কি একটি জাগ্রত রাজ্য ? পসেনদিকে বাহুবলে সিংহাসনচ্যুত করা তার পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, যদি বন্ধুল ও দীঘকারায়ণ বাধ্য না দ্যান।

এ কী ভাবছে সে ? শরীরটি আপাদমস্তক ঝাঁকিয়ে এই ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করল তিষ্য। মুখের দু পাশে হাত রেখে সিংহনাদ করল। চমকে উঠল সবাই। তিষ্যর বুকের মধ্যে সন্তোষ, তৃপ্তি। চমকে ফিরে তাকাল বীরিয়। দ্রুত আসতে লাগল এদিকে। দেখল ক্ষুদ্র জনসমাবেশ।

— কী হয়েছে পাঞ্চাল ?

এই কিশোরটি কেন কে জানে মাতুলালয়ের স্বপ্নে বিভোর। বংশ, কুল। এই কুল বস্তুটাকে এরা বড়ই গুরুত্ব দেয়। কী ভাবে একটি কুল প্রস্তুত হয়। যে ভাবে অন্য কুল গুলি হয়েছে সে ভাবেই তো ? এক কুলের মানুষরা কিছু গৌরবের কাজ করলে তখন কুলের খ্যাতি হয়। এইটুকু সে বুঝতে পারে। শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ মৌলিক মত প্রচার করে কুলগৌরব বৃদ্ধি করেছেন। সত্য। কিন্তু আর কী আছে এই কুলের, যার জন্য এদের এতো দম্ভ এবং অন্যদের এমন সম্ভ্রম ? সিদ্ধার্থর আগেই বা কে কী করেছিল ? বীরিয়র মতো একটি তক্ষশিলক কেন নতুন চিন্তা করতে পারে না ?

— কী হয়েছে পাঞ্চাল ?

তিষ্য সামনের লোকগুলিকে দেখিয়ে বলল— এদের ক্ষেত্ররক্ষা করতে বরাহ মারতে হবে।

— আপনি যে ভাবে সিংহনাদ করলেন, তাতে বরাহরা আজ আর এদিকে ঘেঁষবে বলে মনে হয় না— বীরিয় হাসতে হাসতে বলল।

— হ্যাঁ বরাহগুলির আসবার সময় হলে যদি আ রও দু একটি নাদ করি, কয়েকদিনের মতো নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে। কিন্তু তারপর ?

— তারপর ওরা আবার আসবে —লোকগুলি বলল।

— অতএব বীরিয় তোমার ধনু নাও— পাঞ্চাল তিষ্য দ্রুত পদক্ষেপে শিবিরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটু পরে পিঠে তূণ, হাতে বিশাল ধনু নিয়ে বার হয়ে এলেন।

সৈনিকরা পিছু পিছু আসছিল। তাদের নিষেধ করলেন পাঞ্চাল তিষ্য। হরধনু হাতে রামের মতো প্রবেশ করলেন মহাবনে। পেছনে লক্ষ্মণের মতো কুমার বিরূঢ়ক।

— সেই আশ্চর্য রাতটির কথা জীবনে কখনও ভুলবেন না তিষ্যকুমার। যেমন সুন্দর, পরিষ্কার, তেমনই উজ্জ্বল, নীলাভ সেই রাত। রক্তের মধ্যে কেমন একটা ঝিনিঝিনি উন্মাদনা। কেউ নেই নির্দেশ দেবার। দৈবরাত নেই, মহারাজ বিম্বিসার নেই, নেই বন্ধুল। সে-ই দলপতি। কোশলকুমার কিশোর বীরিয় তার আজ্ঞাবাহী। গভীর রাতে মহাবন থেকে বেরোবার মুখে যখন বিকট চিৎকার করে ভূপতিত হল দাঁতাল বরা, তার সঙ্গিনীকে আর একটি ছুটন্ত তীরে বধ করল তিষ্য তখনই দেখা গেল বনের গায়ে জমাট অন্ধকারের মতো সারে সারে দাঁড়িয়ে আছে হাতি। নড়ছে না শব্দ নেই, শুধু ধূম্র কুণ্ডলীর মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তারার আলোয় তাদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক, দুই, তিন চার, বারোটির থেকে অল্প নয় কখনোই। দীনবসন কর্ষকগুলি ভয়ে স্তম্ভিত। সেনাগুলির শরীর শক্ত হয়ে গেছে। নগর-সেনা সব, এমন বিপাকে আগে পড়েনি। বিরূঢ়ক বিভ্রান্ত। কী করবে বুঝতে পারছে না।

ভীষণ সিংহনাদ বেরিয়ে এলো পাঞ্চাল তিষ্যর কণ্ঠ থেকে। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে দূরে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরান্তরে ছড়িয়ে যেতে লাগল উপর্যুপরি সিংহনাদ। কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল হাতির দল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল ধূম্রকুণ্ডলী সরে গেছে, দেখা যাচ্ছে উন্নতশির বৃক্ষগুলির শীর্ষ। স্তব্ধ রাত সহসা বানরের চিৎকারে ভরে গেল। চিচ্চিট সব থেমে গেছে। খালি জোনাকিগুলি জ্বলছে, নিবছে।

তিষ্য দেখল সে শূন্যে। তার দেহ সাপের মতো জড়িয়ে ধরেছে কিছু। পেছন থেকে একটি হাতি এসে তাকে শুঁড়ে তুলে নিয়েছে। মাথার ওপর জাজ্জ্বল্যমান জ্যোতিষ্কগুলি ছাড়া তিষ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। এক নিমেষের জন্য সে কিংকর্তব্য ভুলে গিয়েছিল। তারপর অতি দ্রুত তার মনে হল দুটি উপায় আছে, হাত দুটি মুক্ত। কিন্তু কটি পেঁচিয়ে ধরেছে হস্তিকুম্ভ। মুক্ত হাত দিয়ে সে তূণ থেকে লৌহমুখ তীর বার করে বিঁধিয়ে দিতে পারে এই হাতির মাথায় চোখে, তাতেও বাঁচবে কি না সন্দেহ। আর একটি উপায়.... ? সে কোনক্রমে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে কুম্ভের একটি বিশেষ স্থানে নিবিড় চাপ দিল। কাজ হয়েছে, শ্বলিত হয়ে যাচ্ছে কুম্ভ ? তিষ্যর মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে আসছে এক শিসের মতো সুর, অবিকল যা শ্রাবস্তীর পথে দেবী সুমনা ও তাঁর কন্যা বিশাখার মুখে শোনা গিয়েছিল। তীব্র মাদক সম্মোহনে কপিলবস্তুর প্রান্তিক অরণ্যানী জানু মুড়ে বসে পড়ছে। হতচকিত সৈন্যদল। কুম্ভ বেয়ে ধীরে ধীরে বিশাল হাতিটির পিঠে উঠে পড়ল তিষ্য। সে শুয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। ঘুরে ফিরে শিসের শব্দ হাতিটির কানে আসছে। হাতিটি প্রায় শক্তিহীন। সৈনিকেরা দু পাশ থেকে ছুটে এলো, দলের অন্য হাতিদের চালিয়ে নিয়ে আসবে। বন্য হাতিটির পায়ের চার পাশে খোঁটা পোতা , পায়ে লৌহ শৃঙ্খল পরানো, সবই যখন সম্পন্ন হল, তখন শেষ রাত। মহা সমারোহে ঝলসানো হচ্ছে বরা দুটি। গ্রামজনেরা কদলী গাছ সতূপীকৃত করে রেখেছে হাতিটির সামনে। কদলীর মধ্যে মেশানো আছে তীব্র নিদ্রাকর্ষক ভৈষজ।

শেষ রাতে নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে সেই ঝলসানো মৃগমাংস, শূকর মাংসের ভোজ, সেনাদের সঙ্গে, শাক্য কর্ষকদের সঙ্গে, কিশোর বীরিয়কে পাশে নিয়ে, অতগুলি কণ্ঠে সম্মিলিত জয়ধ্বনি, পাঞ্চাল তিষ্যকে লক্ষ্য করে, তীক্ষ্ণ সুরা ভাগ করে নেওয়া। তারপর পান ভোজনে তৃপ্ত সেই গ্রামবাসী সেই সৈনিকদের ঈষৎ উন্মত্ত ঘোষণা। আপনিই রাজা। আমাদের রাজা। যাঁকে দেখিনি, তিনি না, তিনি আমাদের দুঃখের নিরসন করতে এগিয়ে আসেন না। তেমন রাজা নিয়ে কী কাজ। হে পাঞ্চাল তিষ্য আমরা সাক্ক জানি না, মল্ল জানি না কোসল জানি না। আমরা আপনাকে জানি.....আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

একদিকে গভীর অরণ্য আর একদিকে বিশাল শস্যক্ষেত্র। অসংখ্য জ্যোতিষ্কের আলোয় স্নান করতে করতে এই প্রকারই হল পাঞ্চাল তিষ্যর রাজ্যাভিষেক। হৃদয়ের ছিন্ন ভিন্ন সূত্রগুলি জুড়ে যেতে থাকে। ভেতরে একটা গরিমাবোধ। বিপুল হর্ষ। যাদের প্রকৃত অধিকার সেই সামান্যজন তাঁকে রাজা নির্বাচন করেছে। তিনি যেন ফিরে গেছেন বহু শতক আগে যখন মহারাজ মহাসম্মত নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজতন্ত্রের সেই আরম্ভ। শুধু প্রভুত্বের জন্য রাজা নয়। বিলাস, আত্মসুখ চরিতার্থ করার নাম রাজত্ব করা নয়। বহুজনকে নেতৃত্ব দিয়ে ভয়মুক্ত করে তাদের আনুগত্য শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিজের কৃতি নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে আকর্ষণ করে তবেই রাজপদবী পেতে হয়। এবং সেই শ্রদ্ধা আনুগত্য ভালোবাসা রক্ষা করে যেতে হয় সদা জাগ্রত থেকে। কুল দিয়ে কী হবে ? কুল বংশমর্যাদা এসব কুসংস্কার। আর ব্যক্তিমায়া ? পাঞ্চালের কি ব্যক্তিমায়া অর্জন হয়েছে ? এতদিনে ? তাঁর মধ্যে কতকগুলি দৃঢ় সংকল্প জন্ম নিচ্ছে। এই মুহূর্তে।

বন্য হাতিটিকে পুরোপুরি বশ করতে ছয় সাত দিন লেগে গেল। তার পিঠে রুপোর সাজ। সামনের দুই পায়ে লৌহ শৃঙ্খল। কুম্ভে চন্দনের পত্রলেখা। পাশে দলের সবচেয়ে সুন্দরী হস্তিনী। তাকে দেখাচ্ছে হাতি নয় যেন রাজা। রাজার চরণেও তো শৃঙ্খল থাকে, থাকে না ?

প্রত্যূষ। শিবির তোলা হচ্ছে। চার দিকে সাজসাজ রব। কুমার বিরূঢ়কে নীলবর্ণ বসন পরেছে, উত্তরীয় টিতে গোরোচনা দিয়ে বলাক মালা আঁকা। কেশগুলি সযত্ন চর্চিত হয়ে কাঁধের ওপর পড়েছে। কানে কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ, কণ্ঠে মুক্তামালা। বুক চিতিয়ে সে সৈন্যদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ রাজ কুমার বটে। রাজার কুণ্ডার। তিষ্যকে এগোতে দেখে গ্রীবা সামান্য বাঁকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরূঢ়ক বলল—পাঞ্চাল, মনে হচ্ছে এখানে যেমন, সাকেনগরীতেও তেমনই আপনিই হবেন মুখ্য। কুমার বিরূঢ়কের মুখে কেমন এক প্রকার অপ্রতিভ হাসি।

তিষ্য মৃদু হেসে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে বলল— তা কী করে হবে বীরিয়। তুমিই হলে তাঁদের ভাগিনেয়। তা ছাড়া আমি তো কপিলবস্তু যাচ্ছি না!

— সে কী! আপনি যে বললেন রাজকার্য....

— এখানে হাতিটির জন্য কত বিলম্ব হয়ে গেল বীরিয়, বৈশালীতে সেনাপতি সীহ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি ওই নতুন হস্তী নীলাগ্রের পিঠে চড়ে যখন কপিলবস্তু প্রবেশ করবে, সিদ্ধার্থ গৌতমের চেয়েও অধিক অভ্যর্থনা পাবে। দেখো!

নীলাগ্রকে আপনি জীবন বিপন্ন করে জয় করেছেন। হে পাঞ্চাল নীলাগ্র আপনার।

— যদি আমার হয়ে তবে ওই হস্তিরাজকে আমি আমার প্রথম উপঢৌকন দিচ্ছি কোশলের ভবিষ্যৎ রাজা কুমার বিরূঢ়ক কে।

সেনারা জয়কার দিয়ে উঠল। চোখে বিস্মিত সম্ভ্রমের দৃষ্টি অদূরে কর্ষকগুলি তাদের সামান্য কটিবাস পরে এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে হতাশা, সামান্য তিক্ততাও বুঝি! তিষ্যকুমার। তিষ্যকুমার আপনি নীলাগ্রকে নিন। এই অরণ্য নিন। নিন এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রগুলির ভার। আমরা আপনাকে কর দেবো।

তারা মুখে না বললেও মনে মনে এই কথাগুলি বলছে, কী এক সহজ বুদ্ধিতে সমস্ত বুঝতে পারছিলেন পাঞ্চাল। হয়তো পারছিল কোশলকুমার বিরূঢ়কও।

১৫

অশান্ত বালকের মতো দুর্ধর্ষ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে গান্ধার ভবনে প্রবেশ করলেন চণক। অশ্বরক্ষক এসে দাঁড়াতেই রূঢ় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার হাতে সমর্পণ করলেন চিত্তককে। চিত্তক ভূমিতে পা ঠুকে হ্রেষা করছে, প্রভুর এই ব্যবহার তার মনোমত নয়। চণক ভ্রূক্ষেপ করলেন না। দাসদাসীরা ছুটে এলো, কোনক্রমে হাতমুখ ধুয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

এ কোন সোমাকে তিনি দেখে এলেন? অবাধ্য দুর্বিনীত। নাগরিক বাকচাতুর্যের আড়ালে হারিয়ে গেছে দেবরাতপুত্রী জিতসোমা, তাঁর প্রিয় শিষ্যা, প্রিয়তমা ভগ্নী। শুধু বাকচাতুর্য নয়, ব্যবহারচাতুর্যও বটে। অবাধ্যই কী? না দুর্বোধ্য? ঠিক দুর্বিনীত বলা যায় না, প্রকৃতপক্ষে কেমন অনমনীয়, তার ওপর আর কোনও প্রভাবই নেই যেন চণকের। তিনি কণ্ঠের মধ্যে একটা রুদ্ধ আক্ষেপের শব্দ করতে লাগলেন, যা খানিকটা তর্জন খানিকটা কান্নার মতো শোনালো। যে কাত্যায়ন চণক সমগ্র মগধরাজ্য, অঙ্গরাজ্য ঘুরে ঘুরে জম্বুদ্বীপের রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে এলেন, যিনি প্রত্যন্ত মগধ, সীমান্ত অঙ্গের সামান্য জনের না-বলা আশাহতাশার কাহিনী অত সহজে বুঝে ফেললেন, যিনি বিম্বিসার থেকে আরম্ভ করে মেণ্ডক-ধনঞ্জয় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার প্রভাবী পুরুষকে তাঁর নীতির সম্পর্কে প্রত্যয়ী করতে পারলেন, সামান্য একটি নারীর মুক্তি তিনি কিছুতেই ঘটাতে পারলেন না। হায়, কেন তিনি সোমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন? যে কর্মভার নিয়েছেন, যা যা সম্পন্ন করছেন সবার পেছনে আছে অনিবার্যভাবে সোমার প্রেরণা। সে কাছে থাকলে, আরও কত পারতেন! সবচেয়ে বড় কথা সোমার সামনে জীবনের রুদ্ধ দ্বার খুলে যেত, উন্মুক্ত বিরাট কর্মময় জীবন যার মধ্যে নিজের জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারে সে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। সেই সাধ তার উত্তরাধিকার, পেয়েছে পিতার কাছ থেকে, পেয়েছে মাতার কাছ থেকে, চণক স্বয়ং সে সাধকে দিনে দিনে পুষ্ট করেছেন। চণকের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ 'রাজশাস্ত্র' ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ সোমার জীবন। সোমার হৃদয়। সোমার ভবিষ্যৎ।

অথচ সে শান্ত মুখে প্রদীপের সলতে উসকে দিতে দিতে বলল— ভবিতব্য জেট্‌ঠ। গণিকার ভবিতব্য নিয়ে জন্মেছি। মাঝে বিদুষী-বিদুষী, পুরুষী-পুরুষী খেলা খেলেছিলাম। আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার হাত দিয়েই বিধাতা সোমাকে তার গণিকা ভবিতব্যে ফিরিয়ে দিলেন। আপনি

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো উপলক্ষ্য ! ...আর তা ছাড়া... সোমা সহসা মুখ তুলে তাকাল। তার চোখের মণিতে প্রদীপের প্রতিবিম্ব,— নৃত্য-গীত আমার রক্তে জ্যেষ্ঠ ! আমি প্রতিনিয়ত নূতন সৃষ্টি করছি। কেউ তার প্রকৃত অর্থ বুঝুক না বুঝুক, এই নৃত্যগীতের ভক্তজন রাজগৃহে বহু। যদি মনোমত শিষ্য-শিষ্যা পাই নূতন ধারার প্রবর্তন করে যাব। একটু থামল সোমা, তারপর ধীরে ধীরে বলল— আমার ভালো লাগছে।

—কী ভালো লাগছে, এই নগরশোভিনী-বৃত্তি ?

—নগরশোভিনী তো একটা বৃত্তি নয় জ্যেষ্ঠ ! মুগ্ধতার বেদীমূলে একটি সমাদরময় বিশেষণের অঞ্জলি !

—কার সমাদর সোমা ? সে সমাদরের পেছনে যে রিরংসার কদর্য ইঙ্গিত রয়েছে এ কথা নিশ্চয় দেবী দেবদত্তার কন্যাকে আজ নতুন করে মানে করাতে হবে না !

দেবী দেবদত্তার গরিমাময় ভঙ্গিতেই উঠে দাঁড়াল তাঁর কন্যা। বলল— নৃত্যগীত আমার জননীর উত্তরাধিকার। কে তার কী কদর্থ করে তা নিয়ে আর চিন্তা করি না দৈবরাত। আমার বিশ্রামের সময় হল। আপনিও ক্লান্ত। আজ এই পর্যন্ত।

সোনার কাজ করা কাসিক দুকূলের উত্তরীয়টি গা থেকে টেনে খুলে ফেললেন চণক যেন বৃশ্চিক তাঁকে দংশন করছে। খুলে ফেলেও দংশন জ্বালা গেল না। এই বসন এই উত্তরীয় জিতসোমার উপহার। নিশ্চয় তার নিজের উপার্জন। চণক কি গণিকাদের ঘৃণা করেন ? কই, না তো। শিশুকাল থেকে তাঁদের সমাজশরীরের একটি আবশ্যিক অঙ্গ বলে দেখে এসেছেন। প্রশ্ন ওঠেনি তখন। মনে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। সমাজোৎসবে দূর থেকে এই অপরূপাদের দেখে বিস্মিত, মুগ্ধ বালক এক ধারে দাঁড়িয়ে থাকত। বালক তখন জানত না এর পেছনে কত বলাৎকার, প্রবঞ্চনা, অভিসন্ধির ক্লেদ আছে। বড় হয়ে নগরশোভিনীদের ইতিবৃত্ত শুনলেন ধীরে ধীরে, এঁরা যে অলৌকিক স্বর্গের অনন্তযৌবনা চিরসুখী জন নন, জানলেন, ভালো করে কাছে থেকে দেখলেন দেবী দেবদত্তাকে, তারপর থেকে এঁদের জন্য একটা গভীর বেদনাবোধ, সম্ভ্রমমিশ্রিত ব্যথা তাঁর হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। অন্যান্য নানা বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে চালাতে তিনি একটি অবধান দিয়ে এঁদের সমস্যার সমাধানের কথাও চিন্তা করেন। কখনও ঘৃণা করেননি, না হলে শ্রীমতীর কাছে জীবনের অর্থ খুঁজতে যেতেন না। কিন্তু আজ জিতসোমার বৃত্তি, জিতসোমার উপার্জন তাঁর গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে কেন ? ভগ্নী বলে ? না... ! চণক দু হাত দিয়ে মাথাটি ধরে নতমুখে বসে রইলেন বহুক্ষণ।

তাঁর চোখ দুটি ঘরের চারধারে ভ্রমণ করতে লাগল ধীরে ধীরে, চোখের পেছনে দৃষ্টি নেই, মন নেই তাই দেখতে পাচ্ছেন না। অনেকক্ষণ পরে দীপশিখাটি কেঁপে উঠল। চণক দীপের আলো অনুসরণ করে দেখলেন একটি অপরূপ গজদন্তের পীঠিকা। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। শিল্পদ্রব্যটি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করল। কাছে গিয়ে দেখলেন, পীঠিকার ওপর একটি মণিময় থালী, তার ওপর অলংকার—দুষ্প্রাপ্য কালো মুক্তার কণ্ঠী, হীরকখচিত রত্নবলয়, নীলকান্তমণির কর্ণভূষা। সন্দেহ নেই এ সমস্তই জিতসোমার। এবং উপহার। কারো উপহার। সোমা এসব ফেলে গেছে। তিনি আরও দেখলেন সুবর্ণ মুকুর, স্ফটিকের পানপাত্র, রজতের দীপদণ্ড। কারও বা অনেকের উপহার সোমা ফেলে গেছে। কক্ষময় মৃদু, অতিমৃদু নারীগন্ধ পেলেন, নারীসঙ্গবিবর্জিত পুরুষরা যেমন পায়। সেই সৌরভ কক্ষের অপ্রশস্ত শয্যার আচ্ছাদনে, উপাধানে, নাগদন্তে লম্বমান তাঁর বসনগুলিতে। সোমা কি 'পুষ্পলাবী' থেকে 'গান্ধার ভবন' নিয়মিত আসা-যাওয়া করে ? তিনি শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং ধীরে ধীরে নির্ভুল বুঝতে পারলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে সোমা তাঁর কক্ষটি ব্যবহার করত, সম্ভবত এখানেই থাকত। বাতাসে কান পাতলে তিনি যেন শুনতে পাচ্ছেন তার মৃদু কণ্ঠ, সে আপনমনে শ্লোক আবৃত্তি করছে, গুনগুন করে গান গাইছে, দীর্ঘশ্বাস। দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস। এই কক্ষ যেন তার বাতাসে ধরে রেখেছে সোমার কথা, ভাবনা, চিন্তা। কিন্তু তিনি শুধু মৃদু ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, কথাগুলির মর্মোদ্ধার করতে পারছেন না। ভাবনাচিন্তাগুলি বিহঙ্গপক্ষের বাত্যাঘাতের মতো তাঁকে একটু একটু স্পর্শ করে যাচ্ছে মাত্র। তিনি ধরতে চাইলেই সেই স্পর্শভীরু বিহঙ্গগুলি পাখা মেলে উড়ে উড়ে যায়।

নিদ্রা আসতে লাগল। চণক অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগলেন : লোলা, সূতনা সেই একসালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের বালিকাগুলি, রাজপোতলি গ্রামের সেই মানুষগুলি, বনের মানুষ রগ্‌গা উদ্দক—এরা অনেক সুবোধ্য। এদের সঙ্গ যেন সদানীরায় স্নানের মতো। কিংবা বিশাল তৃণভূমির মধ্য দিয়ে চমৎকার মৃদুল বাতাসের স্পর্শ গায়ে নিয়ে হাঁটার মতো। শিক্ষা যেমন মানুষের চিত্তবৃত্তি পরিশীলিত করে তেমনি তাকে শেখায় সর্ববিষয়ে দ্বিচারণ, গোপনীয়তা। ক্রমশই যেন তিনি নাগরিক জটিলতার অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। স্বপ্নের মধ্যে লোলা তাঁকে কুল্মাষপিণ্ড নিয়ে সাধাসাধি করতে লাগল, উদ্দক হাসি মুখে দেখাতে লাগল সূচীমুখ কাঠের ফলা। তিষ্যকুমার রগ্‌গাকে নিয়ে একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পিঠে তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। চণক তাকে রাগত কণ্ঠে ডাকলেন— সোমাকে নিয়ে যাবার কথা, সে কেন রগ্‌গাকে নিয়ে যায়? 'বিম্বিসার'...সে বলে গেল 'বিম্বিসার, বিম্বিসার'...। এবং তারপরই তিনি দেখলেন সোমা লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে। কই, কাঁদছে না তো? সর্পিণীর মতো মাথা তুলল, তারপর অদ্ভুত দীপ্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জ্বলজ্বলদ্ ধমদ্ধমদ্ বষট্ বষট্— আকাশে বিদ্যুতের রেখার মতো ছুটোছুটি করতে লাগল জিতসোমা। এবং অবশেষে যখন বিদ্যুৎ বলে সূচীসমান তর্জনী যেন তরবারির ফলার মতো সামনে ছুঁড়ে দিল মনে হল সে এই পৃথিবীকেই বিঁধে ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে বুঝি। চণক নিদ্রার মধ্যেই অস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন এই তণ্ড-তাণ্ডব নৃত্য এক ধরনের বিদ্রোহ, বহুমুখী বিদ্রোহ। শিল্পীর বিদ্রোহ, গণিকার বিদ্রোহ, নারীর বিদ্রোহ। জমছে শক্তি, তেজ, আক্ষেপ, আক্রোশ, প্রাণন শক্তি, মনন শক্তি, পুঞ্জীভূত হচ্ছে, ব্যবহার হচ্ছে না, যেদিন ফেটে বোরোবে মত্ত, করাল জিঘাংসু নগ্নিকার বেশে, কর্মী পুরুষ, ভোগী পুরুষ, যোগী পুরুষ পাংশু মুখে শবের মতো ধরাশায়ী হবে।

নিদ্রা তবু এ যেন নিদ্রা নয়। চেতনার ওপর একটি লঘু আচ্ছন্নতার স্তর পড়েছিল। শরীর নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মন তার কাজ করে যাচ্ছে। মন, তার সঙ্গে হৃদয় যুক্ত হয়েছে, যে হৃদয় যুক্তিজাল ছাড়াই বোঝে। বোঝে সোজাসুজি। এ এক ধরনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, চিত্রের রূপ ধরে আসে।

চণক উঠে বসলেন। তাঁর ক্লান্তি দূর হয়নি। এবং স্বপ্নে যা দেখেছেন আধো অন্ধকার কক্ষে তা কতকগুলি ছিন্ন সূত্র কালো মুক্তার মতোই ছড়িয়ে আছে। তাঁর একটা তীব্র ইচ্ছা হল, ইচ্ছা এবং সংকল্প। তিনি যথাসম্ভব দ্রুত বেশবাস করে নিলেন। পেছনের দ্বার দিয়ে গিয়ে অশ্বরক্ষককে জাগালেন। সে চিত্তককে প্রস্তুত করে দিল। তিনি অশ্বরক্ষকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে দিয়ে কুলুপ খুলুপ শব্দ তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সমস্ত নগরীর গায়ে, পাহাড়ের গায়ে, আকাশের গায়ে রাত্রির অন্ধকার মাখামাখি হয়ে রয়েছে। তারাগুলি দপদপ করে জ্বলছে। কতকগুলি তারা যেন হুড়মুড় করে খসে গেল। উল্কাপাত! যেন একটি ছিন্ন হীরার মালার মতো উল্কাগুলি জম্বুদ্বীপের দিকে ছুটে আসছে। কোন প্রান্তর, কোন রাজ্য, কাকে ধ্বংস করবে ওরা? তিনি কোনও কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না, তবু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর দ্বিগুণিত সংকল্প নিয়ে সপ্তসৌণ্ডিকপভারের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

ভুল হয়েছিল। প্রমাদ। প্রকৃত কথা, রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁর যেমন কতকগুলি গবেষণা আছে। সমাজনীতি, সমাজে মানুষের বিন্যাস সম্পর্কেও তেমনি কতকগুলি ধারণা আছে। সেগুলি গড়ে উঠেছে বহু ভাবনাচিন্তার পর। গোষ্ঠীবদ্ধতা ব্যাপারটি তাঁর মনোমত নয়। পিতা এবং অন্যান্য ঋষিদের কাছ থেকে শুনেছেন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের একটি বদভ্যাস হল অন্তর্বিবাহ। ক্রমাগত এই অন্তর্বিবাহের ফল কখনও ভালো হয় না। তক্ষশিলায় ঋষি আত্রেয় পুনর্বসু এ নিয়ে বহু ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। একটি বিদথে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়, তাতে চণক যোগ দিয়েছিলেন। এক সময়ে সহোদর ভাইবোনেরও বিবাহ হয়েছে, কয়েকটি জন নিজেদের উৎপত্তির ইতিহাস এভাবেই নির্দেশ করে। লিচ্ছবিরা, শাক্যরা... এখনও এরা গোষ্ঠীবদ্ধ থাকতে ভালোবাসে। আর বনেচরদের তো কথাই নেই। সম্ভবত মাতা পিতা ছাড়া আর কোনও সম্পর্কই এদের মধ্যে নিষিদ্ধ নয়। জীবক বৈদ্যর সঙ্গেও তাঁর এ বিষয়ে কথা হয়েছে। জীবকেরও তাই ধারণা। তিনি এবং জীবক উভয়ে আলোচনাকালে বিস্ময় বিনিময় করতেন গৌতমের পরম্পরা নিয়ে। অন্তত তিন পুরুষে এঁরা মাতুলকন্যা বিবাহ করছেন। অথচ গৌতমের মতো প্রতিভা কী করে শাক্যকুলে সম্ভব হল? জীবক বলেন— এরপর থেকে দেখবেন গৌতমের বংশ ক্রমশই বিশেষত্বহীন, সাধারণ হতে আরম্ভ করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চণক হেসে বলেন— গৌতম তো নিজের বংশরক্ষা করতে তেমন উৎসুক নন। ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র যে যেখানে আছে সবাইকারই তো মাথা মুড়িয়ে হাতে ভিক্ষাপাত্র ধরিয়ে দিয়েছেন।

জীবক কিন্তু হাসলেন না। তাঁর মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত কথার উদয় হয়। তিনি বললেন— কে জানে নিজ বংশের সার্বিক অবক্ষয় দেখেই তথাগত এ কাজ করলেন কি না। সত্য সত্যই শাক্যবংশ প্রায় নির্মূল করে দিয়ে এসেছেন তথাগত। তাঁর এ কাজের কোনও ব্যাখ্যা পাই না আমি। অন্যত্র ভক্তদের তিনি ইচ্ছামতো উপাসক বা প্রব্রাজক হতে বলেন, অর্থাৎ নির্বাচনের একটা সুযোগ রাখেন। কিন্তু শাক্যদের উনি ছলে বলে কৌশলে প্রব্রজিত করলেন।

জীবকের বিচারবুদ্ধিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন চণক। বলেছিলেন— একটা কথা জীবকভদ্র। সঙ্ঘে বিদ্যা বুদ্ধি বিচক্ষণতা এসবের জন্য যাঁরা বিখ্যাত তাঁদের কেউই কিন্তু শাক্য নন। এটা লক্ষ্য করেছেন ? শ্রমণ আনন্দ তো গৌতমের ছায়া মাত্র। অন্যরা ধ্যানমার্গে হয়ত উন্নতিলাভ করেছেন আমি জানি না, কিন্তু জ্ঞানমার্গ বা বুদ্ধিমার্গে তাঁদের কোনও কৃতির কথা আজও শুনিনি। যতই বলা হোক নির্বাণই বুদ্ধমার্গের লক্ষ্য, আমরা জ্ঞান বুদ্ধি এগুলিকে তো মূল্য দেবোই!

জীবক বললেন— শুধু আমরা কেন ? স্বয়ং তথাগতই কি দেন না ? তাঁর অগ্রশ্রাবক কারা ? মহাপণ্ডিত সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান। অগ্রশ্রাবিকা কাঁরা ? দেবী খেমা যিনি রাজগৃহের প্রাসাদেও বিদ্যার জন্য খ্যাত ছিলেন। সম্প্রতি শ্রাবস্তীর উৎপলবর্ণা বলে যে ভিক্ষুণী আরেক অগ্রশ্রাবিকা হয়েছেন, তিনি প্রথামতো উপনয়নের পর পাঁচ বছর বারাণসীতে উপাধ্যায় গঙ্গাধরের কাছে ব্রহ্মচারিণী ছিলেন, পরে শ্রাবস্তীর একজন খ্যাতনাম্নী উপাধ্যায়া খুব সম্ভব জ্যোতির্লেখা নাম, এঁর কাছে ত্রিবেদ ও আনুষঙ্গিক সবই শিক্ষা করেছেন। অতি সুন্দরী বলে বিবাহ হতে এর বিলম্ব হচ্ছিল। সেই সুযোগে দেবী জ্যোতির্লেখা নাকি এঁকে পরমবিদুষী করে তোলেন। তা হলে দেখুন। পুত্র রাহুলের ভার তথাগত দিলেন সারিপুত্তকে। কই রাজকুমার নন্দও তো শ্রমণ হয়েছেন তাঁকে তো দিলেন না।

—আর রাহুল ? চণক জিজ্ঞাসা করলেন— রাহুল কি কোনও বিশেষ মানুষ হয়ে উঠছে ? না বিনয় পালনের ভারে অবলুপ্ত !

ভাবিত কণ্ঠে জীবক বলেছিলেন— আপনি বুদ্ধমার্গের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করেন না তাই না দৈবরাত ?

চণক সোজাসুজি এ কথার উত্তর দেননি। তিনি বলেন— সাধারণজনের পক্ষে এই মার্গ ভালো জীবকভদ্র। আশ্রয়, অশন-বসনের বাহুল্যও নেই, চিন্তাও নেই, সৎভাবে জীবন যাপনের কতকগুলি নীতি বেঁধে দেওয়া আছে, সেগুলি অনুসরণ করে চলতে পারলে মোটামুটি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে দিনগুলি কেটে যায়। কিন্তু জীবকভদ্র, আপনারও তো বুদ্ধমার্গের প্রতি তেমন নিষ্ঠা আছে বলে মনে হয় না, যদিও আপনি উপাসক।

—এ কথা বলছেন কেন ?

—আপনি যে সাধারণ রোগীর চিকিৎসা করতে চাইছেন না। বা অতি উচ্চ মূল্য চাইছেন চিকিৎসার, সেটা তো ঠিক বুদ্ধের করুণামার্গের উপযোগী হল না!

জীবক হাসতে লাগলেন, বললেন— দৈবরাত আপনার দৃষ্টি দেখছি সব দিকে। ব্যাপারটা কি বলুন তো ? জীবক তার পিতৃপরিচয় জানে না, মাতা কে তাও জানে না। রাজানুগ্রহ পেয়েছে রীতিমতো ক্ষমতা দেখিয়ে। প্রথম দিকে তো মহারাজ আমাকে যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন। যা-ই হোক অনেক কৌশল তিনিও করেছেন আমার মন জানতে, আমিও বহু কৌশল করেছি তাঁকে তা জানাতে। এখন এই রাজানুগ্রহ ব্যাপারটা পদ্মপত্রে জলবিন্দুসম। এই আছে এই নেই। যতদিন আছে ভাই করে নিই। আবার শুনতে পাই মহারাজ স্বয়ং আমার পিতা হতেও পারেন, সে ক্ষেত্রে মাথার ওপর একটি খাঁড়া সবসময়ে ঝুলছে বুঝতে পারেন তো ? তেমন বুঝলে ধনসম্পদ নিয়ে চম্পট দেবো। অত করুণা করলে জীবকের চলবে না।

চণক হাসলেন কিন্তু বললেন— চম্পট দেবেন ? চম্পট কেন ? মিথ্যা কারণে অত্যাচার হলে আপনি প্রতিবাদ করবেন না ?

জীবক বললেন— ভৈষজ বিদ্যাটি ভালো করে আয়ত্ত করেছি দৈবরাত। সামান্য বুদ্ধি সুদ্ধিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ঘটে, কিন্তু শস্ত্রচর্চা এমন করিনি যে কুমার কুনিয়র সঙ্গে যুঝে পারবো— তা ছাড়া দৈবরাত বৈদ্য শত হলেও একজন মানুষ, তার শারীরিক সাধ্যের একটা সীমা আছে। রাজবৈদ্য বলে রাজ-পরিবারের অমাত্যদের পরিবারের যে যেখানে আছে সবাইকার চিকিৎসা আমাকে করতে হয়। তথাগত এবং সঙ্ঘের চিকিৎসা ভারও আমার। তা হলে ? আর সময় কই ? বলুন ? এর অধিক করতে গেলে জীবকের নিজস্ব সময় বলে কিছু থাকবে না। তার কাজের উৎকর্ষও হয়ত এক প্রকার না থাকতে পারে.... ।

ভাবনায় ভাবনায় অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছেন চণক। অদূরে রাত্রির কৃষ্ণতার মধ্যে আরও গাঢ় কৃষ্ণিমা সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে সপ্তসৌণ্ডিকপভার। সাপের ফণার মতো পর্বত গাত্র। জিতসোমা অতি বুদ্ধিমতী, বিদুষী হলেও ছিল তাঁর একান্ত অনুগত। এক অহেতুক ভয়ে সংকোচে তিনি তাকে ত্যাগ করে এসেছিলেন। না, ত্যাগ তাকে বলা যায় না। সেই মুহূর্তে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল তাঁর সঙ্গ জিতসোমার পক্ষে অশুভ হবে। ভালো করে ভেবে দেখলে মনে হয় তাঁর আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটেছিল। এবং যেহেতু রাষ্ট্রিক কাজে নিজেকে নিবেদন করতে চান সেহেতু ব্যক্তিগত জীবনে জটিলতা পরিহার করতে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

মহারাজ বলছেন জিতসোমা তিষ্যকুমারকে মনস্থির করবার সুযোগ দেয়নি। তিনি জিতসোমার আরক্ষার জন্য সশস্ত্র রক্ষী রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু কুমার কুনিয়কে জিতসোমা নিজেই অনুমতি দিয়েছে গান্ধার ভবনে প্রবেশ করবার। দুজনের মধ্যে কী সম্পর্ক তা নাকি মহারাজ জানেন না। এবং বর্তমানে 'পুষ্পলাবী'র এই নটীজীবন সোমা নিজেই নির্বাচন করেছে। সন্ধ্যায় নৃত্য-গীতের পর কোনও কোনওদিন কাব্যপাঠ, নানা বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদির পর জিতসোমার দ্বার নাকি বন্ধ হয়ে যায়। কারো প্রবেশের অনুমতি থাকে না। ভালো। অদ্য চণক ভগ্নীর গৃহে যাবেন। এ বার যখন প্রাচীতে যাবেন সোমাকে নিয়ে যাবেন। অতি দুর্গম প্রদেশে যেতে হলে তাকে ভদ্দিয়তে রেখে দেওয়া যায়, চম্পায় মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর গৃহে রেখে দেওয়া যায়। একসালা গ্রামে বালিকা লোলার গৃহই বা মন্দ কী ? প্রাচুর্যে অভ্যস্ত জিতসোমা। কাকে বলে দরিদ্রতা, কাকে বলে সরল জীবন, নিরাড়ম্বর, নিরুপকরণ, সামান্য আশা আকাঙ্ক্ষার জীবন, দেখুক। রাজশাস্ত্রে এদের কী স্থান হবে ? এদের কী গুরুত্ব সে দেবে তিনি জানতে উৎসুক। এক বন্য বালিকাকে স্পর্শ করতে জিতসোমা ঘৃণা বোধ করেছিল ...আবার... আবার গৌতম যখন সেই বন্যরমণী...কী যেন নাম হারীতি না ? তাকে যখন বশ করলেন সে মুগ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করেছিল, গৌতমের নীতির সশ্রদ্ধ সমর্থন করেছিল।

পুষ্পলাবীর কাননে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন চণক, শিশিরসিক্ত মৃত্তিকার ওপর শিক্ষিত চিত্তকের খুরের শব্দ হল না। প্রতি মুহূর্তেই তিনি আশা করছেন রক্ষীদের।

—ও কী ? ও কে ? চন্দ্রকেতু না ? অমাত্য চন্দ্রকেতু ?

পেছনের দ্বার দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে চণকের, তাই তিনি চিনতে পারছেন। এক মুহূর্ত। পরক্ষণেই আর চন্দ্রকেতুকে দেখতে পেলেন না চণক। কিন্তু আরও একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসছে। একইভাবে। সহসা চণকের কী হয়ে গেল তিনি কটি থেকে ছুরিকা টেনে নিলেন, ক্ষিপ্র হাতে অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে ছুঁড়ে দিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুরিকা বিঁধে গেল ছায়ামূর্তির কণ্ঠনালীতে। ঘড়ঘড় মতো একটা মৃদু শব্দ হল, লোকটি সম্ভবত ঝোপঝাড়ের ওপর পড়ল। সংবিত ফিরে এলো চণকের। ওই ছায়ামূর্তি যদি কুমার কুনিয় হয় ? যদি হন স্বয়ং মহারাজ ?

চণক, কাত্যায়ন, তুমি দিশা হারাচ্ছো। সম্ভবত তোমার চিত্ত তোমার বশে নেই। এইসব অতর্কিত প্রতিক্রিয়া, তড়িৎ-সিদ্ধান্ত, হত্যা, রক্তপাত,— এ সবই তোমার অনেক পেছনে ফেলে আসার কথা ছিল। চণক ! চণক !

চকিতে চণক চিত্তকের পিঠ থেকে নেমে ছুটে গেলেন। একটি কামিনীঝোপের ওপর পড়ে আছে লোকটি। কৃষ্ণ বসন পরা, কণ্ঠ থেকে গলগল করে রক্তপাত হয়েছে। না পরিচিত কেউ নয়। একটি অপরিচিত সামান্য মানুষ। মরে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনের দ্বারে মৃদু করাঘাত করলেন চণক। সামান্য পরেই জিতসোমা স্বয়ং দরজা খুলে দিল। চোখে নিদ্রার চিহ্নমাত্র নেই। পরিপাটি সাধারণ বেশ। দীর্ঘ বেণী দুলছে। চণককে দেখে তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। চণক আঙুল দিয়ে ঝোপের দিকে দেখালেন।

—ও কী ?— ত্রস্ত পায়ে কাননে নেমে এলো সোমা— রুরুকে এ ভাবে মারলে কে ?

—আমি।

—আপনি ? জেট্‌ঠ ? — জিতসোমা এমনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল যেন সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সহসা তার চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়তে লাগল, স্খলিত গলায় সে বলল—রুরু, হতভাগ্য রুরু, রুরু, তুমি বিশ্বস্ত ছিলে, এই কি তোমার অপরাধ ?

সে ছুটে ভেতরে চলে গেল। নিমেষের মধ্যে একপাত্র জল নিয়ে ফিরে এলো। তূল ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে রুরু নামক ব্যক্তির গলায় ঢেলে দিল। লোকটির গলার ভেতরে জল গেল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তার মাথাটি একদিকে হেলে গেল অসহায়ের মতো। জিতসোমা লোকটিকে দু হাতে তুলে ধরল অমানুষিক বলে। কোলে করে নিয়ে দাঁড়াল। পরিশ্রমে তার মুখে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ফুটে উঠেছে। চণক দেখলেন তাম্রবর্ণ, খর্বকায়, কৃশ একটি সামান্যদর্শন মানুষ। তিনি বললেন— আমি সাহায্য করছি সোমা তুমি পারবে না।

সোমা প্রাণপণে মাথা নাড়ল— আপনি একে স্পর্শ করবেন না। যা আমার কর্তব্য তা আমাকেই পালন করতে দিন— তার দু চোখ দিয়ে এখন ঝরঝর করে জল পড়ছে।

—এত দূর ? এত দূর তোমার অধঃপতন সোমা! ধিক। একটি সামান্য লম্পট! তার জন্য এত! একেবারে ক্রোড়ে তুলে নিয়েছো ?

সোমার বক্ষের উত্তরীয় রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। সে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলল— আপনিও তো একদিন এক নষ্ট-ভ্রষ্ট বন্যবালিকাকে কোলে করে নিয়ে এসেছিলেন, আসেন নি ? মুগ্ধ-কাতর নেত্রে চেয়ে থাকতেন তার দিকে দিবসরজনী। তাতে দোষ হয়নি ? নাকি সে আপনি দেবরাত পুত্র বলে।

চণকের ক্রোধ আসছে। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন— সে বালিকা নষ্ট-ভ্রষ্ট ছিল না।

— এ ব্যক্তিও লম্পট নয়।

—সকলই তোমার ক্ষমার অযোগ্য মোহ।

—মোহ আপনার, ভ্রম আপনার। আর, কাউকে ক্ষমা করা অথবা না করার দায় সোমা নেয় না।

সোমা উচ্চতম সোপানে দাঁড়িয়েছে এবার। চলে যাবে।

ক্রোধে ক্ষোভে মুখ রক্তবর্ণ করে চণক বললেন— যাও, যাও, সোমা ভিক্ষুণীসংঘে যোগ দাও গিয়ে। স্বাধীনতা কন্দুক নয় যে তাকে হেলায় মলক্ষেত্রে ফেলে দেবে। যাও সোমা যাও যাও...

তিনি আর দাঁড়ালেন না। তীব্রবেগে মুখ ফেরালেন। কয়েকটি ক্ষিপ্র পদক্ষেপে পৌঁছে গেলেন চিত্তকের কাছে। তারপর রাজগৃহের প্রত্যূষ-পথে ধূলার ঘূর্ণাবর্ত ছাড়া কিছু দেখা গেল না।

AMARBOI.COM

১৬

কিশোর সোপাক চলেছিল ভিক্ষুণী উপাশ্রয়ের দিকে। হন হন করে। মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। দুতিন বছরের মধ্যেই সোপাক অতিশয় প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠেছে। সে স্থবির সারিপুত্তর সার্ধবিহারিক। প্রত্যূষে উঠে উপাধ্যায়কে দন্তকাষ্ঠ, মুখ ধোবার জল, ধোয়া চীবর— এসব গুছিয়ে দিয়েছে। উপাধ্যায় এবার ধীরে ধীরে পদচারণা করবেন, তারপর ভিক্ষায় বেরোবেন। সোপাকও বেরোবে ভিক্ষায়। কিন্তু বেরিয়ে প্রথমেই সে যায় ভিক্ষুণী উপাশ্রয়ে মায়ের কাছে। মাকে না দেখে সোপাক থাকতে পারে না। অবশ্য মা এখন এই সময়টা উপাশ্রয়ে থাকেন না।

সোপাক চণ্ডালপুত্র। তিন চার বছর আগে তাকে দেখলে মনে হত একটি শশকশাবক। সর্বদা ভয়ে ভয়ে আছে এই কোনও হিংস্র জন্তু এসে তাকে গ্রাস করে নিল বুঝি বা। সোপাকের অভিজ্ঞতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলত সংসার এক অরণ্য। হিংস্র, ভয়াল, কিংবা উদাসীন। একমাত্র আশ্রয় মা। অথচ পিতৃব্যপুত্রের জন্মের আগে সে ছিল গৃহের পরম আদরের ধন। সেসব দিনের কথা ক্ষীণভাবে মনে পড়ে সোপাকের। তার হাতে ক্ষীরমণ্ড তুলে দিচ্ছেন পিতৃব্য। নানাপ্রকার খেলনা এনে দিচ্ছেন। সে তখন নিতান্তই শিশু। মা বলতে চান না। কিন্তু দুঃখে দ্বন্দ্বে বড় হয়ে সোপাক যতটা বোঝার তার চেয়ে অধিক বোঝে। তার পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্যের পত্নী হবারই কথা ছিল তার মায়ের। তাদের পরিবারে এ রূপই হয়ে থাকে। হলে কোনও গোল হত না। কিন্তু মা সম্মত হননি। পিতৃব্য বিবাহ করলেন, সেই থেকে পিতৃব্যপত্নী খুল্ল-মা, তাদের বিষচোখে দেখলেন। সারাদিন পরিশ্রমের পর পিতৃব্য গৃহে ফিরলে অভিযোগ আর অভিযোগ। অল্পবয়স থেকেই সোপাক প্রহার খেয়ে আসছে। তর্জন-গর্জন, চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, কেশের গুচ্ছ ধরে প্রহার। সেদিন মা গেছেন প্রতিবেশী গৃহে মহানসীর কাজে। তাঁকে গৃহের কাজ করা ছাড়াও উপার্জন করে এনে দিতে হয় পিতৃব্যকে। তৈলের ভাঁড় তুলতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে যায়। খুল্ল-মা আর খুল্ল-পিতা তাকে এমন প্রহার করলেন যে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কতক্ষণ পর জ্ঞান এসেছে সে জানে না, কিন্তু জ্ঞান হতে দেখল ঘোর অন্ধকার চারিদিকে, টুপ টুপ করে হিম ঝরছে। অন্ধকারে গোল গোল জ্বলন্ত চক্ষু, ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। আর্তনাদে চক্ষুগুলি সামান্য দূরে সরে গেল, কিন্তু আবার একটু পরে কাছে ঘেঁষে আসতে লাগল। সোপাকের দুর্বল শরীর, প্রহারের ক্ষতগুলিতে যন্ত্রণা হচ্ছে। সে কিছু একটা পিণ্ডজাতীয় বস্তুর সঙ্গে বাঁধা। চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না সে। বস্তুটা কী? কোনও বৃক্ষ বা যষ্টি জাতীয় কিছু তো নয়। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আকাশ ঘোর কালো। প্রচুর মেঘ সঞ্চয় হয়েছে। সেই বিদ্যুতের আলোয় সোপাক দেখল সে একটি শবদেহের সঙ্গে বাঁধা। আতঙ্কে বালক চিৎকার করে উঠল— 'মা, মা বাঁচাও। কে কোথায় আছো বাঁচাও...।'

অন্ধকারে কে কোথা থেকে বলে উঠল— 'কে তুমি? কোথায় আছো?'

—আমি সোপাক। একটি মৃতদেহের সঙ্গে বাঁধা আছি।

বিদ্যুতের আলোয় পথ হাতড়ে হাতড়ে এক শ্রমণ এসে দাঁড়ালেন। দ্রুত হাতে তার বাঁধন খুলে দিলেন।

—কী ভাবে তুমি এখানে এলে বালক? স্নেহসিক্ত কণ্ঠ।

সোপাক ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে সব বলল।

—হায় তথাগত, মানুষ এত নিষ্ঠুর!

আর একটি কণ্ঠ বলল— আনন্দ ওকে আমার কোলে দাও।

দুই শ্রমণ মিলে তাকে বেলুবনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মধ্যরাত্রে তার সর্বাঙ্গ উষ্ণ জলে ধুইয়ে নানা স্থানে অনুলেপন লাগানো হল। পরিষ্কার বস্ত্র পরানো হল। গরম দুধ পান করানো হল। সারা রাত্রি দুজনে তার ব্যথাক্লিষ্ট শরীরে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়ালেন। যখন ঘুম ভাঙল চারদিক আলোয় আলো। সে বুঝতে পারল অপূর্ব চন্দনের গন্ধর মধ্যে অতিশয় সুখে সে শুয়ে আছে। এতো সুখ, এতো শান্তি, এতো স্নেহ যেন সে পায়নি কখনও। সেই কক্ষে তখন কেউ ছিল না যেন। অথচ তার কোনও ভয় তো হলই না, একটা নির্ভরতার ভাব, আশ্রয়ের আশ্বাস তাকে ঘিরে রইল। নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে আবার নিদ্রা যেতে যাচ্ছিল সে, একটি গম্ভীর কিন্তু কোমল কণ্ঠ তাকে বলল—এই হল সংসার, সোপাক, এই-ই সংসার, এই-ই সংসার। এখানেই কি ফিরে যেতে চাও?

—না, না, কখনোই না।

—বিলাস, ব্যসনের সুযোগ পাবে না বালক। নিয়ম পালন করতে হবে। তবে বিদ্যা শিক্ষা পাবে।

—মা? আমার মা?

—মাকেও পাবে বচ্চ। সংঘে আসবে কী?

—আসব দেবতা।

—আমি দেবতা নই সোপাক।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তবে ?

—আমি মানুষ।

—আমার মতো ?

—তোমারই মতো ?

—আমি যে চণ্ডাল !

—তোমার সঙ্গে আমার কোনই পার্থক্য নেই, বালক। শুধু আমি পথ পেয়েছি। তুমি এখনও পাওনি।

সোপাক হন হন করে হাঁটছিল। তার পেছন থেকে এক অশ্বারোহী তীব্র বেগে চলে গেলেন। সোপাক চোখ দুটি ঢেকে ফেলল। ধুলো উড়ছে।

ধূলি। সর্বত্রই শুধু ধূলি, শুধু ভস্ম। সোপাকের অস্তিত্বটি যেন একটি শুক্তির মধ্যে মুক্তার মতো। শুক্তির আশ্রয়ে আছে সে, কিন্তু সেই শুক্তির জোড় সামান্য খোলা। সে টের পায় ঘূর্ণমান ধূসর কল্লোল তাকে ঘিরে। বহু প্রকার মাংসজীবী মৎস্য, জলজন্তু লাঙুল ঝাপটায়। এই রাজগৃহের বাইরে এখনও সে যায়নি। রাজগৃহই তার পৃথিবী। কিন্তু রাজগৃহের পথে বেরোলেই মনে হয়—কেমন অশান্ত, উত্তাল, কেমন হিংস্র এই নগর, যেন দাঁতে নখে তাকে খেতে আসছে। অশ্বগুলি, রথগুলি বুঝি তাকে পিষে ফেলে চলে যাবে। যদি দুইয়ের অধিক তিন ব্যক্তিও কাছাকাছি আসে সোপাক সভয়ে শশক শিশুর মতো পথ ছেড়ে দূরে সরে যায়। এরা যেন সোপাককে দেখতে পাচ্ছে না। যদি তাকে মাড়িয়ে চলে যায় ? কিম্বা যদি সহসা হত্যা করে ? ধূলি চারদিকে ধূলি উড়ছে। সংসারের ধূলি, মানুষের বিচিত্র কামনা-বাসনার ধূলি। লোভ, রোষ, দম্ভ, ঈর্ষার ধূলি সর্বব্যাপী এক ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ের মতো রাজগৃহ নগরকে ঘিরে ঘিরে উৎক্ষিপ্ত করতে চাইছে। ওই যে অশ্বারোহী চলে গেল, কিসের অত বেগ, কোথায় ওকে পৌঁছতে হবে নিমেষের মধ্যে ? কিম্বা পালাচ্ছে কী ? কোথাও থেকে পালাচ্ছে কী ? যেন উন্মত্ত ক্রোধের এক দীর্ঘ পুচ্ছ পথের মধ্যে রেখে গেল। ক্রোধ ? কিম্বা...কিম্বা...শোক ? উন্মত্ত শোক ? দুহাতে মুখ ঢাকে কিশোর সোপাক। এই ধূলির ঝড়ের মধ্যে সে যে একা বেরিয়েছে ! কেমন করে পথ পাবে ?

মায়ের কাছে বহু কষ্টে পৌঁছল সোপাক। তিনি এই সময়টা ভিক্ষুণী উপাশ্রয় ছেড়ে থাকেন বৈভারগিরির ওপরে একটি কন্দরে। নির্জন সাধনা হয়ত তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু এই নির্জন গিরিগুহায় তিনি প্রাণভরে পুত্রকে আদর করতে পারেন। কেউ দেখবার নেই। কাষায় চীবর পরিহিতা শ্রমণা পুত্রকে বুকে টেনে নেন।

—সোপাক, সোপাক, বচ্চ আমার, কাঁপছিস কেন বাপা ?

—মা। নগরীতে বড় ভয়। বুঝি কিছু অমঙ্গল ঘটবে।

—এ তোর কী হল সোপাক। কেন এতো ভয় ? এতো বুঝিস কেন ? আহা যদি তথাগত তোকে আমার কাছে থাকতে দিতেন ! না, না, মা তো তোকে রক্ষা করতে পারেনি। তিনিই তোকে রেখেছেন। তিনি যা বলবেন তাই করবি।

—তাই করি মা। তাই করি। যখন তাঁর সঙ্গে থাকি, বেলুবনেই হোক, সিতবনেই হোক, কোনও ভয় থাকে না তো মা ! বাইরে পা দেবামাত্র নগর যেন লুব্ধ পশুর মতো আমাকে তাড়া করে আসে।—সোপাক কেঁদে ফেলে।

—ভগবান তথাগতকে বলিস নি এ কথা ?

—না।

—বলবি। বিলম্ব করবি না।

—শোন সোপাক একটু কাঞ্জিক খা। গোধূমের পুরোডাশে ভিজিয়ে।

—কোথায় পেলে মা ? সঞ্চয় করছো ?

—না, বাপা। গিরিগুহায় থাকি। মোড়ানো মাথা। গায়ে শ্রমণার বস্তর। লোকে মনে ভাবে কত বড় সন্ন্যাসিনী বুঝি। দিয়ে যায়। আজ প্রভাতেই দিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—মা, আমরা একাহারী। সারাদিন ভিক্ষার পর মধ্যদিনে খাই।

—মরে যাই বচ্চ, তুমি বালক, তুমি কখনও এতোক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারো? প্রভাতে যাউ বা কাঁজি খেতে তো নিষেধ নাই।

—কিন্তু মা, পুরোডাশ?

—খাও সোপাক, মায়ের হাতে খেলে তোমার উপাধ্যায় রাগ করবেন না।

—তা হলে তুমিও খাও মা।

দুখিনীর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন—আবার আমি কেন বচ্চ! আমি তো আর তোমার মতো বালক নই?

—তা হলে আমিও খাবো না মা—সোপাক উঠে দাঁড়ায়।

—বোস, বোস, কোথায় যাস বচ্চ। ঠিক আছে, আমি খেলে যদি তোর অনাগামি ফল লাভ হয় তো খাচ্ছি।

গিরিগাত্র বেয়ে মাতা পুত্র নেমে আসে।

—কোন দিকে যাবি এখন সোপাক?

—পুব পল্লীতে যাই মা? সোপাক এখন অনেকটা শান্ত।

—তাই এসো বচ্চ। ওদিকে হাট রয়েছে। যা পাবে নিয়ে তাড়াতাড়ি সঙ্গে চলে যেও।

পুব পল্লী থেকে ফেরবার পথে একটি রোরুদ্যমানা রমণী সোপাকের পথ রোধ করল। সোপাকের চোখে ধন্দ। একটু পরে সে বুঝতে পারল এ তার খুল্লমাতা।

—সোপাক, সোপাক, রুরু কোথায় জানো?

—রুরু? রুরু কে?

—ছল করছো? রুরুকে জানো না? রুরু আমার ছোট ভাই।

তখন সোপাকের মনে পড়ল রুরু নামে এক ব্যক্তি অদ্ভুত অদ্ভুত অসময়ে তাদের গৃহে আসত বটে। তার খুল্লমার অতিশয় আদরের ভাই। এলেই গৃহের যাবতীয় সুখাদ্য তার সামনে ধরে দিতেন খুল্লমা।

—রুরু কদিন আমার কাছেই ছিল। সন্ধ্যায় কাজ আছে বলে বেরোলো। আজ দেখো সূর্যি মাঝ আকাশে চড়তে গেল তবু তার দেখা নেই। সে আমাকে নিশ্চয় করে বলেছিল আজ গৃহে আমার কাছে পলান্ন পায়স খাবে...কী সোপাক কথা বলছো না কেন?

সোপক একটা গভীর বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যে ছিল। যে রমণী এক বালককে সামান্য কারণে বা অকারণে প্রহার করে মৃতপ্রায় করে ফেলে তাকে আমক শ্মশানে মৃতদেহের সঙ্গে বেঁধে রেখে আসতে পারে, সে-ই আবার আরেক ব্যক্তির ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় এমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদে! কী অদ্ভুত মানুষ! কী অদ্ভুত গতি স্নেহের!

—কথা বলছো না কেন?

—আমি কী করে জানবো? সোপাক শান্ত স্বরে বলে।

—তোমারই অভিশাপ। তোমারই অভিশাপ। সমন হয়েছ। ইদ্ধি হয়েছে। এখন আমাদের ওপর শোধ নিচ্ছো।—ক্রুদ্ধ স্বরে বলল রমণী। তারপর সহসা কেমন যেন ভেঙে সোপাকের পায়ের কাছে পড়ে গেল। গদ গদ কণ্ঠে বলতে লাগল—সমন সোপাক, সমন সোপাক দয়া করো, কোথায় কী বিপদে পড়েছে রুরু আমায় বলে দাও। আমি তোমায় দান দেবো। তার পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল খুল্লমাতা।

সোপাকের চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে অথচ সে যেতে পারছে না। তার পা দুটি বন্দী। তার সারা শরীর ঘিরে কেমন ভয়ের ঘোর। প্রত্যুষে রাজপথে যেমনটা সে অনুভব করেছিল। যেন দলে দলে সশস্ত্র মানুষ আসছে। একে অপরের মাথা কেটে নিচ্ছে। রুধির বইছে। পথে পথে রুধিরের স্রোত। সে শুধু অস্ফুটে বলল—বিপদ, বড় বিপদ জননী। রাজসভায় যান, সাহায্য চান।

হাতদুটি খসে গেল সোপাকের পা থেকে। রমণী ছুটে চলে গেল। সোপাকের পিণ্ডপাত্র হাত

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে পড়ে গেছে। তার বাসিটি কোথায় তাও সে জানে না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে বেলুবনে ফিরে এলো।

সন্ধ্যাবেলায় আমক শ্মশানে শবের স্তূপের মধ্যে রুরুর মৃতদেহ পাওয়া গেলে, ধীরে ধীরে নগরে সঙ্ঘে সর্বত্র রটে গেল চণ্ডাল বালক সোপাকের অলৌকিক ইদ্ধিলাভ হয়েছে। তার উপাধ্যায় আদেশ দিলেন সোপাক এখন ভিক্ষার্থে নগরে বেরোবে না। অন্য ভিক্ষুরা তাঁদের ভিক্ষাভাগ দেবেন তাকে। সে শুধু ধ্যান এবং নিভৃত-শ্রবণে শিক্ষালাভে দিন কাটাবে।

বিম্বিসার বললেন—পথে পথে ঘোষণা করাই। কেউ যদি রুরুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানে।...আমার রাজ্যে আগে কখনও এমন ঘটেনি সোমা।

সোমা শিউরে উঠে বলল—মহারাজ, চর মাত্রেই বিপজ্জনক জীবিকা নেয়। কখন...কোথায়...কীভাবে...। কী প্রয়োজন ? ছেড়ে দিন।

—প্রয়োজন ? তোমায় যে বললাম এ রাজ্যে আগে কখনও এমন ঘটেনি সোমা। তোমার কি মনে হয় কুনিয়র লোকেরাই ওকে হত্যা করল ?

—কোনও সিদ্ধান্তে আসবেন না মহারাজ। আমার কাছে কর্ম করতে এসে লোকটি নিহত হল, এটাই আমার দুঃখ...লজ্জা...। সোমার মুখ অতি বিষণ্ণ।

প্রথমটা মহারাজ নীরবে ছিলেন। সম্ভবত ইতিকর্তব্য কী ভাবছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—তোমার কাছে কর্ম করতে 'এসে' লোকটি নিহত হল ? কোনও বিশেষ অর্থে বলছো না কি ? ও কি নিহত হবার পূর্বে তোমার কাছে এসেছিল।

—ও তো ইদানীং প্রায় প্রতি রাত্রেই আসত...সোমা বিবর্ণ মুখে বলে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন একবার মহারাজ।

সোমা বলল—মহারাজ, যাই হোক, ও বড় মূল্যবান সংবাদ দিয়ে গেছে। এখন আপনার প্রধান কর্তব্যই হবে কুমারকে ছলে বলে চম্পায় পাঠানো। অমাত্য বর্ষকারকে পদচ্যুত করবেন কি না ভাবুন।

—বর্ষকারকে পদচ্যুত করলে আরেকটি মহাশত্রু সৃষ্টি করা ছাড়া কিছুই হবে না সোমা।

—সেইজন্যই ভাবতে বলছি। অন্ততপক্ষে তাঁকে দূরে রাখুন। অমত্য চন্দ্রকেতু যাতে আপনার কাছে কাছে থাকেন, সেই মতো ব্যবস্থা করতে হবে। অমাত্য সুনীথ সম্পূর্ণভাবে বর্ষকারের অনুবর্তী। স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে কিছু না করলেও তাঁকে বিশ্বাস করা যায় না। আপনার রক্ষীদলকে আরও সুসংবদ্ধ করুন।

অন্যমনস্কের মতো বিম্বিসার বললেন— বন্ধুরা শত্রু হয়ে যাচ্ছে, রক্ষী নিয়ে কী করবো সোমা ?

কিন্তু রুরুর মৃত্যু নিয়ে নগরে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তা হঠাৎই মরে গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে :

সেদিন স্থবির সারিপুত্ত ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন। পূর্বপল্লীর মুখে লোক জমাছিল।

—একটি লোক নিহত হল, তার হন্তা কে বোঝা যাবে না ? সকলে ভারী উত্তেজিত।

—শাস্তি হবে না অপরাধীর ?

—বাঃ ভালো রাজ্য হয়েছে...

—আগে কখনও এমন হয়নি।

রাজা যদি সমনের পরামর্শে রাজ্য চালান। তো এমন হবে না তো কী ?

—কে বলল আগে এমন হয় নি ? ...গম্ভীর কণ্ঠে সারিপুত্ত বললেন, ফিরে তাকাল সবাই।

অসুরেন্দ্র ভরদ্বাজ এদের দলপতি। সে-ই সবচেয়ে সোচ্চার।

—আপনি বলছেন আগে হয়েছে ? —সারিপুত্তকে দেখে অসুরেন্দ্র সসম্ভ্রমে বলল।

—হয়েছে যে এমন অনুমান করতে পারি সমন সোপাকের ঘটনা থেকে।

—সমন সোপাকের ঘটনাটা কী ?

সোপাকের পিতৃব্য আর তার পত্নী তাকে প্রহার করে অর্ধমৃত অবস্থায় আমক শ্মশানে শবদেহের সঙ্গে বেঁধে আসে। ঘোর অমাবস্যার রাত্রে। একাদশ বর্ষীয় বালক একটি...আপনারা কি মনে করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি বালককে হত্যার চেষ্টা ঘৃণ্য অপরাধ নয়।

অসুরেন্দ্র শিউরে উঠে বলল— বলেন কী ? তারপরে ?

—তারপর সমন আনন্দ ও ভগবান তাকে উদ্ধার করেন, সে এবং তার দুঃখিনী মা দুজনেই এখন সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন। ...এই রুরু তো শুনতে পাচ্ছি সেই পাষণ্ড পিতৃব্যেরই শ্যালক !

—আপনি কি বলছেন বালক সোপাকের হয়ে কোনও মহাশক্তিই এই প্রতিশোধ নিয়েছেন ?

—আমি কিছুই বলছি না ভদ্র, আপনারা বলাবলি করছিলেন এ রাজ্যে আগে কখনও এমন হয় নি...আমি তারই সাধ্যমতো উত্তর দিলাম। ...আর ভদ্র এ জন্য রাজাকে দোষ দেওয়া অনুচিত। কোথায় কোন বালকের খুল্লমাতা-পিতা তাকে প্রহার করে মেরে ফেলছে রাজা কী করে জানবেন ? যদি না বালকের প্রতিবেশীরা তাঁকে জানায় ? রাজ্য-শাসনযন্ত্রের কতকগুলি স্তর থাকে ভদ্র। প্রাথমিক স্তর পরিবারে। তার পরে সমাজ। সমাজ...যদি এই সকল অন্যায়-অবিচারের প্রতি চোখ বুজিয়ে থাকে, শাসন যন্ত্র কী করবে ? সেক্ষেত্রে যতগুলি পল্লী ততগুলি চর, এবং উপযুক্ত সংখ্যক রাজভট রাখা প্রয়োজন। আপনার পল্লীতে আপনি গৃহের বালক-বালিকা-নারী-দাসেদের প্রতি কী ব্যবহার করছেন দেখবার জন্য চর ঘুরঘুর করলে আপনার ভালো লাগবে ?

অসুরেন্দ্র বললেন— সত্যই ভালো লাগবে না। আপনি ঠিকই বলেছেন সমন।

—প্রতিবেশীর দায়িত্ব আছে, সমাজের দায়িত্ব আছে। শাসনযন্ত্র একা কী করবে ? বলতে বলতে স্থবির সারিপুত্ত চলে গেলেন।

রুরুর হত্যা থেকে এখন সমালোচনাটি ঘুরে গেল। সোপাকের প্রতি তার আত্মীয়দের অমানুষিক ব্যবহারের প্রতি এবং অনিবার্যভাবে সোপাকের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি।

১৭

AMARBOI.COM

দেবরাতপুত্র চণক এসব কিছুই জানতেন না। জানবার অবস্থাও তাঁর ছিল না। জীবনে কখনও তিনি এরূপ উত্তেজিত হননি। সে রাত্রে গ[illegible]ভবনে তিনি আদৌ ফেরেননি। চলে গিয়েছিলেন উত্তরদুয়ার পেরিয়ে নগরীর বাইরে। প্রত্যুষে দুয়ার খোলবামাত্র। নগরপ্রাচীর, নগরপ্রত্যন্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, শস্যক্ষেত্র তারপর ক্রমে ক্রমে পাটুলিগ্রাম। এবং গঙ্গা। পাটুলিতে গঙ্গার ধারে পাথরের সুন্দর বিশ্রামগৃহ। এইখানে বসে জলের দিকে তাকিয়ে চণক স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তিনি সম্পূর্ণ অন্যমনা। নানা ভাবনা ও ভাব তাঁর চিত্তের মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করছে, কোনটিই স্থিত হচ্ছে না। প্রায় তিন দিন দুই রাত তাঁর এখানেই কেটে গেল। অতিশয় ক্ষুধা বোধ হলে হাটে গিয়ে কোনও সমাশালয় থেকে খেয়ে আসেন। চিত্তককে খাওয়ানো কোনও সমস্যাই নয়। পাটুলি অত্যন্ত সম্পন্ন গ্রাম। অশ্বরক্ষার জন্য মন্দুরাও এখানে আছে। এই বিশ্রামগৃহের অদূরেই আছে একটি ভালো মন্দুরা। চিত্তককে আপাতত সেখানেই সমর্পণ করেছেন তিনি। গঙ্গার বহমান জলধারার দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রহরগুলি কাটছে।

তৃতীয় দিন সকালে সহসা তাঁর অত্যন্ত কাছে বসে কেউ বলল— দেবরাত, আপনি এখানে !

চমকে মুখ তুলে চণক দেখলেন— অমাত্য বর্ষকার।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে চণক বললেন— আমিও তো আপনাকে একই প্রশ্ন করতে পারি অমাত্যবর ?

—প্রশ্ন করলে উত্তর দেবো ভদ্র। আমি এবং সুনীথ এই স্থানে অর্থাৎ গঙ্গাতীরে একটি দুর্গের উপযুক্ত স্থান দেখে বেড়াচ্ছি। অর্থাৎ সন্ধান করছি।

—দুর্গ ? ও—চণক অনুৎসুক স্বরে বললেন।

—আপনি কি মনে করেন না পাটুলি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ? পূর্ব-দক্ষিণের বাণিজ্যদ্বার, শক্তিশালী বজ্জি রাজ্যের ঠিক বিপরীতে এর অবস্থান। গঙ্গা-হিরণ্যবাহর সঙ্গমস্থল। ধনার্থী-রণার্থী-পুণ্যার্থী সবাইকার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এই অনুপম স্থানটি...নয় ?

চণক তখনও নীরব রয়েছেন দেখে বর্ষকার গলায় একপ্রকার আক্ষেপের শব্দ করে উদ্বিগ্ন স্বরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন— হল কি দৈবরাত ? আপনিও কি আবার সোতাপত্তি মগ্‌গে প্রবেশ করলেন নাকি ? সর্বনাশ !

চণক হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন, বললেন— কী বলছিলেন অমাত্য ?

—বলছিলাম, মহারাজকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না, এই পাটুলিতে দুর্গ রচা প্রয়োজন। উত্তর-পশ্চিম থেকে মগধ আক্রান্ত হলে শত্রুসৈন্য এই স্থানেই অবতরণ করবে। তাদের বাধা দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা এখানেই থাকা উচিত। নয় কী।

চণক চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন— হতে পারে...নিমেষ পরে আর একটু উৎসাহ ও আস্থার সঙ্গে বললেন— ঠিকই। রাজগৃহ পর্যন্ত তাদের যেতে দেওয়া ঠিক নয়...

বর্ষকার নিজের উরু চাপড়ে বললেন— ঠিক এই কথাটাই আমি মহারাজকে বোঝাতে পারছি না। উনি সর্বদাই রাজগৃহের প্রাচীর, প্রাকৃতিক সুরক্ষা ইত্যাদির কথা বলে থাকেন। রাজগৃহ যেন মহারাজের প্রথম সন্তান। আর কিছু তার সমকক্ষ হোক তা তিনি চান না। অথচ এরূপ কোনও পক্ষপাত রাজার উপযুক্ত নয়। দৈবরাত, আপনি যদি সময় করে মহারাজকে বোঝান...

চণক জিজ্ঞেস করলেন— মহারাজের সম্মতি ছাড়াই কি আপনারা দুর্গ-স্থল অনুসন্ধান করছেন ?

—করছি দৈবরাত, ব্যক্তিগত উদ্যোগে। সমস্যাটা হল কি জানেন ? আমরাও দণ্ডনীতি জানি, বার্তা জানি, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে করতে বহু সমস্যা ও তার সমাধান মাথায় আসে। শুধু মহারাজের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে কাল কাটাতে পারি না।

অমাত্য সুনীথ এই সময়ে উত্তেজিত হয়ে কোথা থেকে ছুটে এলেন।

—অমাত্য বর্ষকার, অমাত্য বর্ষকার ! দুর্গের উপযুক্ত স্থান আর একটু পশ্চিমে পেয়েছি।

চণককে দেখে তিনি থেমে গেলেন।

—মহামান্য দৈবরাত যে ! আপনি এখানে ?

চণক উত্তর দিলেন না। একটু হাসলেন শুধু। বর্ষকার ও সুনীথ পরস্পর চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

চণক বললেন— আমার প্রত্যাবর্তনের সময় হলো। নমস্কার অমাত্যগণ।

কিছুদূর গিয়ে তাঁর কী মনে হল, দাঁড়ালেন, সামান্য পথ ফিরে এসে বললেন— আমি কোনও চরকর্ম করতে এখানে আসিনি।

এবার তিনি দ্রুত মন্দুরার দিকে গেলেন, চিত্তককে সংগ্রহ করলেন। কিছুক্ষণ পরেই রাজগৃহ অভিমুখে তাঁর ঘোড়া ছুটল। তিনি বোধিকুমার ও জননী সুমেধার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

চলতে চলতে তাঁর মনে হল— শ্রীমতী ? শ্রীমতী কি ফিরেছে ? যদি তার সন্তান নির্বিঘ্নে জন্মে থাকে তা হলে এতদিনে তার বেশ কয়েক বৎসর বয়স হয়ে যাবার কথা। তাকে তিনি তক্ষশিলায় পাঠাবেন। রাজার কাছে ওই লম্পটটিকে হত্যা বিষয়ে স্বীকারোক্তি করা ভাল। চন্দ্রকেতু যদি বিদ্ধ হত ? তা হলে এতক্ষণে রাজগৃহে কোলাহল পড়ে গেছে। তিনি অনেক চেষ্টায় মনটিকে অন্য চিন্তায় ফেরালেন। দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। একটি রথ চলে গেল তাঁর পাশ দিয়ে, রথ স্বহস্তে চালাচ্ছেন একজন বীরপুরুষ, পাশে সূত। ভেতরে বসে একটি শ্রমণ। দৃশ্যটি অদ্ভুত লাগল তাঁর। কে ওই বীরপুরুষ ? রূঢ়দর্শন। কিন্তু সম্ভবত বয়সে একেবারেই যুবক। দাম্ভিক, রীতিমতো শক্তিধর... প্রায় রাজগৃহের প্রাকার পর্যন্ত চলে আসার পর চণকের মনে হল— এ নিশ্চয় কুমার কুনিয়।

ভেতরে শ্রমণটি কে ? তথাগত ? তিনিও তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন। রথটিও চলেছিল আট পা তুলে উর্ধ্বশ্বাসে। কাষায় বস্ত্র ও মুণ্ডিত মস্তকের একটা স্মৃতি রয়েছে মাথায়। কিন্তু তথাগত নয়। অন্য কেউ। কে ?

গান্ধারভবনে গিয়ে স্নান সাজসজ্জা আহার করে পরিতৃপ্ত হলেন চণক। তীব্র ইচ্ছা হচ্ছে পুষ্পলাবীতে যেতে। জানেন না, আজ অনুষ্ঠান আছে কি না, কিন্তু শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে প্রস্ফুটিত কুসুমের গান, দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে সেই মহাকালের নৃত্য। কিন্তু গোপনে। কেন কে জানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিতসোমার মুখোমুখি হতে তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে না।

সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি রাজপ্রাসাদে মহারাজ বিম্বিসারের দর্শনার্থী হয়ে গেলেন। কূটকক্ষে আহূত হলেন চণক।

—মহারাজ, আপনাকে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তো এখনও কিছুই বলা হয়নি— কেমন অস্থির যেন আজ চণক রাজাও যেন কেমন অন্যমনা। বিমর্ষ।

—আমি শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে আছি আচার্যপুত্র। বললেন, কিন্তু কেমন নিরুৎসুক।

—শুনুন, দু-তিনটি নতুন জনপদ বসিয়ে এসেছি, বন কেটে। অর্থ দিয়েছেন ভদ্দিয়র শ্রেষ্ঠী মেণ্ডক। আর প্রচার করে এসেছি।

—কী প্রচার করেছ চণক?

—প্রচার করেছি মহারাজ বিম্বিসার প্রজাপালক, উদারহৃদয়। মহারাজ পিতার মতো বৎসল, দেবতার মতো শক্তিধর, কিন্তু তিনি প্রজাদের কাছ থেকে বিপদের সময়ে সৈন্যবলের প্রত্যাশী। তিনি চান প্রতিটি গ্রাম আত্মরক্ষায় সমর্থ হোক।

বিম্বিসার উঠে বসলেন, বললেন— তুমি তোমার উপযুক্ত কাজ করেছ আচার্যপুত্র। তুমি চক্রবর্তী রাজার চক্রস্বরূপ। কিন্তু হায় এ চক্র ধারণ করবার মতো রাজা বুঝি আর নেই!

—এ কথা বলছেন কেন মহারাজ?

—নানান জটিলতায় ক্রমশই জড়িয়ে যাচ্ছে রাজ্যের ভাগ্য, রাজার ভাগ্য....

মহারাজের হতাশাব্যঞ্জক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিলেন না চণক। বললেন— ভাল কথা, আমি একটি গর্হিত কাজ করে ফেলেছি। দণ্ডনীতির দিক থেকে গর্হিত, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত নীতির দিক থেকে কাজটি শ্লাঘ্য।

—অর্থাৎ। বিম্বিসার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

—'পুষ্পলাবী'র নগরশোভিনীর গৃহে রাত্রিচর একটি লম্পটকে আমি হত্যা করেছি।

—তুমি! বিম্বিসার চমকে উঠলেন— সোমা জানে?

—অবশ্যই! মুমূর্ষু প্রণয়ীকে অন্তিম জলগণ্ডূষ তো সে-ই দিল। আপনি বিচার করে আমার যা শাস্তি প্রাপ্য মনে করেন, দিন।

বিম্বিসার গম্ভীর হয়ে বললেন— এ অপরাধের প্রকাশ্য বিচার তো হওয়া সম্ভব নয় দৈবরাত!

—কেন?

—তাতে শুধু তুমি নও, জিতসোমা, মগধের শুভাকাঙ্ক্ষী অমাত্যরা এবং শেষ পর্যন্ত মহারাজ বিম্বিসারও জড়িয়ে পড়বেন।

চণক অনুভব করলেন, তিনি ধীরে ধীরে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছেন।

মহারাজ বললেন— চণক, জিতসোমা আমার অমাত্য, পূর্বেও তোমাকে বলবার চেষ্টা করেছি, বিশ্বাস করনি। আবারও বলছি, নগরশোভিনীর এই আয়োজন, এ তার ছদ্মবেশ। রাত্রে তার কাছে প্রণয়ীরা যায় না। যায় চরেরা। এবং বিম্বিসার-ভক্ত অমাত্যরা। কুনিয়-পন্থী অমাত্যদেরও সে সমান আতিথ্য দেয়, কিন্তু তা শুধুই তার রাজকার্য করতে। যে ব্যক্তিকে তুমি হত্যা করেছ, সেই রুরু একটি সামান্য চর।

চণক বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন।

বিম্বিসার বললেন— জিতসোমা প্রশংসনীয় অমাত্য-কর্ম করেছে চণক। অতি অল্পকালের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠী ও অমাত্যদের মধ্যে কারা বিম্বিসারের শত্রু, আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছে, বিম্বিসারের ঘনিষ্ঠতম অমাত্যরাই কুমার কুনিয়র সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছেন। এবং এঁদের প্ররোচিত করছেন একজন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ—দেবী রাহুলমাতার সহোদর— ভগবান তথাগতর নিজের শ্যালক—স্থবির দেবদত্ত। ... তাই বলছিলাম, চক্র হল কিন্তু চক্র ধারণ করার মতো রাজা হয়ত আর থাকবে না।

চণক ঘটনার বিবরণে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন। এবার তিনি পাটুলি গ্রামে দুর্গ, বর্ষকার-সুনীথ, এবং রথারোহী কুমার ও শ্রমণের দৃশ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারলেন। সেই সঙ্গে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমার জল-ভরা চোখ ও দৃপ্ত ভঙ্গি মনে পড়ে তিনি নির্বাক হয়ে রইলেন। ব্যক্তিগত জীবনের জটিলতায় এমনই বিভ্রান্ত ছিলেন যে মহারাজের শেষ কথাগুলি তাঁর কান এড়িয়ে গেল। তিনি অভিমানাহত গলায় বললেন— সোমার সমস্ত ব্যাপারটি আমায় পরিষ্কার করে বলা কি আপনাদের উচিত ছিল না ?

—সমস্তটাই গুপ্ত। কেউ জানতে পারলে সর্বনাশ।

—আমার থেকেও গুপ্ত ?

—তোমাকে সব খুলে বলতে নিষেধ ছিল দৈবরাত।

—কার নিষেধ মহারাজ ?

—সোমার।

—এইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একজন নারীর নিষেধের কী মূল্য মহারাজ !

—কিন্তু এই নারী বিদুষী, দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ। নূতন পথ প্রদর্শন করছে সে, তার মতামতের মূল্য নেই ? তুমি তার আচার্য, তুমিও এরূপ বলছো !

—মহারাজ, সোমা বিদুষী, তত্ত্বজ্ঞরূপে আপনার রাজ্যের গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে পথ নির্দেশ করছে। কিন্তু আমাকে জানাতে নিষেধটা সে করেছে অভিমানে। এবং নারী অতিমাত্রায় আবেগতাড়িত ও স্পর্শকাতর বলেই অতিবিদুষী হওয়া সত্ত্বেও তাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করার আগে দুবার ভাবতে হয়। ব্যক্তিসত্তার থেকে নৈর্ব্যক্তিক কর্মীসত্তা স্বতন্ত্র করতে পারে না সে।

—সকল পুরুষই কি তা পারে ?

—পারে না মহারাজ। ঠিকই। কিন্তু পারতে হয় এবং বহুকাল ধরে পারতে পারতে এটা পুরুষের অভ্যাস হয়ে গেছে।

—তা হলে তুমি বলছ, সোমাকে অমাত্য নিয়োগ করে আমি ভুল করেছি ?

চণক নীরবে দু দিকে মাথা নাড়তে লাগলেন। যেন, তিনি কী বলবেন ঠিক করতে পারছেন না।

—বলো, কিছু বলো বন্ধু ! বিচারটা ঠিক করলে কি না ভাবো।

—ভাবছি, ভাবছি মহারাজ... সোমার অহেতুক গোপনীয়তার কারণে একটি নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যাকারী হতে হল। নিহত হল আরেক ব্যক্তি। নিহতর চেয়ে হত্যাকারীর ভাগ্যই কি ভাল ?

হত্যাকারীর ভাগ্য নির্ধারণ, আমি বুঝব। আমি যা হয় করব। তুমি এ নিয়ে অনর্থক চিন্তা না-ই করলে।

—মহারাজ, সে চিন্তার কথা বলছি না। একটি ব্যক্তিকে শুধু শুধু হত্যা করেছি এ কথা ভাবলে নিজেকে কলঙ্কিত লাগে ভয়ানক। চণক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন।—

ক্ষত্রিয়দের ওরূপ কত হত্যা করতে হয় ! তা ছাড়া বন্ধু তুমি তো জেনেশুনে করোনি ! যাই হোক, আমি তোমাকে শাস্তি দেবো, ভেবো না। শুধু প্রকাশ্যে দেওয়া সম্ভব নয়। এইটুকু। আমার আর একটা অনুরোধ, এই দুঃসময়ে তুমি আমার পাশে, রাজগৃহে থাকো।

ক্ষণকাল ভেবে চণক বললেন— স্বীকৃত হলাম।

কিন্তু এর কয়েক দিন পর বোধিকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে চণকের স্বাভাবিক স্থৈর্য আবার টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

সকালবেলা রাজগৃহ নগরী রৌদ্রে স্নান করছে। ক্রমশই তপ্ত হয়ে উঠছে পথ। চণক দেখলেন বোধিকুমারের গৃহদ্বার খোলা। সকালে বন্ধ থাকবার কোনও কারণও অবশ্য নেই। কিন্তু মাতা-পুত্র উভয়ে গালে হাত দিয়ে গৃহদ্বারের প্রান্তে বসে আছেন। মুখ যারপরনাই বিষণ্ণ।

চণককে দেখে বিস্ময়ে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল বোধিকুমার। আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে আসছিল। সহসাই সে পিছিয়ে গেল।

—কী ব্যাপার ? —চণক হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—সব কুশল তো ?

দেবী সুমেধা বললেন—আজ দশম দিন হল।

'কিসের দশম দিন ?'

প্রথমে কেউ উত্তর দিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু পরে বোধিকুমার বলল—শ্রীমতীর মৃত্যুর।

'শ্রীমতী... মারা গেছে ?' চণক ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন।

সুমেধা বললেন—বচ্চ চণক, মারা গেছে অত্যন্ত দুঃখের কথা, শোকের কথা। কিন্তু তার জন্য শোক করছি না। আজ দশ দিন হয়ে গেল হতভাগিনীর সৎকার হল না।

'—সে কী ? কেন জননী !'

—রাজাদেশে, সমন গৌতমের আদেশে...

—অর্থাৎ ?

উত্তরে চণক এই কাহিনী শুনলেন : শ্রীমতী সন্তান জন্মের পর দ্বিগুণ রূপ যৌবন নিয়ে রাজগৃহে ফিরে আসে। এবং তার গৃহে নিয়মিত নৃত্য-গীত-সভাও বসাতে থাকে। বোধিকুমার তার নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল, দেবী সুমেধা তাকে সাদরে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী সবিনয়ে এ সকল প্রত্যাখ্যান করে পূর্ববৎ জীবনযাপন করতে থাকে। বোধিকুমার নিয়মিত তার সভায় যেত। দিন দশ আগে গিয়ে শোনে শ্রীমতীর প্রবল জ্বর এসেছে। বৈদ্য ঔষধ দিয়ে গেছেন। বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতিদিনই সে শ্রীমতীর সংবাদ নিতে যেত, কিন্তু দাসী চন্দা দেখা করতে দিত না। তিনদিন জ্বরভোগের পর মধ্যরাতে শ্রীমতীর যন্ত্রণার অবসান হয়। তার দেহ দাসেরা বয়ে নিয়ে যায় শ্মশানে। চিতা জ্বালাবে, এমন সময় সমন গৌতম তাঁর একটি তরুণ শিষ্যকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন।

—কেমন ? এ-ই তো সেই নারী ? —সমন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ ভন্তে, এই সেই লাবণ্যকোমল, মধুরা, গীতকুশলা, অপরূপা রমণী যাকে দেখে আমার মনে হয়েছে প্রব্রজ্যা প্রকৃতপক্ষে প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়।

সমন হেসে বললেন—ভালো, সেই মোহন দেহকান্তের আর রইল কী ? যা কোমল দেখেছিলে তা এখন কেমন কঠিন দেখো, যা উষ্ণ ভেবেছিলে তা শীতল, গীত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

—হোক কঠিন, হোক শীতল, হোক স্তব্ধ, তবু কী সুন্দর, কী মোহময় ভন্তে।

শিষ্যর এই কথায় সমন গৌতম শ্রীমতীর সৎকার স্থগিত রাখতে মহারাজকে আদেশ করেন। মহারাজও সে আদেশ ঘোষণা করে দেন।

AMARBOI.COM

চণক উঠে পড়লেন। দেবী সুমেধা চোখ তুলে তাকালেন, বোধিকুমারকে চোখের ইঙ্গিত করলেন শুধু।

চণক বেরিয়ে গেলেন চক্ষের নিমেষে। বোধিকুমারের এখন একটি অশ্ব হয়েছে। সে অশ্বকে প্রস্তুত করে যেতে যেতে চণক অদৃশ্য হয়েছেন। সে অনুমানে নির্ভর করে দক্ষিণ শ্মশানে পৌঁছল। এখানেই শ্রীমতীর শব রয়েছে।

প্রচুর লোক জমেছে শ্মশানের মুখে। বোধিকুমার দেখল উচ্চমঞ্চে শ্রীমতীর শবদেহটি শোয়ানো, কণ্ঠ অবধি একটি শুভ্রবর্ণ, সোনারূপার কাজ করা কার্পাসিক বসন দিয়ে ঢাকা। মঞ্চের সামনে সে গৌতমকে দেখতে পেল, সঙ্গে বেশ কয়েকজন ভিক্ষু। জনপরিধি ঠেলে বোধিকুমার শ্মশানভূমিতে পৌঁছল।

—কেমন বৎস ? এখনও কি তোমার এই রমণীকে বাঞ্ছিত, সুন্দর বলে মনে হচ্ছে ? গৌতম বললেন।

শ্রীমতীর মুখের ত্বক শুষ্ক। অস্বাস্থ্যকর ভৌতিক এক কৃষ্ণবর্ণ তাতে। ওষ্ঠাধরদ্বয় কেমন যেন ঝুলে পড়েছে, দাঁত দেখা যাচ্ছে। বোধিকুমার আরও এগিয়ে দেখল যেন বিকট এক মুখব্যাদান। সভয়ে চোখ সরিয়ে নিল সে। গৌতম ততক্ষণে তাঁর হাতের দণ্ডটি দিয়ে আচ্ছাদন বস্ত্রটি ধীরে ধীরে সরিয়ে দিচ্ছেন। এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এক উৎকট গন্ধ।

উপস্থিত সকলে উত্তরীয় দিয়ে নাসা চেপে ধরল।

—আয়ুষ্মান বৎস, দেখো এই নারীদেহ কী বীভৎস পূতিগন্ধময়, কৃমি-কীটের বাস। দুর্গন্ধময় এই নারীর জন্য তুমি...

সহসা ভিড় ঠেলে প্রবেশ করলেন চণক। দেখলেই বোঝায় যায় তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছেন। তাঁর দেহ ঘর্মসিক্ত। চোখদুটি জ্বলছে।

তিনি চিৎকার করে বললেন—কে, কে এই রমণীর অন্ত্যেষ্টিতে বাধা দেয় দেখি! —তিনি জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন শ্রমণ গৌতমের দিকে।

—কেউ বাধা দেবে না আয়ুষ্মান, তুমি এর সৎকার করো—গৌতম বললেন।

—এতকাল কে বন্ধ রেখেছিল সৎকার? কার আদেশে এই নারীর এরূপ অসম্মান ঘটল?

—বিশেষ প্রয়োজনে, এই ভিক্ষুকে প্রব্রজ্যায় ফেরাতে অন্ত্যেষ্টি স্থগিত রাখা প্রয়োজন হয়েছিল। অসম্মান তো নয় কাত্যায়ন?

—অসম্মান নয়? একটা সামান্য লম্পটের তথাকথিত ধম্মের নামে একটি স্বকর্মে নিষ্ঠ নারীকে এভাবে দাহ না করে ফেলে রাখা অসম্মান নয়?

—কাকে লম্পট বলছো কাত্যায়ন?

যে ভিক্ষু নারীর দেহকেই নারী বলে মনে করে, যৌবনশোভায় মত্ত হয়, আর মৃতদেহে কৃমি দেখে ঘৃণায় শিহরিত হয় সেই মূর্খ দেহসর্বস্ব ভিক্ষুকে লম্পট ছাড়া কী বলব? আর যিনি এইভাবে স্বসংঘে জনসংখ্যা বাড়ান, তাঁকে কী বলব? কী বলব? বলে দিন শ্রমণ!

—তাঁকে যা ইচ্ছা বলতে পারো আয়ুষ্মান—বুদ্ধের মুখে মৃদু হাসি।

—তাহলে তাঁকে দিগ্‌ভ্রান্ত, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, দাম্ভিক, বাতুল, উন্মাদ বলি। উন্মাদ শ্রমণ।

আরও কিছু চীবরধারী আশেপাশে ছিলেন, তাঁরা ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন, কাকে কী বলছেন? কাকে কী বলছেন? ধিক, ধিক আপনাকে।

গৌতম বললেন—বলতে দাও। যখন কোনও ব্যক্তি কাউকে কিছু দেয় এবং প্রথম ব্যক্তি তা গ্রহণ করে না, তখন দত্ত বস্তুগুলি কী হয়?

ভিক্ষুরা বলে উঠলেন—দাতার কাছে ফিরে যায় ভন্তে।

—ভালো, ওই তিরস্কারগুলি আমি গ্রহণ করিনি। ওগুলি কাত্যায়নের কাছেই ফিরে গেল।

তিনি দৃঢ়পায়ে স্থানত্যাগ করতে উদ্যত হলেন।

চণক বললেন—চলে যাবার আগে শুনে যান শ্রমণ, আপনি বাসনার কণ্ঠরোধ করার নামে প্রণয়কে হত্যা করছেন। দুর্বলতা, ভীরুতা, অসংযম এগুলিকে শক্তি, সাহস ও সংযমে পরিণত করতে সাহায্য করছেন না। শেষ অবধি কতকগুলি নপুংসক সৃষ্টি করে যাচ্ছেন সমাজে। যে সমাজ সুস্থ বাসনার বেগ ধারণ করতে পারে না, স্বাভাবিক বীর্যপাতকে যে বজ্রপাত মনে করতে শেখে, নারীকে কামের উপকরণ বলে ভাবে, এবং ভিক্ষাজীবীকে সম্মান করতে বাধ্য হয় সে সমাজ কীটদষ্ট বটবৃক্ষের মতো আমূল উৎপাটিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি জানেন না, আপনিই সেই শক্তিশালী কীট। বটবৃক্ষরূপী জম্বুদ্বীপের বর্তমান, তার ভবিষ্যৎ শাণিত দন্তে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করছেন।

—ক্ষান্ত হও চণক, ক্ষান্ত হও।

বোধিকুমার দেখল একটি দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ যুবক এসে চণককে দুহাতে সংবৃত করছে।

চণক একেবারে অবাক হয়ে দুহাতে ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে ধরলেন—অনঘ। সখা অনঘ, এতকাল পরে? কোথা থেকে?

যুবকটির বীরপুরুষের মতো আকৃতি। কটিবন্ধ থেকে কোষবদ্ধ অসি ঝুলছে। তিনি বললেন, সেসব কথা পরে হবে, এখন এসো এই মৃতদেহের সৎকার করি। আপনারা এখানে যাঁরা আছেন, এই অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে পারেন।

অনেকেই স্থানত্যাগ করল। রয়ে গেল বোধিকুমার স্বয়ং এবং সে বিস্মিত হয়ে দেখল আরও দু'চার জনের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং রাজসচিব বর্ষকার ও সুনীথ এবং কুমার বিমল।

চিতায় অগ্নিসংযোগ করবার পর, আগুন তখন ধুধু করে লেলিহান শিখায় ওপর দিকে উঠছে, বোধিকুমার দেখল কুমার বিমল কৌণ্ডিল্য শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অগ্নিশিখার দিকে।

বর্ষকার বললেন—দৈবরাত ঠিকই বলেছেন। কী বলেন কুমার?

বিমল কোনও উত্তর দিলেন না।

বর্ষকার আবারও বললেন—কিন্তু সমন গৌতম যা-ই করে থাকুন, মহারাজের অনুমতি ছাড়া তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেননি। প্রকৃতপক্ষে... অর্থাৎ বুঝলেন কুমার, বুঝলেন কবি মহারাজের ওপর এই ভ্রমণের প্রভাব... উঁহুঃ বর্ষকার মাথা নাড়তে থাকলেন।

সুনীথ বললেন—অমাত্যবর, রাজনটীদের রক্ষার দায় রাজার, তারাও রাজাকে উপার্জনের অংশ করস্বরূপ দিয়ে থাকে। এখন সে মারা গেলে তার শেষকৃত্য তো রাজাদেশেই সুসম্পন্ন হওয়ার কথা। এটি একটি রাজকর্তব্য। এই অনাথার প্রকৃত নাথ তো রাজাই।

বিমল ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে বললেন—এই-ই নটীর ভাগ্য। কোন দুর্ভাগিনী মায়ের কোলে জন্ম নিয়েছিল। যখন উৎসবমুখর থাকে সভাগুলি, বহুজনের শংসা, সাধু সাধু রব, মৃদঙ্গের ধ্বনি, বংশীর গীত, নূপুরের নিক্বণ... সকল সৌন্দর্যের যেন আপনভূমি, তখন কি সে ভেবেছিল ? ভেবেছিল এরূপ হবে।

কথাগুলি যেন কুমার আত্মগত বলছেন। বোধিকুমার ভিন্ন আর কেউ সম্ভবত শুনতে পায়নি। কুমার মৃদুস্বরে কথাগুলি বলতে বলতে থেমে গেলেন। ওদিকে দুই অমাত্য এবং আরও কয়েকজনের মধ্যে মৃদুস্বরে হলেও প্রবল তর্ক চলছে। চণক বসে আছেন একটি শিলাখণ্ডে, পাশে তাঁর সখা অনঘ।

বিমলকে মাঝে মাঝে শ্রীমতীর সঙ্গীতসভায় দেখেছে বোধিকুমার। কিন্তু তিনি কি শ্রীমতীর প্রণয়ী ছিলেন ? উনি বৈশালীর নগরশ্রী অম্বপালীর পুত্র বলে একটি রটনা আছে রাজগৃহে। মহারাজ বিম্বিসারের ঔরসে। কত দূর সত্য কে জানে !

শবদাহক বলল—আপনারা কি গঙ্গানীর দিয়ে চিতা নেভাবেন ? তাহলে এক্ষুনি যাওয়া প্রয়োজন। গঙ্গা থেকে রাজগৃহের দিকে যে নালিকা কাটা হয়েছে তার জল হলেই চলবে।

চণক উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—চিত্তক অতি দ্রুত যায়। আমি যাচ্ছি।

কুমার বিমল বললেন—আমার রথটি যাবে আরও দ্রুত। যদি কেউ সঙ্গে আসেন। তিনি বোধিকুমারের দিকে তাকালেন।

বর্ষকার বললেন—সেই ভালো।

চিতা তখন নিভে এসেছে। একটা গরম বাষ্প উঠছে তা থেকে। সেই বাষ্পে দৈবরাত চণকের মুখটি শুষ্ক, শোকার্ত দেখায়। সূর্য ঢলে পড়েছে। বোধিকুমার মৃৎকলসটি চণকের হাতে তুলে দিল।

চিতায় জল ছিটোতে ছিটোতে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন চণক। তারপর শ্মশানের পার্শ্ববর্তী সরোবরে স্নানে নামলেন সবাই।

অমাত্য বর্ষকার একটা ডুব দিয়ে উঠে বললেন—কবি, কুমার কোথায় ?

বোধিকুমার তার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় স্তব্ধ হয়ে ছিল। এখন যেন স্বরকে তার আবিষ্কার করতে হল। কয়েকবার চেষ্টা করবার পর সে সফল হল। বলল—কুমার গন্তব্যে পৌঁছে আমাকে জল নিয়ে ফিরে যাবার কথা বললেন। বললেন—তিনি আর ফিরবেন না। বৈশালী যাবেন, গঙ্গার অভিমুখে চলে গেলেন কুমার।

—বলেন কী ? অমাত্য সুনীথ বললেন।

—হ্যাঁ আশ্চর্য। পথে যেতে যেতে কুমার বলছিলেন—সব তর্ক, সব বাদ প্রতিবাদের ঊর্ধ্বে জেগে আছে অবমাননাময় ক্লিন্ন এই মৃত্যুর সত্য। এই ভবিতব্য যেন তাঁর না হয়। কখনও তাঁর না হয়।

—কার কথা বলছিলেন কুমার ? নিজের কথা ?

—না। বোধহয় দেবী অম্বপালীর কথা।

সকলে নীরব হয়ে গেলেন।

সিক্ত বসন নিংড়োতে নিংড়োতে চণক চিত্তকের কাছে এসে পৌঁছলেন, অশ্বগুলি সবই একস্থানে রক্ষিত। যে যার অশ্বে উঠবেন এবার।

—চণক বললেন—কবি, আমার পুত্র কোথায় ?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—পুত্র তো নয় দৈবরাত, কন্যা।

—কন্যা ? চণক থমকে দাঁড়ালেন। একটু পরে বললেন—সে কোথায় ?

—কী করবেন জেনে ? সে তো আপনার কোনও কাজে লাগবে না!

—এতকাল পরে আমায় এই বুঝলেন কবি! চণক কি শুধু প্রয়োজনের কথাই ভাবে ? আর কিছু নেই! তাঁর কণ্ঠস্বর যেন আর্তের।

বোধিকুমার বলল—তা নয় দৈবরাত, প্রয়োজনই শুধু নয়, আপনার যে আছে মহান কর্তব্য, কন্যাটিকে গ্রহণ করবার কথাও তো আপনি বলেননি! পুত্রের কথাই বলেছিলেন, তাই...

—কন্যাটিকে কি আপনি লালন করতে চান ? চণকের কণ্ঠ এখন অনেক শান্ত।

—সে সুযোগ শ্রীমতী আমায় দেয়নি দৈবরাত। কন্যাটিকে সে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছে। মহিষী কোশলকুমারীর প্রাসাদে বড় হচ্ছে সে। চণকভদ্র শ্রীমতী তার পিতৃপরিচয় দেয়নি। আমি আপনার সব কথা তাকে বলেছিলাম, তবুও না। সে আপনাকে কন্যার পিতা বলে স্বীকারও করেনি। ওই কন্যাকে আমি দেখিনি ভদ্র, শুনেছি সে মাতৃমুখী। কোশলদেবী তারও নাম রেখেছেন শ্রীমতী।

তখনও অপরাহ্ণ হয়নি। দু'জনেই দেখলেন শ্মশানবৃক্ষগুলির শাখায় শাখায় একে একে শকুন এসে নামছে।

১৮

ক্রমে রাজগৃহে সন্ধ্যা নামে। রাত্রি নামে। রজনীর যামগুলি একে একে পার হতে থাকে। চণকের চোখে কোনদিনই ঘুম আসে না। পাশের শয্যায় সখা অনঘ ঘুমে অচেতন। দীর্ঘ দিন শাক্যপুত্রীয় সংঘে বিনয় পালন করে অনঘ শিখেছে কী ভাবে চিত্তকে সংযত, একাগ্র, উদাসীন রাখতে হয়। শাক্য মুনির গুণগ্রামে সে অভিভূত। শুধু স্বীকার করে একটি বিশেষ কর্মভার নিয়ে একদিন সে বেরিয়েছিল। তার স্বদেশের ভাগ্য ছিল তাতে জড়িত। সেই কর্ম ফেলে রেখে শ্রমণসংঘে যোগ দেওয়া তার অনুচিত হয়েছিল। চণকের কাছে বারবার সে অনুতাপ প্রকাশ করেছে। কিন্তু যা শিখেছে, যা জেনেছে তা নিয়ে তার আনন্দের অবধি নেই। তাই শয্যায় শোয়ামাত্র নিদ্রায় সে অভিভূত হয়ে যায়। বাঁদিকে পাশ ফিরে হাতের ওপর মাথা রেখে উপাধান বিনা সে শুয়ে থাকে। প্রশান্ত মুখ, সহসা দেখলে মনে হয় সে চোখ দুটি বন্ধ করে শুয়ে আছে মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সুষুপ্ত। চণক পদচারণা করতে করতে ভাবেন আপন চিত্তের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্বের যার অবসান হয়েছে সে-ই একমাত্র এমন নিদ্রায় নিদ্রিত থাকতে পারে। চণক পারছেন না। শুধু আজ বলে নয়, যৌবনোন্মেষের সময় থেকেই অদ্ভুত সব শক্তিশালী চিন্তা, স্বপ্ন, কল্পনা তাঁকে জাগিয়ে রেখেছে। মধ্যরাত্রে সহসা ঘুম ভেঙে যেত কতদিন। কোনও ভাব, কোনও সমস্যা তার সমাধান, একেবারে চিত্রের মতো ভেসে উঠত, মনে হত যেন কেউ তাঁর ভেতরে বসে সমস্যাগুলির সমাধান করছে, চিত্রগুলি লিখছে, ভাবগুলি উদিত করে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। প্রথম যৌবনে মনে হত কেউ, কোনও দেবতা তাঁকে ভর করেছেন। তাঁর ভেতরে বসবাস করছেন। এখন, বহু অভিজ্ঞতার পর তিনি বুঝেছেন না, কোনও দেবতা নয়। তাঁর চিত্তের মধ্যে আরও একটি চিত্ত আছে। সদাসতর্ক। বহিশ্চিত্তের দৃষ্টিতে যা এড়িয়ে যায় এই অন্তশ্চিত্ত তাকেও দেখে, তার ক্ষমতা অসীম, বাড়ালেই বাড়ে। চণকের গভীর, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের মূলে তাঁর এই অন্তশ্চিত্তের প্রতি আস্থা। কিন্তু সম্প্রতি, অতি সম্প্রতি সেই আস্থা টলেছে। তিনি উপলব্ধি করছেন বাইরের ঘটনাবলীকে তাঁর চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না সবসময়ে যতই চেষ্টা করুন, আর দ্বিতীয়ত যেটি আরও ভয়াবহ, তাঁর অন্তশ্চিত্তও ভুল করে। তিনি অস্থিরও হন। আজ যে দ্বন্দ্ব যে সমস্যা তাঁর সামনে তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না কী ভাবে তার সম্মুখীন হবেন।

প্রাসাদ থেকে ভেরীঘোষ ভেসে এলো। শেষ যাম রজনীর। অস্থির চণক দ্রুত পদে গান্ধার ভবনের পেছনের দ্বার খুললেন গিয়ে। অন্ধকারে কয়েকটি ছায়ামূর্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে নিঃশব্দে ঢুকে এলো।

গম্ভীর কণ্ঠে একটি মূর্তি বলল-একেবারে অভ্যন্তরে, সোমার কক্ষে নিয়ে চলুন আর্য।

চণকের পেছন পেছন অন্তঃপুরের শেষ কক্ষটিতে পৌঁছলেন সবাই। পরিত্যক্ত কক্ষ। নাগদন্ত থেকে একটি ছেঁড়া-তার বীণা ঝুলছে। শয্যার ওপর চিত্রময় একটি আস্তরণ। রাত্রে শুতে যাবার আগে একটি আচ্ছাদন হর্ম্যতলে বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অতিথিরা তার ওপরে বসলেন, শুধু কর্কশ কণ্ঠ-বিশিষ্ট ব্যক্তি বসলেন গিয়ে একেবারে জিতসোমার শয্যার ওপরে।

চণক একবার কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। অনঘ উঠে এসেছে।

—আসুন আসুন মহামান্য গান্ধার—বলে উঠলেন শয্যায় উপবিষ্ট ব্যক্তি।

চণক দ্রুত গিয়ে দ্বার বন্ধ করে দিলেন।

বর্ষকার বললেন এবার আমাদের আলোচনা আরম্ভ হতে পারে কুমার।

শয্যায় উপবিষ্ট ব্যক্তিই কুমার কুনিয়। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঈষৎ হেসে বললেন আলোচনার তেমন কিছু তো নেই। মগধ কোনদিন আর সাম্রাজ্য হবে না। মগধের রাজাও সম্রাট, রাজচক্রবর্তী হবেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে ভীরু। উত্তরে শক্তিশালী রাজ্য সব, বিশেষত বৈশালীর কাছে তিনি একপ্রকার পরাজিতই হয়েছেন। লিচ্ছবিরা নানা প্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা নেন, আমাদের রাজা দেখেও দেখেন না, শ্বশুর কুল তো! কী, আমি কি সত্য বলেছি শ্রেষ্ঠী অহিপারক।

অহিপারক শুধু মাথা নাড়লেন।

বিশদই বলুন না, ভয় কী? বর্ষকার বললেন

বিশদ আর কী বলব দৈবরাত, গান্ধার অনঘ, বৈশালী আর মগধের সীমানায় একটি রত্নখনি আছে। পূর্বে তার উৎপাদন মগধও কিছু পেত। যত দিন যাচ্ছে, সুকৌশলে লিচ্ছবিরা রত্নখনির চারপাশে পাহারা বসাচ্ছে। মাগধ বণিকরা আর সেখানে যাতায়াত করতে পারেন না। আমাদের গোষ্ঠী থেকেই এ অভিযোগ এসেছে। শ্রেষ্ঠীবর যোতীয় জানেন।

চণক ধীরে ধীরে বললেন—মহারাজকে জানিয়েছিলেন?

—কতবার।

—ফল হয়নি?

—না।

—ভালো, আমাকে কী করতে বলেন? —চণক জিজ্ঞেস করলেন।

কুমার কুনিয় পদচারণা করছিলেন, থেমে গিয়ে বললেন— আপনি কী করবেন তা পরে স্থির হবে দৈবরাত। এখন বলুন তো! সমগ্র জম্বুদ্বীপ জুড়ে এক সাম্রাজ্য, এক রাজচক্রবর্তীর মহৎ কল্পনা নিয়েই কি আপনি আসেননি?

—এসেছিলাম কুমার!

জানবেন, মহারাজের এখন যা মতিগতি তাতে তার আর আশা নেই। এখন বলুন নটী শ্রীমতীর মৃতদেহ দশ দিন যাবৎ সৎকার না করে ফেলে রাখা— এ আপনি সমর্থন করতে পেরেছেন?

—পারিনি—কঠিন মুখ চণকের।

গৌতম বুদ্ধ নামে শাক্য রাজকুমার স্বরাজ্য ছেড়ে এখন সমস্ত রাজ্যের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করবার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। সিংহাসনে বসতে তিনি চান না। কিন্তু হতে চান রাজদণ্ডের নিয়ামক। সত্য কি না?

এই সময়ে অনঘ বলে উঠলেন—আমি তথাগতর ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এরূপ কোনও অভিপ্রায় তাঁর আছে বলে আমার মনে হয়নি। তিনি মহাত্মা।

—তিনি যে মহাত্মা তাতে আমাদের সন্দেহ নেই, বর্ষকার তাড়াতাড়ি বললেন, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না গান্ধার, কিন্তু মহাত্মারাও সর্বদর্শী হন না, অথচ নিজেদের সর্বদর্শী ভেবে থাকেন। রাজকার্যে অনর্থক বাধার সৃষ্টি করে মগধরাজ্যকে গৌতম বুদ্ধ একটি মহা সঙ্কটে ফেলে দিয়েছেন। রাজগৃহ তো আর তাঁর সঙ্ঘ নয় যে সমগ্র রাজগৃহকে তার রাজা-প্রজা সহ তিনি বিনয় পালন করাবেন!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তিনি কি তাই করছেন ?

—তা ছাড়া কী, গান্ধার ? বৈশালীর স্পর্ধা চূর্ণ করবার জন্য মহারাজের যদিও বা একেকবার ইচ্ছা জাগে, ইনি তাঁর কানে মন্ত্র দেন— বৈশালী অপরাজেয়। বৈশালী সংঘবদ্ধ, তাই অপরাজেয়। রাজ্যে যক্ষ-রক্ষের উপদ্রব হলে আগে এদের মুণ্ড কেটে বনপথে বর্শায় গেঁথে রাখা হত, আর এখন ? ইনি তাদের রক্ষা করেন। সবচেয়ে ভয়ের কথা মহারাজ শাস্তি দিতে উদ্যত সেই সময়ে সেই উত্তোলিত হাত ইনি ধরে ফেলেন। এতে রাজার মর্যাদা নষ্ট হয়, সাধারণের আস্থা নষ্ট হয়।

চণক ধীর কণ্ঠে বললেন— বন্যদের সঙ্গে গৌতমের নির্দেশে মহারাজ যে নীতি মেনে চলছেন তাতে উপকার হয়নি কোনও ?

—উপকার ? ব্যাঘ্রের গুহায় আপনি প্রবেশ করে বসবাস করতে আরম্ভ করলে ব্যাঘ্র আপনাকে ছেড়ে দেবে ভদ্র ? সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হল শক্তিপ্রকাশ, রক্তপাত, আস্ফালন এগুলি করতেই হবে দৈবরাত। পৃথিবী মহর্ষিদের তপোবন নয় যে এখানে 'মা-মা হিংসী' বললেই সব হিংসা থেমে যাবে। আর তপোবনও যে সংগ্রামের হাত থেকে পুরো মুক্ত নয়, সে কথা আপনি ভালোই জানেন। প্রকৃত কথা সাম্রাজ্য স্থাপন। কেন ? কোনও ব্যক্তি বা বংশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কী ? না, তা নয়। সাধারণ অস্ত্রহীন মানুষ, উৎপাদক, বণিক, দাস, ভূস্বামী সবাই, সবাই নিরাপদে থাকবে বলে, দেশ সুরক্ষিত হবে বলে— উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু তার জন্য প্রথমে কঠোর হতেই হয়। দৈবরাত আপনারও কি এরূপ মত ছিল না ?

চণক একটু ইতস্তত করে প্রশ্নটি সামান্য এড়িয়ে বললেন— মৈত্রীর মধ্য দিয়ে, দান, সহমর্মিতা ও কল্যাণকর্মের মধ্য দিয়েও যে রাজ্যবিস্তার এবং সংহতি হয় না এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু মহামান্য সচিব যে বলছেন কোনও ব্যক্তি বা বংশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাম্রাজ্য নয়, তিনি কি বলতে পারেন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে ক্রমশই তা ব্যক্তির ও বংশের হয়ে যাবে না ?

—তার জন্য মন্ত্রিপরিষদ চাই। —সুনীথ এতক্ষণে বললেন।

—মন্ত্রি-পরিষদের যথেষ্ট ক্ষমতা চাই—বর্ষকার বললেন।

—কী হবে এই সকল কথা আলোচনা করে ? রক্ত বসনাবৃত মুখ প্রকাশ করলেন এক বয়স্ক শ্রমণ। কক্ষের অন্ধকারতম কোনটিতে এতক্ষণ বসেছিলেন ইনি।

চণক অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর অতিথিরা সকলেই রাজপুরুষ। এই দলে একটি শ্রমণ আছেন এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। তাঁর বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ল কুমার কুনিয়র রথের ভেতরে সেই শ্রমণের কথা। তিনিই কি ইনি ?

শ্রমণ কৃশকায়, দীর্ঘদেহ, চক্ষুদুটি কোটরাগত। সুগৌর বর্ণ। কুমার কুনিয় সম্ভবত চণকের বিস্ময় লক্ষ্য করেছিলেন। বলে উঠলেন— দৈবরাত, ইনি ভগবান দেবদত্ত, ইনিই প্রকৃত বুদ্ধ।

মহাসচিব বর্ষকার ভিন্ন দিকে তাকিয়ে রইলেন, সুনীথ মাথা নিচু করেছেন। প্রকৃত বুদ্ধ ? রজনীর শেষ যামে কয়েকজন রাজপুরুষের সঙ্গে একজন বিদেশীর গৃহে এসেছেন মন্ত্রণা করতে ? মন্ত্রণা না ষড়যন্ত্র ?

তাঁর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল শ্রমণ দেবদত্তের কণ্ঠস্বরে।

—গৌতমকে আমি শিশুকাল থেকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। সে অতিশয় ক্ষমতালিপ্সু। রাজা তো অনেকেই হয়। সেও হতে পারত গণরাজ। হয়ত শাক্যরা সবাই তাকে মেনে নিত। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা আরও অনেক উচ্চে। সে রাজাদের নিয়ন্তা হতে চায়। তার অঙ্গুলিহেলনে চলবে কোশল, বৎস, মথুরা, কুরুদেশ, মগধ—সব, সব। সঙ্ঘের মধ্যে যেভাবে সকলকে দমিত করে রেখেছে, সেইভাবেই সারা জম্বুদ্বীপের রাজপুরুষদের ওপর সে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাপাতে চায়।

দেবদত্ত একটু থামলেন, কেউ কোনও কথা বলছে না। তথাগত বুদ্ধের কার্যাবলীর এই জাতীয় একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে কেউ সম্ভবত ভাবেনি।

দেবদত্ত চারদিকে একবার তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন— আমি তোমাদের আরও কয়েকটি কথা বলব, ধৈর্য ধরে শোনো। তোমাদের মনে হয়ত আমাদের সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন জাগছে। মনে হতে পারে আমি গৌতমের প্রতি ঈর্ষায় এসব করছি। ঈর্ষা কিন্তু নয়। গৌতমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহন্তা যে কতদূর সর্বনাশা হতে পারে আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী, জীবন দিয়েও আমি তার কুফল রোধ করব এই আমার প্রতিজ্ঞা। সমগ্র শাক্যকুলকে সে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। কত শত শাক্যরমণী যে মর্মবেদনায় মৃত্যুবরণ করেছে, আরও কত যে উপায়ান্তর না দেখে সংঘে প্রবেশ করেছে এবং আরও কত যে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছে তা তোমাদের বোঝাতে পারবো না। এখন যে শাক্যপ্রধান সেই মহানামা তো গৌতমের নাম শুনলে জ্বলে যায়। তাকে শতাধিক অনাথা রমণী প্রতিপালন করতে হচ্ছে।

দেবদত্ত আবার থামলেন, বললেন—ভেবো না, শাক্য-কোলীয়দের হয়ে প্রতিহিংসা সাধন করতে আমি গৌতমের শত্রুতা করছি। শাক্যদের উদাহরণ দিলাম শুধুমাত্র বোঝাতে গৌতমের শক্তি কী রূপ। সে ইচ্ছা করলে এই সমগ্র জম্বুদ্বীপ শুধু তার নিবৃত্তির তত্ত্ব দিয়েই শ্মশান করতে নিতে পারে।

অনঘ বলে উঠলেন— কিন্তু ভন্তে এ কথা কি সত্য নয় যে অন্যান্য শাক্যকুমার যেমন ভগু, কিম্বিল, ভদ্দিয় এঁদের সঙ্গে আপনি স্বেচ্ছায় এসে সংঘের শরণ নিয়েছিলেন।

—নিয়েছিলাম আয়ুষ্মান। গৌতমের প্রভাব কি সামান্য মনে করো ? সে সময়ে শাক্য রাজ্যে প্রতি গৃহ থেকে একজন অন্তত প্রব্রজ্যা না নিলে লোকে তাকে নিয়ে উপহাস করত। আমি প্রব্রজ্যা নিই, কঠোর সাধনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করি, তারপর জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হল— সব কিছু পরিষ্কার দেখলাম, বুঝলাম।

—কী বুঝলেন, আমাদের যদি একটু বলেন ভালো করে... কুনিয় বলল।

—কুমার বুঝলাম সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী আর গৃহীর পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ + সম্পূর্ণ। সন্ন্যাসী কখনও অর্ধগৃহী হবেন না। এই যে সব বিশাল বিশাল বিহার নির্মিত হচ্ছে, সর্বশ্রেণীর মানুষ সে চণ্ডাল হোক, পুক্কুশ হোক, সংঘভুক্ত হচ্ছে, রোগ-ব্যাধির নাশ করে তিন তলিকা পাদুকা পরা হচ্ছে, মধু, ঘৃত, পায়স, গৃহস্থের গৃহে অন্নভোগ মৎস্য মাংস সহযোগে, এ সকল কি অর্ধগৃহীত্ব নয় ? সন্ন্যাসী হতে চাও পূর্ণ সন্ন্যাসী হও, আর নইলে পূর্ণ গৃহী। গৃহীর সামাজিক দায়িত্ব কি অল্প ? প্রকৃতপক্ষে তা সন্ন্যাসীর চেয়ে অনেক অধিক। গৃহীই সমাজকে, পৃথিবীকে রাখে। সেই গৃহীরা যে সন্ন্যাসীর লবণ ও অন্নতৃষ্ণা মেটায়, তাকে প্রয়োজনে রক্ষা করে এই-ই তো অনেক। এর ওপরে এ কানন দাও, ও কানন দাও, বিহার গড়ো, নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করো, এ সকল কি ভালো ? আমি একজন অর্হন, জীবন্মুক্ত পুরুষ—আমি বলছি ভালো নয়, এ কখনও কল্যাণকর হতে পারে না।

ঘরটি অর্হন দেবদত্তর কণ্ঠস্বরে গমগম করতে লাগল। কেউ কোনও কথাই বলতে পারলেন না।

অনেকক্ষণ পরে অনঘ বললেন : কিন্তু ভগবন, আপনি এক নতুন দৃষ্টিতে বুদ্ধবাণীর ব্যাখ্যা করলেও ওঁর নিজের দিক থেকে উনি একে বলছেন মঝ্‌ঝিম পন্থা।

তিক্তস্বরে অর্হন দেবদত্ত বললেন হ্যাঁ। গৃহীর দায়িত্বও পালন করতে হবে না। সন্ন্যাসীর করণীয়ও করতে হবে না। গৃহীর সুখও রইল, সন্ন্যাসীর সুখও রইল। আমি অর্হন দেবদত্ত বিহারে থাকি। তা শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে শীতল, কেন না শ্রেষ্ঠ স্থপতিরা রাজাদেশে তা প্রস্তুত করেছেন। নামমাত্র ভিক্ষায় বেরোই একেক দিন, গৃহস্থ আমাকে দেখলেই তটস্থ হয়ে তার সেদিনের শ্রেষ্ঠ ব্যঞ্জনাদি তা আমার পাত্রে ঢেলে দেয়, আমি নির্জন বৃক্ষতলে বসে আহার সমাধা করি, অন্য কোনও গৃহস্থ আমাকে নিমন্ত্রণ করে শুধু ষোড়শ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোজনই করায় না, উপরন্তু উপহার দেয়। রেশমের কাষায়বস্ত্র অতি সুখস্পর্শ, কোমল কার্পাসিক পাদুকা, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ভিক্ষাপাত্র, সম্প্রতি স্বর্ণ-রৌপ্যও দিচ্ছে, সংঘ গ্রহণ করছে। সংঘের কোষাগার প্রস্তুত হচ্ছে। অর্থাৎ কোনও কর্ম না করেই, না সন্তান পালন, না জনক-জননী আদি পূর্বজ, ভার্যা প্রভৃতি প্রতিপালনীয়াগণের, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সুহৃৎ গণের প্রতি কোনও কর্তব্য, রাজাকে কর না দিয়ে, বণিককে পণ্যের অর্থমূল্য, দাসকে আরক্ষা না দিয়েই সর্বপ্রকার গৃহসুখ পাচ্ছি। মঝ্‌ঝিম পন্থাই বটে।

অর্হন দেবদত্তর তিক্তভাষণে সবাই অনেকক্ষণ চিন্তিত, স্তব্ধ হয়ে রইল।

—শ্রমণ গৌতম কোনও কোনও বিচারে ভুল করেন— চণক অবশেষে বললেন—কিন্তু তাঁকে, অর্থাৎ তাঁর কার্যকলাপকে আমি ঠিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা অভিসন্ধিমূলক বলে ভাবতে পারছি না।

—তাহলে উনি বজ্জিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে মহারাজকে বাধা দিচ্ছেন কেন ? কুনিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল।

—কেন ? আপনার কী মনে হয় কুমার ? চণক জিজ্ঞেস করলেন।

—বজ্জি, মল্ল শাক্য এরা সবাই গণরাজ্য। নিজে শাক্য বলে, গণরাজ্যের সন্তান বলে, শ্রমণ গৌতমের সহানুভূতিও পরিপূর্ণ এদের পক্ষে। বজ্জিরা স্বাধীন, মল্লরা হৃতগৌরব, তবু একপ্রকার স্বাধীনই, শাক্যরা নামেমাত্র কোসলের প্রজা, কার্যত স্বাধীন। উনি চান এই গণরাজ্যগুলি ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠুক, মগধ সাম্রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত না হোক। বজ্জিরা যে কোনও দিন মগধ আক্রমণ করতে পারে দৈবরাত, তখন শ্রমণ গৌতম মহারাজের কানে মন্ত্র দেবেন, বজ্জিরা সংঘবদ্ধ, তারা অপরাজেয়। মহারাজের মনোবল ভেঙে যাবে। রাজনীতির এইসব কূটকৌশল, শত হলেও আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি বোঝেন না।

বর্ষকার হাঁ হাঁ করে উঠলেন— এ কথা বলবেন না কুমার, ব্রাহ্মণরাই চিরকাল রাজসচিবের কাজ করে এসেছে, রাজনীতি ও বার্তা নিয়ে তত্ত্ব রচনা করেছেন যাঁরা, তাঁরাও ব্রাহ্মণ।

কুমার কুনিয় বলল— দৈবরাত যদি আমার কথায় আঘাত পেয়ে থাকেন, আমি মার্জনা চাইছি। তিনি তো আমার পিতৃবন্ধুও। আবার বয়সে তিনি পিতার চেয়ে অনেক ছোট। আমার পিতৃব্য হলেন। তাই না ? আমি মগধ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হয়েছি। ভগবান দেবদত্ত ক্ষত্রিয়, তাই রাজ্যরহস্য জানেন আবার প্রব্রজিত, তাই সন্ন্যাসরহস্যও জানেন। বাইরে থেকে আমরা সন্ন্যাসী দেখেই ভক্তিতে নত হয়ে পড়ি। কিন্তু সন্ন্যাসী হলেই তিনি সকল ভ্রমের ঊর্ধ্বে, প্রলোভনের ঊর্ধ্বে হন না, স্বভাবতই সমালোচনাও তাঁকে শুনতে হবে।

চণক বললেন— না। শ্রমণ গৌতমের কার্যকলাপের পেছনে কোনও স্বার্থপর অভিসন্ধি আছে, এমন মনে করা ভুল কুমার। নূতন কোনও তত্ত্বকে আমরা সহসা গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের সংস্কার তাতে বাধা দেয়। ইনি রাজনীতির ব্যাপারে একটি নূতন তত্ত্ব এনেছেন। মৈত্রী তত্ত্ব শুনতে সহজ, রূপ দিতে সহজ নয়। আবার যতটা কঠিন মনে করছি, ততটা কঠিনও না। শুধু বজ্জি, মল্ল, শাক্য নয় উনি সমগ্র জম্বুদ্বীপকে মৈত্রীবদ্ধ হতে বলছেন। রাজা প্রজা, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজশক্তি—সবাইকে। হয়ত উনি ঠিক এভাবে বলেননি, কিন্তু ওঁর সার্বিক তত্ত্ব থেকে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক এইটুকুই। পারস্পরিক বিপদ ভুলে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে স্থিত থেকে সংঘবদ্ধ হওয়া।

দেবদত্ত বললেন— আয়ুষ্মান, তোমার সঙ্গে না গতকল্যই তার তুমুল বিবাদ হয়েছিল। নটীর অন্তিম সৎকার বন্ধ করা নিয়ে ? তুমি এরূপ গৌতমের পক্ষ নিয়ে কথা বলছো ?

চণক ধীরে ধীরে বললেন— আমি তাত্ত্বিক। তত্ত্বের প্রয়োগও কিছু কিছু করে থাকি। তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে একদেশদর্শিতা থাকে না। বিবাদ ঘটেছিল, বিবাদের কারণ ছিল বলে, তার অর্থ এই নয় যে....

কুমার বলে উঠল.— আপনি ভগবান দেবদত্তকে অপমান করছেন দৈবরাত। আপনি প্রয়োগকুশল পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু তিনি অর্হন।

চণক একটা দুর্বোধ্য হাসি হাসলেন। তারপরে দেবদত্তের দিকে ফিরে বললেন— আমার উক্তি কি আপনাকে কোনও কোমল স্থানে স্পর্শ করল নাকি ভন্তে !

রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই চলে গেলেন পাঁচ আগন্তুক।

সহসা অনঘর দিকে ফিরে চণক বললেন— সখা অনঘ, তুমি কি জানো, দেবী দেবদত্তার কন্যা জিতসোমা এই নগরীতেই আছে।

অনঘ আশ্চর্য হয়ে বলল— জিতসোমা ! এখানে ? কী বলছো সখা !

—তুমি গান্ধারী নটী সোমার নাম শোন নি ? শোননি এই গান্ধার ভবনে সোমা থাকত এক সময়ে ! আজ আমরা যে কক্ষে বসে মন্ত্রণা করলাম, সে কক্ষ জিতসোমার, ওই বীণা, এই শয্যা জিতসোমার।

অনঘ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন— নটী সোমার নাম শুনেছি, শুনেছি গান্ধারভবনে তোমাকে দেখাশোনা করত সেই নটী পূর্বে। কিন্তু এই সোমা সেই জিতসোমা....এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অনঘ ক্ষণেক নীরব থেকে আবার মাথা নাড়লেন— না, না। স্বপ্নেও না।

চণক বললেন— এখন তো শুনলে। কী ভাবছো এখন ?

—কী বিষয়ে ? অনঘ কথা কটি বললেন সম্পূর্ণ অন্যমনে।

চণক বললেন—এ কথা কি সত্য নয় অনঘ যে, এত বৎসর পরে জিতসোমার স্মৃতিই তোমাকে সংঘ ত্যাগ করতে বাধ্য করল ?

—হয়ত তাই চণক। হয়ত নয়। তুমি যে অর্থে বলছো, সে অর্থে নয় অন্তত।

— যে অর্থেই হোক অনঘ, তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি জিতসোমাকে মাগধ রাজনীতির এই জটিল আবর্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

—রাজনীতির জটিল আবর্ত ? কী বলছো চণক, ভালো করে বুঝিয়ে বলো।

—সোমা শুধু রাজনটী নয়, আমি যতদূর জানি, সে কিছু রাজকার্যও করে। ঘটনাচক্র যেদিকে চলেছে তাতে তার সে ভূমিকা আর গোপন থাকবার নয়। আজকে যাঁরা এসেছিলেন, বুঝলাম, তাঁরা কুমার কুনিয়কে সমর্থন করছেন। জিতসোমা, অমাত্য চন্দ্রকেতু এঁরা সমর্থন করছেন মহারাজকে। কুনিয় জিতসোমার প্রতি আসক্ত। তার বিশ্বাস মহারাজই তার প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী। সোমা বুঝতে পারছে না, রাজ্যলোভ, সেই সঙ্গে প্রণয়—উভয় মিলে কুনিয় অতি ভীষণ হয়ে উঠেছে। সোমা অতিশয় বিপন্ন। অনঘ সখা, দয়া করো। পূর্বকথা ভুলে যাও।

অনঘ মৃদুস্বরে বললেন— চণক, তুমি ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই জিতসোমার কোনও মঙ্গল বা অমঙ্গল করে। তুমি, তুমিই তাকে বাঁচাতে পারো।

চণক অব্যক্ত বেদনার ধ্বনি করে বললেন— তুমি তো জানো অনঘ, সে কীরূপ উগ্র অভিমানী, মর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন। সে আর আমার কথা শুনবে না। তুমি চেষ্টা করো অনঘ। এই ভয়ঙ্কর আবর্তের মধ্যে পড়ে সোমা না শূলবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দেয়।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন অনঘ। একটু পরে শান্ত হয়ে বললেন—চণক, চণক, সোমাকে রক্ষা করতে কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে ? কেনই বা তুমি আমাকে তার রক্ষার ভার দিতে চাইছো সব জেনে শুনে !

—সময়, অনঘ সময়। যখন জিতসোমা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারপর অনেক শুক্লপক্ষ অনেক কৃষ্ণপক্ষ এসেছে, গেছে অনঘ, হিমবন্তের শিখরে শিখরে মেঘরাজি কতবার তুষার হয়ে গলল, সিন্ধু গঙ্গা যমুনা, সদানীরার জল কতবার আমূল পরিবর্তত হয়ে গেছে, সোমা জানে না, সে কত বিপন্ন ! অনঘ তুমি একবার অন্তত চেষ্টা করো।

অনঘ নিঃশব্দে অন্যমনার মতো ভোরের কাননের দিকে চলে গেলেন। তাঁর মুখে বেদনার ছবি। চণক কিছুক্ষণ পদচারণা করতে লাগলেন। আজ যে পাঁচ আগন্তুক তাঁদের দুই গান্ধার যুবককে নিজেদের গুপ্ত মন্ত্রণায় স্থান দিল, তার কারণ কী ? তিনি প্রকাশ্যভাবে শ্রমণ গৌতমের বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তাঁকে কটু কথা শুনিয়েছেন তাই ? এবং অনঘ সংঘত্যাগ করে চলে এসেছে, তাই ? এ মূর্খদের একবারও মনে হল না, অনঘর সংঘত্যাগের পশ্চাতে গৌতম বিরাগ ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে ? একবারও মনে হল না, তিনি একটি ব্যাপারে গৌতমের সমালোচনা করেছেন বলেই অন্য ব্যাপারে না-ও করতে পারেন ! এই মূর্খতার কারণ কী ? ত্বরা। অতিশয় শীঘ্র কুমার একটা বিম্বিসার-বুদ্ধবিরোধী দল গড়তে চাইছে। কুনিয়ই কী ? না দেবদত্ত নামে ওই শ্রমণ ! বর্ষকার, সুনীথ ও শ্রেষ্ঠী অহিপারকের অবস্থান আরও জটিল। তাঁরা যতটা রাজার বিরুদ্ধে তার চেয়েও অধিক তাঁর বর্তমান নীতির বিরুদ্ধে। এবং গৌতমকে তাঁরা শ্রদ্ধা হয়ত করেন, রাজনীতিতে তাঁর হস্তক্ষেপ একেবারেই কল্যাণকর মনে করেন না। ইতিমধ্যে শ্রমণ গৌতম নামে ওই ব্যক্তি রাজনীতি, সমাজনীতি, সংঘনীতি কিছুই গ্রাহ্য করেন না। যা ভালো মনে করেন, তা যতই অদ্ভুত হোক, অপ্রচল হোক করেই ছাড়েন। সেদিন তিনি গৌতমকে কিছু কঠিন কথা শুনিয়েছিলেন, কী প্রতিক্রিয়া হল তাতে ওঁর ! ওগুলি নাকি তিনি গ্রহণ করেননি। অগৃহীত উপহার ওই গালিগুলি নাকি চণকের কাছেই ফিরে এসেছে। বা ! বা ! বা ! অতি অদ্ভুত কৌশল তো ! কী তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এই শ্রমণের, কী সংযম ! কী শক্তি দৈহিক এবং চারিত্রিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ চণক যেন চমকে উঠলেন। এই কি সেই ব্যক্তি নয়, যাঁকে তাঁর পিতা কাত্যায়ন দেবরাত এবং তিনি চণক সারাজীবন ধরে খুঁজে চলেছেন ? এই তো সে, যে সমগ্র জম্বুদ্বীপের আরক্ষা ও প্রতিপালনের ভার নিতে পারবে। এই সেই রাজচক্রবর্তী যার ছত্রতলে সব রাজা নিজেদের রাজদণ্ড স্বেচ্ছায় নামিয়ে রাখবে। বিনা সংগ্রামে, বিনা রক্তপাতে। ইনিই তিনি, যাঁর কান্তি দিব্য, ধৈর্য অসীম, বুদ্ধি অসামান্য, ভেদবুদ্ধি নেই, সংস্কার নেই, যে কোনও ঋষিবাক্যকে স্পর্ধা জানাতে পারেন। অসাধারণ ব্যক্তিমায়া। লোভ নেই, জিঘাংসা নেই, জুগুপ্সা নেই, অথচ বীরপুরুষ।

স এষ, সে-ই এই। চণক ছটফট করে উঠলেন। অথচ এক্ষুনি, এই মুহূর্তে তিনি মহারাজ বিম্বিসারের কাছেও যেতে পারেন না। যেতে পারেন না শাক্যমুনির কাছেও। কুমারের চর কি তাঁর ওপর লক্ষ রাখছে না ? মন্ত্রভেদ তিনি করবেন না, এমন কথা তাঁর কাছ থেকে এরা নেয়নি, সম্ভবত ভেবেছিল, নটী শ্রীমতীর কারণে তিনি চিরকালের মতো বিম্বিসারবিরোধী হয়ে গেছেন। কিন্তু এখন ? সব বিষয়ে তিনি বা তাঁরা যে এদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না, এতেই এরা সতর্ক হয়ে যাবে। অথচ, অথচ... অনঘ কই ? তিনি কাননের কোণে কোণে আনঘকে খুঁজলেন তারপর ফিরে এলেন গৃহে। না, গৃহেও সে নেই। কোথায় গেল অনঘ ? এখুনি, এই মুহূর্তে সোমার কাছে যাওয়া বিপজ্জনক। ভীষণ বিপজ্জনক। চণক দীর্ঘ কয়েকটি পদক্ষেপে মন্দুরায় পৌঁছে গেলেন। না, কোনও ঘোড়া নেয়নি অনঘ। তিনি এক লাফে চিত্তকের পিঠে চড়লেন। ভোরবেলা তিনি চিত্তকের পিঠে পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যান। চর থাকলে সে দেখুক। সন্দেহের কোনও কারণ ঘটবে না। পথে অবশ্যই অনঘকে পাবেন। পেতেই হবে। কিন্তু চণক অনঘকে কোথাও পেলেন না।

সেইদিনই গভীর রাতে অমাত্য চন্দ্রকেতু সংবাদ নিয়ে এলেন। অনঘ কারারুদ্ধ হয়েছেন। অপরাধ—চক্রান্ত। মগধরাজ্যের বিরুদ্ধে। আর নিয়ে এলেন মহারাজ বিম্বিসারের কাছ থেকে চণকের জন্য দণ্ডাজ্ঞা। নির্বাসন। রুরুবধের জন্যই কী ? হে চন্দ্রকেতু, সত্য বলো। সত্য বলো। গোপন করো না কিছু।

গভীর উদ্বেগে চন্দ্রকেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন চণক। তার পর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

AMARBOI.COM

১৯

তিন্দুক, আমার একটি কাজ করে দিতে পারবে ?

নিশ্চয়, মহামান্ন পাঞ্চাল, আপনি আমাদের যা বলবেন, তা-ই পালন করব।

শাক্য কর্ষক ভক্তি ও স্নেহভরে পাঞ্চালের দিকে চায়। এই যুবককে তারা ক দিনেই বড় ভালোবেসে ফেলেছে। বীরপুরুষ কিন্তু দম্ভ নেই। অন্যের জন্য নিজ প্রাণ বিপন্ন করেন। বিনিময়ে কিছু চান না। তুলনায় সাবত্থির রাজকুমারকে তাদের ভালো লাগেনি। সামান্যজনের থেকে দূরত্ব রেখে চলে কুমারটি, কারো দিকেই চায়ই না, যেন শক্রদেব স্বয়ংই বা এলেন। নিয়ে তো নিলি পাঞ্চালের জয় করা হাতিটা। ঈর্ষায় কেমন অস্থির-অস্থির করছিল শেষটা ? এ প্রসঙ্গ রাত্রে আগুন ঘিরে বসে তারা শাক্য-কর্ষকরা অনেকবার আলোচনা করেছে। পাঞ্চাল মহাপ্রাণ মানুষ। তবু, আঘাত লেগেছিল তাঁর। সেই আঘাতের প্রশম করতে তারা কদিন প্রাণপণ করেছে। সমাদরে ভরিয়ে দিয়েছে তাঁকে। তাদের যতদূর সাধ্য ! তবুও পাঞ্চাল গভীর রাত্রে টিলার ওপর একা বসে থাকতেন। আকাশের অগণিত তারাগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কাকে খুঁজতেন, কোন প্রশ্নের উত্তরও হয়ত খুঁজতেন। তারা দূর থেকে দেখত। কাছে যেতে সাহস হত না।

—একটি পত্র রাজগহে নিয়ে যেতে হবে তিন্দুক, মহারাজ বিম্বিসারকে পৌঁছে দিতে হবে।

—ওরে বাবা, মগধরাজ ! রাজা-রাজড়া কখনো যে দেখিনি পাঞ্চাল !

—দেখনি ? সত্য বলো। —পাঞ্চাল মৃদু হাসেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি পাঞ্চাল, যাবো। কিন্তু... মহারাজের কাছে পৌঁছবো কী ভাবে ?

—অভিজ্ঞান দেবো। অতিশয় সাবধানে রাখবে সেটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সাহেত-গামের আপণটি রইল। বাণিজ্য-বিস্তারে বহু সময় গেল। এবার যাবো ভিন দেশে। ধরুন কপিলা, কোসম। বেসর-গামে এখনই না। বেসর হয়ে ফিরব। পণ্য এতদিনে ভালো বিকোয়। সংবাদের জন্য মন বড় উচাটন।"

শেষ পংক্তিটি ভেতরের একটা তাড়ায় লিখে গেছে, কেটে দেবে কিনা অনেকবার ভেবেছে তিষ্য। কোন সংবাদ, কার সংবাদের জন্য তার চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে তা যেন তার নিজের কাছেও স্পষ্ট জানা নেই। মহারাজ কি তার এ ব্যাকুলতাকে বাতুলতা মনে করবেন? ...না, না। তিনি নিজেও কোমল চিত্তের মানুষ। বারবার তার প্রমাণ সে পেয়েছে।

তিন্দুক ধূলিধূসর বসনপ্রান্ত দিয়ে তার গাধাটির পিঠ মুছে নিচ্ছে। বেঁধে নিয়েছে চিঁড়ে-গুড়। পাথেয়র জন্য কয়েকটি তাম্র কার্ষাপণ পায় সে, পুরস্কারস্বরূপ পাঁচটি স্বর্ণ কার্ষাপণ।

আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা মুখশ্রীতে। তিন্দুক যায়। গাধার ক্ষুরে খুটটুট শব্দ হতে থাকে।

বিলীয়মান সেই বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে তিষ্য। কতদিন, আর কতদিন এই নির্বাসনে, এ কেমন কাজ যা সমাধা করতে যুগ লেগে যাচ্ছে!

বিপরীত দিকে চায় সে। কপিলবস্তুর পথ। কৌতূহল ছিল। তথাগত বুদ্ধের জন্মভূমি... কেমন তা? কেমন তাঁর গোষ্ঠীর মানুষ? শ্রমণ আনন্দর মতো সুঠাম, নিরভিমান? না বিনয়ধর থের উপালির মতো বাক্যব্যয়ী? বকবকবক। হাত পা নেড়ে মাথা ঝেঁকে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন সদাই। থের ভদ্দিয়র মতো সদাপ্রসন্ন সৌম্যদর্শন? না থের রূপনন্দর মতো উদাসীন, মূক, বৈরাগী! বিরূঢ়ক কি তার সূক্ষ্ম ঈর্ষার অসদ্‌গুণটি মাতৃবংশ থেকে পেল? নাকি জনক প্রসেনজিতই তাকে দিলেন এই দোষ? অথচ বিরূঢ়ককে সর্বাংশে মন্দ বলা যাবে না। রাজার কুমার হলেই কি এতো অসহিষ্ণু হতে হয়? কুমার বিরূঢ়ককে এখনও সে স্নেহই করে, কিন্তু কোশলের রাজা হতে হলে কুমারটিকে আরও উদার হতে হবে। গর্ব ভালো, কিন্তু এই প্রকার অহন্তা সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। আশা-নিরাশা, আশা-নিরাশা... মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে তিষ্যর এই পরস্পর-বিরোধী অভিজ্ঞতা হয়েই যাচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে।

শাক্যভূমিতে যাওয়া হল না যখন মল্লভূমি বজ্জিভূমিতেও এ যাত্রা যাওয়া স্থগিত থাকুক। রাজগৃহের যত কাছে যাবে তত তার কর্তব্যের লৌহ শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করবে। সে জানে। সংবাদের জন্য মন বড় উচাটন। কার সংবাদ? শুধু কি মহারাজ বিম্বিসারের? শুধু কি ক্যাত্যায়ন চণকের? অন্য নামটি নিজের মনের কাছেও উচ্চারণ করতে পারে না তিষ্য।

সুতরাং পাঞ্চাল ঘোড়া ছুটিয়ে দ্যান। —উত্তরপথের দীর্ঘ পুচ্ছ সচল হয়।

—কে যায়? কে যায়?

—সার্থ যায়।

—সার্থবাহ কে?

—অমৃত।

—কোথাকার?

—চম্পার। কোথায় যান ভদ্র?

—আপাতত কুরুদেশে।

—আমাদের গোযানগুলির ভেতরে উৎকৃষ্ট শয্যা আছে, বিশ্রাম নিতে পারেন পথিক। সঙ্গে উৎকৃষ্ট চাল, আসব রয়েছে। রাত্রে গো-মাংস পাক করব, কুক্কুট পাক করব। আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলে সুখী হবো।

সার্থর পর সার্থ পেছনে ফেলে পাঞ্চাল যান। দেহের ওপর দিয়ে দিন রাত বহে যায়, বহে যায় রৌদ্র কিরণ, উত্তরের হিমবায়ু। দেহবর্ণ তাম্রাভ হয়ে ছিল, ঘোর তাম্রবর্ণ হয়ে যায়, ত্বক রুক্ষ, কেশগুলি অযত্নে বেড়ে গেছে। অবয়বে রুক্ষতা, রূঢ়তাও কী?

মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়, জলের বর্ণ নীলাভ, আকাশ দ্যুতিমান, বহতা বাতাস কই? ওই তো! কনকনে বাতাস। পাঞ্চাল তিষ্য কোনও রাজ-আশ্রয়ে অধিক দিন থাকেন না। শুধু মগধরাজের বার্তাটুকু বোঝাতে যা বিলম্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অহো, রাজ্যে রাজ্যে শান্তির প্রস্তাব নয় ?

—হ্যাঁ মহারাজ তাই, কিন্তু অধিকন্তুও কিছু।

—বলি যুদ্ধ-টুদ্ধ তো কিছু নেই!

—নিশ্চিন্ত থাকুন, আপাতত কোনও যুদ্ধ নেই।

—তা মগধরাজ তো ক্রমেই পরাক্রান্ত হয়ে উঠছেন। তিনি তো ইচ্ছে করলেই... সাম্রাজ্য-বিস্তারে আমাদের সাহায্য চান না কি ?

—না। শুধুমাত্র জম্বুদ্বীপের শত্রু ঠেকাতে, আন্তঃরাজ্য সমস্যাগুলির সমাধান করতে।

—এ যেন নতুন প্রকার মনে হয়!

—নতুনই, একেবারেই নতুন। আপনারা মর্যাদা দিলেই মর্যাদা পায় এই নূতন তত্ত্ব।

কুরু-রাজ্য পাঞ্চাল রাজ্যের সে সব গৌরবের দিন আর নেই। কিন্তু অহঙ্কার আছে। মধ্যদেশীয় যুবকটির নির্লিপ্ত কিন্তু সবিনয় আচরণে সেই অহঙ্কার চরিতার্থ হয়। বিদ্বেষ মাথা তুলতে পায় না।

অবিনয়ী এবং অহঙ্কারী এখানকার মানুষ জন। বহুদিনের ঐতিহ্য বহন করার অহঙ্কার, বিদ্যার অবিনয়। অতিথিভবনের দাসেরা পর্যন্ত কুতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়।

—মধ্যদেশীয়... মগধ... আচার-বিচার মানে না

—সত্য না কি ?

—কিন্তু ভীষণ পরাক্রমী। এখন তো ওদেরই দিন পড়েছে।

নিজেদের মধ্যে জনান্তিকে বলাবলি করে ওরা।

গ্রাহ্য করেন না পাঞ্চাল। উভয়পক্ষীয় রাজাদের সম্মানরক্ষার্থে যতদিন প্রয়োজন তার চেয়ে একদিনও অধিক থাকেন না।

উত্তরপথের একটি শাখা চলে গেছে বৎস-অবন্তীর দিকে। চলেন, চলেন। বামে ঘুরে যান পাঞ্চাল।

—কে যায় ?

—সমন যান। সাক্যপুত্তীয় সমন।

—কোথা থেকে আসেন ? কোথায় যান ?

—আসি কোসাম্বি হতে। যাই সাবত্থির পথে।

—আমরা যাই বেসালি।

—দিকে দিকে যান না কি ? কোনও সমবেত লক্ষ্য নাই ?

—দিগ-বিদিকে ধম্ম বহে নিয়ে যাওয়াই আমাদের কাজ হে পথিক। তা ছাড়া সন্ধান করি, ভগবান কোথায় যে গেলেন!

—হারিয়ে গেলেন না কি ? —তাম্রকের রাশ টেনে ধরে মৃদু কৌতুকে জিজ্ঞাসা করেন পাঞ্চাল।

—আমাদের ত্যাগ করেছেন তথাগত।

অশ্রুমুখী ভিক্ষুরা।

—আমরা কলহ করেছিলাম। বিরক্ত হয়ে চলে গেছেন।

—ও আপনারা তাহলে কলহও করেন! সংসার-ত্যাগ করে সংঘ আশ্রয় করার প্রয়োজন কি ছিল তবে ?

—সত্য, সত্য কথা। আপনি তাঁকে দেখেছেন না কি ?

—দেখি নি, দেখে থাকলেও বলব না।

পথের ধুলোয় বিব্রত হয়ে অরণ্যসঙ্কুল স্থানগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন পাঞ্চাল। অবাক কাণ্ড! সত্যই তথাগতকে আবিষ্কার করলেন। একটি শাল বৃক্ষের তলায় তিনি বসে আছেন আর একটি হাতি শুঁড়ে করে জল এনে তাঁর মাথায় ওপর ফেলছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে পাঞ্চাল দৃশ্যটি দেখলেন কিছুক্ষণ।

দাঁড়িয়ে উঠে নিজের উত্তরাসঙ্গটি ভালো করে নিংড়ে নিচ্ছেন তথাগত। ঝাড়ছেন শব্দ করে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ওপর ভর দিয়ে উঁচু শাখে শুকোতে দিলেন বসনটি। অন্য একটি শাখা থেকে সংঘাটি

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে নিয়ে পরলেন। এবার অন্তরবাসক নিংড়োচ্ছেন। শুকোতে দিলেন।

এক লাফে তাম্রকের পিঠ থেকে নামলেন পাঞ্চাল। শুষ্ক পত্রের মর্মর শব্দ তুলে দৌড়ে গেলেন। বৃক্ষের তলা জলে ভিজে, ধুলোর সঙ্গে মিশে কাদা হয়েছে, নিজের পেটিকা থেকে বসন বার করে পরিষ্কার করে দিলেন স্থানটি।

এই মানুষটির জন্য কিছু করতে ভালো লাগে।

—চিনতে পারছেন ভন্তে?

—পারছি। সাবত্থির। কুমার তিষ্য, নয়? মৃদু হাসছেন তথাগত।

—পলায়ন করেছেন শুনলাম?

—অবশ্যই। দেখো আয়ুষ্মান, ওই মোঘপুরুষগুলিকে যেন আবার আমার সংবাদ দিও না।

—নাঃ, তাই দিই? সংঘ সৃষ্টি করে বড় বিপদেই পড়েছেন তাই না ভন্তে?

প্রসন্ন হাসি হাসলেন তিনি।

—উত্তর দিলেন না তো আমার কথার?

—তুমি পৃথগ্জন, ধম্মে বিশ্বাস করো না, তোমায় উত্তর দেবো কেন?

—কী করে জানলেন ধম্মে বিশ্বাস করি না। কোনদিন তো তিষ্য বলে আহ্বান জানাননি। রাজগৃহে প্রথম সাক্ষাৎ, তারপর কতবার সিতবনে, বেলুবনে, অম্ববনে গেছি। গেছি জেতবনে। কখনও তো ডাক দেননি।

—যারা বলে সমন গোতম শিষ্যসংখ্যা বাড়াবার জন্য মায়ার আশ্রয় পর্যন্ত নেয়, তাদের এ কথা বলো আয়ুষ্মান।

—আজ আমার কাছ হতে ভিক্ষা নিন।

—তাই হোক।

তিষ্য তার সংগ্রহ থেকে শুষ্ক খাদ্য বার করে, তারপর কী মনে করে বলে

—আমি আসছি, লোকালয় কোনদিকে বলতে পারেন?

—ওই তো... আঙুল দেখান তথাগত— ওই দিকে পারিলেয্যক গাম।

গ্রাম থেকে চিঁড়ে, দধি, মিষ্টান্ন সংগ্রহ করে এসে তিষ্য দেখে একটি বৃদ্ধ বানর হাতে কী নিয়ে অবিকল মানুষের ভঙ্গিতে তাঁর সামনে বসে আছে।

—কী ব্যাপার? হাতি-বানর সব পুষছেন নাকি ভন্তে, মানুষ শ্রমণদের ওপর রাগ করে! এদেরও ধম্ম বিতরণ করছেন?

—ওরা ধম্মের কতকগুলি মূল কথা জানে। ও আমাকে মধু খাওয়াতে এসেছে। কিন্তু তুমি ভিক্ষা দেবে বলেছ তাই ওকে বসিয়ে রেখেছি।

তথাগত পাত্র এগিয়ে ধরলেন, তিষ্য তার সংগৃহীত খাদ্যগুলি পাত্রের ওপর রাখলে, তথাগত পাত্রটি বানরটির দিকে বাড়ালেন, তড়িৎগতিতে বানর মৌচাক দুহাতে টিপে তাঁর পাত্রের ওপর মধুবর্ষণ করল, তারপর দুতিন লাফে দূরে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পারিলেয্যক হয়ে আরও একদিনের পথ অপরাহ্ণ অবধি চলে পাঞ্চাল কৌশাম্বী পৌঁছান। রাজ অতিথিশালে দিন কাটে। যত্ন, বিলাস, প্রমোদ কিছুর অভাব নেই। শুধু রাজার সঙ্গে দেখা হয় না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে শোনেন রাজা নাকি শোকার্ত।

—কিসের শোক? কী ঘটেছে রাজ্যে?

—রাজ্ঞী সামাবতী আর তাঁর সহচরীরা আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছেন।

—সর্বনাশ! কী করে আগুন লাগল? নেভানো গেল না? এতো সরোবর...

—আহা দাহ্য পদার্থ অপর্যাপ্ত থাকলে সে আগুন নেভে?

—দাহ্য পদার্থ?

—হ্যাঁ মান্যবর দগ্ধ তৈলের গন্ধে ধ্বংসস্তূপ পরিপূরিত ছিল।

—তাহলে এ তো সাধারণ দুর্ঘটনা নয়।

—নয়ই তো! কাউকে বলবেন না আমি বলেছি, রানীকে সপরিষদ কেউ হত্যা করেছে। হয়ত বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজ-আদেশই... জিভ কাটে অতিথিশালার অধ্যক্ষ।

—ভালো— পাঞ্চাল গম্ভীরভাবে বলেন— তাহলে আবার শোক কিসের ?

—বলেন কি মহামান্য মাগধ ! শোক করবেন না ! দেবী সামাবতী যে গুণের আকর ছিলেন, দীপশিখা হেন স্নিগ্ধোজ্জ্বল মানুষটি। অমন সেবা আর কেউ করলে তো ! ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর পালিত কন্যা ছিলেন তো। বহু ভাগ্য বিপর্যয় দেখেছিলেন জীবনে। বড় ক্ষমাশীলা, করুণার্দ্রা মহিয়সী ছিলেন আহা।

—এতোই যদি গুণ তো !

—আমাদের উদেনরাজ বড় অধৈর্য, লোকের কথায় বড্ডই নৃত্য করে ওঠেন কিনা। অমন রাণী অবিশ্বাসিনী হয় ? আপনিই বলুন না পাঞ্চাল...

—আমার কিছু বলবার নেই। কবে মহারাজ সভায় আসছেন ? সভায় না আসেন, আমাকে নিভৃত আলাপের সুযোগ দিন।

উদেনরাজার পারিষদ সব যেন বিদূষকের মতো।

—এখন কোনও লাভ হবে না। দুর্ঘটনার পেছনে কারণের অনুসন্ধান চলছে, এখন সাক্ষাতে কোনও লাভ নাই। কোনও লাভ নাই... তাদের এক কথা।

কিন্তু একদিন রাজপ্রাসাদ থেকে ডাক আসে। রাজার নয়, রাণীর। না কি জানতে পেরেছেন মগধদূত দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করছেন।

যাবো কি যাবো না ! —তিষ্যকুমার ভাবতে থাকেন। রাজগৃহে দীর্ঘদিন মহারাজের সঙ্গে আহার-বিহার। কিন্তু মহিষীদের সঙ্গে কোনও পরিচয় হয়নি কোনদিন। কোশলমল্লিকা অবশ্য আপন ভগিনীর মতো মধুর ব্যবহার করতেন। শাক্যকন্যা বাসবীও ততটা না হলেও মাঝে মাঝে উৎসব কি ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাক্ষাৎ হলে জ্যেষ্ঠার মতোই আচরণ করতেন। না, রাজ্ঞীরাও তো মানবী-ই। ডেকেছেন, না যাওয়া তো রাজাজ্ঞার অবাধ্য হওয়ারই মতো। না, যাবো, যাই।

অহো ! কী গরিমাময় গ্রীবাভঙ্গি ! হাত তো নয় যেন রাজদণ্ড। মাথার মুকুট সু-উচ্চ। অঙ্গবস্ত্র, অলংকার সবই কেমন অতিমানবিক। ইনি নিজেই তো সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন মনে হয়। করবেনও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে। রাজা উদেনের যেরূপ অবস্থা !

—আমি পট্টমহিষী মাগন্দিয়া। কুরুবংশের কন্যা, ব্রাহ্মণ...

নত হয়ে নমস্কার জানান পাঞ্চাল। কুরুকন্যা ? তো কী ? ব্রাহ্মণ... তাতেই বা হল কী ?

—কোশল হতে আসছেন শুনলাম।

—ঠিকই শুনেছেন দেবি...

ভণ্ডটা নাকি ধরা পড়েছে !

—কোন ভণ্ডের কথা বলছেন ?

—নির্লজ্জ দাম্ভিকটা এখানেও তো কিছুকাল আগে বসবাস করছিল। তা নাগরিকরা ও প্রকার লোক সহ্য করবে কেন ? গালি দিয়েছে অকথ্য। পালিয়েছে ! —ওই যে শ্রমণ গৌতম !

—শ্রমণ গৌতম ? তিনি আর যাই হোন ভণ্ড তো নন ? দাম্ভিক তো ননই। কখনো নন।

পাঞ্চালের চোখের সামনে দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ওপর ভর দিয়ে তিনি— শালশাখায় উত্তরাসঙ্গ শুকোতে দিচ্ছেন।

—এই যে শুনলাম শ্রাবস্তীতে, রাজগৃহে তার নামে প্রবল অভিযোগ উঠছে, কোন রমণীকে না কি সে...

—ও সব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ওই রমণীগুলিই দুষ্ট লোকের কাছ থেকে উৎকোচ খেয়ে...

—থামুন... ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর

চক্ষু তুলে পাঞ্চাল দেখেন এ তো রূপের রূপিনী নয় ! যেন বিষের সর্পিণী ! কিসের ক্রোধ এতো ?

—আমার মতো সুন্দরী দেখেছেন আর ?

পাঞ্চাল বোঝেন যাকে গরিমা মনে হয়েছিল তা শুধু দম্ভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—সুন্দরীরা কখনও একে অন্যের মতো হন না তো দেবি, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র।

—বিদুষী দেখেছেন ? ব্যাকরণ, ছন্দ সব কণ্ঠস্থ ?

—দেখেছি, শুনেওছি— পরম সন্তোষের সঙ্গে বলে পাঞ্চাল। গান্ধার ভবনের দিনগুলি স্মরণে আসে। চিত্ত কোমলতায় গৌরবে উদ্‌ভাসিত হয়ে যায়।

—থামুন— ছিন্ন জ্যার মতো অতর্কিতে উঠে দাঁড়ান রাজ্ঞী

—আপনি আমাকে অপমান করছেন ?

—তা যদি বলেন দেবি, আপনিই আমাকে অপমান করছেন। আপনি রাজ্ঞী হতে পারেন, কিন্তু আমি মগধরাজের প্রতিনিধি, তাঁর সম্মান আপাতত আমারই প্রাপ্য। তবে তা যদি না-ও দিতে চান, আপনার বা বৎসরাজ্যের ভৃতক তো আমি কখনোই নই।

পাঞ্চাল উঠে দাঁড়ান।

—তুমি... তুমি তোমাকে বন্দী করবার ব্যবস্থা করছি।

ক্রোধে কাঁদতে থাকেন মাগন্দিয়া।

করুন— বিরস মুখে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন পাঞ্চাল। ভেতরে বহু শব্দ। বহুস্বর। রানীর সখীরা তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রতিহারী বলে— রাজ্ঞী অতিশয় বিদুষী, রূপ তো দেখলেনই, কেন যে এমন উন্মাদের মতো... শ্রমণ গৌতম নাকি ওঁকে প্রত্যাখ্যান করে ছিলেন তাইতেই...

রূপ, বিদ্যা, অর্থ, উচ্চপদ কিছুই তাহলে কিছু না ? ভেতরে বাসনার কূটদন্ত যদি কামড় দেয় তো রক্ষা নেই।

বিশৃঙ্খল বৎসরাজ্য ছেড়ে উজ্জয়িনীর দিকে চলে যান পাঞ্চাল। প্রদ্যোৎ মহাসেন মহা সমাদর করেন মগধদূতের।

মহারাজ বিম্বিসার যতদিন, যখন যেভাবে আমাকে সাহায্য করতে বলবেন আমি তা করব। তিনি আমাকে দুরারোগ্য রোগ থেকে বাঁচিয়েছেন। আমার জন্য তিনি ভেবেছেন, আমিও তাঁর জন্য ভাববো। তেমন প্রয়োজন হলে আমার সেনা তাঁকে অনুসরণ করবে।

বৃদ্ধ, কিন্তু মহাবল, ক্রোধী বলে পরিচিত এই নৃপতি এই কথা বললেন। তখন উত্তর-পশ্চিম দিক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে তিষ্য কুমারের মনে হল সে তার কাজ সমাধা করতে পেরেছে, প্রায়। অবশিষ্ট রইল সুদূর উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলি— মদ্র, সৌবীর, গান্ধার। উচিত সেদিকেই যাওয়া। কিন্তু চিত্ত বড় ক্লান্ত। অবন্তীরাজের কাছে বিদায় নিয়ে সে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। উত্তর পথ পিছু হাঁটতে থাকে।

শ্রাবস্তী পার হয়ে যায় যায়। অদ্ভুত সংবাদ কানে আসে।

রানী বাসবী আর কুমার বিরূঢ়ব নাকি প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। প্রত্যন্ত গ্রামের লোকেরা বলাবলি করছে।

গ্রামের নাম সালবতিকা। পুষ্করণী থেকে স্নান সেরে ফিরছেন দুই গৃহস্থ। বলছেন :

—কোসলরাজের কোনও হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই। পট্টমহিষী বলে কথা, উপযুক্ত পুত্র... বার করে দিলেন ?

—না না এ ভালো কথা নয়।

—মহিষী না কি শাক্যরাজার দাসীকন্যা। কোসলবংশে নিজেদের কন্যা দেবে না বলে বঞ্চনা করেছে। কপিলবস্তু হতে জেনে এসেছে। কুমারের বসার আসন না কি সাত ঘড়া দুধ দিয়ে ধুচ্ছিল। দাসীপুত্রের ছোঁয়ায় অপবিত্র হয়ে গেছে।

—চমকে ওঠে তিষ্য। এক মুহূর্ত ভাবে। তার পর বৈশালীর পথে অশ্বচালনা করে। বিরূঢ়ব যদি সত্য সত্যই রাজকুমার হয়, ভাগ্যবিপর্যয়ে হতাশ্বাস হবে না সে। কিন্তু কোসলরাজের কাণ্ডখানা দেখো !

পসেনদি, উদেন, এঁরা দুজনেই ভারসাম্যহীন মানুষ তাহলে ! রাজসত্তা আর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে অক্ষম ! বর্তমান জম্বুদ্বীপের দুজন প্রতাপশালী নরপতি এইভাবে চলছেন। উদেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্র বোধিকুমার নাকি সুংসুমারগিরিতে একটি বিলাসপ্রাসাদ প্রস্তুত করাচ্ছে। যার তুলনা জম্বুদ্বীপের কোথাও নেই। রাজার কোষটি কী দিয়ে ভরেছে? কিছু সীতা ভূমির ওপর তাঁর অধিকার থাকে ঠিকই, কিন্তু আর সব? সবই তো প্রজাদের রাজস্ব, অপুত্রক প্রজার সম্পত্তি, বণিকের শুল্ক এইসব। রাজাকে তাঁর প্রাসাদ, যান, অলঙ্কার এ সকল কে দেয়? প্রজাই তো। অথচ সেই ধন যথেচ্ছ ব্যয় করে যান প্রত্যেক রাজা, তাঁরা যে প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের বৃত্তিভোগী ভৃতক এ চেতনা থাকে না। মগধরাজ এরই মধ্যে একটু ব্যতিক্রমী বই কি।

গণরাজ্যে ধনের বন্টন কী রূপ দেখা যাক। রাজনীতির খেলাই বা তাঁরা কী ভাবে খেলেন।

কপিলবস্তুর ক্ষুদ্র শাখাপথটি পার হয়ে গেছে। শাক্যরাজ্যে যাবার প্রবৃত্তি হয়নি। সে শুনেছিল রানী বাসবী স্বয়ং তথাগতর ভ্রাতৃকন্যা। কোসল রাজ শাক্যকুলের কন্যা বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। শাক্যদের এতো দূর স্পর্ধা যে বিবাহের জন্য দাসীকন্যা পাঠাল! বলে দিতে পারত। আর এই যে ধনী ব্যক্তিমাত্রেই অজস্র দাসী, নটী রাখবে, তাদের গর্ভে ইচ্ছামতো সন্তান উৎপন্ন করবে এই অপব্যয়ী প্রথাই বা কেন? যশ নামে এক অর্হন আছেন তিনি ছিলেন বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীপুত্র। একবার শ্রাবস্তীতে তিষ্যর গৃহে ভিক্ষার্থে আসেন। তিষ্যর বড় কৌতূহল, কখন কী পরিস্থিতিতে এঁরা প্রব্রজ্যা নেন। অর্হন যশকে জিজ্ঞাসা করেছিল। উনি বলেন— ঘৃণায়।

—ঘৃণা?

—একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে যখন পৃথিবী সবে নিদ্রান্তে জাগছে, অপার্থিব বালার্ককিরণে চতুর্দিক রহস্যভূমি, তখন জেগে উঠে দেখলাম আমি শুয়ে আছি, বিলাস শয্যাটি তছনছ, দু পাশে দুই নারী, মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। প্রভুপুত্রের সেবা করে এতো ক্লান্ত যে তাদের অস্থি পর্যন্ত যেন শিথিল হয়ে গেছে। হর্ম্যতলে কৃমি কীটের মতো কিলবিল করছে আরও অনুরূপ নারী। বিতৃষ্ণা হল।

—কার ওপর, ওই নারীগুলির ওপর না কি?

—ওরাই ঘৃণা জাগায়, মূত্র পুরীষের আধার, অপবিত্র, কুৎসিত... কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম আমি, আমিই ঘৃণ্য, ঘৃণ্য আমার এ জীবনযাপন, তখনই ছুটে চলে গেলাম। ভাগ্যক্রমে ভগবান তথাগতর সন্ধান পাই।

তিষ্য কোনদিন এমন জীবন যাপন করেনি বলেই কি তার জীবনতৃষ্ণা যায় না!

AMARBOI.COM

২০

একশ এক জন গণরাজা সংস্থাগারে মগধদূতের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। অভূতপূর্ব সাফল্য।

সেনাপতি অভয় বললেন: কিন্তু একটা কথা আপনারা স্মরণে রাখবেন পাঞ্চাল নিজেকে মগধের প্রতিনিধি বলছেন না, বলছেন বিম্বিসার-প্রতিনিধি।

—দুটির মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে নাকি?

—সে-কথা পাঞ্চালই বলুন।

সাবধানতার সঙ্গে শব্দ নির্বাচন করতে হয় পাঞ্চালকে।

—তত্ত্বটি মহারাজের নিজস্ব ভাবনা-প্রকৃত। সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের কাছেই তিনি প্রথম প্রচার করতে চান। আপনারা সম্মত হলে তবেই রাজ্যেরও নীতি বলে স্বীকৃত হবে।

—আর সম্মত না হলে। মগধরাজ কি যুদ্ধ করবেন?

সেনাপতি অভয় লোকটি অতি চতুর।

পাঞ্চাল বলেন—আমার কাজ মৈত্রী নীতির কথা, রাজসংঘের কল্পনার কথা আপনাদের জানানো। এর অধিক বলবার অধিকার আমার নেই। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো—মগধরাজ দুর্বল বা রণভীরু এমন ভাববেন না। অন্যরা হোক তা-ও তিনি চাইছেন না। একের বিপদে বহুর বিপদ। সুতরাং সংঘবদ্ধ হওয়া ভালো—এই-ই তাঁর ধারণা।

—সংঘনায়ক কে হবেন? রাজা ছেটক জিজ্ঞাসা করলেন। সবাই উৎসুক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই প্রশ্নটিকেই ভয় করছিলেন পাঞ্চাল। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল, হেসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন : আপনারা ? আপনারা বৈশালীর গণরাজারা এই প্রশ্ন করছেন ?

ছেটক স্মিতমুখে বললেন : ঠিকই। ভগবান বুদ্ধও আমাদের কর্মপদ্ধতির ভূয়সী শংসা করে থাকেন। আমরা সবাই সমমর্যাদার অধিকারী, মহল্লকদের পরামর্শ গ্রহণ করি। শলাকার দ্বারা নির্বাচনের পদ্ধতি বার করেছি... প্রশাসনের ব্যাপারে শেষ কথা আমরাই বলতে পারি।

সেনাপতি অভয় তবু ছাড়েন না।

—মগধরাজ তাহলে আর সাম্রাজ্য চাইছেন না ? সৈন্যদল ভেঙে দিচ্ছেন ?

—রাজসংঘ গড়ে উঠলে কারোই আর সাম্রাজ্যের প্রশ্ন থাকছে না— মহামান্য সেনাপতি। কিন্তু সৈন্যদল ভেঙে দেবেন কেন ?

—বসিয়ে বসিয়ে ভৃতি দেবেন নাকি ?

—নিশ্চয়। তাদের প্রশিক্ষা, অস্ত্রনির্মাণ এ সমস্তই অব্যাহত থাকবে। জম্বুদ্বীপের বহিঃশত্রুর প্রসঙ্গটি আপনারা বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছেন।

সংস্থাগার থেকে প্রত্যাবর্তন করতে করতে পাঞ্চাল বুঝলেন এঁরা, এই গণরাজারা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে এই মৈত্রী-প্রস্তাবের ভেতর থেকে নিজেদের জন্য কোনও বিশেষ সুযোগ বার করে নিতে চাইছেন। এঁরা চাইছেন, মগধরাজ অস্ত্র ত্যাগ করুন, সৈন্যদল ভেঙে দিন। নেতৃত্ব বৈশালীর হাতে অর্পণ করুন।

সেনাপতি সীহর কাছে পত্র দিয়ে বন্ধুল পাঠিয়েছেন তাকে। রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় না রেখে সীহ তাকে রেখেছেন নিজের গৃহে। রথে উঠতে উঠতে সীহ জিজ্ঞাসা করলেন, কী ভাবছেন পাঞ্চাল ?

—ভাবছি গান্ধার সীমান্তের কথা।

হেসে উঠলেন সীহ—কোথায় বেসালি আর কোথায় গান্ধার।

—যতটা দূর ভাবছেন, ততটা নয় সেনাপতি। কুভা নদী পার হতে পারলেই...

—কুভা ? যমুনা, সদানীরা, সিন্ধু এগুলির কথা বলুন, বিস্মিত সীহ বললেন।

—পারস্য থেকে এ-দেশে আসতে তো সর্বাগ্রে কুভা-ই পড়বে সেনাপতি। তারপরে অবশ্য সিন্ধু, সদানীরা, যমুনা, গঙ্গা সবই সহজে পার হওয়া যাবে। যে সময়টা আমরা কে সংঘনায়ক হবেন বা কোনও রাজ্যের সৈন্যদল থাকবে কি থাকবে না এই নিয়ে বিতর্ক করব, সেই সময়ের মধ্যেই এ-নদীগুলি পার হওয়া যাবে।

শুনতে শুনতে সীহর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন—সত্যি, আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে বড়ই ব্যস্ত থাকি, নয় !

—ইতিবৃত্ত মনে করুন সেনাপতি। যারা যেখানে পরাজিত হয়েছে, এই কারণেই হয়েছে। এই ক্ষুদ্র স্বার্থ।

—মগধরাজ মহানুভব—আপন মনেই বললেন সীহ, বললেন, রত্নখনি নিয়ে আমরা এত ক্ষুদ্রতা করছি তার পরেও তিনি মৈত্রীর কথা ভাবেন। সত্য পাঞ্চাল, অন্যদের কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি লজ্জিত বোধ করছি।

তিষ্য কোনও রত্নখনির বিষয়ে জানে না। সে সতর্ক কানে শুধু শুনল। মন্তব্য করল না।

—এমন মহানুভব শুধু তথাগত বুদ্ধকেই দেখেছি।

মহারাজ বিম্বিসারের সঙ্গে তথাগত বুদ্ধর তুলনায় তিষ্য চমৎকৃত হয়। কিন্তু সীহ এখন উচ্ছ্বাসের ঘোরে আছেন।

—আমি পূর্বে জিন নাতপুত্তের অনুগামী ছিলাম। ভগবান বুদ্ধের উপাসক হওয়ার পর তিনি আমাকে প্রথম কী কথা বললেন জানেন ?

—কী ?

—বললেন নাতপুত্তকে আগের মতো অর্চনা করতে আমি যেন বিস্মৃত না হই। তাঁর যেন কোনও ক্ষোভ বা কষ্টের কারণ না জন্মায়।

সেই রাত্রে সীহর গৃহের বিলাস-শয্যায় সহসা আবার তিষ্যকুমারের শয্যাকণ্টকী হল। নিদ্রার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতর্কিতে গুপ্ত শত্রুর মতো এক অনির্দেশ্য উৎকণ্ঠা তার শরীর-মন অধিকার করে নিচ্ছে। এত তীব্র যে, তার প্রথম নিদ্রা ভেঙে মনে হয়েছিল কোনও ব্যাধির আক্রমণ হয়েছে বুঝি বা।

—আমি কি হলাহল পান করেছি ? বিস্মিত তিষ্য নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। কী সুতীব্র আক্ষেপ ! কোনও খরস্রোতা নদীর তীরে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কেউ বুঝি চলে গেছে। কেউ নেই, কিছু নেই, কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো চালিত হচ্ছে সে এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে। বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। কিন্তু অভিজ্ঞতাগুলিও সব সারিবদ্ধ কাষ্ঠমূর্তির মতো সত্তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটিই তার ভেতরে এসে তার রক্ত, মাংস, মজ্জার সঙ্গে মিশল না। হঠাৎ তার মনে হল, সে তার মৃত্যুদৃশ্য দেখছে।

'পাঞ্চাল তিষ্যর দেহাবসান হয়েছে-এ-এ' কোথাও কেউ ঘোষণা করছে। 'এই মাত্র মারা গেলেন।'

'পাঞ্চাল তিষ্য ? কে তিনি ?'

'তিষ্যকুমার নামে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবাকে চিনতাম। কিন্তু পাঞ্চাল ?'

' ও অবশ্যই। সেই তিষ্যই ! ভাল, তিনি সংকৃত হয়েছেন তো ?'

শয্যা থেকে উঠে পড়ে তিষ্য। সুপরিসর কক্ষটিতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। কখনও বাতায়নের কাছে থামে। তমসাবৃত কাননের দিকে চেয়ে থাকে। আবার আকাশের দিকে মুখ তোলে। জ্যোৎস্নায় তার মুখটি পাণ্ডুর দেখায়। মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি কখনও পেছনে রাখে। কখনও খুলে বাতায়নের বাইরে মেলে দেয়।

—পাঞ্চাল !

—কে ? তিষ্য বেগে ঘুরে দাঁড়ায়।

—আমি সীহ।

—আপনি ! এত রাতে !

তিষ্য জানে না লিচ্ছবিরা অতিথিবৎসল হলেও অতি সতর্ক। মগধের কোনও রাজপ্রতিনিধিকে কখনও তারা চোখের আড়ালে রাখবে না।

—আপনার নিদ্রা আসেনি।

—এসেছিল, হঠাৎ ভেঙে গেছে।

—অপরাধ মার্জনা করবেন পাঞ্চাল, আমি এখুনি সুন্দরী নটী পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—না— পাঞ্চালের চক্ষু দুটি বাঘের মতো জ্বলে।

মৃদু প্রদীপের আলোয় সীহ সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

এখন মধ্যরাত। সমস্ত পৃথিবীর সুখী ও নির্বোধেরা গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। তিষ্য আর সীহর মাঝখানে নিশীথিনীর আড়াল।

পাঞ্চালের কণ্ঠ ভেসে আসে—এ-কথা কি সত্য সেনাপতি ?

—কী সত্য পাঞ্চাল ?

—পুরুষের তাবৎ যন্ত্রণার নিরাময় নারীশরীরে ?

—এ-কথা কখন বললাম ?

—আমাকে বিনিদ্র দেখে রমণী পাঠিয়ে দেবার কথা বলেননি ?

—বলেছি পাঞ্চাল। যা সহজ, সুপ্রচল—তাই ভেবেছি। মার্জনা করুন। আপনি স্বতন্ত্র।

—মার্জনার প্রশ্ন নেই সেনাপতি। কিন্তু আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বয়োজ্যেষ্ঠ। বলতে পারেন, কী সে যাতনা যা আমাকে থেকে থেকে বৃশ্চিকের মতো দংশায়।

সত্যিই, অতিথিকক্ষের আলো-অন্ধকারে পাঞ্চালকে এক নীল বর্ণের পুরুষ বলে ভ্রম হয়। দংশনের বিষে নীল।

সীহ বললেন—পাঞ্চাল, যতদূর শুনেছি আপনি তো আমার চেয়েও অধিক আমার চেয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে দেখেছেন। মনে হয়নি, আপনার এ-যাতনা তিনি দূর করতে পারেন।

—কার কথা বলছেন ?

—সেই আদিত্যবর্ণ পরমপ্রাজ্ঞ অমিতাভ তথাগত।

—তিনি যে মৃত্যু এবং নিবৃত্তির কথা বলেন,

—কিন্তু তিনি অমৃতের কথাও তো বলেন! নির্বাণ অমৃত ছাড়া কী ? আর নিবৃত্তির কথায় তো আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নাই, আপনি সংযমী পুরুষ।

—না, না, এ নির্বাণ, এ-নিবৃত্তি আমার নয়।

তখন নিশ্বাস ফেলে সীহ বললেন, আসুন পাঞ্চাল, বেশবাস করে নিন, দেখি আপনার বৃশ্চিকের দংষ্ট্রা নির্বিষ করতে পারি কি না।

—কোথাও যেতে হবে, সেনাপতি ?

—ব্যক্তিগত সংকটের কথা যে মুহূর্তে আমাকে জানিয়েছেন, সে মুহূর্ত থেকে আমি আপনার সুহৃৎ। আমাকে সেনাপতি বলে আর সম্বোধন করবেন না পাঞ্চাল। হ্যাঁ যেতে হবে। চিত্ত এবং চিত্তবৈকল্যের ব্যাপারে যাঁকে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ বলে মানি তাঁর কাছে নিয়ে যাই। আমাকে বিশ্বাস করুন।

স্ফটিকের পাত্রের মধ্যে একটি আলোকশিখা জ্বলছে। দূর থেকে দেখা যায়। সম্ভবত একটু উচ্চ ভূমির ওপর গৃহটি। শ্বেতমর্মরের সেই অপরূপ স্থাপত্য জ্যোৎস্নাপিণ্ডের মতো অন্ধকারেও দৃশ্যমান। দীর্ঘ কয়েকটি অঙ্গন পেরিয়ে একটি সুবিশাল কক্ষ। পাথরের স্তম্ভগুলিতে ওপরে পদ্ম, নিচে সিংহ, হস্তী। কোথায় আলো জ্বলছে দেখা যায় না। ভোরের মতো আলোয় কক্ষটি ভরে রয়েছে। মৃদু একটা সৌরভ। সীহ তাকে বসিয়ে রেখে আসছি বলে চলে গেছেন। এতো রাতে নিশ্চয় গৃহকর্তাকে নিদ্রা থেকে তুলতে সময় লাগবে।

কক্ষটিতে প্রতিকৃতি রয়েছে অনেকগুলি। মহাবল, শক্তিসুন্দর পুরুষ সব। দেখতে দেখতে একটির সম্মুখে থেমে যায় তিষ্য—মহারাজ শ্রেণিয় না ? একেবারে উদ্ভিন্নযৌবন। কী অসামান্য প্রতিভাদীপ্ত মুখশ্রী! তিষ্যর বক্ষের ভেতর থেকে কী যেন একটা উঠে আসতে চায়। চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। এ-দুর্বলতা তাকে সাজে না, সাজে না! সে ঘুরে দাঁড়ায়। সুন্দর-সুন্দর মূর্তিও রয়েছে কক্ষটিতে। সত্যি কথা বলতে কি কত যে শিল্পসম্ভার, আর কী অদ্ভুত সুন্দর তাদের বিন্যাস সে কথা মুখে বলা যায় না। নারীমূর্তিগুলি নৃত্যভঙ্গিমায়। শ্বেত পাথরের, কৃষ্ণ মৃত্তিকার, কত প্রকার আভা যুক্ত বস্তু, সে কি কাংস্য না অন্য কিছু বোঝা যায় না সব সময়ে। তিষ্য মূর্তিগুলি অলস চোখে দেখতে থাকে। এক একটি মূর্তি যেন জীবন্ত। দেখতে দেখতে সুন্দরতম মূর্তিটির সামনে সে দাঁড়িয়ে যায়। এর চোখদুটি অলৌকিক করে এঁকেছেন শিল্পী। ঈষৎ দেখা যাচ্ছে কদলী পুষ্পের মতো একটি দুটি দাঁত। হাত দুটি অঞ্জলিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তি। মুগ্ধ তিষ্য বিস্মিত হয়ে বলে, কোন শিল্পী তোমাকে গড়েছেন জানি না। কিন্তু তিনি মহাশিল্পী।

অঞ্জলিবদ্ধ হাতদুটি কপালের কাছে ওঠাল মূর্তি। মৃদু নিক্বণ শোনা গেল। তিষ্যকে বিস্ময়ে অভিভূত করে মূর্তি বলল—যিনি আপনাকে গড়েছেন, তিনিই।

—আপনি...আপনি...

—আমি অম্বপালি।

পাঞ্চাল তিষ্যর পরিণত যৌবনের শরীর থেকে যেন মন্ত্রবলে বেরিয়ে এল একটি অনভিজ্ঞ, প্রণয়োন্মুখ, বহু আশার আশী এক কিশোর। সে কোন চিরকালের নদীপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এক সদ্যকিশোরীকে বলল—আমায় ফিরিও না। ফিরিয়েছ বলে আমি পূর্ণ হতে পারছি না, প্রত্যয়ী হতে পারছি না।

—ফেরাইনি তো! আমি যে তোমাকে বারবার ডেকেছি। দুই সজল চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে কম্পিত ওষ্ঠাধরে বলে উঠলেন অলভা—আমাকে এই অফলা যৌবনের কারাগার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাতনায় নীল হয়ে মুখ ফেরাল তিষ্য।

অমনি কক্ষ পার হয়ে চলে যেতে যেতে স্ফুরিতাধরে কেউ বলে উঠল—চাই না। কিছু চাই না। নিজ কর্তব্যে যাও, ডেকো না আমাকে, বলল—কোমলে ও কঠিনে, প্রণয়ে এবং দুর্বিনয়ে।

—অম্বপালি! আপনি অম্বপালি! বিস্ময়, শ্রদ্ধা, আনন্দ, সমর্পণ সব সব কিছু যেন তার কণ্ঠে।

—হয়ত অম্বপালি। হয়ত নয়। হয়ত বা অন্য কেউ যাকে চিত্তের মধ্যে মূক করে রেখেছেন হে পাঞ্চাল। —করুণ হাসিতে যেন গলতে থাকে মুখশ্রীর মণ্ডন।

তিষ্য দেখল তার দু' নয়ন থেকে তৈলধারার মতো অশ্রুবর্ষণ হচ্ছে। এক বারিধিই বুঝি জমে ছিল তার বুকের ভেতর।

বারিবিধৌত সেই মুখটিকে তাঁর দু'হাতের অঞ্জলিতে নিয়ে চুম্বন করলেন অম্বপালি। কোথাও দ্বার খোলবার শব্দ হল। আকাশ স্বয়ং নত হয়ে পড়েছে তার ভোরবেলাকার কুসুমবর্ণ মেঘরাজি, তার দ্বিপ্রহরের কাংসোজ্জ্বল রোদ, তার ত্রিযামা যামিনীর অগণ্য নক্ষত্রশোভিত আলো-অন্ধকার নিয়ে। পদ্মগন্ধের লহরী বহে যায়। বহে যায়।

অম্বপালি গান ধরলেন মৃদুস্বরে। কোন অন্তরাল থেকে বীণা বেজে উঠল।

সীহ যখন তিষ্যকে নিতে এলেন তখন সদ্যই অংশুমালী দিগন্ত পার হয়েছেন। স্ফটিকের মতো ঝকঝক করছে শিশিরমগুনা বৈশালী। সখী রম্ভা এসে জানাল—তিস্‌স ভদ্দ গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছেন। অম্বা তাঁকে জাগাতে নিষেধ করেছেন।

সীহ ফিরে গেলেন। মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে আবার তাঁর উৎকণ্ঠিত রথ এসে দাঁড়ায়। রম্ভা জানায় ভদ্দ তিস্‌স এখনও নিদ্রিত।

—কোনও বিশেষ সুরা...ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করেন সীহ।

—কই না তো! কোনও সুরাই তো নয়!

গোধূলিবেলায় তিষ্য জেগে ওঠে। প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি সময় অপরাহ্ণ। সে ভেবেছিল প্রত্যুষ হচ্ছে। ঘরটির চারদিকে বাতায়ন। মুক্ত বাতায়নপথে চোখ ভরে দেখা যায় বৈশালীর অপরাহ্ণশ্রী। দুটি যুবতী ঘরে ঢুকে তাকে স্নানের আহ্বান জানাল।

—স্নানগৃহটি শুধু দেখিয়ে দিন। কারো সাহায্য লাগবে না। বলল তিষ্য। সসম্ভ্রমে কলসে সুরভিত কবোষ্ণ জল রেখে, মার্জনী বস্ত্র, তৈল, অঙ্গরাগ, সুগন্ধি সব সাজিয়ে রেখে চলে গেল তারা।

এক প্রস্থ নববস্ত্র, তার অলঙ্কারগুলি ফলকের ওপর রাখা। স্নানের পর বাইরে এসে দেখে যুবতী দুটি দাঁড়িয়ে আছে। বলল, আসুন ভদ্দ।

—কোথায় যেতে হবে? আমি এবার...

—সায়মাশ খেতে হবে না? অম্বার গৃহ থেকে এমনি যাবেন? আর কয়েক প্রহর হলেই তো পুরো একটি দিবস নিদ্রা হয়ে যেত। ক্ষুধাবোধ হচ্ছে না?

—একটি দিন কেটে গেছে?

—প্রায়।

—তবে কি এখন প্রত্যুষ নয়?

—এখন বৈকাল ভদ্দ।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে দু'জনে।

সত্যই সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। এত ক্ষুধা যেন তক্ষশিলার সেই ব্রহ্মচর্যের দিনগুলিতেও কখনও অনুভব করেনি সে। একটি স্বপ্ন দেখেছিল সে গতরাত্রে। স্বপ্নটি তার চিত্তের সমস্ত অন্ধকার সংগ্রহ করে নিয়ে মিলিয়ে গেছে।

অপর দিকের বস্ত্রাবরণী সরিয়ে এক রমণী প্রবেশ করেন। শুভ্র সামান্য বসন। অলঙ্কারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও বাহুল্য নেই। মুক্তকেশী। কে ইনি ? এঁর উপস্থিতির ছটায় কক্ষটি যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

—এখন ভাল বোধ করছেন তো ? মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করে তিনি বসলেন একটি পীঠে।

—আমার কি কিছু হয়েছিল ?

—না, তেমন কিছু নয়। গীত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর নিদ্রা। সুষুপ্তি বলতে পারেন। যে নিদ্রায় কোনও দুঃস্বপ্ন থাকে না।

—দেবী অম্বপালি বোধহয় আমাকে ঘুম পাড়াতেই ওই গীত গেয়েছিলেন...তিষ্য বলে, একটি ফলকে আহার্য এল।

তিষ্য বলল আমি ক্ষুধার্ত। অনুমতি করুন।

—নিশ্চয়, আপনি উদর পুরে খান।

তিষ্য শুনল—খেতেই তো বললাম যুবক...বলছেন এক শুভ্রবসনা কুণ্ডলকেশী শ্রমণা।

একজন যুবতী এসে বলল—অম্বা, সেনাপতি এসেছেন।

—তাঁকে প্রতীক্ষাগৃহে আপ্যায়ন কর সুলসা। আমার নমস্কার জানাও, জানাও মহামান্য পাঞ্চাল প্রায় প্রস্তুত, এখনি যাচ্ছেন।

—যাবার আগে দেবী অম্বপালীর কাছে একবার বিদায় নেব। কোথায় তিনি ?

—এই তো আমি। আমিই সে।

—তা হলে কাল রাতে যাঁকে...স্তম্ভিত তিষ্য কথা শেষ করতে পারে না।

—আমাকেই তো দেখেছিলেন পাঞ্চাল।

লজ্জা সংকোচ ভুলে সে এই প্রগাঢ়যৌবনা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, তন্বী, লাবণ্যকোমল, প্রজ্ঞাভাস্বর মানবীরত্নর দিকে তাকিয়ে রইল।

—বিশ্বাস হচ্ছে না ? কেমন এক প্রকার হাসলেন রমণী,—আমি সর্ব কল্যাণী নারী। ছলনা করি না। কিন্তু মানুষ আমার মধ্যে তার মনোলোকের কল্পমূর্তি দেখে। সত্য মানুষটিকে দিবালোক ছাড়া দেখতে পায় না। দিবালোকেও পায় কি ? ভদ্র পাঞ্চাল আপনি কি স্বপ্নের ঘোরেই থাকতে চান, না দিবালোকের স্পষ্টতায় ফিরতে চান।

—আমি কি স্বপ্নের ঘোরেই ছিলাম এতদিন ?

—এমন স্বপ্ন দেখা চোখ আমি বহুদিন দেখিনি।

—বুঝলাম না দেবি।

কী বুঝলেন না ?

—কিছুই না।

—একটু প্রতীক্ষা করুন, ধৈর্য ধরুন, দেখবেন, অনেক কিছুই বুঝতে পারছেন। প্রকৃত কথা নিজের চিত্তকে বোঝা।

—তাহলে আমি আপনার কাছে আবার আসব। অনুমতি দিন...

—কাল রাত্রেই আমি আমার শেষ অতিথি গ্রহণ করেছি ভদ্র।

গভীর সজল সেই চোখ দুটির দিকে চেয়ে তিষ্য মাথা নিচু করে বলল—অতিথির মতো আসতে চাই না। আচার্যের কাছে শিক্ষার্থী যেমন আসে, তেমনি আসব দেবি।

জম্বুদ্বীপের এই শ্রেষ্ঠ নারী ভগবান বুদ্ধের চোখেও ধন্দ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বৈশালীতে তাঁর আমন্ত্রণসভায় তথাগত বারবার তাঁকে দেখছিলেন—কী আশ্চর্য এই অম্বপালি। কত সামান্য বেশ, কোনও প্রসাধন নেই, অলঙ্কার ন্যূনতম, তবু কী মহিমা! তুষিত স্বর্গের দেবীরাও বুঝি এই মানবীর কাছে পরাজিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে সর্বার্থসুন্দরী এই নারীকে দেখলে পুরুষ এত বিভ্রান্ত হত যে কেউই তাঁকে সঠিক চিনতে পারত না। স্পষ্ট দেখতেই পেত না। তিনি নিত্যই নব নব রূপে পুরুষের প্রাণের দুয়ারে গিয়ে আঘাত দিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উষাকাল। মুক্তাভার মতো একটি আস্বচ্ছ দ্যুতিতে দ্যুতিমতী ধরণী। শেষবারের মতো গৃধ্রকূটের পাশ দিয়ে নগর-প্রাকারের দিকে চলে যাচ্ছেন চণক। চলেছেন একটা ঘোরের মধ্যে। পরিচিত পথগুলি অপরিচিত লাগছে। সব যেন অসত্য, ভ্রান্ত, মায়া। নিদ্রিত রাজগৃহ। রাজগৃহ, তুমি জানলে না এক যুগেরও অধিক কাল তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য। হে গৃধ্রকূট, আমার চিন্তার চারণভূমি, বিদায় দাও। হে বৈপুল্ল, বৈভার গিরিমালা, কালশিলা, শীতবন, আম্রবন, বেণুবন, লট্‌ঠিবন কাত্যায়ন চণক যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে যায়।

প্রাকার-তোরণের কাছে বিদায় নিচ্ছেন চন্দ্রকেতু। স্থবিকা দিচ্ছেন কাত্যায়নের হাতে।

—কী এ?

—পাথেয় হে কাত্যায়ন।

—প্রয়োজন হবে না।

—মান্যবর, এ স্থবিকা না নিয়ে যাবেন না, মহারাজের আদেশ।

তোরণ পার হচ্ছেন চণক। — এই পর্যন্ত মগধরাজের আদেশ মানি। তারপর আর না।

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। চিত্তক তার আরোহীকে নিয়ে ছুটছে। উষা ক্রমে স্ফুট হচ্ছে। স্থবিকা হাতে বিমূঢ় থেমে আছেন চন্দ্রকেতু। কী বলবেন বিম্বিসার নামে সেই দীর্ণ বিভক্ত মানুষটিকে যিনি তরবারির ওপর ভর দিয়ে কূটকক্ষের অভ্যন্তরে একা দাঁড়িয়ে আছেন?

ক্রমে মহাবন, সেই মহা-অরণ্য মানুষের বহু পূর্ব থেকে যা অধিকার করে আছে জম্বুদ্বীপের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম। মাঝে মাঝে তাকে কেটে পরিষ্কার করে কোনও জন নিজেদের বাসভূমি প্রস্তুত করেছে, মাথা তুলেছে জনপদ। সভ্যতা, বাণিজ্য, কৃষি, নগরায়ণ, সংস্কৃতি, মনন, রাজনীতি। কিন্তু সে কতটুকু!

চিত্তককে বনের প্রবেশপথে একটি আমলকী গাছের সঙ্গে শিথিল বাঁধনে বাঁধলেন তিনি। একটু শক্তি প্রয়োগ করলেই সে বাঁধন ছিঁড়ে মুক্ত হতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্গাত তৃণদলের মধ্যে মুখ নামাল চিত্তক। কত সুখী এই মনুষ্যেতর প্রাণীরা! কত অল্প প্রয়োজন! অল্পতর সান্ত্বনা! চণক মহাবনে প্রবেশ করলেন। যতই যান, বনভূমির আঁচল তাঁকে ঢেকে দিতে থাকে। অনেক চেষ্টায় তিনি সেই কুটিরটিতে আসেন, একদা যা আটবিকরা তাঁর জন্য বেঁধে দিয়েছিল। কুটির নয়, কুটিরের অকিঞ্চিৎকর অবশেষ এখন। চালের একটি খণ্ড বটবৃক্ষের মাথায় দুলছে। খুঁটিগুলি অদৃশ্য। বনভূমির থেকে এক হাত প্রমাণ উঁচু ছিল। সেই উচ্চতার কিছু এখনও টিকে আছে। সেই সরোবর অদূরে, যা দেখে তিনি একদিন বাসস্থান নির্বাচন করেছিলেন। আরও এগিয়ে যান যেখানে একটি জনগোষ্ঠী বাস করে বলে তিনি জানতেন। কোনও চিহ্ন নেই কারও। তৃণে তৃণে গুল্মে গুল্মে ঢেকে গেছে মানুষের চরণচিহ্ন। খসখস শব্দ তুলে চকিত শশক পালিয়ে গেল। ওরাও অমনি করেই পালিয়ে গেছে। ভয়ে। হয়ত শুধু ভয়ে নয়। অজানা আতঙ্ক, কল্পনার অতীত কৃতঘ্নতা হয়ত তাদের ঘৃণাও জাগিয়েছে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। অথচ তিনি তাদের সেই ক্রোধ, আতঙ্ক, ঘৃণার নিরসন করবার চেষ্টা না করে, তাদেরই বাসভূমি অধিকার করে করে মগধরাজ্যের সীমানা বাড়াতে গিয়েছিলেন। কী মূঢ়তা, কী সীমাহীন মূঢ়তা! আরও বন পার হতে থাকেন তিনি। তৃষ্ণা পেলে পান করেন কোনও পল্বলের জল, ক্ষুধাবোধ তাঁকে ছেড়ে গেছে, তবু যখন জঠরের কথা স্মরণ হয় তখন ফল পাওয়া গেলে খান। না পাওয়া গেলে জল আরও জল। চলতে চলতে তিনি বুঝতে পারেন এই অরণ্যই তাঁর নিয়তি ছিল। নইলে উচ্চভূমি, তুষারাবৃত পর্বতের সানু, উজ্জ্বল বারিহীন দিনরাত্রি এবং স্বর্ণ বর্ণের মানুষ দেখে যার অভ্যাস সে কেন এই অরণ্য, এই বৃষ্টি, এই কৃষ্ণদেশকে এত ভালোবাসবে! চলতে চলতে অস্পষ্টভাবে তাঁর আরও মনে হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রবাহ যা অরণ্য ভেদ করে কৃষ্ণ ভারতের অভিমুখে ছুটে চলেছে, রক্তের ভেতরের কোন অজানা তৃষ্ণায়, তৃষ্ণা মেটাবারও তৃষ্ণায়। সম্ভবত তাঁকে চালিত করছে এক অমোঘ শক্তি যা জম্বুদ্বীপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের একটি সূচক বলে তাঁকে চিহ্নিত করেছে। তাঁর এবং এই দেশের ভবিতব্য হয়ত বা এক ও অভিন্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম্পরাক্রমে রাজশাস্ত্রের যে চর্চা তাঁরা করে আসছেন তারই বলে হয়ত স্বদেশের ভাগ্যে ভাগ্য মেলাবার এই দুরূহ পুরস্কার তাঁর। কোনও সত্য-সাম্রাজ্য স্থাপনের গুপ্ত মন্ত্র উদ্ভাসিত হচ্ছে তাঁর কাছে আজ, শান্তরস তপোভূমির আশ্রয়ে নয়, অনার্য-অধ্যুষিত এই আদিমানবী অরণ্যানীর গুণ্ঠনের তলায়।

ক্রমশই চণক ঢুকে যেতে লাগলেন আরও গভীরে, গহনে, গম্ভীরে। চতুর্দিকে বনস্পতিসকল আকাশ বিদ্ধ করে নিঃশব্দ কোলাহল করতে থাকল। দেখো হে মানব, মৃত্তিকায় প্রোথিত চরণ, তবু ঊর্ধ্বে উঠি। যত দূর চক্ষু যায় তত দূর, আরও দূর। সূর্যশিখার সন্ধানে ক্রমাগত নভস্তল বিঁধে চলি। শাখাপ্রশাখাগুলিকে প্রচারিত করে দিই শূন্যমণ্ডলে। বিমুক্ত, অনপেক্ষ, আদিম তবু নবীন, সকল শীতবসন্ত বুকে নিয়ে চিরস্থির তবু চিরপ্রচল।

স্পর্ধিত এই বনবাণী শুনতে শুনতে হর্ষে, রোমাঞ্চে, আক্ষেপে, আক্রোশে, পিপাসায়, অন্বেষায়, ত্রাসে, বিস্ময়ে, দুঃখে, মোহে এক সময়ে তাঁর বাস্তবের জ্ঞান হারিয়ে গেল। সময়ের হৃৎস্পন্দন শোনা যায় না। সময় চলেছে তাঁরই সঙ্গে একীভূত হয়ে, তাঁরই অনুভূমিক বক্ররৈখিক ভঙ্গিতে। এক অনাদ্যন্ত ব্রাহ্মমুহূর্ত ক্রমাগত চলে চলেও তিনি পার হতে পারছেন না এই বোধ তাঁকে আক্রান্ত করল। মস্তিষ্ক হারিয়ে ফেলল তার অনবদ্য ভাবনা-প্রতিভা, স্মৃতি, তার প্রখর আত্মজ্ঞান ও সাধন-সংকল্প, স্বাতন্ত্র্য।

ঘন গুল্ম, লতাপাতা, কোমল বৃক্ষকাণ্ড, শাখাপ্রশাখা দু হাতে সরাতে সরাতে কঠিন শাল-শাল্মলী-অশ্বত্থ-ন্যগ্রোধ-অর্জুন-সপ্তপর্ণী কাণ্ডে দু হাতে আঘাত করতে করতে চিৎকার করে চণক ডাকতে লাগলেন—রগ্‌গা, রগ্‌গা, রগ্‌গা, রগ্‌গা, রগ্‌গা.... গম্ভীর নাদের সেই ডাক ক্রমশ ভাঙতে লাগল—কর্কশ, করুণ, শক্তিহীন, ক্রমশ তা ঝিল্লির ডাকের মতো নিরন্তর এক অরণ্যধ্বনি হয়ে গেল। তিনি নিয়ন্ত্রণহীন, সংজ্ঞাহীন পড়ে গেলেন সেই মহাবনের গহন গভীর বক্ষের কোমলতম কজ্জলিত মৃত্তিকায়। অবিকল যেন একটি দীর্ঘ শালবৃক্ষ, সমূল উৎপাটিত। দীর্ঘ হাত দুটি সামনে ছড়িয়ে রইল, বজ্রমুষ্টি খুলে গেল ক্রমশ ? তিনি কি প্রথমে কিছু ধরতে চেয়েছিলেন ? দুর্মূল্য কোনও কিছু ? তার পর সেই বস্তুর ওপর আস্থা হারিয়ে, মায়া হারিয়ে তাকে মুঠি খুলে ফেলে দিয়েছেন ! পা দুটি মহাশালের নিষ্পত্র শাখা, কেটে রাখা হয়েছে, দক্ষ বর্ধকিরা অদূরভবিষ্যতে কাজে লাগবে বুঝি বা। তাঁর সুগঠিত নাসা ডুবে গেছে ঝরাপাতার স্তূপে। ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে সমস্ত মুখমণ্ডলটিই। সম্ভবত তাঁর অন্তরাত্মা লুকোতে চাইছে। কিংবা আশ্রয় চাইছে ধরিত্রীর গভীরে। আশাহীন কোনও মহাসংকটে পরাজিত মহাবীরেরা বীরাঙ্গনারা এইভাবেই আশ্রয় চান ধরিত্রীর কাছে।

উপকথালোক ছেড়ে উড়ে আসে ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধ ভূশণ্ডী কাক, ক্রমাগত ডানা ভাসিয়ে ভাসিয়ে আসতে থাকে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী। আসে শুক-সারী, অমিতায়ু উলূক।

—কে ধায় ? কে যায় ?

—এক প্রেমী পুরুষ। আর ধায় না, যায় না, এখন শয়ান। এখন শব।

—কাকে স্নেহ করেছিল ?

—স্বজাতিকে, স্বদেশকে, যাকে পৃথিবী বলে জেনেছিল।

—আর কাকেও ?

—আর সেই পৃথিবীকে ধারণ ভরণ করতে পারেন এমন একজনকে।

—আর কাকেও ?

—বড় জটিল এই স্নেহ স্নেহান্তরের কথা...আর কারও অসুখও তাই এত জটিল নয়।

—আরোগ্য হবে না ?

—সময়ান্ত হলে হবে, নইলে নয়।

—এমন কেন হয় ? এ অসুখে কেউ কষ্ট পায়, কেউ পায় না...

—সময়কে হারাতে চায় যারা তাদেরই বোধহয় এ অসুখ করে...

—অসুখও তবে এক প্রকার সুখ ?...সুখ...সুখ...সুখ এবং ঠিক সেই সময়ে, পরিপূর্ণ সভাগৃহে, বামে বর্ষকার, দক্ষিণে সুনীথ সর্বার্থক সচিবদ্বয়, অবিদূরে চন্দ্রকেতু বিনিশ্চয়কার, অহিপারক নগর শ্রেষ্ঠী, দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশে কুমার অভয় বীরপুরুষ যিনি অবন্তীর আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন এবং হল্ল ও বেহল্ল ছেল্লনাদেবীর পুত্রদ্বয়, আরও বহু অমাত্য, দ্বারপাশে ধনুর্গ্রহ দ্বারী, পিছনে চামরধারিণীরা, ঝলসে উঠল বর্শা কুনিয়র হাতে।

এত অবাক যেন অমাত্যরা আর কখনও হননি। ঠিক এমনটি তাঁরা কেউই ভাবেননি। কুমারের স্বপক্ষীয়রা না, বিপক্ষীয়রাও না। মন্ত্র এখনও গুপ্ত। প্রকৃত বিপদ শ্রমণ গৌতমের, তিনিই মহারাজকে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছেন। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় মহারাজকে ঘিরে এমন ঘটনা ঘটতে পারে কারওই কল্পনায় ছিল না। বর্ষকার সুনীথ কুমারের আনুগত্য স্বীকার করেছেন। অহিপারক তাঁকে অর্থসাহায্য করবেন কথা দিয়েছেন। কিন্তু তা ইতিকর্তব্য স্থির হবার পর। চন্দ্রকেতু এবং তাঁর অনুগত অমাত্যরা তরোয়ালের কোষে হাত রাখলেন। অভয় স্থিরবুদ্ধি মানুষ। পাছে কেউ মনে করে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকার চাইছেন তাই নিজেকে সতর্কভাবে সঙ্কুচিত রাখেন। আজ তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হল্ল বেহল্লর চোখে মহাভয়। ভয় বিস্ময় অনুপস্থিত শুধু রাজার চোখে। সামান্য কৌতুক সেখানে এবং ক্লান্তি।

মহিষী কোশলকুমারী কদিন উপর্যুপরি দুঃস্বপ্ন দেখে ঘর্মাক্ত হয়ে জেগে উঠছেন। প্রতিদিন প্রত্যুষে তিনি তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেন।

—কদিন বিশ্রাম করুন মহারাজ, অন্তঃপুর থেকে বেরোবেন না।

—কেন ?

—স্বপ্ন দেখলাম গিজ্‌ঝকুটের গিজ্‌ঝমুণ্ডটা পড়ে যাচ্ছে, আপনার শির চূর্ণ করে দিল।

—স্বপ্ন দেখলাম জল, ভীষণ তরঙ্গ এক ছুটে আসছে। আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

—মহারাজ যাবেন না, স্বপ্ন দেখলাম দক্ষিণবনে দাবানল লেগেছে। আপনি একটি বৃক্ষ, পুড়ে যাচ্ছেন...

—দেবি, তথাগত বলেছেন, দুঃস্বপ্ন শরীর মনের বিকারমাত্র।

—যাবেন না মহারাজ, বন্ধ থাক সভা—ছুটে এসেছেন ছেল্লনা।

—কেন ?

—কেমন ভালো লাগছে না। কুমার কদিন কেমন অস্থির, চঞ্চল...

—যখন দীর্ঘদিন ধরে তাকে তপ্ত করেছিলে মনে হয়নি এমন দিন আসবে ?

অশ্রুমুখী ছেল্লনা, ভয়ার্ত কোশলকুমারীকে পেছনে ফেলে অন্তঃপুরের দ্বার পেরিয়েছিলেন তিনি।

—একমাত্র কাপুরুষেরাই অবরোধের বিবরে মুখ লুকোয় দেবি, বিম্বিসার তো কাপুরুষ বলে সাম্রাজ্য-বিস্তার বন্ধ রাখেনি !

তিষ্যকুমারের শেষ পত্রটির কথা স্মরণ করলেন তিনি। সে তার যথাসাধ্য যত্ন করেছে। প্রত্যেক রাজা, কোশলের তো নিশ্চয়ই, কুরুর, পঞ্চালের, কৌশাম্বীর, উজ্জয়িনীর, বৈশালীর গণরাজারা সবাই তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্বীকার করেছেন। কিন্তু রাজসংঘের ব্যাপারটি কেউই ভালো করে বোঝেননি।

—বোঝেননি ? না বুঝতে চাননি ? ব্যক্তি বিম্বিসারের তাঁরা সবাই সুহৃৎ। সুহৃৎ ? রাজা সেনিয় বিম্বিসার হাসেন। রাজনীতির নিরুক্ত-কারিকায় সুহৃৎ কথাটি বড় আপেক্ষিক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে, ব্যক্তিগত, কুলগত, গোষ্ঠীগত স্বার্থে একজন আর একজনের সুহৃৎ হয়। বৃহৎ রাজনৈতিক স্বার্থও আছে। কিন্তু বৃহৎ হলেও তা তো স্বার্থই ! নিঃস্বার্থ বন্ধুতা কোনও রাজা কারও কাছ থেকে চাইতে পারেন না। চাওয়া ভ্রম। সে ভ্রমের মূল্য তাঁকে হৃৎ-পিণ্ড ছিঁড়ে দিতে হয়েছে। ব্যক্তি বিম্বিসার ? ব্যক্তি বিম্বিসার কে ? তাকে কেউ দেখতে পায় ? দর্পণ ? দর্পণও দেখে কি ? সেই ব্যক্তি বিম্বিসারকে জম্বুদ্বীপের রাজকুল আশ্বাস দিয়েছেন নাকি ? তিষ্য বলছে। তিষ্য আরও বলছে...রাজসংঘের তত্ত্ব বোধগম্য হতে আর একটু সময় লাগবে। সময় ? তিনি হাসেন ? সময় আছে নাকি ? তিনি তো দেখছেন, সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। সময় আর থাকছে না। তিনি তাঁর রক্তের মধ্যে সময়ের সেই অবলোপ অনুভব করছেন যে !

হে তথাগত, এই জীবন ততটুকুই পারবে যতটুকু ব্যক্তির কর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। হে তথাগত, এই জীবন বহু আকাঙ্ক্ষার যোগফল, তুমি বলেছ। জীবনের শেষে মৃত্যু। দুর্বার। কেমনভাবে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবে সে-ই স্থির করে। হে তথাগত...

ডান হাতটি তুললেন মহারাজ। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে নয়। যেন বরাভয় দিচ্ছেন। অদ্ভুত! হত্যা করতে যাচ্ছে ঘাতক, তাকে অভয় দিচ্ছেন নাকি? মহাপাপ, মহাপাপ থেকে মহাভয়। অনন্ত নরক। জীবনে এবং জীবনান্তে। তাই অভয়!

—পিতাকে হত্যা করতে চাও? কেন?—একেবারে নিরুদ্বেগ প্রশ্ন, যেন অস্ত্র তোলেনি, কন্দুক তুলেছে কোনও বালক।

—আর কতকাল এই সিংহাসনে বসে আমার পথরোধ করে থাকবেন? আর কতকাল? কত আয়ু আপনার?

সভা শ্বাসরুদ্ধ করে শুনছে। সুনীথ, অহিপারক মুখ নত করেছেন, লজ্জায়, দুঃখে। কোনও নীতি নয়। লোভ, বর্বর লোভের কথাই শেষ পর্যন্ত বলল কুমার? বর্ষকার চেয়ে আছেন দূরের প্রাচীরের দিকে। কী ভাবছেন, বোঝা যায় না। সম্ভবত কী করে এই লোভকে বীর্যে পরিণত করা যায়, সেই কথা ভাবছেন উপায়কুশল মহাসচিব। চন্দ্রকেতুর মুঠির তরোয়াল কোষমুক্ত।

বিম্বিসার উঠে দাঁড়ালেন। কৌতুকের চিহ্ন মুছে গেছে মুখ থেকে।

—বসো। এ আসন ছেড়ে দিলাম। পিতৃরক্ত পাত করা কুশল কর্ম নয়।

সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন তিনি। উত্তরীয়টি লুটোতে লুটোতে অবশেষে খসে পড়ে গেল। রাজসভা এবং অন্তঃপুরের মধ্যবর্তী পথে ছিন্ন পতাকার মতো পড়ে রইল।

যত দূর দেখা যায় দেখলেন সভাসদরা। সিংহকটি এখনও, প্রশস্ত পিঠ, পেশল কাঁধ। বীরপুরুষের আকৃতি। বীর কিন্তু অনিচ্ছু। নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

পরিপূর্ণ সভার অনুচ্চারিত ধিক্কারের মধ্যে ভ্রূকুটি ভীষণ মুখে অজাতশত্রু সিংহাসনে বসলেন।

AMARBOI.COM

পুষ্পলাবীর গবাক্ষপথে জিতসোমা দেখল পথ যেন জনহীন। দু চারজন যা চলাফেরা করছে অত্যন্ত সন্তর্পণে, যেন প্রয়োজন সমাধা হয়ে গেলেই আপন বিবরে মুখ লুকোবে। সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কুমার কুনিয় নাকি রাজসভায় সর্বসমক্ষে মহারাজকে হত্যা করতে গিয়েছিল এবং মহারাজ রাজদণ্ড সেই পাপীর হাতে তুলে দিয়ে, রাজমুকুট সেই পাপীর মাথায় পরিয়ে সভাত্যাগ করেছেন।

—এ কী করলেন মহারাজ? তাঁর অনুগত রক্ষী, অমাত্য এরাও তো কিছু অল্প ছিল না। এতেই কি তিনি বাঁচতে পারবেন? শুধু জীবনের প্রতিই এত মায়া!

সহচরী বৃন্দা বলল—পুত্রের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করবেন? পিতা-পুত্র পরস্পরের রক্তপাত করছে সেটাই কি ভালো? শুনেছি অমাত্যরা সব মাথা নত করে বসেছিলেন, কেউ একটি কথাও বলেননি, কী বুঝবেন এতে রাজা?

ব্যর্থ ক্রোধে কক্ষের চারপাশে ঘোরে জিতসোমা। নিজেকে এত অযোগ্য মনে হয়! ওই সভায় উপস্থিত থাকার অধিকার সে কোনও মতেই অর্জন করতে পারেনি। মহারাজ তাকে ভূতকভোগী অমাত্যের পদ দিলেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু তা গুপ্ত রইল। এই গোপনতায় তার সম্মত হওয়া উচিত ছিল কি। কুনিয়-দেবদত্তর দলকে দমন করার যে পরিকল্পনা সে করেছিল তা-ও মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করার সময় পাওয়া গেল না। এই থের-দেবদত্ত নিজেকে প্রকৃত বুদ্ধ বলে প্রচার করছেন। তাইতে মহারাজ বিরক্ত, ক্রুদ্ধ। সোমা তাঁকে বার বার বলছে রাজগৃহ তো কোনও শ্রমণ কোনও সন্ন্যাসীকেই ফেরায় না! কূটনীতির অঙ্গরূপে মহারাজ থের দেবদত্তকেও উপহার পাঠান না! গয়াশিরে তাঁকে একটি সুন্দর বিহার করে দিন! নিরাপদ দূরত্বও থাকবে, আবার বুদ্ধদ্বেষী এই স্থবির প্রশমিতও হবেন। দেবদত্ত রাজগৃহ থেকে দূরে এবং তুষ্ট থাকলে কুমারের সাহস দম্ভ আস্ফালন সবই অল্প হয়ে যাবে, কারণ অলৌকিক শক্তির ওপর কুমারের বিশ্বাস বালকের মতো। কিন্তু মহারাজ এত কূটনীতিজ্ঞ হয়েও এইটুকু করতে চাইলেন না। বুদ্ধদ্বেষী কাউকে তিনি কোনও ছলেই সইবেন না। ...হয়ত মহারাজ মনে করেন- অকপট, অচঞ্চল থাকলে তথাগতই তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু এ বিশ্বাস কি ঠিক? তা হলে যে মুহূর্তে কুনিয়র হাত পিতৃবধে উদ্যত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল, সে মুহূর্তে সে হাত কেন খসে পড়ল না ? নাকি মহারাজ ওই সন্ন্যাসীকে আপন প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন ?

জিতসোমা রক্ষীপ্রধানকে ডেকে পাঠায়। সে কিছু বলবার আগেই রক্ষীপ্রধান বলে—সেনাপতির কাছ হতে আদেশ এসেছে দেবি, আমরা কিছুক্ষণের জন্য যাচ্ছি।

—কেন ডেকেছেন ?

—তা তো জানি না।

—অনুমানও করতে পারো না ?

—অতিশয় গোপন কথা দেবি, সম্ভবত সেনাপতি আমাদের যতজনকে পারেন একত্র করতে চাইছেন।

—যাও।

রক্ষীদের বিদায় দিয়ে জিতসোমা প্রসাধনকক্ষে যায়। দীর্ঘ কেশ কাঁধ পর্যন্ত কেটে ফেলে। বক্ষে চর্মের বর্ম বাঁধে। পায়ে উপানৎ। পিঠে তূণ, কটিতে ছুরিকা। মাথায় করোটিকা শিরস্ত্রাণ। হাতে, জানুতে লাগিয়ে নেয় স্থূল চর্মের পট্টিকা, তাণ্ডব-নৃত্যের নটী সে, পুরুষসুলভ চলনের ছন্দ আয়ত্ত করতে তার বিলম্ব হয় না। সে অপেক্ষা করে। তার অনুগত রক্ষীদের অপেক্ষা।

এক দিন যায়, দু দিন যায়, তৃতীয় দিনও যায় যায়। রক্ষীরা আসে না। আসে কুমার। সংবাদ পেয়ে জিতসোমা বর্ম, শিরস্ত্রাণ, অস্ত্র, উপানৎ সব নামিয়ে রাখে। শুধু বসনের মধ্যে থাকে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা।

আসনশালায় ভ্রূকুঞ্চিত মুখে কুমার কুনিয়, সঙ্গে রক্ষীরা। এবং এক শ্রমণ।

—ঘোষণা শুনতে পেয়েছ ?

—পেয়েছি। এক দুর্বৃত্ত পিতার হাত থেকে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছে।

—সাবধান...সাবধান সোমা...কুনিয় চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায়।

—মিথ্যা বলেছি ?

—কুমার বীরোচিত কর্ম করেছে—পাশে এসে দাঁড়ালেন দীর্ঘদেহী শ্রমণ।

—বীর ? —সোমা যত না ক্রুদ্ধ তার চেয়েও বুঝি বিস্মিত।

—কাপুরুষের হাতে রাজদণ্ড থাকা না-থাকা সমান নারী। যে সন্ন্যাসীর নির্দেশে রাজ্য চালায় তার ওপর কে আস্থা রাখবে ?

এই তা হলে সেই স্থবির দেবদত্ত !

বৌদ্ধ ধর্মসংঘের ভেতরে ইনি রাষ্ট্রীয় রাজনীতির কীট ঢুকিয়ে দিলেন তা হলে। এ কি কোনও সনাতন ঐতিহ্য ? না কোনও ইতিহাসের আরম্ভ হল এভাবে ? নির্বাসনা প্রব্রাজকরা তা হলে রাজনীতিতে এত বড় শক্তি ? কারণ ? কারণ কী ? অশন-বসন নয়, বিলাস নয়, নারীও নয়, প্রভুত্ব। আর সব বাসনা যখন যায়, তখন সব বাসনার শক্তি একত্রিত হয় প্রভুত্বের বাসনায়। জিতসোমার মাথার ভেতরে রাজশাস্ত্রের কয়েকটি শূন্য পাতা উল্টে যাচ্ছে। সে লিখছে : সাবধান ! রাজপুরোহিত শুধু ধর্মকার্যে রাজাকে সহায়তা করেন না। তিনি এবং যে কোনও পন্থের প্রব্রাজকদের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। সাধারণ সূত্র—ক্ষমতার লোভ। প্রয়োগের ক্ষেত্র—প্রজাসাধারণ। উভয়েরই অস্ত্র—ভয়। রাজা ধনমানপ্রাণের ভয় সব সময়ে জাগিয়ে রাখেন রাজদণ্ড সামনে রেখে। আর সন্ন্যাসীর পলাশদণ্ড ? অভিশাপের ভয়, নরকের ভয়, তির্যগ্‌ বা হীনযোনিতে জন্মের ভয়। হে রাজন, ভবিষ্যৎ যুগের রাজাসকল, আপনারা যদি সত্য সত্যই প্রজাপালক, লোকসেবক হন, হতে চান, তা হলে যে প্রব্রাজক, পুরোহিত, বৈরাগী আপনার ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে তাকে গূঢ়, কূট, স্বার্থসন্ধানী জেনে দূরে রাখবেন। রাজা ও সন্ন্যাসী একত্র হলে তা কোনও অর্থেই রাজ্যের পক্ষে শুভ নয়। রাজার পক্ষেও তা শেষ পর্যন্ত অশুভ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মহারাজ বিম্বিসারের ক্ষেত্রে হল।

—কথা বলছ না কেন জিতসোমা ? এ কি ! কেশ কেটে ফেলেছ কেন ?

—এ তো কেশমাত্র, কারও মাথা তো আর নয় !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী বললে ? রাজা কুনিয়র মাথা নিতে চাও ?

রুষ্ট চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় জিতসোমা।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হাসে কুনিয়, বলে—যাই হোক মহামান্য কাত্যায়নও তো এই কথাই বলেন, সে একটি পুঁথি বার করে, —পড়তে থাকে : যে রাজ্য নিজেকে বিতত করে না, প্রতিবেশী রাজ্যের অন্যায় সয়ে যায় সে রাজ্যের আয়ু শেষ হয়ে আসে।...মহামান্য চণক আমাদের সঙ্গে সহমত।

চমকে ওঠে জিতসোমা, কিছু বলে না।

দেবদত্ত বলেন—তক্ষশিলার স্নাতক। রাজশাস্ত্রের রচয়িতা তিনি। বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন—এ আর অধিক কী ?

কুনিয় তির্যক চোখে চেয়ে বলল—তিনি যে শ্রমণ গৌতমকে সবার সামনে স্পর্ধা জানালেন, তিরস্কার করলেন, তাঁর প্রভাব যে রাজার পক্ষে, রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এ কথা স্পষ্ট জানালেন—তাইতেই তো আমরা আরও ত্বরা করলাম। যে কোনও উত্থানের পেছনে তাত্ত্বিকের সমর্থন থাকা প্রয়োজন। তক্ষশিলক না হতে পারি। পণ্ডিতদের মেনে চলি।

—এ পুঁথি কোথায় পেলেন ? ছিন্ন কেন ?

—গান্ধার ভবনে! আর কোথায় পাবো ? পাতাগুলি কক্ষের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করছিল।

—সে কী ? তিনি কোথায় ?

—আমরা সন্ধান করছি। মনে শঙ্কা রেখো না সোমা। দৈবরাত চণককে আমরা মাথায় করে রাখব। আর তোমাকে ?...

কুমার কুনিয় এখন রাজা অজাতশত্রু, তার কথা শেষ করল না। প্রকৃতপক্ষে সে সোমাকে কোনও নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না। অন্তঃপুরে তার মহিষী পদুমাবতী অত্যন্ত চতুর, ক্ষমতাবতী, অভিমানিনী হয়ে উঠেছে। সদ্যবিবাহিতা সুন্দরী তরুণী, কুনিয়র তার প্রতি আকর্ষণও কিছু অল্প নয়। অথচ সোমা এক অমূল্য সম্পদ, পিতার সঙ্গে সংগ্রাম করে পাওয়া। সোমাকে হারাতে হলে...হারাতে হলে...কুমার ক্ষিপ্তের মতো ঘাড় ফেরায়। না। না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। শ্মশানের স্তব্ধতা চারদিকে। কিন্তু রাজগৃহের ঘরে ঘরে শিশু, রোগী ও অতিবৃদ্ধ ছাড়া নিদ্রা যায়নি কেউ। যুবরাজ অজাতশত্রু রাজা হয়েছেন এ ঘোষণা চলেছে সারাদিন, রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত। এখন সে ঘোষণাও বুঝি ক্লান্ত। যারা এতদিন রাজাকে দোষারোপ করছিল, তারা বিষণ্ণ হয়ে ঘরের মধ্যে বসে। হট্টে, আপণে ক্রয়-বিক্রয় তেমন হয়নি। বিম্বিসার সমালোচিত হলেও লোকপ্রিয় ছিলেন, প্রজাদের ক্ষতি কখনও করেননি। পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে যে সিংহাসনে বসে, তার হাতে নিরাপত্তা থাকবে কিনা এই প্রশ্নে ভারাক্রান্ত সবার মন। কিন্তু রাজপরিবারের ব্যাপার, অমাত্যরাই কিছু বলছেন না, সাধারণে কী বলবে !

মহাশ্রেষ্ঠী যোতীয় জটিল শ্রেষ্ঠীকে বললেন—বুঝলে কিছু ?

জটিল সতর্ক কণ্ঠে বললেন—আমাদের ধনমানপ্রাণ ?

—নিরাপদ ছিল, এখন বিপন্ন।

—বলছেন ?

—বলছি—স্থূল ভ্রূযুগের মধ্যে অসংখ্য কুঞ্চন, যোতীয় চোখ দুটিও কুঞ্চিত করে যেন অদূরকালের অভিসন্ধি বোঝবার জন্য সামনে চেয়ে রইলেন।

—রাজ্যের হয়ত ভালোই হবে। মহারাজ তো ইদানীং...

—বাক্য শেষ করো জটিল। মহারাজ তো ইদানীং কী ? সুবিচার করছিলেন না ? না, তোমার সঞ্চিত ধনের কলসগুলি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ! কোনটি ?

—কোনওটিই নয় মহাসেট্‌ঠি, রাজোচিত উদ্যম-উদ্যোগের কিছু অভাব দেখা দিয়েছিল। এই মাত্র।

—তোমারও পুত্র আছে জটিল। ভেবে দেখো...

রাজসভাতেও অমাত্যরা গম্ভীর মুখে বসে থাকেন, গ্রামণীরা ব্যাপার শুনে শুষ্কমুখে ফিরে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যান। রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী অহিপারক দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকেন, তাঁর নাকি কঠিন অসুখ। অন্তঃপুর থেকে সংবাদ আসে রানিরা অজাতশত্রুর সাক্ষাৎ-প্রার্থী। থের দেবদত্ত বলেন—সাবধান মহারাজ, আপনার পিতা ছিলেন লোকপ্রিয়। তাঁকে চক্ষের সামনে রেখে রাজত্ব করা দুষ্কর হবে। আরও সাবধান, আপনার মাতারা আপনাকে দ্রব করতে চেষ্টা করবেন।

সেনানীগ্রামে উপঢৌকন যায়—সেনারা নতুন রাজার অভিষেক উপলক্ষে উৎসব করো। নৃত্য-গীত, ভোজ, যত প্রকার আমোদ-প্রমোদ জানা আছে,সব। ব্যয় বহন করবেন রাজা। রাজ্যময় উৎসবের ঘোষণা হতে থাকে। অন্ত্যজ-পল্লীতে নতুন বস্ত্র, গন্ধানুলেপন, উৎকৃষ্ট তণ্ডুল বিতরিত হয়। দান যায় শাক্যপুত্রীয় ছাড়া অন্য শ্রমণসংঘগুলিতে। রাজা অজাতশত্রু অন্তঃপুরে আসেন ভয়ানক অপরিচিত মুখ নিয়ে, সঙ্গে নতুন রক্ষী সব। অঙ্গদেশ থেকে এসেছে। আদেশ হয়—

—কারারুদ্ধ থাকবেন রাজপিতা, এখন থেকে।

আর্তনাদ করে ওঠেন রানিরা।

বিম্বিসার বলেন—আর কী চাও ?

—রাজদ্রোহ প্রচার করছেন অন্তঃপুরে বসে।

—প্রমাণ ?

—আপনাকে দেখাতে শোনাতে বাধ্য নই।

অস্ত্র ঝনঝন করতে করতে চলে গেল অজাতশত্রু।

ছেল্লনা সকাতরে বললেন—মহারাজ! কিছু করুন।

—আর কিছু হয় না—বিম্বিসার বললেন— এ-ই আমার কর্মফল। তোমারও কর্মফল রাজ্ঞী। হল্ল-বেহল্লকে অবিলম্বে সেচনকের পিঠে মাতুলালয়ে পাঠাও।

AMARBOI.COM

—হল্ল-বেহল্ল নিয়ে গেছে আমার মঙ্গলহস্তী আঠার লহর রত্নহার। এ সব রাজার সম্পদ। —অজাতশত্রু ক্রোধে আগুন হয়ে কারাগারে প্রবেশ করে—কেন দিয়েছেন ?

—এক পুত্রকে সমগ্র রাজ্য দিলাম। আর দুই পুত্রকে মাত্র একটি হস্তী ও একটি রত্নহার। অন্যায় হল ?

—ওই হস্তী রাজার বাহন। ওই হার কণ্ঠে নিয়ে রাজা সিংহাসনে বসেন।

—ভদ্রাবতী আছে, নালাগিরি আছে, বাহনের অভাব কী ? রত্নহারেরও অভাব নেই কোষাগারে।

ক্রোধে গর্জন করে অজাতশত্রু।

ক্ষীণভাবে মনে পড়ে রাজার, এই পুত্র তাঁর প্রথম বৈধ পুত্র। একে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে দেখেছেন মাতৃগর্ভে। ভূমিষ্ঠ হবার পর সে কী উৎসব সমস্ত রাজ্যে! কুনিয়কে অদেয় সেদিন তাঁর কিছুই ছিল না। সারা বাল্য এই পুত্রের কেটেছে তাঁর প্রশ্রয়ে, সচিবরা বলেছিল তক্ষশিলায় পাঠাতে। অত দূরে বলে তিনি বারাণসী থেকে আচার্য আনান। স্বতন্ত্র প্রাসাদে আচার্য এবং শস্ত্রাচার্যদের কাছে শিক্ষা কুনিয়র। কোশলদেবীর এতে আপত্তি ছিল। তিনি ঐতিহ্যশালী কোশল রাজবংশের কন্যা, তক্ষশিলার শিক্ষা না হলে সত্যিকার রাজবংশের উপযুক্ত হবে না পুত্র, এইজাতীয় মনোভাব তাঁর ছিল। কিন্তু কুনিয় নিজেও যেতে চাইল না। তিনিও মেনে নিলেন। ফলে, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য পালনই করতে হয়নি কুমারকে। আরও অতিরিক্ত স্নেহ ছিল তার দেহগত ত্রুটির জন্য।

—হল্ল-বেহল্লকে ফিরে আসতে আদেশ করুন। হস্তী এবং হার নিয়ে।

—তারা পালিয়েছে প্রাণের ভয়ে কুনিয়। অভয় দিলে নিশ্চয়ই আসবে।

আর উপহার দিয়ে ফিরিয়ে নেবার আগে বিম্বিসারের মৃত্যুও ভালো।

—তবে তাই হোক। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে উচ্চারণ করে সে।

অজাতশত্রু আদেশ দিয়ে গেল বন্দীর আহার বন্ধ। কেউ যেতে পারবে না তাঁকে দেখতে, একমাত্র কোশলদেবী ছাড়া।

কদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ হয়ে যান বিম্বিসার! অন্ধ কারাকক্ষে একটিমাত্র ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে গৃধ্রকূট দেখা যায়, আলোকিত সেই বিন্দুটির দিকে চেয়ে চেয়ে রাজ্যচ্যুত মগধরাজ ভাবেন—কে আমি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যই বা কী ? ষোড়শ বর্ষের যে কিশোরকে তার পিতা রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন, যে যুবক শত্রুরাজ্যের শত বিপদ অগ্রাহ্য করে এক অনন্যার প্রণয়াহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, যে পরিণতযৌবন বীরপুরুষ এক অলোকসামান্য শ্রমণকে আত্মনিবেদন করেছিল, সে কি সত্য ? না এই ক্ষুৎপিপাসা-কাতর ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ সত্য ? দুটি আমিই কি এক ব্যক্তি হতে পারে ? কোন্ কর্মফল দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির, ভিন্ন ভাগ্যের মানুষকে যুক্ত করছে ? মঙ্গলহস্তীর পিঠে সেইসব দুঃসাহসী অভিযান...শতসহস্র প্রজার জয়ধ্বনি, সপারিষদ সেই সব তীর্থগমন !

ক্রমশ হতবল হতে থাকে শরীর। অবসন্ন মন। চৈতন্য আবিল। বৃদ্ধ আর ভালো করে দেখতে পান না। চিন্তাগুলি বিবর্ণ চিত্র গড়ে। গড়ে আর ভেঙে যায়। শত চেষ্টা করেও সেগুলি সমঞ্জস ও সুস্থির রাখতে পারেন না। কে আমি ? এই চেতনা যাকে আমি বলে জানে সে কে ? কয়েক দিন আগেও তো সে ছিল না ? হায় তথাগত ! বলেছিলে বটে প্রতিটি ক্ষণ স্বতন্ত্র ; নিরবচ্ছিন্ন ধারে ক্ষণ পরম্পরা আসে তাই মনে হয় এক। প্রকৃতপক্ষে এক নয়। বালক বিম্বিসার, যে জলের মুকুরে মুখ দেখত, বান্ধবী সুমনাকে যখন তখন প্রহার করত ও প্রহার খেত, যে বিম্বিসার পিতার পরাজয়ের শোধ নিতে অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে হারিয়ে নির্মূল করে দেয়, যে বিম্বিসার মহাসমারোহে শ্রাবস্তীর রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করল সমবেত জয়কারের মধ্য দিয়ে, এক শ্রমণ যুবকের অলোকসামান্য প্রতিভাচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে যে তাঁকে রাজন্যপদ, সেনাপতিপদ সব দিতে চাইল, দেশনা শুনছে, মহারানি ক্ষেমার সঙ্গে রহস্যালাপে মত্ত, চণক...দৈবরাত চণকের সঙ্গে সেই আশ্চর্য মিলনে মিলিত বিম্বিসার, ভোজনগৃহের কেন্দ্রে আমরণ বন্ধুত্বের অঙ্গীকার...হায় চণক...হায়, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিম্বিসার, নানা বিম্বিসারের এক মালা এ। একটির কর্ম অন্যটিকে সৃষ্টি করে যাচ্ছে ক্রমাগত, তৈলধারের মতো। এগুলিকে স্বতন্ত্র বলে পরিষ্কার চিনতে পারছেন তিনি আজ। কার্যকারণ সম্পর্কে বিম্বিসারগুলি গ্রথিত।

ভগবন, ভগবন পিপাসায় বুক ফেটে যায়। করুণা করো করুণা করো। তোমার সেই অলৌকিক করুণাধারে স্নাত করাও এই বিম্বিসারের জীবন, যা শেষ, ব্যর্থ হতে চলেছে। এ কি ঘোর অন্যায় ? ঘোরতর পাপ ! আত্মজ হয়ে স্নেহশীল পিতাকে কারারুদ্ধ করে ? অনাহারে হত্যা করে ? জননীর দেহ অনুসন্ধান করায় ! কোন্ কর্মফলে এই ব্যর্থ পিতা, ব্যর্থ রাজা সৃষ্টি হল ? হে ভগবন !

গবাক্ষের দিকে মুখ তুলে চান বন্দী। কী আশ্চর্য ! তথাগত আবির্ভূত হয়েছেন ! পসেনদিকে সহস্র বুদ্ধ দেখিয়েছিলেন, আজ বিম্বিসারের ডাকে তমসের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। চোখ ভরে, প্রাণ ভরে সেই অতীন্দ্রিয় দৃশ্য দেখতে থাকেন বিম্বিসার। মহাশূন্যের পটে ভগবান তথাগত বুদ্ধ। দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে অবশেষে বিম্বিসার নামের একদা প্রতাপশালী প্রজারঞ্জক অধুনা আত্মপরিচয়হারা, দীনাতিদীন বন্দী সহসা বুঝতে পারেন, এ কোনও অলৌকিক আবির্ভাব নয়। এখন কারার বাইরে পৃথিবীতে প্রত্যূষ এসেছে। তথাগত দেশান্তরে ছিলেন, এসে নিদারুণ সংবাদ শুনেছেন, রাজগৃহের বিস্ফোরক বাতাবরণে নিষ্ঠুর রাজনীতির কাছে উপরোধ করে বিম্বিসারকে মুক্ত করবার সাধ্য তাঁর নেই। তিনি শুনেছেন গৃধ্রকূটশীর্ষ থেকে এই কারাকক্ষ দেখা যেতে পারে। তাই সূর্যোদয়ের লগ্ন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। তিনি যত সহজে ভগবানকে দেখতে পাচ্ছেন, ভগবান তত সহজে তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না। আদৌ পাবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি চেষ্টা করছেন। বৃদ্ধ তথাগত, বৃদ্ধ বন্দী বিম্বিসারকে দেখবার চেষ্টা করছেন। সকরুণ, কাতর নয়ন। অশ্রুবিন্দুগুলি বুঝি চোখের প্রান্তে থমকে আছে। হাত দুটি কি অঞ্জলিবদ্ধ ! সম্ভবত পরমপুরুষ উপনিষদোক্ত ঈশের কথা যিনি কখনও বলেন না, আজ পরমতর কোনও শক্তির কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ বিম্বিসারের জন্য প্রার্থনা করছেন। এবং সেই মুহূর্তে বিম্বিসার এ-ও বুঝতে পারেন, কী সেই কর্ম যার এই ফল। তথাগত, তথাগতরূপ সম্মোহই সেই কর্ম, এই রুদ্ধ কারা তারই ফল। শুধু তথাগত কেন, বিশ্বনিয়ামক কোনও মহাশক্তি পর্যন্ত তার ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না।

তথাগতরচিত কর্মতত্ত্বের এবম্বিধ মর্মান্তিক উদ্ভাসই মহারাজ বিম্বিসারের জীবনের শেষ প্রাপ্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২

বাইরে অনেকগুলি পেঁচা একসঙ্গে যেন আর্তরব করে উঠল। কাঁ কাঁ ক্রাঁররর্ ক্রাঁররর্। তারপরেই কাকেদের তুমুল কোলাহল। কারা ধ্বংসে হচ্ছে বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ আগে প্রাসাদের দিক থেকে উপর্যুপরি ভেরীর আরাব শোনা গেছে। সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল, ভেরীর অস্বাভাবিকতাতেই সম্ভবত সে লঘু তন্দ্রা ছুটে গেল। রাতের পর রাত নিদ্রা আসে না জিতসোমার। পুষ্পলাবীর গর্ভে সে বহুদিন হল বন্দিনী। কত দিন সে আর গুনে গুনে পারে না। রাজপ্রাসাদ, রাজগৃহ নগরীর অভিজাতকুল, মগধের রাজনীতি সব, সব কিছুই যেন গান্ধার নটীকে ভুলে গেছে। জিতসোমার দেহ ক্ষীণ, চোখের চারপাশে অনিদ্রার কালি। রাজগৃহ কেমন যেন ছিল ? তার পাহাড়, পাহাড়িয়া পথ, কাননগুলি ? সব যেন দূর জন্মের স্মৃতি। জিতসোমা বাইরে যেতে পারে না। তার কাননে, প্রাসাদের প্রবেশপথগুলিতে পাহারা দিচ্ছে অজ্ঞাতকুল সব রক্ষী। কক্ষ থেকে কক্ষে ভ্রমণ করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় রাখেনি এরা। প্রথম যেদিন বাইরে যাবার চেষ্টা করেছিল, তিনজন ভীষণদর্শন অস্ত্রধারী সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। সোমা দেখল তার রথ নেই। মন্দুরা শূন্য। কয়েক পা যাবার পর সে ফিরে এসেছিল।

তার দাসী ধ্রুবা প্রথম প্রথম হট্টে যেত। শাক, পর্ণ, মাংস, মৎস্য, ঘৃত·· তণ্ডুল··· প্রয়োজন কি একটা ? ধ্রুবা এসব ছাড়াও আনত সংবাদ।

এদিক ওদিক চেয়ে মৃদুকণ্ঠে বলত—শুনেছেন দেবি, মহারাজ নাকি এখন কারাগারে।

—সে কি ? সিংহাসন ত্যাগ করার পরেও ?

—তাই তো শুনছি ? কুমারের সঙ্গে কী রত্নহার নিয়ে কলহ···

—আজ বড় মর্মান্তিক কথা শুনে এলাম।

—কী !

—কুমার নাকি মহারাজকে অনাহারে রেখেছে। কাউকে তাঁর কাছে যেতে পর্যন্ত দেয় না। এক মহারানি ছাড়া। তা মহারানি নাকি কবরীর মধ্যে, পাদুকার মধ্যে লুকিয়ে ভোজ্য নিয়ে যেতেন। ধরা পড়ে গেছেন। অকথ্য লাঞ্ছনা হয়েছে তাঁর। ভাবতে পারেন ! রাজমহিষী, রাজার মা !··· শুনছি কুমার নাকি মায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রও তুলেছিল। জীবক কোমারভচ্চ আর ওই অমাচ্চ বস্সকার মিলে থামান।

—প্রজারা, বড় বড় গৃহপতিরা কেউ কিছু বলছেন না ?

—প্রজারা ভয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এতটুকু বিরুদ্ধাচরণ করলেই ভীষণ দণ্ড হয়ে যাচ্ছে। অমাচ্চ মহানাগকে হত্যা করেছে। সেট্‌ঠি পুন্নক পালিয়ে যাচ্ছিলেন, গঙ্গাবক্ষ থেকে তাঁকে ধরে এনেছে। ওই দেবদত্ত থের নাকি মহা ইদ্ধিমান। হাতে বালুমুঠি ধরে মন্তর পড়লে তা মুষলমুঠি হয়ে যায়।

কিন্তু এই সব সংবাদের প্রবেশ এখন থেমে গেছে। রক্ষীরা একদিন স্থবিকায় করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি নামিয়ে রাখল একে একে। শাক, পর্ণ, মৎস্য, মাংস, ঘৃত, তণ্ডুল···। অপাঙ্গে একবার চাইল, সে কী দৃষ্টি ! ভালো ! কী চায় এই কুমার ! বুদ্ধপূজা করার অপরাধে একটি বালিকা নটীকে পর্যন্ত না কি হত্যা করেছে রাজপুরীতে। শ্রীমতী। চন্দ্রকেতু কারাগারে, মহানাগ নিহত। আরও বহু বিম্বিসার ভক্ত, বুদ্ধপন্থী রাজপুরুষ হয় কারাদণ্ড ভোগ করছেন, নয় মৃত্যুদণ্ড। ওই অমাত্যদের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা কি এতদিনেও প্রকাশ পায়নি ? তাকেও হত্যা করুক না। হত্যা করো। সোমাকে হত্যা করো কুমার। শৃঙ্খলিত করতেও অন্তত এসো। সোমা কোনদিন তোমার প্রতি সুমুখ হবে না। সে ভক্তি করেছিল তোমার পিতাকে।

কুট্ট কুট্ট কুট্ট কুট্ট··· কোথায় যেন কাষ্ঠকুট্ট পাখি শব্দ করছে। একটু পরেই অদূর অরণ্য থেকে ভেসে আসে কৃষ্ণসার পুরুষের হাক হাক হাক। আবার কাষ্ঠকুট্টর কুট্ট কুট্ট কুট্ট···

এত রাতে কাষ্ঠকুট্ট ? সহসা সতর্ক হয়ে উঠল জিতসোমা। উত্তরীয়টি ভালো করে মাথায় জড়িয়ে, ডান হাতে ছোট ছুরিকা নিয়ে সে প্রস্তুত হয়। এ অন্য কোনও নিশাচর। শব্দটি লক্ষ্য করে সে বাতায়নের দিকে এগিয়ে যায়। নিঃশব্দে খুলে ফেলে কপাটদুটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক অঞ্জলি ম্লান চন্দ্রালোক।

—ভদ্রে! —মৃদু বৃষ্টিপাতের মতো কণ্ঠস্বর। বহু বর্ষার ওপার থেকে কণ্ঠটি ভেসে আসে। বহু মেদুর বর্ষা, বহু বিফল বসন্ত, বহু নীলবর্ণ শীত, পীতবর্ণ গ্রীষ্ম। এই কণ্ঠ আর শুনতে পাওয়া যাবে আশা ছিল না। শুনলে হৃদয় এমন করবে জানা ছিল না।

ছায়াশরীর ভেতরে প্রবেশ করে।

—আজ রাত্রির প্রথম যামে মহারাজ··· প্রয়াত হলেন।

উদ্‌গত ক্রন্দনধ্বনি অন্ধকার গ্রাস করে নেয়। দুজনে অতি নিকটে। মাঝে একটি আলিঙ্গন থমকে আছে।

—আপনি কি জানেন দৈবরাত নির্বাসিত?

—সে কী? কেন?

জিতসোমার পায়ের তলায় পৃথিবী প্রকম্পিত হচ্ছে।

সম্ভবত গৌতম বুদ্ধর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য। সম্ভবত কেন তাই-ই।

—কত দিন?

—অনেক দিন। তার পরেই কুমারের এই দ্রোহ···মহারাজের পাশে দুঃসময়ে তিনি রইলেন না। অঙ্গীকার ছিল উভয়ের মধ্যে, মহারাজ মানলেন না...নিয়তি...। ভদ্রে কেউ জানে না তিনি কোথায় গেছেন। কারাগারে অমাত্য চন্দ্রকেতুর কাছে শুনলাম··· মহারাজের দেওয়া স্বর্ণ, বাহন, বসন, অস্ত্র সমস্তই প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছেন।

নিমেষগুলি নিঃশব্দে পার হতে থাকে। বিশুষ্ক, অশ্রুহীন।

—ভদ্রে, আজ নগরী অরাজক, আপনার রক্ষীরা প্রাসাদের দিকে চলে গেছে। কুমার সম্ভবত গণ-উত্থান আশঙ্কা করছেন। আসুন, আমরা রাজগৃহ ছেড়ে চলে যাই।

পাঞ্চালের বাহু গান্ধার নটী বিম্বিসার-অমাত্য জিতসোমাকে ঘিরে ধরে।

AMARBOI.COM

নীলকৃষ্ণ বনরেখার ওপর গৈরিক পথটি বাঁক নিতে নিতে চলেছে। বিসর্পিল রেখায় চলেছে সার্থ। বারাণসী বণিকদের তীর্থ। এমন পণ্য নেই যা বারাণসীতে পাওয়া যায় না। এমন সার্থ নেই যারা বারাণসীতে বাণিজ্যার্থে আসে না। প্রাচী থেকে বহু বছর স্থলবাণিজ্য করে সার্থ মধ্যদেশে স্বগৃহে ফিরছে। বারাণসী হয়ে শ্রাবস্তী যাবে। রৌরুক থেকে কৌশাম্বী হয়ে আবার আসছে আরও একটি দল। এরা যাবে চম্পা, দক্ষিণগিরি, আলবী। বারাণসী হয়ে এসেছে। উভয় দলের দেখা হয়েছে উরুবেলা গ্রামের কাছে। দুটি দলেই রয়েছে শ্বেতবসনধারী নিয়ামক, লোহিত বেশ পরা রক্ষীরা। তাদের হাতে লগুড়, ধনুর্বাণ, তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা। বণিকদের অধিকাংশই কুসুমবর্ণের উত্তরীয় ও পাটল অধোবাস পরেছে। দীর্ঘ পথ পার হবার সময়ে ধূলির ভয়ে তারা এই বর্ণগুলিই নির্বাচন করে। সিন্ধু-সৌবীর থেকে আগত দলটির সঙ্গে অশ্বতর ও গর্দভ ছাড়াও রয়েছে কতকগুলি উট। মরুদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। এই মরুবাহন উষ্ট্রদেবদের বিশেষ মর্যাদাসহকারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যানরূপে এদের অসীম গুণগুলির প্রচার হবে অঙ্গদেশে। এঁদের প্রধান পণ্য রত্ন। বারাণসীর হাটে সবই প্রায় বিকিয়ে গেছে। সম্ভ্রান্ত রুচিমান ধনপতিরা, মণিকাররা কিনেছেন।

অঙ্গদেশের সার্থ নিয়ে চলেছে তামা, লোহা, বসন, কিলিঞ্জক, সুরা। সার্থবাহ নন্দিয় রয়েছেন এই দলের পুচ্ছের দিকে। তাঁর বাহন একটি অশ্বতর। অশ্বতরই ভালো, তা যদি বলেন। অশ্ব থেকে একবার তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। গুরুতর কিছু হয়নি। কিন্তু শিক্ষা হয়ে গেছে। জীবনটি দুর্মূল্য বস্তু। বহু ভাগ্যবিপর্যয়, আবার সৌভাগ্য, দৈব করুণা, মানুষী সহায়তা ইত্যাদি মিলিয়ে এখন একটি পরিতোষজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত সহজে দুম বলতে অশ্বের পিঠ থেকে পড়ে গেলে হয়! অপর দলটির কাছ থেকে তিনি দুটি উট কিনেছেন, সেগুলিকে এর পরে পশ্চিমে বাণিজ্যযাত্রা করার সময়ে ব্যবহার করবেন ভেবেছেন। কিন্তু নিজে ওগুলির ওপর কখনই চড়বেন না। বালুকাময় মরুকান্তারে নাকি চড়তেই হয়।

নন্দিয় অপর দলটির সার্থবাহর কাছ থেকে অনেক রত্ন এবং উপরত্ন কিনেছেন। বৈদুর্য, সিতমণি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রুম, অকীক, স্ফটিক, নামহীন বহু বর্ণের উপরত্নই অধিক। নন্দিয়র ইচ্ছা বারাণসীতে মণিকারপল্লী থেকে এই রত্নগুলি দিয়ে পত্নী ময়ূরীর জন্য একটি ঘনমট্‌ঠক নির্মাণ করাবেন। এই অলঙ্কার পরেন বিসাখাভদ্দা, ময়ূরীর সখী। অত মূল্যবান অলঙ্কার নন্দিয় এ-জন্মে আর নির্মাণ করাতে পারলেন না। রত্নগুলির স্থানে উপরত্ন দিলে হয়ে যেতে পারে। বড় সুন্দর অলঙ্কারটি। নিজের জন্যও একটি রত্নহার গড়াবেন নন্দিয়। সকলের অলক্ষ্যে পেটিকা থেকে একটি মুকুর বার করে, কেশগুলি আঁচড়িয়ে নেন সার্থবাহ। মুখটি তো এখনও ভালোই আছে। তেমন বয়সের রেখা তো কই···!

পেছন থেকে একটি তরুণ অপর একটি তরুণকে বলল— খুল্লতাতর মাথাটি গেছে। কোসল যত এগিয়ে আসছে দর্পণে মুখ দেখা ততই বেড়ে যাচ্ছে।

কথাটি কানে যায় নন্দিয়র। খুল্লতাত ? কোন পিতার সম্পর্কে তোমাদের খুল্লতাত হই বাপা! যাক জেট্‌ঠতাত যে বলোনি এই যথেষ্ট। সার্থবাহ নন্দিয় মুকুর তুলে রেখে ঈষৎ কর্কশ কণ্ঠে চেঁচান— বাপা হে, একটু পা চালিয়ে। বনের দিক থেকে অনেক সময়ে তরক্ষু কি দ্বীপী ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে যায়।

শিবির পড়ে দুই পক্ষেরই। একটি ছোটখাটো গ্রামই হয়ে যায় যেন। ব্যস্ত সবাই। পশুগুলিকে বাঁধা, জল, ঘাস, খড় দেওয়া। শিবিরের ভেতর বাহির পরিষ্কার করা। শকটগুলিকে মাঝখানে রাখা, রাতে সমস্ত অঞ্চলটি ঘিরে অগ্নিকুণ্ড হবে তার জন্য কাঠকুটো সংগ্রহ করা, মাটি কাটা। দুই দলের বণিকরা, নিয়ামকদ্বয়, বসে বসে বিশ্রাম নেন।

ক্রমে অগ্নি জ্বলে। পাক হয়। মুক্ত আকাশের তলায় অন্ন সিদ্ধ হবার সুগন্ধ ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন বণিকদল স্বতন্ত্র পাকশাল খুলেছে।

—তোমাদের কী ভাই ?

—মাংসভক্ত। তোমাদের ?

—কুল্মাষ হচ্ছে ভালো মুদ্গ ও শ্যামাক ধানের তণ্ডুল দিয়ে। বর্তক পাখি আছে কতগুলি, পুড়িয়ে নেবো।

—বতিঙ্গণ নাই ? বর্তক-পোড়ার সঙ্গে লাগবে ভালো।

—আছে। সার্থবাহর আদেশ নাই। কাল হবে।

অদূরে একটি সরোবর। তার তীর দিয়ে দিয়ে চলে যান দুই শ্রমণ। সম্ভবত জলপান করে উঠেছেন। ছায়ার মতো দেখা যায় দুজনকে।

—ভো সমন!

কথা কানে যায় না শ্রমণদের।

—ভো ভো সমন!

দুজনে থেমে গেছেন।

—সাক্কপুত্তীয় যেন মনে হয়! কোথা হতে আসা ?

হাত ঘুরিয়ে দিক-নির্দেশ করে শ্রমণরা আবার চলবার উপক্রম করেন।

—অরে! যান কই ? রাজগহ হতে আসেন নাকি ?

মাথা নাড়েন শ্রমণরা।

—রাজগহে তো ভারি গোল ?

মাথা নাড়েন শ্রমণরা।

—নতুন রাজা সাক্কপুত্তীয়দের ওপর অত্যাচার করছেন নাকি ?

আবার মাথা নাড়ছেন শ্রমণদ্বয়।

—কী ডাইনে-বামে মুণ্ড নাড়েন সমন তখন হতে ? স্বর নাই ? ভাষা নাই ? আমি এক সময়ে তীত্থিক ছিলাম, সমন-টমনের নাড়ি-নক্ষত্তর জানি। অত মান আমার কাছে পাবেন না, তা বলে দিচ্ছি। যাবেন কোথায় ?

একটু ইতস্তত করে একজন বললেন—সাবত্থি।

—পাটুলির দিকের দ্বারগুলি বন্ধ করে দিয়েছে, না ? বড় গোল। তা সাবত্থি তো আমরাও যাবো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারাণসী, সাকেত হয়ে। বসুন না! আমাদের গো-শকটে আপনাদের নিমন্ত্রণ রইল। যতদিন না সাবত্থি পৌঁছাই। এতে দোষ নাই সমন।

সার্থবাহ নন্দিয় দুই শ্রমণকে পাশে বসান। আবার সার্থবাহকে জিজ্ঞাসা করেন— তা উদয়ভদ্দ, রোরুক ছাড়া আর কোথাও গিয়েছিলেন নাকি?

—ভরুকচ্ছে গিয়েছিলাম ভদ্দ। সমুদ্দুর দেখা হল। সে কী অকূল জলরাশি। নীল-হরিৎ বর্ণ। মহা বিস্ময়ের ব্যাপার সে। আবার শুনতে পাই ওই বারিধির ওপারেও নাকি ভূমি আছে।

—থাকুক—নন্দিয় বললেন—তা কখনই পৃথ্বী নয়। প্রেতলোক-টোক হতে পারে। কী বলেন সমন!

শ্রমণ দুজন বসে আছেন বাক্যহীন।

—মগধের নতুন রাজা কিন্তু সেট্‌ঠিদের ওপর শক্তি দেখাতে যাচ্ছেন, কাজটা ভালো করছেন না। কী বলেন!

মাথা নেড়ে সম্মতি জানান শ্রমণরা।

—সেট্‌ঠি-জেট্‌ঠক যোতীয় মহোদয়ের ঘটনাটি শুনেছেন নাকি ভদ্দ উদয়!

উদয় শোনেন নি। মহা উৎসাহে ঘটনাটি সবিস্তারে বলতে লাগলেন নন্দিয়।

—সেনাদল নিয়ে রাজা অজাতশত্রু তো গেছেন যোতীয়র প্রাসাদে। উদ্দেশ্য সম্পদ সব অধিকার করা। যোতীয়র সম্পদ অতুল, জানেন তো? সারা জম্বুদ্বীপ ওঁর নাম জানে, মান দেয়।

উদয় বললেন— আমরা অঙ্গদেশে মেণ্ডক মহোদয়কে মানতাম। এখন উনি প্রয়াত। ওঁর পুত্র ধনঞ্জয়ও মহাসেট্‌ঠি। তিনি অবশ্য···

—ওঁর কথা আপনি কী বলবেন? নন্দিয় বিজ্ঞ ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। উনি তো আমাদের সাবত্থির মিগারমাতা বিসাখার পিতা। মিগারমাতার সখী [illegible] আমার পত্নী। এই সমনরা সাবত্থিতে গিয়ে যদি মিগারমাতু প্রাসাদে ওঠেন, কিছুর অভাব হবে না। নিশ্চিন্তে ধম্মকথা কইতে পারবেন।

—যোতীয় সেট্‌ঠির ঘটনাটি বলবেন না? —সার্থবাহ উদয়ই শুধু নয় আরও অনেকে নন্দিয়র কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে কাহিনীর লোভে। নন্দিয় বলতে থাকেন।

—রাজা সসৈন্য যোতীয়র প্রাসাদের প্রধান দ্বার দিয়ে ঢুকে দেখেন অপরদিকে একটি বস্ত্রাবরণ। তার পেছনে সশস্ত্র রক্ষীদল অপেক্ষা করছে। রাজা তো দ্বিধায় পড়ে গেছেন। অরক্ষিত গেহ লুঠ করা এক, আর রক্ষীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া আরেক। রাজাকে কি তা শোভা পায়? ফিরে যাচ্ছেন। পথে সেট্‌ঠি মহোদয়ের সঙ্গে দেখা। রাজাকে দেখে রথ থামিয়েছেন যোতীয়। দেখেছেন তো মহাসেট্‌ঠিকে সমন? এঁরা না দেখে থাকতে পারেন। শুভ্র কেশ, ভ্রূগুলি সুদ্ধ পেকে গেছে। বৃদ্ধ মানুষ। কিন্তু বলিষ্ঠ। রাজা বললেন বাহা। ভালো সেট্‌ঠি তো আপনি। সাক্ষাৎ করতে গেলাম আপনার সঙ্গে আর যোদ্ধা দিয়ে দ্বার আটক রাখলেন?

বৃদ্ধ বললেন— সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন? না গেহ লুঠ করতে গিয়েছিলেন কুমার?

—যদি তাই যাই। কী করবেন?

—ভালো। এই দেখুন আমার দশ আঙুলে দশটি অঙ্গুরী। এই বজ্রমণি, এই মুক্তা, এই মরকত, পদ্মরাগ, নীলকান্তমণি এ সকল প্রত্যেকটি দুর্মূল্য। অপ্রাপ্য বললেই হয়। লক্ষ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা পাবেন বিক্রয় করলে। নিন তো দেখি কেমন নিতে পারেন!—

তা শত টানাটানিতেও অঙ্গুরী খুলল না। শেষে ঘর্মাক্ত হয়ে থামলেন রাজা। তখন সেট্‌ঠি বললেন—পাতুন হাত, উত্তান করুন দেখি হাত দুটি।

সেই হাতের ওপর অঙ্গুরীগুলি ঝেড়ে ফেলে দিলেন। বললেন— শুনে রাখুন কুমার। বলপ্রয়োগ করে শুধু যোতীয় কেন কোনও সেট্‌ঠির কাছ হতেই কিছু পাবেন না। আর, আমার কুটিরে যোদ্ধাও নাই, রক্ষীও নাই। স্ফটিকের প্রাচীর আছে, তাইতে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে ভয় পেয়েছেন। যান, গেহে যান। স্নেহদুর্বল পিতার ওপর অত্যাচার করে পার পেতে পারেন, সেট্‌ঠিদের কাছে পাবেন না···

বলতে বলতে নন্দিয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুটি ডাইনে-বামে নাড়তে লাগলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বুঝলেন তো সবাই ? সেট্‌ঠিরা অর্থ না দিলে রাজ্য আর রাজ্য থাকবে না খঞ্জ হয়ে যাবে। আমাদের ঘরে যা আছে, রাজার ঘরে তা নাই।

অগ্নিকুণ্ড হতে সামান্য দূরে বসে আছেন শ্রমণ দুজন। নন্দিয়র কাহিনী শুনে সবাই ভারি আহ্লাদিত। তারা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। সন্ধ্যার গাঢ় বাতাসে মাংসর উপাদেয় সুবাস। সার্থবাহরা কাহিনী, সংবাদ বলাবলি করছেন।

—সিন্ধু নদীর জল ছাঁকলে নাকি সোনা পাওয়া যায় ?— নন্দিয়র দলের এক তরুণ বণিক প্রশ্ন করল।

উদয় বললেন— তা যায়। তবে সিন্ধুনীরে এখন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পোত নিয়ে পার্সরা ঘুরে বেড়ায়। স্বর্ণ যা পাবার তারাই পায়।

—পার্স ? তারা কারা ?

উদয় সাড়ম্বরে বর্ণনা করেন—কুভা নদীর অপর পার হতে এসেছে সব। দলে দলে। কপিশা নাকি তাদের করায়ত্ত। পাকা সোনার মতো গাত্রবর্ণ। নাসাগুলি বিষম তীক্ষ্ণ। তক্ষশিলায় শুনতে পেলাম কুভা আর সিন্ধুর মধ্যবর্তী দেশগুলি এই পার্সদের রাজা দরায়ভুস জিতে নিয়েছেন। সিন্ধুর এপারে গান্ধারের সৈন্যদল সর্বদা পাহারা দিচ্ছে।

একজন শ্রমণ অর্ধস্ফুট একটি শব্দ করেন। নন্দিয় ফিরে তাকালেন। শ্রমণ অতিশয় গৌরবর্ণ। দীর্ঘ চক্ষুদুটি। গাঢ় অক্ষিপল্লব। কেশগুলি অল্প বড় হয়েছে। অতিশয় শোভাময়। অপর শ্রমণ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন—যুদ্ধ হবে নাকি ?

—পার্সগুলি স্বর্ণলোভী বুঝলেন শ্রমণ, উদয় বললেন, তক্ষশিলা অবধি আসেনি। সিন্ধুর ওপারেই ঘোরে। রাজা দরায়ভুস স্বর্ণ নেবার জন্য দূত পাঠান। স্বর্ণ পেলেই হল। সিন্ধুটি তো সেঁচে ফেলছে একেবারে। নদীতটে বালুর সঙ্গে স্বর্ণ মিশ্রিত আছে। নদীর জলেও সোনা বইছে।

দরায়ভুস নামটি অনেকেরই হাসির উদ্রেক করে।

—দরায়ভুস, দরায়ভুস। ভুস, ভাউস নানাপ্রকার হাস্যমিশ্রিত গুঞ্জন ওঠে।

আশ্চর্যের কথা কী জানেন ? উদয় বললেন—এই পার্সরা অসুরভক্ত। পার্সগুলি 'স' উচ্চারণ করতে পারে না বোধ হয়। অসুরকে বলে আহুর। সিন্ধুকে বলে হিন্দুস্। সোমকে বলে হোম। আমাদের বৈদিকদের মতো আগুন জ্বেলে যজন-হবনও করে থাকে।

সকলেই অতিশয় আশ্চর্য হয়ে গেল।

গৌরবর্ণ শ্রমণ মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : যুদ্ধ ছাড়াই কি পার্সরা গান্ধার জয় করে নিল ?

—ওই যে বললাম, রাজা দরায়ভুস স্বর্ণ চায়। যুদ্ধ ছাড়াই যদি প্রতি বৎসর স্বর্ণ পেয়ে যায়, যুদ্ধের কী প্রয়োজন শ্রমণ। তবে যুদ্ধ যদি করত ওগুলিকে বাধা দেবার কেউ থাকত না। গান্ধাররাজ পুক্কুসাতি তো শুনলাম, ভগবান বুদ্ধকে দেখবার আশায় এদিকেই এসেছিলেন, দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর পুত্র রাজা স্বর্জিতের তেমন কোনও ক্ষমতা নাই। প্রকৃত ক্ষমতা অমাত্যদের। গর্বসেন না দ্রবসেন। মহা ধুরন্ধর ব্যক্তি। তবে তিনিও তো বৃদ্ধ। সত্য বলতে কি জম্বুদ্বীপের সর্বত্রই কেমন একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছে। তেমন কোনও রাজা দেখি না যিনি চক্রবর্তী হতে পারেন। মহারাজ বিম্বিসারকে দিয়ে আমাদের বড় আশা ছিল।

নন্দিয় শ্রমণ দুজনের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে লাগলেন। আগুনের প্রভায় শ্রমণদের মুখগুলি বড়ই বিষণ্ণ দেখায়।

নন্দিয়র সহবণিক একজন বললেন—কেন ? আমাদের কোসলরাজ ?

নন্দিয় বললেন—সত্য কথা বলব ?

—বলুন না ভদ্দ। ভয় কী ?

—ভয় ? ভয় নন্দিয় কাউকে করে না। আপনারাই বলুন না কোসলরাজের প্রকৃত বল কী ? কে ? বন্ধুল মল্ল। নয় কী ? তাঁর পুত্রগুলিই বা কী ? সব পিতার মতো বীরপুরুষ। তা এগারজনকেই কি নিহত হতে হয় ?

একজন শ্রমণ ভয়ানক চমকে উঠলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী বললেন সার্থবাহ ?

—দেখুন সমন, আমি পাঁচ বৎসর পরে দেশে ফিরছি। কিন্তু দেশের সঙ্গে যোগাযোগ আমি সর্বদাই রেখে যাই। কজঙ্গলের দিকে রয়েছি সে সময়টা। সাবত্থি হতে একদল নাতপুত্তীয় এলেন, ওঁরা লাঢ়দেশে যাচ্ছেন, ওঁরাই আলোচনা করছিলেন বন্ধুল ও তাঁর পুত্ররা সব প্রত্যন্ত দস্যুদের হাতে নিহত হয়েছেন। সেই দারুণ শোকসংবাদ বুকে নিয়েই বন্ধুলপত্নী মল্লিকা নাকি বুদ্ধ ও সংঘের সেবা করেছেন। ভোজ শেষ হবামাত্র জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন।

শ্রমণটি হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢাকলেন, তাঁর বক্ষ ফুলে ফুলে উঠছে। গাঢ় সন্ধ্যার তিমিরেও তাঁর শোক ঢাকতে পারছে না।

—চিনতেন নাকি মল্লকে ?

সার্থবাহ নন্দিয় তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর পেলেন না।

কিছুক্ষণ পর নন্দিয় বললেন—সমন, মনে কিছু করবেন না, আমিও এক সময়ে ভগবান বুদ্ধের দেশনায় মুগ্ধ হয়ে পব্বজ্জিত হতে চেয়েছিলাম। আজও তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু চতুর্দিকে এই যে তাঁর বড় বড় উপাসকদের শোচনীয় গতি হচ্ছে এর অর্থ কী ? ভগবান কি বৃদ্ধ হয়েছেন বলে তাঁর ক্ষমতাগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে ? যিনি অঙ্গুলিমালের মতো নিষ্ঠুর নরহন্তাকে বশ করলেন, তিনি কি মগধের এই পিতৃঘাতী রাজকুমারটিকে কোনক্রমেই শান্ত করতে পারতেন না ?

শোকার্ত শ্রমণ এই সময়ে উঠে চলে গেলেন। অগ্নির প্রভা থেকে দূরে। বনরেখা যেখানে আকাশের প্রান্তে লুটিয়ে রয়েছে সেইখানে তাঁকে পেছন ফিরে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

সার্থবাহ নন্দিয় অপর শ্রমণকে লক্ষ্য করে বললেন—সত্য বলুন তো। উনি পঞ্চাল তিস্স না !

শ্রমণটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

—প্রথম হতেই আমার ওঁকে পরিচিত মনে হচ্ছিল। কেশগুলি এখন খুদ্দ খুদ্দ··· সমন হয়েছেন··· তাই কেমন···। উনি তো বন্ধুলের দক্ষিণ হাত স্বরূপ ছিলেন। পুত্রদের থেকেও অধিক বোধ হয়। যখনই কোনও ক্রীড়া কি প্রতিযোগিতার আয়োজন হবে, উনি থাকবেন বন্ধুলের পাশে। আহা ! কী আঘাতই না ওঁর লাগল ! মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন একেবারে ! হলেনই বা পব্বজ্জিত। পিয়জনের শোক লাগবে না তাই বলে ! একটু পরে নন্দিয় আক্ষেপের সুরে বললেন—সব বীরপুরুষই যদি সমন হয়ে যান···

সার্থবাহ উদয় বললেন— আপনি কিন্তু মধ্যদেশের নয় সমন।

এই শ্রমণটি বড় অল্পভাষী, মাথাটি নাড়লেন শুধু। একটু পরে তিনিও উঠে গেলেন বনভূমির দিকে।··· গান্ধার পার্সকবলিত হয়ে গেল তা হলে। সমুদ্র তরঙ্গের মতো সৈন্যদল আসে নি ! তবু পরাজিত হয়েছে। এত হতবল ! কী-ই বা করবে ? দ্বীপের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, যে যার অস্তিত্বসংকট নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু গান্ধার শত্রুর গর্ভে গেল, আর যিনি এই পরিণাম দ্রষ্টার চোখ দিয়ে দেখেছিলেন, তিনি কোথায় রইলেন ! জানতেও পারলেন না ! অনঘ, সুভদ্র, চণক, এঁদের তক্ষশিলার লোকে বলত 'ত্রয়ী' 'ত্রিবেদ', দেশের সংকট, বিদ্যার সংকট, সমাজের সংকট নিয়ে এঁরাই চিন্তা করতেন, সেসব চিন্তার কথা আলোচনা করতেন। কোথায় রইলেন তাঁরা গান্ধারের এই দুঃসময়ে ?

কিন্তু, দুঃসময় কি একা গান্ধারেরই ? সমগ্র জম্বুদ্বীপই কি বিপন্ন নয় ? যিনি এই বিপদের মর্ম যথার্থ বুঝতেন সেই মহাবীর রাজা আরেক দিক দিয়ে এত দুর্বল যে তাঁকে কারারুদ্ধ করা গেল, অনাহারে মেরে ফেলাও গেল। শার্দুলের পরিণাম যদি মার্জারের মতো হয়, তা হলে তো তথাগতকে লোকে দোষ দেবেই। সঙ্গত কারণেই দেবে।

সার্থবাহ উদয় এবং অঙ্গদেশগামী বণিকদের সঙ্গে বিদায় অভিবাদন বিনিময় করে শ্রাবস্তীর দল আবার পথ চলে। সকাল এবং সন্ধ্যা যায়। সন্ধ্যা এবং সকাল। বারাণসী যতই এগিয়ে আসে ঘোর কলরোল শোনা যায়। এরা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। বারাণসীতে এরা এই প্রথম তো আসছে না। স্থানটি হট্টগোলের সত্য। কিন্তু তাই বলে এত কোলাহল ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ামক রক্ষীদের অস্ত্র বার করতে বলল। বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। কিন্তু ভয়ানক কোনও দস্যুদল হতে পারে।

নন্দিয় বললেন—না। নগরীর এত কাছে দুস্য যদি আসেও, আসবে নিঃশব্দে। এভাবে নয়।

পথ আরেকটি বাঁক নিতেই ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। সমুদ্রের মতো সৈন্যদল আসছে। হা হা শব্দ করতে করতে, তূর্যধ্বনি করে, শল্য ধনুর্বাণ মুষল আস্ফালন করতে করতে। পদাতিক, অশ্বারোহী, গজবাহী, রথারোহী সেনাদল।

নিয়ামক চিৎকার করে বলল— পথ ছেড়ে দাও হে। ত্বরা করো, ত্বরা করো, প্রান্তরে, বনে যে যেখানে পারো নেমে যাও···

উভয় দিকে নেমে যেতে থাকে বণিকদল। শুধু দুই শ্রমণ ছুটে গিয়ে মাঝে দাঁড়ান দু হাত তুলে। নিয়ামকের হাত থেকে ভেরীটি তুলে নিয়েছেন শ্রমণ।

সেনাদলের ঘোষকের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর হচ্ছে।

—কোথকার সেনা-আ-আ- ?

—কাশী কোসলের-র-র।

—কোথায় যায় ?

—মগধ আক্রমণ করতে-এ-এ-

—কেন-ও-ও-ও- ?

—মহারাজ পসেনদি ভগ্নী কোসলদেবী ও ভগ্নীপতি মহারাজ বিম্বিসারের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চলেছেন। কাশীগ্রামটি কোসলদেবীর বিবাহের যৌতুক ছিল-অ-অ। আমাদের রাজকুমারী, মগধের মহারানি বিষপান করে আত্মঘাতী হয়েছেন-ন। মগধের পিতৃমাতৃ ঘাতক কুমার কি এখনও কাশীগ্রামের রাজস্ব ভোগ করবে না কি-ই-ই ? কোসলরাজ তা করতে দেবেন না-আ-আ।

—সৈনাপত্য করছেন কে-এ-এ ?

—কোসলকুমার ও দীঘ মল্ল-অ-অ।

রক্ত কাষার দেহ থেকে খুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন শ্রমণদ্বয়। সংঘাটির তলা থেকে প্রকাশিত হল বর্ম-অস্ত্রধারী যোদ্ধৃশরীর। পাঞ্চাল ভেরী মুখে তুলে চিৎকার করে বললেন— ভো সেনাধ্যক্ষ দীঘকারায়ণ, ভো ভো কুমার বিরূঢ়ব আমি পাঞ্চাল তিষ্য বলছি-ই-ই। আমাদের অশ্বরথাদি রণসামগ্রী দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা যুদ্ধে যাবো-ও-ও।

২৩

বনের মধ্যে রাতগুলি দিন শুষে নিয়ে পুষ্ট হতে থাকে। প্রসূত হতে থাকে অচেনা শব্দ, অজানা গন্ধ, বহু অদৃষ্টপূর্ব আলো যাদের প্রভায় দেখা যায় অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্যও। তাদের ভৌতিক, অলৌকিক মনে হতে থাকে। একমাত্র নানা জাতীয় মৃগরা, শশকরা, সরীসৃপরা জানে এগুলি অলৌকিক নয়। কেউ নাক ডুবিয়ে ঘ্রাণ নেয়, কেউ সতর্ক করে কান দুটি, দ্রুত তরঙ্গে পালায়। এইখানে মাটিতে মাটি, তৃণেতে তৃণ, গুল্মেতে গুল্ম হয়ে শুয়ে থাকে নিঃসংজ্ঞ দেহটি। গাত্রবর্ণ হারিয়ে ফেলে তার কাঞ্চন আভা। কেশগুলি হয়ে যায় পিঙ্গল, জটাবদ্ধ। শীর্ণ অতি শীর্ণ দেহ। পিঠের ওপর কয়েক স্তর মাটি জমে যায়। তার ওপর খেলা করে গোধিকা, শল্লকী, বৃক্ষমার্জার। শিশুরক্ষু কেশগুলি তৃণ ভেবে চিবায়, তারপর বিস্বাদ মনে হওয়ায় ফেলে দিয়ে লম্ফ দিয়ে দিয়ে দূরে চলে যায়। নকুলযুবা রক্তচক্ষু মেলে দ্রুত ছুটে আসে, অস্থির হয়ে ঘোরে, সামনের পা দিয়ে মাটি খোঁড়ে, মুদিত চোখ দুটি খুবলে নেবে কি না ভাবে, আবার অস্থিরভাবে ছুটে চলে যায়। বানরেরাও শাখা থেকে ঝুপঝাপ নেমে পড়ে, মহা কৌতূহলে। আবার ওপরের শাখায় উঠে যায়, দোল খায়। বহু দূর থেকে ধ্বনি প্রতিধ্বনিময় নাদ শোনা যায় ধিমি ধিমি দ্রিমি দ্রিম দ্রিমি দ্রিম দ্রিম্‌ দ্রিম্‌—। লঘু পায়ে দেহটি মাড়িয়ে ছুটে চলে যায় কজন। চমকে থামে। পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খোঁচায়।

—তলে ই তো বাহাসিন্দড়ি লয় ?— এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী ? কী ? কী তবে ?

কটিদেশের পাতার মালা দুলিয়ে মানুষগুলি উপুড় হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে চোখগুলি গোল হয়ে যায়। অভীষ্ট বস্তু বুঝি পেয়ে গেছে তারা। একজন কী ইঙ্গিত করে। আরেক জন ছুটে চলে যায়।

—বেগাবেগি যা, বেগাবেগি যা··· পেছন থেকে নির্দেশ আসে।

ক্রমে একটি পুরো দল চলে আসে। টাঙ্গি দিয়ে বৃক্ষশাখা কেটে কেটে একটি চারকোনা খাটুলি প্রস্তুত হয়। তারপর সংজ্ঞাহীন মৃত্তিকাময় দেহটি বাহিত হয়ে চলে যায় দূরে··· বহু দূরে।

এ দিকে বহধ্বম্ জহধ্বম্ শব্দ করে গিজ্‌ঝকূট থেকে গড়িয়ে পড়ে পাথরের খণ্ড। বৃদ্ধ হলে হবে কী ! গৌতম বিড়ালের সতর্কতায় সরে যান। তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় অতি সজাগ। ধীর চারিকায় ছিলেন তিনি। অদূরে ছিলেন উপস্থায়ক আনন্দ। চারিকার সময়ে তিনি মগ্ন থাকেন নানা চিন্তায়। কেউ বলতে পারে না তা কী ! তা কি ব্রহ্মবিহার ! নাকি দেশ কাল-পাত্র-সমাজ বিহার ! যদি ধ্যানেই মগ্ন থাকবেন তো এতো সতর্ক হন কী করে ?

কিন্তু সতর্কতায়ও পুরো ফল হয়নি। একটি পাথরের খণ্ড গুল্‌ফ ঘেষে চলে গেছে। রক্তধারা বয়ে যাচ্ছে, অস্থি ভেঙেছে কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু গুল্‌ফের পাশটি থেঁৎলে গেছে। উঠতে পারছেন না ভগবান।

—কী হল ? কী হল জেট্‌ঠ ?

ভগবান স্মিতমুখে আনন্দর দিকে চান। বিপন্নতম মুহূর্তগুলিতে আনন্দ ভুলে যান তিনি শ্রমণ। তথাগত বুদ্ধর উপস্থায়ক। শুধু মনে থাকে ইনি জেট্‌ঠ। মাতা গোতমীর কোলে সিদ্ধার্থ ও নন্দ, কিন্তু কিশোর সিদ্ধার্থের সকল কাজের কাজি বালক আনন্দ, পিতৃব্য অমৃতোদনের ছেলে।

আনন্দ বসে পড়েছেন। দ্রুত হাতে ছিঁড়ে নিচ্ছেন ঘাস। চেপে ধরেছেন ক্ষতস্থানের ওপরে।

পথ দিয়ে আসছিলেন দুজন নাগরক। ঊর্ধ্বে মুখ তুলে দেখলেন কিছু মানুষের আকৃতি। গিজ্‌ঝকূটের পাথর ও গুল্মের মধ্য দিয়ে মিলিয়েছে। আনন্দ ব্যাকুল স্বরে বললেন—আয়ুষ্মন, মহাবেজ্জকে একবার সংবাদ দেবেন ! ভগবান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন।

—তা দিচ্ছি সমন, তবে আপনারা সাবধান হন, এটি দৈব বা আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়।

ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে গিরিশিরের দিকে তাকায় নাগরকদ্বয়।

উদ্বিগ্ন আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তথাগত বললেন—সম্মা সতি, হে আনন্দ, সম্মা সতি।

—সেদিন ধনুর প্রহারের হাত থেকে বেঁচে গেলেন বহু ভাগ্যে, আজ নামল গিরিশৃঙ্গ, এর পরে কী ? চলুন ভগবন আমরা রাজগৃহ ছেড়ে চলে যাই। আনন্দ আকুল হয়ে বললেন।

—হে আনন্দ, পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম অংশেরও নাম করো যা মৃত্যুস্পৃষ্ট নয়।

আনন্দ সজল চোখে নির্বাক হয়ে রয়েছেন। তথাগতর যুক্তিজালের সঙ্গে তিনি পরিচিত। সমগ্র জীবন, সমস্ত পৃথিবী এবং মহাকালের প্রেক্ষিতে তাঁর সব বিচার।

—বলতে পারছো না ! তবে কোথায় পালাবে ? ভয়ানক, ভয়ানক থেকে ভয়ানকতর, ভয়ানকতম মৃত্যুও অপেক্ষা করে থাকতে পারে তোমার আমার জন্য। যে বাসনামুক্ত হয়েছে, যে চতুর্ আর্যসত্য জানে—সে ভয়ভৈরবের হাত থেকেও মুক্ত।

নাগরকরা এগিয়ে আসে।

—ধনুর প্রহার থেকে বেঁচে যাবার কথা কী যেন বলছিলেন সমন !

আনন্দ বললেন— এই তো পাঁচ ছ'দিন পূর্বে প্রত্যূষে আজকের মতোই ধীর চারিকায় আছেন ভগবান। গিজ্‌ঝকুটের পাশ দিয়ে পথ। পাঁচটি ধনুর্গ্রহ এসে তাঁকে প্রণাম করল। এরা কজঙ্গলের অধিবাসী, ভাগ্যান্বেষণে রাজগহে এসেছে। এদের নাকি বলা হয়েছে, এই পথের পাশে গুপ্তভাবে থাকতে। প্রথম এ পথ দিয়ে যে আসবে তাকেই হত্যা করতে হবে। ভগবানকে আসতে দেখে ঘাতকরা আশ্চর্য হয়ে যায়। স্বভাবতই শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁর শরণ নেয়। গৃহে ফিরছে এরা, আরও পাঁচটি ধনুর্গ্রহ বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয় দলের একজন প্রথম দলের একজনকে চেনে। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ পায় দ্বিতীয় দলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রথম দলকে হত্যা করবার। বুঝলেন তো? ভগবানকে হত্যা করার কোনও সাক্ষী থাকবে না। ব্যবস্থাটি উত্তমই হয়েছিল। কিন্তু পণ্ড হল।

নাগরকরা উচ্চকণ্ঠে এই ষড়যন্ত্রকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে গেল। তাদের বুঝতে বিলম্ব হয়নি এর পেছনে কারা আছে।

মহারাজ বিম্বিসারের হত্যা আপামর রাজগহবাসীকে রাজনীতি সচেতন করে দিয়ে গেছে। পূর্বে শুধু অভিজাতরাই দণ্ড ও বার্তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন। এখন যে কোনও গৃহস্থ জানে, একজন স্বৈরাচারীর আয়ত্তের মধ্যে বাস করার কী ভয়ানক বিপদ। তথাগত বুদ্ধর ওপর তারা অনেকেই বিরক্ত ছিল, এখন তার দ্বিগুণ বিরক্ত দেবদত্তর ওপরে। হত্যা, গুপ্তঘাতের যেন বান ডেকেছে নগরে। মহারাজ বিম্বিসার নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি কি এভাবে প্রজাসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছেন কখনও? ক্রমশ তাদের ভয় চলে যাচ্ছে। আর কিছুকাল দেবদত্তকে সহ্য করতে হলে তারা বিদ্রোহ করবে, টেনে নামাবে ওই পিতৃঘাতী রাজাকে। অমাত্যগুলি তাকে ঘিরে আছেন, এটাই কথা। কেন? ওঁদের পক্ষপাত কোথায় এবং কেন বুঝতে না পারলে তারা এখনও কিছু করতে সাহস করছে না। কিন্তু রাজগহে অসন্তোষ এখন ধূমায়মান।

নাগরক দুজন চোখের আড়ালে গেলে তথাগত বললেন—আনন্দ তুমি ভালোই বাক্যবাগীশ।

আনন্দ বললেন—আপনিই তো বলে থাকেন মৌনতা অবলম্বন করলেই মুনি হয় না। মৌনতার অর্থ অনেক সময়ে প্রতীতির অভাব, বা কিছু জানাতে কৃপণতা। আমি ওই ঘটনাটি নিশ্চিতরূপে জানি, জানাতেও আমার কার্পণ্য নেই। আপনার অক্রোধের উপদেশের কথা স্মরণে রেখেই এ কথা বলছি।

তথাগত বললেন— তথাগতর উপস্থায়ক না হয়ে তুমি কোনও বোহারিকের উপস্থায়ক হলে ভালো করতে।

আনন্দর মুখটি শুকিয়ে গেল কিন্তু তিনি মুখ নত করে জ্যেষ্ঠের কথা মেনেও নিলেন না। বললেন— কোসাম্বিতে ভিক্ষুরা কলহ করেছিল বলে আপনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তা এখানেও কি একজন কলহ করে সংঘভেদ করছেন না? আর মগধের রাজকুমার? তিনি যা করলেন তা কি ক্ষমার যোগ্য?

—আনন্দ, ভিক্ষুরা আমার আপনজন। তাদের ছেড়ে আমি চলে যাই তাদের চেতনা জাগাতে, আমার এবং তাদের মধ্যে যে সূত্র রয়েছে, সেই সূত্র ধরে টান দিতে। কিন্তু পৃথগ্‌জন অধ্যুষিত এই ভূমি এমনই মরু যা তথাগতকে পার হতেই হবে। সংঘকেও। এমন কি আনন্দকেও। আর তাতেই মরু হয়ে যাবে ফুল্লকানন।

জীবক রথে করে এসে পৌঁছলেন, তাঁর রথে— চর্মপেটিকায় শুশ্রূষার সব আয়োজন। দুহাতে আহত তথাগতকে তুলে নিলেন তিনি।

তথাগত স্মিতমুখে বললেন— হে জীবক, তুমি তো শুধু মহাবেজ্জই নও! মহাবলীও দেখছি।

জীবক হেসে প্রত্যুত্তর দিলেন— তা যদি বলেন ভন্তে, আপনাকে দশবল লোকে শুধু শুধু বলে না। আপনার দশ বলের একটি বল অন্তত দৈহিক বল। সম্যক আহার, সম্যক বিহারে শরীরটি রেখেছেন চমৎকার!

—আর সম্যক সমাধি? তার কথা তো কই বললে না জীবক! ধ্যানটি ঠিক মতো অভ্যাস করছো তো?

—যতদূর পারি ভন্তে! তবে বোঝেনই তো জীবকের ধ্যানের একমাত্র বিষয় হল ব্যাধি। বিচিত্র, দুরন্ত সব ব্যাধি— জীবক হাসিমুখে তথাগতর ক্ষত পরিষ্কার করে ভেষজ লাগিয়ে পট্টিকা বেঁধে দিলেন। না, অস্থি ভাঙেনি।

নালাগিরির ঘটনার পর রাজগৃহের মনোজগতে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। ঘটনাটি ঘটে এইরূপ: নালাগিরি এমনিতেই দুর্দান্তস্বভাব হাতি। মহারাজ বিম্বিসার ছাড়া আর কাউকে সে পিঠে নিতে চাইত না। তাকে সুরাপান করিয়ে উন্মত্ত অবস্থায় পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক যে সময়ে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধ ভিক্ষার্থে বার হয়েছেন। সঙ্গে অল্প কজন ভিক্ষু। হাতির সামনে পড়ে গেছে শিশু কোলে এক রমণী। আনন্দ ছুটে আসছেন— রক্ষা করতে হবে ওই শিশুটিকে, তার মাতাকে, তথাগতকে। উপস্থায়ক আজ প্রাণ দিয়েই ছাড়বেন। সহসা তথাগত স্বয়ং একটি যুবক মল্লর মতো দ্রুত, অতিদ্রুত চারণে সবাইকে পার হয়ে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়ালেন হাতিটির। কী যেন বলছেন হাতিটিকে। শুঁড় তুলে হাতি বাতাসে গন্ধ নিতে থাকে—এ সেই তাঁর গন্ধবাহী বাতাস না, যার অদর্শনে সে ক্ষিপ্ত হয়েছিল! রক্ত গৈরিকের ছটা, প্রসন্ন সুন্দর মূর্তি— এঁর চারিদিকের ব্যক্তিত্ব-বলয়ে তার প্রভু বিম্বিসারের গায়ের ঘ্রাণ! হাতির শোকানলে শান্তি বারি ঝরছে। সে জানু মুড়ে বসে পড়ল।

কাতারে কাতারে লোক জমে গিয়েছিল সেদিন জীবকাম্রবন থেকে বৈভারের পথে। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উঠতে থাকে গৌতম বুদ্ধর নামে। এতদিন পরে মহারাজ বিম্বিসারের একটি স্বপ্ন পূর্ণ হল বুঝি বা। রাজগৃহের মানুষ তাদের পূর্ব অভিযোগ ভুলে গৌতমের চরণে লুটিয়ে পড়ল। প্রাসাদে বসে প্রমাদ গুণলেন অজাতশত্রু। গয়াশিরে পালালেন দেবদত্ত, কোকালিক, মোরগতিষ্য, খণ্ডদেবপুত্র ও সাগরদত্ত। সংঘভেদী বিশ্বাসঘাতক পাঁচ শ্রমণ।

কার্তিকোৎসবের উৎসব মুখরিত দীপোজ্জ্বল সন্ধ্যা। পূর্ণিমার চাঁদ থেকে যেন কুন্দকুসুমের প্রপাত নেমেছে। রাজা অজাতশত্রু উৎসবে অংশ নিতে পারছেন না। সভাসদদের ডেকেছেন। এসেছেন বর্ষকার সুনীথ, চন্দ্রকেতু-জীবক, কুমার অভয়, এসেছেন নগরশ্রেষ্ঠী অহিপারক। বেশ-বাস করেছেন রাজা, জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করছে মুকুটের হীরক, কিন্তু প্রাসাদ অঙ্গনেই বসে আছেন, কখনও বসে, কখনও বা দাঁড়িয়ে উঠছেন। অতি অস্থির। মাধ্বী পরিবেশিত হয়েছে। সোনার পাত্রে স্বাদু, দুর্মূল্য আসব। পাত্র হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন জীবক, চন্দ্রকেতু।

গণ-উত্থানের ভয়ে তুমি আজ রূপ পরিবর্তন করছো, তাই না কুমার? বহিঃশত্রু তো আছেই। কোশলরাজ একবার পরাজিত হয়েছেন, আবারও হবেন কী? সেনাপতি মহানাগ নেই। হত হয়েছেন মহাবীর কুরুবিন্দ। শোনা যাচ্ছে অবন্তীর সৈন্যও বেরিয়ে পড়েছে। প্রদ্যোত মহাসেন নাকি বিম্বিসার হত্যায় জ্বলন্ত অয়সের মতো তপ্ত হয়ে রয়েছেন। তিনি এবার বৈশালীর সঙ্গে মিলবেন। সঙ্গে আসছে তাঁর দুর্দান্ত নিষাদ সেনা।... তাই আজ সভাসদ্‌দের ডেকে পানভোজন করতে চাইছো! এই অভয়কুমারকে নিজ প্রাসাদে বন্দী রেখেছিলে, চন্দ্রকেতুকে পাঠিয়েছিলে কারাগারে, অহিপারক, বর্ষকার, সুনীথ কারো কথার মান দাওনি! এই সচিবরা তাই অন্য অমাত্যদের কাছে অপরাধী হয়ে আছেন। চোখে চোখ রাখতে পারেন না কারো। নিঃশব্দ ধিক্কার চতুর্দিকে— ধিক বস্‌সকার, ধিক ধিক সুনীথ তোমাদের না মহারাজ বিম্বিসার সবচেয়ে উচ্চপদে বসিয়েছিলেন! বিশাল মগধসাম্রাজ্যের সর্বার্থক হওয়ার আশা পরিপূরিত হয়নি বলে কুমারের লোভে ইন্ধন জুগিয়ে রাজার প্রাণ নিলে? রানির প্রাণ নিলে? ধিক ধিক, শত ধিক্...

সহসা কুমার দু হাত উর্ধ্বে তুলে অব্যক্ত আর্তনাদ করে উঠল—পিতা! পিতা!

অদূরে ধাত্রী এসে দাঁড়িয়েছে কুনিয়র শিশুপুত্র উদায়ীকে কোলে নিয়ে, শিশু পিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে দু হাত।

—কুমার দু হাতে নিজের বক্ষে আঘাত করতে থাকে।

ধাত্রী সভয়ে শিশুটিকে নিয়ে পালায়। অন্তঃপুরের পথ থেকে শিশুটির কান্না ভেসে আসে। ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর।

মুখ নত করে বসে থাকেন সবাই। একটি সান্ত্বনার বাক্যও উচ্চারণ করতে পারেন না।

—জীবকভদ্র। জীবকভদ্র!— কুমার এমন করে ডাকছেন যেন কেউ তাঁকে ছুরিকাবিদ্ধ করেছে।

—বলুন কুমার— রাজা হতে পারেন অজাতশত্রু। এঁরা কেউ তাঁকে কুমার ছাড়া বলেন না।

—বলুন, কার কাছে, কোথায় গেলে শান্তি পাবো! দিনে রাতে সর্বত্র পিতার মুখ দেখি... মাতার মুখ... সইতে পারি না।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবকের হৃদয়ের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল। কিন্তু সেই মহাবাণী ছাপিয়ে তাঁকে অধিকার করতে লাগল পবিত্র ক্রোধ।

খেলা, না ? এই সব রাজা-হওয়া, রাজা-হত্যা করা ! অমাত্য নির্বাচন, যুদ্ধ ! হে রাজনীতিকগণ— ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ, খেলা পেয়েছ, না ? লক্ষ কোটি মানুষের জীবন নিয়ে চিরকাল ধরে খেলা করে চলেছ ? জানলে না জীবনের রহস্য। জানতে চাও না। পারবে ? মহাপ্রাণ ছেড়ে এক বিন্দু প্রাণও সৃষ্টি করতে পারবে ? বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্ক প্রাণ ? তাও পারবে না। আয়ুর্বেদ বলছে—পারবে না। জীবক জানে— পারবে না। ব্যাধির দুঃখ, অঙ্গহানির দুঃখ, মহাদুঃখ জীবজগতে, জীবক প্রাণপণে তার সারা জীবনের সাধনায় সে দুঃখ এই মগধেই বা কতটুকু দূর করতে পেরেছে ? পারেনি, কিছুই পারেনি। আরও অনেকগুলি জীবন পেলে, আরও ফলবান মস্তিষ্ক, যুগাতিশায়ী প্রতিভা পেলে আরও পারতো। কিন্তু জীবক জানে, সুস্থ সবল সুন্দর জীবনের কী অপরিসীম মূল্য। সেই জীবনগুলি শিশু যেমন করে পতঙ্গের পাখ ছেঁড়ে তেমনি করে ছিঁড়েছ, ভেঙেছ, সর্বনাশ ছড়িয়ে দিয়েছ দু হাতে ; তোমার শান্তির অধিকার কী ?

ক্রোধে অগ্নিপিণ্ডের মতো লোহিতবর্ণ হয়ে স্থির বসে রইলেন কোমারভচ্চ।

সেট্‌ঠিবর, বলুন, আপনি অন্তত কিছু বলুন !

গলাটি অনাবশ্যক ঝেড়ে কেশে অহিপারক বললেন— রাজগহের পাহাড়ে, কন্দরে তো কত বড় বড় তীর্থঙ্কর বাস করছেন, গিয়েই দেখুন না !

—না, না, এমন কেউ কি নেই যাঁর করুণা অলৌকিক, আকৃতি বচন এমনই সৌম্য মধুর যে দেখলেই হৃদয় শান্ত হয় !

উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারেন কুমার কার কথা বলছেন, কিন্তু কিছু দিন আগেও যাঁর নাম পর্যন্ত মুখে আনা নিষিদ্ধ ছিল, যাঁকে আরাধনা করার অপরাধে যত্র তত্র হত্যা হয়েছে, হত্যা হয়েছে এমন কি সুকুমারী নারী পর্যন্ত, কিশোরী নটী শ্রীমতীর হত্যার স্মৃতি কি অত সহজে মুছবে ? কে তাঁর নাম মুখে আনবে ?

জীবকের দিকে ভিক্ষুকের মতো চেয়ে রয়েছেন কুমার।

জীবক ভাবলেশহীন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— আপনি কি তথাগত বুদ্ধর কথা বলছেন ? তিনি এখন আমারই অম্ববনে অবস্থান করছেন। যান, যাবেন তো যান। এমন কোনও ক্ষমা নেই যা তাঁর অদেয়।

জীবক উঠে দাঁড়ালেন।

—কোথায় যান মহাবেজ্জ ? আপনি সঙ্গে যাবেন না ?

ভয়, ভয়ভৈরব অধিকার করেছে পিতৃঘাতককে।

অম্ববন। ঝিল্লির ডাকটি পর্যন্ত শোনা যায় না। কার্তিকী পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নায় গাছের পাতাগুলি পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়। সঙ্গে সভাসদরা। কুমার সভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল— জীবক ভদ্র, এ কী ? ছল করে এখানে এনে হত্যা করাবেন নাকি ?

—এর অর্থ ?— জীবক ক্রুদ্ধ মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন— আপনিই তো আসতে চাইলেন ? আপনি পাবেন শান্তি ? সান্ত্বনা ? মহারৌরব নরকের আগুন আপনার নিজের ভেতরেই জ্বলছে।

—মহাবেজ্জ। মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন অহিপারক। সতর্ক করা প্রয়োজন জীবককে।

কিন্তু কুমার যেন কিছুই শোনেননি। বললেন— এই সব বৃক্ষের পেছনে অস্ত্রধারী ঘাতক আছে। আমি জালে পড়ে গেছি। গুপ্তহত্যা··· স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শল্যগুলি শাখা-প্রশাখা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে··· দূর হতে বিঁধবে···

অমাত্য চন্দ্রকেতু আর সহ্য করতে পারলেন না, এগিয়ে গেলেন। পেছন পেছন চলে গেলেন জীবক ও অহিপারক। প্রাণান্তক ভয়ে অজাতশত্রু অসি কোষমুক্ত করে সামনের বৃক্ষতল পেরোলেন। অমনি অন্ধকার সরে গেল। আলো, আলো। আলোর সমুদ্রে ভাসছে রাজগৃহ। ধনী, দরিদ্র, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, দাস, নর, নারী, বালক বালিকা, নটী, গৃহিণী সবাই। সমগ্র রাজগৃহে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচার হয়ে গেছে তথাগতবুদ্ধ এক দেবমানব। রাজগৃহের অনেক ভাগ্যে তিনি এখানে অবস্থান করছেন। তাঁর ঋদ্ধি বিফল করে দিয়েছে সমস্ত বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্র। এই আনন্দসন্ধ্যায় তাই রাজগৃহ তার ভ্রম শুধরে নিতে জীবকাম্রবনে এসে বসেছে। শুভ্র বসন সব, উত্তরীয়গুলি বাতাসে অল্প অল্প উড়ছে, মানবসমুদ্রে যেন হিল্লোল উঠছে। ঋজু, শুভ্র মূর্তি। বসে আছেন মণ্ডলমালে। দুই ভ্রূর মাঝখানে একগুচ্ছ শুভ্র রোম।

তিনি বলছেন—এক অদ্ভুত জগৎ অদ্ভুত সমাজের কথা। সেখানে হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ নেই। সৎ কর্ম, সৎ সঙ্কল্প, সৎ চিন্তার মধ্য দিয়ে জীবনকাল কাটিয়ে পৌঁছও এক অনির্বাণ প্রশান্তিতে— যার নাম নির্বাণ।

নির্বাণ কী ? কেমন ? তা ভাষার অতীত, বর্ণনার অতীত। কেমন সে কথা ভেবে অনর্থক কালক্ষেপ করে কাজ নেই। কেউ কি কখনও গঙ্গার বালুরাশি কিংবা সমুদ্রের জল গুণে, পরিমাপ করে শেষ করতে পেরেছে ? প্রয়োজনই বা কী ?

—ভগবন, জগৎ শাশ্বত কি অশাশ্বত ?

—দেহ ও আত্মা এক না পৃথক ?

—ভগবন, নির্বাণ প্রাপ্ত অর্হন কি বিদ্যমান থাকেন ?

—হে রাজগহবাসী, আমি কি একবারও তোমাদের বলেছি এসো এসো। তোমরা তথাগতর শরণ নাও, তাহলেই আমি তোমাদের এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেবো। এমন বচন দিয়েছি কী ?

—না ভগবন, তা আপনি দেননি।

—তা হলে এ সকল প্রহেলিকা থাক। হে নাগরকগণ, যদি কোনও ব্যক্তির শরীরে বিষাক্ত বাণ প্রবেশ করে, এবং সেই ব্যক্তির আত্মীয়রা মহাবেজ্জ জীবককে ডেকে আনে তাহলে কি জীবক যন্ত্রণাকাতর রোগীকে প্রশ্ন করবেন এই বাণ কে মেরেছে ? সে গৌরবর্ণ না কৃষ্ণ বর্ণ ? সে ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়, না শূদ্র ? ধনুকের জ্যাটি কিসের ? জিজ্ঞাসা করবেন, না শল্য চিকিৎসা করে রোগীকে আরোগ্য করবেন !

—আরোগ্য করবেন ভগবন—

—জগৎ শাশ্বত বা অশাশ্বত, আত্মা আছে কিনা, মৃত্যুর পর কী ঘটবে এ সকল উত্তর-প্রত্যুত্তরে শুধু কালক্ষেপই হবে, জরা, মরণ, পরিদেব, শোক এগুলির থেকে মুক্তি হবে না। তথাগত যেসব বিষয়ে চর্চা করেননি সেগুলি চর্চার অযোগ্য জানবে। অস্ত্র ব্যতীত, হিংসা ব্যতীত এক সুন্দর জীবন গঠনের চেষ্টায় নিয়োজিত হও।

অজাতশত্রু সেই মহতী সভায়, জ্যোৎস্নালোকে তথাগতর বেদিকার সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ভঙ্গিতে পড়ে গেলেন।

বড় সংশয়ী মানুষ বর্ষকার। বললেন— কুমারের চাতুর্য বুঝলে, সুনীথ ?

—বলুন মহামাচ্চ, আপনার ব্যাখ্যাগুলি।

—গণ- অভ্যুত্থানের ভয় পাচ্ছেন তো, তাই গণের সামনেই তথাগতর শরণ নিলেন। তথাগত এখন রাজগহের মাথার মুকুট। কুমার পাপী কিন্তু অনুতপ্ত, ওঁর শরণাগত। উনি ক্ষমা করলে, রাজগহ ক্ষমা না করে করে কী ?

—এতোটুকুও সত্য কি নেই কুমারের আচরণে ?

—আছে সুনীথ, ভয়ের সত্য, ইদ্ধিতে বদ্ধমূল বিশ্বাসের সত্য, আর সহজাত কূটবুদ্ধির সত্য। ভয় নাই। কুমার অস্ত্রত্যাগ করবে না, মগধসাম্রাজ্য আমরা পাবোই। আজ, নয় কাল।

—তোমরা কে ?— কণ্ঠ ক্ষীণ, দৃষ্টিতে আলো নেই, স্মৃতি আহত, যেন বহুদূর থেকে বললেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোমরে পাতার মালা, গলায় কুঁচ ফলের হার, খালি গা, মানুষগুলি বলল— হড় গো, মোরা হড়। ই যে বির দেখিস কেঁদ, বয়ড়া, গাব, শ্যাওড়া, সাল, পিয়াল গাছে গাছ বির, ই বির মোদের।

এরা এই বনের মানুষ ? নিজেদের এরা হর বলে কী ?

—আমি কোথায় ?

—মোদের মজাঙে আছিস। ভাবিস নাই। তু মোদের মেইয়্যার নাম লিছিস। তুরে ঠারে লিব। বুঢ়ামবুঢ়া বুঢ়ামবুঢ়ি বলিছে।

ধিমি ধিমি ধিমি ধিমি বাদ্য বাজে। তাঁর ঘোর লাগে। এরা কি তাঁকে কোনও সুরা পান করিয়েছে ? জিভে কেমন একটা মাদক মধু মধু স্বাদ ! বলকারক কোনও তৈল দিয়ে তাঁর সারা শরীর মাজছে এরা। শরীরের অসাড়ভাব কেটে যাচ্ছে ক্রমশ। কার নাম নিয়েছেন তিনি ? কার নাম ? তিনি বুঝতে পারেন না কেন এরা তাঁকে সেবা করছে।

তিনি ঘোরে থাকেন। মজাঙে রক্ষিত আগুন থেকে তাঁর হাতে পায়ে সেঁক দিতে দিতে বাঁশের চোঙা থেকে মধুক-মদ পান করে তারা। গল্প করে অনেক চাঁদ আগে তাদের বন্ধু ভিন্ন এক কিল্লির পাড়ায় এক যতি এসেছিলেন। পূজা ঠিকমতো না হওয়ায় একদিন তিনি রাগ করে অদৃশ্য হয়ে যান। আর তারপরে তাঁর মন্তরের টানে তাদের বীরতমা মেয়েটি আর বীরতম ছেলেটি কোথায় চলে যায়। যতি দেখলেই তাই সব কিল্লির হড়রা তাকে তুষ্ট করবার প্রাণপণ প্রয়াস পায়। কে বলতে পারে কার মধ্যে কী শক্তি আছে।

ঘুমঘোরের মধ্যে গল্প কথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় তাঁর চেতনা। তিনি অস্পষ্ট স্বপ্নে নিজেকে হাতড়ে ফেরেন। তিনি কে ? কোথায় ছিলেন ? তিনি কি কোনও যতি ? এরা কি পত্রশবর ? কারা হারিয়ে গেছে ? তিনি কি তাদের চিনতেন।

২৪

AMARBOI.COM

মগধ-কোশলের যুদ্ধে ভিক্ষুসংঘ বড়ই জড়িয়ে পড়ে। কোশলের পক্ষে থাকে এবং থাকে সক্রিয়ভাবে। বুদ্ধ তখন জেতবনেই। ভিক্ষুদের সক্রিয় সহযোগের কথা তিনি প্রথম থেকেই জানতেন কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না। ধনুর্গ্রহ তিষ্য নামে এক স্থবির আরেক স্থবির উপ্তুর সঙ্গে একই পরিবেণে থাকতেন। ধনুর্গ্রহ তিষ্য প্রব্রজ্যা নেবার আগে তক্ষশিলার শস্ত্রশিক্ষক ছিলেন। তাঁর সেই সময়ে রাতে নিদ্রা হত না পসেনদির মূর্খামিতে। অবশেষে উপ্তুর পরামর্শে তিনি তাঁর শিষ্য পাঞ্চালকে ডেকে পাঠান।

—আমাকে নিমন্ত্রণ করছ না কেন তিষ্য ?

—সে কী ? এখনি করছি। কালই আসুন আচার্যদেব।

—যাবো যাবো অবশ্যই যাবো, কিন্তু আমি শ্রমণ, আমাকে সেইভাবে ডাকো আয়ুষ্মন।

—ভন্তে, আমার অপরাধ হয়ে গেছে।

পরদিন নিমন্ত্রণে এসে তিষ্যপত্নী সোমার হাতের পায়স চেটেপুটে খেতে খেতে স্থবির বললেন—উপাসককে ভোজনান্তে উপদেশ দেওয়ার নিয়ম, জানো নিশ্চয় তিষ্য ! সুতরাং আরম্ভ করি। বলি বৎসে সোমা, তুমি এমন বিদুষী হয়ে পতিকে যুদ্ধে যেতে দিচ্ছ না এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

সোমা বলল—সে কি ভন্তে, এমন মিথ্যা আরোপ আমার ওপর ?

—তবে তিষ্য সৈনাপত্য করছে না কেন ? কে বাধা দিচ্ছে ?

তিষ্য বলল—দীঘ মল্ল রয়েছেন। কুমার রয়েছেন। মগধ থেকে পালিয়ে আসবার সময়ে যুদ্ধ করেছি। মহারাজ তো স্বয়ং নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখন।

কুমারের গূঢ় বিরাগ ও দ্বেষ যে তাঁকে এই যুদ্ধ থেকে শেষ পর্যন্ত সরিয়ে রাখল, এ কথা পাঞ্চাল পত্নী ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ওটি তো একটি আস্ত গর্দভ !

—স্বর মৃদু করুন ভন্তে ! আমি জানি উনি তাই। কিন্তু ওঁর গর্দভত্বের কোন্ দিকটির প্রতি আপনি এখন নির্দেশ করছেন ?

—দীঘ মল্ল ও রাজকুমার বিরূঢ়ক যদি ওঁর সঙ্গে রণক্ষেত্রেই থাকে, তাহলে যুদ্ধে জয় হওয়া সম্ভব ? অচিরেই মহারাজ বন্দীও হবেন। মল্লই ধরিয়ে দেবে।

—সে কী !

—বন্ধুলের কারণে দীঘ কারায়ণের হৃদয়ে প্রতিহিংসার অনল জ্বলছে না ? আর বিরূঢ়ক ভগবানের মধ্যস্থতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য। কিন্তু দাসীপুত্র বলে বিতাড়িত হবার অপমান সে কোনদিন ভুলবে ?

—তা সত্য। কিন্তু প্রতিহিংসা ? বন্ধুলের কারণে ? ঠিক বুঝলাম না ভন্তে !

—তুমি তিষ্য আরও একটি গর্দভ।

—মাঝে মাঝে মনে হয় বটে। কিন্তু আপাতত এ বিশেষণটি কেন উপহার দিলেন ভন্তে ?

—বন্ধুল আর তার দশ পুত্র মহাবীর। এগারটি মহাবীর প্রত্যন্ত দস্যুর হাতে নিহত হল এই শিশু-ভোলানো উপকথা তুমি ছাড়া আর কেউই বিশ্বাস করে না তিষ্য।

—তা হলে ? —নিশ্বাস রুদ্ধ করে তিষ্য বলে।

—পসেনদি নিজে ওদের হত্যা করিয়েছেন।

তিষ্য কাঁপতে থাকে। শরীরে স্বেদ। দেহ কঠিন হয়ে যায়।

সোমা বৃথাই বলে, আত্মসংবরণ করো, ধৈর্য ধরো হে পাঞ্চাল।

স্থবির বললেন—বন্ধুল বড় পরিহাসপ্রিয় মানুষ ছিলেন। কখনও সখনও হয়ত পরিহাস করেই বলে থাকবেন তাঁদের এগারজনের মিলিত শক্তিতে অনায়াসেই পসেনদিকে রাজ্যচ্যুত করা যায়...পসেনদি যে তাঁর ছাত্রজীবনের সখা এ কথা তো বন্ধুল কখনওই ভুলতেন না—তা এই প্রকার কথাবার্তা হতে হয়ত অনড়বান রাজাটির মনে সংশয় জমে থাকবে ! মল্লর বিরুদ্ধে মন্ত্রণা দেবার লোকও তো অমাত্যদের মধ্যে কিছু অল্প নয়, তুমি তো জানো সবই...কী হল তিষ্য, কথা বলো ? এমন বাক্যহারা হলে প্রতিহিংসা নেবে কী করে ?

—আপনি বুদ্ধপন্থী হয়ে প্রতিহিংসার কথা বলছেন ?—তিষ্য অনেক কষ্টে সংবৃত হয়ে বলে।

—আয়ুষ্মন, বন্ধুল যেমন পসেনদির সতীর্থ ছিলেন তেমনি আমারও ছিলেন যে ! আর সদ্ধর্ম যেমন প্রাণিহিংসা, হিংসার পরিবর্তে হিংসা নিষেধ করে, তেমনি অসৎকে পরিত্যাগ করার কথাও তো বলে। আমি এবং স্থবির সারিপুত্ত এমন কত উপদেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করে আনন্দ পাই। তবে প্রতিহিংসার অর্থ যে হত্যাই, তা আমি একবারও বলিনি তিষ্য। দেবদত্তর কেমন শাস্তিটা হল ? নিজের শিষ্যদের পদাঘাতে মুখে রক্ত উঠল, তারপর ভগবানের কাছে আসবার পথে ভূকম্পে মারা গেল।...তবে অসতের শাস্তিবিধান করতে হলে কাকে ছেড়ে কাকেই বা রুখবে ? এই যে একেকটি রাজবংশ হয়ে যাচ্ছে, মনে করছে পরম্পরায় পৃথিবী ভোগ করবে, এতেই হয়ে যাচ্ছে সর্বনাশ !

—আমাকে কী করতে বলেন ভন্তে।

—যুদ্ধে যাও, কাশী হতে গয়ায় প্রবেশ করতে দু' পাশে গিরি আছে, ওইখানে শকট ব্যূহ রচনা করে অজাতশত্রুকে টিপে মারো।

ধনুর্গ্রহ তিষ্য চলে গেলেন। যাবার সময়ে পেছন ফিরে একবার মৃদুস্বরে বললেন—আমার নামটি আবার যেন তথাগতের কানে না যায়। তুমি যা—

—গর্দভ ! তিষ্য বলল।

কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল তথাগত ব্যাপারটি শুধু জানেনই না, প্রসন্ন মুখে তিনি ধনুর্গ্রহ তিষ্যর গুণগান করছেন।

যাই হোক, পাঞ্চালের পরামর্শে শকট ব্যূহ রচনা করে পসেনদি জয় লাভ করলেন। কিন্তু অজাতশত্রুর শাস্তি ? হল কই ! দু'-তিনদিন ধরে বন্দী মগধরাজকে অনর্গল তিরস্কার করে কন্যা বজিরার সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন পসেনদি। এবং যে-কাশীগ্রাম নিয়ে বিরোধ সেটাই তাকে প্রত্যর্পণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন।

কিশোরী বজিরার কান্না, আহত সৈনিক ও দাসদের আর্তনাদ, মৃত সৈনিকদের স্ত্রী-পুত্রদের হাহাকার ও বিবাহ উৎসবের বিবিধ হট্টরোল শুনতে শুনতে ক্রমশ বিষণ্ণ, উদাস হয়ে যেতে থাকেন পাঞ্চাল। ওই তো রাজা পসেনদি বার্ধক্য-কুঞ্চিত মুখে হা-হা করে তাঁর বিখ্যাত হাসি হাসছেন। মদিরার স্ফটিক পাত্র তুলে দিচ্ছেন তারই হাতে যে নাকি তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপতির নিষ্ঠুর ঘাতক! কই? শোক, ক্রোধ এসবের কোনও চিহ্ন তো নেই! তা হলে যুদ্ধ কেন হল? সহস্র সৈন্য নিহত হয়েছে। শত শত আহত। উভয় পক্ষেই। রাজায় রাজায় এ এক গোপন খেলা তবে পরস্পরের সিংহাসন সুরক্ষিত করার জন্য?

বিবাহ-সভা ত্যাগ করে চলে যান পাঞ্চাল।

—কোথায় যান পাঞ্চাল!

কুমার বিরূঢ়ক আসছে পেছন পেছন।

—আপনি কোথায় যান?

ক্রুদ্ধ মুখে গর্জন করে কুমার বলে—ভগ্নীর কান্না আর শুনতে পারছি না পাঞ্চাল। একটা নৃশংস ঘাতক, বিকলাঙ্গ—এই কি বজিরার উপযুক্ত পতি? আমাদের ভাই-ভগ্নীর কোনও মূল্য নেই পিতার কাছে?

বড় বড় নিশ্বাস পড়ে কুমারের।

তিষ্য বলেন—এ এক প্রকার কান্না। কুমার, আরো কান্না আছে। শুনবেন তো আসুন।

শুশ্রূষাশালায় আহত সৈনিকদের মধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি কুমারকে নিয়ে। বৈদ্যরা পট্টিকা লাগাচ্ছেন, ঔষধ দিচ্ছেন, হাত, পা, আঙুল বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দিতে হচ্ছে। অমানুষিক চিৎকার, আর্তনাদে শুশ্রূষাশিবির যেন সপ্তম নরক।

অশ্বারোহী দলের এক সৈন্যের দুটি পা-ই গেছে, ক্ষতস্থান পচে ভীষণ আকার ধারণ করেছে। সে জান্তব আর্তনাদ করছে আর বলছে—নিপাত যাক, নিপাত যাক মগধ, কোশল নিপাত যাক...ধ্বংস হয়ে যাক যে যেখানে আছে।

—কী হবে আমাদের পুত্র-কন্যা-পত্নীর? কেউ কেউ বলছে।

—আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার? কে দেখবে? —রব উঠছে চারদিকে।

পাঞ্চাল বলেন—শান্ত হও, শান্ত হও সৈনিক, আমি দেখব, কথা দিচ্ছি, এই কোশলকুমার দেখবেন।

আরও বৈদ্য আসেন। শল্যবিদ আসেন। সেবক আসে। মৃত্যুর হাহাকার...তারই মধ্যে যাদের আঘাত অত গুরুতর নয়, যাদের চিকিৎসায় উপকার হচ্ছে তারা জয়ধ্বনি করে তিষ্যকুমারের, রাজকুমারের। ক্রমশ বৈদ্যদের কাছে গিয়ে প্রতিটি রোগীর সংবাদ নিতে থাকে বিরূঢ়ক।

—এই-ই করণীয় কুমার—ধীরে ধীরে বলেন পাঞ্চাল—স্বাভাবিক করুণার বশে যদি না-ও করেন, অন্তত প্রজাদের হৃদয়ে প্রবেশ করবার জন্যও করুন।

শ্রাবস্তীতে ফিরে মগধ যুদ্ধে হতাহত সৈনিকদের পরিবারগুলির জন্য ব্যবস্থা নেন পাঞ্চাল। সেনাপতি দীঘমল্লর পরেই এখন তাঁর স্থান। কিন্তু রাজার দেওয়া বৃত্তির অধিকাংশই ব্যয় করেন দানে। পত্নী জিতসোমার সঙ্গে থাকেন সাধারণ গৃহস্থের মতো।

চণকের সন্ধানে দিকে দিকে লোক যায়। কেউ কোনও সংবাদ আনতে পারে না। দর্ভসেনের মৃত্যুর পর গান্ধারের সবার্থক হয়েছেন তাঁর পরমমিত্র অনঘ আঙ্গিরস—এমন সংবাদ আসে। প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায় তখন যে চণক সেখানে নেই।

শ্রাবস্তীর রাজনীতির আকাশে সবার অলক্ষ্যে মেঘ ঘনায়। কাল, জুহু, উগ্র, শ্রীভদ্র—ব্রাহ্মণ অমাত্যরা কেউ বৃদ্ধ রাজার ওপর আস্থা রাখেন না। সারাটা জীবন তিনি একবার বুদ্ধ একবার বেদ এইভাবে দুই তরীতে পা দিয়ে চললেন; তাঁদের অসন্তোষ আজকাল পরিষ্কার বোঝা যায়। দীঘকারায়ণের সঙ্গে প্রায়ই তাঁরা নানা পরামর্শ করেন, যদিও সে মল্ল বলে তাকেও তেমন বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন না। প্রায়ই এই অমাত্যদের গৃহ থেকে নিমন্ত্রণ আসে তিষ্যর কাছে।

এমনই এক নিমন্ত্রণে যেতে অমাত্য শ্রীভদ্র একদিন বললেন—মহামান্য পাঞ্চাল, আপনি তো কোশলেরই সন্তান...

পাঞ্চাল বুঝতে পারেন না শ্রীভদ্র কী বলতে চান।

শ্রীভদ্র বলেন, কোশলের গর্ব আপনি। প্রজাসাধারণকে যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে জয় করে ফেলেছেন তাতে করে মনে হয় কোশলের এখনও কিছু আশা আছে। আপনি কি সেই ঘটনাটি জানেন ?

—কোন ঘটনা ?

—ওই, রাজা রাজকুমার এরা মনোমত না হওয়ায় অমাত্যরা তাদের সিংহাসন থেকে টেনে নামায়, জনগণ সমর্থন করে, একজন সত্যিকার গুণী মানুষকে তখন রাজা করা হয় !

—এমন ঘটনা আগে প্রায়ই ঘটত—তিষ্য সতর্কভাবে বলেন।

—আবার ঘটবে, ভবিষ্যতে প্রচুর ঘটবে, বর্তমানেও ঘটা উচিত। এইভাবে চললে কোশলের আয়ু আর অধিক দিন নয়। মগধের গর্ভে চলে যাব আমরা।

তিষ্য মনে মনে হাসতে হাসতে ফেরেন। শ্রীভদ্র জানেন না, একদা এই তিষ্য মগধেরই আধিপত্য বিস্তার করার জন্য প্রাণপণে করেছেন। সে কথা জিতসোমাকে জানাতে সে বলে—সাম্রাজ্য হবেই পাঞ্চাল, দৈবরাত যে-চক্রবর্তীক্ষেত্রের কথা বলে গিয়েছিলেন এই মধ্যদেশ, প্রাচী-ঘেঁষা মধ্যদেশই সেই ক্ষেত্র। অজাতশত্রু এবং তাঁর দুই দুর্ধর্ষ সচিব বর্ষকার ও সুনীথ থাকতে মগধের সাম্রাজ্য হওয়ায় কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি অমাত্য ছিলাম, আমি জানি পাটুলিতে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহর সঙ্গমস্থলে দুর্গ গড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। অতি দক্ষ দ্রাবিড় কম্মাররা এসেছে, মহাশিলাকণ্টগ বলে এক ধরনের নতুন অস্ত্র নির্মাণ করাচ্ছে অজাতশত্রু। বড় বড় শিলাখণ্ড বহু দূর পর্যন্ত ছুড়তে পারবে এই অস্ত্র। গবেষণা চলছে রথমুষল নিয়ে। রথের চারপাশে মুষল থাকবে। এই দ্রুতগামী রথ শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়ে চললে বহু লোক নিমেষেই হতাহত হবে।

তিষ্য আশ্চর্য হয়ে বললেন—সত্যিই তো ! নতুন অস্ত্র হলে তবেই তো পুরনো অস্ত্রধারীদের ওপর জয়লাভ করার আশা থাকে ! এ কার কল্পনা, সোমা ?

—কুমারেরই।

—কুমার তো তা হলে সামান্য নয় ?

—আমি কি একবারও বলেছি সামান্য ? প্রকৃত কথা উদ্ভাবনী-প্রতিভার সঙ্গে শুভবুদ্ধি আছে কিনা। হে পাঞ্চাল, শুভবুদ্ধি বিবর্জিত কুমারের প্রতিভা তাই ভয়ের কারণ। তবে এখন শুনছি তথাগতর সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেছে...আশা করতে পারি তার কিছু ভালো ফল হবেই ! —সোমা হাসল।

অন্যমনস্কভাবে তিষ্য বললেন—তা হলে দৈবরাত ঠিক মানুষটিকে চিহ্নিত করতে পারেননি ! পিতা নয় ? পুত্র ?

জিতসোমা বিষণ্ণ দু চোখ তুলে বলল—দৈবরাত ভুল করেননি পাঞ্চাল। কাল, স্বয়ং কাল এই ভুল করেছে।

শ্রাবস্তী থেকে কপিলবস্তু। কপিলবস্তু থেকে শ্রাবস্তী ঘন ঘন যাতায়াত করছেন বুদ্ধ। মগধের সঙ্গে সন্ধির পর নিশ্চিন্ত পসেনদিও তাই করছেন। রানি মল্লিকার মৃত্যুর পর এক স্থানে স্থির থাকতে পারেন না তিনি। বুদ্ধর প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়েছে। সমান অনুপাতে বেড়েছে অমাত্যদের বিরাগ।

অবশেষে একদিন প্রবাসী পসেনদির রাজছত্র, মুকুট ইত্যাদি রাজচিহ্ন চুরি করে নিয়ে দীঘকারায়ণ ঘোড়া ছুটিয়ে আসেন। তাঁর পেছনে কোশলসৈন্যের একটি দল। বিরূঢ়কের রাজ্যাভিষেক হয়। অমাত্যরা কেউ আপত্তি করেন না। কিন্তু আড়ালে পাঞ্চালের কাছে এঁরা নানা প্রকার অভিযোগ জানাতে থাকেন। বয়োবৃদ্ধ অমাত্যদের নানাভাবে অপদস্থ করছেন বিরূঢ়ক।

—অমাচ্চ হয়েছেন কিসের জন্য ? ভৃতি, প্রাসাদ, লোকজন, বহু স্ত্রী, সম্পদ ভোগ করবার জন্য ? রাজাকে সুপরামর্শ দেওয়া আপনাদের কাজ নয় ? যখন পট্টমহিষী এবং তাঁর কুমার প্রাসাদ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহিষ্কৃত হলেন সামান্য দাসদাসীর মতো, তখন কোথায় ছিলেন ? সুন্দরী শূদ্রা দাসীর অঙ্কে শয়ন করেছিলেন বোধহয় !

কিংবা

—মগধের রাজাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন আপনাদের মহারাজ ? এর মধ্যে দণ্ডনীতির কোনও ভুল নেই ? হিংস্র শার্দুলকে হাতে পেয়ে ছেড়ে কেউ দেয় মহামূর্খ ছাড়া ? তারপর আবার সেই শত্রুর ঘরে কন্যা পাঠানো ! জেনে রাখবেন অমাত্য মহোদয়রা, পাশকের গুটি এখন ওই বিকলাঙ্গ রাজার হাতে। আমরা কোনওদিন ওর সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরোধিতা করতে পারব না, কন্যা দিয়েছি বলে। নিষেধ করতে পারেননি ?

—শোনেন তিষ্যও। ঠিকই বলেছে বিরূঢ়ক। বয়স অধিক নয়, কিন্তু বুঝেছে সঠিক। শুধু যদি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আর অকারণ রূঢ়তাকে জয় করতে পারত !

পসেনদি মারা গেলেন রাজগৃহের উত্তর দ্বারের বাইরে এক রথকারের কুটিরে। রাত্রে এসে পৌঁছেছিলেন। রাজগৃহের দ্বার রাত্রে খোলে না। অজাতশত্রুর কাছে শেষ আশ্রয় নিতে এসেছিলেন, না সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছিলেন বোঝা গেল না। তার আগেই হৃৎস্পন্দ বন্ধ হয়ে গেল।

অমাত্যদের গোপন প্রার্থনা তিষ্য রাজা হোক। ক্ষণে ক্ষণে নানা ছলে নানা বেশে চর আসছে তার কাছে। যে কোনও সুযোগে তাঁরাই বসাবেন তিষ্যকে সিংহাসনে। বহু শ্রেষ্ঠী, সাধারণজন পাঞ্চাল তিষ্যকে চায়। পাঞ্চাল ভাবেন—হায় ঈশ, একদিন রাজাই হতে চেয়েছিলাম, কী অফুরন্ত শক্তি। উৎসাহ, কল্পনা ছিল, গড়তে চেয়েছিলাম আমার সব দিয়ে একটি আদর্শ রাজ্য। বোধহয় একটি রানীর অভাবে তা হল না। —ভাবতে ভাবতে তিষ্য আপনমনেই হাসেন—আর এখন ? রানী প্রস্তুত, রাজ্য প্রস্তুত, সিংহাসন ডাকছে, কিন্তু তিষ্যই প্রস্তুত নয়। মহাবীর পাঞ্চাল কি শেষে চৌর্যবৃত্তি ধরবেন ? না, কখনও না। মন্দ উপায়ে কোনও শুভফলে পৌঁছনো যায় না।

AMARBOI.COM

পরদিন কোশলের রাজসভা পাঞ্চালের তীব্র প্রতিবাদ শুনল। রাজা বিরূঢ়ক ঘোষণা করেছিলেন, কপিলবস্তুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন।

—কেন ? পাঞ্চাল তিষ্য উঠে দাঁড়িয়েছেন—কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি মহারাজ ! শাক্যরা কোশলের অধীন, নিয়মিত রাজস্ব দেয়। আমাদেরই মনোমত ব্যক্তিকে গণজ্যেষ্ঠক করে, কী ছলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ?

—তারা কোশলের রাজবংশকে, রাজকুমারকে অপমান করেছে। এর চেয়ে বড় কারণ আর কী হতে পারে ? বিরূঢ়ক ক্রুদ্ধ।

—কিন্তু কোশলের রাজবংশ তো আর কোশল নয় মহারাজ।

—অর্থ ?

—কোশলের রাজবংশ একটি ধনশালী কুল। একদা কুলের প্রমুখের হাতে এ রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল। কথা ছিল সচিবরা, মহামাত্ররা মিলে সিদ্ধান্ত নেবেন, রাজা একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। আমি একজন মহামাত্র, সেই পদাধিকারে আপনাকে নিষেধ করছি—মিথ্যা লোকক্ষয় করবেন না। মাতুলদের কুলের সঙ্গে আপনার যে মান-অভিমান তা ব্যক্তিগত। সে কারণে আপনি সমগ্র কোশলকে বিপন্ন করতে পারেন না। এই সেদিন মগধের সঙ্গে যুদ্ধ উপলক্ষ্যে কোশল রক্তস্নান করে উঠেছে, আবারও যুদ্ধ হলে তা কোশলের কাল হবে।

জুহ্, কাল, শ্রীভদ্র—তিন অমাত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—মহামাত্র পাঞ্চাল ঠিকই বলেছেন মহারাজ।

সিংহাসন ছেড়ে রাগে গরগর করতে করতে সভা ত্যাগ করে চলে গেল বিরূঢ়ক।

কদিন পরই কোশলসৈন্য কপিলবস্তুর দিকে যাত্রা করল। কুমার স্বয়ং পরিচালনা করছেন। দীঘকারায়ণ রাজধানী রক্ষা করতে লাগলেন। আর কাউকেই নতুন রাজা বিশ্বাস করেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঞ্চাল নিজের গৃহে ফিরে জিতসোমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। পুঁথিতে সম্ভবত ছায়া পড়েছিল, জিতসোমা মুখ তুলে তাকালেন। মগধ হতে আসবার পর থেকে জিতসোমার শীর্ণতা কাটেনি। চোখদুটি অস্বাভাবিক বড় এবং কালো দেখায়। রজতসূত্র দেখা দিচ্ছে মাথায়। এখনও চণকের সন্ধান চলছে। দেশে দেশে সার্থ যায়। ক্রমেই তাদের সংখ্যা, সম্পদ বেড়ে যাচ্ছে। তাদের দেওয়া হয় সন্ধানের ভার। সংবাদ মেলে না।

তিষ্য জানু মুড়ে বসে পড়েন, তারপর প্রিয়ার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন।

—কী হল, মহামাত্র কি ক্লান্ত ?

—সম্ভবত তিষ্য আর মহামাত্র নেই প্রিয়ে।

—কেন ? —সোমা লেখনী রেখে দেন।

ক দিন আগেকার সভার বিবরণ, আজ যুদ্ধযাত্রার বিবরণ দেন তিষ্য। তারপর বলেন—বৃথাই রাজশাস্ত্র লিখছ সোমা, তোমার স্বর্গরাজ্য স্থাপনের কল্পনা কোনওদিন সফল হবে না।

—স্বর্গরাজ্য তো নয় পাঞ্চাল! সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের অভিঘাতময় এই মর্ত্যের উত্তরাধিকারকেই বিবেক ও নিয়মের শাসনে সংযত করে যেতে চাই।

—কিন্তু স্বভাবের মধ্যে হিংসাকে উচ্ছিন্ন না করলে, বাসনাকে বন্দী করতে না পারলে কি মানুষ কোনদিন সুখ পাবে ?

—হায় পাঞ্চাল, তুমি যে তথাগতর মতো কথা বলছ ? হিংসাকে কোনদিন উচ্ছিন্ন করা যাবে কি ? কামনাকেও বিনষ্ট করা যাবে না। সব মানুষ একই সময়ে সর্বতোভাবে সুখীও হবে না।

—তা হলে ? তিষ্য স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করেন।

—তোমার কি মনে হয় না এগুলি জীবনেরই স্বভাব ? ওই কামনা! বাসনাজাত ক্রোধ লোভ, দম্ভ, ঈর্ষা—এইসব! যতই এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে ততই দ্বিগুণ বলের সঙ্গে এরা তোমাকে আক্রমণ করবে। এমন কি তুমি দেখোনি ? শোনোনি ?

—তা হলে উপায় ?

—ক্রোধকে ক্ষাত্রতেজ, লোভকে বাণিজ্য বিস্তার, দম্ভকে মর্যাদাবোধ, ঈর্ষাকে উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর হওয়ার প্রয়াসে পরিণত করা যায় না কী ?

—আর বাসনা ?

—বিত্তবাসনার কথা তো বললামই পাঞ্চাল, শক্তিবাসনার থেকে উদ্ভূত হোক বিরাট বিরাট কর্মকাণ্ড, মহান সব মানুষ—আর দেহবাসনার রূপান্তর তো সবচেয়ে সুন্দর হবে। এই যে পাঞ্চাল সারা জীবন ধরে বিশাখার জন্য অস্থির বাসনাকে সোমার জন্য স্থির প্রেমে পরিণত করলেন, এ কী তবে ? দুঃখময় পৃথিবীতে এই অমৃতের জন্যই কি লক্ষবার ফিরে আসতে ইচ্ছা হবে না ?

ক্লান্ত চোখদুটির মধ্যে দীপ জ্বলছে। পাঞ্চাল তাকিয়েই থাকেন। অপরূপ এক আহ্লাদে ভরে যেতে থাকে—শরীর, মন, অস্তিত্ব, পৃথিবী। কিছু তা হলে পেরেছেন তিষ্য ? কেউ তা হলে শেষপর্যন্ত তাঁকে গ্রহণ করল! তিনিও পারলেন দিতে এবং নিতে ? জীবনের স্বাদ কী গভীর! কী মধুর। মন কী যে বিষাদে পরিপ্লুত। নারীরাই—বিশাখা এবং অলভা, ভদ্রা এবং অম্বপালী, অবশেষে সোমা জিতসোমা তাঁর অর্ন্তজীবনকে গড়ল। একটু একটু করে পূর্ণতা দিল। তিনি সোমার মুখাটি নামিয়ে এনে থিরবিজুরির মতো একটি দীর্ঘ চুম্বনে বহুক্ষণ স্থির-অস্থির রইলেন।

২৫

তিষ্যভদ্র! তিষ্যভদ্র!—তিষ্যকে তিষ্য ডাকবার লোক এখানে কেউই নেই। সকলেই বলে পাঞ্চাল। হরিৎ উত্তরীয়টি কাঁধে গুছিয়ে নিয়ে তিষ্য দাঁড়িয়ে পড়েন। বিশাখা। অদূরে পূর্বারাম মহাবিহার। বিশাখার শিবিকা থেমে আছে। বিশাখা নেমে এসেছে।

—বলুন দেবি!

—দেবি নয় সাকেতকুমার, সখি বিশাখাকে বিশাখা বললেই তো যথেষ্ট হবে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবস্তীর শালতরুর তলায় সরযূ বহে যায়, মল্লিকার গন্ধ ভেসে আসে।

—আপনি নাকি যুদ্ধে হতাহত সৈনিকদের জন্য সর্বস্ব দিয়ে দিচ্ছেন!

—সর্বস্ব? এ কথা কে বলে বিশাখা?

—সারা সাবত্থি বলছে।

—সর্বস্ব নয়। সামান্যই।

—কখনও সামান্য নয় ভদ্র, আপনার কাজই ঠিক। ঠিক স্থানে পৌঁছচ্ছে। আজ মনে হয় আমি বড় বাহুল্য করেছি, যৌবনের অফুরন্ত শক্তির, কল্পনার অপব্যয়...

—এ কথা কেন বিশাখা?

—জেতবন মহাবিহার তো ছিলই। তা সত্ত্বেও পূর্বারাম নির্মাণ করাতে শক্তি দিলাম। সমস্ত শক্তি।

—দান করে খেদ করতে নেই বিশাখা।

গ্রীবা ঋজু করে পঞ্চকল্যাণী নারী বলে—দেবী সুমনার কন্যা সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না। ভদ্র, পিতার কাছে শিখেছিলাম ধন উপার্জন করার সুযোগ ও প্রতিভা সবার থাকে না, তাই যার থাকে তাকে সে ধন ভাগ করে নিতে হয়। স্বকুল, স্বগোত্র, স্বগ্রাম। যদি আরও থাকে তো দানের সীমা আরও বাড়াতে হয়। তাতেই আসে ধনসাম্য। নইলে বসুন্ধরা কুপিত হন, সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। পিতার শিক্ষার মূল কথাটি বুঝিনি। ভগবান তথাগতও বলেছিলেন—যারা সংসার ত্যাগ করে আসছে তাদের জন্য কি দ্বিতীয় সংসার গড়ছো, বিশাখা? তখনও বুঝিনি। মোহগ্রস্ত ছিলাম ভদ্র। আজ দেখছি পূর্বারামের মধ্যে চীবরের পেটিকা নিয়ে কলহ করছে ভিক্ষুরা। কয় তলিকা পর্যন্ত পাদুকা পরার অনুমতি পাবে, ভেষজ বলে ঘৃত, মধু, মাংসভক্ষ্য কীভাবে সংগ্রহ করা যায় এই নিয়ে চিন্তা করছে। বিহার প্রাঙ্গণে একদিন শ্রেষ্ঠীদের পাঠানো অন্ন ইত্যাদি দিয়ে পাকসাক হচ্ছিল মহাভোজের জন্য জানেন? থের সারিপুত্তর তিরস্কারে থামে। নিমন্ত্রণে কে দধির অগ্র পায়নি, কার ভাগের মাংসে অস্থি অধিক ছিল এই নিয়ে নিমন্ত্রককে কটু কথা শুনতে হয়। তিষ্য ভদ্র, প্রতিদিন পাঁচ শত ভিক্ষুকে আহার দিতে প্রতিশ্রুত আমি, আমি জানি মুষ্টিমেয় অর্হন, আদি-ভিক্ষু ও সৎ-কয়েকজনকে বাদ দিলে সংঘ একটি অলস, পরভোজী, অপদার্থ মানব সম্প্রদায় সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু মুণ্ডিত মাথা আর রক্তকাষায়ের জন্য আজ মানুষের শ্রদ্ধা ও দান অবলীলায় নিয়ে যাচ্ছে এবং তাইতে এদের আত্মাভিমান, অধিকার বোধ আরও বেড়ে যাচ্ছে। আমি তাদেরই পুষ্ট করছি।

বিশাখা ম্লান মুখে চেয়ে থাকে।

—এত বিরাট একটি সম্প্রদায় সকলেই কি সমান হয় বিশাখা?—তিষ্য সান্ত্বনা দিতে বললেন।

—বলেন কী? এরা যে অনাগারী। নির্বাণ পথের পথিক, কামনাকে জয় করবে বলে এসেছে! জানেন, থের সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের প্রয়াণের পরে এরা কী বলাবলি করছিল?

—কী?

—ভালই হল—এঁরা গেলেন। এবার তথাগত গেলেই আমরা ইচ্ছামতো চলতে পারব। এত তিরস্কার, উপদেশ, বাঁধাবাঁধি, নিয়ম আর ভালো লাগে না।

—বলো কী বিশাখা?

—হ্যাঁ। এইরূপই অবস্থা। ভগবান নাকি ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠার সময়ে বলেছিলেন, নারীদের স্থান দেওয়ায় ধম্মের আয়ু পাঁচশ বৎসর অল্প হয়ে গেল। আমি জানি ধম্মের আয়ু আরও অল্প। কিন্তু তা নারীদের স্থান দেওয়ার জন্য নয়।...এমনকি ভগবানের সব আচরণও আমি বুঝতে পারি না। মেনে নিতে পারি না ভদ্র! পরম খেদে বিশাখা নতমুখী হয়ে বলল।

তিষ্য দাঁড়িয়ে থাকেন।

—আমার কন্যাসমা ভগ্নী সুজাতা মাতৃহারা, পিতার বড় আদরের, সাকেতের গৃহে সে ছিল মুক্ত, সম্রাজ্ঞী। মহাসেট্‌ঠি সুদত্তর ঘরে তার বিবাহ হয়েছে। বিশাল পরিবার, বহু প্রকারের মানুষ সেখানে, হতভাগিনী সেখানে বালিকাস্বভাবে আগের মতোই আহার-বিহার করে। দিনকাল পরিবর্তিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে তিষ্যভদ্র, আমি আমার অধিকার, মর্যাদা রক্ষার জন্য মিগারগৃহে সংগ্রাম করেছি। ভগ্নী আমার তা পারে না। তার নামে ভগবানের কাছে অভিযোগ এলো সে দুর্বিনীত, কাউকে মান দেয় না। অমনি ভগবান সেখানে গিয়ে তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে এলেন সে দাসীর মতো থাকবে। ধনঞ্জয়ের কন্যা দাসী ? আমি...আমি ভগবানের সঙ্গে এ নিয়ে কলহ করেছি তিষ্যভদ্র, বলেছি তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইচ্ছানুযায়ী চলছেন, বলেছি প্রব্রজিতদের গুহায় কন্দরে থাকাই ভালো—স্থবির দেবদত্ত এ কথাটি অন্তত ঠিকই বলেছিলেন। আরও বলেছি, সমাজের শক্তি তাঁর চেয়ে অনেক অধিক। তিনি কি পেরেছেন মহারাজ বিম্বিসারের হত্যা রোধ করতে ? তিনি কি পেরেছেন নারীদের অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে ? পেরেছেন কি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থামাতে ? অন্ত্যজদের দুঃখ দূর করতে ? তা হলে কেন তিনি বহুজনহিতের কথা, বহুজনসুখের কথা, শ্রামণ্যফলের কথা বলবেন—বিশাখার দু' চোখে অভিমানের অশ্রু।

—শান্ত হও সখি, তিষ্য তাড়াতাড়ি বলেন—শান্ত হও। তোমার সে অপূর্ব স্থৈর্য কোথায় গেল ? উপাসিকার মহাসম্পদ প্রশান্তি ! তুমি না সাত বছর বয়সে স্রোতাপত্তি মার্গে প্রবেশ করেছিলে ?

—তিষ্য, আমার চারপাশের পৃথিবী যখন ভেঙে যেতে থাকে, আমার সন্তানরা বিপথে চলে যেতে থাকে, তখন আমি মাতা কেমন করে স্থির থাকি ? পারি। নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারি। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকেই কিছু সংকল্প ছিল। নারীদের জন্য, দাসেদের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম। পারিনি...আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি।

সেই বিশাখা। সাকেত সুন্দরী গরবিনী কিশোরী যে হতে পারতো রানী। কোনও পদই যার পক্ষে অধিক মর্যাদার হত না। জীবন তাকে এক ধরনের সার্থকতা দিয়েছে। ভাবতেন তিষ্য। আজ সেই সখী বিশাখা অশ্রুমুখী, নিজের শূন্যতার কথা নিজেই বলে গেল। তিষ্যর চেয়ে আপন আর কেউ নেই তার এ কথা বলবার। ম্লানমুখী বিশাখাকে শিবিকায় তুলে দিয়ে গৃহে ফিরতে লাগলেন তিষ্য।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ অতিক্রান্ত। বর্ষা আসব আসব করছে। মেঘেরা জলসঞ্চয় করছে। কাননের মধ্যে হরিৎ অন্ধকার। শেষ গ্রীষ্মের কুসুমের সুগন্ধে মন কেমন করে। কী প্রবল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে একেকটি অমূল্য জীবন আরম্ভ হয়—ভাবলেন তিষ্য। তারপর একদিন যখন ফেরবার পথ থাকে না তখন উপলব্ধি হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। কিছুই পারিনি। এ কি শুধু মিগারমাতা বিশাখারই অনুভব ? অধিকাংশ কর্মী মানুষেরই তো এই এক অনুভব ! বিম্বিসার কি পারলেন রাজসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে ? চণক কি পারলেন বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জম্বুদ্বীপকে সংহত করতে ? ঐক্যবোধ আনতে ? ভগবান বুদ্ধ কি পারলেন পারস্পরিক হিংসা, যা দেখে তিনি উন্মন হয়েছিলেন, তা বন্ধ করতে ? উপরন্তু বলা যায় বহু হিংসার অনুষ্ঠানের পরোক্ষ কারণ তিনিই। হত না বিম্বিসার-হত্যা তিনি না এলে, অহিংসার বাণী প্রচার না করলে, কারণ রাজগৃহের আপামর মানুষ প্রাণপণে সাম্রাজ্যের গৌরব চেয়েছিল, আজ যে বিরূঢ়ক শাক্যদের ধ্বংস করতে ছুটছে তা-ও হত না, শাক্যমুনিকে দেখে মুগ্ধ পসেনদির মনে শাক্য-কন্যার লোভ না জাগলে। মগধ-কোশল বন্ধুভাবে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারত হয়ত। হয়ত রূপ পেত রাজসংঘ। হয়ত বা।

তিষ্যর মনে হল পশু-পাখি-বৃক্ষ-লতা এবং সমস্ত মানুষের নির্যাস দিয়ে গড়া একটি রূপ যেন ভেদ করতে চাইছে ক্রান্তিকালের কঠিন প্রাচীর। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা পার হয়ে এসেছে সে। তার পরেও নতুন ব্যর্থতার পাষাণ প্রাচীরে এসে মাথা ঠুকে যায়। ব্যর্থতাই কি তবে মানুষের নিয়তি ? কোথায় দৈবরাত ? এতো ভালোবেসে ছিলেন মহারাজ বিম্বিসারকে যে নির্বাসন দণ্ডের অভিমানে একেবারে হারিয়ে গেলেন ? আজ তিনি থাকলে ইতিবৃত্ত অন্যপ্রকার হত। কিছু না হোক নক্ষত্রালোকে ছাদে বসে তাঁরা তিনজনে অলোচনা করতেন রাজনীতি, মানবনীতি।

কানন পার হয়ে নক্ষত্রালোকিত প্রান্তরে পড়লেন তিষ্য। একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা পেছন থেকে এসে আমূল বিঁধে গেল তাঁর পিঠের বাঁদিকে। পুষ্পিত বকুলের তলায় তিষ্য পড়ে গেলেন। একটি আর্তনাদের শব্দও মুখ থেকে বেরল না। এমনই নিপুণতা ঘাতকের। শুধু তরুতলে ঝরা বকুলগুলি গাঢ় রক্তে রাঙিয়ে যেতে থাকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচিরবতীর শুষ্ক খাত। শিবিরের পর শিবির পড়েছে। রথ, হাতি, ঘোড়া, গো-শকট। শাক্যদের শিশু-বৃদ্ধ-নারীদের গরম রক্তে হাত ধুয়ে প্রতিহিংসার শপথ পূর্ণ করেছে বিরূঢ়ক। শিবিরে শান্তিঃ। সাবত্থিতেও একমাত্র পথের কাঁটা যে নির্মূল, সে-সংবাদ পৌঁছে গেছে। হৃদয়ে শান্তির ঢল। গভীর রাতে গাঢ় কল্লোল জাগে। সুখশয্যায় পাশ ফিরতে ফিরতে কুমার ভাবে এ আমার রক্তেরই কল্লোল। বড় আহ্লাদিত রক্তকণাগুলি। বইছে, নিষ্কণ্টক বইছে। অহো কী শান্তিঃ। আর্তনাদ কিসের? অশ্বের হ্রেষা, হাতিদের বৃংহণ? যেন রাত্রি ফাটিয়ে ফেলতে চায়? অচিরবতীর শুষ্ক খাতে ঢল নেমেছে। উজানে বৃষ্টি। মুষলধার। পশুগুলি মুক্ত হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, শত শত সৈন্য পায়ের তলায় পিষ্ট করে ছুটোছুটি করে। তুমুল বন্যায় বিরূঢ়কের সেনা, রথ, পশু, অস্ত্র, শিবির ভেসে যায়। ফেনিল গর্জন করতে করতে বর্ণময় বস্ত্রগুলি ঊর্ধ্বে তুলে অচিরবতী ছোটে। পাণং ন হানে...পাণং ন হানে...পাণং ন হানে...

এবং মাৎস্যন্যায়ে পূর্ণ অরাজক শ্রাবস্তী নগরী ছেড়ে অবশেষে গান্ধারের দিকেই যাত্রা করেন একাকিনী সোমা। কোলে শিশুপুত্র। সার্থবাহ নন্দিয় যাচ্ছেন উত্তর পথ ধরে। সিন্ধু সৌবীর ঘুরে গান্ধার যাবেন। পার্সরা বহু নতুন পণ্য আনছে, অনেক মূল্য দিয়ে কিনছেও পূর্বাঞ্চলের পণ্য। তাই সার্থ যায়। নন্দিয়র সঙ্গ নিয়েছেন পাঞ্চালপত্নী সোমা। কখনও শকটে, কখনও অশ্বে, কখনও পদব্রজে পথ চলেন। শিশুটিকে সাবধানে নিয়ে চলে রক্ষীরা। চলতে চলতে গান্ধারী ভাবেন—সারাজীবন কি তিনি প্রবাসেই কাটালেন? মধ্যদেশ...এই মধ্যদেশ তাঁকে মুক্তি দিয়েছে, কর্ম দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, প্রেম দিয়েছে, শোক দিল মর্মান্তিক বিচ্ছেদের, মর্মান্তিক মৃত্যুর। ব্যাকুল আশঙ্কায় এখন মাতৃভূমির কোলে ফিরছেন তিনি। পার্সপুরীর রাজা ধারদ্বসূর সামন্তরাজ্য এখন গান্ধার। পরপদানত। তা হোক। মা দেবদত্তার নিঃশ্বাস মিশে আছে তক্ষশিলার বাতাসে। পিতা দেবরাতের ভাবনা। যেমন করেই হোক তক্ষশিলার মহাবিদ্যালয়ে পৌঁছতে হবে। আছেন মিত্র অনঘ আঙ্গিরস। নিশ্চয় সাহায্য করবেন। শিশুটি দেবরাতের স্বভূমিতে বেড়ে উঠুক তাঁর কন্যার বংশ। তিষ্যপুত্র চণক...তার পুত্র চণক, তার পুত্র, তার পুত্র...সোমা চণকের রক্ত এবং স্বপ্ন নিয়ে নতুন গোত্র জন্ম নেবে নাকি? সেই চণকের গোত্রসম্ভব কোনও প্রতিভাধর দূর ভবিষ্যতে যদি চণকের স্বাধীনতার স্বপ্ন বুঝতে পারে, যদি বন্ধন মোচন করতে পারে।

AMARBOI.COM

২৬

...গৌতম জানেন এই তাঁর শেষ যাত্রা। এই শেষবার বেণুবন, কলন্দক নিবাপ, মোর নিবাপ, গিজ্ঝকূট, জীবকাম্ববন...এই শেষ। কেউ জানে না। তিনি একা জানেন। রাজগহ পেরিয়ে চলেছেন মেঘের সঙ্গে সমান তালে। অম্বলট্‌ঠিকা। পাবারিক অম্ববন। দলে দলে মানুষ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে একটি নতুন সংঘারামের। পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ সারিপুত্তর জন্মস্থান নালকগ্রামের অদূরে এই পাবারিক সংঘারাম।

বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য আমি দীর্ঘ আশি বছর জীবিত রয়েছি? সাধনা করেছি। প্রথমেই মানুষের করণীয় সম্পর্কে সব বুঝে যাইনি। আজ সদ্ধম্ম বলে তোমরা যা জানো তার সবটাই নিমেষের উদ্ভাস নয়। দিনে দিনে তিলে তিলে একে গড়েছি। গড়েছেন এই নালক গ্রামের সারিপুত্ত, যিনি অতি সাধারণ মানুষের মতো রক্তবমন করে মারা গেলেন, গড়েছেন মোগ্‌গল্লান যিনি ধ্যানরত অবস্থায় নিতান্ত অসহায়ের মতো দস্যুদের হাতে, সম্ভবত অনঙ্গ চণ্ডাল ও তার দলবলের হাতে নিহত হলেন, গড়ছে প্রতিভাবান কিশোর কুমার কাশ্যপ যে মাতৃগর্ভে সঙ্ঘে এসেছিল, রাজপুরীর সুখে লালিত হয়েও যে এখন অনাগারী, কূট দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা করছে ছোট থেকে। গড়ে চলেছেন অগ্‌গসাবিকা খেমা ও উপ্‌পলবন্না তাঁদের বিশ্বাস দিয়ে, গড়ছে বিসাখা মিগারমাতা তার সংশয় দিয়ে। নালক থেকে পাটুলি যাই তবে? নালক যদি বৌদ্ধবিদ্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাবিদ্যালয় হয় তবে পাটুলি হবে আর্যাবর্তের এক শ্রেষ্ঠ নগরী। শোন হে মগধবাসী, কোনও ঋদ্ধি থেকে বলছি না, বর্ষকার ও সুনীথ যে-দুর্গের পত্তন করেছেন, দেখে এসো, তার সঙ্গে মেলাও তার অবস্থান। আমাকে বুঝতে পারবে। অগ্নি, জল আর অন্তঃকলহ এই তিন ভয় থাকবে এ নগরীর। সাবধান নগরবাসী, সকল ঐশ্বর্যশালী নগরীরই এই তিন ভয় থাকে। বর্ষকার, পূর্বের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষতিপূরণ করতেই কি এই দ্বারের নাম দিলে 'গৌতমদ্বার' ? এই ঘাটের নাম দিলে 'গৌতমঘাট' ? তা দাও, কিন্তু সেই সঙ্গে বৈশালীকে পরাজিত করার মন্ত্রটিও তো জেনে নিলে। জেনে নিলে না অনুমতি নিলে ?ভেদনীতির কথা কি আর তোমরা জানো না ? জানে, লিচ্ছবিরাও জানে, তবু ভুল হয়ে যায়।

—কোটিগ্রাম ছেড়ে চলি নাতিকাগ্রামে। ভিক্ষু সাল্হ, ভিক্ষু সুদত্ত, ভিক্ষুণী নন্দা এই নাতিকাগ্রামের মানুষ। এখন নির্বাণ লাভ করেছেন। না গ্রামবাসীজন, তোমাদের প্রিয়জনদের পারলৌকিক গতি সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। কেন এ প্রশ্ন করো ? অবান্তর। দূরে দেখা যায় আমার বড় প্রিয় বৈশালী নগরী। না ছেটক, কূটাগারশালায় যাব না এখন, আপনাদের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করব না, যাব অম্বপালীর অম্ববন। এসো মা অম্বিকা, তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি তো ! অম্ববনটি তথাগতকে দেবে ? দাও—সম্মতি দিলাম। বিহারে বিহারে ভরে যাক মগধ। চলো ভিক্ষুগণ—স্মৃতি জাগ্রত রাখো। সমাদর, দান, বহু জনসমাগম এসব উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয় চিত্ত। স্মৃতি জাগ্রত রাখো। স্মৃতি...। সম্মা সতি।

বর্ষা আসছে। বেলুব গ্রামে বর্ষাযাপন করলেন গৌতম। জীবনের শেষ বর্ষা ! তাই বোধহয় নিয়ে এলো কঠিন আন্ত্রিক পীড়া। নিদারুণ যাতনা।

—ভগবন, এই ব্যাধিই কি আপনার শেষ ব্যাধি ? যদি তা-ই হয় ভিক্ষুসংঘকে জানিয়ে যাবেন না ?

—কেন আনন্দ ? সংঘ আমার কাছ থেকে আর কী প্রত্যাশা করে ? যা করণীয় বলে, ধর্ম বলে মনে করেছি সব নিঃশেষে জানিয়ে দিয়েছি, মুষ্টিবদ্ধ তো রাখিনি কিছুই। অতি সরল সহজ, কিন্তু দারুণ কঠিন সেই উৎকৃষ্ট জীবনের দ্বার খোলবার সংকেতসূত্র। কঠিন। কিন্তু গোপন, রহস্যময় তো নয় ? হে আনন্দ, মনে করো না আমিই তোমাদের পরিচালক, ভেবো না ভিক্ষুসংঘ আমার আশ্রিত। তোমরা নিজেরাই নিজেদের আশ্রয় হও। আত্মদীপ হও। এ দেহ জরাজীর্ণ। ভাঙা শকটের মতো, এখন একে পরিত্যাগ কারবার সময় এসেছে।

তবে ঋদ্ধিপাদ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে আয়ুর সীমা বাড়িয়ে নিতে পারেন। এ কী ? এ কথা কেন বললাম ? আনন্দ উন্মন ? শোনেনি কি ? কেন বললাম ? বহুজনের বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকি রয়ে গেল—তাই ? মহাকাল তাদের প্রশ্নের উত্তর দিক। সত্যই কি সমাজের প্রভাববলয়ের বাইরে যেতে পারিনি ? যদি সমাজের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্রোতে যেতাম, যেটুকু সম্পাদিত হয়েছে সেটুকুও হত না, মঝ্‌ঝিম পন্থা আমার, সর্ব অর্থেই মধ্যম। নারীরা ক্রমে পুরুষের ইচ্ছার দাস হয়ে যাচ্ছে, বর্ণভেদ বাড়ছে। আমার ব্যক্তিগত বিদ্রোহ আমি রেখে গেলাম রাজাকে উপেক্ষা করে নটীর নিমন্ত্রণ নিয়ে জীবনের এই অন্ত্য পর্বে, চণ্ডাল সোপাক, নীচকুলজাত সুনীতকে সংঘে গ্রহণ করে, নহাপিত উপালিকে শ্রেষ্ঠ বিনয়ধরের সম্মান দিয়ে। হে বিরুদ্ধবাদীরা, আমি অন্তর্যামী, আবার অন্তর্যামী নইও। কিছু অনুমান করতে পারি, কিছু পারি না। বিপুল চরিত্রজ্ঞান, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আর করুণা দিয়ে পৌঁছতে পারি অনেক সময়েই দ্বন্দ্বের মূলে। সমস্যার মূলে। আমি যেখানে পৌঁছেছি ধ্যানস্তিমিত সেই প্রশান্তির পারাবারে বিক্ষোভ ওঠে না। তবু চেষ্টা করেছি লোকচিত্তের কাছাকাছি থাকতে। লোকভাষায় কথা বলতে।

ডেকো না আনন্দ, আমাকে ডেকো না, আমি এখন সমাধিমগ্ন থাকলেই ভালো থাকি।

বর্ষাকাল শেষ। মহাবনে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়েছেন। তাদের তিনি উপদেশ দিলেন : 'বায়ধম্মা ভিক্‌খবে সঙ্খারা অপ্‌পমাদেন সম্পাদেথ'—তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করো। ভাণ্ডগ্রাম-ভোগনগর...আনন্দ চৈত্য। এখানে বললেন : যদি কেউ এসে বলে তথাগত এই বলেছিলেন, তথাগত তাই বলেছিলেন তা হলে বিনয়সুত্তের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখবে। জানবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনয়ই হল তোমাদের মূলশাস্ত্র। এবার মল্লভূমি পাবা। ভিক্ষুসংঘ-সহ গৌতম নিমন্ত্রিত চুন্দর আম্রকাননে। কম্মার চুন্দ বহু আয়োজন করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে সূকরমদ্দব নামে একপ্রকার ছত্রাকের ব্যঞ্জন। বুদ্ধ খেয়ে বললেন—চুন্দ, এগুলি আর কাউকে দিও না। মাটিতে পুঁতে ফেলো।

বিষম রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন তিনি। উপস্থিত সবাইকে বললেন—তথাগত সমস্ত জীবন যা যা খেয়েছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সুজাতার দেওয়া পরমান্ন যা বোধিলাভের পূর্বাহ্নে খাই আর চুন্দর দেওয়া এই পক্বান্ন যা...। ভিক্ষুগণ তোমরা যেন চুন্দকে দোষ দিও না।

অসুস্থ দেহেই তিনি পথ চলতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে ককুত্থা নদী পার হয়ে গেল। জলপান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। মল্লপুত্র পুক্কুস তাঁর শরণ নিল। নদীতে স্নান করে আম্রকুঞ্জে আশ্রয় নিলেন। আবার চলতে থাকেন। হিরণ্যবতীর তীরে কুশিনারা দেখা যায়। পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে মল্লদের শালবন। আর পারেন না। যুগ্মশালের অন্তরালে তাঁর শেষ শয্যা পাতা হল। বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বনভূমি প্লাবিত। শালের কুসুম ঝরছে। সিংহ শয়নে শুয়ে গৌতম বললেন—আমার যা সাধ্য তা করেছি হে আনন্দ। পাঁচ সহস্র বছর পরে সদ্ধম্মের প্রভাব যখন লুপ্ত হয়ে যাবে তখন আসবেন আরেক বুদ্ধ—মেত্তেয্য (মৈত্রেয়)।

২৭

শোন ও মহানদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ পাহাড় জঙ্গলময় মালভূমির নানান অঞ্চলে বন কামানো ও জ্বারানো শেষ হয়ে যায়। ছোট গাছপালা ঝোপঝাড় সবই কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরু ছাইয়ের পরত পড়ে গাভিন হয় জমি। পরিষ্কৃত এলাকায় খোন্তার লকুট দিয়ে গর্ত করে বীজ বুনতে বুনতে আকাশের দিকে তাকান চণক। বৃষ্টি আসছে। বৃষ্টি! নৈর্ঋত থেকে অগ্নিকোণে মোড় নিয়ে ছুটে আসছে পরিমিত বৃষ্টিদায়ী ছাই-রঙা মেঘের দল। দেখতে দেখতে ব্যাখ্যাতীত আহ্লাদে ভরে যেতে থাকে মন। ক্রমে শস্য ফলে। চারদিকে আগুনের কুণ্ড জ্বেলে, রেখা টেনে, খুঁটি গেড়ে গ্রাম পত্তন হয়। ব্রীহি থেকে ঢেঁকিতে কুটে চাল হয়। সারনায় সারনায় পবিত্র পাকুড় কিংবা শ্যাওড়া গাছের তলায় কালো মোরগ কেটে সূর্যদেবতা সিঙবোঙার পুজো হয়। পুজো হয় গ্রাম-দেবতা বুঢ়ামবুঢ়া বুঢ়ামবুঢ়ির। তাঁর কেশবতী শবরী পত্নী রগ্‌গা মিশ্রবর্ণের স্বাস্থ্যল সন্তান প্রসব করে। শিশুর শুভজন্ম উপলক্ষে আখারায় আখারায় ধিমি ধিমি চাঙ্গু বাজে। ক্রমে তাঁরা খুঁজে পান স্বর্ণপ্রসূ এক গাঙের অবারিত বেলা। নতুন জনপদ গড়তে গড়তে এগিয়ে যান অপরিমেয় লোহা ও তামার আকরের শিরা চেঁছে নিয়ে, রত্নখনি মাড়িয়ে, তৃণগুল্মময় বুরুগুলির ওপর দিয়ে পুবে আরও পুবে। পথে পড়ে প্রাচীন সব সাসান-দিরি। খাড়া খাড়া পাথরগুলি পিতৃপুরুষের চিহ্ন নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। ক্ষণেক দাঁড়ান তিনি। কারা তাঁর পিতর্? তিনি কে? কী যেন তাঁর করার ছিল? মনে পড়ে, পড়ে, পড়ে না। আগুনে টান টান করে সেঁকা চাঙ্গুর ধিমি ধিমি বোল ভেসে আসে। স্তব্ধ কোনও দুপুরে ভূমি চষতে চষতে শোনেন ভিন্ন কিল্লির ভিন্ন পাঢ়ায় ছাগপালক রাখালিয়ার বাঁশের বাঁশি তিরি-লিরি করে বাজছে। উন্মন থেমে দাঁড়ান। মনে পড়ে, পড়ে, পড়ে না। তিনি মিশে যান পারাপারহীন জীবনস্রোতে। বইতে থাকেন পাঁচ হাজার বছর পরেকার কোনও সময়বিন্দুর দিকে। বইতে থাকেন। মৈত্রেয় হবেন বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

অগ্নিস্টোম—অতি ব্যয়সাধ্য এবং কঠিন এক সোমযাগ।
অচিরবতী—বর্তমান রাপ্তী।
অট্‌ঠগুরুধম্ম—আটটি নিয়ম যা মেনে নেওয়ার পর মহাপ্রজাবতীর নেতৃত্বে ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপিত হয়। ১. ভিক্ষুদের প্রতি সম্ভ্রম দেখাতে হবে। ২. যেখানে ভিক্ষু নেই সেখানে ভিক্ষুণীরা বাস করতে পারবেন না। ৩. সব বিষয়ে ভিক্ষুসংঘের অনুমতি নিয়ে চলতে হবে...ইত্যাদি ইত্যাদি।
অট্টালক—Watch-tower
অঙ্কধাত্রী—ধাত্রী তখন নানারকম হত, মেয়েদের এটি একটি বহুপ্রচলিত জীবিকা। অঙ্কধাত্রী শিশুকে কোলে নিয়ে যত্ন করবে, স্তন্যধাত্রী—দুধ-মা, মালধাত্রী বা মণ্ডনধাত্রী পোশাক পরিচ্ছদের ভার নেবে, ক্রীড়াপনিক ধাত্রী—শিশুর সঙ্গে খেলবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।
অনাগামি—বৌদ্ধ ধর্মে শ্রাবকদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা হত। সোতাপন্ন—তিনটি বন্ধন নাশ করলে, সকদাগামি—আর দুটি বন্ধন কাম-ক্রোধ নাশ হলে, অনাগামি—এই পাঁচটি বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় হলে, তারপর আরও পাঁচটি বন্ধন নাশ হলে হয় অর্হন।
অবীচি—বৌদ্ধশাস্ত্রের অষ্ট নরকের অষ্টমতম।
অরুর্মুখ—লালমুখো। কৌষিতকী উপনিষদে আছে ইন্দ্র বলছেন : অরুর্মুখান্ যতীন সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম—অর্থাৎ আমি লালমুখো মুনিদের সালাবৃক (হায়েনা বা নেকড়ে)দের মুখে দিয়েছি, অর্থাৎ ভক্ষণ করিয়েছি।
আজানেয় অশ্ব—Throughbred horse
অসুর—আসিরীয়
আবুস—সমপর্যায়ের ব্যক্তিকে সম্বোধন।
আর্য—অর্থ—noble man. পরে জাতিবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। এঁরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে দ্রাবিড় সভ্যতা ধ্বংস করে সিন্ধুর তীরে বসবাস শুরু করেন। এমন ঐতিহাসিক মত। তবে প্রশ্নটি এখনও গবেষণাধীন।
ইন্দ্রকীল—নগরতোরণের সামনে সুদৃঢ় স্তম্ভ, যাতে হাতি এসে সোজাসুজি ধাক্কা মারতে না পারে।
উদকশুদ্ধিক—বিশেষ নদী বা দিঘির জলে স্নান করলে পাপ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাস যার। অনুরূপ শ্মশানশুদ্ধিক, নামসিদ্ধিক।
উপসয়—উপাশ্রয়। ভিক্ষুসংঘের কাছাকাছি ভিক্ষুণীদের থাকবার জায়গা।
উপায়কুশল—resourceful
কম্মারগাম—কর্মকারগ্রাম—কর্মকারদের পল্লীও হতে পারে, আবার একটি পুরো গ্রাম শুধু কর্মকারদের বসতি এমনও হতে পারে। তুলনীয়—লোণকারগাম, বর্ধকিগাম...
কর্মান্ত—estate বা factory
কর্মস্থান—ধ্যানের বিষয়, বুদ্ধ ভিক্ষুদের ধ্যানের বিষয় বলে দিতেন তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী।
কামানো ও জারানো—বন কেটে জ্বালিয়ে চাষের জমি প্রস্তুতের আদিবাসী পদ্ধতি। ঝুম চাষ।
ককায়বন্ধন—কোমরবন্ধ। বেল্ট, ভিক্ষুদের পোশাকের অঙ্গ।
কাষ্ঠকুট্ট—কাঠঠোকরা পাখি
কার্ষাপন—পালি কহাপন > কাহন। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তিন ধাতুরই হত এই মুদ্রা।
কিলিঞ্জক—মাদুর।
কিম্ভি—গোত্র।
কুম্ভথুনিক—হাঁড়ি-বাজিয়ে।
কূটাগার—চিলেকোঠা
কুরুস—পারস্যরাজ Cyrus (558-530 B.C); ইনি পুব দিকে গাণ্ডারাইটিস জয় করেছিলেন এমন অনুমান আছে। সম্ভবত ইরান (পারস্য) ও ভারতের সীমান্ত প্রদেশ তিনি জয় করেছিলেন। এবং সেখান থেকে কর আদায় করতেন। এই গাণ্ডারাইটিসই গান্ধার হতে পারে। নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।
কুলপুত্র—ভদ্রলোকের ছেলে।
কুলপতি—দশ হাজার ছাত্র যাঁর তেমন আচার্যকে কুলপতি বলা হত। Universityর Vice-Chanceller?
কেতুকাম্যতা—ambition
কোমারভচ্চ—কৌমারবৎস, শিশু-চিকিৎসক। জীবকের উপাধি ছিল, কিন্তু তিনি সবার চিকিৎসাই করতেন।
খজ্জ—শুকনো খাবার > খাজা।
গহপতি—সংস্কৃত গৃহপতি। সাধারণভাবে সম্পন্ন গৃহস্থকেই বোঝাতো। কিন্তু বিশেষার্থে বুদ্ধযুগে বণিকদের বোঝাত। শুধু বৈশ্য নয়, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় গহপতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।
গান্ধারদেশ—বর্তমান পেশোয়ার (পুরুষপুর) ও রাওয়ালপিণ্ডি। রাজধানী তক্ষশিলায় প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। গান্ধাররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কাশ্মীরও।
চত্তার আর্যসচ্চ—চতুরার্যসত্য—দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ বাসনা, বাসনা নিবৃত্তি করেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে, বাসনা নাশের উপায় হচ্ছে অষ্টাঙ্গিক মার্গ।
সোমযাগ—সোমরস আহুতি দেওয়া হয় এমন ব্যয়সাধ্য কঠিন যজ্ঞ। ব্রাহ্মণদের জীবনে একবার করতেই হত।
চাম্ভ—ধামসা জাতীয় পশুচর্মের বাজনা।
চতুর্মাস্যা—আষাঢ়ি পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত চারমাস বৌদ্ধরা বাস করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেল—বস্ত্রখণ্ড বা প্রান্ত, রুমালের মতো ওড়ানো হত।

ছন্দ—বেদের ভাষা ও ছন্দ

ছয় তীর্থংকর—১. অজিত-কেশকম্বলী—নাস্তিক, চার্বাকের মতো। ২. মক্খলী গোশাল—বা মকখালি গোসাল—নিয়তিবাদ মানতেন। অর্থাৎ ভালো-মন্দ কিছুতেই কিছু হয় না। সংসারের সবগুলি চক্রের ভেতর দিয়ে যাবার পরই দুঃখের অন্ত হবে। ৩। পূরণ কাশ্যপ, বা পূরণ কাস্সপ পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই, কর্মফল নেই—অক্রিয়বাদী। ৪. নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র বা নিগ্গন্ঠ নাতপুত্ত—মহাবীর নামে পরিচিত। চাতুর্যাম ও তপস্যার দ্বারা বিগতজন্মসমূহের পাপ ক্ষয় করা সম্ভব—এই ছিল এঁর মত। ৫. প্রক্রুধ কাত্যায়ন পকুধ। কচ্চায়ন—অন্যোন্যবাদী। পৃথিবী, জলবায়ু, তেজ, সুখ দুঃখ ও জীবন অচল ও কূটস্থ পদার্থ। এদের কেউ নষ্ট করতে পারে না। ৬। সঞ্জয় বৈরট্টিপুত্র— বা বেলট্ঠিপুত্ত—ইনি বিক্ষেপবাদী। অজ্ঞেয়বাদী বলা যায়।

ছোটিকা—তুড়ি।

ঠারে—কাছে, আপন করে।

দর্শযাগ—প্রতি অমাবস্যায় করণীয় যাগ।

দহর ভিক্ষু—অল্পবয়স্ক ভিক্ষু।

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণই উপনয়নান্তে উপবীত ধারণ করত, ও দ্বিজ আখ্যা পেত।

ধর্মনাটক—নিঃসন্তান রাজা প্রথমে দাসীদের, পরে অপ্রধান রাণীদের। তারপরে অগ্রমহিষীদেরও অবরোধের বাইরে ছেড়ে দিতেন। ইচ্ছে মতো বিচরণ করে সন্তানসম্ভবা হয়ে আসবার জন্য।

ধারয়বসু—দরায়ুস, দরায়বৌস, পারস্যরাজ (522-486 B.C.) আনুমানিক 518 B.C.-র মধ্যে উত্তর পাঞ্জাব অর্থাৎ গান্ধারের কিছু অংশ অধিকার করেন। তাঁর পার্সিপোলিস লেখতে (520-518 B.C.) গান্ধার এবং সিন্ধু উভয়েরই উল্লেখ আছে। ৩৬০ ট্যালেন্ট সোনা তিনি রাজস্ব হিসেবে আদায় করতেন। অজাতশত্রুর রাজত্বকালেই কোনও সময়ে এই ঘটনা ঘটে। দরায়ুস কীভাবে বিজিত প্রদেশ শাসন করতেন জানা যায় না।

নবকম্মকুটির—ভিক্ষুণীদের নির্জনবাস ও ধ্যানের জন্য ছোট কুটির।

নলপট্টিকা—পাটি, একরকম মাদুর।

নিগমগ্রাম—বাজার হাট আছে এমন গ্রাম। গঞ্জ।

নিয়োগপ্রথা—সন্তান না হলে স্বামীর অনুমতিক্রমে ভিন্ন পুরুষের ঔরসে গর্ভধারণ। পঞ্চপাণ্ডব যেভাবে জন্মেছিলেন।

পঞ্চকল্যাণী—চুল সুন্দর (কেশকল্যাণী), দাঁত সুন্দর (অস্থিকল্যাণী)। গড়ন সুন্দর (মাংসকল্যাণী) ত্বক সুন্দর (ছবি কল্যাণী) ও চিরযুবতী (বয়ঃ কল্যাণী) কন্যা।

পঞ্চরাজচিহ্ন—খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা ও চামর।

পর্ণ—শাক।

পরিবৃক্তী—রাজাদের চারজন বৈধপত্নী থাকতো—মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তী ও পলাগালী। মহিষী সম্মানে শ্রেষ্ঠ, বাবাতা প্রিয়া, পরিবৃক্তী পুত্রহীনা, ইনি ও পালাগলী—একেবারেই দুয়োরানী।

পরিস্রাবণ—ছাঁকনি, ভিক্ষুদের ব্যবহার্য।

পাণং হানে—প্রাণী বধ করো না। বুদ্ধোক্ত পঞ্চ শীলের প্রথমটি।

পার্স—পারসিক।

পুণ্যশিষ্য—Charity Scholar

পূর্ণমাস যাগ—প্রতি পূর্ণিমায় করণীয় যাগ।

পোষধ—পালি উপোসথ > উপোস। প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় পালনীয় ছিল। শুধু বৌদ্ধদের নয়, ধর্মপ্রাণ অন্য মানুষদেরও। কিন্তু পোষধ হচ্ছে সংযম পালন। অনাহারে থাকা নয়।

বাসি—ছোট ক্ষুর।

বাহাসিঁদড়ি—মাটি, ভূমি, বসুন্ধরা।

ব্যক্তিমায়া—Charisma

বির—অরণ্য।

বুঢ়ামবুঢ়া বুঢ়ামবুঢ়ি—জুয়াঙ্গদের গ্রামদেবতা।

বেগাবেগি—তাড়াতাড়ি

ব্রীহি—ধান—দ্রাবিড় শব্দ।

মজাঙ্—মাচাং—গ্রামের প্রথমে একটি বড় ঘর যেখানে যুবকেরা রাত কাটায়। নাচ গান এরই চাতালে হয়। অতিথি এলে এখানেই থাকে।

মহানসী—রান্নার যোগাড়ে

মাণ্ডলিক রাজা—সার্বভৌম রাজার অধীনে কোনও অঞ্চলের রাজা।

রজ্জুক—Surveyor.

লকুট—ধাতুর খণ্ড।

শম্বোষ্ঠী—মোটা-ঠোঁট অলা

শাক—তরি-তরকারি

সম্মা সতি—সম্যক স্মৃতি, ধারণা ঠিক রাখা, অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্যতম।

সারনা—পবিত্র বৃক্ষ সম্বলিত স্থান।

সুমের—বর্তমান ইরাক।

সৌগুঞ্জন—সন্ধ্যনে

হড়—মানুষ।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি :

1. Political History of Ancient India : H.C. Ray Chaudhuri.
2. The Age of Imperial Unity : History and Culture of the Indian People, Vol. II by Bharatiya Vidya Bhavan.
3. The Vedic Age : „ Vol I
4. Buddhist India : T.W.Rhys Davids
5. Social Organisation in North-East India in Buddha's Time : Richard Fick
6. Society at the Time of Buddha : Narendra K. Wagle
7. Genesis of Buddhism—Its social Content : Dr. Bratindranath Mukherjee
8. Studies in the Buddhist Jatakas : B.C.Sen.
9. Buddhist Legends : 6 Vol. E.W.Burlingame
10. Tribal Life of India : Nirmal Kumar Bose
11. Introduction to Ancient Indian History and Culture : D.D.Kosambi
12. জাতক—ছয় খণ্ড—অনুবাদ : ঈশানচন্দ্র ঘোষ
13. কৌটলীয় অর্থশাস্ত্র—দুই খণ্ড— „ : ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক
14. ধম্মপদ „ : নারদ মহাথের
15. উপনিষৎ প্রসঙ্গ ৫ম—অনুবাদ—„ কৌষিতকী : শ্রীমৎ অনির্বাণ
16. থেরী গাথা—অনুবাদ : ভিক্ষু শীলভদ্র
17. মিলিন্দ-প্রশ্ন „ : শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির
18. বুদ্ধ কথা : ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন
19. ভগবান বুদ্ধ : ধর্মানন্দ কোসাম্বি
20. তথাগত বুদ্ধ : শান্তিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
21. বৌদ্ধ ধর্ম : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
22. দর্শন দিগ্‌দর্শন : রাহুল সাংকৃত্যায়ন
23. যজ্ঞ কথা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
24. বেদের কবিতা : গৌরী ধর্মপাল
25. প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য : ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য
26. পালি সাহিত্যে নারী : ডঃ বাণী চট্টোপাধ্যায়
27. প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে : ডঃ রণবীর চক্রবর্তী
28. বাংলার ইতিহাস : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
29. বিজ্ঞানের ইতিহাস—১ম খণ্ড : সমরেন্দ্রনাথ সেন
30. বৌদ্ধযুগের ভূগোল : ডঃ বিমলাচরণ লাহা
31. প্রাচীন ভারতের পথপরিচয় : গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
32. হিন্দুসমাজের গড়ন : নির্মলকুমার বসু
33. সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ : সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~